পন্থা

২য় খণ্ড]   নবপর্য্যায়, বৈশাখ ১৩২[illegible]   ১ম সংখ্যা

আমাদের সপ্তদশ বৎসর।

ওঁ অধ্যাত্মনে নমঃ।

সর্ব্বে বেদা যৎপদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি—
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি যৎযতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যঞ্চরন্তি—

যে অবিনাশী পরম তত্ত্ব, অক্ষয় পুরুষকে, বেদবিদ্‌গণ ইঙ্গিতে আভাস বীতরাগ ও ভেদাত্মক অহঙ্কারের প্রবণতাশূন্য সংযত-চিত্ত যতিগণ যাঁহাতে প্রবেশ করেন, যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরিত হয়,—সেই শুভ্র, জ্যোতির জ্যোতিঃ, সর্ব্বস্বরূপ, অমৃতের খনি, বেদ-বেদ্য, ব্রহ্মণ্যদেব শ্রীভগবানে গত বৎসরের কর্ম্মফল ভক্তি চন্দনে চর্চ্চিত হইয়া অর্পিত হইল;—যেন সেই কর্ম্ম সর্ব্ব-হৃদয়ে, সর্ব্বভূতে, সেই পরাৎপর দেবের লীলাকার্য্যে স্বীকৃত হয়। হরিঃ ওঁ তৎসৎ। তন্নোধীয়ো প্রচোদয়াৎ ওঁ।

পথ কি? 'পন্থার' কার্য্য কি? শাস্ত্রে ত' অনেক পথের কথা দেখা যায়; এবং নানাবিধ শ্রুতিতে বিপ্রতিপন্ন-চিত্ত ক্ষুদ্র মানবের হৃদয়ে প্রশ্ন স্বতঃই উত্থিত হয়, 'পথ কি'? এই জন্য শাস্ত্র অসঙ্কোচে বিস্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছেন, "নান্যঃপন্থা বিদ্যতে অয়নায়" "পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সা পরা গতিঃ।"

"পুরুষ হইতে অন্য পথ নাই। পুরুষই একমাত্র লক্ষ্য ও পরাগতি।" এ পর্য্যন্ত মত ভেদ নাই; কিন্তু "পুরুষ'এর অর্থ কি? 'পুরুষ' শব্দে শাস্ত্র কি কোন তত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন?

ভাবিলাম, পুরীতে যিনি কার্য্য করেন, তিনিই পুরুষ; অর্থাৎ দেহীই পুরুষ। সর্ব্ব ব্যাপারে বিশিষ্ট 'আমিকে' লক্ষ্য করিয়া পথ চলিতে গেলাম। কিন্তু শান্তি ত' মিলিল না। সাংখ্য বলিলেন;—

"কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে প্রকৃতির্হেতুরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥"

"বাপু, কার্য্য-কারণ কর্ত্তৃত্বের সংঘাতের মধ্যে বিশিষ্ট নাম রূপের পরিমাণ লইয়া, পুরুষকে খুঁজিলে পাওয়া যায় না। পুরুষ প্রাকৃতিক খেলার অতীত পদার্থ সুখ দুঃখ-ভোগের হেতু। তিনি পুরীতে 'শয়ান' আছেন, কর্ত্তা নহেন। ভাবিলাম এইবার বুঝা গেল, 'ভোক্তাই' পুরুষ। ভোগের চেষ্টায় ব্যাপৃত হইলাম; বস্তুর তারতম্যানুসারে ভোগেরও তারতম্য হইতে লাগিল। ভাবিলাম কৈ, এককে ত' পাওয়া গেল না।

পাতঞ্জল বলিলেন "ভুল বুঝিয়াছ। তুমি যাহাকে 'ভোগ' বল, তাহা কেবল দৃশ্যের উপলব্ধি। পুরুষের উপলব্ধি—অপবর্গ। "দৃশ্যস্য যা উপলব্ধি সা ভোগঃ, যাতু দ্রষ্টুঃস্বরূপোপলব্ধি সোঽপবর্গঃ।" (ব্যাসভাষ্য) ভোগ অর্থে যতক্ষণ বস্তুর বিশিষ্ট ভাবের গ্রহণ বুঝায়, ততক্ষণ উহা সংসারের কারণ। 'ভোগ' শব্দে শরীরও বুঝায়। কারণ বহির্ম্মুখী ভাবে ভোগ করিলে, শরীর গ্রহণ হয়। যেরূপভাবে বস্তু গ্রহণ করিলে, আর বস্তু না দেখিয়া, বস্তুর মধ্যে বিশ্বাতিগ, অদ্বিতীয় 'আমি'-অভিমুখী এক গতি দেখা যায়; যখন বস্তুগুলি দর্পণরূপে ব্যবহৃত হইয়া, সেই এক 'আমিকে'ই দেখাইয়া দেয়,—তখনই জীব 'পুরুষ' অভিমুখী অন্তর্দৃষ্টি প্রাপ্ত হয়। পুরুষকে বুঝিতে গেলে এক ও পরাভাবে, বস্তু হইতে বিপরীতক্রমে,—দেখিতে শিখিতে হয়।

একধৈবানুদ্রষ্টব্যমেতদপ্রমেয়ং ধ্রুবম্।
বিরজঃ পর আকাশাদজ আত্মা মহান্ ধ্রুবঃ॥ (বৃহদারণ্যক শ্রুতি)

যখন সকল বা সর্ব্বভাবে, একরূপে অন্তর্মুখী ভাবে, অনুদৃষ্টি করিতে পারিবে;

তখন প্রেয়ের হইতে শ্রেয়ের, ক্ষর হইতে ধ্রুব, প্রকৃতির শেষ-শূন্য 'পর' পুরুষকে দেখিতে পাওয়া যায়।

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ। (কঠ শ্রুতি)

এই পুরুষ সকল ভূতে গূঢ়ভাবে,—জলে সৈন্ধব ও পুষ্পে মধুর ন্যায় আছেন; কিন্তু গূঢ় বলিয়া সহজে তাঁহাকে দেখা যায় না। "সূক্ষ্মত্বাদবিজ্ঞেয়ং" সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি অবিজ্ঞেয়। যাঁহাদের বুদ্ধি 'অগ্রভাবাপন্ন' বিশিষ্টের অভিন্ন,—তাঁহারা সূক্ষ্ম দর্শন দ্বারা ইঁহাকে দেখিতে পান।

ভাবিলাম, "এইবার বুঝা গেল। সূক্ষ্ম-তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" সূক্ষ্ম-তত্ত্ব অনুশীলনে ব্যাপৃত হইলাম। আসন প্রাণায়ামের সাহায্যে ও অন্যান্য কৌশলে পুরুষকে বাহিরে খুঁজিবার জন্য, ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি লোকের আলোচনায় ব্যাপৃত হইলাম। ইন্দ্রিয়গণের সূক্ষ্ম পরিণাম, বিশিষ্ট দ্রব্য সকলের তেজোময় ভাব প্রভৃতি দেখিতে দেখিতে পথ চলিতে লাগিলাম। স্থূলের পরিবর্ত্তে (aura) জ্যোতিশ্ছটা, সূক্ষ্মভূত ও শক্তিনিচয়ের খেলা দেখিয়া তৃপ্ত হইলাম। তার পর বাসনার বিপাক, মনের গতি প্রভৃতি বুঝিতে বুঝিতে, ধূম রাত্রি, কৃষ্ণ-পক্ষ, দক্ষিণায়ন প্রভৃতি বিশিষ্ট অহংবোধের প্রতিদ্বন্দ্বী ও অহংবোধের প্রকাশক পিতৃগণ ও তাঁহাদের কার্য্যকলাপ,—দেহসৃষ্টি প্রণালী দেখিতে দেখিতে বিশিষ্ট-ভুক্ মন বা সোম, এবং তৎক্ষেত্র 'দেবস্থানে' উপনীত হইলাম। সেখানে কত খেলা দেখিলাম তাহা বলিতে পারি না। হঠাৎ একদিন দেখি, যে আমার সেই ভাস্বর, রজতধবল দেহখানি বিলীন হইয়া যাইতেছে। বড় ভয় হইল, বড় দুঃখ হইল—তাহার পর বড় মনে নাই। তবে গুরুদেবের কৃপায় এক অস্পষ্ট স্মৃতি মাত্র আছে বালক যেমন বাহ্যভাবে নিবিষ্টচিত্ত হইয়া গর্ত্তে পতিত হয়, তদ্রূপ দৃশ্যাভিমুখী 'আমিটি' সোমরাজার অন্নরূপে পরিণত হইয়া গেল। অবিশেষ মনোময়ভাবে নিবিষ্টচিত্ত 'আমিটি', দেবতাদিগের ভোগ্য হইল। তাহাতে দেবতারা একটু বিশিষ্টতার স্বাদ প্রাপ্ত হইয়া তৃপ্ত হইলেন। বস্তুগত বিশিষ্টতা বস্তু লয়ে অবিশেষ মনস্তত্ত্ব বা মেঘরূপে পরিণত হইল; পরে বৃষ্টি হইয়া পড়িয়া গেল। তদ্দ্বারা ব্রীহি যব, ওষধি, বনস্পতি প্রভৃতি নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হইল। আর কতকগুলি জলকণা ভোগ্য হইয়া পশু, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি যোনিতে প্রবিষ্ট হইল।

উক্ত ভোগ্য পদার্থগুলি আহার্য্যরূপে সম্মিলিত হইয়া, পিতৃশরীরে রেতঃ-কণা ও মাতৃশরীরে বুদ্বুদরূপে পরিণত হইল পরে উভয়ের সংযোগে দেহ নির্ম্মিত হইলে, নষ্ট-স্মৃতি ও নষ্ট-জ্ঞান হইয়া, শুধু এক অবিশেষ অহং বোধ মাত্র লইয়া,— দেহে প্রবিষ্ট হইলাম। বাহিরে উদ্ভিদাদি বস্তু সকলে প্রক্ষিপ্ত অহংকণাগুলি স্থূল ও বাসনারূপে পুনরায় 'আমি'র সহিত সম্মিলিত হইয়া, বিশিষ্ট 'আমি'টিকে বাহিরের সর্ব্ববস্তুর সহিত সম্মিলিত করিয়া, পুনরায় ফুটাইতে লাগিল। ভাই! সাধের 'আমিটি' এইরূপে বিকীর্ণ হইয়া 'সর্ব্ব'ভাবে প্রক্ষিপ্ত হওয়া যে কি কষ্ট, তাহা কি বলিব? বুঝিলাম যে 'অহং'কে—'সর্ব্ব' হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিয়াছিলাম বলিয়াই, আমার 'আমিটি' অবশ হইয়া পুনরায় 'সর্ব্বরূপে' প্রক্ষিপ্ত হইল। পাঠক, ইহাই পিতৃযান মার্গ,—

দ্রব্য-সূক্ষ্ম বিপাকশ্চ ধূমোরাত্রিরপক্ষয়ঃ।
অয়নং দক্ষিণং সোমো দর্শ ওষধিবীরুধঃ॥
অন্নং রেত ইতি ক্ষেশ পিতৃযানং পুনর্ভবঃ॥ ভা ৭।১৫।৫০,৫১।

'দর্শ' অর্থাৎ অদর্শন; বিশিষ্ট-ভোগ-ক্ষয়ে শোকাগ্নি দ্বারা দেহের অদর্শন। তাই শ্রীধর বলেন,—"তত্র ভুক্তভোগস্যাবরোহণ প্রকারোদর্শ ইত্যাদি। দর্শ ইতি বিপরীতলক্ষণয়া বিশিষ্টভোগক্ষয়ে শোকাগ্নিনা দেহলয়েনাদর্শনমুচ্যতে।" ইহাই আধুনিক থিয়সফিষ্টদের 'অরূপ স্বর্গ'। ভুক্ত অন্নকণা যে প্রকারে শক্তিরূপে অবিশেষ ভাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ অবিশিষ্টতার মধ্যেও বাহ্য প্রবণতা থাকে;— তদ্রূপ এই 'অরূপ' লোকের অবিশিষ্টতার মধ্যে ভেদ-বহুত্বের বীজ সুপ্ত থাকে। প্রকৃতি, বিশেষ ও অবিশেষ গুণ-পর্ব্বযুক্তা, ইহা পাতঞ্জলে বিবৃত আছে। ঐ প্রবণতা হইতে তজ্জাতীয় বাসনা এবং বাসনা হইতে দেহ ও জগৎভাবের পুনরুৎপত্তি হয়।

পথটা ছাড়িয়া দিলাম, বুঝিলাম বস্তু সকলে 'অহং'এর কণা আছে; উহা অহং জ্ঞানের উপলব্ধি ক্ষেত্র। অহংজ্ঞান যে প্রকার তাহা তত্তৎ জাতীয় বস্তু হইতে পরিপুষ্ট হয়। ভাবিলাম 'আমি'র কেন্দ্ররূপ ভাবটি, বহুর প্রকাশক ভাবটীই সত্য। শুনিলাম ইহাই দেবযান * পথ;—তদ্দ্বারা আর ফিরিতে হয় না।

অগ্নিঃসূর্য্যোদিবাপ্রাহ্নঃ শুক্লোরাকোত্তরং স্বরাট্।
বিশ্বোঽথ তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তূর্য্য আত্মা সমন্বয়াৎ॥

* পর সংখ্যায় দেবযান ও পিতৃযান প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। পং সং

এবমেবানমিদং প্রাহুর্ভূত্বাভূত্বানুপূর্ব্বশঃ।
আত্মবান্ধুপশান্তাত্মা হ্যাত্মস্থো ন নিবর্ত্ততে। ভা ৭।১৫।৫৪.৫৫

এ পথে,ব্যক্ত 'আমি' ভাবটীই—লক্ষ্য ও অবলম্বন। 'দিব.' অর্থে ' প্রকাশ', উপাধি সাহায্যে প্রকাশিত, বিশিষ্ট, অধিভূত, অহংজ্ঞানকে 'অগ্নি' বলে। অগ্নি যদিও কাষ্ঠ হইতে উপরে ফুটিয়া উঠিতেছে, তত্রাচ যাঁহারা ইহার প্রকাশ বা দীপ্তি ভাবের প্রাধান্য দেখেন, তাঁহাদের জ্ঞানে কাষ্ঠ-বুদ্ধিও মিলিত থাকে ; যেমন কাষ্ঠ তেমন অগ্নির প্রকাশ। ইহাই আমাদের দেহাত্ম বুদ্ধি ;—দেহ ধ্বংস করিয়া প্রকাশ হয় বটে, কিন্তু দেহ না থাকিলে হয় না। তা'রপর শুদ্ধ উপাধিশূন্য'আমি'বা সূর্য্য স্বরূপ ভাব। কিন্তু প্রতিদিনই সূর্য্যের ত' উদয়াস্ত আছে। ইহা আমাদের এক এক জন্মের "আমি।" তা'রপর বৃহত্তর প্রকাশকভাব,—শুক্লপক্ষ। উহার প্রতিদিন উদয়াস্ত নাই ; কিন্তু বৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে। ইহাই আমাদের বাসনা-ভুক্ 'আমি'। তা'রপর উত্তরায়ণ-রূপ বৃহত্তর 'জীব' শব্দবাচ্য 'অহং'। তা'রপর ব্রহ্মারূপী'আমি'। ব্রহ্মাতে অহংজ্ঞান স্থির করিবার পর, বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ প্রভৃতি সর্ব্বাত্মিকা ভাবে যদি বিশিষ্ট অহংকেন্দ্রকে লয় করিতে পার. তাহা হইলে ব্রহ্মার লয়ে তুমি আত্মস্থ হইবে, আর ফিরিতে হইবে না। না হইলে কল্পক্ষয়ে, কল্পান্তে "ভূত্বা ভূত্বানুপূর্ব্বশঃ" আবার জীবরূপে আসিতে হইবে। যে বিশিষ্ট অহং-জ্ঞানের মোহে এই পথ চলিতেছিলাম, দেখিলাম 'বিশ্ব' 'তৈজস' ও 'প্রাজ্ঞ' এই তিন মহাভাবে সেই 'আমিকে' পরমাত্মাতে লয় করিতে হইবেই হইবে। তবে অগ্নি-জ্যোতি প্রভৃতি বিশিষ্টাভিমানের ফল কি ? যখন অভিমান ত্যাগ করিতেই হইবে, তখন সোজাসুজি পথে, প্রথম হইতেই শ্রীভগবানে অভিমান ত্যাগ করাই ত' আবশ্যক। প্রণব তত্ত্ব আলোচনাতে এ কথা বিশদরূপে বিবৃত হইবে। যদিও উচ্চ হইতে উচ্চতর অহংজ্ঞানের সাহায্যে দেহ-বুদ্ধি অতিক্রম করা যায়, জন্মে জন্মে ভূঃ প্রভৃতি তিনটি লোকে তিনটী "অহং-কেন্দ্র" অর্জ্জন বা "ত্রিণাচিকেত অগ্নির" চয়ন করা যায়, যদিও এই অবিদ্যামূলক অহমভিমানের সাহায্যে ত্রিলোকীর জন্ম মৃত্যু অতিক্রম করিতে পারা যায়,—কিন্তু উহাতে অমৃতত্ব লাভ হয় না। শাস্ত্র বলিলেন—"ত্রিণাচিকেতস্ত্রিভিরেত্য সন্ধিং, ত্রিকর্ম্মকৃৎতরতি জন্মমৃত্যু।" (কঠ) ত্রিণাচিকেত অগ্নি দ্বারা তিনটী সন্ধিস্থল অতিক্রম করিলে, তবে জন্মমৃত্যু অতিক্রম করিবে। আত্মার চারিটী পাদ আছে ; উহাদের মধ্যে

তিনটী সন্ধিস্থল (critical point) আছে। বিশিষ্ট অহংজ্ঞান, এই সন্ধিস্থলে আসিলেই অহংজ্ঞানের মৃত্যু হয়। সেই জন্য বিশিষ্ট অহংজ্ঞানের অতিগ,ঘন, একরস, সমরূপী, বিভু, আত্মাকে অন্তর্মুখী ভাবে বুঝিতে পারিলে,জাগ্রত স্বপ্ন অবস্থাগুলির অন্ত বা সন্ধিস্থলে "প্রকৃত অহং" স্থির হইলে,আর শোক করিতে হয় না।

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।

মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি॥ (কঠ শ্রুতি)

ইহাই প্রকৃত "সন্ধ্যা"। সেইজন্য সন্ধিস্থলে সন্ধ্যার বিধি ;—

যদাত্মা প্রজ্ঞয়াত্মানং সন্ধত্তে পরমাত্মনি।

তেন সন্ধ্যা ধ্যানমেব তস্মাৎ সন্ধ্যাভিবন্দনম্॥ ব্রহ্মোপনিষৎ।

"যে প্রজ্ঞাতে বা ভগবৎচৈতন্যে বিশিষ্ট অহং-কেন্দ্রগুলি, পরমাত্মাতে একরস হইয়া লীন হয়, সেই পরাবিদ্যার আরাধনাই সন্ধ্যা।" যতদিন 'আমিকে' বিশিষ্ট মনে করিবে, ও বিশিষ্ট ক্ষেত্রে বা লোকে প্রকাশিত খেলা লইয়া ব্যাপৃত থাকিবে, যতদিন 'মৃত্তিকেভ্যোবসতাং' রূপ ভগবানকে না দেখিতে পাইয়া আমি-কেন্দ্রগুলির ভাবে মত্ত থাকিবে, ততদিন মৃত্যু হইতে মৃত্যুই প্রাপ্ত হইবে। "মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥" (কঠ) বিশিষ্ট অহং-কেন্দ্রের মোহকে "সম্ভূতি" বলে। "ততো ভূয় ইব তে তমো য উ সম্ভূত্যাং রতাঃ"। (ঈশ) শাস্ত্র বলিলেন, "বাপু, পূর্ব্ব হইতেই ত' বলিয়া আসিতেছি, যে একদিন ব্রহ্মারও লয় হইবে, অধিকারী পুরুষদের ত' কথাই নাই।" 'আব্রহ্মভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।' পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি যে প্রকাশ-ক্ষেত্র মাত্রেই শান্তি নাই,—স্থৈর্য্য নাই। 'আমিকে' না দেখিতে পাইলে, কেহ কখনও শান্তি পাইবে না। "মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে।" পূর্ব্বেই ত' বলিয়াছি যে যতক্ষণ ভিন্ন অহং-কেন্দ্রগুলি ত' দূরের কথা,বিশ্ব, তৈজস,প্রাজ্ঞ প্রভৃতি অবস্থাত্রয়কে ভেদ ভাবে দেখিবে. ততদিন তুমি 'মর।'—' ত্রিস্রো মাত্রা মৃত্যুমতঃ প্রযুক্তা"—যতদিন স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি অবস্থাত্রয়ের মধ্যে 'এক'কে দেখিতে না পাইবে, ততদিন তুমি অমৃতত্ব লাভ করিতে পারিবে না। *Light on the Path* বলিলেন "Live in the Eternal; for nothing which is embodied, nothing which is conscious of separation can aid you." "অক্ষরে আত্মজ্ঞান স্থাপিত কর, কারণ যাহা কিছু শরীরী, যাহাতে একটুকু

দ্বৈতবুদ্ধি বা জ্ঞান আছে, তদ্দ্বারা তোমার কোন উপকার হইবে না।” “কত চতুরানন মরি মরি যাওত, নাহি তুয়া আদি অবসানা। তোঁহে জনমি পুনঃ তোঁহে পুনঃ সমাওত সাগর লহরী সমানা॥” এইরূপে কর্ম্মচিত লোক সকল মিথ্যাভূত হইয়া যায়। বহুবচনে দেখিসে বেদ সকলও ত্রিগুণ। “ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ।”

আবার কাঁদিলাম, ভাবিলাম;—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, বেদ গেল, জাতি ও কুল গেল; কুলটা হইলাম। একে একে বস্তু, পশু, মানব, পিতৃ, দেবতা প্রভৃতিতে প্রাণ সমর্পণ করিলাম; কিন্তু “আমিকে ত' লাভ হইল না।” তখন লোক সকলে অতৃপ্ত হইয়া, কৃতে ও অকৃতে নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া, 'আমিটীকে' আধার মাত্র বুঝিয়া, “গুরুর সন্ধান করা আবশ্যক” এই বাক্য শাস্ত্রঘোষিত করিল। “পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো, নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্য-কৃতঃ কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ম্ ব্রহ্ম-নিষ্ঠম্।” (মুণ্ডকোপনিষদ)

তখন গুরুর সন্ধানে ফিরিলাম। দেখিলাম, পেশাদারী গুরুগণের মধ্যে প্রায় সকলেই—হয় “বাবা”, না হয় “স্বামী”, না হয় ত' “Adept-Initiate”। কেহই স্ত্রী নহেন। মনে পড়িল যে, বৃন্দাবনে ত' সকলেই স্ত্রী, এক ভিন্ন অন্য পুরুষ নাই। বড় একটা খট্‌কা লাগিল, তবে “এরা কারা”। এক সম্প্রদায় বলিলেন, “এস, আমাদের দলে এস। আমাদের গুরু সাক্ষাৎ ভগবান্; ইচ্ছামাত্র কত অলৌকিক যোগশক্তি প্রকাশ করিতে পারেন। ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে, সূক্ষ্ম শরীরে যাইয়া, শিষ্যদিগের ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেন।” ভাবিলাম, এত গোলযোগ কেন? একটা Alarm ঘড়ি কিনিলেই ত' চলে।—আর একদল বলিল, “বিন্ধ্যাচলে আমাদের সূক্ষ্ম আশ্রম আছে, তথায় গুরুগণ থাকেন। শিষ্যগণকে প্রতিনিয়ত দেখিবার জন্য, প্রত্যেক শিষ্যের মনোময় শরীরের ছাঁচ্ তৈয়ারী করিয়া যোগবলে শিষ্যের শরীরের সহিত এক সুরে বাঁধিয়া আশ্রমে রাখিয়া দেন। তদ্দ্বারা তাঁহাতে আর শিষ্যে সহজেই ভাব বিনিময় হয়। ভাবিলাম, 'বড় মজার কথা'; মহাপ্রভু ত' বলিয়াছেন,—

“যাঁহারে হেরিলে মুখে আসে কৃষ্ণ নাম।
তাঁহারে জানিও তুমি মহান্ত প্রধান॥”

যে গুরুর প্রত্যেক কার্য্যে ও ভাবে তোমার হৃদয়ে ভগবানের ভাব ও মহিমা স্ফুরিত না হইবে,—যাঁহাকে দেখিলে মনুষ্য-বুদ্ধি ভুলিয়া ভগবানের আভাস না পাইবে,—তিনি তোমার গুরু নহেন ; তদ্দ্বারা তোমার কোন উপকার সাধিত হইতে পারে না। গুরু অন্তরের ধন, প্রাণের প্রাণ। দল বাঁধিবার বুলি নহেন। ভগবৎবুদ্ধি কথঞ্চিৎ ভাবেও হৃদয়ে না ফুটিলে, গুরুকে বুঝিতে পারিবে না।" ভাগবত বলিলেন, "যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞান-দীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥" (৭।১৫।২৬ যে সাক্ষাৎ ভগবানের-রূপ জ্ঞানবিৎ গুরুতে মনুষ্য-বুদ্ধি করেন, তাহার সাধনা হস্তি-স্নানের ন্যায় নিরর্থক।

বুঝিলাম যে ঘুরিয়া ফিরিয়া একই কথা। এ পথের আদিও ভগবান,—অন্তও ভগবান। ভিতরে ভগবৎ-বুদ্ধি না ফুটিলে, বাহিরে ভগবৎ-মূর্ত্তি গুরুকে চেনা যায় না,—সাধনা ত' দূরের কথা। হতাশ হইয়া কাঁদিলাম ;—

ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে, কে আর আমার আছে।
রাধা বলে আর জুড়াইতে নাই, যাইব কাহার কাছে॥
এ কুলে ওকুলে, দুকুলে গোকুলে কে আছে রাধার আর।
শীতল বলিয়া শরণ লইনু ও দুটী কমল পায়॥

ভিতর হইতে কে বলিয়া দিল, "কি বাহ্য, কি আন্তর" সকল ব্যাপারেই এক 'আমিই' প্রতিষ্ঠিত। তবে 'আত্মাকে' তোমার 'আমি' হইতে বাহিরে দূর করিয়া দিয়া, খুঁজিতেছ কেন? তোমার 'আমিই' আমার 'গুরুস্বরূপ' ভাব। ক্ষুদ্র ছিন্ন অহং জ্ঞান ত্যাগ করিয়া, এক চৈতন্য-ঘন "আমি"-স্রোতে গা' ভাসাইয়া দাও, দেখিবে সর্ব্ব ব্যাপারে 'আমিরই' ব্যঞ্জনা হইতেছে। কাম, রূপ, প্রভৃতি সবই আমার আয়তন। প্রণিপাত পরিপ্রশ্ন ও সেবাই গুরু লাভের একমাত্র উপায়। তা'রপর বিশ্বব্যাপী অথচ বিশ্বাতিগ চৈতন্যের স্রোতকে 'প্রণব' বলিয়া বুঝিয়া, তাহাতে আত্মানুভূতি প্রতিষ্ঠিত কর। ঐ আত্মানুভূতিই শর, প্রণবই ধনুঃ এবং পরম 'আমিই' লক্ষ্য। 'আত্মতত্ত্বের' পর 'বিদ্যাতত্ত্ব' 'তা'রপর 'শিবতত্ত্ব'। "প্রণবো ধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।' (মুণ্ডক) ইহাই শাস্ত্রচক্ষুঃ, "শাস্ত্রেণ চক্ষুষা বেদ জনস্থোঽপি ন মুহ্যতি॥ ভাঃ ৭।১৫।৬৬।

শাস্ত্রচক্ষু প্রণবতত্ত্বের কথা প্রবন্ধান্তরে আলোচনার সাধ আছে। এইরূপে "শাস্ত্রসম্মত আত্মানুভূতি"র সাহায্যে "সর্ব্ব"কে "এক" পরিণত করিতে হইবে।

"আমি" অর্থে যখন এক, বিশ্বাতিগ, প্রপঞ্চাতীত, "পর"-অভিমুখী (Transcendent) গতি বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখনই পরতত্ত্ব বুঝিবার অধিকার জন্মে। 'For within you is the Light of the World, the only light that can be shed on the Path. If you cannot see It within, you cannot recognise it without.'—*Light on the Path.* তা'ই ভাগবত বলিলেন,—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্টৈবাত্মনীশ্বরে॥ ১।৩।২১॥

যিনি "আত্মা"তে বা "আমি"তে ঈশ্বর বা ভগবানকে দেখিতে পান, তাঁহারই অবিদ্যামূলক অহঙ্কার-গ্রন্থি ছিন্ন হয়। 'সর্ব্ব' শব্দে অনুস্যূত সংশয়াত্মক মিথ্যা-জ্ঞান দূর হয়, এবং সমস্ত কর্ম্ম-বন্ধ ক্ষীণ হইয়া যায়। ইহাই আত্মানুসন্ধানের প্রথম স্তর। তার পর সেই মহান্ "আমি"র সহিত একত্বে, প্রকৃত স্মৃতির সাহায্যে, তিনিই "আমি" বা তিনিই "আমার" এই বুদ্ধিতে, বাহিরের 'বহু' গুলিকে মিশাইয়া দিয়া, প্রকৃত 'প্রত্যাহার' সাধনা করিতে হইবে। এতদিন ভেদভাবাপন্ন অহং বোধে, "সর্ব্ব"কে আহরণ করিতে গিয়া অধর্ম্ম ও মৃত্যুতে পাতিত ছিলাম। এখন সেই প্রকৃত আত্মতত্ত্বের সাহায্যে, পুনরায় সব আহরণ করিতে হইবে। ভেদাত্মক 'আমির' আহরণে, যেমন সেই 'আমির' ক্ষেত্ররূপে বা জগদ্রূপে বাহিরের "সর্ব্ব"গুলি প্রতিষ্ঠিত ছিল,—তদ্রূপ শ্রীভগবানকে এক লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বাত্মিকা একত্ব বুদ্ধির সাহায্যে সর্ব্ব-ভাবের পুনরাহরণ দ্বারা শ্রীভগবানের প্রকাশক্ষেত্র বা রূপ প্রস্তুত করিতে হইবে। তখন "রূপ্যতে ইতি রূপম্";—ভগবানের ব্যঞ্জনাই রূপ। ভূতশুদ্ধির ইহাই রহস্য।

এইরূপে মহামৎস্য যেরূপ জলের মধ্যে অবাধে সমভাবে খেলা করে, সেইরূপ ভগবানে অহংবুদ্ধি ও স্মৃতি স্থাপন করিয়া, জাগ্রত স্বপ্ন সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাত্রয়ের মধ্য দিয়া অনুস্যূত এক 'আমিরই' স্থাপন—প্রকৃত সাধনা। "সোঽহমিতি স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাচ্চ স্থানত্রয়ব্যতিরিক্তত্বমেকত্বং... ....মহামৎস্যাদি শ্রুতেঃ॥" (মাণ্ডুক্য—শঙ্করভাষ্য) তা'ই ভাগবত বলিলেন;—

ভাবাদ্বৈতং ক্রিয়াদ্বৈতং দ্রব্যাদ্বৈতং তথাত্মনঃ।
বর্ত্তয়ন্ স্বানুভূত্যেহ ত্রীন্ স্বপ্নান্ ধুনুতে মুনিঃ॥ ৭।১৫।৬২॥

বুঝিলাম,—প্রথমে'মুনি'বা মননশীল হওয়া চাই। বাহিরের বস্তু, প্রকাশ বা দীপ্তির দিক্ হইতে চক্ষু ফিরাইয়া, যখন মানব সর্ব্ব পদার্থে ও প্রবৃত্তিতে এক অন্তর্ম্মুখী স্রোত, ভাব বা গতি (inwardness of trend) দেখিতে পান, তখনই তিনি মুনি। ঐ অন্তর্ম্মুখীনতাই 'পুরুষ' বা পরাগতি। সর্ব্বাবস্থায় এই পরা গতির প্রতি আসক্ত হইয়া, সর্ব্ব বস্তুতে এই গতির ভাষা বুঝিতে পারিয়া, ভাব বা অস্তিত্বের একত্ব সিদ্ধ হয়। তখন কার্য্য ও কারণকে আর ভিন্ন দেখা যায় না ;— ঘট পটাদি রূপ মিথ্যা, মৃত্তিকাই সত্য। তখন সৃষ্টির মধ্যে শাশ্বত, ক্ষরের মধ্যে অক্ষর, চঞ্চলের মধ্যে স্থির, আত্মাকে করামলকের ন্যায় দর্শন করিয়া ভেদ মাত্রই 'স্বপ্ন মায়া' বলিয়া বোধ হয় : তখন সর্ব্ব জীবে কৃষ্ণাধিষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। তখন 'সর্ব্বে' আর বহুত্ব বুঝায় না ; এককেই বুঝায়। ইহাই ভাবাদ্বৈত।

কার্য্য-কারণ-বস্ত্বৈক্য দর্শনং পটতন্তুবৎ।

অবস্তুত্বাদ্বিকল্পস্য ভাবাদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ভাঃ ৭। ১৫ ।৬৩।

যাহাকে ভালবাসি,—তাহার করণকারণাদি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, তাহার বস্ত্রাদি বাহ্যবস্তুও আর বহুরূপ দেখায় না, কেবল তাহাকেই দেখায়। যেমন বস্ত্রের সর্ব্বই তন্তুময়। এই ভাবাদ্বৈত-বলেই গোপীকারা মেঘ বৃক্ষাদি দর্শন করিয়াও কৃষ্ণানুভূতি লাভ করিতেন। প্রেম ও একত্ববুদ্ধিই ভাবাদ্বৈতের মূল। ইহাই বিদ্যার পরিণতি। কারণ বিদ্যাই আত্মার অভেদ দর্শন ও পরম 'আমি'তে সর্ব্বের পরিণতি।

তা'রপর ক্রিয়াদ্বৈত। আমাদের প্রত্যেক ক্রিয়ার মূলে কতকগুলি 'কারক বুদ্ধি' আছে। যেমন একই বৃত্ত (curve) বিভিন্ন স্থির-রেখার সাহায্যে বুঝিতে পারা যায় ; তদ্রূপ কারকগুলি স্থির-রেখার (directrix) ন্যায় ; উহারা কেবল সেই অদ্বৈত-বস্তুরই একত্ব স্ফুরণ করিবার জন্য। কর্ত্তাও তিনি, কর্ম্মও তিনি, করণও তিনি, এইরূপে সকল কারকগুলি তাঁহারই ব্যঞ্জক বলিয়া বুঝিতে পারিলে, কর্ম্মের দ্বারা একত্ব বুদ্ধির প্রতিষ্ঠা হয়। বাস্তবিক পক্ষে কর্ম্মও একত্ব বাচক। কারণ, কর্ম্ম করিবার সময় মানব একত্ব ভাবে নিবিষ্ট হইয়া কর্ম্ম করে। কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানে কর্ত্তা, কর্ম্ম প্রভৃতি ভাবগুলি ভিন্ন বলিয়া বোধহয় ; সেই জন্য একত্ব বুদ্ধিটীর অবসানে কর্ত্তৃত্বাভিমান, করণাভিমান প্রভৃতি অভিমান গুলি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যেমন elephantisis (গোদ) রোগাধিকারে একই প্রাণশক্তি দ্বারা ভুক্ত

অন্নের ফল সর্ব্ব শরীরে সমান ভাবে না পৌঁছিয়া, বিশিষ্ট অঙ্গাদিকে পরিপুষ্ট করে; তদ্রূপ 'দ্বৈত যোগাধিকারে' কারকগণকে বিভিন্ন ভাবি বলিয়াই, কর্ম্মফল সাক্ষাৎ (Immediately) ভেদাতীত ভগবানে পৌঁছায় না; পরন্তু বিভিন্ন কারকগুলির পরিপোষণ করিয়া জগৎ-ভাবের পরিপুষ্টি করে। ইন্দ্রিয়ে "সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাষং" ভগবানকে না দেখিলে,—শরীরে অধিভূতরূপী দেবকে না চিনিলে,—কামনাতে তাঁহার আকর্ষণ অনুভব না করিলে, কর্ম্মফল শ্রীভগবানে পৌঁছায় না। বিভিন্ন কারকগুলি ফল খাইয়া ফেলে; সেই জন্য বাঙ্‌মনস্তনু দ্বারা কৃত সমস্ত কর্ম্ম, সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যখন সমরূপী ভগবানে পৌঁছায়, তখনই ক্রিয়াদ্বৈত সিদ্ধ হয়।

যদ্ ব্রহ্মণি পরে সাক্ষাৎ সর্ব্বকর্ম্মসমর্পণম্।
মনোবাক্‌তনুভিঃ পার্থ ক্রিয়াদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ভা। ৭। ১৫। ৬৩।

ইহাই গীতার "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিঃ ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মনাহুতম্।"

তার পর দ্রব্যাদ্বৈত

আত্মজায়াসুতাদীনামন্যেষাং সর্ব্বদেহিনাম্।
যৎ স্বার্থকাময়োরৈক্যং দ্রব্যাদ্বৈতং তদুচ্যতে ॥ ভা। ৭।১৫।৬৪।

আত্মা, জায়া, সুত প্রভৃতি সর্ব্বদেহীদের, ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় ভাবে, স্বার্থ ও কামের ঐক্যের নাম দ্রব্যাদ্বৈত। যাহা আমাদের অহং-চৈতন্যকে দ্রব করিয়া,—রস, তৃষ্ণা ও প্রবৃত্তিরূপে তরল করিয়া লইয়া যায়, তাহাকে আমরা 'দ্রব্য' বলি। ইহাই Mill এর permanent possibility of sensation. যেমন আমি, তেমন দ্রব্য ভাব। 'আমি' উচ্চ হইলে 'দ্রব্য'ও উচ্চ হয়। 'দ্রব্যকে' উন্নত করিলে, 'আমি'ও উন্নত হই। দ্রব্যগুলিকে ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট বোধ করিলে 'আমি'ও ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট হই। 'দ্রব্য' আমাদের আমির 'অর্থ' বা ভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত, বা 'স্বার্থ'। অথচ 'আমি' ও 'দ্রব্য' একত্রে মিশিলে কি এক আশ্চর্য্য ঐক্যে বা অদ্বৈতে পরিণত হয়। কাম আমাদের ক্ষণিক অহং-ভাবের অতিরিক্ত আকর্ষণ শক্তি। কাম আছে বলিয়াই, আমরা ক্ষুদ্র 'আমিটাকে' অসম্পূর্ণ বোধ করি; ও কি এক অপরিজ্ঞাত পরিপূর্ণতার আকর্ষণে দ্রব্যকে আমির সহিত মিশাইয়া দিই। ক্ষুদ্র 'আমি'তে স্থির করিলাম যে কৃষ্ণ-মূর্ত্তিই আমার ভগবান। কিন্তু আমার মনঃকল্পিত সেই মূর্ত্তিতে, কি অনন্ত জগৎ-বস্তুর মধ্য দিয়া প্রকাশিত আকর্ষণ-শক্তিগুলিকে পরিসমাপ্ত করিতে পারি।

যখন পারিব, তখন কৃষ্ণমূর্ত্তিই ভগবান হইবেন। যাহাতে সর্ব্ব জীবের সর্ব্ব ভাবের পরিতৃপ্তি,—যাহাতে 'সর্ব্ব' প্রবৃত্তিগুলি সহজে মিশিয়া যায়, তাহাই সনাতন বস্তু। আমার পুত্রশোক হইলে, সম্মুখস্থ বৃক্ষটির কিছু ক্ষয় হয় না বা বৃদ্ধি হয় না। তদ্রূপ আমি হিন্দু, মুসলমান বা যাহাই হই না কেন,—পশু, মানব বা দেবতা প্রভৃতি যে কোন শরীর ধারণ করি না কেন,—এক কথায় আমার ব্যক্তিত্ব ভাব যে ভাবেই থাকুক্ না কেন,—যে বস্তুতে সর্ব্ব ভাবের পরিপূর্ণতা হয়, তাহাই পরম অদ্বৈত দ্রব্য বা তত্ত্ব। এইরূপে যেখানে, সকলকার স্বার্থ ও কামের ঐক্য, তাহাই দ্রব্যাদ্বৈত। আর একভাবে দেখিলে, যখন স্বার্থ ও কামের মিলন হয়, তখনই পরম-তত্ত্ব প্রকাশিত হয়। এই জন্য বিশিষ্ট দ্রব্যের আকর্ষণে চলিতে চলিতে, যখন আমি ও আকর্ষক বস্তুর সম্মিলন হয়, তখনই—সেই কামের পরিসমাপ্তিতে, অদ্বয়, আনন্দ-ঘন, নিরঞ্জন, পরিপূর্ণতায় পরিপূর্ণ হইয়া,—সেই আনন্দে একদিকে অহং-জ্ঞান, অপর দিকে বস্তু, জ্ঞান স্তিমিত হইয়া পড়িয়া যায়। ইহাই স্বার্থ ও কামের ঐক্য। যেমত সর্ব্ব জলের সমুদ্রই একমাত্র অয়ন, গতি বা পরিসমাপ্তি,—স্পর্শের ত্বকই একমাত্র অয়ন্ তদ্রূপ সেই আনন্দে, সেই বিজ্ঞান-ঘনে, বিভিন্ন জীবাদি-বুদ্ধি লীন হইয়া যায়। "স যথা সর্ব্বেষামপাম্ সমুদ্র একায়নমেবং, সর্ব্বেষাং স্পর্শানাং ত্বগেকায়ন মেবং, সর্ব্বেষাং রসানাং জিহ্বৈকায়নমেব। স যথা সৈন্ধবখিল্য উদকে প্রাপ্ত উদকমেবানু বিলীয়েত (বৃহদারণ্যক শ্রুতি)। তখন "তমেব ভান্তং অনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা (ভাষা ?) সর্ব্ব-মিদ বিভাতি" ;—

তাঁহারি জ্যোতিতে সব আলোকিত, তাঁহারি প্রকাশ করিছে ইঙ্গিত।
অব্যক্ত সে বাণী হইছে ভাষিত, মধুর মুরলী নিঃস্বনে ॥

ইহাই সামবেদ কৌথমেয় শাখা। ইহাই প্রতীচ্য জগতে ভগবান যীশু-দেবের মুখে রূপান্তরে ঘোষিত হইতেছে;—When the husband meets the wife in loving embrace, I am between them."

পতিপত্নী সম্ভাষণে, শুদ্ধ প্রেম আলিঙ্গনে।
দেখহ আমাকে সবে মাঝারে দোঁহার ॥

বহু-জ্ঞান সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে লীন করে। যাহা সকলে, সর্ব্ব সময়ে, সমান

ভাবে, ভোগ করিতে পারে তাহাই প্রকৃত অর্থ; যে অবয়বীভাব (organic life) সর্ব্বের মধ্যে সমান ভাবে অনুস্যূত, যাহাতে সর্ব্বের পরিপুষ্টি হয়, যাহাতে সর্ব্বকে 'একের' দিকে উত্থিত (converge) করে, তাহাই সনাতন ধর্ম্ম। যাহাতে সর্ব্বভাবের পরিপূর্ণতা আসে, তাহাই শাস্ত্রসম্মত কাম। যাহাতে সর্ব্ব একেতে নিবৃত্ত বা পরিসমাপ্ত হয়, তাহাই মোক্ষ। যে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব এইরূপে সমভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, সর্ব্ব হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া 'সর্ব্বকে' আপনার ক্রোড়ে তুলিয়া লইতেছেন, তাহাই "পন্থার" লক্ষ্য। সামর্থ্যহীন, বুদ্ধিহীন, সম্পাদক ও লেখকগণের প্রযত্ন, সেই অমৃতময়ের আকর্ষণ শক্তির উপরে স্থাপিত হউক, এই আমাদের প্রার্থনা !! আমাদের জ্ঞান বা মোহ যাহা কিছু আছে, তাহাতে ত' তিনিই আছেন।

"সর্ব্বের" মর্ম্মস্থলে যে অহং আছে, যাহা হইতে জ্ঞান স্মৃতি ও মোহ প্রভৃতি ভাব প্রসূত হয়, সমষ্টি ও ব্যষ্টির মধ্যে যাঁহার অক্ষর ও শাশ্বত মূর্ত্তি অঙ্কিত হইতেছে,—

সর্ব্বস্যচাহং হৃদিসন্নিবিষ্টো মত্তোজ্ঞানস্মৃতি অপহোনঞ্চ !

যিনি সর্ব্ব বেদের একমাত্র বেদ্য, সেই পরমদেবই আমাদের আশা ভরসা ; তিনিই লক্ষ্য, ও বেদ্য। ওঁ শান্তি ওঁ।

সম্পাদকানাং—

.মোক্ষ]

তুমি ও আমি

তুমি অনাদি কারণ, সৃজন পালন,
বিশ্ব তোঁহে যায় মিশিয়া।
আমি বুদ্‌বুদোপম ছুটি, পলে যা'র লয়,
ছুটিছে উঠিছে হাসিয়া॥

তুমি গুণাতীত, তবু এ বিশ্ব সৃজিলে,
'সর্ব্ব'শক্তিমান্ হইয়া।
আমি করমের দোষে, আসি যাই ভবে,
সতত কামনা লইয়া॥

তুমি মায়াতীত, রচি করমের পাশে,
আছ মায়াজাল পাতিয়া।
আমি মায়ার পুতুল, পড়ি তার মাঝে,
মায়াখেলা খেলি মাতিয়া

তুমি করুণা নিদান, বিতর করুণা,
সতত বিপদে রাখিয়া।
আমি মোহ-কুয়াসায় দেখিতে না পাই
তোমারে, নিকটে থাকিয়া

তুমি বিশ্বময় নাথ! আকাশে ভূতলে,
সকলে রয়েছ ভরিয়া।
আমি নিবিড় আঁধারে ঘুরিতে ঘুরিতে,
কালস্রোতে যাই ভাসিয়া॥
তুমি কত কাছে, আমি কত দূরে; তুমি
হাসিছ এ ভাব হেরিয়া।
আমি দূরে যাই তুমি কাছে এলে; মোরে
কুসঙ্গী রয়েছে ঘেরিয়া॥
তুমি নিমেষের তরে দেখা দিয়া পুনঃ,
দাঁড়াও কোথায় স'রিয়া।
আমি খুঁজিয়া বেড়াই, অতি ক্ষীণ সেই
স্মৃতি-টুকু বুকে ধরিয়া॥
তুমি পরখিতে মোরে, আমিত্বের সনে,
মমতায় দেহ গাঁথিয়া।
আমি খেলিব কেমন নিজে কর্ত্তা সাজি,
অবিদ্যার সাথে মাতিয়া॥
তুমি আমিত্ব দিয়াছ, ক্ষতি কিবা তায়!
'তুমি আমি' ভেদ ভাবিয়া।
সদা দাস আমি, তুমি প্রভু, তোমা সদা
সেবিব আপনা সঁপিয়া॥

শ্রী প্রসন্নকুমার দাস, বি, এ।

মোক্ষ]

অভিনয়

কেহ কেহ এমন বেরসিক, যে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে আসিয়াও আপনাকে কিছুতেই ভুলিতে পারে না। তা'র "আমিত্ব" বোধটা এত প্রবল, যে অভিনয় ক্ষেত্রেও উহাকে চাপিয়া রাখা অসম্ভব হয়। তা'ই সময়ে অসময়ে, অভিনয় ক্ষেত্রে অসংযম প্রকাশ করিয়া রস-ভঙ্গ করিয়া বসে! আরে বাপু, তুমি যা, তা' তো, জানাই আছে; অত প্রকাশ করে লাভ কি? ও এখানে 'রাম' সেজে এসেছে, রামের অভিনয় দেখাক্,—সে 'হনুমান' সেজে এসেছে, আর একজন রাক্ষস সেজে এসেছে—বেশ তো তা'রই অভিনয় দেখাক্। তা' নয় "আমি রাক্ষস সাজ্‌বনা, আমি হনুমান হব,"—"আমি হনুমান সাজ্‌ব কেন, আমি রাম সাজ্‌ব" -এই নিয়ে ঝগড়া করতে ব'স্‌ল। এই সব গুলাই বোকামি! আরে মুখ্যু তোরা যা,—তা' সেজে এসেছিস বলেই কি 'রাম' হয়ে যাবি; না 'রাক্ষস' হয়ে গেলি! বিশ্ব-রঙ্গ-মঞ্চেও অনেক হস্তীমূখ, এইরূপ বেরসিকতা প্রকাশ ক'রে, জীবন নাট্যশালায় অভিনয়কে অসম্পূর্ণ

করে তুলে ॥ বেশ তো আমি দীন-ভিখারীই হই বা রাজ মুকুট পরে আসি,—সাধু হই বা ফকির হই,—গৃহী হই বা উদাসীন হই,—বিদ্বান্ই হই বা মূর্খ'ই হই, মেয়েই হই বা পুরুষই হই—এসবই তো সাজা—নাটকের অভিনয় করা ছাড়া আর কি? থিয়েটারে বা যাত্রায়, মেয়ে—পুরুষ সাজে, পুরুষ-মেয়ে সাজে। কেউ হয় রাজা, কেউ বা হয় রাণী, কেউ বা হয় দাস, কেউ বা দাসী, কেউ বা অমাত্য, কেউ বা দূত, কেউ বা কিছু;—কিন্তু তা'রা সকলেই মনে মনে জানে—"আমরা যা'ই সাজিনা কেন—আমরা যা'—তাই" এসব সাজ্‌গোজ্ অধিকারীর বা অধ্যক্ষের অভিপ্রায় মাত্র!! সুতরাং রাজা হয়েও সুখ নেই, ভিক্ষুক সেজেও দুঃখ নেই!

এই সংসার রঙ্গমঞ্চেও আমরা নানা সাজে সেজে অভিনয় করে বেড়াচ্চি, এবং তাঁর অভিপ্রায়কে পূর্ণ করে তুল্‌চি! এই জ্ঞানটুকু আমাদের থাক্‌লেই আর "পৃথক সজ্জার" জন্য দুঃখ বা ক্ষোভ আস্‌বে না। তখন সবই সুন্দর ও স্বাভাবিক বলে মনে ঠেক্‌বে! কিন্তু বুঝতে না পারলেই সব মাটি!! অবশ্য বুঝে উঠা যে খুবই সহজ তা' নয়। "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি, ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা"—এই কথাটির তাৎপর্য্য প্রথমেই বুঝ্‌তে হবে। এটা বুঝ্‌তে পারলেই আমরা সহজে উপলব্ধি করতে পারবো, যে "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া"। তখনই আমরা "সর্ব্বভাবেন" তাঁ'র শরণাগত হবার জন্য প্রস্তুত হ'তে থাক্‌বো। এইরূপে নটরাজের নাট্য-শালার বিশ্বরঙ্গাভিনয়কে সম্পূর্ণ করে তুল্‌তে পারবো! ইহাই জীবনের পরম সার্থকতা। এইটুকু বুঝিলে তারপর, "রাসলীলা" বুঝিবার অধিকার জন্মিবে!

হায়! সে অধিকার আমার কবে হবে? হে নাথ! কবে আমি আমাকে তোমার "যন্ত্র" বলিয়া বুঝিব? আমার "আমিত্বের" অহঙ্কার—অভিমান মিটিয়া যাবে! কবে নামহীন খ্যাতিহীন হইয়া, পরম অগৌরবকে বরণ করিয়া লইতে পারিব? কবে তোমাকে স্মরণ করিয়া—আমাকে ভুলিয়া, জগতের এক ক্ষুদ্র-কোণে রহিয়া নীরবে গাহিতে থাকিব:—

"ওহে ত্রিভুবন পতি বুঝিনা তোমার মতি,
কুত' অভাব তব নাহি;—

হৃদয়ে হৃদয়ে তবু ভিক্ষা মাগি ফির প্রভু,
সবার সর্ব্বস্ব ধন চাহি'!!
আমারে রাজার সাজে বসায়ে সংসার মাঝে,
কে তুমি আড়ালে কর বাস ?
হে রাজা ! রেখেছি আনি তোমারি পাদুকা খানি,
আমি থাকি পাদপীঠ তলে ;
সন্ধ্যা হয়ে এল ওই আর কত বসে রই,
নব রাজ্যে তুমি এস চলে !"

মোক্ষ]

আত্ম-পূজা

গুণ বা অগুণ, রতি বা বিরতি,
কিঞ্চিত নাহি যা'য়,
বিশ্ব বা ব্যোম সূর্য্য বা সোম
যাহার কিরণে ভায়,
বিকল্প-হীন বর্ণ বিহীন
মানস অতীত যেবা,
নিখিলের স্বামী, সেই শিব তুমি,
কাহার করিবে সেবা ?
নহ ত' শিষ্য, নাহি গুরু তব,
আপনা আপনি জান ;
ধরম করম, সকলি ভরম,
পরম আপন জ্ঞান।
নাহি আবাহন, নাহি নিবেদন,
অরপণ পুন নাই,
নাহি মন্ত্র, তন্ত্র, নাহি পূজা, জপ,
হে জীব ! তুমি যে তাই !

চিন্তা নাহিক, চিত্ত মায়িক
নহে সে স্বরূপ তো'র,
কাহার ধেয়ানে লভিবে সমাধি ?
আপনাতে রহ ভোর।
অন্ত, মাঝার আদি নাহি যার,
নাহিক আপন, পর,
শূন্য সমান, পূর্ণ মহান্
তুমি সে পুরুষবর।
কামাতীত তুমি, কামনা কোথা রে ?
নিঃসঙ্গে কোথা রা সঙ্গ ?
মনের অতীতে কোথা মলিনতা ?
রঙ্গ-বিহীনে, রঙ্গ ?
তোমা বিনা যবে নাহি কিছু, তবে
কেমনে এক বা দ্বন্দ্ব ?
দিক্ কালাতীত, তোমাতে কেমনে
নিতি বা অনিতি দ্বন্দ্ব ?

ধ্বনি, রূপ, রস গন্ধ বা পরশ
বিষয়-বিবশ নহ,
কেমনে কামনা বাসনা যাতনা,
পীড়িবে তোমারে কহ ?
নাহি মাতা, পিতা, জায়া সুত, সুতা
জনম, মরণ, মন,
কেন রে আকুল ? নাহি মোহ ভুল,
তুমিই ত নিরঞ্জন !
জীব প্রপঞ্চ মায়ারি রচনা,
তোমার বিকার নয়,
ষড় রিপু আর বিষয়াদি পঞ্চ
তোমাতে নাহিক রয়
নাহি নিরূপণ, নাহি রূপ, নাম,
নাহিক উপাধি তো'র,
সুপ্তি-স্বপন, নাহি জাগরণ,
আনন্দেতে রহ ভোর।
এই ত' সংসার কুহকী মায়ার
সুবিস্তৃত লতাজাল,
সে শুধু জীবের বন্ধনের ডোর,
কুসুম-রচিত মাল।
'কান্তা' কনক, রচিছে কুহক,
কুহকিনী মায়া ওই,
ভুলো না কুহকে, ভাঙ্গে তো' পলকে,
কেহ নাই তোমা বই !
তোমারি প্রকৃতি ল'য়ে রজকণা
বাঁধি' বিচিত্র গেহ,
সূক্ষ্ম, কারণ সুস্থূল পুন
রচিয়াছে এই দেহ।

গুণাতীত তুমি কূটস্থ সদা
আনন্দ-রসরূপী,
সগুণা প্রকৃতি তোমারি লীলায়
ভ্রমে যেন বহুরূপী !
জীবের আকারে গড়ি আপনারে
আপনি করিছ খেলা,
পিতা. মাতা সুত. পতি, সতী হ'য়ে
বসায়েছ ভব-মেলা।
সম্বরি পুন রে লহ আপনারে,
ভাঙ্গিবে সে খেলা-ঘর,
জলেরি গোলক জলে মিশাইবে,
তুমি ইহ, তুমি পর
পুণ্য বা পাপ নিঃশ্বাসে উড়ে
জ্ঞানঝঞ্ঝায় তব,
আনন্দ নীরে, ধরমাধরম
ধৌত করহ সব
জনম করম করিতে দহন
জ্বলন-স্বরূপ তুমি,
দুঃখ-বাড়ব- অনল ধরিতে
অগাধ সিন্ধু তুমি।
দহন, পবন, অবনী, গগন,
সলিল নহ ত' তুমি,
বিশাল বিশ্ব হ'তেছে দৃশ্য
তোমার ত্রিগুণ চুমি'।
অণুতে, মহতে পশিয়াছ তুমি,
তোমাতে কেহ না পশে,
ভিতরে, বাহিরে তুমি আছ ঘিরে'
আনন্দঘন-রসে।

কেন রে! কেন রে! কাঁদিছো এত রে?
নাহি রে মরণ জরা;
কেন এ রোদন, নাহি রে যখন
তোমার জনম-কারা?
কুরূপ ভাবিয়ে কেন ম্লান মুখ?
রূপ যে নাহিক তো'র।
'গেল যে যৌবন,' ভেবো না তা' বলি
তো'র নাহি বয় ডোর!
সুখ না মিলিল, তাহে কি আকুল
নহ সুখ-ভোগী মন;
রিপুর পীড়নে পীড়িবে কেমনে
ইন্দ্রিয়-হীন যে জন?
কাম্য কোথা রে বলিয়ে কেঁদ না,
কামনা নাহিক তব;
লুব্ধ কেন রে বিচর ভুবনে?
লোভে নাহি অভিভব

ঐশ্বর্য্য তরে কেন রে পাগল?
নাহি বৈভব তুমি;
বনিতা বিহনে, কেন রে কাঁদিছ?
নারী নর নহ তুমি!
নহ তুমি পাপী, নহ গো অ-পাপী,
বন্ধনে নহ মুক্ত,
হেয় উপাদেয়, বিধেয়াবিধেয়,
নহ হিতাহিতযুক্ত
সহজ সরল তুমি নিরমল,
অচল গগনোপম,
নহ ত' উজল, নহ অনুজল,
অঙ্কিত-দীপ সম
সাক্ষিস্বরূপ তুমি জগতের,
পরশিতে নারে ভব;
সংবিদ রূপ সমরস তুমি,
তোঁহে সঙ্কিত সব।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

মোক্ষ]

মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।

কিঞ্চিদধিক চারি শত বর্ষ অতীত হইল, ভক্তিপ্রবণ বঙ্গদেশে ধর্ম্মহানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। একে ধর্ম্মের বিকৃত ভাব লইয়া লোকসকল অধর্ম্মে রত। তান্ত্রিক সাধনা-রহস্য সকল না বুঝিয়া মদ্য-মাংসাদির সেবাতেই পরিণত; হিন্দুধর্ম্মের সার সত্য অন্তর্হিত; নিষিদ্ধ আচার ও ভগবদ্বহির্মুখতায় জীবকুল ভাসমান। তাহার উপর অপ্রতিহত প্রভাব মুসলমানগণ ইস্লাম ধর্ম্মের উদার অর্থ না গ্রহণ করিয়া, হিন্দুকে মুসলমানরূপ বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত করিবার জন্য সচেষ্ট। এমন সময় প্রেমের প্রকট মূর্ত্তি, যুগধর্ম্মসংস্থাপক বঙ্গদেশে প্রকট হইলেন। তাঁহার ভুবনমোহন মূর্ত্তি, অলৌকিক বৈরাগ্য, অসাম্প্রদায়িক

ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা শুষ্ক প্রাণেও উৎসের সৃজন করিল, তার্কিকদিগের তর্কজাল ছিন্ন করিল ও নষ্টপ্রায় ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার সাধিত হইল। ধার্ম্মিকদিগের হৃদয়ে আনন্দের অবধি রহিল না। কবিরাজ মহাশয় সত্যই লিখিয়াছেন,—

নদীয়া উদয়গিরি, পূর্ণচন্দ্র গৌরহরি
কৃপা করি হইল উদয়।
পাপতম হইল নাশ ত্রিজগতের উল্লাস
জগ ভরি হরিধ্বনি হয়॥

আজ আমরা এখনও বঙ্গের ক্ষুদ্র পল্লীতে যে নিষ্ঠা বা ভক্তির অনুষ্ঠান দেখিতে পাই, শুধু বঙ্গ কেন, আসাম উৎকল হইতে সুদূর-প্রান্ত সৌরাষ্ট্রের অরণ্যমধ্যে ও এমন কি, মণিপুরের পর্ব্বত-কন্দরেও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ধ্বনি শুনিতে পাই, হিন্দুর সেই পবিত্র পূর্ণানন্দস্বরূপ, মন্দমারুত-সংসিক্ত, বসন্তঋতু-সেবিত পরমধামস্বরূপ শ্রীবৃন্দাবনের বিগ্রহ-সেবায় এখনও গৌড়ীয় বৈষ্ণবদিগের অধিকার দেখিতে পাই, আজ যে গ্রামে গ্রামে মৃদঙ্গ-করতালির ধ্বনির সহিত হরিনামের বিজয় নিশান এখনও উড্ডীয়মান দেখিতে পাই, ইহার মূল হেতু সেই নবদ্বীপের দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুমার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।

কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥

যে বাক্যে, সকলেই যে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে ভক্তির অধিকারী হইতে পারে, ইহা জীব যাঁহার নিকট হইতে বুঝিয়াছে, তাহার মূল হেতু—আমাদের এই বঙ্গীয় দরিদ্র ব্রাহ্মণ-কুমার—মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ।

মহাপ্রভু অবতীর্ণ হইবার পূর্ব্বে তদানীন্তন বঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল, বৈষ্ণব গ্রন্থপাঠে তাহা বেশ বুঝা যায়। নবদ্বীপ তখন ধন ও ঐশ্বর্য্যের কেন্দ্র-স্থল, জ্ঞান ও বিদ্যার নিকেতন। বিদ্যা আলোচনার স্থান হইলেও তখন ধর্ম্মের অবস্থা অতীব শোচনীয়। শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে দেখিতে পাই—

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাই
যাঁহা অবতীর্ণ হইলা চৈতন্য গোঁসাই॥
নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গা-ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥

কৃষ্ণনামভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হইল ভবিষ্য আচার॥
সকল সংসার মত্ত ব্যবহাররসে।
কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি নাহি কারো বাসে॥

ব্যবহার আছে, ধর্ম্মের নাম আছে, কিন্তু ধর্ম্ম-বেত্ত পরম আকর্ষক শ্রীভগবান্ নাই। দেশের এই দুরবস্থার সময়ে দুই একজন মহাত্মা ভাগবত ধর্ম্ম আলোচনা করিতেন; তাঁহারা সাধারণ চক্ষুতে হেয় ও অপদার্থ বলিয়া গণ্য হইতেন। তাঁহারা,—

স্বকার্য্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান, কৃষ্ণের কথন॥

শ্রীমৎ অদ্বৈতাচার্য্যের ন্যায় জ্ঞানী ও ভক্ত তৎকালে আর কেহই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না;—

অদ্বৈত আচার্য্য নাম সর্ব্বলোকধন্য॥
জ্ঞানভক্তি বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর।
কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যে হেন শঙ্কর॥
ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্র পরচার।
সর্ব্বত্র বাখানে কৃষ্ণপদ-ভক্তি সার॥

তিনি দেখিলেন— সকল সংসার।
কৃষ্ণ-ভক্তিগন্ধহীন বিষয় ব্যবহার॥
আপনি শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার॥
শুদ্ধভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন।

এ দিকে অন্যান্য স্থানেও ভক্তগণের আবির্ভাব হইতে লাগিল; সকলেই নবদ্বীপে মিলিতে লাগিলেন। কারণ, ভগবান্ ত' 'সর্ব্ব' না থাকিলে, এরূপে প্রকট হন না; তিনি যে সর্ব্বমধ্যে এক বা 'সর্ব্বজ্ঞ'।

কারো জন্ম নবদ্বীপে কারো চাটীগ্রামে।
কেহ রাঢ়ে, ওড্রদেশে শ্রীহট্ট পশ্চিমে॥
নানা স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।
নবদ্বীপে আসি হৈল সবার মিলন॥

শ্রীহট্টে শ্রীবাস, শ্রীরাম, চন্দ্রশেখর ও মুরারি গুপ্ত; চট্টগ্রামে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, বূঢ়নে হরিদাস; রাঢ় প্রদেশে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভৃতি মহাত্মারা জন্ম পরিগ্রহ করিলেন। এই সকল উজ্জ্বল নক্ষত্রের উদয়ের পর যেন পৌর্ণমাসী রজনীতে নবদ্বীপ-গগনে শ্রীচৈতন্যরূপ পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইল। সেই প্রেমোজ্জ্বল কিরণে বঙ্গের ধর্ম্মাকাশ উদ্ভাসিত হইল। তাঁহার প্রবর্ত্তিত নাম-সংকীর্ত্তনে ধীরে ধীরে সকল সম্প্রদায়ই সাগ্রহে যোগদান করিতে লাগিল। রাজসচিব সনাতন রাজসম্মান তুচ্ছ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। রূপ গোস্বামী— "স দেবশ্চৈতন্যাকৃতিরতিতরাং নঃ কৃপয়তু" বলিয়া আপনাকে গৌরাঙ্গ-চরণে ছাড়িয়া দিলেন। রঘুনাথ লাবণ্যময়ী পরিণীতা পত্নী ও অতুল ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিলেন। পণ্ডিত-শিরোমণি বেদান্তাধ্যাপক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার স্নেহের বালক নিমাইকে বেদান্ত শিক্ষা দিতে গিয়া, পরিশেষে করযোড়ে প্রাণের আবেগে বলিলেন,—

বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষপ্রধানঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী, কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ, প্রাদুস্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে, গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

কাশীবাসী ভুবনবিজয়ী সন্ন্যাসিকুলগুরু যাঁহাতে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার কৃত গ্রন্থে শ্রীগৌরাঙ্গ-বিগ্রহকে শ্রীশ্রীরাধামাধবের একীভূত বপু বলিয়া নিশ্চয় করিলেন,—"সাক্ষাৎ রাধামধুরিপুবপুর্ভাতি গৌরাঙ্গচন্দ্রঃ।" (১০৯ শ্লোক) তাঁহার প্রেমময় দর দর ধারা-বিগলিত, কমনীয় মূর্ত্তিখানি যাহার সম্মুখে একবার দাঁড়াইয়াছে, সেই বিষয় ভুলিয়াছে—আপনাকে ভুলিয়াছে। জানি না, তিনি কি বোধ সংক্রমণ করিতেন যে, তাঁহাকে দেখিলেই জীবের ভগবদ্ভাব আপনি ফুটিয়া উঠিত? সত্যবাই, লক্ষ্মীবাই—আপনার রূপজাল বিস্তার করিয়া সেই পরম-সুন্দর জিতেন্দ্রিয় যতিপ্রবরকে মুগ্ধ করিতে গিয়া আপনি কাঁদিয়া ফেলিল। দুর্ব্বিনীত পাঠান বিজুলী খাঁ আকৃষ্ট হইল; দস্যুগণ দস্যুবৃত্তি ভুলিয়া হরিনাম গ্রহণ করিল। একদিকে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী নৃপতি তাঁহার অপার মহিমা অনুভব করিয়া, বহু চেষ্টায় তাঁহার কৃপালাভ করিলেন; অপর দিকে দীনাতিদীন দরিদ্র 'খোলাবেচা' শ্রীধরকে তিনি "নিজ জন" মনে করিয়া কোলে লইলেন।

সেই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্যজড়িত মুখখানিতে কি এক অপূর্ব্ব প্রেমের আভা সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকিত যে, তাঁহাকে দেখিলেই একটী আকর্ষণ অনুভূত হইত। তা'ই তাঁহার আবির্ভাবে শীঘ্রই ভগবানের ভাব তরঙ্গায়িত হইয়া দেশে ছুটিল।

এক্ষণে এই মহাপ্রভুর তত্ত্ব কি, তিনি অবতার—কি, ভক্ত; না মহাত্মা? এ সম্বন্ধে সুধীগণের মত কি? অনেকে তাঁহাকে অবতার, মহাত্মা বলিয়া মনে করেন, কেহ বা তাঁহাকে উন্মত্ত বলিতেও কুণ্ঠিত হন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব এবং গোস্বামীদিগের সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত' শ্রীকৃষ্ণই। এই গোস্বামীদের মতানুসরণ করিয়াই প্রেমবিলাসরচয়িতা বলিলেন;—

গৌর কৃষ্ণ এক, ইথে ভেদবুদ্ধি যায়।
সে যায় রৌরবে তার নাহিক নিস্তার॥
চৈতন্য গোঁসাইয়ের তত্ত্ব নিরূপণ।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র-নন্দন॥

কবিরাজ গোস্বামীও বলিলেন;—

নন্দসুত বলি যাঁরে ভাগবত গাই।
সেই কৃষ্ণ অবতীর্ণ চৈতন্য গোঁসাই॥

গোস্বামীরা অবশ্য তাঁহাকে দেখিয়া, পরে শাস্ত্র-সাহায্যে তাঁহার অবতার-বিষয়ক প্রমাণাদির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহাদের প্রামাণ্য শ্লোকগুলি এই,—

১। কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষা কৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥

২। আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো হ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥

৩। সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গো বরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।

৪। সন্ন্যাসকৃৎ শমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ॥

৫। অহমেব কচিদ্ব্রহ্মন্! সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥

পুরাণোক্ত ঐ সকল প্রমাণগুলি শ্রীচৈতন্যদেবকে ইঙ্গিত করে কি না, তাহা এক্ষণে দেখা যাউক। শেষোক্ত শ্লোকটী তাঁহাকেই স্পষ্টরূপে নির্দ্দেশ

করে ;—কারণ, সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিয়া, হরিভক্তি দ্বারা জীবের কল্যাণকল্পে নিযুক্ত, তাঁহাকেই দেখিতে পাই। বিষ্ণুর সহস্রনামোক্ত 'সন্ন্যাসকৃৎ', 'সুবর্ণবর্ণ', 'নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ' প্রভৃতি লক্ষণগুলি তাঁহাকেই প্রতিপন্ন করে। ভাগবতোক্ত শ্লোক দুইটিই এখন বিবেচ্য। প্রথম শ্লোকটীর অর্থ কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্য-চরিতামৃতে এইরূপ করেন।

'কৃষ্ণ' এই দুই বর্ণ সদা যাঁর মুখে।
অথবা কৃষ্ণকে তেঁহো 'বর্ণে' নিজে সুখে॥
কৃষ্ণবর্ণ শব্দের অর্থ দুই ত' প্রমাণ।
কৃষ্ণ বিনু তাঁর মুখে নাহি আইসে আন॥
দেহকান্তে হয় তেঁহো অকৃষ্ণ-বরণ।
অকৃষ্ণবরণে কহে পীত বরণ॥

অকৃষ্ণবরণে পীতবরণ বলার তাৎপর্য্য এই যে, শুক্ল, রক্ত, কৃষ্ণ ও পীত এই চারিটী বর্ণের উল্লেখ করিয়া, প্রথমোক্ত তিন বর্ণের অবতার পৃথক্‌রূপে বলায়, পীতাবতারই অবশিষ্ট রহিল ; অকৃষ্ণাঙ্গ হইলেও তিনি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ। দ্বাপরে শ্যামাবতার ও কলিযুগে অকৃষ্ণ কৃষ্ণাবতারের একত্রে উল্লেখ থাকায়, একই তত্ত্বের আভাস পাওয়া যায়। তা'ই গোস্বামীরা শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলিয়া, শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীকৃষ্ণ উভয়কে অভিন্ন বোধ করেন। কারণ,—

প্রকাশস্তু ন ভেদেষু গণ্যতে স হি ন পৃথক্॥

যাঁহারা অবতার বিশ্বাস করেন না, ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বরে এবং ভগবান্ অবতার হইয়া জীবের মঙ্গল বিধান করেন, এ কথায় বিশ্বাস করেন,—শাস্ত্র মানেন, অথচ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুকে ভগবদবতার মানিতে ইতস্ততঃ করেন, তাঁহারা এ সকল প্রমাণে তৃপ্ত হইবেন কি না, জানি না। কারণ, বেদরূপ কল্পতরুর সুপরিপক্ক ফলস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত যাঁহার আভাষ দিয়াছেন, সর্ব্ববেদার্থের ইতিহাস মহাভারতে যাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াছেন, সেই গৌরবর্ণ সন্ন্যাসিপ্রবর হরিভক্তিপ্রচারককে না মানিব কেন? অবশ্য এ কথা বলিতে পারেন যে, এই সকল প্রমাণ অন্যান্য অবতারের ন্যায় স্পষ্টতঃ নহে—থাকিবার কথাও নয় ; কারণ, ভাগবতেই ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের

বাণী,—'ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্॥' (৭।৯।৩৮।) কলিযুগে প্রচ্ছন্ন; তা'ই তাঁহার একটি নাম 'ত্রিযুগ।'

প্রত্যক্ষরূপধৃগ্ দেবো দৃশ্যতে ন কলৌ হরিঃ।
কৃতাদিষেব তেনাসৌ ত্রিযুগঃ পরিপঠ্যতে॥ বিষ্ণুধর্ম্ম।

আর একভাবে এ কথা বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন; —"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।"

যিনি যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, তিনি কি কলিযুগে করিবেন না; কলির ধর্ম্ম—শ্রীহরিসংকীর্ত্তন। শ্রীমদ্ভাগবতে—

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ ১২।৩।৫২॥

অন্যত্রও—ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চ্চনম্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ত্ত্য কেশবম্॥

এই শ্রীহরি-সংকীর্ত্তনপ্রচারকারী—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভিন্ন যুগধর্ম্মসংস্থাপক—আর কাহাকে বলিবেন? কাহার দ্বারা জীব নামসংকীর্ত্তনের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারিল? অবতার-তত্ত্ব সমাধান বিষয়ে ভাগবতে আর একটী কথা দৃষ্ট হয়;—

যস্যাবতারা জ্ঞায়ন্তে শরীরেষশরীরিনঃ।
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈর্বীর্য্যৈর্দেহিষসঙ্গতৈঃ॥ ১০।১০।৩৪।

এই শ্লোকটী নলকূবর ও মণিগ্রীব উপাখ্যানে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাহাদের উক্তি। "আপনার শরীর নাই বটে; কিন্তু যে সকল অতুল আতিশয্য-সম্পন্ন বীর্য্য দেহীর পক্ষে অসম্ভব, সেই সকল বীর্য্য দর্শন করিলে দেহীদিগের মধ্যে আপনার অবতার জানা যায়।" অলৌকিক বা অমানুষিক ব্যাপার কি তাঁহার জীবনে দৃষ্ট হয় নাই? এক দিনে আম্রবীজ বপন ও ফলোদ্গম; স্পর্শমাত্র কুষ্ঠ-রোগীর আরোগ্যলাভ; ষড়্ভুজ মূর্ত্তি প্রকাশ; এ সকল কি অলৌকিক নহে? এ সকল অলৌকিক ব্যাপার পরিত্যাগ করিলেও, যে মহাভাবে তাঁহার দেহ কদম্ব-কোরকের ন্যায় কণ্টকিত হইত চক্ষু হইতে দর দর ধারা বিগলিত হইত, সেই প্রেমের মূর্ত্তি অতীব অপূর্ব্ব। অবশ্য তিনি নিজকে ভক্ত বলিয়াই পরিচয় দিতেন। ঈশ্বরভাবে কেহ সম্বোধন করিলে তিনি বিরক্ত হইতেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌম ঈশ্বরজ্ঞানে বন্দনা করিলে;—

প্রভু কহে সার্ব্বভৌম আর কথা কহ।
আতাল পাতাল কথা কেনবা বলহ॥ গোবিন্দ-কড়চা।

রামানন্দ রায় 'ঈশ্বর' বলিয়া সম্বোধন করায়, তিনি স্পষ্টই বলিয়াছিলেন ;—

প্রভু কহে, আমি মানুষ, আশ্রমে সন্ন্যাসী।

চণ্ডীপুরে ঈশ্বর ভারতী 'কৃষ্ণ' বলিয়া উল্লেখ করায়, তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। ইহা ত' স্বাভাবিক, তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া, ভক্তের সাধনা-পদ্ধতি নিজ আচরণ দ্বারা জীবকে দেখাইতেই ত' আসিয়াছেন। জীবের বিশিষ্ট 'আমি' ভগবানের দাস, এই জ্ঞানে অবস্থিত না হইলে, সে ভাবের সাধনা হইবে কিরূপে ? যাহার স্বরূপ বা 'তটস্থ' ভাব স্ফুরিত হয় নাই, সে জোর করিয়া 'আমি'তে ঈশ্বর-বুদ্ধি স্থাপন করিলে, অহঙ্কারেরই বৃদ্ধি হইবে। যাহাতে জীবের ভেদাত্মক অহংকার বৃদ্ধি না হয়, তজ্জন্যই "জীব ভগবানের দাস" এই মহা উপদেশ। তবে এমন সময় আসে, যখন উপাস্য ও উপাসকে আর ভেদ থাকিতে পারে না। জয়দেব কবিও 'মধুরিপু' ভগবান্‌ই 'আমি', শ্রীরাধার এই প্রকার অবস্থা বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছেন,—"মুহুরবলোকিতমণ্ডনলীলা, মধুরিপুরহমিতি ভাবনশীলা॥" বিদ্যাপতিও লিখিয়াছেন,—'অনুখন মাধব মাধব সোঙরিতে, সুন্দরী ভেল মাধাই।' ভাগবতেও দেখিতে পাই, গোপীগণ নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ ভ্রম করিতেন, চৈতন্যদেবের জীবনেও সময়ে সময়ে তদ্রূপ হইত। তিনি রাধাভাবে যাঁহার অনুসন্ধান করিতেন, প্রাণের তীব্র আবেগে যাঁহার জন্য অহরহ অশ্রুপাত করিতেন, যেন তাঁহাকে হৃদয়ে পাইয়া বাঞ্ছিতের আলিঙ্গনে তদ্রূপত্ব প্রাপ্ত হইলেন, তখন,—"মুঞি সেই, মুঞি সেই কহি কহি হাসে।"

ইহাই চৈতন্যদেবের মহাপ্রকাশ বলিয়া বৈষ্ণব গ্রন্থে উল্লেখ আছে। পাঠক একবার এই মহাপ্রকাশ কিরূপ ভাবে হইত, দেখুন।—প্রথম প্রকাশ, অদ্বৈত-মিলনের দিন। অদ্বৈত প্রভু দেখিলেন,—

জিনিয়া কন্দর্প কোটী লাবণ্যসুন্দর।
জ্যোতির্ম্ময় কনক-সুন্দর কলেবর॥
শ্রীবৎস কৌস্তভ মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা দেখে।

কিবা নখ কিবা মণি, না পারি চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে।

আর একদিন "সাত প্রহরিয়া মহাপ্রকাশ,—" যে দিন "খোলাবেচা" শ্রীধর প্রভুকে বিষ্ণুরূপে, মুরারি গুপ্ত 'রামচন্দ্র'রূপে এবং প্রত্যেক ভক্তই স্বীয় আরাধ্য বস্তু বলিয়া দেখিতে পান। তিনি যেন দেখাইলেন, "জীব! দেখ আমি সকলের সাধনার ধন; মূর্ত্তিভেদ কেবল ভাবভেদে।" সেই চিদানন্দ-ঘনমূর্ত্তি,সেই— "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্" কালশশী. সাধকের চিত্তের ভাব অনুসারে প্রকট হন।

যার যেন মত ইষ্ট প্রভু আপনার।
সেই দেখে বিশ্বম্ভর সেই অবতার॥

ভাগবত এ কথার সমর্থন করেন —

যদ্যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥

মনের দ্বারা ভক্তগণ যে যে বপু স্বেচ্ছায় ধ্যান করেন, ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ বশতঃ স্বীয় সর্ব্বাত্মিকা বিস্তার সহ অনুরূপ প্রবেশ করিয়া, তিনি সেই রূপেই প্রকট হন। শ্রীকৃষ্ণ কংস-সভায় উপস্থিত হইলে, প্রত্যেকেই এক এক ভাবে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

মল্লানামশনিঃ নৃনাং নরবরঃ স্ত্রীনাং স্মরো মূর্ত্তিমান্।

মল্লগণ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ ভীষণতম অশনি; জনসাধারণ দেখিলেন, শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ-শ্রেষ্ঠ; স্ত্রীগণ, সাক্ষাৎ কামদেব; গোপগণ, স্ব-জন; অসৎরাজারা দেখিলেন, তাহাদিগের শাস্তা। বসুদেব দেবকী, শিশু; ভোজপতি, সাক্ষাৎ মৃত্যু। এইরূপে প্রত্যেকের হৃদয়ের ভাব অনুসারে তিনি আপনাকে প্রকট করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবও ঠিক সেই ভাবে প্রকট হইতেন।

তৃতীয় প্রকাশ—চন্দ্রশেখর-গৃহে। এই দিন শ্রীমতী রাধার বৈভব-প্রকাশ। এইরূপ বৈভব-প্রকাশ ভগবানের বিশেষ প্রকাশকেই ইঙ্গিত করে। কারণ, ঈশ্বর ত' সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত। জ্ঞানী জ্ঞাননেত্রে "সর্ব্বত্রই" সেই ভগবৎ-সত্তা দেখিতে পান। ভক্তও—

স্থাবর জঙ্গম দেখে, না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তা'র ইষ্টদেব-স্ফূর্ত্তি॥

তবে কোথাও তিনি বিশেষভাবে প্রকাশিত হন। শ্রীচৈতন্যদেবে ঐশীভাবের বিশেষ প্রকাশ অনেক স্থানেই দৃষ্ট হয়। তবে সকলেই যে তাঁহাকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিবে, এরূপ বলা যায় না। দ্বাপরযুগে ব্যক্তাবতার শ্রীকৃষ্ণকে যখন সকলে স্বীকার করে না, তখন প্রচ্ছন্নাবতার গৌরচন্দ্রের সম্বন্ধে ত হইবারই কথা। স্বয়ং ব্রহ্মারই যখন এ বিষয়ে মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল, তখন অন্যের ত' হইতেই পারে।

আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ রাধাকৃষ্ণ এই দুই ভাবের মহা মিলন। এই দুই আবার একই তত্ত্ব। শ্রীপাদ স্বরূপ দামোদর ইহার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি "সাক্ষাৎ মহাপ্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ"। সেই তত্ত্বই চরিতামৃতে ব্যক্ত হইয়াছেন।

রাধা পূর্ণশক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণশক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাই, শাস্ত্র পরমাণ ॥

শক্তি ও শক্তিমানে তত্ত্বতঃ ভেদ নাই ;—

মৃগমদ তার গন্ধ যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি ও জ্বালাতে যৈছে কভু নাহি ভেদ ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুই রূপ ॥
প্রেমভক্তি শিখা'তে আপনি অবতরি।
রাধাভাব কান্তি দুই অঙ্গীকার করি ॥
শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যরূপে কৈল অবতার।

ঈশ্বর কর্ম্মাধীন না হইয়াও, ষোড়শকলাত্মক লিঙ্গদেহ আশ্রয় না করিয়াও স্বেচ্ছাক্রমে স্বীয় শক্তি অবলম্বনে আপনাকে প্রকট করেন। যেমন সৃষ্টিকালে ভগবান্ যেন আপন স্বরূপ রস উপভোগার্থে আপনাতেই আপনাকে প্রকাশ করেন ;—আপনার আত্মভূত শক্তি, ভগবৎচৈতন্যক্ষেত্রে, আত্মলীলার জন্য ভগবান্‌কে অবলম্বন করিয়া যেরূপ সর্ব্ব বা জগৎরূপে প্রকট হয়েন,—তদ্রূপ তিনি স্বীয় হ্লাদিনী-শক্তি শ্রীরাধার মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া আত্মলীলার জন্য শ্রীচৈতন্যরূপে প্রকট হইলেন। এই মহাভাব অবলম্বনেই শ্রীগৌরাঙ্গমূর্ত্তি এরূপ কমনীয়, এরূপ প্রেমময়। কারণ—এই মহাভাবে সেই "রসো বৈ সঃ"। চণ্ডী-দাস এই মহামিলনচিত্র ধ্যান-সহায়ে দেখিতে পাইয়া কবিতায় প্রকাশ করিলেন—

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে, এরূপ হইবে কোন্ দেশে ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যেক কার্য্যেই এই মহাভাব দেখিতে পাই। শ্রীরাধার প্রেমোন্মাদ, বিরহ, মিলন, সকল অবস্থাই শ্রীমদ্ভাগবত বা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে যাহা বর্ণিত, গৌরাঙ্গ-জীবনে তাহা প্রকটীকৃত। শ্রীরাধিকার তমাল দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ স্ফুরণ হইত। শ্রীরাধা মেঘ দেখিয়া—

চাহে মেঘ পানে, না চলে নয়নের তারা। (চণ্ডীদাস)

দেখিবেন, শ্রীচৈতন্যদেবও—

চটক পর্ব্বত দেখি গোবর্দ্ধন ভ্রমে।
ধাঞা চলে আর্ত্তনাদ করিয়া ক্রন্দনে ॥
যথা নদী দেখে তাঁহা মানয়ে কালিন্দী।
মহাপ্রেমবশে নাচে প্রভু পড়ে কাঁদি ॥ চৈতন্যচরিতামৃত।

তিনি—

তমালের বৃক্ষ এক সম্মুখে দেখিয়া।
কৃষ্ণ বলি ধেয়ে গিয়ে ধরে জড়াইয়া ॥ গোবিন্দ-কড়চা।

* * *

বন দেখি ভ্রম করে এই বৃন্দাবন ॥

যেমন, শ্রীরাধিকা—

পুছয় কানুর কথা ছল ছল আঁখি।
কোথায় দেখিলা শ্যাম কহ দেখি সখি ॥

তেমন—শ্রীচৈতন্যদেবও—

গদাধরে দেখি প্রভু করয়ে জিজ্ঞাস।
কোথা হরি আছেন, শ্যামল পীতবাস ?

শ্রীচৈতন্যদেব এইরূপে সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়া ভগবদ্ভাবকে ইঙ্গিত করিয়াছেন। তাঁহার বিরহ, তাঁহার মিলন, সকলই ভগবান্‌কে লইয়া। তিনি যেমন বিরহে একান্ত কাতর হইতেন, মাটীতে গড়াগড়ি দিতেন, সেইরূপ ব্যগ্রতা, আকুলতা ও তীব্র অনুরাগ জীবেরও আসা চাই। কারণ, সর্ব্বজীবে ও সর্ব্বভাবে, সেই প্রকাশাতীত, 'সর্ব্ব'-ভাবের লয়-স্থান কালশশীকে দেখিতে হইলে, বিরহ আবশ্যক। বিরহ দ্বারাই মন 'সর্ব্ব' বস্তুতে তাঁহাকে দেখিতে বাধ্য হয়। যখন বিরহের

তীব্র জ্বালায় ক্ষুদ্র ভেদজ্ঞান ভস্মীভূত হইয়া যায়, যখন প্রেমময়কে না দেখিয়া তাঁহার চিত্র বসনাদিতে তাঁহাকে দেখিতে পাওয়া যায়, তখন আর সেই হৃদয়ের ধন জীবন-সখার অদর্শন ঘটে না। প্রথমতঃ ভাবের সহায়তায়, পর্ব্বতে গোবর্দ্ধন ভ্রমে, তমালকে কৃষ্ণ অনুমানে, 'সর্ব্ব'বস্তুতে তাঁহার ভাব দেখিয়া, পরে শ্রীভগবান্‌কে তত্ত্বতঃ জানিয়া, তাঁহার সদা অপ্রকাশিত অস্তিত্বে সাধক আপনি লয় হয়। এই মহাভাবই তাঁহার মহাশিক্ষা; তিনি গোপীভাবের সাধনা যে কিরূপ, তাহাই দেখাইয়াছেন। মেঘ-দর্শনে গোপীর হৃদয়ে ভগবদ্ভাব প্রকট হইল। ভাব প্রকট হইতে হইলে, রূপের মধ্যে অনুস্যূত রূপাতীত অথচ রূপের দ্বারা আভাষ-প্রাপ্ত ভগবদ্ভাব হৃদয়ে প্রকাশিত হওয়া চাই। রূপ ও ভগবান্ এক,— "রূপ্যতে ইতি রূপং" বলিয়াই এই ভাব প্রকট হইতে পারে। ইহা আমাদের শ্রীচৈতন্যদেবে স্পষ্ট দেখিতে পাই।

এখনও বেশী দিন যায় নাই; কিন্তু তাঁহার ধর্ম্ম এখনি বিকৃত-অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। তাঁহার মহাশিক্ষা ভুলিয়া কতকগুলি ভক্ত গোঁড়ামিকে আশ্রয় করিয়া মহাপ্রভুর দোহাই দিতেছে। মহাপ্রভুর উদার ও অসাম্প্রদায়িক ভাব ভুলিয়া, আজ বৈষ্ণব ৺কালীর প্রসাদ খাইতে চাহে না; আজ বৈষ্ণব দেবীদর্শন করিবে না। কিন্তু যাঁহার আদর্শে তাঁহারা চলিতে চান, তাঁহার ব্যবহার দেখুন;—

তিনি মহাদেব, পার্ব্বতী, গণেশ প্রভৃতি সকল দেবতা দর্শনে মহাভাবে বিভোর হইতেন ভাবোচ্ছ্বাসে পূরিত হইতেন; বাহ্য জ্ঞান লোপ পাইত। সকল বিগ্রহের ভিতর দিয়া তিনি ভগবান্‌কেই পূর্ণভাবে দেখিতে পাইতেন।—তিনি ধলেশ্বর মহাদেব-দর্শনে;—

'হর হর' বলি প্রভু উচ্চরব করি। আছাড় খাইয়া পড়ে ধরণী উপরি॥

শ্রীরামচন্দ্রের পদচিহ্নদর্শনে—

চরণের চিহ্ন প্রভু করিয়া পরশ।
গাঢ়তর প্রেমবশে হইলা অবশ॥ গোবিন্দ-কড়চা।

অষ্টভুজা দেবী-দর্শনে—'সেখানেই গিয়া প্রভু করিলা প্রণতি।' সুরথ-প্রতিষ্ঠিতা দেবী-দর্শনে—'শক্তিমূর্ত্তি দেখি প্রভু ধরণী লুটায়।'

আর একটী কথা বলিয়া আজ প্রবন্ধ উপসংহার করিব। অলৌকিক ঘটনাতে বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাঁহাকে অবতার বলুন বা না বলুন, ক্ষতি নাই।

কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে ভগবান্ মানবে ও মানবে ভগবান্ ভাব দেখা যায়। তাঁহার জীবনের কোন্ স্থানটী মানবীয়, আর কোন্ স্থানটি ভাগবত, তাহার স্থির করা যায় না ;—যেন মানবে ও ভগবানে যে ভেদ নাই, তাহাই দেখাইতে, মানব-ভাবে কান্দিতে কান্দিতে 'ভগদ্ভাবে' প্রকটিত হইতেন। এই ব্যবহারিক ও মায়ার জগতে যাঁহাকে দেখিলে ভগবান্ বলিয়া মনে হইত, যাঁহার আচার-ব্যবহারাদি সাধারণ মনুষ্যের সহিত একজাতীয় বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও, ভক্তি দ্বারা তীক্ষ্ণী-কৃত দৃষ্টিতে দেখিলে স্বতঃ পরত সর্ব্বতোভাবে যাঁহাকে কেবল শ্রীভগবান্‌কে মনে করাইয়া দিবার জন্য অবতীর্ণ বলিয়া বোধ হয়, যে "সর্ব্বভূত-হৃদয়কে" শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্যও শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে পূজা করিলেন ও বেদোক্ত পুরুষ-সূক্ত মন্ত্র দ্বারা মহাভিষেক করিলেন, তুলসী চন্দন যাঁহার চরণে প্রদান করিলেন,—তিনি অবতার হউন বা না হউন, তাঁহাকে প্রণাম করি।

তর্ক-প্রণোদিত না হইয়া, ভক্তিভাবে, অকপটচিত্তে, সেই ভুবন-মোহন ন্যগ্রোধ পরিমণ্ডল প্রেমরসময় গৌর-সুন্দরের প্রতিমা স্থিরভাবে একবার দৃষ্টিপাত করুন, দেখুন দেখি, সেই গৌর-রূপের ভিতর দ্বিভুজ মুরলীধর রসিকশেখর ব্রজ-রাজ-তনুজ মূর্ত্তি' দেখিতে পান কি না? দেখুন দেখি, নিষ্ঠা-শান্তিপরায়ণ দণ্ডধারী সুবর্ণ-বর্ণের ভিতর অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপের' আভা ফুটিয়া উঠে কিনা? দেখুন দেখি, আজানুলম্বিত-ভুজ, সংকীর্ত্তন-প্রবর্ত্তক, শান্তমূর্ত্তির ভিতর যুগধর্ম্ম-সংস্থাপিনী ভগবৎ-ছটা দৃষ্টিগোচর হয় কি না? একবার দীনভাবে 'হা গৌরাঙ্গ' বলিয়া ডাকুন দেখি, সেই প্রচ্ছন্ন বিগ্রহ আত্ম-প্রকাশ করেন কি না?

তিনি আত্মপ্রকাশ করুন বা না করুন, আমরা তাঁহাকে ঈশ্বরজ্ঞানে প্রণাম করি। যিনি কলিযুগে জীবের উদ্ধারার্থ "হরের্নামৈব কেবলং" এই মহামন্ত্র প্রদান করিলেন, শাস্ত্রের গুহ্য বস্তু প্রকাশ করিলেন, বিশুদ্ধ ভক্তিশাস্ত্রনিচয়ের বীজ যিনি গোস্বামি হৃদয়ে বপন করিলেন, তিনি ঈশ্বর হউন বা না হউন, ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করি। যিনি আপামর-চণ্ডাল সকলকেই ভগবৎ-প্রাপ্তির আশা দিয়াছেন, সর্ব্বাত্মক অদ্বয়তত্ত্ব ও তাহার ফলভূত বিশ্বজনীন ভ্রাতৃভাবের সংস্থাপন করিলেন, যাঁহার কৃপায় জীব 'রাধাকৃষ্ণ' বা জীবে শিব ও শিবে জীব সাধনের অধিকারী হইল, যিনি জগদ্গুরু-স্বরূপ, তিনি অবতার হউন বা না হউন, ঈশ্বরজ্ঞানে তাঁহাকে প্রণাম করি!!!

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

নির্ভীক যাত্রী

মন-প্রাণ দিইছি তাঁকে,
মুখে বল্‌ছি তাঁ'র নাম।
কর্ম্মাকর্ম্ম চুকিয়ে দিয়ে,
চলেছি মোরা তাঁ'রি ধাম ॥
ইন্দ্রিয় বা বিষয় লয়ে,
মরুক্ তা'রা খুসি মত।
আমরা কিন্তু প্রাণে প্রাণে,
হয়েছি তাঁ'র অনুগত ॥
তাঁ'রি প্রেমে প্রেমিক হ'য়ে,
সবাই গাহি তাঁ'রি নাম।
তাঁ'রই নাসা তাঁ'রি ফুলে
পায় যে সদা তাঁ'রি ঘ্রাণ ॥
তাঁ'রি প্রাণের ব্যাকুলতা,
জেগে উঠে সকল প্রাণে।
তাই যে মোরা ধ্যান করি গো,
তা'ই ত' বসি যোগাসনে ॥
তাঁ'রি রসে রসিক হয়ে,
রসনা আছে হয়ে ভোর।
বিষয়-রস বিরস হ'লো
কর্‌তে নারে কিছুই মোর ॥
তাঁ'রি চক্ষে তাঁ'রই রূপ,
দেখ্‌চি কিবা মনোহর।
তাঁ'রি কাণে শুন্‌ছি বসে
মধুর তাঁ'র ও কণ্ঠস্বর ॥
তাঁ'রি দেহে তাঁহার পরশ,
পাচ্চি কিবা আবেগ-ভরা।

মন-প্রাণ উঠ্‌ছে ভরে,
দেখ্‌চি তাঁ'তেই জগৎ ভরা ॥
আত্মহারা ভাব্‌চি বসে,
কে সেই আমার হৃদয়চোরা।
আমার প্রাণের ভিতর ব'সে,
দিচ্চে এত প্রাণের সাড়া ॥
সেই ত' মোদের মাতা পিতা,
দারা সুত ও বন্ধু-ভ্রাতা।
সেই ত' মোদের সর্ব্বস্ব-ধন,
ভবার্ণবের পরিত্রাতা ॥
সে যে মোদের মহারত্ন,
সেই ত' মোদের জীবন-সখা।
হৃদ্-কুহরে বসে থাকি,
পে'তে একটু তাঁ'রি দেখা ॥
তিনিই যবে দু'হাত তুলে,
ডাকেন তাঁ'হার আপন কাছে
সুখে দিয়া তিলাঞ্জলি
ছুটি তখন তাঁহার পাছে ॥
'সকল' ভুলে নেচে উঠি
হাঁসি কান্না ফেলে দিয়ে।
(তাঁর) চরণকূলে যাত্রা করি,
জীর্ণ এই তরী বেয়ে ॥
সকল আশা ভাসিয়ে দিয়ে,
তাঁ'র রাঙ্গা ঐ চরণতলে।
ঝাঁপিয়ে গিয়ে পড়্‌ব এবার,
ডুবি কিংবা উঠি কূলে ॥

আর কিছু ত' চাহিব না,
'চাওয়া' 'পাওয়া' মিটে গেছে
তাঁ'র চরণযুগল ভরসা করে,
পাড়ি দেব ভবসিন্ধু-মাঝে ॥

ইচ্ছা হয় ত' উঠিয়ে নিও,
নয় ত' দিও দূরে ফেলে।
(আমি) দূরেই থাকি, কাছেই থাকি,
আছি তোমার চরণমূলে ॥

ধর্ম্ম]

প্রণব-রহস্য ।*

ভাষা-পরিচ্ছেদ ।

১। 'সর্ব্ব' ।—

মানব পরিদৃশ্যমান ও উপলব্ধ ভাবাদির মধ্যে সর্ব্বদাই একত্ব ও অদ্বিতীয়ত্ব অন্বেষণ করিতেছে। একদিকে, বাহিরে অনন্ত 'দৃশ্য', অপরদিকে, অন্তরে অনন্ত বৃত্তির খেলা। ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও ভেদাভিমানী মানবের নিকট প্রথমে অনন্তের এই উভয়বিধা বা প্রকার কোনরূপ একতার ব্যঞ্জনা করে না। তাহার নিকট এই অনন্ত বিকাশের মধ্যে কোনরূপ শৃঙ্খলা বা নিয়ম পরিদৃষ্ট হয় না। বস্তু মাত্রই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট; বৃত্তিগুলিও তদ্রূপ। তারপর যখন মানবের ভিতর বুদ্ধিতত্ত্বের উন্মেষ হইতে আরম্ভ হয়, তখন সে এই বিশ্লিষ্টতার মধ্যেও একত্বের ক্ষীণালোক দেখিতে প্রয়াস করে। ইহাই বিজ্ঞানের জন্ম। বহুত্বের মধ্যে "আমিই" একত্ব ও ইহাই সর্ব্বপ্রথমে একত্বের ইঙ্গিত দেয়। তারপর যা'র যেরূপ বিদ্যা বা আত্মানুভূতি ও স্মৃতি, সে তদ্রূপ ভাবে একত্ব-পরিস্থাপনে প্রবৃত্ত হয়। 'যথা বিদ্যা যথা স্মৃতি।'

বিজ্ঞানের একত্বানুসন্ধানের গতি নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায় যে, স্বভাব, নিয়ম, গতি প্রভৃতি ভাবগুলির মধ্য দিয়া বিজ্ঞান যে একত্বের জন্য প্রয়াস করিতেছে, উহার ভিতরে বহুত্বের আভাস থাকিলেও উহা সর্ব্বাত্মিকা (universal)। প্রথমে দেখা যায়, যে 'বহু' বা 'সর্ব্ব' একেবারে বিচ্ছিন্ন হইলে, বস্তুর বিশিষ্টতা উপলব্ধি হয় না। বিশিষ্ট বস্তু অর্থে আমরা উহাকে কতকগুলি বিশেষ ধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া বুঝি। কিন্তু 'ধর্ম্ম' শব্দে সামান্য সর্ব্বাত্মিকাভাব বুঝায়; যাহা

* এই নামে ধারাবাহিকরূপে সাধকগণের প্রণব সম্বন্ধে দর্শন ও আত্মানুভূতির ভাবগুলি প্রকাশিত হইবে। পং সং।

সর্ব্বকালে, সর্ব্বভাবে সত্য। যাহা অন্যান্য সর্ব্ব বস্তুর ঘাত-প্রতিঘাতেও নষ্ট হয় না, তাহাই ত' বস্তুর ধর্ম্ম। যেমন অগ্নির দাহিকা-শক্তি; যদি দাহিকা-শক্তি সর্ব্বকালে ও সর্ব্বভাবে একরূপ না থাকিত, যদি আজ অগ্নি উষ্ণ, কল্য শীতল বোধ হইত, যদি সর্ব্ব বস্তুকে দগ্ধ বা তপ্ত করিতে না পারিত, তাহা হইলে অগ্নির এই সর্ব্বাত্মিকা 'ধর্ম্ম' সিদ্ধ হইত না। চক্ষু আজ রূপ দর্শন করিয়া, কাল যদি কোন বস্তু দর্শন করিতে না পারিত, কিম্বা যদি কোন পদার্থের সহিত মিলনে চক্ষুতে 'রূপভাব' না ফুটিয়া, স্পর্শ-ভাব ফুটিয়া উঠিত, তাহা হইলে চক্ষুর ধর্ম্ম নির্ণীত হইতে পারিত না।

এই সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তির মূল কি? ইহা কি 'বহুর' কৃত্রিম কোন 'ফল' মাত্র; না ইহার ভিতরে কিছু একত্ব সত্তা আছে? দশটী বিভিন্ন স্থানে, আম্র, নারিকেল, প্রস্তর প্রভৃতি দশটী বিভিন্ন বস্তুকে পৃথিবীতে পড়িতে দেখিলাম। যদি ভেদ ও বিশ্লিষ্টতা বা বিচ্ছিন্ন বহুত্ব-ভাবই সত্য হইত, তাহা হইলে কি পতনরূপ ধর্ম্মটী আম্র, নারিকেল বা প্রস্তর খণ্ডের বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া মনে হইত না? বহু পদার্থে একরূপ গতি না থাকিলে, সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি কিরূপে ফুটিবে? ঐ "সর্ব্ব" বুদ্ধিতে, ঐ মাধ্যাকর্ষণরূপ সর্ব্বাত্মিকা ভাবে, বিশিষ্ট বস্তুর ছিন্ন ভাবগুলি ডুবিয়া গিয়া, কি এক মহান্ ভাবের ইঙ্গিত করিতেছে। ঐ একত্ব দেশ, কাল, অবস্থা, বস্তুর আকার, পরমাণু প্রভৃতি আপাততঃ বিভিন্ন ভাবগুলি বিলোপ সাধন করিয়া এক ঘন, একত্ব রূপে, আমাদের নিকট প্রতিভাত হইতেছে। ইহাতে বুঝিতে পারা যায় যে, বাহিরের বোধ সকলের মধ্যে, কি এক সর্ব্বাত্মিক একত্ব-ভাব অনুস্যূত হইয়া রহিয়াছে; বহুত্ব বা বিচ্ছিন্ন বুদ্ধি মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে। 'সর্ব্বাত্মিকা' শব্দে বহুত্ব না বুঝাইয়া কি এক অপরিজ্ঞাত, বিশেষ বস্তুর লয় সাধনকারী, একত্বকেই ইঙ্গিত করিতেছে। সাংখ্যের 'প্রকৃতি', 'বহু'-প্রসব-ধর্ম্মী হইলেও, নিত্যা এক ও সর্ব্বাত্মিকা। শাস্ত্র 'সর্ব্ব' শব্দ এই ভাবে ব্যবহার করিয়াছেন।

২। সর্ব্বের অবস্থা বা ভাব।

আমাদের 'আমিটী' যে ভাবে অবস্থিত, সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিটীও তদ্‌জাতীয় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়: ইহা আর একটী রহস্য। যে কেবল মাত্র বিভিন্ন ভোগে ব্যাপৃত, যে বিশিষ্ট বস্তুর সাময়িকভাব গ্রহণ করিয়াই সন্তুষ্ট হয়, যাহার ভিতরের "আমি"

বুদ্ধিটা তরঙ্গরূপেই সর্ব্বদা খেলিতে থাকে, তাহার নিকট বাহিরের বস্তুগুলিও বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। এ বিষয়ে অষ্ট্রেলিয়ার বর্ব্বরের দৃষ্টান্তটী সমীচীন। একটী বর্ব্বর মনুষ্য শীতে কাঁপিতেছিল; তাহা দেখিয়া একজন মিশনারী সাহেব তাহাকে একখণ্ড শীতবস্ত্র দান করেন; বর্ব্বর তাহা পাইয়া ব্যবহার করিয়া দেখিল, যে উহাতে শীত দূর হয়। সেই জন্য সে সর্ব্বদাই কম্বলখানি গায়ে দিয়া রহিল। তা'র পর গ্রীষ্ম আসিল'। কম্বল গায়ে রাখিতে উত্তাপ বোধ হইতে লাগিল। সে বড়ই বিস্মিত হইল, "ভাবিল এমনটা হইল কেন? কম্বলটী ত' এতদিন বেশ ভাল লাগিত!" তার পর উত্তাপ আরও বৃদ্ধি হইলে, সে কম্বলটী দূরে ফেলিয়া দিয়া সুখী হইল; কিন্তু পুনরায় শীতাগমে কষ্ট পাইতে লাগিল। বর্ব্বরের ভিতর সর্ব্বাত্মিকা-বুদ্ধির বীজ একেবারে সুপ্ত ছিলনা; তাহা হইলে সে সর্ব্বাবস্থায় অনুভূত শীত-বাধক সুখটী রক্ষা করিবার জন্য, সর্ব্বদা কম্বলটী গায়ে দিয়া থাকিত না। কিন্তু সে কম্বলটীকে সূর্য্য ঋতু, প্রভৃতি অন্যান্য বস্তু হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেখিয়াছিল বলিয়াই, শীতকালের কম্বলের সুখকরত্ব ও গ্রীষ্ম-কালে কম্বলের দুঃখকরত্ব একত্রে জুড়িতে বা মিশাইতে পারিল না। বাহিরের 'সর্ব্বের' সহিত কম্বলটীকে মিশাইতে না পারিয়া, তাহার 'কম্বল তত্ত্ব' উপলব্ধি হইল না। পাঠক! বর্ব্বরের দশায় হাসিবেন না'। আমাদের দশাও তাহা হইতে বিশেষ পৃথক নহে; তাহা হইলে অত্যধিক আহার, বিহার, প্রভৃতি করিয়া মানব-জাতি শরীরকে রুগ্ন ও চিত্তকে ক্লিষ্ট করিত না। তাহা হইলে, আমরা ধন, পুত্র, মান প্রভৃতিকে সর্ব্বাবস্থায় সুখের কারক বলিয়া ভাবিতাম না। সব লোকে মরিতেছে দেখিয়াও, নিজের স্থূল শরীরের অমরত্ব জন্য প্রয়াস করিতাম না। 'সর্ব্ব' শব্দে বিশ্লিষ্টতার অতীত একত্বকেই বুঝায়। বহুত্ব বুদ্ধি একত্বে পরিসমাপ্ত হইলে, 'সর্ব্ব বুদ্ধি' সিদ্ধ হয়। ইহাই 'সর্ব্ব' শব্দের প্রকৃত অর্থ; 'বিশেষে' 'সর্ব্ব' নাই, 'বিশেষের' পরিসমাপ্তিতেই সর্ব্ব।

(৩) অহং বা জ্ঞ;—

আর এক প্রকার বা জাতীয় একত্ব বুদ্ধি আছে। উহা আমাদের 'অহং' জ্ঞানের একত্ব। উহা 'সর্ব্ব হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন নহে। অহং তত্ত্বের একত্ব 'সর্ব্ব'গ্রাসী; উহাতে 'বহু' ভাবগুলি, ধর্ম্ম, স্বভাব, জাতি প্রভৃতি জ্ঞানে মিশে না। স্থূলই হউক আর সূক্ষ্মই হউক, 'সর্ব্ব'

বস্তুই একই (আমিকে) জাগাইয়া দেয়। সুখই হউক আর দুঃখই হউক, একই অহং তত্ত্বে লীন হয়। বাহ্য বস্তু, ক্রিয়া, প্রভৃতি ভাবগুলি, তাহাদের বিশিষ্ট নাম, রূপ, ধর্ম্ম প্রভৃতি ত্যাগ করিয়া, নদী সকল যেমন সমুদ্রে মিশিয়া যায়, তদ্রূপ ভাবে 'আমিতে' মিশিয়া যায়। এই আমিই 'আত্মা'-শব্দ বাচ্য। উহা বিশেষ বা সামান্য এই উভয় ভাবেরই অতীত, ঘন, একরস পদার্থ। এইজন্য অহং বোধ বা জীবভাবকে এক বিশ্বাতিগ (Transcendant) 'পর' অভিব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়। ইহাই গীতার 'পরা প্রকৃতি'। যে ভাব লইয়াই তুমি খেলা কর না কেন, তোমার 'আমিটী' সেই ভাবগুলির উপরে বা পরাভাবে অবস্থিত। ভোক্তৃত্ব অবস্থায় নানা বস্তু উপভোগ করিয়াও, আমিটী স্বরূপ-ভাবে এক। সেইজন্য 'আমি' শব্দের কোন পরিমাণ নাই। সুখের সময় মনে হইল, 'আমি সুখী'। কিন্তু সুখ চলিয়া গেলেও, 'আমি' যাইবেনা। ধর্ম্মালোচনে মনে হইল 'আমি ধার্ম্মিক', কিন্তু ধর্ম্ম ভাবটী পড়িয়া গেলেও 'আমি' যাইবে না। স্থূল দৃশ্যের দ্রষ্টা হইয়া মনে হইল আমি স্থূল-দর্শী, কিন্তু স্থূল পড়িয়া গেলেও 'আমি' যাইবেনা। জাগ্রত স্বপ্ন-সুষুপ্তি-রূপ তিনটী অবস্থার দ্বারা 'আমির' পরিমাণ করিতে গিয়া দেখিব, যে আমি অপ্রমেয়। ইহাই শাস্ত্রের "জ্ঞ" শব্দের পরিভাষা। বাস্তবিক পক্ষে "জ্ঞ" ও "সর্ব্বে" ভেদ নাই; ইহা পরে বুঝা যাইবে। এই "জ্ঞ"ই দেহরথে অধিষ্ঠিত হইয়া ইন্দ্রিয়াদি অশ্বগণ কর্ত্তৃক আহৃত বোধ প্রথমে বাহ্যভাবে ও পরে আত্মস্বরূপে দর্শন করিয়া, সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপ হন। ইহাই এইবারের চিত্র পরিচয় *।

৪। মাত্রা।

'জ্ঞ" বা 'অহং" এর প্রকাশের তারতম্য লক্ষিত হয়। যেমন স্থূল অবস্থায় 'অহং' বিশ্লিষ্ট ও বস্তু হইতে সর্ব্বদা বিভিন্ন বলিয়া বোধ হয়, অথচ বস্তু না থাকিলে থাকেনা। এইরূপ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির 'অহং' তত্ত্বে অন্য প্রকার প্রবৃত্তি দৃষ্ট

* আত্মতত্ত্বের বিশেষতঃ উপনিষদের ভাষা চিত্রে অঙ্কিত করিতে যাওয়া বড় সহজ নহে। নৈপুণ্য ও অভিজ্ঞতার সহিত, শাস্ত্রবুদ্ধি একাধারে থাকা আবশ্যক। শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ম্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ে উভয় গুণের সদ্ভাব চিত্র দৃষ্টে প্রমাণিত হয়। তিনি দ্বারভাঙ্গাধিরাজের চিত্রকর ও যশীব-ধন্য। কিন্তু তিনি হিন্দু, সেই জন্য আমাদের অনুরোধে চিত্রের সাহায্যে শাস্ত্র মর্ম্ম প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন; সমস্ত হিন্দু সমাজের ধন্যবাদ তাঁহার প্রাপ্য। মূল চিত্রখানি 'পন্থা' আপিসে আছে। উহা ১০০৲ একশত টাকা মূল্যে বিক্রয় করিতে তিনি স্বীকৃত আছেন।

হয়। যে শক্তি বা ভাবের বশে একই অহং-তত্ত্ব বিভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হয়, ও এমন কি ভিন্ন ভিন্ন অহং-কেন্দ্র (centres) বলিয়া বোধ হয়; তাহাকে 'মাত্রা' বলে। প্রাচ্য জগতে পণ্ডিতগণ সম্মোহন-বিদ্যা (Hypnotism) অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাইয়াছেন যে, একই ব্যক্তির ভিতর তিনটী বিভিন্ন প্রকার অহং-বোধ বা অহং-কেন্দ্র ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া উঠে। নিরক্ষরা কৃষক রমণীকে সম্মোহন বিদ্যায় অভিভূত করিয়া, তাহার স্থূল অহং-বুদ্ধি সরাইয়া দেওয়া হইল। স্ত্রীলোকটী স্থূলাবস্থায় অতি ভাল মানুষ ও বোকা। কিন্তু সম্মোহিত অবস্থায় দেখা গেল, যে তাহার ভিতর আর একটী 'আমি' আসিয়াছে; উহা চঞ্চল, অথচ বুদ্ধিমতী ও রসিকা। ঐ 'আমি' স্ত্রীলোকটী হইতে আপনাকে পৃথক বলিয়া জানিত, এবং কৃষক রমণীকে 'মূর্খ স্ত্রীলোক' বলিয়া সম্বোধন করিত। তন্দ্রা আরও গাঢ় হইলে, তৃতীয় এক 'আমি কেন্দ্র' ফুটিয়া উঠিল। ঐ আমিটী স্থির ধার্ম্মিক এবং শান্ত, চঞ্চলও নহে—মূর্খও নহে। শুদ্ধ 'আমি বোধটী' চিরকালই এক; কিন্তু বিশিষ্ট ভাবে আমিকে দেখিলে, বিশিষ্ট শক্তি বা বোধের খেলায় 'আমি জ্ঞানটী' ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়, সেইজন্য একই জীব, এক জন্মে 'রাম' আর এক জন্মে 'শ্যাম' প্রভৃতি নানাভাবে স্থূল জগতে আবির্ভূত হয়। যেমন $(ক+খ)^২ = ক^২ + ২ক খ + খ^২$ $(ক খ)^৩ = ক^৩ + ৩ ক^২ খ + ৩ কখ^২ + খ^৩$ ভাবে পরিণত হয়, যেমন একই ব্যক্তিতে ভোজনেচ্ছা জাগ্রত হইলে ভোজন কার্য্যের অনুরূপ, স্থূল 'ভোক্তৃত্ব বুদ্ধি' প্রকটিত হইয়া, তদনুরূপ চর্ব্বনাদি ক্রিয়া-সকল প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ 'মাত্রা' শব্দে বিশিষ্ট অহং-তত্ত্বের ভিতর দিয়া ক্রিয়াশীল বিশিষ্ট জ্ঞান বা শক্তি প্রভৃতি ভাবকে বুঝায়; এইরূপ আংশিক বা ক্ষণিক মাত্রার সাহায্যে একই ব্রহ্ম হইতে অনন্ত জীবকুল উৎপন্ন হইয়াছে। মাত্রাকে ইংরাজীতে Index বা Exponent বলে।

৫। পাদ।

মাত্রা—কেন্দ্র-মূলক বা বীজ-স্থানীয়; পাদ অঙ্কুর ও বৃক্ষ স্থানীয়। মাত্রা 'অহং' ভাবের প্রকাশ, পাদ 'সর্ব্ব' ভাবের প্রকাশ। যেমন $(ক+খ)^৩ = ক^৩ + ৩ ক^২ খ + ৩ক খ^২ + খ^৩$ মাত্রায় অবস্থিত হইয়া, সর্ব্বাত্মিকা বা বহুত্ব ভাবে একটী পর্য্যায় (Series) বা সংস্থাতে পরিণত হয়। ঐ পর্য্যায়ের মধ্যে অভিব্যক্ত মূল ভাবটীর নাম 'পাদ'; এবং পর্য্যায়টীকেও পাদ বলা যায়। পাদ,—বহুত্ব বা সর্ব্বের

সাহায্যে একত্ব ভাব প্রকটিত ও এমন কি, প্রমাণিত করিয়া দেয় ; এবং তদ্বারা মাত্রাযুক্ত কেন্দ্রের ভাবটী প্রতিষ্ঠিত হয়। $(ক+খ)^{৩}$ যে কি, ও উহার গতি বা মূল্য (Value) কত, ইহা বিশিষ্ট প্রকাশের সাহায্যে, প্রকাশের ভাষায়,—$ক^{৩}+৩ক^{২}খ+৩খ^{২}ক+খ^{৩}$ এই পর্য্যায়টীর দ্বারা মানব বুদ্ধিতে প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সর্ব্ব' ভাবটীর যেরূপ অর্থ-বোধ হয়, পাদও সেইরূপ ভাবে তাহার অন্তর্নিহিত একত্বকে প্রকটিত করে।

পাঠকগণ! এই সংক্ষিপ্ত 'সঙ্কেত' Symbol গুলি স্মরণ রাখিলে প্রণব সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত উপদেশগুলি বুঝিবার বিশেষ সহায়তা হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলব্ধ-বেদান্ত।

১। কাম]

সহজ যোগ।

সাধ্য ও সিদ্ধ ভেদে যোগ' দ্বিবিধ। 'সাধ্য' যোগে কর্ম্ম-প্রবৃত্তি আছে, ক্রিয়া আছে, সুতরাং কামও আছে। 'সিদ্ধ' যোগে,—স্থির 'শাশ্বত' একত্বের বুদ্ধি বা সমই কারণ। স্বয়ং শ্রীভগবান্ বলিলেন ;

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ গীঃ ৬।৩।

ইষ্ট তত্ত্ব বা বস্তুর প্রতি আকর্ষণ কাম এবং ঐ কাম ভিন্ন সাধ্য যোগের আরম্ভ নাই। ভগবান বলিলেন।—"অভ্যাসযোগেন মাম ইচ্ছাপ্তুম্ ধনঞ্জয়।" অভ্যাস যোগের সাহায্যে আমিকে পাইবার ইচ্ছা কর।' সেই জন্য আমরা সাধ্য যোগকে জ্ঞানের কাম-ফলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করিলাম।

যোগ শাস্ত্রে যে সকল মৌলিক তথ্য আছে, তাহা না বুঝিলে যোগ যে মানবের 'সহ-জ' প্রবৃত্তি বা অবস্থা, তাহা বুঝা যায় না। যোগ স্বাভাবিক ও সহজ। কেবল কতকগুলি কৃত্রিম ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, লোকে 'মধুর হরিনামের ন্যায়, যোগকে বাঘ করিয়া তুলিয়াছে"। সেই জন্য আমরা প্রথমে যোগের মৌলিক তত্ত্বগুলির অনুশীলন করিব।

১। সাধ্য যোগ, প্রকৃতি-মূলক। স্ত্রী-পুরুষে প্রণয় হইলে তদ্দ্বারা আমরা কি বুঝি? প্রত্যেকের ভিতর দুইটী মৌলিক প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। একটিকে আমরা "আমি" জ্ঞান বা বোধ বলি; অপরটিকে স্বভাব, প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম-স্বরূপে অভিব্যক্ত 'প্রকৃতি' বলি। অহং-প্রবৃত্তিটী প্রকৃতি হইতে অতিগ "পর"; কারণ প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইলেও,—স্বভাব, প্রবৃত্তি ও কর্ম্ম বদলাইয়া গেলেও, 'আমি' জ্ঞানটী স্থির থাকে। আমি'র রূপ পরিবর্ত্তন হয় বটে; কিন্তু আমির বোধ সমানই থাকে। স্ত্রী-পুরুষের প্রণয় হইলে, উহাদের 'আমি' জ্ঞানটী মিশিয়া যায় না, ও এমন কি সকল সময়ে দুই জনের প্রকৃতিও এক হয় না; কেবল স্বভাব, প্রবৃত্তি ও কর্ম্মগুলি সমানুপাতি বা সমজাতীয় হয়। ঐ স্বভাবাদির ঐক্যই আমরা 'প্রেম যোগনামে' অভিহিত করি। এই স্থান হইতেই হিন্দু ও পাশ্চাত্য প্রেমের গতির বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। পাশ্চাত্য দম্পতীরা, হয় প্রত্যেকে প্রিয়তমের সহিত আপনাকে মিশাইতে চায়; না হয় ধর্ম্ম নীতি প্রভৃতি বাহ্য আদর্শের সাহায্যে প্রত্যেকের বহির্ম্মুখী ভাব, প্রবৃত্তি ও কর্ম্মগুলিকে নিয়মিত করিয়া, উভয়ের মধ্যে প্রকৃত্যাংশে ঐক্য স্থাপন করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু এই উভয়বিধ প্রকার বা বিধায় সম্পূর্ণ ঐক্য স্থাপিত হয় না। স্ত্রী ও পুরুষে প্রকৃতিগত ভেদ আছে; সুতরাং উভয়ের প্রকৃতিকে মিশাইতে গেলে, পুরুষকে স্ত্রী-ভাবাপন্ন এবং স্ত্রীকে পুরুষ-ভাবাপন্না হইতে হয়। কিন্তু কোন বস্তু তাহার প্রকৃতি বা স্বভাব ত্যাগ করিলে, তাহার বিশেষত্ব হারাইয়া যায়। এইত' গেল এক কথা। একটী 'আমি'কে অপর "আমি'তে মিশাইতে গেলে,—প্রকৃতির অতীত 'আমি'র ঐক্যে প্রতিষ্ঠা আবশ্যক। সুতরাং প্রেমিক দম্পতীর মধ্যে যোগফল কি 'আমি'-জ্ঞানে কি 'প্রকৃতি' জ্ঞানে, স্থির হয় না।

হিন্দু স্ত্রীর প্রেম অন্যরূপ; উহা পুরুষ-মূলক। হিন্দু স্ত্রী সর্ব্বপ্রথমে তাহার "আমি"টাকে, স্বামীর "আমি"র অংশ, প্রকাশ বা 'প্রকৃতি মাত্রা' বলিয়া অনুভব করেন; এবং আপনাকে স্বামীর অব্যক্ত 'আমি'র প্রকাশ বা অভিব্যক্তির ক্ষেত্র বলিয়া স্বীকার করিয়া ল'ন। বিবাহ-মন্ত্রে স্বামী স্ত্রীকে বলেন, যে "আমার যেরূপ হৃদয়, তোমার সেইরূপ হৃদয় হউক্।" 'হৃদয়' শব্দে, হৃদি+অয়ম্=হৃদয়ম্, হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ভগবান্‌কেই বুঝায়; কারণ ভগবানই

সর্ব্বহৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া খেলিতেছেন। স্বামীর হৃদয়ে অভিব্যক্ত পুরুষ বা ভগবানই স্ত্রীর লক্ষ্যরূপে স্থিরীকৃত হয়। এই জন্য হিন্দু-সতী স্বামীকে সাক্ষাৎ ভগবান রূপে দেখিতে চেষ্টা করেন। স্বামী ভিন্ন অন্য ইষ্ট বা গুরু, শ্রেয় বা প্রেয় তাহার থাকে না। যেমন "একটি পুরুষ যদি ১০ দিনে, একটি স্ত্রীলোক ২০ দিনে ও একটি বালক ৩০ দিনে একটি ক্ষেত্রের শস্য কাটিতে পারে, তাহা হইলে কত দিনে দুইটী পুরুষ, চারিটী স্ত্রীলোক, ও ছয়টী বালক ঐ শস্য কাটিতে পারিবে?"—এই অঙ্কের সমাধান করিতে হইলে 'পুরুষ' 'স্ত্রীলোক' ও বালক' নামীয় বিশিষ্ট বস্তুগুলিকে সামান্য শক্তিরূপে সমানুপাতি করিয়া দেখিতে হইবে,—তদ্রূপ বিশেষ, পরম বিশেষ ও বহুর মধ্যে এক বা সমরূপে অবস্থিত ভগবানের সহিত স্বামীর 'আমিকে' মিশাইয়া, ভগবদ্বুদ্ধিতে আপনার সর্ব্ব-প্রবৃত্তি, স্বভাব ও কর্ম্মগুলিকে সেই সমের অনুপাতি করিয়া, দেখে বলিয়াই, সাধ্বী হিন্দু রমণীর প্রেমের নিকট যমও পরাভূত হয়। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, রূপ চতুর্ব্বর্গ ফল সহজেই তাহার করায়ত্ত হয়। সর্ব্ব কার্য্যে, সর্ব্ব ভাবে, আপনার বিশিষ্ট "আমি"টীকে ত্যাগ করিয়া তাহার চিত্তের গতি স্বামীরূপে অভিব্যক্ত অথচ রূপাতীত 'পর' ভগবদ্রূপী 'আমির' দিকে ধাবিত হয়। সেই জন্য হিন্দুরমণী স্বামীর কামের পরিতৃপ্তি করিয়াও অকামতা-সিদ্ধা।— স্বামীর জন্য সর্ব্ব' কর্ম্মে সদা প্রবৃত্তা হইলেও, নিত্য বৈরাগ্যে অধিষ্ঠিতা; স্বামীর জন্য 'সর্ব্ব' বিষয়ে বুদ্ধি-প্রয়োগ করিয়াও'অমনী'বা মন বুদ্ধির অতীত হইয়া নিত্য, সমাধিস্থ হইতে পারেন। স্বামীর সর্ব্ব বা আত্মীয়গণের প্রতি 'আপন' বুদ্ধিতে সেবা করিয়া, সহজেই তাহার ভেদজ্ঞান পড়িয়া যায়। হিন্দু রমণীর ধর্ম্ম, শ্রীনারদ ঋষি ভাগবতে (৭।১২ শ্লোকে) এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন,—

"স্ত্রীণাঞ্চ পতিদেবানাং তচ্ছুশ্রূষানুকূলতা।
তদ্বন্ধুষনুবৃত্তিশ্চ নিত্যং তদ্ব্রতধারণম্॥ ২৫
সম্মার্জনোপলেপাভ্যাং গৃহমণ্ডনবর্ত্তনৈঃ।
স্বয়ঞ্চ মণ্ডিতা নিত্যং পরিমৃষ্ট পরিচ্ছদাঃ॥ ২৬
কামৈরুচ্চাবচৈঃ সাধ্বী প্রশ্রয়েণ দমেণ চ।
বাক্যৈঃ সত্যৈঃ প্রিয়ৈঃ প্রেম্না কালে কালে ভজেৎ পতিম॥ ২৭

যা পতিং হরিভাবেন ভজেৎ শ্রীরিব তৎপরা।
হর্য্যাত্মনা হরের্লোকে পত্যা শ্রীরিব মোদতে॥ ২৯।

স্ত্রীদিগের ধর্ম্ম এই—পতিকে দেবতা বুদ্ধিতে শুশ্রূষা ও সেবা; পতিকে অন্ন বা "আম" রূপে গ্রহণ করিয়া, তাঁহার অনুকূলতা বা তাঁহাতেই সর্ব্ব প্রবৃত্তির পরিসমাপ্তি করা,—নিত্য পতির ব্রত বা নিয়ম ধারণ বা পালন করা; এবং পতির বন্ধু বা আত্মীয়াদিতে পতির 'বিম্ব' বা ভাব দর্শন করিয়া 'আপন' বুদ্ধিতে তাঁহাদের সেবা ও অনুবৃত্তি। তা'র পর পতির স্বাস্থ্য ও নৈতিক সুখাদির জন্য গৃহাদি সম্মার্জ্জন, উপলেপন, গৃহাদিকে সুন্দর উপকরণাদি দ্বারা সজ্জিত করা ও স্বয়ং পতির তৃপ্তির জন্য মণ্ডিত থাকা। সাধ্বী রমণী কামের দ্বারা, প্রশ্রয় দম সত্য,বাক্য, প্রিয় ভাষণ, ও প্রেমের দ্বারা এবং উচ্চ ও নিম্ন জাতীয় সর্ব্ব পদার্থের দ্বারা স্বামীর ভজনা করিবেন। এইরূপে পতিকে 'পর' অয়ন বা গতি বলিয়া, তাঁহাতে তৎপরা হইয়া, হরি-বুদ্ধিতে লক্ষ্মীর ন্যায় পতির ভজনা করিয়া পতির আত্মস্বরূপ হরির সাহায্যে, পতি সহ হরিলোক প্রাপ্ত হন।

পাঠক,—বলিবেন 'স্বাধীন চিন্তার দিনে, স্বতন্ত্র অহং-বুদ্ধির কালে, সাফ্রাগিট-দিগের অভ্যুদয়ের সময়ে এ'সব কি কথা? যোগের ব্যাখ্যা করিতে "ধান ভানিতে শিবের গীত" কেন? তাহা বলিতেছি। পূর্ব্বে যোগের দুইটী অবস্থা বা পাদের কথা বলিয়াছি। একটী প্রকৃতি-গত; অপরটী পুরুষ-গত। প্রকৃতি-গত ভাবে, 'সর্ব্ব'-বৃত্তিগুলিকে বা সর্ব্ব-জ্ঞানকে নিরোধ করাই যোগ। 'যোগঃশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ।" এইটী প্রাকৃতিক-যোগের মূল-সূত্র। সর্ব্ব বস্তুর সহিত 'আমির' সম্বন্ধ স্থাপনের যে প্রবণতা আছে, তাহাকে "চিত্ত" বলে। ইংরাজীতে মায়ার্স সাহেব ইহাকেই Primitive receptivity of consciousness বা "অবিশেষ অথবা সর্ব্ব-বিশেষ গ্রহণাত্মিকা প্রবৃত্তি" নামে অভিহিত করিয়াছেন। স্থূল অভিমানী "অহং"এ এই প্রবৃত্তিরই বশে, স্থূলের 'সর্ব্ব' গ্রহণের জন্য লিপ্সা, সঙ্গ বা প্রবণতা উৎপন্ন হয়। সূক্ষ্মাভিমানী ও কারণাভিমানী জীবও, এইরূপে আপনাপন ক্ষেত্রে স্বজাতীয় 'সর্ব্ব' বস্তুর আভিমুখী হয়। এই প্রবণতাকে ব্যাস দেব প্রখ্যারূপ চিত্ত সত্ত্ব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রবণতা বা বোধ প্রবৃত্তি রজঃ বা ক্রীয়াশীলতা ও তমঃ বা বস্তু রূপে স্থিতি প্রবৃত্তির দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া আছে। সর্ব্ব গ্রহণাত্মিকা বোধকে সত্ত্ব; সর্ব্ব ক্রিয়া

-শীলতা গতিকে রজঃ ও 'সর্ব্ব' বস্তুরূপে স্থিতি-শীলতাকে তমঃ নামে অভিহিত করা হয়। তিনটীরই গতি আপাততঃ বহির্ম্মুখী বা 'বহুর' দিকে বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। পুরুষই প্রকৃতির স্বার্থ বা প্রকৃত উদ্দেশ্য ও বস্তু,—"পরার্থবুদ্ধিঃ সংহত্যকারিত্বাৎ স্বার্থঃ পুরুষঃ।" (২।২০ সূত্র ব্যাসভাষ্য) প্রকৃতির খেলা বাস্তবিক পক্ষে স্ব-স্বামী অথচ অতিগ বা 'পর' পুরুষের অভিমুখী বলিয়া, বুদ্ধি সেই 'পর' পুরুষের জন্যই বিক্ষিপ্ত-ভাবরাশিকে সংহনন করিয়া, পুরুষের জন্য সেই গুলিকে মিশাইয়া, পুরুষে স্থির হইবার চেষ্টা করিতেছে। তবে সর্ব্বের দিকে গতি কেন? "সর্ব্বার্থাধ্যবসায়কত্বাৎ", বুদ্ধি 'সর্ব্বার্থ-অধ্যবসায়' করেন বলিয়া, "বুদ্ধিরধ্যবসায়েন" ইতি "ভারতঃ।" অধ্যবসায় অর্থে অধিকৃত বিষয়ে পুরুষ-রূপে অবসান বা পরিসমাপ্ত হওয়া; যখন চৈতন্য সেই এক পুরুষকে দেখাইয়াই শান্ত হয়, তখনই ঐ সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তির নাম ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি।

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥" গীতা ২।৪১।

বুদ্ধির গতি, সেই এক পুরুষেই আপনার অন্ত বা সমাপ্তি দৃষ্টে স্থির হওয়া। তবে বহির্ম্মুখী ভাবে যখন পুরুষ হইতে অন্য বুদ্ধি জন্মে, তখন পুরুষের বিপরীত ভাবে অনন্ত বস্তু, ক্রিয়া প্রভৃতি রূপে চৈতন্যের বৃত্তি স্থির হয়। প্রথমটি পৌরুষেয় বুদ্ধি, দ্বিতীয়টী অপৌরুষেয় বা প্রাকৃতিক। পুরুষের অহং-কাম এক ভাবে না থাকিয়া, যখন দ্রব হইয়া বাহিত হয়, তাহাকে বুদ্ধি বলে, তা'ই ভারত বলেন,—"দ্রব্যমাত্রমভূৎ সত্ত্বং পুরুষস্যেতি নিশ্চয়ঃ।" পুরুষের দ্রব-ভাব বা পুরুষাশ্রিত ভাবকেই দ্রব্য বলে। প্রবৃত্তিমার্গে, বুদ্ধি ভেদাত্মক পুরুষ জ্ঞানে, পুরুষকে "সর্ব্ব" বিষয় রূপে পরিণত করিয়া দেখে; নিবৃত্তিমার্গে 'সর্ব্ব' অর্থ বা বিষয়ের শেষ বা অন্ত বলিয়া পুরুষকে দেখিয়া, বুদ্ধিও তাহাতে নিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ বহুরূপী বৃত্তভাব ত্যাগ করিয়া পুরুষ-রূপে স্থির হয়।

সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি-তত্ত্বের এই রহস্যের উপর সমস্ত যোগশাস্ত্র অধিষ্ঠিত। যাঁহারা এক পুরুষকে দেখিতে পান নাই, তাঁহাদের বুদ্ধি বিপরীত-ক্রমে খেলে। বাহ্যশূন্য আদ্যন্তহীন পরম ভাবকে না বুঝিতে পারিয়া, তাহা আমরা যেমন 'অনন্ত' শব্দে ইহা সংখ্যার অনন্ততা বলিয়া বুঝি, বুদ্ধিও তদ্রূপে এক পুরুষকে না পাইয়া, অথচ অস্পষ্ট ভাবে সেই পুরুষের জন্যই প্রবৃত্ত হইয়া, এক

স্থির, অনন্তকে, গতিশীল পরিণামী 'অনন্ত' বস্তুরূপে দেখিতে যায়। 'সর্ব্ব'ই আত্মা বা স্বামী অর্থাৎ স্বামীতেই 'সর্ব্ব' ভাবের পরিপূর্ণতা স্পষ্ট না বুঝিতে পারিয়া, 'সর্ব্ব'ই আত্মার বা স্বামীর এই বুদ্ধিতে, স্ত্রী-রূপা চিত্ত জগদ্বস্তু-রূপ অনন্ত সন্ততি, আত্মীয় ও কুটুম্ব রূপে, সেই স্বামীরই সেবায় ব্যাপৃত থাকে। ইহাতে স্বামী বুদ্ধিটী দৃঢ় ও রসাল হয়। পরে স্বামী-বুদ্ধি স্থির হইলে, 'সর্ব্ব' বস্তুতে পুরুষের "দ্রব" ভাব বা প্রেমের স্পর্শ অনুভব করিয়া, স্বামীকেই এক অথচ বহুর মধ্যে অদ্বিতীয় সত্য বলিয়া বুঝিয়া, খেলার ভাষায় অতৃপ্ত হইয়া, যখন সেই অক্ষর এক স্বামীতে পুনরায় স্থির হইয়া থাকিতে চায়, তখনই সর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া একে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধ্যান অর্থে এই অন্তর্ম্মুখী 'সর্ব্ব'নাশী চৈতন্য-রূপিণীর স্ব-স্বামি-রূপে ফিরিবার প্রবৃত্তি। ইহাই পাতঞ্জলের সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। 'সর্ব্ব'-ভাবে চিত্তে স্ব-স্বামি-সেবার নাম সম্প্রজ্ঞাত, এবং 'সর্ব্ব' বুদ্ধি-নিরোধে, দ্রষ্টা-স্বামীর স্বরূপে অবস্থিতির নাম অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি। তা'ই ভাগবত বলিলেন ;—

যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে॥ ভাঃ ১।৩।৩৪।

যখন চৈতন্যময়ী দেবী, 'সর্ব্বে'র ঈশ্বরী, সর্ব্বশক্তি-স্বরূপিণী সর্ব্ব-প্রকাশিকা ভাবে বিরক্ত হইয়া, পুনরায় একরূপে প্রতিষ্ঠিতা হয়েন, যখন 'সর্ব্বের' অভিমুখী কাম ও বাসনা হৃদয় হইতে দূর হয়,—

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ কঠ ২।১৪।

যখন বুদ্ধি দেবী, বিদ্যাভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া, এক 'আমিকেই' দেখিতে শিখিয়া আর 'সর্ব্ব ভাবে' চেষ্টা না করেন, তখনই পরমাগতি। "বুদ্ধিশ্চ ন বিচেষ্টতে তামাহুঃ পরমাং গতিম্।" (কঠ— ।১০) পতিব্রতা সাধ্বী চৈতন্যময়ী "সর্ব্ব" বস্তুতে 'সর্ব্ব'-ভাবে, সংসার বস্তুতে জীবাদিরূপে, স্বামীর একত্ব ও মহিমা প্রকট করিয়া, রাত্রিকালে বাহিরের 'সর্ব্ব' ত্যাগ করিয়া, স্বামীর বক্ষে উপরতা হইয়া নিদ্রিতা হইলেন ; ইহাই যোগরহস্য। তবে একটা কথা যেন আমরা না ভুলি, স্ত্রীতে স্বামী ভিন্ন 'অন্য' বুদ্ধি থাকিলে, পুত্রাদিকে স্বামী হইতে পৃথক্ ভাবে দেখিলে, সে রাত্রে [illegible] থাকিয়া হঠাৎ 'বক্কব' স্বপন দেখে : ইহা যোগ নহে, অবিদ্যা। ইহাই

ব্যাস-ভাষ্যে বর্ণিত আছে;—"প্রখ্যারূপং হি চিত্তসত্ত্বং রজস্তমোভ্যাং সংসৃষ্টং ঐশ্বর্য্য-বিষয়প্রিয়ং ভবতি। তদেব তমসানুবিদ্ধং অধর্ম্মাজ্ঞানাবৈরাগ্যানৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। তদেব প্রক্ষীণমোহাবরণং সর্ব্বতঃ প্রদ্যোতমানং অনুবিদ্ধং রজোমাত্রয়া ধর্ম্মজ্ঞান-বৈরাগ্যৈশ্বর্য্যোপগং ভবতি। অতো বিপরীতা বি বকখ্যাতিরিত্যতস্যাং বিরক্তং চিত্তং তামপি খ্যাতিং নিরুণদ্ধি; তদবস্থং সংস্কারোপগং ভবতি। স নির্ব্বীজসমাধিঃ ন তত্র কিঞ্চিৎ সম্প্রজ্ঞায়তে ইত্যসম্প্রজ্ঞাত দ্বিবিধঃ; স যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ ইতি। পা ১। সূ-২॥

প্রকাশ-শীলত্ব প্রবৃত্তি-শীলত্ব ও স্থিতি-শীলত্ব হেতু চিত্ত, সত্ত্ব রজঃ ও তম এই গুণত্রয়াত্মক। প্রখ্যারূপ চিত্ত, সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা সংসৃষ্ট হইলে, তাদৃশ চিত্তে ঐশ্বর্য্য ও বিষয় সকল প্রিয় হয়। সেই চিত্ত তমোগুণের দ্বারা অনুবিদ্ধ হইলে অধর্ম্ম, অজ্ঞান, অবৈরাগ্য ও অনৈশ্বর্য্য, এই সকল তামস-গুণোপগত হয়। প্রক্ষীণ মোহাবরণযুক্ত, সুতরাং গ্রহিতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য এই ত্রিবিধ বিষয়ের সর্ব্বতোরূপে universal প্রজ্ঞা সম্পন্ন হইলে, রজোমাত্রার দ্বারা অনুবিদ্ধ সেই চিত্তসত্ত্ব, ধর্ম্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও ঐশ্বর্য্য বিষয়ে উপগত হয়। যখন লেশমাত্র রজোগুণের মলও অপগত হয়, তখন চিত্ত স্বরূপ প্রতিষ্ঠ, কেবল মাত্র বুদ্ধি ও পুরুষের ভিন্নতা খ্যাতি বা জ্ঞানযুক্ত, ধর্ম্মমেঘ ধ্যানোপগত হয়। এই জন্য বিবেক বা বিশিষ্ট-জ্ঞানের খ্যাতিতেও বৈরাগ্যযুক্ত চিত্ত, সেই ভেদজ্ঞান নিরুদ্ধ করিয়া ফেলে। সেই অবস্থা সংস্কারোপগত। তাহাই নির্ব্বীজ সমাধি, তাহাতে কোনও প্রকারে সম্প্রজ্ঞান থাকে না বলিয়াই তাহার নাম অসম্প্রজ্ঞাত।

(ক্রমশঃ)

যোগানন্দ ভারতী।

কাম]

কামায় কামপতয়ে।

ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে আমি জগতের যাহা কিছু উপলব্ধি করিতে পারি, তাহাকেই 'আপনার' করিতে না পারিলে আমার তৃপ্তি হয় কৈ? একের

পর দুই, দুইয়ের পর তিন, তিনের পর চার, এইরূপে বহুর পর 'বহু' রূপে ও নামে জগৎ আমার সমক্ষে আত্মাতিরিক্ত খেলার জাল যতই বিন্যস্ত করিতে থাকে, আমি ততই তাহাকে বহির্ম্মুখী-ভাবে আয়ত্ত করিতে চাই। 'আমার' বাহিরে কিছুই রাখিতে ইচ্ছা হয় না কেন, বলিতে পার? আমার এই ইচ্ছার প্রবর্ত্তক কে? জগতের সহিত আমার এমন কি আত্মীয়তা বা আত্ম সম্বন্ধ যে,তাহাকে আমার 'আমিতে' পর্যাবসিত করিতে না পারিলে, আমার "আমিকে" তৃপ্ত করিতে পারি না। জগৎ আমাকে এই বহুত্বের ভিতর দিয়া কি দেখাইতেছে? এই বহুত্বের ভাষা কাহার ইঙ্গিত করিতেছে? জগতের এই বহুত্ব-সঙ্গীতের কি রাগিণী, ইহার লয় কোথায়, মান কোথায়, তাল কি? ইহার দেবতা, ঋষি, ছন্দই বা কি? জগৎ তাহার গীত গাউক, আমি তাহাতে আকৃষ্ট হই কেন? শব্দ, স্পর্শ, রূপ-রসাদির আকর্ষণে, আমি এত 'রস' পাই কেন? ইহারা আমার নিকট এত মাধুর্য্য লইয়া আসে কেন? আমিই বা তাহাতে মজি কেন? কেহ বলিতে পার, ইহাদের সহিত আমি কি সম্বন্ধে বদ্ধ? এবম্বিধ ভাবতরঙ্গে আকুল উদ্বেলিত নির্ব্বিঘ্ন হৃদয়ে মাকে ডাকিতে লাগিলাম; কাতরকণ্ঠে মাকে বলিতে লাগিলাম;—

"মা গো— ("আমি) দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু
(আমায়) দেহ গো দেখা'য়ে—বুঝা'য়ে।"
তোমার বাহিরের খেলা সমাপ্ত কোথায়
(আমার) দেহ মা ফুটা'য়ে হৃদয়ে।

বুঝি আমার কাতর ক্রন্দন জগৎ-জননীর চরণ-সমীপে পৌঁছিল; সন্তানের করুণ ক্রন্দনে সর্ব্বাত্মিকা জননীর স্নেহ-ধারা ক্ষরিত হইল। জননীর বাণী যেন জগতের মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। তখন জগৎ আর এক অভিনব মাধুরীময় মহিমামণ্ডিত মূর্ত্তি ধারণ করিল। এ মূর্ত্তির প্রকাশ আছে, দাহ নাই;—ভাষা আছে, ভৎর্সনা নাই; মিলন আছে, মোহনাই;—আকর্ষণ আছে, অবসাদ নাই। এই দিব্য জ্যোতির্ম্ময়ী-কামরূপিণী কামাখ্যা দেবী, অসংখ্য কলা পরিবৃতা বিশ্ব-বিমোহিনী জগন্ময়ী মূর্ত্তি; কাম ইহাঁর বীজ, সর্ব্বময়ী বিশ্বেশ্বরী স্বয়ং অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, পরমাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণতত্বই ইহার পরিসমাপ্তি। সেই দেবতা, জলদ-গম্ভীর মধুর নিঃস্বনে, প্রত্যেক বিশিষ্ট ভেদ-ভাবাপন্ন 'আমির' মর্ম্ম-স্থল স্পন্দিত করত

"এবৈকবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা" মহামন্ত্র ঘোষণা করিতে লাগিলেন। আরও ঘোষণা করিলেন "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় ! প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ। অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ। অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥"(—)"আমিই সর্ব্বভূতাশয়স্থিত; আমারই রস'রূপশব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধাদি আমারই রসে রসিত। আমিই সর্ব্বরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান; আমারই রস 'কাম' রূপে বিশিষ্টের নিকট ব্যক্ত; 'সর্ব্ব'স্বরূপে সচ্চিদানন্দজ্ঞানৈক-রসরূপে সকলের মধ্যে বিদ্যমান।

ভাই, কামকলা কামাত্মিকার ভাষা ত্যাগ করিয়া যাইও না। ইহাঁকে ত্যাগ করিলে প্রাণের ভিতর টান' অনুভব করিতে পারিবে না; টানে বা স্রোতে না পড়িলে, বিশিষ্ট অহঙ্কারের ত্রিপুটী ভাসিয়া যাইবে না; এই টানে পড়িয়াই বুঝি বিল্বমঙ্গল গাহিয়াছিলেন—

"টানে প্রাণ যায় রে ভেসে, কোথায় নে যায় কে জানে?"

তবে কামে এত অশান্তি কেন? শাস্ত্র কাম ত্যাগ করিতে বলেন কেন? এ সম্বন্ধে গত বৎসরের 'পন্থার' দুইটি কথা মনে পড়িল। গঙ্গার টান চিরকালই সাগরাভিমুখী,—শুধু সাগর নহে, অচল-প্রতিষ্ঠ সাগর। সেখানে মিশিলেই নদীগুলির প্রবাহের বিরাম হয়, তাহারা নাম-রূপ ত্যাগ করিয়া ডুবিয়া যায়। আর 'টানাটানি' থাকে না; তখন কে কাকে টানে বল। কিন্তু রামের শ্বশুরবাড়ী কোন্নগর; সে ভাবে টানাটি বুঝি কোন্নগরেই পরিসমাপ্ত। হরি বৈদ্যবাটীর হাটে আলু পটল বিক্রয় করে; সে জানে ঐ টানটি হাটেরই অভিমুখী। এইরূপে "যার মনে যা হৈছে সে তৈছে, শুনে।" কিন্তু একবার 'কাত্যায়নি, মহামায়ে মহাযোগীন্যধিশ্বরি। নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ" বলিয়া সেই গঙ্গার টানে 'আমিকে' ভাসাইয়া দিতে পারিলে, ঠেকিতে ঠেকিতে, একদিন স্রোতোময়ী কামরূপিণী আমাদিগকে কামের অন্ত দেখাইয়া দিবেন।

আমরা ত 'তাহা দেখিয়া বা সেই নন্দ-সুতকে পতিরূপে পাইতে চাহি না। তা'ই বিশিষ্ট 'আমি' অভিমানী জীব যতই বিশিষ্ট 'আমি' বোধের ভিতর দিয়া অপর বিশিষ্ট 'আমি' বা বস্তুকে উপভোগ করিতে চাহে বা তাহাকেই গম্যস্থান বলিয়া লক্ষিত করিতে প্রযত্নপর হয়, ততই তাহার বিশিষ্ট বস্তুর সহিত সঙ্গ হইতে থাকে। সঙ্গে বিশিষ্টতা ও বন্ধ আছে; টানেই নাই। এই টান ত' তাঁহারই। এই পুরাণী প্রবৃত্তি ত' তাঁহারই। বিশিষ্টের অন্তরালে থাকিয়া আর

কে টানিবে বল? "বিশিষ্ট আমির বিশিষ্ট ভোগে তৃপ্তি নাই" এই শিক্ষা দিবার জন্যই সর্ব্বময়ী সর্ব্বমঙ্গলা, কামরূপিণী 'আমি'কে কামের টানে বিশিষ্টের মাঝে ডুবাইয়া দেন। যাই সেই বিশিষ্টের উপভোগ হইয়া গেল, অমনি ঘোর অবসাদ, অতৃপ্তি ও গ্লানি আসিয়া পড়িল; সাধের কুসুম ফুটিতে না ফুটিতেই বাসি হইয়া ঝরিয়া পড়িল। তাই কবি গাহিয়াছেন,—

যাহা দেখি তাই, ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভুলাতে।
শেষে দেখি হায়, ভেঙ্গে সব যায়, ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে॥

সেই ভোগ অতি মুহূর্ত্ত-মাত্র-স্থায়ী হউক না কেন কিংবা অতি ক্ষণভঙ্গুর হইলেও, তথাপি বিশিষ্ট কামের উপভোগে একটু আনন্দ নাই কি? চঞ্চলা দামিনী-ছটা, জলদাবৃতা তামসী রজনীর ঘনীভূত অন্ধকারকেও নিমেষের তরে উজ্জ্বল আলোক ছটায় উদ্ভাসিত করিয়া যদিও লুকাইয়া যায়, তথাপি তাহাতে ক্ষণিকের জন্যও একটি অতুলনীয় জ্যোতির সত্তা সূচিত হয়। বহুদিন বিচ্ছিন্ন বান্ধবের দূরাগত কণ্ঠস্বর শ্রবণে বন্ধু-হৃদয়ে,—সূচীভেদ্য তামসী রজনীতে অঙ্কগত সুপ্ত শিশুর অঙ্গস্পর্শে জননী-হৃদয়ে,—কণ্ঠা-শ্লেষী প্রেমিকের চিত্র-দর্শনে প্রিয়-হৃদয়ে,—তৃষ্ণাক্রান্ত শুষ্ক রসনাগ্রে জল-গণ্ডূষাভিষেকে তৃষ্ণাতুরের হৃদয়ে ও মধু-লোলুপ ভ্রমর হৃদয়ে সদ্যস্ফুট কুসুমদামের পরিমল গন্ধে যে ভাবের তন্ত্রী স্পন্দিত করিয়া তোলে,—উহা যতই ক্ষণিক ও স্বল্পস্থায়ী হউক না কেন,—সকলেই অভ্রান্ত ভাবে, এক আনন্দ-ঘনরস-ভাণ্ডারের অস্তিত্বেরই ইঙ্গিত করে না কি? আবার সেই আনন্দ-রসের ক্ষণ-ভঙ্গপ্রবণতা গম্ভীর ভাবে বলিয়া দেয়, "বাপু, আনন্দের খনি ত' আছে; কিন্তু এই পথে নহে!! বিশিষ্ট 'আমি'র মোহাবরণে অবগুণ্ঠিত হইয়া আনন্দ-কন্দ সন্নিধানে পৌঁছিতে পারিবে না। যদি সেই আনন্দ-ঘনৈকরস আস্বাদন করিতে চাও, তবে একবার বিজ্ঞান দৃষ্টিতে ভূমাকে দেখ। দেখিবে, প্রত্যেক কাম্য বস্তুর অন্তরালে সর্ব্বরূপে এই ভূমারই আনন্দ বিরাজিত। কাহার সপ্ত-স্বরা মোহন বেণুর মধুর সঙ্গীতের তানে, কাহার অন্বেষণে চরাচর বিশ্ব আত্ম-সমর্পণ করিতে প্রধাবিত, কাহার মোহন বংশীর

প্রথম রন্ধ্রের গানে যমুনা উজান,
দ্বিতীয় রন্ধ্রের গানে গাভীগণ ধায়,
তৃতীয় রন্ধ্রের গানে ধেনু বৎস ফিরে,

চতুর্থ রন্ধ্রের গানে যোগী যোগ ছাড়ে।
পঞ্চম রন্ধ্রের গানে সতী ছাড়ে প'তি ;
ষষ্ঠ রন্ধ্রের গানে ভুলে পশুপতি ;
সপ্তম রন্ধ্রের গানে ভুলে ত্রিভুবন,
যে ধ্বনি শুনিয়া রাধা ভ্রমে বনে বন।

সপ্ত প্রকাশ-রন্ধ্র, দেহ, প্রাণ, কাম, মন, বুদ্ধি অহংকার ও আত্মার রন্ধ্র যুক্ত বংশীতে যাঁহার বিশ্ববিমোহন কাম-বীজ মধুর—মধুরতর নিক্বণে ধ্বনিত হইতেছে, সেই সর্ব্ব-স্বরূপ নন্দ-নন্দনের অভিমুখী হইয়া, সেই কাম-জনকের চরণ-তলে তোমার ক্ষুদ্র বিশিষ্ট 'আমি' কণার কামার্ঘ্য প্রদান কর, তখন শ্রীনন্দ-নন্দন তোমার কঠিন বিশিষ্ট 'আমি'কে আপনার আনন্দ-রসে দ্রব করিয়া 'বসুধারা'রূপে ব্যবহৃত করিবেন। তিনি ত' স্বয়ংই বলিয়াছেন—

"ন হি ময্যাপিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে."—

"যাহার বুদ্ধি বা অহং-প্রকাশিকা শক্তি, সর্ব্বস্বরূপ আমাতে অর্পিত, তাহার কাম আর কাম নহে ও বন্ধের কারণ হয় না। তোমরা কুমারী, কাত্যায়নী-প্রসাদ-লব্ধ সর্ব্বাত্মিকা-বুদ্ধিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, 'সর্ব্ব' কার্য্য ও 'সর্ব্ব' ভাব-রূপ বসন পরিত্যাগ করত নগ্ন দেহখানিকে বিপরীতবাহিনী পরাভিমুখী প্রেমযমুনার জলে অবগাহিত করিয়াছ। বাঞ্ছিত পরদেবতা তোমার সেই সর্ব্বভাবের আবরণ বা বসন আহরণ করত তোমাদিগকে স্বীয় আনন্দের সহিত যুক্ত করিতেছেন। অয়ি মুগ্ধে! তোমাদের আর বসনে কাজ কি? 'সর্ব্ব'-স্বরূপ পরমাত্মার পদতলে আপনাকে উৎসর্গ করিয়া দেও; কাম আর তোমাদের কিছু করিতে পারিবে না। তোমরা 'অকামঃ সর্ব্বকামো বা আত্মকাম উদারধীঃ' হইতে পারিয়াছ।"

ভাই, যতদিন তোমার বিশিষ্ট আমি আছে, ততদিন বস্তুর বিশিষ্ট সত্তাবোধও আছে। ভক্ত রামপ্রসাদ তা'ই গাহিয়াছিলেন, "আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল।" কিন্তু এ 'আমি' কি সহজে মরিতে চাহে? ইহাতে যে স্বয়ং মৃত্যুঞ্জয়ের সত্তা রহিয়াছে। "সর্ব্বে মাহেশ্বরীপ্রজা" (মনু) আর আমির' মরিবারই বা দরকার কি? এই ক্ষুদ্র "আমি প্রবাহটীকে" যদি মহৎ সর্ব্বময় মহা-সিন্ধুতে মিশাইয়া দিতে পার, তাহা হইলেই প্রকারান্তরে তোমার ক্ষুদ্রত্বের মরণ

হইল। তোমার ক্ষুদ্রত্ব আছে, ভোগে স্পৃহা আছে ; কাজেই ক্ষণভঙ্গুরই হউক, আর যাহাই হউক, ভোগে একটু তৃপ্তিও আছে। একটি কার্য্য কর, তোমার যে ভোগ বড় প্রিয়, তাহা প্রিয়জনকে কিছু দেও, কিছু বৃদ্ধকে দেও, কিছু শিশুকে দেও, কিছু দেবতাকে দেও, কিছু ব্রাহ্মণকে দেও, কিছু দরিদ্রকে দেও, কিছু পশুকে দেও ; কিছু কীট-পতঙ্গ, স্থাবর-জঙ্গমে বিতরণ করিয়া, অবশেষ মাত্র নিজে ভোগ কর। এইরূপে সর্ব্বগুহাশয়ে সর্ব্ব-স্বরূপে ক্রমে ক্রমে প্রিয় ভোগ-গুলি বিতরণ কর, সর্ব্বেশ্বর তাহা লইবেন ; তুমি তাহার দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হইতে থাকিবে। যে ভোগ সর্ব্বকে দিতে ও সর্ব্বের সহিত ভোগ করিতে পারা যায় না—সে ভোগেই পাপ ও সেই ভোগ তোমাকে বিশিষ্টতাবদ্ধ করিয়াই রাখিবে।

বলিতে পার, যে ভোগ সকলের সহিত অংশক্রমে ভোগ করা যায় না, এমন ভোগের জন্য যদি প্রবল প্রবণতা থাকে, তবে কি করিব ? অবশ্য তাহার একমাত্র উপায় সর্ব্বস্বরূপ বিশ্বেশ্বরের পদানত হইয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করত তাঁহার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা কর, তিনি অবশ্য উপায় করিবেন।

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মাম্ উপযান্তি তে। গীতা ১০।১০।

যে দেবী সর্ব্ব-ভূতে বুদ্ধিরূপে সংস্থিতা, তাঁহার শরণাপন্ন জনের কিছুরই জন্য ভাবিতে হয় না ; তিনিই তাহার সুব্যবস্থা করিয়াছেন। তবে তাঁহাতে অনন্যশরণ হওয়া চাই। তোমার স্ত্রীর প্রতি তোমার কামাসক্তি খুব প্রবল ; তুমি এই আসক্তি ত্যাগ করিতে পার না। ভগবানের বিচিত্র বিশ্বলীলা রক্ষার হেতুভূত শাস্ত্র-বিহিত ভাবে প্রজা-জনন কার্য্যে কামের ব্যবহার কর, কাম তখন সর্ব্বকাম বা অকাম হইয়া পড়িবে। "প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ" (গীতা)। তিনিই ত কন্দর্পভাবে প্রজনন কার্য্য করেন। তাঁহার কার্য্য তাঁহাকে দেও ; 'পরের' ধনে আপনার বলিয়া মোহে পতিত হইও না। আবার কামকে হেয় জ্ঞান করিয়া রোধ করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। জোর-জবরদস্তি করিয়া, ভস্মাবৃত বহ্নির মত ইহাকে না হয় ক্ষণকালের জন্য বদ্ধ রাখিতে পার, কিন্তু সর্ব্বকাম বা আত্ম-কাম হইতে না পারিলে 'অকাম' হইতে পারিবে না।"

"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।"

রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥ গীতা ২।৫

একমাত্র পর পুরুষের সাক্ষাৎকার ও অঙ্গ সঙ্গ ভিন্ন অকাম হইতে পারিবে না। সর্ব্ব-মঙ্গল-ময়ী প্রকৃতি সর্ব্বস্বরূপের দিকে বিশিষ্টকে যে আকর্ষণ করেন, সে বৃত্তিই বিশিষ্টের নিকট কামরূপে অভিব্যক্ত। এই প্রবণতা রস ময়; কারণ-ইহা যে রসময়ের আকর্ষণ-যন্ত্র! রস ভিন্ন টান নাই, টান ভিন্ন গতি নাই। যদি রসিক-শেখরের কাছে যাইতে চাহ, তবে রসের টানে গা ভাসাইয়া দিয়া তদভিমুখী হইয়া থাক; নানা প্রকার কূলে-উপকূলে ঠেকিয়া ঠুকিয়া, অবশেষে সেই রসময় মহাসিন্ধুতেই—চরম বিরাম লাভ, করিবে। গঞ্জিকা-সেবী মাঝির মত নৌকার লঙ্গর বা খোঁটা না তুলিয়াই সারা রাত্রি বাহিলেও ঘাটের তরী ঘাটেই থাকিবে। দেখিও, যেন ভোগাশক্তির খোঁটায় বাঁধা, বিশিষ্টতারূপ খুলিয়া দিতে ভুল করিও না; এবং যেন সেই সর্ব্বস্বরূপের দিকে মুখ ফিরাইতে ভুল না হয়। (ক্রমশঃ)

—— চিন্তা

অর্থ]

মহামায়ার খেলা।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

[পূর্ব্বাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত আভাষ;—হেমলতার স্বামী যোগাভ্যাস করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন! তাঁহার শরীর জনৈক সন্ন্যাসীর আদেশানুসারে গঙ্গাজলে প্রক্ষিপ্ত হয়। এদিকে নবকুমার নামক একটি যুবক হেমলতার প্রণয়াকৃষ্ট হইয়া, তাহার প্রতি বল প্রয়োগ করিতে উদ্যত হয়। হেমলতা ঘটনাচক্রে এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে উপস্থিত হইয়া, তৎকর্ত্তৃক যোগে ও জীবহিত-ব্রতে দীক্ষিত হইতেছেন। নবকুমার অনুতাপে জর্জ্জরিত হইয়া গঙ্গাবক্ষে ঝম্প প্রদান করেন।]

কিছুদিন পরে সন্ন্যাসী আসিয়া হেমলতার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভৈরবী বলিলেন যে, হেমলতা তাঁহার নিকটেই থাকিতে চায়। সন্ন্যাসী হেমলতার নিজ মুখে শুনিতে চাহিলেন; কিন্তু হেমলতা ইহার ঠিক সদুত্তর দিতে পারিল না। সন্ন্যাসী ধীরভাবে বলিলেন "হেমলতা! আমার উদ্দেশ্য

তুমি সম্পূর্ণ বুঝিয়াছ কি ? আমি অনেক দিন হইতে এই মহাব্রত গ্রহণ করিয়াছি। এই ঘোর দুর্দ্দিনে 'ধর্ম্ম'সংরক্ষার্থই নিয়ত ব্যাপৃত আছি। হিমালয়ের শুভ্র তুষাররাশির মধ্যে একটি আশ্রম স্থাপন করিয়া, তথায় অনেকগুলি শিষ্যের শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছি। কিন্তু কেবল পুরুষের শিক্ষা হইলেই চলিবে না; স্ত্রীশিক্ষারও প্রয়োজন। তুমি যদি এই কার্য্যের সহায়তা কর, তাহা হইলে তোমাকেও এই মন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। শিক্ষা ভিন্ন সে ব্রত উদ্‌যাপন হইবে না।"

হেমলতা। প্রভু! আমার ন্যায় ক্ষুদ্র রমণী দ্বারা কি এই মহাব্রতের সাধন হইতে পারে ?

সন্ন্যাসী। সে চিন্তা তোমার নাই, তুমি সেই পথে অগ্রসর হও। ভগবানের ইচ্ছারূপিণী মা আনন্দময়ীর কৃপায় তুমি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিবে। ভবিষ্যতের জন্য ভাবিও না।

হেমলতা। আমি সামান্যা স্ত্রীলোক। স্ত্রীলোকের দ্বারা এই মহাব্রত সম্পন্ন হইতে পারে না বলিয়া ভয় হয়।

সন্ন্যাসী। তুমি স্ত্রীলোক, স্ত্রীলোকই তোমার ক্ষেত্র হইবে। অবশ্য বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোকের শিক্ষার প্রতি হিন্দু-সমাজ প্রায় সম্পূর্ণ উদাসীন। শাস্ত্র তাহা বলে না। গার্গী, মৈত্রেয়ী আমাদেরই দেশের। যাঁহাদের নাম স্মরণ করিয়া প্রাতঃকালে শয্যা ত্যাগ করিতে হয়, আমাদের এই আর্য্যদেশেরই কুন্তী, দ্রৌপদীর কথা কে না জানে ? সীতা সাবিত্রীর মত আদর্শ আর কোথায় দেখিয়াছ ? স্ত্রী—পুরুষের সহধর্ম্মিণী; ইহাই হিন্দুদিগের আদর্শ। হিন্দুমতে সহধর্ম্মিণী স্বামীর অন্য রূপ মাত্র; সহধর্ম্মিণীর উন্নতি না হইলে, পুরুষও অসম্পূর্ণ থাকে।

হেমলতা। প্রভু! আমরা অশিক্ষিত, এ উচ্চ ধারণা আমাদের নাই। স্বামীর নিকট এই শিক্ষার আভাস পাইতাম; কত গল্প দ্বারা তিনি আমাকে এই উচ্চ আদর্শের কথা বলিতেন। কিন্তু আমি মহান্ একত্বের ভাবে স্থাপিত হইতে পারি নাই। উপদেশ করুন; এই মহাব্রত কিরূপে সাধিত হইবে।

সন্ন্যাসী। স্ত্রীলোকমাত্রই আনন্দময়ীর ছায়া। তা'ই তাহারা জননী, ভগিনী, গৃহিণীরূপে হৃদয়ের আনন্দ-রাশি দ্বারা গৃহ আনন্দে উজ্জ্বল ও মধুর

করিয়া রাখে। অতীত কালে তাহাদের প্রেমোজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি, সেই উদার ও সুনিপুণ পরহিত-ব্রত, গৃহীর সর্ব্ব প্রকার দীনতা, ক্লেশ, মলিনতা দূর করিয়া শান্তির স্থাপনা করিত। তাহাদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, প্রেম ও ভালবাসা, তাহাদিগকে দেবীরূপে সম্মানিত করিত; তাই শাস্ত্রকার বলিতেছেন,—

যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্রৈতাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।

তা'ই স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজন। স্ত্রী-শিক্ষা ভিন্ন প্রকৃত উন্নতি হইতে পারে না। স্ত্রীকে আশ্রয় করিয়াই সংসার-ধর্ম্ম। তা'ই আমি তোমাদিগকে সে আদর্শে শিক্ষা দিতে চাই, যাহাতে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ভারত আবার আপনার পূর্ব্ব-আদর্শ ফিরিয়া পায়।

হেমলতা। প্রভু! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। আপনি যাহা আদেশ করিবেন, আমি সাধ্যানুসারে তাহা পালন করিব।

সন্ন্যাসী। সকলি মায়ের ইচ্ছা। তুমি এখানে আসিবার পরই আমি বুঝিলাম যে, মা কৃপাকটাক্ষে চাহিয়াছেন। যাক্ সে সব কথা। এখন তোমার এই কথাটী জানা প্রয়োজন যে, সকল আশ্রমের মূলভিত্তি "ব্রহ্মচর্য্য"। ব্রহ্মচর্য্যই এই পথের প্রথম সোপান। কি সন্ন্যাসী, কি গৃহী, সকলকেই এই সোপানের উপর দিয়া যাইতে হইবে। তোমার এ বিষয়ে বিশেষ কষ্ট হইবে না; কারণ, তোমার চিত্ত পূর্ব্ব হইতেই সংযত ও সত্ত্ব-গুণাশ্রিত। তবুও তোমার সুবিধার জন্য কিঞ্চিৎ বলিয়া রাখা ভাল। তুমি প্রত্যহ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া ভৈরবীর আদেশ অনুসারে কার্য্য করিবে। প্রত্যহ পূতমনে পূজার পুষ্পাদি চয়ন করিবে, ফলমূল আহরণ করিবে, পূজান্তে দেবীর প্রসাদ গ্রহণ করিবে। অবশ্য সংসারের ব্যস্ততার মধ্য হইতে নীরব নির্জ্জন স্থানে বাস, প্রথমে একটু কঠোর বলিয়াই মনে হইবে। কিন্তু এই কঠোরতার ভিতর দিয়া সংযম অভ্যাস সুখসাধ্য। আজকাল সামান্য পরিশ্রমেই স্ত্রীগণ ঘর্ম্মাক্তকলেবরা হন; এমন কি, ভোজনে একটু বিলম্বও আর সহ্য হয় না। ইহা কি কম দুঃখের কথা? সেই অতীত-কালে রামচন্দ্র বন-গমনে উদ্যত হইলে, সতী-শিরোমণি সীতা দেবী তাঁহার অনুগমন করিলেন, বনবাসের অসীম কষ্ট, শীতাতপ তুচ্ছজ্ঞান করিলেন। সেই কনকভূষিতা রাজলক্ষ্মী বন-বাসিনী হইয়া ফলমূলে উদর পূরণ করিলেন;

তাহাতে অণুমাত্র বিচলিত হইলেন না। কণ্টক-কঙ্করময় পথ অতিক্রম করিয়া, কোমল চরণযুগল ক্ষত-বিক্ষত হইল; কিন্তু তাঁহার মুখে বিষাদের চিহ্নমাত্রও দৃষ্ট হইল না। যাঁহাদের হৃদয়ে এইরূপ প্রেম ও মনের বল,—তাঁহারাই যথার্থ দেবী। এই সব আদর্শ মনে রাখিও; দেখিবে, দুঃখ-দৈন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে; তৎপরিবর্ত্তে অভিনব আনন্দের অভিব্যক্তি হৃদয়ে দেখিতে পাইবে।

হেমলতা। তাঁহাদের সহিত আমাদের তুলনা?

সন্ন্যাসী। তুলনা কথা নয়;—সর্ব্বদা সেই আদর্শ চিন্তা করিতে করিতে চিত্তও ঠিক তদ্রূপ হইয়া যায়। শুন নাই যে, ভরত চিন্তা করিতে করিতে মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন? নন্দিকেশ্বর সর্ব্বদা সদাশিবের ধ্যান করিতে করিতে সেই দেহেই শিবরূপী হইয়াছিলেন।

হেমলতা। প্রভু! কঠোরতার জন্য ভাবি না। স্বামীর পরলোক-গমনের পর, কোন উৎসব বা আমোদ-প্রমোদে যোগদান করি নাই এবং করিতে ভালও লাগিত না। সেখানেও একটী বৃদ্ধা আমার সঙ্গিনী; এখানেও এই ভৈরবী দিদি; তাহার জন্য আমার কোন কষ্ট হয় না; তবে শ্বশুর মহাশয় লইতে পাঠাইয়াছেন; তাঁহার সেবার বোধ হয় ত্রুটি হইবে। (ক্রমশঃ)

অর্থ]

প্রত্যাবর্ত্তন।

(১)

হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার পৌত্র বালক নরেশকে সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। যখন বেড়াইতে যাইতেন, সঙ্গে লইতেন, স্নান ও আহার করিবার সময় সঙ্গে লইয়া স্নানাহার করিতেন; যখন পূজা বা চণ্ডীপাঠ করিতেন, তখন বালক নরেশ তাঁহার নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিত। চক্রবর্ত্তী মহাশয় পূজা করিতে করিতে তন্ময় হইয়া যাইতেন;—বালকও অবাক্ হইয়া স্থিরনেত্রে দেবী-দর্শন ও স্থিরকর্ণে পবিত্র মন্ত্রধ্বনি শ্রবণ করিয়া, কি এক ভাবে বিভোর হইয়া যাইত।

সাধারণের ধারণা বা দৃঢ় বিশ্বাস যে, চক্রবর্ত্তী মহাশয় একজন সাধক ;—তিনি যখন নিবিষ্টচিত্তে স্থিরাসনে পূজা করেন, তখন দেবী মূর্ত্তিমতী হয়েন। যদি কোন সঙ্কল্প করিয়া চণ্ডীপাঠ করেন, তাহা হইলে সে সঙ্কল্প নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়।

শুধু হরিশ চক্রবর্ত্তী কেন, শুনা যায়, চক্রবর্ত্তি-বংশই ভক্ত সাধকের বংশ ; এ বংশে আরও অনেক সাধক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দু'একজন না কি তন্ত্রে সিদ্ধ, এবং নবীন বয়সে কৌপীনধারী হইয়া গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়াছিলেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সুখের সংসার। ভক্ত সাধকের গৃহ ;—তজ্জন্য মার কৃপা স্থির ;—ধন ধান্যে পূর্ণ। কেবল একবার বিপদ্ আসিয়াছিল। সে যখন তাঁর লক্ষ্মী-স্বরূপিণী গৃহিণী ও একমাত্র যুবক পুত্র ভবেশের কাল পূর্ণ হয় ; কিন্তু এই দুই ঘটনাতেই কোনরূপ বিচলিত না হইয়া, তিনি বরং বীরের ন্যায়, জ্ঞানীর ন্যায় সানন্দে সব সহ্য করিয়াছিলেন।

ভবেশের দেহত্যাগের পর তিনি বধূমাতাকে ডাকিয়া বলিলেন, "বৌ-মা! শোক করিও না, সকলি মায়ের ইচ্ছা। মায়ের ইচ্ছাতেই সে আমার ঘরে আত্মজ-রূপে ও তোমার স্বামিরূপে আসিয়াছিল, আবার মায়ের ইচ্ছাতেই আনন্দ-ধামে চলিয়া গেল। ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বা দুঃখ করিবার কিছুই নাই ; সকলেরই এইরূপ। মার কৃপা কার' উপর আগে, কার' উপর পরে হয়। ভবেশ ভাগ্যবান্ ; তা'ই বোধ হয় সে আগেই চলিয়া গেল।

"যখন তোমাকে বিবাহ দিয়া ঘরে আনিয়াছিলাম, তখন ত' বড় আশাই করিয়াছিলাম যে, তোমাদের সুখে স্বচ্ছন্দে রাখিয়া, মার নাম করিতে করিতে ডঙ্কা বাজাইয়া চলিয়া যাইব। তা' হ'ল না ; সে তোমার ও আমার অদৃষ্ট। মানুষ কেবল নিজ সুখের জন্য আশা করে ; ভগবদিচ্ছা যে কি, তা' তো' বুঝিতে পারে না। আবার সংসারধর্ম্ম, দেবসেবা, অতিথিসেবা, এ সকলি তোমাকেই করিতে হইবে। তোমার এই শিশুপুত্র ;—এ পুত্র কালে বংশোজ্জ্বল করিবে ; ইহার দ্বারা চতুর্দ্দশ পুরুষের উদ্ধার হইবে, সুতরাং ইহাকে তোমাকেই লালন-পালন করিতে হইবে।"

জ্ঞানবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ শ্বশুর মহাশয়ের শক্তিতে ও উপদেশে নরেশের মা বৈধব্য-শোক হৃদয়ে লুকাইয়া কর্ত্তব্য পালনে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্রাদ্ধের দিন নিকটবর্ত্তী হইলে, পুরোহিত ডাকাইয়া, ব্রাহ্মণ শ্রাদ্ধের সমস্ত উদ্যোগ যথাশাস্ত্র,—সমস্ত খুটিনাটি ধরিয়া, বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। পুরোহিত ত' অবাক্। তাঁহারই

চক্ষু ছল ছল করিতেছিল ; বুঝিতে পারিলেন না যে, কোন্ শক্তি বা জ্ঞানবলে ব্রাহ্মণ এরূপ অবিচলিতচিত্ত।

ব্রাহ্মণ, যখন পুত্রের শ্রাদ্ধের জন্য গ্রামস্থ সকলকে নিমন্ত্রণ করিতে যাইলেন, তখন অনেকেই সরিয়া পড়িয়াছিল। যাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তাঁহারা বলিলেন "বলেন কি? ভবেশ আমাদের কালকের ছেলে ; তা'র শ্রাদ্ধে কি করিয়া—কোন্ মুখ লইয়া দাঁড়াইব?"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলিলেন, "কি করিবে বল ভাই ; সকলি মার ইচ্ছা। সে চলিয়া গিয়াছে বলিয়াই ত' তা'র প্রতি কর্ত্তব্য ফুরায় নাই। প্রেতকার্য্য দেব-কার্য্য প্রভৃতি ত' যথাশাস্ত্র করিতেই হইবে। যখন সে ছাড়িয়াই গেল, তখন ক্ষণিক চিত্ত-দৌর্ব্বল্যের জন্য তা'র শুভকার্য্য অসম্পূর্ণ রাখি কেন?" অশ্রু-ভারাক্রান্ত প্রতিবেশীরা নির্ব্বাক্।

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আর একবার একটু শোক লাগিয়াছিল। সে অনেক দিনের কথা ;—যখন তাঁর পুত্রসম কনিষ্ঠ সহোদর গোপাল গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করে। সে বারেও কিন্তু কষ্ট চাপিয়া, আনন্দ করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন, "যাক্ যাক্, সে সৌভাগ্যবান্। আত্মসুখের জন্য তা'র উন্নতিতে বাধা দিব না।"

পৌত্র নরেশকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন বলিয়া, লোকে বলিত যে, "ব্রাহ্মণের স্ত্রী-পুত্রের সমস্ত মায়া এই নাতিটীর উপর পড়িয়াছে।" কেহ কেহ অনুযোগ করিয়া বলিতেন, "চক্রবর্ত্তী মহাশয়! নরেশকে এত স্নেহ দিচ্ছেন যে, ওর লেখা-পড়া কিছুই হ'চ্ছে না! এরূপ ভাবে থাক্‌লে, আপনার অবর্ত্তমানে সে পথে বস্‌বে।"

চক্রবর্ত্তী মহাশয় হাসিয়া বলিতেন,—"হাঃ-হাঃ-হাঃ! বটে, বটে ; ভায়ারা যা' বলছ, তা' যুক্তিযুক্ত কথা বটে। তবে কি জান, সকলি মায়ের ইচ্ছা। তাঁ'র যদি কৃপা হয় ত' অসাধ্য সাধন হয়ে যাবে। তিনিই নরেশের জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া দিবেন। যিনি মহাবিদ্যা,—তাঁ'র কৃপায় কোন বিদ্যাই অসম্পূর্ণ থাকে না। মেহারের সর্ব্বানন্দ ঠাকুরের কথা জান ত'? যেদিন তাঁ'র উপর দেবীর দয়া হইল, সেই দিনই মূর্খ সর্ব্বানন্দ, সর্ব্ববিদ্যা-বিশারদ হইয়া উঠিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, নরেশেই বংশোজ্জ্বল হইবে ; উহার উপর মার কৃপা হইবে। এ ছেলের দ্বারা বংশের ও পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠা হইবে।"

প্রতিবেশীরা ব্রাহ্মণের এইরূপ স্থির বিশ্বাস দেখিয়া বেশী কিছু বলিতেন না। শান্তি দেবী নরেশের জননী, অনেক সময় পুত্রের লেখা পড়ায় অমনোযোগিতা ও দুরন্তপণার জন্য দুঃখিত ও বিরক্ত হইতেন। কিন্তু শ্বশুর মহাশয়ের ঐরূপ উক্তি শুনিয়া তাঁহার আনন্দ হইত; আহ্লাদে বুকখানা দশহাত বোধ করিতেন।

(২)

চক্রবর্ত্তী মহাশয় স্বর্গারোহণ করিলেন; সেই সঙ্গে শান্তি দেবীরও কপাল ভাঙ্গিল। পিতামহের অত্যধিক স্নেহে নরেশ একেই আবদারে অবাধ্য ও লেখা-পড়ায় অমনোযোগী ছিল, এখন তাঁহার অবর্ত্তমানে বিদ্যালয়ের সমস্ত সংস্রব ত্যাগ হইল। অভিভাবকহীন অর্থবান্ মূর্খ যুবকের যাহা হয়, তাহার তাহাই হইল; ধীরে ধীরে কুসঙ্গী জুটিল: সে ধীরে ধীরে পাপের পিচ্ছিল পথে নামিয়া, ক্রমে সম্পূর্ণরূপে নেশার দাস হইয়া পড়িল।

মধ্যে মধ্যে গভীর রাত্রে বাটী ফিরিতে আরম্ভ করিল। কখনও একদিন দুই দিন নিরুদ্দেশ; যখন ফিরিত, তখন হয় ত' সম্পূর্ণরূপে স্খলিত-পদ ও জড়িতবাক্। শান্তি দেবী শিরে করাঘাত করিয়া বলিতেন, "হায় মা! কি করিলে? বড় আশা করিয়াছিলাম, এ ছেলে বংশের মুখোজ্জ্বল হবে, না কোথায় কুলাঙ্গার হইল।" স্বর্গগত শ্বশুর মহাশয়ের কথা মনে পড়িত, আবার ভাবিতেন যে, বুঝি তাঁহারই দুরদৃষ্টক্রমে সেই বাক্‌সিদ্ধ ব্রাহ্মণের কথা বিফল হইল।

তিনি নিজের অদৃষ্টকেই ধিক্কার দিতেন; বুঝিতেন যে, তাঁহারই পোড়া কপালের ফলে এই বিড়ম্বনা। তাঁহারই জন্য শাশুড়ী শ্বশুর গেলেন; অকালে স্বামিবিয়োগ হইল—সোনার সংসার ছারখার হইল। শেষে 'শিবরাত্রির সলিতা'-স্বরূপ ছেলেটীও তাঁ'র দুরদৃষ্টক্রমে অধঃপাতে যাইল।

নরেশকে প্রকৃতিস্থ পাইলে বুঝাইতেন; অনুযোগ ও তিরস্কার করিতেন; তাঁ'র শ্বশুর-বংশের কথা—তাঁ'র পিতার কথা—শ্বশুর মহাশয়ের ভবিষ্যৎ বাক্য সকলি তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেন। কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী'—তখন তা'কে বিষে ধরিয়াছে, নেশায় খাইয়াছে; সে বিলাসিতার 'টোপ' গিলিয়া বসিয়াছে।

হতাশ হইয়া শান্তি দেবী ঠাকুর-দেবতার নিকট প্রত্যহ স্তব স্তুতি করিতেন; তাঁহাদের নিকট কাতর ভাবে কত কি 'মানসিক' করিতেন;—শ্বশুর মহাশয়কে

উদ্দেশ করিয়া বলিতেন, "ঠাকুর! দেখো, যেন আপনার মুখ রক্ষা হয়। আপনার ভবিষ্যদ্বাণী যেন সার্থক হয়; নরেশের যেন সুমতি হয়।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অর্থ]

আধ্যাত্মিক ঘটনা।*

১। 'সর্ব্বে'—'আমি'।

"চিত্ত-গত প্রবণতা-ভাবগুলি যাহাতে শেষ বা স্থির হয়, তাহাকে বিষয় বলে।

"মনে কর, তোমার অর্থলাভের কামনা হইতেছে; তুমি অর্থের উপকারিতা ও অর্থ-উপার্জ্জন সম্বন্ধে উপদেশগুলি সংগ্রহ করিয়া মনে মনে সেই বিষয়ের চিন্তা করিতে লাগিলে; এইরূপে "ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়া থাকিয়া, লাক্ টাকার স্বপন দেখিলে" তোমার চিত্ত-বৃত্তি স্থির হইবে কি? তুমি স্থূলভাবে আপনাকে সত্য বলিয়া ভাব; সেই জন্য 'স্থূল অর্থ' না পাইলে তোমার শান্তি হয় না। যে ভাবগুলি বিশিষ্ট-রূপে কোন বস্তুতে স্থির হয়, সেই গুলিকে আমরা বস্তু বা সত্য বলি; সেই জন্য ভাবের সম্যক্ স্থৈর্য্য বা পরিসমাপ্তিকে বিষয় বলে। বেদার্থের পরিপূরক বলিয়া 'পুরাণ' শাস্ত্রপাঠে বেদ ও উপনিষদে উক্ত ভাব ও অর্থগুলি, ইতিহাস ও গল্পের সাহায্যে আমাদের অনুভূত 'সর্ব্ব' বিষয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া ভিতরের অপরিস্ফুট আত্মার ভাবকে স্থির করে। 'সর্ব্ব' বা জগৎ-বস্তুতে বিন্যস্ত বস্তুনিচয়ের মধ্যেও সেই বিশিষ্ট বস্তুগুলির সাহায্যে চিত্তগত অপরিস্ফুট ভাবগুলি স্থির হয়। পুরাণ, ইতিহাসাদি ত্যাগ করিলে ধ্যেয় বস্তুর স্থৈর্য্য লাভ হয় না।

"অঙ্ক শাস্ত্রের জ্ঞান, বিশিষ্ট অঙ্ক না করিলে স্থির হয় না, ইহা যেমন সত্য, সেইরূপ ব্যাসদেবের চিত্ত শ্রীভগবানের লীলা বর্ণনা না করিয়া যে শান্তিলাভ করিতে পারে নাই, তাহাও সেইরূপ সত্য। এই জন্য ইতিহাস, গল্প ও পুরাণাদির

---

* এই নামে সাধক-জীবনে অনুভূত 'অর্থ'-ভাববিশিষ্ট সত্যমূলক ঘটনা বর্ণিত হইবে

আবশ্যকতা সাধক-জীবনেও দৃষ্ট হয়। আমার সর্ব্বভাব,—বাহ্য ভাবগুলির মধ্যে জ্ঞানরূপী 'আমি'কে না দেখিলে, 'সর্ব্ব' ও 'জ্ঞ' এক হইয়া, সর্ব্বজ্ঞ ভগবান্‌কে বুঝাইতে পারে না।

ভাগবত গীতায় অর্জ্জুন তাঁহার অবস্থানুরূপ ভাবগুলিকে যখন ভগবানের মহাবিভূতিদর্শনে শ্রীভগবানে পরিসমাপ্ত বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখনই শ্রীকৃষ্ণে সখা-বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, নিত্য শাশ্বত শ্রীভগবান্ বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেন। তা'ই বলি, 'সর্ব্ব' ভাবের মধ্যে 'একরূপে' পরিসমাপ্তি না দেখিলে, বস্তু বা অস্তিত্ববুদ্ধি স্থির হইবে না।"

"আপনার জীবনের ত' অনেক অদ্ভুত ঘটনা হইয়াছে? তদ্দ্বারা এই বিষয়টি বুঝাইয়া দিন।"

"আধ্যাত্মিক ঘটনাদি বলিতে কোন আপত্তি নাই। তবে ভেদভাবাপন্ন মানব ঐ গল্পের মধ্যে 'সর্ব্ব' ভাবের পরিসমাপ্তি বা অবসান যে শ্রীভগবানেই—তাহা না দেখিয়া স্বভাবজাত স্থূল ও মনুষ্য-বুদ্ধির মোহে ঐ ঘটনাবলীতে বিশিষ্ট ব্যক্তি, দল বা প্রক্রিয়ার মহিমা বুঝিলে ক্ষান্ত হয়। কিন্তু দার্শনিক ভাবে দেখিলে সর্ব্বপ্রকার অদ্ভুত ঘটনাবলীর মধ্যে একই নিয়ম বা তত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়। ভগবান যীশু কর্ত্তৃক বারখানি রুটি ও বারটি মৎস্যের দ্বারা অসংখ্য ব্যক্তির পরিতুষ্টিসাধন ও অর্দ্ধকণা অন্ন ও শাকমাত্র ভোজনে পূর্ণ-ব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তৃপ্তিতে 'সর্ব্ব'জগতের তৃপ্তি,—এই উভয় ব্যাপারই "সর্ব্বভাবের একরূপে পরিণতি" ও "একে সর্ব্বরূপের সমাপ্তি,"—এই একই তত্ত্ব বুঝা যায়। তোমাকে 'সর্ব্ব' ও 'আমির' অদ্ভুত সমন্বয়-মূলক একটি ঘটনা বলিব।

"সে আজ ১৫ বৎসরের কথা। সাধারণ ধর্ম্ম-জীবনে "আমি" ও 'আমার' এই তৃষ্ণার খেলা দেখিয়া, আমার মনে ধর্ম্মমাত্রেই অবিশ্বাস হয়। পরে নানা কারণে ও উপদেশগুলির মধ্যে একটি সর্ব্বাত্মিকা প্রবণতা বা ভাব বুঝিতে পারিয়া 'থিয়সফিষ্ট' সভায় ভুক্ত হই। তখনকার 'থিয়সফির' গতি অন্য প্রকার ছিল। তখন থিয়সফির পুস্তকপাঠে আমরা আপনাপন ধর্ম্মের মৌলিক ভাবগুলি দেখিতে পাইতাম ও তদ্দ্বারা স্বধর্ম্মে অনুরাগাদি বৃদ্ধি হইত। অথচ একটা সার্ব্বজনীন ভাবের উপলব্ধিতে অন্য ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষ-ভাব দূর হইত। তখন থিয়সফি নূতন ধর্ম্ম বা নূতন অবতারের স্থাপনার জন্য প্রবৃত্ত হইত না। সে যাহাই

হউক, সার্ব্বজনীন উপদেশগুলি জীবনে কিছু অভ্যাস করিতে করিতে সর্ব্ব-জীবের প্রতি প্রেমভাবের বিকাশ হইতে লাগিল; কিন্তু তাহাতেও শান্তি পাইলাম না। কারণ, ঐ 'সর্ব্ব' প্রবৃত্তিগুলি পরস্পর বিশিষ্ট। থিয়সফিষ্টদের পুস্তকে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে শ্রীভগবানের কথা না থাকাতে, মনস্তত্ত্ব কর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞান-গুলিতে চিত্তবৃত্তির স্থৈর্য্য হইল না। ভাবের অভিব্যক্তি হইল বটে; কিন্তু আমার 'আমিকে' না পাইয়া ভিতরে অস্থির হইয়া রহিলাম। পরে কিরূপে গুরু-লাভে পিপাসা কতক পরিমাণে প্রশমিত হইল,—সে অন্য কথা; তাহা অন্য দিন বলিব। গুরুলাভ করিয়াও প্রথমে গুরুতে বিশিষ্ট মনুষ্য-বুদ্ধি যাইল না। মহাপুরুষদের কার্য্য-কলাপ শ্রবণে তাঁহাদিগকে "অতি মানব" বলিয়াই বোধ হইত।

গুরুদেব চিত্তের ঐ প্রবৃত্তি বুঝিতে পারিয়া, তাঁহার নিজ ও অন্যান্য ব্যক্তি-গণের জীবনে গুরুলাভের ব্যাপার এবং 'মহাপুরুষগণ যে কি ক্ষুদ্র, কি মহৎ সকলেরি ভিতর খেলিতেছেন,' তাহা বুঝাইবার জন্য কত অদ্ভুত ঘটনাবলী বর্ণনা করিতেন। শুনিতে শুনিতে, চিত্তে তজ্জাতীয় বোধ সকল ফুটিতে লাগিল; জীবনে আশার সঞ্চার হইল। মহাপুরুষগণ মুক্ত ও ভেদাত্মক আশয় বা অহং-কারের অতীত। সুতরাং যে ব্যক্তি উদারবুদ্ধিতে 'সর্ব্ব' জীবের কল্যাণ-সাধনে তৎপর এবং জীবে কৃষ্ণাধিষ্ঠান দেখিতে ব্যগ্র,—যাহার ভিতর কেবল "আমি ও আমার" বুদ্ধি একটুকুও ঘুচিয়াছে, যিনি সর্ব্বপ্রকার জগতের অশান্তির মধ্যে জীবকে যথাসাধ্য সেবা করিতে প্রস্তুত, তিনি অরণ্যে বাস করিলেও তাঁহার ভিতর ঋষিগণের কৃপা-প্রকাশ ও ক্রিয়া হইতে পারে—তাহা অস্ফুটভাবে বুঝিতে পারিলাম। জগতের বহুত্ব ও দ্বন্দ্ব, জীবগণের জীবন-সংগ্রামের ভীষণ চিত্র-মধ্যেও কি এক অপূর্ব্ব 'মধু'ভাব প্রবাহিত ও অনুস্যূত হইল। ছিন্ন জীবগুলি ঐ 'মধু'ভাবে সম্মিলিত হইল। জীবনের ব্যাপার মধ্যে জন্ম কর্ম্ম প্রভৃতি বিশিষ্ট ভাবের ভিতর এক সমরস স্রোত বহিতে লাগিল। তখন—

"দূতী-মুখে শুনাইতে ঐরূপ রীত,—সব অঙ্গ পুলকিত চমকিত চিত।"

তখন দেখিলাম—

না জানি কতেক মধু 'গুরু' নামে আছে গো,

বদন ছাড়িতে নাহি পারে—

জপিতে জপিতে নাম　　　অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তাঁ'রে।

এইরূপে পূর্ব্বরাগের আকর্ষণে কিছুদিন কাটিয়া গেল। উহা জাগ্রত, না স্বপন, চেতনা কি মোহ, তাহা বলিতে পারি না। প্রাণে যেন সদাই কাহার কথা; হৃদয়ে যেন সদাই কাহার ভাষা; নয়নে যেন সদাই কাহার কি রূপ ফুটিয়াও যেন ফুটে না, জাগিয়াও যেন জাগে না। দুঃখ নাই; কি এক আনন্দে ডুবিয়া গেল। সুখ নাই; কি এক অভিনব আকর্ষণে মিশিয়া গেল। 'সর্ব্ব'ভাবে কাহার প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলাম।

একদিন প্রাতে গুরুদেবের নিকট বসিয়া, তাঁহার কথামৃত পানে বিভোর হইয়া আছি। যে ঘরে আমরা বসিয়া আছি, তাহার পার্শ্বে একটি সুসজ্জিত ইংরাজীভাবের বৈটকখানা বা 'হল'-ঘর।

সঙ্গী দুই জন ও গৃহস্বামী ন' বাবুও ছিলেন। সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ঋষিগণের ও ভগবানের করুণার কথায় নিবিষ্টচিত্ত। গুরুদেব মাঝে একবার হলঘরে কি করিয়া আসিলেন; কিছু পরে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "সুরেন! ঐ ঘরে মধ্যের টেবিলের উপর একখানি পুস্তক আছে; লইয়া আসিতে পার?" গুরুদেবের সেবা ও তাঁহার কার্য্য করিতে যে কত সুখ, তাহা সকলেই জানেন। লাফাইয়া উঠিয়া হল-ঘরে গেলাম।

"একি! একি!" বলিয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম। একটী চেয়ারের কোণে মস্তকে আঘাত লাগিয়া রক্তপাত হইতেছিল; কিন্তু কোন কষ্ট ত' অনুভব করি নাই;—কেবল মেঝেতে পড়িয়া গড়াগড়ি ও কি এক অননুভূত আনন্দের স্রোতে ভাসিয়া গেলাম। পাঠক! কি দেখিলাম, বলিতে পারেন? দেখিলাম,—একখানি ফটোগ্রাফ্। কিন্তু কি এক সৌম্য, সৌম্যাতিশেষ, চিদ্‌ঘন, আনন্দময় মূর্ত্তি।

নয়ন যুগল　　করয়ে শীতল
বড়ই রসের কূপ।

তখন সেই মূর্ত্তিখানি যেন পট হইতে সজীবভাবে উঠিয়া আসিল। তখন

চাহিতে তা' পানে,　পশিল পরাণে,
বুক বিদরিয়া মরি।

হৃদয়ে দেখিলাম—সেই মূর্ত্তি কি এক অভিনব ভাবের স্রোতে হৃদয়কে পূরিত করিয়া দিতেছেন। তখন,—

চাহিতে চাহিতে, নয়নেরি গতি,
হয়ে গেল অতি স্থির।
হৃদয়ের রসে— তিতিল নয়ন,
ক্ষীর-স্রোতে বহে ক্ষীর॥
জগতের 'সব'— 'অনন্ত' মাঝারে,
না দেখি মূরতি আর।
'সবেরি' মাঝেতে উথলিয়া উঠে—
উছল জোছনা-ভার॥
'সবেরি' হৃদয়ে— চিদানন্দ ঘন,
মূরতি উঠিল ভাতি।
'বহু' ভাবগুলি, হইল বিলোপ,—
'আমি'কে করিয়া সাথী॥
'সবেরি' মাঝারে 'সম-রস' রূপে,
হ'ল তাঁর ভাব স্ফূর্ত্তি।
যে দিকে নয়ন ফিরাই না কেন
দেখি সেই "দেব"-মূর্ত্তি।

যে সবের দিকে চাহিলাম, সে সবের স্থূল-রূপ যেন দ্রব হইয়া সেই মূর্ত্তিতেই পরিসমাপ্ত হইয়া স্থির হইল। আকাশের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম, আকাশ গ্রহ, তারা সকল জুড়িয়া—সেই বিশ্বাতীত মূর্ত্তিই বিরাজমান। ঘরের পাশের রাস্তার প্রত্যেক মানবে, বৃক্ষে, কাক-পক্ষীতে, 'আমাতে' 'তোমাতে' কেবল সেই মোহন সৌম্য মূর্ত্তিখানি ফুটিয়া উঠিতেছে। রাস্তার জনকোলাহল, পাখীর বুলি, সকলেই যেন আমাকে সেই পরম-প্রেমময় দেবাপী ঋষির—বাণীই ঘোষিত করিতে লাগিল; যেন সকলেই—বলিল, "দেখ, তোমারই জন্য কত দিন বসিয়া আছি"। মন অবলম্বনশূন্য আর সংকল্পাদি প্রবৃত্তি নাই। তরঙ্গ নাই; আছে কেবল সেই দেবের অভিমুখী এক গতি মাত্র। বুদ্ধি আর বাহ্য-রূপে অবসান না হইয়া, আর বাহ্য-বস্তুর স্থাপনা না করিয়া, কি এক—অখণ্ডমণ্ডলাকার

'সর্ব্ব'-স্বরূপ অথচ সর্ব্বাতিগ, ঘন, এক, চিন্ময় ভাবে স্থির হইল। সর্ব্বরূপে সেইরূপ উছলিয়া উঠিল; সর্ব্বরস তাঁ'র রসে এক হইল, সর্ব্ব তৃষ্ণা মিটিয়া গেল।

মরমে পৈঠল সেহ,　　হৃদয়ে লাগল দেহ,
শ্রবণে ভরিল সেই বাণী।

তখন তাঁহার মধুর স্বরে কাম সাফল্যভাবে কৃতকৃত্য হইল। বিশ্বের গতি নাই, আছে স্থৈর্য্য,—　　"পবন রহিয়া শুনে
যমুনার বহয়ে উজান।
না চলে রবির রথ—　　বাজী নাহি পায় পথ,
দরবয়ে দারু পাষাণ॥"

তা'রপর দেখি, পার্শ্বে গুরুদেব। জলদগম্ভীরস্বরে বলিলেন, "ইনিই আজকাল কৌথুমী নামে ইঙ্গিত হন। ইনি সমরূপী সামবেদের শাখার অধিষ্ঠাতা, শ্রীভগবানের সমরূপ মন্ত্রের ঋষি। সর্ব্বস্বরূপে উহাঁকে দেখিলে ত, এখন নিরীক্ষণ করিয়া দেখ।"

না জানি, মন প্রাণে কি অঞ্জন লেপন করিলেন; দেখি, পরমগুরুদেবের হৃদয়ে, স্ত্রী কি পুরুষ ভাল বুঝিলাম না,—কি এক—

চিকন কালা　　গলায় মালা,
বাজন নূপুর পায়।
চূড়ার ফুলে　　ভ্রমর বুলে
তেরচ নয়ানে চায়॥

দেখি—　　কামের কামান জিনি　　ভুরুর ভঙ্গিমা লো,
হিঙ্গুলে বেড়িয়া দুটী আঁখি।
কালিয়ার নয়ান্-বাণ　　মরমে হানিল গো,
'কালাময় আমি' এক দেখি॥

দেখি—　　পীত বসন জনু—　　বিজুরী বিরাজিত
সজল-জলদ-রুচি দেহ।
মৃদু মৃদু ভাবি　　হাসি উপজায়ল
দারুণ মনসিজ-আগি॥

দেখিলাম— সে জলদ-রূপ-ভায়,— জগত সমাপ্ত হয়,
অম্বুরূপে ভাতে 'সব' তায়।
শুনিলাম— "সর্ব্ব"-ভাবে, ভাবে যেই, গুরুরূপে পায় সেই;
বিদ্যা 'ভাবে' বহু হয় লয়।
'বিদ্যা' মাঝে দেখি 'ওঁমে'— পরিপূর্ণ সর্ব্ব-কায়,
কামরূপে নাহি বদ্ধ হয়॥
'সর্ব্ব'-হৃদে অধিষ্ঠান 'সর্ব্ব-রস' 'সর্ব্ব-প্রাণ'
'আমি'-রূপ প্রবৃত্তি 'আমার'।
সেই "কাল," মম রূপ— বুঝিয়া মোর স্বরূপ
জীবভাব নাহি থাকে আর॥"

খেলা বন্ধ হইল। 'জগৎ'-ভাব পুনরায় ফুটিয়া উঠিল। আবার ভেদাত্মক 'আমি' কথা কহিতে লাগিল। কিন্তু তদবধি আর ক্ষুদ্র 'আমিতে' স্থির হইতে পারিতেছি না। মন, বুদ্ধি, আর সেই পর-পুরুষ ভিন্ন অন্য কোন ভাবে শান্ত হইতে পারে না। দেখি, কত জীবনে হয়! তবে ইহা জানি যে, একদিন হইবেই হইবে।

গুরুদেব বলিলেন—'আমিকে' 'সর্ব্বে' দেখিলে; ভাবটী হারাইও না; সময়ে সর্ব্বকে সেই 'আমিতে' দেখিতে পাইবে।"

ভরদ্বাজস্য।

শ্যাম-সুন্দর রূপ।

(১)

এই কি গো তব শ্যাম-সুন্দর রূপ?
সুনীল আকাশ-কোলে, শ্যামলা ধরণীতলে,
তটিনীর ছল-ছলে উছলে অরূপ।
যুগে যুগে ভক্ত-হিয়া ওই রূপ নিরখিয়া,
রহিয়াছে বুঝি আহা, ভক্তি-রস-কূপ!

(২)

এই কি গো তব শ্যাম-সুন্দর কান্তি?
নিবিড় নীরদ-গায়, ফুল্ল তরু-লতিকায়,
ভুবনমোহন যার উছলে বিভাতি;
চৌদিক্ হইতে যেন, করিতেছে আলিঙ্গন,
এ বিশ্বে বিরাট এক মহাশ্যাম শক্তি!

(৩)

এই কি গো তব শ্যাম-সুন্দর চিত্র ?
এ মম মরমে পশি, দেখালে গো প্রেমশশী,
যে মধুর শ্যামরূপ অতুল বিচিত্র !
তা'ই আজি অবিরাম, ঢালে সুধা শ্যাম-নাম,
কালি ছিল স্বপ্ন যাহা,—কুহেলিকা মাত্র !

(৪)

এই কি গো তব শ্যাম-সুন্দর ছবি ?
আজি নাথ বুঝিলাম, চিরনয়নাভিরাম,
তব শ্যামরূপে হরি ! ঢেকেছে পৃথিবী
আজন্ম শুনিনু আমি, ওই শ্যাম-নাম স্বামী,
(একটি দিনের তরে, আকুল করেনি মোরে,)
আজি নাচে তার মাঝে, কোটী শশী রবি,
শ্যাম নামে বেজে উঠে দিবের দুন্দুভি !

(৫)

কত রূপে রাজ, শ্যাম-সুন্দর হরি !
একরূপ বহু করি, লীলাময় আছ ভরি,
জল স্থল নভস্তল আহা, মরি মরি !
কত রূপ নব নব, দেখাইলে অভিনব,
আজ সখে ! নবতর স্বরূপলহরী,
এস, এস, ধ্যান করি, নবীন মাধুরী !

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

সমালোচনা।

গীতগোবিন্দ।—শ্রীসতীশচন্দ্র রায় এম-এ-প্রণীত। শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দের কথা কে না জানে? যে গীতগোবিন্দের পদাবলী লইয়া যতীন্দ্র-প্রবর শ্রীচৈতন্যদেব দুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত লইয়া আলোচনা করিতেন, যাহার কবিত্ব, মাধুর্য্য ভাব-জগতে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে, সেই গীতগোবিন্দ অনেক আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিকট কুরুচিকর আখ্যায় আখ্যায়িত হইয়াছে, এমন কি, ৺বঙ্কিম বাবুও ইহাকে মদন-মহোৎসব আখ্যা দিয়াছেন ; কেহ বা ইহাতে "গীত আছে ; গোবিন্দ নাই" বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সেই গীত-গোবিন্দ যে প্রকৃতই শ্রীগোবিন্দের গীত,—ভাবুকের হৃদয় যে ইহা পাঠ করিতে করিতে গভীর ভাবভরে মোহিত হইতে পারে, চিত্তে যে প্রকৃতই সাত্ত্বিক প্রেমরস উথলিয়া উঠিতে পারে, ইহা সতীশ বাবু স্পষ্টরূপে দেখাইয়াছেন। শ্রীভগবানের লীলাব্যঞ্জক এই গীতগুলির আন্তরিক পদ্যানুবাদ অতি সুন্দর হইয়াছে। গ্রন্থকার ছন্দের অনুরোধে মূলের প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করেন নাই,

মূলের উপর স্বাধীনতা না লইয়া, এরূপ পদ্যানুবাদ আমরা এই প্রথম দেখিলাম। ইহাতে এক পৃষ্ঠায় লাল অক্ষরে মূল ও পূজারী গোস্বামীর টীকা; অপর পৃষ্ঠায় পদ্যানুবাদ ও মন্তব্যাদি দৃষ্ট হয়। জয়দেবের জীবন-বৃত্তান্ত, ছন্দাদির আলোচনাও যথেষ্ট ভাবে করিয়াছেন। এইরূপ পুস্তক হিন্দুদিগের প্রত্যেকেরই পাঠ করা কর্ত্তব্য। পুস্তকে কয়খানি ছবিও আছে, প্রায় ৪০০ পৃষ্ঠা, উৎকৃষ্ট বাঁধাই, মূল্য ২৲ টাকা।

আর্য্যদর্পণ।—মাসিক পত্রিকা। শ্রীগৌরাঙ্গ অনাথ-নিকেতন (আসাম) হইতে প্রকাশিত। ধর্ম্মবিষয়ক মাসিক পত্রিকার যেরূপ অভাব, তাহাতে এরূপ মাসিক পত্রিকার প্রচার হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা কয়েক সংখ্যা পাঠ করিলাম; 'মুক্তির স্বরূপ-লক্ষণ ও তল্লাভোপায়," 'পাগলের খেয়াল"ও বৈষ্ণব-তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি উল্লেখযোগ্য। সব প্রবন্ধগুলিই "গোঁড়ামী"-শূন্য এবং শ্রীভগবানের মহিমাব্যঞ্জক ও মৌলিক ও সরস ভগবদ্ভাবে অনুপ্রাণিত। আমরা পত্রিকা-খানির বহুলপ্রচার কামনা করি।

সম্মোহন-বিদ্যা।—A Complete Course in Hypnotism. ডি, এন, রায় প্রণীত। White Lotus Publishing Societyর নিকট পাওয়া যায়। মূল্য কাপড়ে বাঁধা ৩৲ তিন টাকা ও কাগজে বাঁধা ২॥০ দুই টাকা আট আনা। বৈজ্ঞানিক ভাবে এই বিদ্যার আলোচনাই লেখকের উদ্দেশ্য। তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের গবেষণার ফল স্বাধীন ভাবে বিচার করিয়া, এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যে বিদ্যায় বা আলোচনায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সার্ব্বজনীনতা বা পরার্থমুখীর প্রবণতা নাই, তদ্দ্বারা মানবের কল্যাণ সাধিত হয় না। 'বাঁদর নাচন' সম্মোহন-বিদ্যার গতি নহে। লেখক সেই জন্য ঐ বিদ্যার তত্ত্বগুলিকে বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। প্রাচ্য মনস্তত্ত্ব ও তৎপ্রকাশক যোগদর্শনের আশ্রয় গ্রহণ করিলে, পুস্তকখানি আমাদের বড় ভাল লাগিত। মনস্তত্ত্ব ও তাহার রহস্যগুলিকে বাহির হইতে দেখিবার জন্য পুস্তকখানি ব্যবহৃত হইলে, এবং তৎসাহায্যে মানবের উচ্চতর ভাব সকল বুঝিতে পারিলে, সকলের মঙ্গল হইবে। এই ভাবে ভগবানের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া, পুস্তকে সন্নিবিষ্ট ভাবগুলি পাঠকগণকে ব্যবহার করিতে বলি।

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

২য় ভাগ। জ্যৈষ্ঠ, ১৩২০। ২য় সংখ্যা।

মোক্ষ] আমাদের সেবা-প্রণালী।

সর্ব্বাবস্থাতেই শ্রীভগবান্ আর্য্যগণের একমাত্র বেদ্য; কিন্তু প্রকৃতি ও গুণের ফলে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবান্‌কে বুঝিতে পারা যায় না বলিয়াই, শাস্ত্র তাঁহাকে চারিটী পর্য্যায় (Steps) রূপে আদর্শ করিয়া দিতেছেন।

অদ্বয়-জ্ঞানই শ্রীভগবানের স্বরূপ। "অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন," ইহা ভগবান্ চৈতন্যদেবের উক্তি। ভাগবত বলিলেন, "তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ং; ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।" এই অদ্বয় জ্ঞানই 'তত্ত্ব'—তৎ পদার্থের স্বরূপ। এই জ্ঞান ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্‌রূপে লক্ষিত হয়।

জ্ঞান কর্ম্ম ভক্তি আদি সাধনের বশে,
ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান্, স্বরূপে প্রকাশে।

জ্ঞানের ফল চারিটী—"চতুর্ব্বর্গফলং জ্ঞানং কালাবস্থা চতুর্যুগাঃ।" (রঘু ১০ম) পুরুষাভিমুখী এক ও অবিভাজ্য চৈতন্য-স্রোতকে জ্ঞান বলে। জ্ঞানে ভেদ নাই; জ্ঞান এক। জ্ঞানে—কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া প্রভৃতি ভাবগুলি মিশিয়া গিয়া, একরসে পরিণত হয়। সেইজন্য জ্ঞানে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নাই বলিয়া,

জ্ঞান অহৈতুক অর্থাৎ হেতুশূন্য। তবে ভেদভাবে অবস্থিত, প্রাকৃতিক প্রবণতা-পূর্ণ, জীবের জ্ঞান ঐক্যচ্যুত হইয়া তিনরূপে প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রের শ্লোক লইয়া ভাবিতে লাগিলাম; যতক্ষণ বিশিষ্ট অহং-বুদ্ধি থাকে, যতক্ষণ বিশিষ্ট শাস্ত্র-বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। জ্ঞানের মুহূর্ত্তে (Moment) বাহ্য-ভাব, অহং-দ্রষ্টা-ভাব ও পর্য্যায়-বুদ্ধি পড়িয়া যায়। ঐ মুহূর্ত্তের জন্য একটী ঘন চিন্ময়,—আনন্দময়, কি এক ভাব ফুটিয়া উঠে। ইহাই প্রকৃত জ্ঞান ও ইহাই বিদ্যা। "বিদ্যাত্মনি ভিদা বাধঃ"। ইহাই অপবর্গ বা মোক্ষ; ইহাতে প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির লেশ নাই। সেই জন্য জ্ঞান ও আনন্দের মুহূর্ত্তে মানব—নিষ্ক্রিয়, নিস্পৃহ, অমনা, স্তিমিতেন্দ্রিয় ও স্থির ঘনভাব ধারণ করে। এই অদ্বয় জ্ঞান বা মোক্ষরূপ সত্তাই শ্রীভগবান্, ইহাই প্রকৃত ভক্তি। "নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জনার্দ্দন!" (স্কন্দ পুঃ) ইহাই প্রথম ফল। সুতরাং 'মোক্ষ' শব্দে আমরা ভগবত্তত্ত্ব বা ভগবানের স্বরূপ-প্রকাশিকা সর্ব্বপ্রকার প্রবণতাই বুঝিব। ইহাই পরাবিদ্যা, যাহা দ্বারা অক্ষর অবিনাশী সচ্চিদানন্দ-ঘন পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। "যদক্ষরং অধিগম্যতে।"

"পর"-পুরুষ-বুদ্ধি,—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ"-বুদ্ধি চৈতন্যের বা চৈতন্যময়ীর মৌলিক প্রবৃত্তি। সেই জন্য, দেবী—ব্রহ্মময়ী সনাতনী।

যতক্ষণ বিশিষ্ট অহং বুদ্ধি থাকে, ততক্ষণ চৈতন্যময়ী সর্ব্বাত্মিকারূপে খেলেন। সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে, প্রকৃতি ও গুণ সকল দেখা আবশ্যক; তাহা হইলে ভিন্ন পুরুষ বা অহং-বুদ্ধিটী খসিয়া যায়। মানব "আমিতে" ও বস্তুতে পার্থক্য দর্শন করে; বস্তু ও ক্রিয়ার মধ্যে ভেদ দেখে। তাহাকে অভেদ ভাব শিখাইতে গেলে, বুঝাইতে হইবে যে, বিশিষ্ট "আমি" জ্ঞানটী বাস্তবিক পক্ষে দ্রব্য ও ক্রিয়া জ্ঞান হইতে ছিন্ন করিয়া দেখা যায় না। সেইজন্য ব্যাসদেব বলিলেন,—"দৃশিরূপস্য পুরুষস্য কর্ম্মরূপতামাপন্নং দৃশ্যমিতি তদর্থমেব দৃশ্যস্যাত্মা স্বরূপং" (ব্যাস-ভাষ্য—পাঃ।১।২।১)। দৃশ্য, শুদ্ধ দ্রষ্টা পুরুষের কর্ম্মরূপতা প্রাপ্তি স্বরূপ। অ = ক + খ + গ + ... এই পর্য্যায়ে. 'অ' এক, 'পর' ও প্রকাশাদি গতি বা ভাবরহিত, নিত্যশুদ্ধ। কারণ, একজন পর্য্যায়ের দুইটীমাত্র পদ (Term) বুঝিতে পারিয়াছেন, ক + খ = অ; আর একজন তিনটী পদ বুঝিয়াছেন, তাহার পক্ষে ক + খ + গ = অ। এইরূপ অপরাবিদ্যার সাধনের উৎকর্ষের সহিত, মানব ব্যক্ত গতিশীল

পর্য্যায়ের অল্পাধিক যে কয়টী পদ বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা সর্ব্বাত্মিকা ভাবে যোগ করিলে, যোগফল সর্ব্বাবস্থাতেই "অ" অর্থাৎ আমি। "অ = স্বরূপ। ক, খ, গ, প্রভৃতি পদগুলি তাহারই কর্ম্মরূপতা মাত্র।

অহং-জ্ঞানটী বিচ্ছিন্ন বলিয়া দেখিলে, সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি 'বহু' রূপে খেলেন। ঐ খেলার মধ্যে, আমি-জ্ঞানটী স্থির করিবার প্রবৃত্তি থাকে; কারণ, "আমি কি" স্থির না করিলে, শান্তি হয় না। এই স্থিতি-শীলতা বা প্রবণতাকে অর্থ বলে। পুত্রের সম্বন্ধে যাবতীয় বিভিন্ন ভাবগুলি, একটী বাহ্য পুত্র অবলম্বন করিয়া স্থির হয়। বাহ্য পুত্র, "আমি কি" এই অনুসন্ধানের একটী স্থিতি-শীল রূপ। পুত্র বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক হইলে, পিতার অহং-বুদ্ধি সেই ভাবে স্থির হয়। ভক্তের ভাষায় বলিতে গেলে, শ্রীভগবান্ তিনি যে সকল ভাবেরই পরিসমাপ্তি বা স্থিতি, ইহা বুঝাইবার জন্য এবং জীবের ক্ষণিক-বিজ্ঞানের মোহ ভাঙ্গিবার জন্য, প্রিয় বস্তুরূপে অনন্ত ভাবে জীবকে আকর্ষণ করিতেছেন। ইহাই চৈতন্যের অর্থফল— ইহাই দ্রব্যাদ্বৈত সাধনা।

তারপর ক্রিয়া বা কাম। কামে লক্ষ্য এক, এবং ঐ লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া অনন্ত কর্ম্ম-বুদ্ধির পরিসমাপ্তি হয়। সাধারণ মানবের অহং-বুদ্ধি কর্ম্মানুরূপ;— সৎকর্ম্মে সৎ "অহং"; অসৎ কর্ম্মে অসৎ 'অহং' প্রতিস্থাপিত হয় (Polarised)। সেইজন্য ও জগতে প্রকাশিত শ্রীভগবানের বস্তুরূপ পদাঙ্কগুলি একত্র করিবার জন্য কামরূপে তিনিই আকর্ষণ করিতেছেন। ৺কালীঘাটে যাইতে কামনা হইল; শ্যামবাজার হইতে যাইতে প্রতি পদ-বিক্ষেপে অনন্ত 'বস্তু' ইন্দ্রিয়গোচর হইতে লাগিল। কিন্তু জগন্মাতার প্রতি আকর্ষণ বা কাম সেইগুলিকে এক করিয়া দিল। শ্যামবাজারের মোড়ে একটী গণিকাকে দেখিলাম; কিন্তু জগন্মাতার আকর্ষণে, ঐ গণিকা "স্ত্রিয়ঃ সমস্তা সকলা জগৎসু"-রূপে তাঁহাতে মিশিল। একটী বাড়ীতে একটী সিংহের প্রতিমূর্ত্তি দেখিলাম; কিন্তু তদ্দ্বারা চিত্ত পশু-বিজ্ঞানে (Biology) বিক্ষিপ্ত না হইয়া, বিশ্বমাতার বাহন-স্বরূপ হইয়া তদ্ভাবে জুড়িয়া গেল। ব্রাহ্মসমাজ দেখিলাম; কিন্তু তদ্দ্বারা জগন্মাতারই ধর্ম্মরূপী সংহনন-শক্তি বুঝিতে পারিলাম; বুঝিলাম, যে:বিশিষ্ট "অহং" (Individuality) প্রিয় ব্রাহ্ম ভ্রাতাগণের হৃদয়েও ধর্ম্মরূপ একত্ববুদ্ধি (Sense of organic life) এই সমাজরূপে বাহ্য মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, সে ত' তাঁরই

ধর্ম্মমূর্ত্তি। মনুমেণ্ট দেখিলাম; কিন্তু বুঝিলাম, যেন উহা "পর" বা পুরুষাভিমুখী প্রবৃত্তির চিহ্ন বা লিঙ্গ; পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত হইয়া আকাশ ও আকাশের 'পর' কাহার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া কাহার ভাষা শিখাইতেছে? যতদিন বিশিষ্ট জীব-বুদ্ধি, ততদিন বিশিষ্ট 'বহু' বুদ্ধি ও ততদিন বিশিষ্ট সংহননকারী অবয়বী (Organic) ভাব বা কামও থাকিবে। তবে কামকে ইন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য প্রয়োগ না করিয়া, তদ্দ্বারা এককে বুঝিবার চেষ্টা করাই কামের পরিসমাপ্তি। এই জন্যই করুণাময় শ্রীভগবান্ কামকে আপনার পুত্ররূপে পুনঃ প্রকট করিলেন।

শ্রীভগবানের দিকে মুখ ফিরাইতে গেলে, ধর্ম্মে তাঁহার অবয়বীভাব দেখিতে হইবে। ধর্ম্ম অর্থে অবয়বীকেই বুঝায়। ধর্ম্ম একত্ব-বুদ্ধির উপক্রম। কারণ ধর্ম্মে অবয়বীর নিদানভূত 'বহু'গুলি, 'অবয়বী'-রূপে (Organic life) মিশিয়া যায় ও অবয়বের অতীত এক ভাবের ইঙ্গিত করে।—— - "তস্য এক-বুদ্ধ্যুপক্রমঃ" (ব্যাসভাষ্য ১।৪।৩।) ধর্ম্ম ব্যক্ত বিশিষ্ট 'বহুকে' সংস্থান (Series,) পর্য্যায়রূপে এক করিয়া, তাহা হইতে বিশেষরূপ ফুটিয়া উঠে। 'স চ সংস্থান-বিশেষো...... স এষ ধর্ম্মঃ অবয়বীত্যুচ্যতে' (ব্যাসভাষ্য)। সুতরাং ধর্ম্মের গতি, সর্ব্বদাই ব্যক্ত বিশেষের দ্বারা বিরাটরূপী পরমাবয়বী শ্রীভগবান্‌কে বুঝাইবার জন্য। উহা সর্ব্বদা 'বহু'-জ্ঞানের অতিগ, অদ্বিতীয়, একত্বেরই ইঙ্গিত করে। ধর্ম্মের অর্থ সেই পরম বস্তু। যে ধর্ম্ম সু-অনুষ্ঠিত হইলেও,'ধর্ম্মায় ধর্ম্মপতয়ে' শ্রীভগবান্‌কে দেখাইতে না পারে, উহা বৃথা শ্রম বা 'খাটা-খাটুনী।' তাই ভাগবত বলেন,—

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্‌যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ ১।২।৮।

ধর্ম্মের লক্ষ্য অপবর্গ বা শ্রীভগবানরূপ অর্থ। 'সর্ব্ব' না থাকিলে মূর্ত্তি গড়া যায় না। অথচ বিচ্ছিন্ন, 'বহু' হইলে তাহাদিগকে এক করা যায় না। সেই জন্য ধর্ম্ম সর্ব্বাত্মিকা-ভাবে বাহিরের 'বহুকে' অবয়বীর অবয়বে মিলাইয়া দিয়া, অরূপকে সরূপ, অগুণকে সগুণ ও অব্যবহার্য্যকে ব্যবহারোপযোগী করিয়া দিতেছে। কিন্তু এ ধর্ম্মের ফল, জগৎরূপ বিশিষ্ট 'অর্থ' নহে। যাঁহাকে লইয়াই ধর্ম্ম ও অর্থের ঐক্য, তাঁহাকে বাদ দিলে, ধর্ম্ম দ্বারা বাহ্য লোকাদি প্রাপ্তি ও অর্থ দ্বারা সংসার-পাশ লাভ হয়। বাহ্য বস্তুতে ভেদ-বুদ্ধি দূর করিবার জন্য, বৃক্ষে (অশ্বত্থে) পিতা, মাতা, রমণী, শিশু ও অতিথি প্রভৃতিতে শ্রীভগবান্‌কে দেখিবার জন্য হিন্দু-

শাস্ত্রের উপদেশ। এইরূপ ধর্ম্মানুমোদিত অর্থের প্রতি 'কাম' বা আকর্ষণ বাহ্য বস্তুলাভে পরিসমাপ্ত হয় না। ত'াই ভাগবত বলিলেন,—

ধর্ম্মস্য হ্যপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥ ১।২।৯

নিবৃত্তি ও পরার্থপরতাই অবয়বী ভাব বা ধর্ম্মের ফল। ঐ ফলকে বাহ্য অর্থ বা জগৎরূপে কল্পিত করা যায় না। ধর্ম্মানুমোদিত অর্থই শ্রীভগবান্; এবং তাঁহার প্রতি কামে বাহ্যের লাভ হয় না। 'নহি ময্যার্পিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্প্যতে';—গোপীগণ শ্রীভগবানে কামভাবে মিশিতে গেলেও তাঁহাদের বুদ্ধি বা অহং নির্দ্দেশ শক্তি শ্রীভগবানে পরিসমাপ্ত বলিয়া, ঐ কাম আর কাম রহিল না।

মানবের জ্ঞানফল সগুণ ভাবে সত্ত্বাদিক্রমে ধর্ম্ম কাম ও অর্থরূপে শ্রীভগবান্‌কেই প্রকাশ করিতেছে। নির্গুণ বা পরাভাবে শুদ্ধ ভগবৎ-স্বরূপকে অপবর্গ-রূপে দেখাইয়া দিতেছে। কামের ফল ইন্দ্রিয় প্রীতি নহে,—জীবরূপ অবয়বী বুদ্ধি জন্মাইয়া পরে বিশ্বাত্মা ভগবান্‌কে অবয়বী-বুদ্ধির সাহায্যে দেখাইয়া দেয়। জীব ভোগের জন্য সৃষ্ট নহে; পরমতত্ত্ব বা পরাগতি শ্রীভগবান্‌কে জানাইবার জন্য। যেমন তটস্থ বৃক্ষ হইতে নদীর জ্ঞান, তদ্রূপ জীব প্রথমে প্রকৃতির অতীত এক বিশিষ্ট তত্ত্বের বা 'পর' প্রবণতা বা পরাগতির ইঙ্গিত করে। ধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, অধর্ম্ম হইতে অন্যত্র, পাপ ও পুণ্য হইতে অতিগ 'আমি'কে বুঝিতে গিয়া, আমরা দেখি যে, সর্ব্ব জীবেই এই এক প্রবণতা আছে। সেই প্রবণতাতে বাহ্য 'বহু' ডুবিয়া যায়; এইরূপ 'ভিন্ন' পুরুষকে বুঝিতে গিয়া, পরম-পুরুষাভিমুখী 'সর্ব্বের' ভিতর অন্তর্নিবিষ্ট এক স্রোত বা প্রাণের টান জাগিয়া উঠে। টানে লালসা উৎপন্ন হয়; লালসা হইতে বিরহ-বুদ্ধি; বিরহে ধনমানাদি বিশিষ্ট বস্তুর, দেবতা, পিতৃ-ঋষ্যাদি, কুল ও জাতিরূপ অবিশেষ বুদ্ধি ও অভিমান, সব 'পর'-পুরুষে ডুবিয়া যায়।

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥ ভা, ১।২।১০।

'পন্থা' বিষয় বা দ্রব্যের কথা বলিবে; কিন্তু এরূপ ভাবে বলিতে প্রয়াস করিবে, যাহাতে রাম, শ্যাম প্রভৃতি বিশিষ্ট মনুষ্য, দেবতা বা ঋষি বুদ্ধির মোহ না জন্মায় বা অপর পক্ষে, জীবরূপে বিশিষ্ট নাম-রূপের মধ্যে প্রকাশিত একই ভগবানে দ্বেষ বা ভেদবুদ্ধি না জন্মায়। জীবের মঙ্গলের জন্য হয় ত' বিশেষ মত বা সম্প্র-

দায়ের উপর কটাক্ষ থাকিতে পারে; কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য তত্তৎসম্প্রদায়ের প্রকৃত মঙ্গলানুসন্ধান। ভগবান্ যদি পাপী, অধার্ম্মিক, দৈত্য প্রভৃতিরূপে খেলিতে পারেন, তবে আমাদের দ্বেষ্য কি? তবে ব্যবহারিক জগতে, দুঃখ মৃত্যু প্রভৃতি রূপে, তিনি যেমন জীবের মোহ ভাঙ্গিয়া দেন, আমাদিগকেও লোক-ব্যবহারে শাস্ত্রানুমোদিত, মহাজন-সেবিত বুদ্ধির দ্বারা বিশেষ ভ্রান্তির অপনোদনে চেষ্টা করিতে হইবে।

'পন্থা' কামাদি সর্ব্ব প্রবৃত্তিতে সর্ব্বাত্মিকা চৈতন্যময়ীর ভাষা বুঝাইতে চেষ্টা করিবে; উপন্যাসচ্ছলে 'সর্ব্ব'বৃত্তির পরিসমাপ্তির স্থল শ্রীভগবান্‌কেই দেখাইবার চেষ্টা করিবে। ধর্ম্ম বা অবয়বী ভাবে ভগবান্‌কে দেখাইবার জন্য, শাস্ত্রসম্মত অর্থ, কাম প্রভৃতির সাহায্যে, স্বানুভূতির বা অহং-তত্ত্বের ভাষায়, শাস্ত্র-যোনি শ্রীভগবানের মহিমা প্রকাশ করিতে চেষ্টিত থাকিবে। তারপর ভগবৎস্বরূপের প্রকাশের জন্য মোক্ষ বা অদ্বয় জ্ঞান ও অদ্বয় ভক্তির ভাষায় শ্রীভগবান্ ভগবৎ-প্রকাশিকা গায়ত্রী বা দেবী এবং আত্মানুভূতির হেতুভূত ঋষিগণের মহিমা বালকোচিত অস্ফুট ভাষায় কহিতে চেষ্টা করিবে।

প্রবন্ধগুলি মোক্ষ বা শ্রীভগবান্, ধর্ম্ম বা তন্নিহিত শাস্ত্র, কাম বা আকর্ষণ শক্তি ও অর্থ বা প্রকৃত বস্তু এই চারিটি বিভাগে সন্নিবিষ্ট হইবে। ইহাই আমাদের সাধন মার্গ। লেখকগণের প্রতি নিবেদন যে, তাঁহারা এই চারি মহা-ভাবের মধ্যে যে কোনও ভাবকে অবলম্বন করিয়া, সর্ব্বজীবে চিদানন্দ-ঘন ভগবানের ভাষা ফুটাইবার জন্য, প্রবন্ধাদি লিখিয়া নৈমিষারণ্যের ঋষিগণদ্বারা দেশ, কাল, যুগ প্রভৃতি দ্বারা অনবচ্ছিন্ন ভাবে নিত্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইতেছে, যে যজ্ঞের সুগন্ধে পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধরূপে, কামনায় সুখরূপে, মনে সংগ্রহ বা সংকল্পরূপে একত্বের বাণী ও বুদ্ধিতে "ভগবানই সার" এই ভাষা, সর্ব্বজীবের হৃদয়ে সর্ব্বাবস্থায় সংক্রামিত হইতেছে —সেই মহান্ যজ্ঞে যথা সামর্থ্য সহায়তা করেন। সে যজ্ঞে আমরা হোতা প্রভৃতি না হইতে পারি; কিন্তু হয় ত' পরিনিষ্ঠিত "অহং" বুদ্ধিরূপ কাষ্ঠ বা সমিৎ, জীব-প্রেমরূপ হবি,—অদ্বয়জ্ঞান-পিপাসারূপ অগ্নি, ভাবরূপ পুষ্প প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া, দাসরূপে তাঁহাদের সেবা করিতে পারি;—ইহাকে আকাঙ্ক্ষা বল, স্পর্দ্ধা বল, তাহাতে ক্ষতি নাই, যিনি চালাইতেছেন তিনিই জানেন। ফলাফল প্রভৃতি সকলই ত' তাঁহারই, তবে ভয় কি?

সম্পাদকানাং।

মোক্ষ]

৺শ্রীশ্রীক্ষেত্র অভিমুখে।*

জগতে কত ভাবের যাত্রী আছে। সকলেই এক পথ ধরিয়া চলিতেছে না। চারিদিক্ হইতে চারি পথ ধরিয়া যাত্রীরা চলিয়াছে। কিন্তু সকলেই ছুটিয়াছে—সেই শ্রীক্ষেত্রের অভিমুখে, যেখানে সকল পথ আসিয়া মহাসিন্ধুর অনন্ত বক্ষে মিলিত ও অবসান প্রাপ্ত হইয়াছে, যেখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথের শ্রীমন্দির গগন ভেদ করিয়া উঠিয়াছে; যেখানে শুচি-অশুচি, জাতি-বিজাতি, হেয়-উপাদেয়, হর্ষ-বিষাদ, সকল প্রকার দ্বন্দ্বের ভেদ-বুদ্ধি বিগলিত হইয়াছে; যেখানে জ্ঞান-হিমাদ্রি শ্রীশঙ্কর, প্রেম-সিন্ধু শ্রীগৌরাঙ্গ, একে নির্ব্বিকল্প, অপরে মহাভাব-সমাধিতে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন। জগতের সেই সনাতন পন্থার চারিটি শাখার বিভিন্ন প্রকৃতি এমন ভাবে আলোচিত হওয়া উচিত, যাহাতে পথিকগণ নিজ নিজ পথের বাধা-বিঘ্নগুলি ভাল করিয়া দেখিতে পান, এবং কি উপায়ে তাহা নিরাকৃত হইতে পারে, তাহাও জানিতে পারেন। অধিকন্তু কোনও পথিক যেন আপনার পথটিকেই কেবল শ্রেয় এবং অপরের গৃহীত মার্গকে হেয় ধারণা না করেন; এবং সকলেরই উদ্দেশ্য যে একই শ্রীক্ষেত্রে শ্রীজগন্নাথ দর্শন, তাহাও যেন না ভুলিয়া যান্।

ধন্য তাঁহারা—যাঁহাদের হৃদয় সহ-যাত্রীর ভব-যন্ত্রণা দর্শনে কাতর হয়, যাঁহারা জ্ঞানভক্তির দীপ ধরিয়া অন্ধকারে পথ-হারা পথিকের পথ-প্রদর্শক হন, অন্ধ যাত্রীর নেত্রস্বরূপ হন্। তাঁহাদেরই হস্তে সেই সিন্ধুকূলবাসী জগন্নাথের নিশান, তাঁহাদের চক্ষে তাঁহারি অহৈতুকী করুণার দীপ্তি এবং তাঁহাদের হৃদয়ে তাঁহারি গুপ্তশক্তি চিরাধিষ্ঠিত হউক।— যাত্রী—শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

মোক্ষ]

প্রেম-বৈচিত্ত্য।

বৈষ্ণব কবির কাব্য বিকশিত পদ্মবৎ মনোহর। পদ্মের বর্ণ-মাধুরী, গন্ধ-সম্পৎ চিত্তাকর্ষক হইলেও, তাহার হৃদয় মধ্য-সঞ্চিত একবিন্দু মধুই যেমন মধুকরের ক্ষুৎপিপাসা দূর করে, তেমনি বৈষ্ণব মহাজনদিগের রচিত বিচিত্র পদা-

* এখন গঙ্গাচক্র সমাপ্ত হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথচক্র চলিতেছে। পং সং

বলীর মধ্যে প্রেম-বৈচিত্ত্য নামক ক্ষুদ্র অধ্যায়টি ভাবুক জনের সর্ব্বাপেক্ষা উপ-ভোগ্য। সংখ্যায় ইহা অতি অল্প হইলেও, ভাবের ঘনতায়, প্রেমের মিষ্টতায়, চিত্তের উন্মাদনায়, অনুরাগের তন্ময়তায় এই সঙ্গীতগুলি এক অপূর্ব্ব সামগ্রী।

পূর্ব্বসংস্কারবশে, অথবা শ্রবণ দর্শনাদি দ্বারা প্রীতি হেতু, শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সংলগ্ন হওয়ার নাম রতি। বিঘ্ন সত্ত্বেও ঐ রতির হ্রাস না হইলে, উহা প্রেম নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই শ্রীকৃষ্ণ-চরণে চিত্তের সংলগ্নতা যখন কুল, শীল, মান, লজ্জা, ঘৃণা, ভয় প্রভৃতি বিপুল বিঘ্নের বিপরীত আকর্ষণে ক্ষয় প্রাপ্ত না হইয়া, ক্রম-বর্দ্ধিত দৃঢ়তা অর্জ্জন করে, অনাদরে অটলতা, সোহাগে পুষ্টতা, বিরহে ব্যাকুলতা এবং মিলনে গাঢ়তা প্রাপ্ত হয়, চিত্তের তদানীন্তন অবস্থার নাম সুলীনতা। জন্ম-জন্মান্তরের বহু পুণ্যফলে ভক্ত হৃদয় যখন এইরূপে ভগবানের চরণে ক্রমশঃ আকৃষ্ট, লগ্ন এবং লীন হইয়া যায়, পূর্ব্বরাগ, অনুরাগ, বিরহ, মিলন, সর্ব্বাবস্থার ভিতর দিয়া কৃষ্ণচন্দ্রের মধুর রস পানে সর্ব্বদা 'ভরপুর' হইয়া থাকে, তখন তাহার অন্তরে যে আত্মহারা ভাব উপস্থিত হয়, * বৈষ্ণব কবির অপূর্ব্ব সঙ্গীতে তাহাই প্রেম-বৈচিত্ত্য নামে গীত হইয়াছে। সে অবস্থায় এক অভূতপূর্ব্ব ভ্রান্তি, অঘটন-ঘটন-পটু চিন্তা, স্বপ্ন-সাগরের বিচিত্র তরঙ্গ ভঙ্গিমা, বাস্তব-কল্পনার অপূর্ব্ব মিশ্রণ একে একে লক্ষিত হয়। তখন চিত্তের বিগত-চিত্ততা বা বি-চিত্ততা, বোধ-শক্তির বিহ্বলতা, স্মৃতিতে বি-স্মৃতি, মিলনে বিরহ-ব্যথা, বিরহে মিলনানন্দ, দিবসে নিশাভ্রম, রজনীতে দিবা-বুদ্ধি, সুখে দুঃখ এবং দুঃখে সুখ প্রভৃতি বিবিধ অসমঞ্জস অনুভূতির প্রাবল্য ঘটিতে থাকে। কিন্তু এত যে অনুভবে বৈচিত্র্য, চিত্তের বৈচিত্ত্য, তবু "সর্ব্ব"ভাবের অভ্যন্তরে সেই এক প্রেমময়ের প্রেমামৃত, গূঢ় প্রবাহে সঞ্চিত রহে। ইহার লক্ষণ-বর্ণনায় কবি বলিতেছেন :—

অঞ্চলে বান্ধিয়া রত্ন চাহি ফিরে ঘরে।
কোলেতে থাকিয়া হয় বিচ্ছেদ অন্তরে॥

নিস্তব্ধ রজনী। জ্যোৎস্না-স্নাত কুঞ্জ। চম্পক শয্যায় প্রেম যুগলমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া বিরাজিত।

* চিত্ত তখন 'সর্ব্ব'ভাবে ক্ষুদ্র জীবকে না দেখিয়া, শ্রীভগবানে অবসান প্রাপ্ত হইয়া, স্থির হয়। পং সং।

শ্যামক কোরে　　　　যতনে ধনি শুতল,
মদন-মহালসে ভোর।
ভুজে ভুজে বন্ধন,　　　　নিবিড় আলিঙ্গন,—
জনু কাঞ্চন মণি জোর॥

মিলনের এই সুখ, দেহ-সর্ব্বস্ব কামুকের পক্ষে সর্ব্বস্ব হইতে পারে; কিন্তু দেহের অতীত, মনের অগম্য, কৃষ্ণ-প্রেমে যিনি উন্মাদিনী, যাঁহার পবিত্র দেহের অণু পরমাণুও শ্যামসুন্দরের অকৈতব প্রেমে অনুপ্রাণিত, চিরসুন্দরের নির্ম্মল রূপ-রসে রসিত, জড় দেহের স্থূল মিলনে কি তাঁহার মিলনাকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত, একাত্ম-যোগ-সাধন সংসিদ্ধ হইতে পারে?* যে মিলনের জন্য শ্রীমতী বিশ্বসংসার তুচ্ছ বোধ করিয়াছেন, কুলে শীলে জলাঞ্জলি দিয়াছেন, সমাদরে কলঙ্ক-গরল কণ্ঠে ধরিয়াছেন, কণ্ঠালিঙ্গনে তাহার তৃপ্তি কোথায়? বাহু-বন্ধনে তাহার সফলতা কোথায়?

কোরহি শ্যাম,—　　　　চমকি' ধনি বোলত,
"কব মোহে মীলব কান?
হৃদয়ক তাপ　　　　কবহুঁ মঝু মীটব,
অমিয়া করব সিনান?
সো মুখ-মাধুরী,　　　　বহু নেহারন
সোঙরি সোঙরি মন ঝুর।
সো তনু সরস　　　　পরশ যত পাওব,
তবহি মনোরথ পূর॥"

সে কেমন কানু,—যাহার অঙ্কে শয়ন করিয়াও মনে হয় 'কানু' মিলিল না? সে সে কেমন তনু,—যাহার শিরীষ-পেলব, চন্দ্র-চন্দন-শীতলস্পর্শ-নদীতে সর্ব্বাঙ্গ সিক্ত হইলেও হৃদয়ের তাপ নিবারিত হয় না? অগাধ সিন্ধুর অমৃত-নীরে অনন্তকাল ধরিয়া অবগাহন করিবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে? কেমন প্রেম,—যাহার কুহকে দেহ সত্ত্বেও দেহ-বুদ্ধি বিসর্জ্জিত হয়, ধৃতি সত্ত্বেও বিষয়ের ধারণা বিশৃঙ্খল, বিগলিত হইয়া যায়?

* ক্ষিতিতত্ত্বে স্থৈর্য্য সিদ্ধ হয়। সেইজন্য স্থূল ভাবেও চিত্তের চিন্ততার অবসান আবশ্যক। পং সং

বৃন্ত যখন শ্লথ হইয়া পড়ে, পুষ্প তখন শাখাচ্যুত হয়। আসক্তি যখন রস-পরিপাকে শুষ্ক হইয়া পড়ে, প্রেম তখন আর দেহে নিবদ্ধ থাকে না। বাহ্য বিষয়ের সারভূত রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শ হইতে ধীরে ধীরে ভক্তের বা যোগীর মন বিশ্লিষ্ট হইয়া, প্রেম-সাধনায় বা জ্ঞান-যোগে এক সনাতন বস্তুতে যখন লীন হইতে থাকে, তখন দেখিতে দেখিতে দেহ-বোধ ক্ষীণ,—ক্ষীণতর হইয়া যায়; চিত্ত অপূর্ব্ব দৃষ্টি পাইয়া অলৌকিক দর্শনে অভ্যস্থ হয়; প্রাণ-বায়ু এক কেন্দ্রাভিমুখে প্রবাহিত হয়, এবং পরিশেষে বাহ্য জ্ঞানের বিলোপে মহা-ভাব-সমাধির অবস্থা উপস্থিত হয়। তখন যে স্থূলদেহের মিলনাকাঙ্ক্ষা সূক্ষ্ম-মানস-মিলনাশায় পরিণত হইয়াছিল, তাহাও দেখিতে দেখিতে ধ্যানগম্য সু-লীনতায় পর্য্যবসিত হইয়া যায়, আনন্দ-সাগরের নিঃশব্দ গভীরতায় নিমজ্জিত হইয়া যায়। কবি বুঝি পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহারি আভাষ দিতেছেন :—

এত কহি সুন্দরী দীঘ নিশাসই
মূরছিত হরল গেয়ান।
আকুল রাই, শ্যাম পরবোধই,
গোবিন্দ দাস পরমান॥

এই রস-সিন্ধুর আর দুইটি তরঙ্গ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

সজনি! প্রেমক কহবি বিশেষ।
কানুক কোরে, কলাবতী কাতর,
কহত—'কানু পরদেশ।'
চাঁদক হেরি, সুরয করি ভাখই,
দিনহি রজনী করি মান।
বিলপই, তাপে তাপাওত অন্তর
পিয়ার বিরহ করি ভান।
"কব আওব হরি?" হরি সঞে পুছই,
হসই, রোই খেণে ভোরি।
সো গুণ গাই, বাঢ়ই,
ক্ষণহি ক্ষণহি তনু মোড়ি॥ (বল্লভদাস)

নাগর সঙ্গে　　　　রঙ্গে যব বিলসই,
কুঞ্জে শুতল ভুজ-পাশে।
"কানু—কানু" করি'　　　　রোঅই সুন্দরী,
দারুণ বিরহ-হুতাশে॥
এ সখি! আরতি কহনে ন যাই।
আঁচলক হেম　　　　আঁচলে রহু যৈছন,
খোজি' ফিরত আন ঠাঁই॥

(গোবিন্দদাস।)

প্রেম-বৈচিত্ত্যের এই অপূর্ব্ব ভাব। কৃষ্ণ-অঙ্কে আলিঙ্গনাবদ্ধা শ্রীরাধিকার এই অভূত-পূর্ব্ব বিরহানুভূতি নবদ্বীপে এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। বৃন্দাবনে এক হইয়াও, কৃষ্ণ রাধা ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে এই পবিত্র লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু নবদ্বীপের কি পরম সৌভাগ্য! নবদ্বীপের কি পুণ্য-ফল! বৈকুণ্ঠে যাহা কল্পনা, বৃন্দাবনে যাহা স্বপ্ন, নবদ্বীপে তাহা সত্য হইয়াছিল। আদি পুরুষ এবং আদি প্রকৃতি, অনাদি চিৎ-স্বরূপ এবং অনন্ত আনন্দ স্বরূপিণী, প্রেমের পূর্ণাদর্শ কৃষ্ণ রাধা—হর-গৌরী, এই নবদ্বীপের বক্ষে একাঙ্গ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং একই দেহে অবস্থান করিয়া প্রেম-বৈচিত্ত্যের এই অপূর্ব্ব লীলা প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি আর কেহ নহেন, তিনি কাল-কলুষ-ভঞ্জন, একাধারে জ্ঞান-প্রেমের, চিদানন্দের প্রকটমূর্ত্তি. আমাদের শ্রীগৌরাঙ্গ। তিনি কখনো আপনাকে কৃষ্ণাঙ্কশায়িনী রাধা ভাবিয়া কৃষ্ণালিঙ্গের স্পর্শ-সুখে পুলকিত হইয়া উঠিতেছেন; আবার কি জানি, কেন স্বীয় অঙ্গের দিকে চাহিয়া চাহিয়া, তথায় কৃষ্ণ নাই ভাবিয়া কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছেন। কখনো বা আপনাকে কৃষ্ণবোধে, নিজ দেহের গৌর-কান্তিদর্শনে শ্রীমতীর স্বর্ণময়ী রূপ-নদীতে অবগাহন করিতেছেন ভাবিয়া, আনন্দে আত্মহারা হইয়া যাইতেছেন; পরমুহূর্ত্তে চিত্ত দেহান্তরের অতি ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া স্থূলশরীরে আর কিশোরীর সূক্ষ্ম মূর্ত্তি দেখিতে পাইতেছেন না, এবং অদর্শনজনিত দারুণ দুঃখে নেত্রদ্বয় অবিরল অশ্রুমোচন করিতেছে!

হরি ! হরি ! গোরা কেন কান্দে ?

নিজ সহচরগণ পুছই কারণ,

হেরই গোরামুখ-চান্দে ॥

অরুণ লোচন প্রেমভরে ভেল চুন,

ঝর ঝর ঝরে প্রেমবারি।

যৈছন শিথিল গাথল মতিফল

খসি পড়ে উপরি উপরি ॥

সোঙরি বৃন্দাবন নিশসই পুন পুন

আপনার অঙ্গ নিরখিয়া।

দুই হাত বুকে ধরি, "রাই—রাই" করি'

ধরণী পড়ল মুরছিয়া ॥

তঁহি প্রিয় গদাধর, ধরিয়া করল কোর,

কহয়ে শ্রবণে মুখ দিয়া।

পুন অট্ট অট্ট হাসে, জগজন মন তোষে,

বাসুদেব মরমে ঝুরিয়া ॥

প্রেম-বৈচিত্ত্যের এই বিচিত্র লীলা জগতের এক অপূর্ব্ব বস্তু। কৃষ্ণপ্রীতি ইহার ভিত্তি, চিত্তের একাগ্রতা ইহার মূল, হৃদয়ের দ্রব ভাব ইহার রস, দেহ-দ্বয়ের একভাব ইহার কাণ্ড, সুখে দুঃখানুভব এবং দুঃখে সুখানুভব ইহার কিশলয়, দেহবুদ্ধির বিসর্জ্জন ইহার পুষ্প, এবং দেহ মনের অতীত বাহ্যজ্ঞানলোপী মহাভাব-সমাধি ইহার সুপক্ক ফল। কল্পবৃক্ষের ফল—ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ; এই রসতরুর ফল,—আনন্দ। স্বয়ং শ্রীগৌরাঙ্গ জীবদেহ ধারণ করিয়া যাচিয়া যাচিয়া, জনে জনে এই ফল বিতরণ করিতেছেন। কে আছ প্রেমিক, উহা করায়ত্ত করিয়া ধন্য হও।

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

স্বরূপ

(১)

হে মূল-কারণ, সত্য !
তুমি সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী,
নিখিলে বিহর নিত্য
সত্তা তোমার শব্দে, গন্ধে,
অণুতে, বেণুতে, দৃশ্যে, ছন্দে,
প্রগাঢ় বিরাজে, গোপন-বিহারি !
পুলকে পূরিয়া চিত্ত।
এমনিই আছ, আপনার হ'য়ে,
নিখিল-শরণ সত্য !

(২)

হে অনন্ত-জ্ঞান-পূর্ণ!
মহিমায় তব, মোহ আবরণ,
পলকে করিছ দীর্ণ।
দীপ্তি-পরশে তমসা ঘুচাও
আপনি আসিয়া মানসে জাগাও,
উজ্জল মধুর সুধীর মূরতি,
দীনতা করিয়া চূর্ণ।
এমনিই তোমার করুণা বিকাশ,
সুন্দর ! শিব ! পূর্ণ !

(৩)

হে অদ্বৈত রূপ ! শান্ত !
'বহুত্বে' তোমার একত্ব প্রকাশ,
বুঝে না মানব ভ্রান্ত !
একমাত্র তুমি স্থির, নির্ব্বিকার,
অদ্বিতীয় তুমি, মঙ্গল-আধার,
প্রেম পুণ্য তুমি আত্মা নিরাকার,
অনন্ত, তুমি সান্ত
এমনিই তুমি সকলের মাঝে,
এক হ'য়ে আছ শান্ত !

(৪)

হে আনন্দময় ! ব্রহ্ম !
তোমাতে মিলেছে সত্ত্ব, রজ, তমঃ,
জ্ঞান, ভকতি, কর্ম্ম।
আনন্দ তোমার বিশ্ব ছাপিয়া,
কত দুঃখ জ্বালা, মালিন্য নাশিয়া—
মৃত-সঞ্জীবনী অমৃত ঢালিয়া,
বিশ্বাসে পুরিছে মর্ম্ম।
এমনিই তোমার স্বরূপ বিকাশ,
আনন্দময় ব্রহ্ম !

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।

মিলন।

যিনি কত যুগ-যুগান্তর হইতে, আমার সহিত মিলনের আশায় আমার (হৃদয়) ভবন দ্বারে প্রতিদিন আসিয়া, সকাল সন্ধ্যায় আমার জন্য চুপ্‌টি করিয়া নীরবে

অপেক্ষা করিয়া থাকেন,—কত বৎসর, কত মাস, কত শীত, কত গ্রীষ্ম, কত শুক্ল-কৃষ্ণ-পক্ষ কত মধু-যামিনী, কত সরস-বরষাধারা-সিঞ্চিত ঘোর নিশীথ সময়ে—তাঁহার আসার বিরাম নাই। আসেন প্রতিদিনই—প্রতিদিনই আমার রুদ্ধ দ্বার দেখিয়া, সাশ্রুনেত্রে ফিরিয়া যান। তবু আমাকে ডাকেন না, পাছে আমি লজ্জিত হই,—সঙ্কুচিত হই। এমনই গোপন তাঁহার ভালবাসা; এমনই নীরব গম্ভীর তাঁ'র প্রেম-মহিমা! এই যে প্রতিদিন ফিরিয়া যান, তা'র জন্য কোন বিরক্তি নাই; এত উপেক্ষাতেও কোন অভিমান নাই। ওগো, লোকে তাই তাঁ'কে পাথর. কাঠ ব'লে উপহাস করে।

আমার প্রেম-লাভ করিবার জন্য, তিনি যাচকের মত প্রতিদিনই একবার না একবার আমার এই ভবন-দ্বারে উদ্‌গ্রীব হইয়া, ব্যাকুল নয়নে চাহিয়া থাকেন। শুধু আপনার মনে মনেই বলেন, "প্রিয়-সখা! আজও সময় করিয়া উঠিতে পার নাই! আচ্ছা যাক্, আবার কাল আস্‌বো।" জন্মজন্মান্তর—যুগ-যুগান্তর যখন এইরূপে কাটিয়া যায়—আমার ঘুমঘোর কাটে না, তখন আমার প্রভু—আমার চির-প্রেমিক, আমার গাত্র স্পর্শ করিয়া জাগাইয়া দেন।

কিন্তু এই যে তাঁহার স্পর্শ, প্রেমিকের হস্ত হইলেও, আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে ঘা দিয়া যায়। এই যে তাঁহার জাগ্রত করিবার প্রয়াস, ইহাই আমরা সময়ে সময়ে ব্যথার মত—পীড়ার মত অনুভব করিয়া থাকি! বোধ হয়, ব্যথা না পাইলে আমরা জাগিতে জানি না! সুতরাং এ ব্যবস্থা তাঁ'র করুণ কর-স্পর্শ মাত্র। রে নির্ব্বোধ চিত্ত! ইহাকে তুই অন্য কিছু মনে করিয়া বিহ্বল হইয়া পড়িস্ না। জানিও, অগাধ করুণাময় যিনি,—তিনি আমাকে পীড়া দিবার জন্য—দণ্ড দিবার জন্য, ব্যথা দিতে আসেন না, পরন্তু মিলনের আশায় এ আমাকে জাগাইবার চেষ্টা মাত্র!

যখনি তাঁহার আমার প্রতি অগাধ ভালবাসার কথা ভাবি, তখন তাঁর করুণ নেত্র দুটি আমার হৃদয়াকাশে ফুটিয়া উঠে, আমি বেদনার কথা সব ভুলিয়া যাই। তখন আত্মহারা প্রাণ গাহিয়া উঠে:—

নিভৃত হৃদয়ে মম কে তুমি নিয়ত জাগ?
বিরহ-ব্যাকুল প্রাণে অধীর হইয়ে ডাক?
নানা কাজে, নানা সাজে, সংসারে রয়েছি ম'জে,
কে তুমি তাহারি মাঝে, আমার সঙ্গ মাগ'?

সকরুণ দুটি আঁখি, আমার পানেতে রাখি,
নিরজনে কে একাকী আমারে নিরত যাচ?
একি সখা ব্যাকুলতা!—কেন এত পাও ব্যথা,
যে হৃদি বুঝিবে না তা' তরে কেন গো সাধ?

মোক্ষ]　জাবালির আত্মোপদেশ।

সম্মুখে মহর্ষি জাবালির আত্মাহুতি সমিদ্ধ-হুতাশন-প্রদীপ্ত, চির-শান্তিময় স্নিগ্ধ-সুন্দর তপোবন। তপোবনের নিকট দিয়া প্রখর-তোয়া পবিত্রতাময়ী ভাগীরথী কুলুকুলু রবে যেন তপস্যার প্রভাব গাহিতে গাহিতে সাগরাভি-মুখিনী। চতুর্দ্দিকে বৃক্ষরাজি বসন্ত-সমীরণে উৎফুল্ল হইয়া, কুসুমস্তবকে শোভিত হইয়া, কি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ-স্রোত বিস্তার করিতেছে। তপো-বনের মধ্যে এক বেদী.—বেদীর দুই দিকে দুইটী অশোক-বৃক্ষ। সেই বেদীর উপর এক সূক্ষ্ম যজ্ঞোপবীতধারী ব্রাহ্মণ উপবিষ্ট। তাঁহার দেহ-প্রভায় তপোবন উদ্দ্যোতিত রহিয়াছে;—উত্তপ্ত কনকাভ মূর্ত্তি, অধরে অকৃত্রিম রক্তিম আভা, চক্ষুতে কি প্রশান্ত সরলতা, কি প্রশস্ত উজ্জ্বল ললাট! সম্মুখে বসন্ত-পুষ্পের অলঙ্কার পরিয়া, গৈরিক বসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া, এক অনিন্দ্য-সুন্দরী ষোড়শী দণ্ডায়মানা;—যেন তপোবনের শান্তিময়ী লক্ষ্মী কোমল-ভাস্বর বেশ পরিগ্রহ করিয়া লাবণ্যের ছটায় স্বপ্রকাশ রহিয়াছেন; ব্রাহ্মণের নাম জাবালি; সেই যুবতীর নাম বাসন্তী—তাঁহার সহধর্ম্মিণী।

জাবালি বলিলেন, "বাসন্তি! আজ তোমাকে অশ্রুত-পূর্ব্ব বিষয় শুনাইব; অবহিত-চিত্তে শ্রবণ কর।"

বাসন্তী বলিলেন, "প্রভু, আপনার কোন্ বিষয়টী আমি আগ্রহ সহকারে শুনি নাই যে, আজ অভিযোগ করিতে হইল। আপনি দয়া করিয়া বলিলেই, এ দাসী চিরকৃতার্থ হইবে।"

জাবালি। জগতে যাহা কিছু দেখিতেছ, তাহার আদি-কারণ একমাত্র আত্মা। সেই আত্মা সম্বন্ধে তোমাকে আজ দু' এক কথা বলিব।

জগতের আদিতে একমাত্র আত্মাই অবস্থান করেন। এই আত্মা এক। কত সৃষ্টি, কত সগ, কত প্রলয় আবর্ত্তিত হইতেছে; তথাপি ইনি অক্ষয় ও অবিনাশী*।

বাসন্তী। প্রভু! এই আত্মা যদি এক হ'ন, যদি ইঁহার ক্ষয় না থাকে, তবে ইঁহা হইতে কি করিয়া অসংখ্য জীব সৃষ্ট হয়? যদি বলেন, একই মৃত্তিকা হইতে যেরূপ অসংখ্য ঘট উৎপন্ন হয়, সেইরূপ একই আত্মা অসংখ্য জীব সৃষ্টির কারণ হইবেন, ইহাতে কি বৈচিত্র্য আছে? তদুত্তরে মনে হয়,—এক আত্মা অসংখ্য জীব সৃষ্টি করেন—করুন, কিন্তু ভিন্নজাতীয় অসংখ্য পদার্থ সৃষ্টি করেন কিরূপে? মৃত্তিকা হইতে ত' পটের সৃষ্টি হয় না।

জাবালি। বাসন্তি! ঐ বিশ্বের সৃষ্টিকারী-শক্তিসম্পন্ন আত্মা এক হইলেও, উহাঁর যে কেবল জীব গড়িবার শক্তি আছে, অপর কিছু গড়িবার শক্তি নাই, ইহা তোমাকে কে বলিল? তিনি স্বতন্ত্র, তিনি ইচ্ছাময়; যখন যাহা ইচ্ছা করেন, তখনই তাহা করিতে পারেন। তিনি যে রঙ্গালয়ে শৈলুষ-স্বরূপ: তাঁহার যখন যাহা আবশ্যক হয়, তখনই সম্পন্ন করেন, তাঁহার সমস্ত গড়িবার শক্তি আছে বলিয়াই, তিনি সর্ব্বশক্তিমান্ †। চৈতন্য-স্বরূপ আত্মা যখন জড়রূপে পরিণত হন, তখনই আকাশাদি জগৎ-সৃষ্টি হয় ‡।"

বাসন্তী। প্রভু! ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করিবেন। আপনি ব'লিলেন, আত্মা চৈতন্যময়; তিনি যখন জড়রূপে পরিণত হন, তখনই জগতের সৃষ্টি হয়। চৈতন্যময়ের জড়রূপতা কি করিয়া সম্ভবে! জলের যে শৈত্যগুণ স্বভাব-সিদ্ধ।

জাবালি। সত্য বটে, বুদ্ধিমতি! চেতনের জড়ে পরিণতি, স্বপ্রকাশ আত্মার নাম ও রূপ দ্বারা ব্যাকৃতি, বস্তুসিদ্ধ বা পরজ্ঞানগম্য নহে। সচ্চিদানন্দ-ময়ের দেহাত্মবোধে অবভাস, ইহা ত' শুধু অবিদ্যাজনিত প্রতীতি, কল্পনার বিজৃম্ভণ। বালক যেরূপ দর্পণে আত্মমুখ প্রতিবিম্বিত দেখিয়া, প্রতিবিম্বিত মুখখানিকে সত্য বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহা তাহার ভ্রম-জ্ঞান, - সেইরূপ চৈতন্যময় আত্মার জড়রূপতা-জ্ঞান জীবেরই নিকট, অবিদ্যাবশতঃ

---

* অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো।—কঠ।

† স য এষোঽণিমা ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং তৎ সত্যং স আত্মা। ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

‡ শাস্ত্রদীপিকা ১ম অধ্যায়।

হইয়া থাকেন। যখন মোহের ধাঁধা ঘুচিয়া যায়, যখন জ্ঞানারুণ আসিয়া অবিদ্যারূপ অন্ধকারকে অপসারিত করে, তখন সেই নির্ম্মলচ্ছবি চৈতন্যময়ের মূর্ত্তি, হৃদয়ে দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হয়, তখন আর জগতের জড়রূপত্ব জ্ঞান থাকে না।

বাসন্তী প্রভু! আপনি বলিলেন, সেরূপ জ্ঞান কল্পনামাত্র। ইহাই অসত্য বস্তুতে সত্য রূপে ধারণার নাম কল্পনা। তবে কি ভগবন্! ইহাই আপনার উপদেশের তাৎপর্য্য, যে এ জগতে এক আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এই যে প্রত্যক্ষ দৃশ্যমান বস্তু, এ সকলই কি মিথ্যা?

জাবালি। বাসন্তি! আমি ত' তাহা বলি নাই। পদার্থের সত্বা ও তাহার উপলব্ধি বা জ্ঞান এ উভয় ত' অভিন্ন নহে। পদার্থের যাথার্থ্য জ্ঞানে ভ্রান্ত হইয়া কল্পনার শরণ লইতে হয় বলিয়া,—আর অবিদ্যা জড়িত ভাবের পথে কল্পনাই যে জ্ঞানের অন্যতম সহায়, বলিয়া যে পদার্থের অস্তিত্ব বিষয়ে সন্দিহান্ হইতে হইবে, এ কিরূপ যুক্তি? অন্ততঃ ইন্দ্রিয়জ্ঞান ত' এ কথা বলিবেই, যে এই সমস্ত যাহা কিছু দেখিতে পাইতেছ, এ সকল পদার্থই আছে; তবে ইহারা নিত্য পদার্থ নহে—ইহাদের বিনাশ আছে। দেখ যেমন স্বর্ণ হইতে কুণ্ডল অঙ্গুরীয়ক প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হয়, কিন্তু যখন ঐ সমস্ত ভাঙ্গিয়া গলান যায়, তখন এক সুবর্ণই থাকে, তদ্রূপ এই যে সকল পদার্থ দেখিতেছ, সে সকলও কালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া আত্মাতে পর্য্যবসিত হয়। কিন্তু উহারা সত্য-শূন্য, এরূপভাবে কে প্রত্যক্ষের অপলাপ করিবে? এক নিত্য পদার্থ (আত্মা) বহু অনিত্য পদার্থের শরীর পরিগ্রহ করিয়া, জীবের জ্ঞান-গোচরীভূত হন, ইহাতে আর বিচিত্র কি? *

বাসন্তী। প্রভু! তবে আত্মার সহিত শরীরের কিরূপ সম্বন্ধ, তাহার প্রকৃত তত্ত্ব আমায় বুঝাইয়া দিন।

জাবালি। দুরূহ কথা! তবে সামান্য উদাহরণের দ্বারা বুঝাইতেছি শুন। যেমন একখানি বস্ত্রে মৃগনাভি গন্ধ মিশাইলে, বস্ত্রের আকৃতিগত কোনও তারতম্য হয় না, কেবল মাত্র দ্রব্য বিশেষ সংযোগে তাহার সৌগন্ধ অনুভব করা যায়;

* আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবিতিষ্ঠত্যেক; তিষ্ঠত্যেক স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং। (শ্রুতি)।

সেইরূপ আত্মা যখন শরীর-সংযোগী হইয়া থাকেন, তখন হস্ত পদাদির ক্রিয়ায় আত্মা সক্রিয় বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। প্রকৃত পক্ষে কিন্তু আত্মা "নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত; শরীরের সহিত আত্মার আধার-আধেয় সম্বন্ধ। আত্মা আধার, শরীর আধেয়। শরীর বলিতে হস্ত পদাদি ইন্দ্রিয় সমষ্টিকেই বুঝায়। এই ইন্দ্রিয় সমষ্টির অধিষ্ঠাতা চৈতন্যময় আত্মা। দেখ, ঘটের রূপ-জ্ঞান উপলব্ধির জন্য চক্ষু-সন্নিকর্ষ আবশ্যক, আর চক্ষু-সন্নিকর্ষ-সাধন জ্ঞান; তাহা আত্মার পক্ষেই সম্ভব।

বাসন্তী। প্রভু! তাদৃশ জ্ঞান শরীরেরও ত' হইতে পারে, তবে কি আধেয় শরীরও আত্মপদ বাচ্য? *

জাবালি। আত্মার ইঙ্গিতে, প্রাণাপানাদির বায়ুর ক্রিয়া চলিতেছে। মায়ার আবরণ অপসারিত হইলে, আত্মারই ঘন চৈতন্যময় মূর্ত্তি সাধকের নয়ন-পথে পতিত হয়। শরীরে ত' এ সকল ধর্ম্মের সমাবেশ লক্ষিত হয় না, সুতরাং আত্মা শরীর হইতে ভিন্ন পদার্থ ইহা স্বীকার করিতে হইবে।

বা। প্রভু! প্রাণাদির ক্রিয়া কি শরীরে সম্ভবপর নহে? শরীর কি চৈতন্য-বিহীন? তবে, শরীরে আঘাত লাগিলে, যন্ত্রণা অনুভব করি কেন?

জা। প্রাণধারণ যে শরীরের গুণ নহে,—সাধু-হৃদয়ে পর-হিতৈষণার মত,—পদ্মের সুগন্ধিতার মত, উহা যে আত্মার ধর্ম্ম, তাহা কি আজও অবগত হও নাই? প্রাণ যদি শরীরের গুণ হইত, তাহা হইলে জীবগণ মর্ত্ত্যধাম ত্যাগ করিতে গিয়া, আত্মীয় স্বজনের হৃদয়ে দারুণ শেল প্রোথিত করিত কি? † প্রাণ লইয়াই ত' যত সমস্যা। যদি শরীর থাকিলেই প্রাণ থাকিত, ত' কিসের এত দুঃখ? সুবর্ণ পিঞ্জরে সাধের পাখী যদি চিরদিন আবদ্ধই রহিল, তবে আর গৃহস্বামীর তাহার উড্ডয়ন জন্য খেদ বা উদ্বেগের আশঙ্কা কোথায়? সেইরূপ বুঝিতে হইবে মৃত শরীরে শরীরত্ব ও রূপাদিগত ধর্ম্ম থাকিলেও, প্রাণ থাকে না। আরও দেখ বাসন্তি! শরীর চৈতন্যময় হইতে পারে না। তুমি আপনাকে বীর বলিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত করিতে ইচ্ছা করিলে; তোমাকে বিপদে ধৈর্য্য

* দেহ এবাত্মা, স চ স্থিরোঽপ্যনুক্ষণ পরিণামী, জায়তে চ নশ্যতি চ, প্রত্যক্ষসিদ্ধমেবৈতৎ। —ইতি লোকায়তদর্শনে।

† মীমাংসাদর্শন। প্রথম অধ্যায়,—প্রথম পাদ।

দেখাইতে হইবে—কখনও অধীরতা প্রকাশ করিলে, তোমার সঙ্কল্প সিদ্ধ হইবে না। 'বহ্নিমান্' বলিতে,—যাহাতে বহ্নি আছে, তাহাই বোধ হয়; সরোবরে বহ্নি নাই, সুতরাং তাহা সরোবরকে বুঝাইবে না। চৈতন্যময় সম্বন্ধেও সেই কথা। শরীরকে যদি 'চৈতন্যময়' বল, তবে শরীর থাকিলেই চৈতন্যের থাকা প্রয়োজন; নচেৎ তাহার চৈতন্যময়ত্ব সিদ্ধ হইবে না। কিন্তু মৃত শরীরে ত' চৈতন্য নাই; অতএব শরীর চৈতন্যময় পদার্থ হইতে ভিন্ন।* আত্মাই চৈতন্যময়—"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ানাত্মাস্য জন্তোর্নিহিতো গুহায়াং।" ইহারই বিশ্ব-নিয়ন্তৃত্ব শক্তি আছে। ইহাই "নিত্য শুদ্ধ মুক্ত স্বভাব পরম-ব্রহ্ম"। এই পরম ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভের জন্য সংসারে অনিত্য শরীরী মাত্রই নানা বাধা বিঘ্নের ভিতর দিয়া কত শত জীবন অতিবাহিত করিতেছে।

বা। শরীরের আবরণ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া, পরব্রহ্মে একীভূত হইতে যদি শরীরীর কোটী কোটী যুগ মান অতিবাহিত করিতে হয়, তবে কেন প্রভু! কল্পান্তেও আত্মা শরীর সংযুক্ত হ'ন?

জা। সৃষ্টিপ্রবাহের নৈরন্তর্য্যের ন্যায়, আত্মার কল্পে কল্পে অংশতঃ শরীর সংযোগও অবশ্যম্ভাবী। দেখ বাসন্তি! জীবগণ যেরূপ কর্ম্ম আচরণ করে, তদ্রূপ এক একটী অদৃষ্ট জন্মায়। সেই অদৃষ্ট পরমাণু-পরমাণুরূপে পুঞ্জাকারে পরিণত হয়,—ক্রমে তাহার আশ্রয়ের আবশ্যকতা হয়। তখন আত্মা আশ্রয়ীরূপে, অদৃষ্টরূপ শরীর আশ্রয়রূপে পরস্পর সম্বন্ধ হইয়া থাকে। এই অদৃষ্ট কর্ম্ম-জন্য। "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াং স্বর্গকামঃ"—অগ্নিহোত্র হোম করিলে স্বর্গ হয়, সে স্বর্গ ঐহিক ভোগ্য নহে; তাহা পরকালে ভোগ করিতে হয়। কর্ম্ম কিন্তু ইহকালে বিলুপ্ত;—বিলুপ্ত কর্ম্ম কিরূপে স্বর্গসাধন করিবে? এজন্য অদৃষ্টই স্বর্গের দ্বার। আবার স্বর্গভোগের দিন সমাপ্ত হইলেই, এই স্থূলদেহ গ্রহণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে আসিতে হয়—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।" কর্ম্মময় জগতে অবিচ্ছিন্নতাই যে রীতি।

তবে ইহাও জানিও বাসন্তি! আমাদিগকে কল্পের মধ্যেই আত্ম-লাভে যত্নবান হইতে হইবে। আত্মজ্ঞান পিপাসাকে সম্বল করিয়া, নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্মের দ্বার দিয়া, আমাদিগকে নিঃশ্রেয়স লাভে তৎপর হইতে হইবে। ঐ দেখ

* ভাষা পরিচ্ছেদ ৪৯ শ্লোক।

বাসন্তি! দুইটী প্রখর-তোয়া নদী 'পুণ্যক্ষেত্র ব্রহ্ম সদন' হইতে নিঃসৃত হইয়া দুইদিকে প্রবলবেগে ধাবমানা হইয়াছে। একটী কর্ম্মরূপা যমুনা, অপরটী জ্ঞানময়ী জাহ্নবী। প্রথমটীর ফলে যাগাদি সদাচারের অনুষ্ঠান—কর্ম্মের চর্চ্চা। কর্ম্ম ব্যতীত জীব ক্ষণমাত্র তিষ্ঠিতে পারে না। কর্ম্ম সকাম ও নিষ্কামভেদে দ্বিবিধ। সকাম কর্ম্মের ফলে জীব স্বর্গাদিলোক লাভ করে; পরন্তু পুণ্যক্ষয় হইলে আবার মর্ত্ত্যধামে ফিরিয়া আইসে। ইহার কথাই তোমায় পূর্ব্বে বলিতেছিলাম।

নিষ্কাম-কর্ম্ম, ঐহিক ও পারত্রিক শুভ ফল প্রসব করে। সিদ্ধি এরূপ কর্ম্মীর করতলগত। * এই নিষ্কামকর্ম্মের উপদেষ্টা জনক, অশ্বপতি প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণ; তাঁহাদের সুকৃত-প্রভাবে, আজও আর্য্যাবর্ত্তের মধ্য দিয়া কর্ম্মরূপা যমুনা প্রবল বেগে ছুটিতেছে।

আর জ্ঞানময়ী জাহ্নবী ব্রহ্মজ্ঞান-দ্বারা ভব বন্ধন মোচন ও পর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার-রূপ অভীষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। এই জ্ঞানের অধিকারী হইতে হইলে, কর্ম্ম-ত্যাগ বা কর্ম্ম-সন্ন্যাস একান্ত কর্ত্তব্য। চিত্ত শুদ্ধির জন্য ধ্যান-ধারণায় সমাহিত-চিত্ত জ্ঞানমার্গের পথিকের হৃদয়ে কোন শুভ লগ্নে এক দিব্য জ্যোতির উন্মেষ হয়। তাহার অম্লান হাস্যচ্ছটায়, অবিদ্যার করাল কুজ্ঝটিকা দূরে বিলীন হইবে, বাসনার প্রবল-বাত্যা স্তিমিততার ক্রোড়ে আশ্রয় লইবে,—বহুকাল-পুষ্ট হৃদয়-ক্ষোভ যেন কাহার মায়া-যষ্টি স্পর্শে আনন্দ-ঘন শান্তির ধারায় আপনাকে নিমজ্জিত করিবে। সেই সে ব্রহ্মবিদ্যার পরিণতি, সেই সে, মায়ামুগ্ধ জীব! তোমার অনন্ত মুহূর্ত্ত, যখন—"ছিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থিছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।

ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

বাসন্তি! ইহার পথ-দ্রষ্টা বশিষ্ঠ, ব্যাস, কণাদ, গৌতম প্রভৃতি জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মজ্ঞান-পরায়ণ সাধকবৃন্দ। ইহাই ত' পন্থা।

এস বাসন্তি! তাঁহাদের উজ্জ্বল কীর্ত্তি মানসপটে চিত্রিত করিয়া, তাঁহাদের পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণে ভগবানকে লক্ষ্য করি। আমরাও দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ, সুখেষুবিগতস্পৃহঃ, বীতরাগভয়ক্রোধঃ হইয়া, সাধু ও শাস্ত্রের কৃপার আশ্রয় লইয়া, জ্ঞানময়ী জাহ্নবীর জলে অঙ্গ ভাসাইয়া দিই। অবশ্যই কূলে উঠিতে পারিব।

ভট্টপল্লী। শ্রীমন্মথনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ।

---

* কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ—গীতা।

প্রণব-রহস্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

আমরা প্রথমে প্রণব সম্বন্ধে শাস্ত্রের উক্তি সকল বিবেচনা করিয়া, এই সকল উক্তি দ্বারা প্রণবের স্বরূপ, যুক্তি ও আত্মানুভূতির সাহায্যে নির্দ্ধারণ করিতে প্রয়াস করিব। যদি প্রণব বিশিষ্ট শব্দ মাত্র হয়, তাহা হইলে মানব জীবনে তাহার কোন বিশেষ কার্য্যকারিতা সিদ্ধ হইতে পারে না। "অ-উ-ম" না বলিয়া "হ য ব র ল' বলিলেও ত' চলিতে পারিত। আত্মতত্ত্ব প্রতিপাদন করিবার জন্য, সেই ভাবে প্রণবের স্বরূপ, স্থির করিতে হইবে।

শ্রুতি বলিলেন,—"ওমিত্যেতৎ" অর্থাৎ ওমই 'এতৎ' শব্দবাচ্য। "ওমিত্যাত্মানং যুঞ্জীত"—আত্মাকে ঐ রূপে ভাবনা করিয়া যোগ করিবে। 'এ'+'তৎ'='এতৎ'। "একার স্তোভঃ এহীতি চাহ্বয়ন্তীতি" (ছান্দোগ্য-ভাষ্য ১।১৩।১০০।২।) 'এ' দ্বারা আহ্বান করা বা নির্দ্দেশ করা হয়। 'তৎ'শব্দ শুদ্ধ সোঽহং তত্ত্ব বা শ্রীভগবানের বাচক। সুতরাং 'এতৎ' শব্দে প্রত্যক্ষ অহং বাদ আত্মাকে নির্দ্দেশ করা হয়। ' প্রত্যক্ষোঽহাত্মা ইহেতি ব্যাপদদিশ্যতে' (ছান্দোগ্য-ভাষ্য ১।১৬।৯৯।) প্রত্যক্ষ আত্মাকে 'ইহ' বা 'এই' শব্দে লক্ষিত করা হয়।

এতদ্দ্বারা বুঝা গেল, যে শাস্ত্র ওম্ বা প্রণব সাহায্যে পুরুষ বা 'অহং' তত্ত্বকে বুঝিতে উপদেশ দেন। "স (প্রণব) আত্মস্বরূপমেব তদভিধ্যায়কত্বাৎ" (মাণ্ডুক্য-ভাষ্য ; ১)। ওঁকারই আত্ম-স্বরূপ, কারণ ইহা আত্মার অভিধায়ক বা নাম স্বরূপ। "তস্য বাচক : প্রণব" ;—প্রণব পরম-পুরুষের বাচক ; ইহাও পাতঞ্জলের মত॥ ভাগবত বলিলেন,—

সমাহিতাত্মনো ব্রহ্মন্ ব্রহ্মণঃ পরমেষ্ঠিনঃ।
হৃদ্যাকাশাদভূন্নাদো বৃত্তিরোধাদ্বিভাব্যতে।

* * *

ততোঽভূৎ ত্রিবৃদোঙ্কারো যোঽব্যক্ত প্রভবঃ স্বরাট্
যত্তল্লিঙ্গং ভগবতো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ। ভাঃ—১২।৬।৩৭।৩৯।

"হে ব্রহ্মন্,—পরমেষ্টি ব্রহ্মা বহির্ম্মুখী-ভাব ত্যাগ করিয়া, তপস্যাদ্বারা সমাহিত আত্মা হইলে, 'সর্ব্ব'-বৃত্তি রোধের দ্বারা বিভাবিত বা পুটীত হইয়া, তাঁহার হৃদয়াকাশ হইতে পরাভিমুখী এক 'নাদ' উৎপন্ন হইল। তাহা হইতে ত্রিমাত্র ওঁকার উৎপন্ন হইল। এই ওঁকার স্বরাট্ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ, অব্যক্ত প্রভব অর্থাৎ পর পুরুষোত্তম-রূপ অব্যক্ত-তত্ত্বের প্রকাশ ও সেই পরাভিমুখী। ইহাই পরমাত্মা ব্রহ্মের লিঙ্গ।" শ্রীধর স্বামী ওঁকার তত্ত্ব যে কেবল "অ-উ-ম" তিনটী অক্ষরের সমন্বয় নহে, ও উহা যে নির্গুণ পুরুষোত্তমের বাচক, তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন,—"ত্রিবৃৎ ত্রিমাত্রঃ। কণ্ঠোষ্ঠাদিভিরুচ্চার্য্যমানস্য ওঙ্কারস্য অক্ষর-সমাম্নায়ান্তর্ভাবাৎ সূক্ষ্মতয়া তং বিশিনষ্টি। অব্যক্তঃ প্রভবো যস্য সঃ। তদেবাহ স্বরাট্ স্বতঃ এব হৃদি প্রকাশমানঃ। তমেব কার্য্যেণ লক্ষয়তি। যত্তদিতি। নপুংসকত্বং 'লিঙ্গ' শব্দ বিশেষণত্বাৎ। লিঙ্গ-গমকম্। ৩৯। প্রণব যে নির্গুণ, সুতরাং ক্লীবলিঙ্গ দ্বারা লক্ষিত পরম-পুরুষের লিঙ্গ বা গমক এবং ব্যক্ত অক্ষরত্রয়ের অন্তর্নিহিত সূক্ষ্ম-ভাবের বাচক,—তাহা পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রণবকে উদ্গীথরূপে লক্ষিত করা হইয়াছে। 'তস্মাদুদ্গীথস্তস্মাদ্বেবোদ্গাতা," (১।৬।৫৪) শঙ্কর বলেন, "স এষ দেব উন্নামা, যো চামুষ্মাদাদিত্যাৎ পরাঞ্চঃ পরাগঞ্চঃৎ"। সেই প্রকাশশীল তত্ত্ব বা দেবকে 'উৎ' নামে অভিহিত করা হয়। ইনি আদিত্যগণ হইতেও অতিগ (transcendent) বা পরাগঞ্চ, পরাক্ অঞ্চতি ইতি। "এতদ্বৈ সত্যকাম পরঞ্চাপরঞ্চ ব্রহ্ম যদোঙ্কার।" "হে! সত্যকাম এই ওঙ্কারই পর এবং অপর ব্রহ্ম।" এই গেল ওঙ্কারের পুরুষ-ভাব বা পরা গতি।

অপর পক্ষে ওঙ্কারই 'সর্ব্ব'। ভূত, ভবিষ্যৎ যাহা কিছু, ও যাহা ত্রিকালাতীত তাহাও ওঙ্কার। মাণ্ডুক্য এই উপদেশ দিলেন। "আত্মৈবেদম্ সর্ব্বম্,"—অর্থাৎ সর্ব্বকেও আত্মস্বরূপে জানিবে। "এবং নামত্বেন প্রতীকত্বেন চ পরমাত্মোপাসন-সাধনং শ্রেষ্ঠমিতি সর্ব্ব বেদান্তেষবগতম্।" (ছান্দোগ্য-ভাষ্য ১।) এই প্রকারে নাম বা পুরুষরূপে, ও প্রতীক্ বা রূপ ভাবে, প্রণবের সাহায্যে পরমাত্মার উপাসনাই উৎকৃষ্ট সাধনা। সর্ব্ব ভাবের সার বা রস রূপ, প্রণব। "স এষ রসানাং রসতমঃ পরমঃ পরার্দ্ধোঽষ্টমো যদুদ্গীথঃ॥" (ছান্দোগ্য ১।৩) এই ওঙ্কারই রস সকলের

রসতম ও সারভূত। উহা পরার্দ্ধ, অর্থাৎ যাহা 'পর' এবং 'অর্দ্ধ' বা অর্দ্ধ-মাত্রা রূপে অবস্থিত, সেই পরম পুরুষের অভিব্যক্তি।

চৈতন্যের দুই ভাবের ভাষা বা ইঙ্গিত আছে। একটীকে আমরা 'আমি' বোধ বা 'আমি' জ্ঞান নামে অভিহিত করি; আর একটীকে 'জগৎ' 'বহু' বা সর্ব্ব শব্দের মধ্যে অনস্যূত একত্ব-জ্ঞান রূপে লক্ষিত করি। একটী বেদান্তের 'সোঽহং' জ্ঞান, আর একটী "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" বুদ্ধি। বাহিরের দিকে "সর্ব্ব" নামে এবং ভিতরের দিকে 'অহং' নামে অভিহিত এই দুইটী একেরই ভাব। 'আমি' ভাবটীকে অভিধান বা 'নাম' ও 'সর্ব্ব' ভাবটাকে অভিধেয় বা 'রূপ' বলে। অঙ্ক শাস্ত্রে, 'নাম' অর্থে term ও 'রূপ' অর্থে expansion অভিব্যক্তি ও series সংস্থা। আমি সর্ব্বাবস্থায় এক; খাইবার সময়ও যে 'আমি'; পড়িবার সময়ও সেই 'আমি'। কিন্তু প্রকাশ-ভাবের তারতম্য আছে। 'আমিতে' খাইবার ইচ্ছা জন্মিল। অমনি আহার্য্যের সংগ্রহ, রন্ধন, ভোজনাগারে গমন, আচমন, চর্ব্বণ, শোষণ, লেহন, পান, বস্তুর বিপাক, সার-গ্রহণ, সুখবোধ ও তৃপ্তি প্রভৃতি ভাব ও ক্রিয়ারাশি 'আমির'-ক্ষেত্রে প্রসূত হইল। তদ্রূপ 'আমিতে' পড়িবার ইচ্ছা উৎপন্ন হইলে, বর্ণ পরিচয় হইতে আরম্ভ করিয়া, পাঠে তৃপ্তি, আনন্দ বোধ, প্রভৃতি অনন্ত ভাবরাশি উৎপন্ন হইল। আমি একরস ঘন নিত্য; তবে খাই-বার বিশিষ্ট 'আমি', পড়িবার 'আমি', ও ধ্যান করিবার 'আমি', পৃথক বলিয়া বোধ হয়। যতক্ষণ 'আমি' স্বীয় ভাবে, পুরুষরূপে থাকে, ততক্ষণ উহা এক; কিন্তু ঐ পুরুষ বুদ্ধিটীকে বিশিষ্ট করিয়া 'আমি' কি প্রকার তাহা জানিতে ইচ্ছা হইলে, 'আমির' স্বরূপ স্থির শাশ্বত ভাবটী দ্রব হইয়া, অনন্ত ক্রিয়া ভাব ও বস্তুরূপে প্রকাশিত হয়। ঐ প্রকাশ বা গতিশীল ভাবকে জগৎ বলে; উহাই দর্শন শাস্ত্রের প্রকৃতি। উহা বৃত্ত (circumference) অভিমুখী। বহুত্ব বুদ্ধি যথায় অবসান প্রাপ্ত হয়, সেইটীকেই আমরা 'আমি' বলি। বৃত্তরূপ ভাবগুলিতে কেন্দ্ররূপে 'শয়ান' আছে ও বৃত্তের বহুত্বগুলি পুরুষকে অবলম্বন করিয়া 'আমি' এই আশ্চর্য্য, অদ্বিতীয় বোধে শান্ত বা লীন হয় বলিয়া, তাহার নাম 'পুরুষ'। প্রকৃষ্ট বস্তু ক্রিয়া প্রভৃতি বৃত্তরূপে যে চৈতন্যের গতি দৃষ্ট হয়, তাহাকে প্রবৃত্তি বলে। সুতরাং চৈতন্যের সকল বাহ্য ব্যাপারের মূলে একটী অঙ্কই রহিয়াছে। তাহা এইরূপ—

(আমি)$^{সর্ব্ব}$ = জগৎ বা সংস্থ (series) ভাব। ঐ প্রবৃত্তিই গীতোক্ত পুরাণী প্রবৃত্তি। যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী॥ গীতা ১৫।৪॥

আমরা সম্মোহন বিদ্যার সাহায্যে উপরোক্ত ভাবের অঙ্কটী আর একটু বিশেষ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করিব। রামকে সম্মোহিত করিয়া বলা হইল, "তুমি স্ত্রীলোক; পুরুষ নহ।" তাহাতে রামে কতকগুলি বিস্ময়কর ভাব ও ক্রিয়া প্রকাশিত হইল। রাম আপনাকে যে বিশিষ্ট ভাবে বুঝে, সেই ভাবটী তাহার 'আমির মাত্রা'। তাহার ফলে 'অহংটী' আত্মস্বরূপ হইতে চ্যুত হইয়া, সর্ব্বদা বাহিরের বিশিষ্টতার অভিমুখী হইয়া আসিবে। সে "আমি কি' বুঝিবার জন্য, বাহিরের বিশিষ্টের দিকে চক্ষু ফিরাইয়া আছে। 'আমি' পদার্থটী বাস্তবিক পক্ষে, ভেদ-বিশিষ্টতায় স্থির থাকিতে পারে না। কারণ 'আমি' বা 'জ্ঞ'র ভিতরে সর্ব্বদাই 'সর্ব্ব' বা সর্ব্বাত্মিকা ভাবের বীজ আছে। 'সর্ব্ব' ভাবের মধ্যে 'জ্ঞ'টাই প্রকৃত 'আমি'। সেইজন্য 'আমি'তে বিশিষ্টতার 'মাত্রা' আরোপ করিলে, 'আমি'টী 'সর্ব্বকে' বাহিরে দেখিয়া, তাহার মধ্যে আপনার বিশিষ্ট ভাবের পরিপুষ্টির জন্য তজ্জাতীয় "সর্ব্ব" ভাবগুলি সংগ্রহ করিবেই করিবে। জীব শ্রীভগবানের প্রতি-মূর্ত্তি বলিয়া সর্ব্বাত্মিকা ভাব একেবারে ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। তবে তাহার অহং যে ভাবে সন্নিবিষ্ট, সে সেই ভাবের বা জাতীয় 'সর্ব্ব' আহরণ করে। এই "সর্ব্বাহরণ প্রবৃত্তিকে", সাংখ্য 'প্রকৃতি' নামে গ্রহণ করে। সুতরাং প্রথম অঙ্কে (অহং)$^{বিশিষ্টতা}$ = জীব এই ভাব আছে। এই বিশিষ্টতা মাত্রাটী আবার রাম নামে স্থূল অভিমানে রঞ্জিত হইল; সুতরাং অঙ্কের দ্বিতীয় স্তর এইরূপ ((অহং)$^{বিশিষ্টতা}$)$^{স্থূল-প্রবণতা}$ = রাম। আমিটীকে 'সর্ব্ব' হইতে স্থূল ভাবে বিচ্ছিন্ন করে বলিয়াই, স্থূল-ভাবটি প্রবৃত্তি-মাত্রা রূপে রামের বিশিষ্ট অহংজ্ঞানকে স্থূলাভিমুখী করে, এবং বিশিষ্ট স্থূলের মধ্য দিয়া, তাহার ভিতরের 'আমির' স্বরূপ নির্দ্ধারণে চালিত করে। ঐ স্থূল-প্রবণতা হিন্দুরও যেরূপ, অন্যান্য জাতীরও সেইরূপ। উহা সামান্য ভাব। সেইজন্য ঐ স্থূল-প্রবণতা-বিভিন্ন বিশিষ্ট সংস্কারাদির দ্বারা নিয়মিত হইয়া কার্য্য করে। হিন্দু ভাবের সংস্কারের দ্বারা চালিত হইয়া, রাম হিন্দুভাবে বাহিরের 'সর্ব্ব'ভাবগুলির সমন্বয় করিতে চায়। রাম খৃষ্টান দেহে জন্ম গ্রহণ করিলে, খৃষ্টীয় ধর্ম্মোক্ত ভাবে আপনাকে সংসিদ্ধ করিতে চায়। সুতরাং সামান্য 'স্থূলতা' মাত্রাটীর উপর, বিশিষ্ট সংস্কারের মাত্রা আছে।

এই সংস্কারের মাত্রা দ্বিবিধ। ইহাতে রামের ইহজন্ম কৃত ক্রিয়া ও চিন্তার শক্তি বা বীজ আছে। আবার সংস্কারে জাতিগত আরও কতকগুলি বীজ আছে। সুতরাং তৃতীয় স্তরের অঙ্কটী এইরূপ হইবে—$(((\text{অহং})^{\text{বিশিষ্টতা}})^{\text{স্থূলতা}})^{\text{সংস্কার}} = \text{রাম}$।

আমাদের শাস্ত্রোক্ত জীবের কোষ যে কি পদার্থ, পাঠক তাহার আভায পাইলেন; হিন্দু শাস্ত্র যে কত গভীর, তাহা বোধ হয় একটু বুঝিতে পারিলেন। এইবার রামের উপর স্ত্রীত্বরূপ আর একটি মাত্রা পড়িল। রাম 'স্ত্রী' শব্দে যদি আহার বিহার প্রভৃতি কর্ম্মের বিশিষ্ট সমষ্টি বুঝে, তাহা হইলে রামের ভিতরের পুরুষ ভাবটী কেবল স্ত্রী-সুলভ ক্রিয়া প্রভৃতি দ্বারা রঞ্জিত মাত্র হইবে; অর্থাৎ রাম গণিত প্রভৃতি যে সকল বিদ্যা অনুশীলন করিয়াছিল, তাহাদের সংস্কারগুলি ও কামনাক্ষেত্রে লব্ধ সংস্কারগুলি অটুট্ থাকিবে। কেবল বাহিরের ক্রিয়াগুলি স্ত্রীভাবাপন্ন হইবে। এইরূপ অবস্থায় তন্দ্রাবশে রাম ঘোম্‌টা দিবে, স্ত্রী-সুলভ হাব-ভাবাদি প্রকাশ করিবে; নাম জিজ্ঞাসা করিলে হয় ত 'রামমণি' বলিবে। কিন্তু বিজ্ঞান অনুশীলন ও বিজ্ঞানের অবিশেষ চিন্তায় সিদ্ধ থাকাতে, এ অবস্থাতেও বিজ্ঞানের কথা বলিলে সে তাহা বুঝিতে পারিবে। তবে তাহার স্থূল ভাব ও ক্রিয়াগুলি স্থূল স্ত্রীভাবে নিয়মিত হইবে। ঘোম্‌টা, হাব ভাবাদি ক্রিয়াগুলি কেবল বাহিরের ভাষায় তাহার স্ত্রীত্ব বোধটী ফুটাইবার জন্য। বোধটি ঐ সকল ক্রিয়ার সাহায্যে পরিণত ও পরিসমাপ্ত হইতেছে। স্ত্রী জ্ঞানটী তাহার 'আমি' জ্ঞানটীর সহিত মিশে নাই, কারণ, সে জানিত যে, 'আমি পুরুষ, আর স্ত্রী আমার বাহিরের পদার্থ'। স্ত্রী ও পুরুষে যদি একই চৈতন্য স্বরূপ দেখা তাহার অভ্যাস থাকিত, তাহা হইলে তন্দ্রাবস্থায়ও তাহাকে স্ত্রী-সুলভ ক্রিয়াদি প্রকাশ করিয়া দর্শকগণের নিকট হাস্যাস্পদ হইতে হইত না। তখন কোন জাতীয় ক্রিয়াই হইত না। 'আমির' স্বরূপ না বুঝাই ত' বিশিষ্ট স্ত্রীবুদ্ধি ও স্ত্রী-সুলভ বহুবিধ ক্রিয়ার মূল কারণ। সংসার যে অজ্ঞান-মূলক, পাঠক! তাহার আভায পাইলেন। কিন্তু এই অজ্ঞানের মূলেও সর্ব্বাত্মিকতা ভাব আছে। সকল স্ত্রীলোক যেরূপ হাব-ভাব করে, রাম তন্দ্রাবস্থায় সেইরূপ হাব-ভাবই প্রকাশ করিবে। বিশিষ্ট কোন স্ত্রীলোকের মত নহে। পাঠক! আর একটু বুঝিয়া দেখুন; বিশিষ্ট হাব-ভাবাদি বস্তুগুলি, বিশিষ্টরূপে সামান্য স্ত্রীত্ব বুদ্ধিকে আঁকি-বার জন্য। বহির্ম্মুখী প্রবণতারূপ অব্যক্ত ভাবটী, অবিশেষ স্ত্রীত্ব বুদ্ধির সাহায্যে,

স্থূলতর বিশিষ্ট ক্রিয়াদি ভাবে পরিণত হইয়া, পুনঃ ক্রিয়ার নিবৃত্তিতে স্রীষ্ক-বৃদ্ধিতে মিলিত হইয়া বীজভাবে থাকে। সেইরূপ আমাদের স্থূল ক্রিয়াগুলি কামনারূপ অবিশেষ ভাবে ও কামনারূপ অবিশেষ ভাবগুলি বিজ্ঞানরূপ অবিশেষ বোধে বীজরূপে থাকে। বস্তুতে সুখ আছে, এরূপে বহির্বিষয়ে যে সামান্য বোধ আছে, তাহা হইতেই কামনার উদ্ভব হয়; এবং কামনা হইতে বিশিষ্টতর ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। ঐ সুখ-বোধটী মানসিক অবিশেষ ভাব; উহা হইতে অসংখ্য কামনার উৎপত্তি হয়। ঐ সকল পুত্রৈষণা ধনৈষণা নামে অভিহিত হয়। মনের সুখ-দুঃখাদি-বোধের উপরও তাহার বীজ স্বরূপ বহির্ম্মুখীনতা-রূপ বিশিষ্ট জ্ঞান আছে। তাহা না থাকিলে আমরা বাহিরে সুখ খুঁজিতে যাইব কেন? ঐ বহির্ম্মুখীনতার ভিতরে বিশিষ্ট 'আমির' অতিগ বা অতিরিক্ত অস্তিত্বের পিপাসা আছে। 'আমি'কে ছোট করিয়াছি বলিয়াই, 'আমি'র 'সর্ব্ব' ভাবটী, বিশিষ্ট 'আমি'র বাহিরে 'আমি'র সমজাতীয় ভাবে রহে। সাংখ্য শাস্ত্রের পুরুষ বিশিষ্ট 'আমি', সেই জন্য ভগবানের 'সর্ব্ব'ভাব বা সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা, প্রকৃতি পুরুষকে 'সর্ব্ব' ভাব শিখাইবার জন্য বাহ্যিক বহু-প্রবণতারূপে খেলিতে থাকে। 'আমি'র বাহ্য ভাবগুলি প্রকৃতি-কৃত। ভগবান জীবরূপে 'বহু' হইতে চাহিলেন, ভগবান-রূপ অগ্নি হইতে অপেক্ষাকৃত বিশিষ্ট ও অংশ স্বরূপ স্ফুলিঙ্গ সকল বিক্ষিপ্ত হইল। এই জীব-শক্তির মূলে একোঽহং ভাবের প্রাধান্য আছে; সেই জন্য প্রত্যেক জীব আপনাকে এক ও অহংরূপে স্বতঃই বুঝিতে যায়। এইরূপে ভগবানের অদ্বিতীয় অর্থাৎ দ্বিতীয়-শূন্য একতা ও অহং ভাব, ব্যক্ত ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অহং বা ভেদাত্মক অদ্বিতীয়তামূলক 'আমি' রূপে অবস্থিত। অপর দিকে, তাঁহার 'সর্ব্ব' স্বরূপ-সর্ব্বাত্মক ভাবটী,—যাহাতে তিনি বাস্তবিক এক, সর্ব্বের মধ্যেও এক, বিশেষ ও অবিশেষ প্রবণতা প্রাপ্ত হইয়া, বহু-ভাব-প্রসবিনী প্রকৃতি হইল। 'সর্ব্ব মানব বলিলে আমরা একত্বই বুঝি' ও ''বহু মানব' বলিলে আমরা বহুত্ব বুঝি। পুরুষ অহমাত্মক; তাহাকে জীব সর্ব্বদা 'অহম্' রূপে অভিহিত করে। "অহমিতি প্রবদন্তি জীবম্" (ভাঃ ১২।৩০।৭)। প্রকৃতি সর্ব্বাত্মিকা। একই পুরুষোত্তমের বা ব্রহ্মের এ দুইটী ভাব মাত্র; তাঁহার স্বরূপাভিব্যক্তির (Self expression' অঙ্কের স্তর বা Step মাত্র। যেন তিনি তাঁহার ঘন একরস সর্ব্বজ্ঞতা ভাব অঙ্ক কসিয়া বুঝিতে ইচ্ছা করিলেন। সেইজন্য সোঽহং বা 'আমির' তৎ বা পরব্র

এবং অহং 'সর্ব্ব' 'আমিই সব', এই দুই স্তরের সাহায্যে সেই আমিই সব ভাব সমাধান করিলেন। যেমন একই নিষ্ক্রিয় লৌহখণ্ড তড়িৎ সন্নিকর্ষে উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্র (Pole) রূপ পরস্পর-সংযুক্ত মিথুন-ভাবে প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ সেই পুরুষের বৈশারদী মতি বা প্রজ্ঞা তাঁহার ইচ্ছা শক্তির সন্নিকর্ষে অবিভক্ত হইয়াও যেন পুরুষ ও প্রকৃতি ভাবে প্রকটিত হইল।

ওমিত্যেতদক্ষরমুদ্গীথঃ। তদ্বা এতন্মিথুনং যদ্বাক্ চ প্রাণশ্চক্ চ সাম চ ॥
(ছান্দোগ্য শ্রুতি ১।১।৫)।

অক্ষর ওঙ্কারই উদ্গীথ ভাবে, বাক্ ও প্রাণ, ঋক্ ও সাম্ এই মিথুন। এই দুইটী একেরই অভিব্যক্তি বলিয়া দুইটীকে বাস্তবিক বিভক্ত করা যায় না। "ন, স্বতো ভেদানভ্যুপগমাৎ।" "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়" ইতি শ্রুতেঃ। "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।" "অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্" ইতি স্মৃতেশ্চ। ছান্দোগ্যোপনিষৎ—শঙ্করভাষ্যঃ।* ভেদ বাস্তবিক নাই, 'এক দেব বা স্বপ্রকাশ আত্মা বা পুরুষ, যিনি 'সর্ব্ব'ভাবাপন্ন ভূতে গূঢ়রূপে আছেন', "হে ভারত! 'সর্ব্ব'ক্ষেত্রে অর্থাৎ সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিরূপ ক্ষেত্রে আমাকে একই ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিবে"। অবিভক্ত হইয়াও ভূত সকলে এই আত্মা বিভক্তের ন্যায় আছে। প্রাণ ও বাক্ কি, তাহা পরে বিবৃত হইবে।

প্রকৃতি ও তদ্বিভক্তি কার্য্যাকারণ-সংঘাত বা সংস্থা (Series) যে আত্মার অভিব্যক্তি-রূপ বা কর্ম্মরূপতা। এ বিষয়ে ভাগবত বলেন।

তস্মাজ্জিজ্ঞাসয়াত্মানমাত্মস্থং কেবলং পরম্।
সঙ্গম্য নিরসেদেতদ্বস্তু বুদ্ধিং যথাক্রমম্।
আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং, বিদ্যা সন্ধি সুখাবহঃ ॥১১।১০।১১

সেই জন্য জিজ্ঞাসা বা আত্মানুসন্ধান দ্বারা বস্তু বা দৃশ্য বুদ্ধিকে আত্ম-সংস্থ অর্থাৎ আত্মাতে অধিষ্ঠিত ও তদ্দ্বারা অভিব্যক্ত বলিয়া বুঝিয়া—অর্থাৎ প্রকাশিত কার্য্যাকারণ পর্য্যায়কে কেবল ও পর আত্মবুদ্ধিতে অবস্থিত বলিয়া সম্যক্‌রূপে বুঝিবার পর, যথাক্রমে বাহ্য বস্তু-বুদ্ধি উপরত হয়। "যথাক্রমে" শব্দে "অ" "উ" "ম" ও "অর্দ্ধ" "মাত্রা" এই চারিটী ক্রম বা পাদ বুঝায়। এইরূপে গুরুকে আদি বা আধারভূত অরণি কাষ্ঠ ও শিষ্যকে উপরস্থ অরণি বলিয়া বুঝিবে। মাতা

* লোটাস্ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত অভিনব মাণ্ডুক্য উপনিষদ্ ২২ পৃঃ।

যেরূপ শিশুকে বুকে করিয়া স্তন্যপান করান, তদ্রূপ গুরু আধার-রূপে শিষ্যের সমস্ত বৃত্তি আকর্ষণ করিয়া, শিষ্যকে সর্ব্বদা হৃদয়ে রাখিয়া, প্রেমের আকর্ষণ দ্বারা হৃদয়ের মধু দ্বারা পুষ্ট করেন। প্রবচন বা শাস্ত্রোপদেশকে "তৎসন্ধান" অর্থাৎ "তৎ" পদার্থে সংযোগ করিবার উপায় বলিয়া বুঝিয়া, প্রত্যেক শাস্ত্র-বাক্যে গুরু-প্রেমলব্ধ শ্রীবিষ্ণুর মহান্ পদ বা অভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিবে। বিদ্যাকে, সন্ধি অর্থাৎ সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে গুরু, অহং ও উপদেশ এই তিন বুদ্ধি এক হইয়া যায়। এইরূপে অতি বিশুদ্ধ অর্থাৎ বিশেষ-ভাবের ভেদাত্মক-প্রবণতাশূন্য বৈশারদী অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ বা অতি-নিপুণ শ্রীভগবানের—সর্ব্বাত্মিকা ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ত্রিগুণ-প্রসূত মায়াকে নিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

বৈশারদী সাতিবিশুদ্ধবুদ্ধির্ধুনোতি মায়াং গুণমম্প্রসূতাম্। ভাঃ ১১।১০।১৩।

এইরূপে জীবে ও প্রকৃতিতে,স্বপ্রকাশ,জ্ঞান-স্বরূপ,নিত্য, আত্মাকে সত্য বলিয়া জানিলে কর্তৃত্বাদি ধর্ম্ম সকল ঔপাধিক বলিয়া বুঝিয়া, আত্মার অতিরিক্ত 'সর্ব্ব'ভাব মায়া বলিয়া জানিবে। 'সর্ব্ব'কে বিপরীত পক্ষে (Differenciate), অনিত্য। বলিয়া বুঝিয়া অন্বয়-পক্ষে 'সর্ব্ব'তে অহং এবং 'অহং'এ সর্ব্ব দেখিতে হইবে।

"অহং-প্রত্যয়-বিজ্ঞেয়ো জ্ঞাতব্যঃ সর্ব্বদৈব হি।" সর্ব্বদা অর্থাৎ 'সর্ব্বের' মধ্যে, প্রত্যয়ের দ্বারা বিজ্ঞাত এক 'অহংকে' জানা আবশ্যক। 'প্রত্যয়' শব্দ প্রতি পূর্ব্বক "ই" ধাতু দ্বারা নিষ্পন্ন হয়; 'প্রতি' শব্দে বিভিন্ন ও বিপরীত ক্রম বুঝায়। বিভিন্নার্থ লইলে বিভিন্ন 'বহু' বোধের মধ্যে, বস্তু-প্রবৃত্তির বিজাতীয় ভাবে 'অহং বুদ্ধি' ফুটিয়া উঠে,—এই কথা বুঝায়; এইজন্য মানব মনে করে যে, প্রতি শরীরে ও এমন কি, প্রত্যেক বৃত্তিতে, বিভিন্ন কর্ত্তা ও ভোক্তা বোধটাই 'আমি'; উহা লোক, কাল ও ধর্ম্মের অনুরূপে প্রতিবিম্বিত ভ্রান্ত বুদ্ধি। 'প্রতি' শব্দে বহির্মুখী বা দৃশ্য দ্বারা উপরোক্ত বুদ্ধি বা প্রবৃত্তি হইতে, বিলক্ষণ অন্তর্ম্মুখী বা এক ও পর trancendent অভিমুখী বলিয়া বুঝিলে, প্রত্যয়ের মধ্যে সেই শুদ্ধ একই দৃষ্ট হয়, ইহাই শাস্ত্রচক্ষু।

"অহং" ও 'সর্ব্ব' এই দুইটি মৌলিক চৈতন্য প্রবৃত্তি। এই দুইটিকে ওঁকার-তত্ত্বের সাহায্যে অন্বিত করিয়া, উভয়ের ভিতরের পর-পুরুষাভিমুখী প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইলে,জীব পুনরায় সেই ঘনজ্ঞানানন্দ রসে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ কথা পরে বিবৃত হইবে।

(ক্রমশঃ) শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলব্ধ বেদান্ত।

তুমি কে ?

(১)

তুমি কি গো ! সেই সরল মধুর
ললিত মূরতি মোর,
আধ-জোছনায় মাখা ভাসা কায়—
সুখের স্বপন-ঘোর ?
তুমি কি গো ! সেই কোমল লতিকা
বিমল ধবল সাজে,
চিতে চিত দিয়ে, হেরেছি যাহারে
বিজন কানন-মাঝে ?
তুমি কি গো ! মোর শারদ-আকাশে
মোহন মধুর-চাঁদ,
আবেশেরি বশে অবশ আকৃতি,
নয়নে নয়ন-ফাঁদ ?

(২)

তোমারি কি সেই শয়নে স্বপনে,
হৃদয়-হরণ-বল,
অলস-অবশ অমিয়-সরসে,
নবীন নলিনদল ?
তোমারি কি সেই মধুর কুসুমে,
সোহাগ মধুর বাস,
মিলায়ে মলিন-মানস মানবে
ভাবের ভকতি-হাস ?
তোমারি কি সেই ললাটফলকে
আদর-আকর দেশ,
সাঁঝেরি গগনে বিবিধ বরণে
বিকাশ, বিলাস-বেশ ?

(৩)

তোমারে চিনেছি কি জানি কেন গো !
নয়ন-সলিলে গলি',
মলিন জীবন-তটিনী-পুলিনে,
হরিত-বসনা বলি ;
তোমারে সাধিতে সাধনার সাধ,
জাগিত হৃদয়ে কত,
গিয়াছে সে সাধ, আশা মিশিয়াছে
আপনা আপনি শত।
তোমারে হেরিব কি ভাবে কহ না,
দেবী না মানবী বলি,'
মাতা, আদরিণী দয়িতা, অথবা
ভকতি-কুসুম-কলি !

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ এম, এ।

দেবযান ও পিতৃযান।

সেদিন "পন্থা"-সম্পাদক মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়া দেখি যে, একটি প্রকাণ্ড প্রবন্ধে দেবযানাদির কথা বলা হইয়াছে। প্রবন্ধটী সব স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম না ; মাত্র বুঝিলাম, ভগবানই একমাত্র পথ। পরে অনুরোধ করায় তিনি যেটুকু বুঝাইয়া দিলেন, তাহা পাঠকগণকে নিবেদন করিতেছি।

আমাদের 'আমি'টুকু কি পিতার রেতে বা মাতার রক্তে আছে? সুধু পিতার রেতে থাকিলে, গর্ভের আবশ্যকতা নাই; মাতার ভিতর না থাকিলে শরীর-গ্রহণ দ্বারা 'আমি' ভাবটী স্থির হইত না। আমরা অন্য বস্তুর সাহায্যে বস্তুর পরিমাণ করি; রাম কর্ত্তৃক রোপিত বৃক্ষ দ্বারা রামকে বুঝি। রাম শ্যামের পুত্র; যদুর কনিষ্ঠ; বিনোদের জামাতা; এইরূপ জ্ঞানে শ্যাম, বিনোদ প্রভৃতি বস্তুর সাহায্যে রামকে নিরূপণ করি, কিন্তু এইরূপে বুঝিবার সময় শ্যাম,যদু ও বিনোদকে অস্পষ্ট-ভাবে 'রাম-বুদ্ধিতে' দেখি। "ওঃ, তা'ই বটে, তুমি শ্যামের ছেলে! তা'ই কেমন একটা চেহারার মিল দেখ্‌ছি!" আমাদের যুক্তি এইরূপ। আমরা অন্ধকারের সাহায্যে আলোককে বুঝি; ধূমের দ্বারা বহ্নি নির্ণয় করি; এইরূপে অহং জ্ঞানের ভিন্ন জাতীয় ও এমন কি, প্রতিদ্বন্দ্বী বস্তু সকলের দ্বারা, 'অহং'কে নির্ণয় করি। একজনের নিন্দা না করিলে. আর একজনের প্রসংশা হয় না; ধর্ম্মবিশেষের গ্লানি না করিলে, অন্য ধর্ম্মের মহিমা বুঝিতে পারি না। এইরূপ 'বিরুদ্ধ-বহুর' সাহায্যে বিশিষ্ট 'আমি'কে নির্ণয় করা অর্থাৎ উপাধি ও লোকসাহায্যে 'আমি'কে বুঝিতে যাওয়াই পিতৃযান-মার্গ। পিতৃযান মার্গে দৃষ্টি, পিতৃগণের সাহায্যে প্রস্তুত দেহাদির দিকে থাকে। সুতরাং পিতৃযান অর্থে দেহের ক্রমোন্নতি দ্বারা বিশিষ্ট 'আমি' জ্ঞানের ক্রমোন্নতির পথ বুঝায়। কিন্তু ইহাতে প্রকৃত তত্ত্ব বোধ হয় না। কাচ হইতে আলোক প্রতিবিম্বিত হয় বটে; কিন্তু যদি কেহ বলেন, আলোকও কাচের ন্যায় ক্ষার-জাতীয় পদার্থ, তাহা হইলে আমরা তাহাকে পাগল বলিব। কিন্তু জীবকে বুঝিবার জন্য, যদি কেহ আমাদিগকে বাসনা, মনোময় ও কারণ-শরীরের নির্ম্মাণ-প্রণালী এবং ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি লোকের বস্তুর বৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যাদির বর্ণনা করে-এক কথায় 'বহুর' দিকে চাহিতে উপদেশ দেন, তাহা হইলে আমরা উহা তত্ত্ব-কথা বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু ভুক্ত অন্নে দেহ নির্ম্মিত হয় বলিয়া. দেহে ব্রীহিবুদ্ধি আনিলে চলিবে না। বস্তু হইতে অহং জ্ঞান প্রকট হয় সত্য, কিন্তু উহা বিপরীত বা ব্যতিরেক ক্রমে। 'জাতি'-বুদ্ধির সাহায্যে এই ব্যতিরেকে ক্রিয়া সিদ্ধ হয়। দেহের অণুগুলি ক্ষণভঙ্গুর; অথচ দেহের মৌলিক একত্ব ঠিক থাকে; যে দেহাতিরিক্ত ভাবে 'আমি'র অনুসন্ধান করি, সেই ক্ষণ-ভঙ্গুরত্ব 'জাতি' হইতে বিপরীতক্রমে স্থির-জাতীয় বুদ্ধির সাহায্যে 'আমির' আভাষ লাভ হয়। বিপরীত ক্রমে দেখিলে, পিতৃযান হইতেও লোকের মঙ্গল

হয়। সেই বিপরীত ক্রমটীর নাম সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি। তা'ই পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী 'দর্শ' শব্দে বিপরীতক্রমে 'অদর্শন' বা দেহের লয় বুঝিলেন। তা'ই দেহ-লয়ে আমাদের 'আমি' জ্ঞানের লয় হইলেও, সর্ব্বজীবে দেহের লয় বা বিনাশ দেখাইয়া শাস্ত্র দেহীর নিত্যতা দেখিতে বলেন।

এই সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি আনিবার জন্য দেবস্থান বা স্বর্গে ভোগায়তন দেহের লয় হইলে, আমাদের 'আমি' জ্ঞানটী কতকগুলি সামান্য বা অবিশেষ দেবতারূপে লীন হয়। বিশিষ্ট 'আমি'টি মরিয়া যায়। প্রেত-তত্ত্ববিদ্‌গণ জানেন যে, স্থূলদেহের নাশে স্থূলাভিমানী জীব 'আমি মরিয়াছি' বলিয়া প্রেতলোকের চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়। বিশিষ্ট দেহটীর লয় হওয়াতে, প্রেতের মনে হয়, 'আমিও মরিয়াছি'। সে বুঝিতে পারে না যে, "আমিও মরিয়াছি" এই জ্ঞানেই 'আমি' রহিয়াছে—যে আমি বিশেষ ও অবিশেষের অতীত অপ্রাকৃত পদার্থ। তদ্রূপ "অরূপ-স্বর্গে" রূপের লয়ে ত্রিলোকীর অহংজ্ঞান লীন হইয়া অবিশেষ দেবতা বুদ্ধিতে থাকিয়া যায়; যেমন বাহ্য বস্তু সংস্কাররূপে আমাদের মনে থাকে—তদ্রূপ। সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি শিখে নাই বলিয়াই, তাহার অবিশেষ ভাবাপন্ন 'আমি'টাকে 'সর্ব্ব'রূপে ও 'সর্ব্ব-নামে' ছিন্ন ছিন্ন করিয়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। এইরূপে স্বরূপ মন বা মেঘ, বাসনা বা জলরূপে পরিণত হইয়া শস্যকণাদিতে'আমি'টিকে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়। যে যে বস্তুতে, পিতৃতে ও দেবতাতে সম বা সর্ব্বাত্মিকা ভাবে 'আমি'র অংশগুলি থাকিয়া যায়, সেই সেই বস্তু দেবতা প্রভৃতি পুনর্জ্জন্মে ব্যক্ত 'আমি'র উপকারী হয়। যে গুলিতে দ্বেষবশতঃ সমবুদ্ধি উৎপন্ন না হয়, সেই বস্তু শক্তি ও দেবতাগুলি পরজন্মে শত্রুভাবে উপস্থাপিত হয়। চক্ষুর অপব্যবহার করিলে, অর্থাৎ চক্ষুর সাহায্যে ভেদাত্মক অহংজ্ঞানের স্থাপনা দ্বারা সর্ব্বাত্মক ভগবানের বিরুদ্ধভাবের কর্ম্ম করিলে, পরজন্মে জীব অন্ধ হয়। 'অহং'এর ভাব গ্রহণ বা স্থির করে বলিয়া, ছান্দোগ্য উপনিষদে এই গুলিকে 'গ্রহ' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই 'গ্রহ'গুলি দ্বারা জীব-বিশেষ হইতে অবিশেষ ভাবে, অবিশেষ হইতে বিশেষ-ভাবে পরিণত হয়।

এইরূপে জ্যোতিষ মতে জীবের জন্ম-কুণ্ডলীতে শুভাশুভ গ্রহের সংস্থান হয়। মনে করুন, এক ব্যক্তি নিজের সুখের জন্য অপরের পুত্রের সর্ব্বনাশ করিল, কিম্বা নিজের পুত্রের মঙ্গলার্থে অপরের পুত্রের অমঙ্গল সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইল না। এরূপে দেহাত্ম-বুদ্ধিতে সর্ব্বাত্মিকা-বুদ্ধির অপলাপ করাতে, পরজন্মে পাপ-গ্রহরূপে

শ্রীভগবানের সর্ব্বাত্মিকা শক্তিগুলি 'পুত্রস্থানে' সন্নিবেশিত হইবে। আর একজন সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে, অর্থ ও কাম স্ব-ভোগে ব্যবহৃত না করিয়া,সর্ব্বজীবের মঙ্গলার্থে ত্যাগ করিলেন। তাহার ফলে পরজন্মে অর্থ ও কামভোগের স্থানে 'শনি' গ্রহরূপে শক্তিগুলির সন্নিবেশ হইয়া, দুঃখের সাহায্যে অতি অল্প সময়েই তাহার সন্ন্যাসি-ভাব জাগ্রত করিয়া দিবে। এইরূপে সর্ব্বাত্মিকাভাব-বিহীন জীবগণ, বিশিষ্ট অহং অভিমানে মুগ্ধ হইয়া, স্থূল হইতে 'অরূপ' লোক পর্য্যন্ত গতাগতি করিতে থাকে। কিন্তু সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হইলেই, এই চক্রের হাত এড়াইয়া যায়।

দেবযান মার্গের কথা স্পষ্ট বলিতে পারিব না, মনে হয়। চৈতন্য যখন শরীরাভিমান ত্যাগ করিয়া, শরীরের মধ্য দিয়া প্রকাশিত অহংভাবটাকে লক্ষ্য করিতে শিখে, তখন সে দিব্ বা প্রকাশরূপী 'আমি' কেন্দ্রকে জানিতে পারে। শরীরাভিমানী জীব ঘাসের ফুলকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না। কিন্তু ইংরাজ কবি ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ 'পান্সি' নামক ক্ষুদ্র ফুল দেখিয়া মানব জীবনের রহস্য বুঝিতে পারিলেন। কামনা, শক্তি, ভাব প্রভৃতি প্রকাশমান তত্ত্বগুলিকে দেবতাভাবে বুঝিতে পারিলে, আমিটাও প্রকাশধর্ম্মী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। যখন এইরূপে দেহাভিমান বর্জ্জিত হইয়া বাহিরের বস্তুগুলিকে প্রকাশক বা ভাবরূপে দেখিতে শিখে, তখন আমিটি ভেদভাবাপন্ন হইলেও, দেহাতিগ ও জ্যোতিষ্মান্রূপে দৃষ্ট হয়। অগ্নি কি পদার্থ, তাহা বিজ্ঞান জানে না ; কিন্তু অগ্নি যে বিশিষ্ট বস্তুর ধ্বংসকারী প্রকাশ-স্বরূপ পদার্থ, তাহা সকলেই জানিতে পারে। ইন্ধন না থাকিলে অগ্নির প্রকাশ হয় না, ইহা সত্য বটে ; কিন্তু ঐ প্রকাশেই ইন্ধনের বিশিষ্ট ভাবটী ধ্বংস হয় ; এবং ইন্ধনের আকারে আকার-প্রাপ্ত হইলেও, অগ্নি পদার্থকে কাষ্ঠ হইতে বিভিন্ন বা অতিগ, ঊর্দ্ধাভিমুখী, স্বপ্রকাশ বস্তু বলিয়া জানিতে পারা যায়। তদ্রূপ যখন জীব, দেহে মোহিত না হইয়া দেহাতিরিক্ত 'আমি'কে পর বা অতিগ ভাবে বুঝিতে পারে, তখন দেবযান-মার্গের প্রথম স্তরে উপনীত হয়। এই মার্গে, বস্তু ও শক্তি প্রভৃতি প্রকাশক ভাবের সহায়করূপে ব্যবহৃত হয় মাত্র। তখন স্ত্রীকে কামের পাত্র বলিয়া পরিত্যাগ না করিয়া, স্ত্রীর সাহায্যে কামের সর্ব্বাত্মিকা প্রবণতা ও এমন কি,কামের গতি ও পরিণতিপ্রভৃতি নির্ণয়করিয়া, কামের অতিগ এক 'আমি'র ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এইরূপে জীব উচ্চগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রকাশ মাত্রেই আবরক-শক্তির আবশ্যকতা আছে ; সেই জন্য বিশিষ্ট-প্রকাশরূপী

অহংকে অবলম্বন করিলেও প্রাকৃতিক খেলার পরিসমাপ্তি হয় না। তবে প্রকাশের মাত্রায় বৃদ্ধি হয়; বিশিষ্টতার নাশ হয় না। এইরূপে আনন্দাংশে মনুষ্য, পিতৃ, দেবতা ও ব্রহ্মার আনন্দের মাত্রার ক্রমোৎকর্ষ দেখিতে দেখিতে আমিটীও উন্নত হইতে থাকে। কিন্তু বিশিষ্ট প্রকাশেব মোহ বা লোক-বুদ্ধি থাকিয়া যায়। এইরূপে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির পর, সর্ব্বাত্মিকা ভাবে চৈতন্যের পাদ ও মাত্রা বুঝিয়া, অমানব গুরুর সাহায্যে, প্রকাশ, লোক, মাত্রা ও পাদের অতীত, বিশেষ ও অবিশেষ ভাবের অতিগ, শুদ্ধ অহং বা ভগবানকে বুঝিতে পারিলে, পথের নিবৃত্তি হয়। নচেৎ অন্য কল্পে ব্রহ্মার ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তিরূপে দেবতাদিভাবে পুনরায় সংসারে আসিতে হয়। এই দুই মার্গই কর্ম্ম সাপেক্ষ; কর্ম্ম নিরপেক্ষ নহে। তাই শ্রীশঙ্কর ছান্দোগ্য-ভাষ্যোপক্রমণিকায় বলেন,—"ন চোভয়োর্মার্গয়োরন্যতরস্মিন্নপি মার্গে আত্যন্তিকী পুরুষার্থসিদ্ধিঃ, ইত্যতঃ কর্ম্মনিরপেক্ষমদ্বৈতাত্মবিজ্ঞানং সংসার-গতিত্রয়হেতূপমর্দ্দনেব বক্তব্যং।" টীকায় আনন্দগিরি বলেন "প্রাণশ্চাগ্নি-শ্চেত্যাদ্যাদেবতা, তদ্বিজ্ঞানং * * তেন * * উপলক্ষিতেন দেবযানেন পথা কার্য্য ব্রাহ্মপ্রাপ্তৌকারণং, ন তু ব্রহ্মপ্রাপ্তৌ তস্য গন্তব্যত্বাভাবাৎ; * অর্থাৎ এই উভয় মার্গেই আত্যন্তিক পুরুষার্থ সিদ্ধি বা ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না। এই দুই মার্গের অতীত, কর্ম্ম-নিরপেক্ষ অদ্বয় আত্মবিজ্ঞানই সংসার হইতে উদ্ধারের হেতু। প্রাণ, অগ্নি প্রভৃতি দেবতা-বিজ্ঞান দ্বারা উপলক্ষিত দেবযানমার্গে কার্য্যব্রহ্ম বা প্রকাশিত কেন্দ্ররূপ ব্রহ্মা পর্য্যন্ত প্রাপ্তি হয়; গতি প্রভৃতি ভাবের, অতীত বলিয়া, গতি বা ক্রমোন্নতি দ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। উপনিষদে "ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে" "তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তি" ইত্যত্র ইমমিহেতি বিশেষণাৎ"—'ইমং' ও 'ইহ' শব্দের প্রয়োগে বুঝা যায়, দেবযানের অপুনরাবৃত্তি কেবল এককল্পের জন্য। এই জন্যই শ্রীভগবান গীতাতে বলিলেন যে পিতৃযানীরা পিতৃ ও দেবযান মার্গীরা দেব-ভাবাপন্ন হয়। কিন্তু যখন বিশিষ্ট বস্তু বা বিশিষ্ট 'আমি'-কেন্দ্র না দেখিয়া এই দু'য়ের মধ্যে অবস্থিত সচ্চিদানন্দ ঘন শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করা যায়, তখন গতি ও পথ ভাবটি পড়িয়া গিয়া, জীব স্থির, শান্ত, শাশ্বত, সেই পরম 'আমি'তে পরিসমাপ্ত হয়। যে 'আমি' প্রকৃতির 'সর্ব্ব'ভাবের সহিত রহিয়াছেন—সেই আমিটিই ত' সহজ। সেই পরম 'আমি' ভিন্ন আর সহজ পথ কি আছে? তা'ই

* লোটাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত ছান্দোগ্যোপনিষৎ ১।২ পৃষ্ঠা।

শ্রীভগবান বলিলেন,—"মদ্ভক্ত্যা যান্তি মামকান্‌" ; এই জন্য কি শঙ্করের জ্ঞান মতে, কি চৈতন্যদেবের ভক্তি মতে, কি মহাত্মা যীশুর সেবা মতে ভগবানকেই 'পন্থা' করা হইয়াছে "আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরের ন্যায় 'অধিকারী' হইতে যাওয়া আমাদের দুরাশা। অধিকরণরূপ শ্রীভগবানকে না বুঝিলে, অধিকারীই বা কিরূপে হইব? তা'ই বলি ভাই, বৃথা মতামত ও পথাপথ লইয়া সময় ক্ষেপণ না করিয়া, যে যেখানে যে ভাবে আছ, সেখান হইতেই সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বাত্মা অথচ পর পুরুষোত্তমকে লক্ষ্য করিয়া, তদভিমুখী হইয়া জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি, অভ্যাস, ও সন্যাস প্রভৃতি সর্ব্বভাবেই তাঁহাকে পাইতে ইচ্ছা কর। তিনি ত' বলিয়াছেন যে সর্ব্বভাবে তদভিমুখী হইয়া, কষ্ট-কল্পনা ত্যাগ করিয়া, প্রীতির সাহায্যে, তাঁহার ভজনা করিলে, তিনিই গায়ত্রীরূপে আমাদের বুদ্ধি প্রেরণা করেন। গায়ত্রী ভিন্ন বুদ্ধি যোগ নাই। তিনিই দেবী-মূর্ত্তিতে বাহিরেও পূজা গ্রহণ করেন। স্বয়ং শ্রীভগবানের আশ্বাসবাণী হিন্দুমাত্রের একমাত্র অবলম্বনীয় ;—

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
দদামি বুদ্ধি যোগং তং যেন মাং উপযান্তি তে॥

শ্রী চিন্তাহরণ দেবশর্ম্মণঃ।

ধর্ম্ম]

প্রার্থনা।

ধর্ম্ম ভেদ ল'য়ে জগত জুড়িয়া,
বিবাদ বিষাণ বাজিছে সদা ;
বুঝেনা কখন লক্ষ্য এক জন,
মূল মাত্র একই সুরে বাঁধা।
হে দীন-শরণ! জগৎ কারণ!
ভ্রমান্ধ মানবে কর জ্ঞান দান ;
দূর হ'লে ভ্রান্তি জনমিবে শান্তি,
জাগিবে পরাণে মধুর তান।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

চতুর্থ অধ্যায়।

জ্ঞান-বিজ্ঞান যোগ।

শ্রীভগবান কহিলেন,—

অব্যয় এ যোগ, আমি কহেছিনু বিবস্বানে।
বিবস্বান মনুরে কহে, মনু ইক্ষ্বাকু স্থানে ॥ ১
হেন পরম্পরা মতে, জানিলা রাজর্ষিগণ।
কালের প্রভাবে নষ্ট, এবে যোগ, অরিন্দম ! ২
কহিনু তোমারে আজি, ভক্ত তুমি – সখা মম।
সেই যোগ পুরাতন, – রহস্য সহ, উত্তম ॥ ৩

অর্জ্জুন কহিলেন,—

বিবস্বান জন্মে অগ্রে, জন্মিলা পরেতে তুমি।
তুমি যে কহিলা পূর্ব্বে, কেমনে বুঝিব আমি ॥ ৪

শ্রীভগবান কহিলেন,—

বহু জন্ম, পরন্তপ ! তোমার আমার গত।
বিদিত সে সব আমি, নহে ত' তোমার জ্ঞাত ॥ ৫
অজ হইলেও আমি অব্যয়াত্মা ভূতেশ্বর।
জন্মি আত্মমায়া সহ, করি' প্রকৃতি আধার ॥ ৬
যখন যখন ঘটে, ভারত ! ধর্ম্মের গ্লানি।
অভ্যুত্থান অধর্ম্মের, 'আমি'কে সৃজি আপনি ॥ ৭
সাধুগণে তরিবারে, দুষ্কৃতে নাশিতে আমি।
ধর্ম্ম সংস্থাপন তরে, যুগে যুগে জন্মি আমি ॥ ৮
জন্ম কর্ম্ম দিব্য মম, তত্ত্বে জানে যেবা নরে।
নাহি তা'র পুনর্জ্জন্ম ; দেহ ত্যাগে লভে মোরে ॥ ৯
রাগ-ভয়-ক্রোধহীন, মন্ময় মম সেবকে।
জ্ঞান তপ-শুদ্ধ, লভিয়াছে মদ্ভাব অনেকে ॥ ১০

যে যথা আমারে ভজে, তা'রে তথা ভজি আমি।
'সর্ব্ব' ভাবে নর, পার্থ! মম পথ অনুগামী ॥ ১১
কর্ম্ম-সিদ্ধি প্রার্থী হ'য়ে পূজে ইহে কত দেবে।
মানুষ লোকেতে সিদ্ধি কর্ম্ম-জাত, শীঘ্র লভে ॥ ১২
গুণ কর্ম্ম অংশ ল'য়ে, চতুর্ব্বর্ণ সৃজি আমি।
সেই কর্ত্তা তাবি জান, অকর্ত্তা অব্যয় আমি ॥ ১৩
আমিতে না লিপে কর্ম্ম, ফলে স্পৃহা না আমার।
—যেবা জানে মোরে হেন, কর্ম্মেতে না বান্ধে তা'য়। ১৪
পূর্ব্ব মোক্ষর্থীরা যত করিলা কর্ম্ম এ মতে
কর কর্ম্ম তবে, পূর্ব্ব দ্রষ্টা পূর্ব্ব-কৃত মতে ॥ ১৫
কিবা কর্ম্ম, কি অকর্ম্ম ? —কবিগণ(ও) মুগ্ধ তাহে।
কহি তাই, কর্ম্ম—জানি অশুভে মোচিবে যাহে ॥ ১৬
কর্ম্ম কি তা' বুঝা চাই, বিকর্ম্ম বুঝিতে হবে।
বুঝহ অকর্ম্ম ; কর্ম্মের গতি দুর্জ্ঞেয় (ভবে)॥ ১৭
কর্ম্মেতে অকর্ম্ম দেখে, অকর্ম্মেতে কর্ম্ম যেই ;
নর-লোকে বুদ্ধিমান্ যুক্ত সর্ব্বকর্ম্মী সেই * ॥ ১৮
(আরম্ভেতে 'ছিন্ন' আমি-বুদ্ধি থাকে প্রিয় সখা !
কামের বিশিষ্ট ভাব, দগ্ধ করে জ্ঞান শিখা)॥
সমারম্ভ সব যা'র, কাম সঙ্কল্প বর্জ্জিত।
জ্ঞানাগ্নিতে কর্ম্মদগ্ধ, জ্ঞানী কহে, সে পণ্ডিত ॥ ১৯
কর্ম্মফল-সঙ্গ ত্যজি,' নিত্য-তৃপ্ত, নিরাশ্রিত।
কর্ম্মেতে প্রবৃত্ত হ'য়ে, সে ত' করেনা কিঞ্চিত ॥ ২০

* কার্য্য কর্ম্মে, নাহি ক্ষুদ্র 'আমি'-ভাব, অরিন্দম।
অকর্ম্মেতে প্রত্যবায় না আসে ত্যজিলে 'মম' ॥
কর্ম্মে দেখি 'পর আমি' তা'হে আকর্ষক রূপে।
অকর্ম্মে প্রবৃত্তি-ন্যাসে আছে আমি অন্ত রূপে ॥
এইরূপে সর্ব্ব কর্ম্মে যে দেখে 'আমি'র ভাবে।
সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি লভি, সর্ব্ব ফল তাহে আসে ॥ গং সং

নিরাশী সংযতচেতা, সর্ব্ব-পরিগ্রহ শূন্য।
শারীর কেবল কর্ম্মে নাহি হয় পাপাপন্ন ॥ ২১
যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট, দ্বন্দ্বাতীত, বিমৎসরে।
সিদ্ধ্যাসিদ্ধি দোঁহে সম, নহি বাঁধে কর্ম্ম তা'রে ॥ ২২
জ্ঞানেতে আস্থিত-চিত্ত, মুক্ত, আসক্তি বিহীন।
যজ্ঞ আচরণে তা'র, সমগ্র কর্ম্ম বিলীন ॥ ২৩
ব্রহ্ম হোতা, ব্রহ্মার্পণ, ব্রহ্ম হবি, হুতাশন।
ব্রহ্ম-কর্ম্ম-সমাধিস্থ, ব্রহ্মে করে সে গমন * ॥ ২৪
কোন কোন যোগী করে, দৈব যজ্ঞ অনুষ্ঠান।
ব্রহ্মাগ্নিতে করে যজ্ঞ, অন্যে যজ্ঞাহুতি দান ॥ ২৫
সংযম অনলে কেহ অর্পে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ে।
সমর্পে ইন্দ্রিয়ানলে অন্যে শব্দাদি বিষয়ে ॥ ২৬
অন্য লোক প্রাণ কর্ম্ম, ইন্দ্রিয় কর্ম্ম সকলে।
সমর্পে জ্ঞান-প্রদীপ্ত আত্ম-সংযম অনলে ॥ ২৭
—দ্রব্য যজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগ যজ্ঞ কার মত।
স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযোগ ;—অন্য যতি তীক্ষ্ণ-ব্রত ॥ ২৮
অপানে অর্পয়ে প্রাণ, প্রাণে কেহ বা অপান।
প্রাণায়াম-পর রোধে, গতি, দুই প্রাণাপান ;
যুক্তাহারী অন্যে করে, প্রাণে প্রাণাহুতি দান ॥ ২৯
সবে তাঁ'রা যজ্ঞবিদ্ যজ্ঞে হ'য়ে পাপহীন,
যজ্ঞ-শেষামৃত ভোক্তা, নিত্য ব্রহ্মে হ'ন লীন ॥ ৩০
নাহি তা'র ইহ লোক অযাজ্ঞিক যেবা জন।
কুরুসত্ত ! অন্য লোক থাকিবে তা'র কেমন ॥ ৩১

ব্রহ্মই অর্পিত দ্রব্য, ব্রহ্ম হবি-রূপ সেই।
হবির্ভুক অগ্নি ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম হোতা যেই ॥
করমেতে সেই ব্রহ্মে, সর্ব্বভাবে এইরূপে।
সমাপ্ত হ'তেছে চিত্ত, পরম 'আমি' স্বরূপে ॥
সকলেরই মাঝে দেখি, নিষ্কল 'আমিকে' সেই।
কর্ম্মাকর্ম্মে এক দেখি, অদ্বয়তা লভে সেই ॥　পং সং

এইরূপ বহুবিধ যজ্ঞ ব্রহ্মমুখে উক্ত।
কর্ম্মজ সে সর্ব্বে বুঝ, হেন বুঝি হ'ও মুক্ত ॥ ৩২
দ্রব্য-ময় যজ্ঞ হ'তে জ্ঞান যজ্ঞ শ্রেয়ার্জ্জুন।
অখিল সকল কর্ম্ম, জ্ঞান (রূপে) সমাপন * ॥ ৩৩
প্রণিপাতে, পরিপ্রশ্নে, সেবাতে, লভ সে জ্ঞান।
উপদেশে তোমা সবে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ ॥ ৩৪
হবে না এ মোহ পুনঃ, যাহা জানি হে পাণ্ডব !
দেখিবে আত্মাতে, পরে আমাতেই ভূত সব ॥ ৩৫
সর্ব্ব পাপী হ'তে যদি, তুমি হও পাপাচার।
জ্ঞানপোতে হবে তবু, সর্ব্ব পাপার্ণবে পার ॥ ৩৬
কাষ্ঠ-জাত অগ্নি যথা, সর্ব্ব কাষ্ঠ ভস্ম করে।
তথা ভস্ম করে পার্থ! জ্ঞানাগ্নি কর্ম্ম সর্ব্বেরে ॥ ৩৭
জ্ঞানের সদৃশ কিছু পবিত্র নাহি ধরায়।
যোগ-সিদ্ধ স্বতঃ লভে কালেতে তাহা আত্মায় ॥ ৩৮
তন্নিষ্ঠ, সংযতেন্দ্রিয়, শ্রদ্ধাবান লভে জ্ঞান ;
লভি জ্ঞান, অচিরেতে পায় পরা-শান্তি ধাম † ॥ ৩৯
জ্ঞানহীন, শ্রদ্ধা শূন্য, নষ্ট হয় সংশয়াত্মা।
সংশয়াত্মার না সুখ, ইহ পর কালে কোথা ॥ ৪০
যোগে সমর্পিত কর্ম্ম, জ্ঞানেতে ছিন্ন-সংশয়
আত্মজ্ঞানে, নাহি বদ্ধ করে কর্ম্ম, ধনঞ্জয় ॥ ৪১

* তমো বুদ্ধি ভাবে কৃত, যজ্ঞ হয় দ্রব্যে ক্ষয়।
অনন্ত বস্তুর রূপে সমাপ্ত, সে দ্রব্যময় ॥
তাহা হতে পরন্তপ ! জ্ঞান-যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ অতি।
সর্ব্বভাবে সব কর্ম্ম জ্ঞানে হয় পরিণতি ॥ পঃ সঃ।

† 'তৎ' যার পরাগতি ইন্দ্রিয়ের 'সব' যত।
স্বরূপ-গ্রহণে চিত্ত শ্রদ্ধারূপে অনুগত ॥
লভি সেই পরা-জ্ঞান, বিশ্বাতিগ এক ঘন।
থাকিলে লভিবে শান্তি পরম সে নিরঞ্জন ॥

হে ভারত! স্বহৃদিস্থ অজ্ঞানজ এ সংশয়
ছেদি জ্ঞান-খড়্গে তা'ই, উঠ, কর,—যোগাশ্রয় ॥ ৪২

শ্রীভবেন্দ্রনাথ দে বি, এ।

কাম] যৎ করোমি জগন্নাথ তদস্তু তবপূজনং।

তোমারই সংসারে তুমি ত' সংসারী,
যাহা কিছু হেথা সকলি তোমারি।
'আমি' সুধু, নাথ! ক্ষণিক প্রহরী,
তোমারই আদেশ আছি শিরে ধরি।
তোমারি করম করাতেছ তুমি,
দোষ, গুণ, সব জান অন্তর্য্যামি;
তুমি যন্ত্রী নাথ, যন্ত্র তব আমি,
তোমারি ইচ্ছায় চলিতেছি স্বামি!
যা' কিছু করাও, যাহা কিছু করি,
মোর অভিমান (শুধু), কাজ ত' তোমারি!
(সেই) অভিমানে নাথ! বলি হাত জুড়ি
কর্ম্ম সর্ব্ব হ'ক, নাথ! অর্চ্চনা তোমারি।

চিন্তা—

কাম] সহজ যোগ। *

যোগ-রহস্য।

"স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌকৃত্বা নাশাভ্যন্তরচারিণৌ॥　　গীতা ৫,২৬।

'স্পর্শ' শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বস্তু। মনও একটী ইন্দ্রিয়। অন্যান্য

---

* এই নামে ধারাবাহিকক্রমে নানা লেখকগণ লিখিত যোগ সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বাহির হইবে। পং সং।

ইন্দ্রিয়ের সাহায্য লইয়া মন যাহা গ্রহণ করে, তাহাকে বাহ্য-স্পর্শ বলা যায়; এবং অন্য কোন ইন্দ্রিয়ের সাহায্য ব্যতীত মন যাহা গ্রহণ করে তাহাকে অন্তঃস্পর্শ বলা যাইতে পারে। যোগী যোগাসনাসীন হইয়া ঐ বাহ্য স্পর্শগুলিকে বাহ্য-সত্য-ভাব হইতে দূর করিবেন, এবং তাঁহার চক্ষু ভ্রূদ্বয় মধ্যে স্থাপন করিবেন; এবং প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমভাবে নাসিকারন্ধ্র মধ্যে চালনা করিবেন। এখানে 'চক্ষু' কথাটী এক বচনান্ত করার তাৎপর্য্য এই যে, চক্ষু অর্থে এখানে চর্ম্মচক্ষু নহে—'দৃষ্টি'। দৃষ্টিও বাহ্য দৃষ্টি নহে, অন্তর্দৃষ্টি। অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তিটীকে নানাস্থানে চালনা না করিয়া ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে রাখিবেন। তাহা হইলে ঐ শক্তির কার্য্য, বাহ্য বিষয়ে বোধ হইয়া, ভ্রূদ্বয় মধ্যে (আজ্ঞাচক্রে) একত্রীভূত হইবে। প্রাণ ও অপান অর্থাৎ নিশ্বাস ও প্রশ্বাস এই দুইটী বায়ু মুখ দিয়া চালিত না হইয়া, নাসিকারন্ধ্র দিয়া সমভাবে চালিত হইবে; মুখ তখন বন্ধ থাকিবে। বলা আবশ্যক যে বায়ুকে এইরূপে চালাইতে গিয়া কোন প্রকার কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিতে হইবে না। মন ও আসন স্থির হইয়া আসিলে, বায়ু আপনা হইতে ঐরূপ নিয়মিত হইয়া চলিতে থাকিবে।

"যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যত চিত্তাত্মা-নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥
শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি নীচং চেলাজিনকুশোত্তরং।
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যত চিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাৎ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে।
সমংকায় শিরোগ্রীবং ধারয়ন্ অচলং স্থিরঃ
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্
প্রশান্তাত্মা বিগতভী ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ"॥

গীতা ৬ অধ্যায় ১০-১৪ শ্লোক।

যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদাই মিতাহারী ও স্ত্রীশূন্য হইয়া ইন্দ্রিয়াদি সংযম পূর্ব্বক একাকী নির্জ্জন স্থানে বাস করিবেন ও আত্ম চিন্তায় নিমগ্ন থাকিবেন। একটী

পবিত্র স্থানে আসন রচনা করিয়া তদুপরি উপবেশন করিবেন। সেই আসনটী যেন অতিশয় উচ্চ না হয় এবং অতিশয় নীচও না হয়; তাহার সকলের নীচে কুশ থাকিবে, তাহার উপরে অজিন (মৃগচর্ম্ম) এবং অজিনের উপর চেলন (রেশম বা পশমের কাপড়) থাকিবে। আসনটী যেন স্থির হয়, অর্থাৎ নড়ে চড়ে না। সে আসনোপরি উপবিষ্ট হইয়া, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াগুলিকে নিরোধ করিয়া এবং মনকে একাগ্র করিয়া, আত্মার বিশুদ্ধির জন্য যোগ সাধন করিবেন। যখন আসনে উপবেশন করিবেন, তখন তাঁহার শরীরটী যেন সমভাবে থাকে, অর্থাৎ ঝুঁকিয়া না পড়ে। শরীর যেমন সমভাবে থাকিবে, মস্তক ও গলদেশও তেমনি সরল ভাবে থাকিবে; শরীরের কোন অংশ যেন নড়ে না। অন্য কোন বস্তুর দিকে না তাকাইয়া, নিজের নাসাগ্রের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। এইরূপে প্রশান্ত-চিত্ত, নির্ভীক, যোগী ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বন করিয়া মনঃসংযম পূর্ব্বক চিত্তে কেবল মাত্র 'আমাকে' ধ্যান করিতে করিতে অবশেষে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

উপরোক্ত কয়েকটী শ্লোকে রাজযোগটী সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যিনি রাজযোগ শিক্ষা ও সাধনা করিতে অভিলাষী, তিনি উপরোক্ত শ্লোক কয়েকটীকে গুরূপদেশ মনে করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন। অবশ্য এই গুরূপদেশ পালন করা ও কার্য্যে পরিণত করা সহজ ব্যাপার নহে। কাহারও বা জন্ম জন্ম চলিয়া যাইতে পারে তথাপি ঐ গুরূপদেশ মত কার্য্য হইবে না। আবার যাঁহার পূর্ব্বজন্মের সাধনা আছে, তিনি অতি সহজেই উহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন। ফলকথা, উপরোক্ত উপদেশ কয়েকটী অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপালন ভিন্ন রাজযোগ আর কিছুই নহে।

ইচ্ছাশক্তির কার্য্য আমাদের শরীরস্থ নাড়ী-মণ্ডলী nervous system মধ্যে সর্ব্বদা চলিতেছে। ভিন্ন ভিন্ন নাড়ীর ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য। আমাদের ইচ্ছাশক্তি যখন যে নাড়ী অবলম্বন করে, তখন সেই নাড়ীর কার্য্য চলিতে থাকে। ইচ্ছা মনের কার্য্য। মনের এক প্রকার বিকাশের নামই ইচ্ছা। মনের তিন প্রকারের বিকাশ—ইচ্ছা, জ্ঞান ও বাসনা। একই মন এই তিনভাবে ব্যক্ত হয়; সুতরাং ইচ্ছা, মন ভিন্ন আর কিছুই নহে। শরীরস্থ নাড়ীমণ্ডলীর কতগুলি নাড়ী বহির্ম্মুখী আর কতগুলি অন্তর্ম্মুখী। বহির্ম্মুখী নাড়ীতে যখন আমাদের ইচ্ছাশক্তি

প্রবর্ত্তিত হয়, তখন আমরা বাহ্য বস্তুতে লিপ্ত হই,—বাহ্য বিষয় অনুভব করি; আমাদের মানসিক শক্তি তখন বাহিরের দিকে ধাবিত হইতে থাকে। বাহিরের বস্তুতে মন যতই লিপ্ত থাকিবে, ততই আমরা প্রকৃত সুখে বঞ্চিত হইব। বাহ্যিক বস্তুতে সুখ নাই; উহাতে মন যতক্ষণ প্রবৃত্ত থাকিবে, ততক্ষণ একটা চেষ্টা বা ক্রিয়া বহির্ম্মুখী নাড়ীতে চলিতে থাকিবে। ঐ চেষ্টা শারীরিক ও মানসিক বলক্ষয় ও ক্লান্তি উৎপাদন করিয়া আমাদিগকে অসুখী করিয়া তুলে। মনের এই অবস্থাটী দুঃখপূর্ণ অবস্থা; ইহাতে সুখ নাই; ইহাকেই রাজসিক অবস্থা বলে। রাজসিক অবস্থায় বাহিরের কার্য্য হয় অর্থাৎ বহির্ম্মুখী নাড়ীমণ্ডলী তখন কার্য্য করে, আর অন্তর্ম্মুখী নাড়ী-মণ্ডলী তখন নিষ্ক্রিয় অবস্থা অবলম্বন করে। এই অবস্থায় আমরা কখনও শান্তিলাভ করিতে পারি না; সর্ব্বদাই দুঃখ পূর্ণ থাকি।

বহির্ম্মুখী নাড়ীর কার্য্য বন্ধ হইয়া গেলে, আমাদের দুইটী অবস্থা সম্ভব হইতে পারে। একটী অজ্ঞানে লীন হইয়া যাওয়া; অপরটী আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রবৃত্ত হওয়া। প্রথমটীর নাম—সুষুপ্তি (স্বপ্ন-বর্জ্জিত নিদ্রা), দ্বিতীয়টীর নাম সমাধি। প্রথমটী তামসিক ভাব; ইহাতে সুখও নাই—দুঃখও নাই; একটী মোহ, একটী আচ্ছন্নতা মাত্র। এই অবস্থায় ইচ্ছাশক্তি বহির্ম্মুখী নাড়ী-মণ্ডলীতেও থাকে না,—এবং অন্তর্ম্মুখী কোন নাড়ীকেও আশ্রয় করে না। ইচ্ছাশক্তি তখন নিদ্রিতা। রাজসিক অবস্থায় থাকিয়া আমরা যখন দুঃখাদিতে অভিভূত হইয়া পড়ি ও শারীরিক ক্লান্তি অনুভব করি, তখন এই তামসিক অবস্থাটী আমাদের আবশ্যক হয়। এ অবস্থায় ক্লান্তি নিবারণ হয় ও দুঃখাদি কিছুকালের জন্য দূর হয়। কিন্তু এই তামসিক ভাব অধিককাল স্থায়ী হইলে, শারীরিক ও মানসিক উভয় প্রকার অবনতি আরম্ভ হইয়া, অবশেষে আমাদের ধ্বংস উপস্থিত হয়। সমাধি অবস্থা সাত্ত্বিক অবস্থা। ইহাতে অধ্যাত্ম-জ্ঞানলাভ-হয়। তখন বহির্ম্মুখী নাড়ী-মণ্ডলীর কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়, অন্তর্ম্মুখী নাড়ীগুলি জাগিয়া উঠিয়া অন্তর্জ্জগতের অলৌকিক সৌন্দর্য্য দেখাইতে থাকে; দৈবী শক্তির উদ্ভব হয়; শরীরের সঙ্গে চিত্তের সম্পর্ক রহিত হইয়া, বাহ্যিক সুখ-দুঃখাদির দ্বারা আত্মা স্পৃষ্ট হইতে পারে না। ইচ্ছাশক্তি ক্রমে সূক্ষ্মতম ও উচ্চতম নাড়ীমধ্যে প্রবাহিত হইয়া দৈবীশক্তি, স্বর্গীয় আনন্দসুধা উৎপাদন করিতে থাকে; ক্রমে আমরা সূক্ষ্মাদপি

সূক্ষ্মভাব প্রাপ্ত হইয়া অবশেষে চিন্ময় ও জ্যোতির্ম্ময়ের সহিত একীভূত হইয়া যাই। অনুভূতির বিষয় বলিবার কিছুই নাই।

উপরোক্ত ভগবদ্‌বাক্যরূপ গুরু-উপদেশ অবলম্বন করিয়া কার্য্য করিতে আরম্ভ কর, ঐ উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন কর —দেখিবে—অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তি অদূরবর্ত্তিনী।*

শ্রীগৌরীনাথ শর্ম্মশাস্ত্রী।

কাম]

লক্ষ্য।

স্রোতোধারা-বিচঞ্চল তৃণখণ্ড সম,
উত্তাল তরঙ্গমুখে অদৃষ্ট-তাড়নে,
আত্মহারা লক্ষ্যহীন এ জীবন মম
অবিরাম বিঘূর্ণিত মোহ-আবর্ত্তনে।

* ভগবানের উক্তির মর্ম্ম কি? স্পর্শ (Contact born) বোধকে ইংরাজীতে Sensation বলে, ঐগুলিকে বাহ্য বা অহংবোধের বাহিরে রাখিতে হইবে। ইহা প্রযত্ন সাহায্যে ভেদভাব করা যায়; অথবা 'অহং' শব্দে স্থির নিশ্চল, সর্ব্বাত্মক, অথচ এক অতিগ চৈতন্য বলিয়া বুঝিলে স্পর্শাদি খেলা বলিয়া মনে হয় ও পড়িয়া যায়।

দুই চক্ষু; দুইটী দৃষ্টি। জীব বা 'ভিন্ন অহং'দৃষ্টি; ইহা দক্ষিণাগ্নিতে প্রতিষ্ঠিত; দ্বিতীয় 'সর্ব্ব' বা বহুত্ব দৃষ্টি—ইহা আহবনীয় অগ্নি। এই দুই প্রকার দৃষ্টি বা বোধ, মনের অতীত, এক অদ্বৈত অতিগ দৃষ্টি আছে, উহা দেবাদিদেবের তৃতীয় নয়ন, ইহার আলোকে অহং মমাত্মক কাম দগ্ধ হয়।

প্রাণ ও অপান, জীবনীশক্তির অহং বা উচ্চ ও বস্তু বা অধোমুখী গতি বা প্রবণতা। এই দুইটী মুখ দ্বারা প্রকট হইয়া বিশিষ্ট ব্যক্ত বা বাক্যভাবে পরিণত হইয়া, ভেদাত্মক আমি ও ভেদস্থিত বস্তুরূপ ধারণ করে। সেই জন্য এই দুই বায়ুকে নাসিকার মধ্যে, কেবল 'পুণ্যগন্ধ পৃথিব্যাম্' রূপে আত্মাতে একত্রে সংযমিত করিতে হইবে।

শুচিদেশ কি? আত্মার আসন কোথায়? কোথায় মনের একাগ্রতা হয়? একাগ্রতা কি? চিত্তে ইন্দ্রিয় কিরূপে সংযত হয়? ইত্যাদি বিষয়ের উত্তর পাইলে আমরা বাধিত হইব। পং সং।

বিরাট এ সৃষ্টিরাজ্যে বিভিন্ন আবাসে,
কর্ম্মরত জীবকুল বাঞ্ছিত সন্ধানে।
কিন্তু ঘোর বিড়ম্বনা ; সুদীর্ঘ প্রবাসে
বদ্ধ আমি মায়াপাশে উদ্ভ্রান্ত পরাণে ;
অতৃপ্ত বাসনা সহ অপূর্ব্ব কল্পনা
অনিত্য পুলকে সৃজি সাধের স্বপন
ভুলায়েছে সার লক্ষ্য, অপূর্ণ সাধনা ;
বিনিদ্রিত তাই মোর প্রবুদ্ধ চেতন।
হৃদিমাঝে পরাশক্তি আনন্দদায়িনী
কহে আজি এ কি বাণী "রে প্রমত্ত মন !
ছাড় রে অবিদ্যা-মায়া চৈতন্য-নাশিনী ;
পূর্ণব্রহ্ম-অংশ তুমি,— লক্ষ্য নারায়ণ।"

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

অর্থ] সম্মোহন-বিদ্যা।

(১)

বেদভূমি আমাদের ভারতবর্ষ সর্ব্ববিদ্যার জন্মস্থান বা প্রকাশ-ক্ষেত্র। যখন গ্রীক দেশে বিদ্যার প্রকাশ হয় নাই যখন মিসর দেশে পীরামিডের ভিত্তি স্থাপনা হয় নাই, তাহারও বহু পূর্ব্বে, অতি প্রাচীন কালে, আমাদিগের পূজ্যপাদ ঋষিগণ বহু আয়াসে, শত সহস্র বৎসর সাধনা করিয়া, বহু আলোচনা ও গবেষণা দ্বারা মানবের মনের তত্ত্ব ও ক্ষমতা সকল স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাহা আয়ত্তও করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই জ্ঞানের প্রভাবে, এমন কি, হিংস্র বন্য জন্তু ও পশু-পক্ষিগণ তাঁহাদের প্রতি হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া, তাঁহাদের বশতাপন্ন হইত। এই বিজ্ঞানপ্রভাবে সসাগরা পৃথিবীর একচ্ছত্রী সম্রাটের মুকুটও তাঁহাদের পদতলে বিলুণ্ঠিত হইত। সেই সমস্ত অলৌকিক ক্ষমতা ও অসাধারণ কার্য্যকলাপ এক্ষণেও তাঁহাদিগকে জগতের শীর্ষস্থানীয় করিয়া রাখিয়াছে।

মনোবিজ্ঞান ও তাহার প্রয়োগ সম্মোহন-বিদ্যা ভারতের ধন হইলেও, ইহার কণিকামাত্র পাশ্চাত্য দেশে বিস্তার লাভ করিয়া, অল্পদিন বিজ্ঞানমধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাই পাশ্চাত্য জগতে প্রথমে মেস্‌মেরিসম্ (Mesmerism) ও পরে হিপ্‌নটিসম্ (Hypnotism) নামে খ্যাত। এই বিদ্যার প্রভাবে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-জগতে কিছুকাল যাবত হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছিল, এবং ইহারই বিস্তৃতিপ্রভাবে ভারতের ধন আবার ভারতে ফিরিয়া আসিয়া ভারতবাসীর নিকট নূতন কলেবরে পরিচিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য জগতে দুই ভাবে এই বিদ্যার প্রয়োগ হয়। প্রথমতঃ- রঙ্গমঞ্চে, ইহার ক্রিয়া-কৌতুকপ্রদ খেলা দেখান হয়, দ্বিতীয়তঃ—ইহাকে রোগমুক্তির জন্য প্রয়োগ করা হয়। প্রথমটী বিভূতি মাত্র; তাহাতে লোক-মনোরঞ্জন হয় বটে, কিন্তু সমাজের ও মানব জাতির বিশেষ কোন উপকারে আইসে না। দ্বিতীয়টীর উপকারিতা বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত মাত্রেই স্বীকার করেন। বহু রোগী ঔষধ-সেবনে উপকার না পাইয়া, অবশেষে এই সম্মোহন বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রোগমুক্ত হইয়াছেন ও হইতেছেন। পাশ্চাত্য জগতে ইহার সাহায্যে কত দুরারোগ্য রোগের কবল হইতে মানবকে মুক্ত করা হইতেছে। রোগমুক্তি বা আরোগ্য করাই পাশ্চাত্য জগতে ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু ইহা যে আমাদের আত্মানুভূতির সাধন, এতদ্দ্বারা যে সাধনা-বিমুখ মানব অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভিতরের তত্ত্ব-সকলের আভাষ পায় ও তদ্দ্বারা আপনার গন্তব্য পথের ইঙ্গিত পাইতে পারে, সে মতপ্রয়োগের কথা পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ উল্লেখ নাই। ইহা আমাদের মানসিক ও ধর্ম্মোন্নতির পন্থার কি সাহায্য করিতে পারে, তাহা বর্ণন এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমে আমরা পাশ্চাত্য সম্মোহন-বিদ্যার ইতিহাস বর্ণনা ও তৎসঙ্গে এই শাস্ত্রজ্ঞ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতামত বিবৃত করিব। ক্রমশঃ ইহার সাহায্যে মনস্তত্ত্ব (Psychology) ও ধর্ম্মের অনুশীলনে যে উপকার সাধিত হয় ও তদ্দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের ও দর্শনের মুখ্য তত্ত্বের যে আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও বলিবার ইচ্ছা আছে। মানব আপনাপন স্বভাবানুসারে বিদ্যা মাত্রেরই প্রয়োগ করে। বিজ্ঞানভাবে প্রতিষ্ঠিত পাশ্চাত্য জগৎ বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তৃপ্ত। ভারত ধর্ম্মের ও সাধনার ক্ষেত্র এবং এ দেশে বিদ্যার প্রয়োগ একদিকে মানবের ঐহিক ও পারমার্থিক মঙ্গলের নিমিত্ত এবং অপরদিকে

নিগূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল উদ্ভাবন করিবার জন্য। মানবের প্রকৃত মঙ্গলে সকল বিদ্যারই পরিসমাপ্তি, ইহাই আর্য্যগণের দীক্ষা ও শিক্ষা।

পাশ্চাত্য সম্মোহন-বিদ্যার মূল অনুসন্ধান করিতে হইলে, মেস্‌মারের জীবনকালের পূর্ব্বে অনুসন্ধান অনাবশ্যক; কারণ, তাঁহারই সময় হইতে এই বিষয়ে বৈজ্ঞানিকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। মেস্‌মার একজন জার্ম্মানদেশীয় চিকিৎসক। তিনি ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এই মহাপুরুষই সর্ব্বপ্রথমে ভৌতিক সূক্ষ্ম প্রাণতত্ত্ব ও জীব-সম্মোহনতত্ত্ব (Animal magnetism) সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জগতের চিত্তাকর্ষণ করেন। তাঁহার মতে সমগ্র জগতে এক প্রকার তরল শক্তিশীল পদার্থ বিদ্যমান আছে। এই পদার্থ মানবদেহে স্নায়ুমণ্ডলে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। যে মানবের দেহে এই তরল পদার্থ বা দ্রব্য পর্য্যাপ্ত আছে, তিনি রোগীর শরীরে তাহার কিঞ্চিৎ অংশ দিয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিতে পারেন। মেস্‌মার রোগ আরোগ্য করিবার জন্য শরীরের ব্যাধিযুক্ত স্থানে হস্তার্পণ করিয়া এই জীবনী শক্তি দান করিতেন।

১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে মেস্‌মার প্যারিস নগরে গমন করেন ও বহু রোগী আরোগ্য করেন। তথায় তাঁহার অদ্ভুত ক্রিয়াকলাপে তত্রত্য অধিবাসিগণ অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হন, এবং অনেকেই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। যদিও চিকিৎসকমণ্ডলী তাঁহার মত সমর্থন করেন নাই, তত্রাচ সাধারণ লোকে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতায় আকৃষ্ট হইয়া রোগ আরোগ্যের প্রার্থী হইত। এইরূপে তিনি বহু সহস্র লোককে যখন রোগমুক্ত করিতে লাগিলেন, তখন এ বিষয়ে ফরাসী রাজপুরুষগণের দৃষ্টি পড়িল। ফলতঃ এই বিষয়ের তথ্য সংগ্রহের নিমিত্ত চিকিৎসক ও বিজ্ঞান-সভার সভ্যগণকে লইয়া একটী অনুসন্ধান-সমিতি গঠিত হইল। এই সমিতি মেস্‌মারের ঘটনাগুলির সত্যতা স্বীকার করিলেও, তাঁহার উল্লিখিত জীবনী-শক্তি-সঞ্চালন মতটী সমর্থন করেন নাই। উক্ত সমিতির সভ্যগণ ঐরূপে আরোগ্য রোগিগণের কল্পনা বা বিশ্বাসমূলক বলিয়া মত প্রকাশ করেন, এবং মনোজ বলিয়া তাহাতে সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তির স্থান নাই, তজ্জন্য উহা বৈজ্ঞানিক ভাবে অনুসন্ধানের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যাগ করেন।

পরে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে রাজকীয় চিকিৎসা-সভার সভ্যগণকে লইয়া আর একটী সমিতিগঠিত হয়। তাঁহাদের মতও বিরুদ্ধ ভাব ধারণ করে ও তাহার ফলে

ফরাসী দেশে মেস্মারের প্রতিপত্তি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপে বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অপদস্থ হইয়া, মেস্মার ফরাসী নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং স্বীয় জন্মভূমি জার্ম্মানী দেশে অজ্ঞাতভাবে তাঁহার শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এবম্প্রকার নানা বিঘ্ন সত্বেও তিনি বহু শিষ্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারাই এখন তাঁহার নাম অনুসারে Mesmerist বলিয়া অভিহিত ও তাঁহার আবিষ্কৃত তত্বটী Mesmerism নামে খ্যাত।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যার দ্বিতীয় স্তর Catalepsy আরব্ধ হয়। এই সময়ে মেস্মারের একজন শিষ্য কৃত্রিম সুষুপ্তি Artificial anæsthesia অবস্থা আবিষ্কার করেন। উহার প্রধান লক্ষণ এই যে, এই অবস্থায় সুষুপ্ত ব্যক্তির মনোভাব এবং কার্য্যকলাপ স্বেচ্ছানুযায়ী চালনা করিতে পারা যায়। এই অবস্থায় পরচিত্তের বোধ Thought-reading ও অতীন্দ্রিয় দর্শন Clairvoyance প্রভৃতি তথ্যগুলি দৃষ্ট হয়। তাঁহার সমসাময়িক পেটিটিন নামক একজন চিকিৎসক ঐরূপ সুষুপ্ত ব্যক্তিগণের শরীরে অসাড়তা উৎপাদন করেন। এই সময়ে রাষ্ট্রবিপ্লবে ফরাসী দেশ প্লাবিত হওয়ায়, এ বিষয়ের আলোচনা লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়ে।

১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ভারত-প্রত্যাগত ফেরিয়া (Feria) নামক জনৈক সাধুর যত্নে প্যারিস সহরে পুনরায় উহার অনুশীলন পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হয়। তিনি সপ্রমাণ করেন যে, সম্মোহন শক্তির ক্রিয়া মনোজ; কিন্তু তাঁহার মত অতি অল্প লোক কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছিল। পক্ষান্তরে মেস্মারের মত অনিবার্য্য ভাবে প্রাধান্য ও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার মতাবলম্বিগণ পীড়িত ব্যক্তিগণকে নিরাময় করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অন্ধকে দৃষ্টিশক্তি ও খঞ্জকে চলচ্ছক্তি প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহাতে ফরাসী দেশে পুনরায় ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইল এবং তাহার ফলে যে মৈস্মর তত্ব পূর্ব্বে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়াছিল, পুনরায় তাহার নূতন ভাবে তথ্যানুসন্ধানকল্পে ফরাসী দেশের চিকিৎসক-সভার কতিপয় যোগ্যতম সভ্য লইয়া একটী তৃতীয় সমিতির অধিবেশন হয়। মৈস্মর তত্বের রোগ আরোগ্য করিবার শক্তি আছে কি না, ইহা নিরূপণ করাই এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত সমিতি ছয় বৎসর

যাবৎ কার্য্য করিবার পর ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে উল্লিখিত বিষয়ের পক্ষে মত প্রকাশ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ফরাসী বিজ্ঞান-সভা উক্ত মত প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়।

কলিকাতা হিপ্‌নটিক বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

অর্থ]

প্রস্থান-ভেদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

(পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমৎ মধুসূদন-সরস্বতী-বিরচিত)

(৩)

বেদাঙ্গ-ষট্‌কের মধ্যে ব্যাকরণ তৃতীয় অঙ্গ। যাহার বা যে শাস্ত্রের দ্বারা শব্দসমূহের ব্যুৎপত্তি (পদ ও পদার্থে সম্বন্ধ প্রভৃতি) জানা যায়, তাহাকে ব্যাকরণ শাস্ত্র বলে ;* অথবা পদ এবং তাহার অর্থ, লিঙ্গভেদ প্রভৃতির সংস্কার যদ্দ্বারা হয়, তাহাকেও ব্যাকরণ বলা যায়।† বি=আ=কৃ×অনট্ ব্যাকরণ। এই ব্যাকরণ আট ভাগে বিভক্ত ও আটজন মহর্ষি-প্রণীত। (১) ইন্দ্রবিরচিত,—ঐন্দ্র ব্যাকরণ (২) চন্দ্র-কৃত,—চান্দ্র ব্যাকরণ, (৩) কাশকৃৎস্ন-কৃত,—কাশকৃৎস্ন ব্যাকরণ (৪) অপিশলী মুনিকৃত,—আপিশলীয় ব্যাকরণ (৫) শাকটায়ন (৬) পাণিনীয় ব্যাকরণ (৭) জয়ন্ত কৃত ব্যাকরণ (৮) জিনেন্দ্রবুদ্ধি-কৃত ব্যাকরণ। এই আটটি ব্যাকরণ শাস্ত্র দ্বারা লৌকিক ও বৈদিক শব্দ-রাশির স্বর, প্রকৃতি, প্রত্যয়, উচ্চারণ, পদসংস্কার প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হইয়া সংস্কৃতাদি শাস্ত্রের লিখন এবং কথনাদিতে বিশেষভাবে নৈপুণ্য লাভ করা যায় বলিয়া, বিজ্ঞগণ উক্ত শাস্ত্রকে ব্যাকরণ শাস্ত্র নামে অভিহিত করিয়াছেন।

---

* "ব্যাক্রিয়ন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা যেন তৎ ব্যাকরণম্।"

† "পদসংস্করণং হি ব্যাকরণম্।"

বাল্মীকি * রামায়ণে নবম সংখ্যক ব্যাকরণেরও প্রস্তাব দেখিতে পাওয়া যায়; এবং 'শ্রীতত্ত্বনিধি' নামক গ্রন্থেও নবম সংখ্যক ব্যাকরণের নাম লিখিত আছে;—যথা,—(১) ঐন্দ্র ব্যাকরণ, (২) চান্দ্র, (৩) কাশকৃৎস্ন, (৪) কৌমার বা কলাপ, (৫) শাকটায়ন, (৬) সারস্বত, (৭) আপিশল, (৮) শাকল. (৯) পাণিনীয় †। দেবাদিদেব শ্রীমন্মহেশ্বর-প্রোক্ত মাহেশ্বর-ব্যাকরণ অধুনা বিলুপ্ত। কিন্তু পাণিনি প্রণীত অষ্টাধ্যায়ীর প্রথমেই ১৪টী সূত্রই মহেশ্বরোক্ত বলিয়া সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধি আছে। ‡ ভারতাচার্য্য বলিয়াছেন, "ব্যাসদেব ব্যাকরণ বারিধি হইতে যে পদরত্ন সমূহ আহরণ করিয়াছিলেন, সে সমুদয় কি গোষ্পদ স্বরূপ পাণিনিতে আছে।" ইহা দ্বারাও মাহেশ ব্যাকরণের সত্বার উপলব্ধি হয়।

কথা-সরিৎ সাগরের প্রথম কথা পীঠকের চতুর্থ তরঙ্গে লিখিত আছে, যে "মহর্ষি উপবর্ষের শিষ্য সমূহের মধ্যে পাণিনি অতিশয় মন্দ-বুদ্ধি ছিলেন। উপবর্ষ-পত্নী-উপাধ্যায়ীর পরিচর্য্যা ও সেবার সময়ে, অতিশয় ক্লান্ত পাণিনি, উপাধ্যায়ী কর্ত্তৃক জড়বুদ্ধি বলিয়া ভৎর্সিত হন। ¶ উপাধ্যায়ী তাহাকে বিদ্যাভ্যাসের জন্য প্রেরণ করেন। ‖ অনন্তর ক্ষুণ্নমনা পাণিনি বিদ্যালাভেচ্ছায় হিমালয়প্রান্তে কঠোর তপশ্চর্য্যাদ্বারা ভগবান্ অর্দ্ধেন্দুশেখরকে পরিতুষ্ট করিয়া, মহাদেবের মুখ হইতে সকল বিদ্যার মুখ-স্বরূপ ব্যাকরণ শাস্ত্র লাভ করেন"। § সেই সময়ে চতুর্দ্দশটী সূত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া. অনন্তর তাঁহার বর প্রভাবে পাণিনি সূত্র সমূহ রচনা করিয়াছেন। ছান্দগ্যোপনিষদে ব্যাকরণকে "পঞ্চম বেদেরও বেদ" বলা হইয়াছে। তদ্ভাষ্যকার তথায় বলিয়াছেন,—"ভারত পঞ্চম বেদের ব্যাকরণ বেদস্বরূপ।" যে হেতু ব্যাকরণ দ্বারা পদ সমূহের বিভাগাদি ও ঋগ্‌বেদাদি শাস্ত্র পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

---

* "সোহয়ং নব ব্যাকরণার্থ বেত্তা"। রামায়ণে।

† "পাণিনীয়ং মহাশাস্ত্রং পদসাধুত্ব লক্ষণং"—(পরাশরোপপুরাণং)

‡ "অ ই উ ণ্" ইত্যাদি "হল" ইত্যন্তং চতুর্দ্দশ সূত্রং মাহেশং। ইতি মাহেশ্বরাণি সূত্রাণ্যনাদি সংজ্ঞার্থানি" মহেশ্বরাদাগতানি. মহেশ্বরেণ প্রোক্তানি ইতি বা তদর্থং।

¶ "যান্যুজ্জহার মাহেশদ্ব্যাসোব্যাকরণার্ণবাৎ।
তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনি গোষ্পদে' ॥

‖ "অথ কালেন বর্ষস্য শিষ্যবর্গোমহানভূৎ। তত্রৈকঃ পাণিনির্নাম জড়বুদ্ধিতরোহভবৎ॥

§ স শুশ্রূষা পরিক্লিষ্টঃ প্রেষিতোব ভার্য্যয়া ; তত্র গচ্ছ [illegible] গিরৌ [illegible] ॥
তত্র তীব্রেণ তপসা তোষিত[illegible]দিন্দুশেখরাৎ। সর্ব্ববিদ্যা[illegible] তেন প্রাপ্তং ব্যাকরণং নব

"বাগ্‌বৈ প্রাচীমবদৎ" এই শ্রুতির দ্বারা কেহ কেহ শ্রৌত, ঐন্দ্র ব্যাকরণের অনুমান করেন।

"সর্ব্বত্র শাকল্যস্য" (পাঃ ৮।৪।৯২ সূঃ) "শাকলাদ্বা" (৪।৩।১২৮ পাঃ সূঃ)। এই সূত্র দ্বারা শাকল্য ঋষি-রচিত ব্যাকরণ, সহজে অনুমিত হয়। শাকল ঋষির স্বীয় নামে শাখা ও কল্পসূত্র আছে। শাকল ঋষির উক্ত বা অধীত গ্রন্থই শাকল্য নামে খ্যাত। 'বাসুপ্যাপিশলেঃ" (পাঃ সূঃ ৬।১।৯২)। এই সূত্র দ্বারা আপিশালি মুনির মতের প্রাচীনত্ব ও তাঁহার রচিত ব্যাকরণের প্রমাণ হয়। কলাপ ব্যাকরণে টীকাকার দুর্গ সিংহও আপিশলের মত বহু স্থানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। (কলাপ-নাম প্রকরণ ৬ষ্ঠ সূঃ টীকা) উক্ত পাণিনি সূত্রের বার্ত্তিককার বলিয়াছেন, সূত্রেতে 'আপিশল গ্রহণ' পূজার্থ।

"ব্যোর্লঘু প্রযত্নতরঃ শাকটায়নস্য" (পাঃ সূঃ ৮।৩।২০)। এই সূত্র দ্বারা শাকটায়ন ব্যাকরণের পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য প্রতীত হয়।

কলাপ ব্যাকরণের পরিশিষ্ট প্রণেতা শ্রীপতি দত্ত স্বীয় গ্রন্থে শাকটায়নের মত বহুবার উদ্ধৃত করিয়াছেন। এখন এই ব্যাকরণ মুদ্রিত। তথাচ শ্রীপতি দত্ত (পরিশিষ্টে সূঃ ৪৯) "শাকটায়নস্তুপক্ষেমলোপমাত্রমাহ" যথা 'সক্কর্ত্তা' "চান্দ্রস্তু রেফমাত্রে নিষেধঃ" (সন্ধিপ্রকরণ পরিঃ ১ম, সূঃ ৮০)। "ইম পাণিনীয়মচান্দ্রঞ্চ" (সূঃ ৫৮)। "চান্দ্রস্তু বিধিরেবৈষ নাদ্রিয়তে" (সূঃ ৪৬)। "বৎসতরমণাদৃত্য 'বৎসর' ইতি কাতন্ত্র, গতঞ্জলি, শাকটায়নাদীনাং"।

"কলাপিনোঽণ্" (পাঃ সূঃ ৪।৩।১০৮)। "কলাপি বৈশম্পায়—" (পাঃ সূঃ ৪।৩।১০৪)। "কলাপি অশ্বত্থ যববুসা" (পাঃ সূঃ ৪।৩।৪৮) কলাপি কর্ত্তৃক উক্ত বা অধীতকে কালাপ বলে। কলাপি (ময়ূর) পুচ্ছ হইতে প্রথম সূত্র নির্গত বলিয়া, এই ব্যাকরণের নাম কলাপ। ইহার 'কাতন্ত্র' ও 'কৌমার' নাম খ্যাত আছে। কার্ত্তিকেয়ের কৃপা লব্ধ বলিয়া কৌমার বলে। অগ্নি পুরাণের শেষ ভাগে ইহা অভিহিত হইয়াছে। ঋগাদির প্রাতিশাখ্যে এই কৌমার ব্যাকরণের অনুরূপ বহু সূত্র দেখিতে পাওয়া যায়।

"মহাদেবের মুখবিনির্গত "সিদ্ধ" এই শব্দ শ্রবণ করিয়া *, কুমার স্বীয়

---

* শঙ্করস্য মুখাদ্বাক্যং শ্রুত্বা চৈব ষড়াননঃ। লিলেখ শিখিনঃ পুচ্ছে স কলাপ ইতি স্মৃতঃ কলাপচন্দ্রিকা।

বাহন ময়ূরের পুচ্ছে ঐ শব্দটী লিখিয়া রাখিয়াছিলেন বলিয়া, এই ব্যাকরণকে কলাপ-ব্যাকরণ বলে। অপরাপর বিবরণ কথা-সরিৎ-সাগরে এবং কলাপের ব্যাখ্যা কবিরাজ গ্রন্থের প্রথমে আছে। মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যেও কলাপানুযায়ী "আখ্যাত"—প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। পাণিনি ভিন্ন যে কয়েকখানি ব্যাকরণ দেখিতে পাওয়া যায়; তন্মধ্যে কলাপ ব্যাকরণই সর্ব্বোত্তম। যে হেতু ইহার সূত্র খুব সরল, সহজবোধ্য, বিচারপ্রণালী অতি বিশদ, এবং আকারে বৃহত্তর, টীকার বাহুল্যও অধিক। মুগ্ধবোধের সূত্রগুলি দুর্ব্বোধ্য, তদ্দ্বারা ভাষাজ্ঞানও ভালরূপে জন্মে না এবং আকারেও লঘু।

(ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ।

অর্থ]

প্রত্যাবর্ত্তন।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

তখন বড়দিন,—সহরময় খুব ধুম। চারিদিকে খুব আমোদ প্রমোদ; নাচ গান, তামাসা, আমোদের ছড়াছড়ি। এ হেন আমোদের দিনে,—আনন্দের আহ্বানে নরেশও স্থির থাকিতে পারে নাই। সেও ইয়ার বন্ধু লইয়া পান্সী ভাড়া করিয়া, মদের তরঙ্গ ছুটাইয়া, গানের হিল্লোল তুলিয়া—নেশা ও স্ফূর্ত্তির তুফানে গা ভাসাইয়া, ৺কালিঘাটে উপস্থিত। সমস্ত পথে কেবল গান ও স্ফূর্ত্তি, আমোদ ও উল্লাস চীৎকার ও হর্‌রা।

পান্সী দুই একবার টলিয়া ও দোল খাইয়া তীরে ধাক্কা লাগিয়া থামিয়া গেল;—পান্সীর ন্যায় আরোহিগণও দুই একবার টলিয়া, দোল খাইয়া ও যেন কতকটা ধাক্কা লাগিয়া নিক্রান্ত হইল।

নরেশ যখন নৌকার 'খোল' হইতে বহির্গত হইয়া 'পাটাতনের' উপর দাঁড়াইল, তখন এক ব্যক্তি স্নান করিতেছিল। লোকটী দীর্ঘাকার, কৌপীন মাত্র সার,—অত্যন্ত ক্ষীণ ও কৃশ, যেন দুর্ভিক্ষপীড়িত বা বহুদিন অনাহারক্লিষ্ট। লোকটী অনিমেষ-নয়নে নরেশের দিকে কি যেন কৌতূহলপরায়ণ হইয়া চাহিয়া রহিল। নরেশও সেটা লক্ষ্য করিল।

থাকে? [illegible] এমত ভাবে লেগে থাকে ত' লোকটাকে দু'একটী পয়সা দিয়ে পাতলা হয়ে পড়।" নরেশ ভাবিল 'দেখাই যাক্ না। লোকটা যখন ডাকিতেছে, তখন নিকটে গেলেই বা ক্ষতি কি?" লৌহ যেমন চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয়, সেও তেমনি যেন কতকটা অজ্ঞাত-সারে আকৃষ্ট হইতেছিল।

নিকটে যাইলে লোকটী বলিল "বাপু! এ সব ব্যাপারে তুমি বেশ সুখ পাও কি?" তাহার স্বর আদেশব্যঞ্জক। নরেশ ভাবিয়াছিল—লোকটা ভিখারী। সুতরাং এরূপ প্রশ্নের জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিল না; ঈষৎ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া গেল।

লোকটী বলিল; "বল লজ্জা কি? তুমি কি সুখ পাও?" নরেশ অন্যমনস্ক ভাবে উত্তর করিল, "হাঁ, সুখ পাই বই কি?"

লো। "আমিও তাই ভাবিতেছিলাম; সুখ না পাইলে এরূপ করিবেই বা কেন?"

নরেশের এসব কথা বড় ভাল লাগিতেছিল না; নিষ্কৃতি পাইলেই সে বাঁচে; অথচ কৌতূহলও হইতেছিল,—এ অজ্ঞাতকুলশীল ভিখারীর এরূপ প্রশ্নের অর্থ কি?

লো। "তা'হলে এ সমস্ত আমোদ প্রমোদ সুখের জন্যই কর, কেমন কি না?"

ন। (কতকটা বাধ্য হইয়া) "হাঁ তা' বই কি? আমোদের জন্যই করি?"

লো। "আচ্ছা আমি যদি এর চেয়ে ঢের বেশী আনন্দ দিতে পারি, তাহা হ'লে এ সব ছাড়িবে কি? তোমার ত' সুখ পেলেই হ'ল।"

নরেশ বিস্মিত; সে এরূপ কথাবার্ত্তার অনুমান পর্য্যন্তও করে নাই; এখন সে বড় বে-কায়দায় পড়িয়াছে। কেন না পূর্ব্বেই বলিয়াছে যে আমোদের জন্যই

[illegible] সব করে। [illegible] একটা [illegible] হইয়া, মৌখিক ভাবেই বলিল, যে "হুঁ যদি [illegible] আমোদ [illegible]

[illegible] যদি [illegible]

[illegible] যদি পাই [illegible] ছাড়িবে ত' ?"

নরেশ এতক্ষণ কথাবার্ত্তা [illegible] হইয়াছিল। [illegible] স্বীকার করিয়া মুস্কিলে পড়িয়াছে, কাজেই বলিল "হুঁ। দিতে পারেন ত' [illegible] ছাড়িবনা।"

লো। "বেশ, এই গঙ্গাতীরে, তীর্থ স্থানে কথা রহিল। তুমি আমার সহিত আগামী মাঘী-পূর্ণিমার দিন বালীতে ৺কল্যাণেশ্বরের মন্দিরে সাক্ষাৎ করিও। আমি এখন চলিলাম।"

লোকটী আর কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই জনস্রোতে মিশিয়া গেল। নরেশ দেখিল—সে প্রকারান্তরে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

কথাবার্ত্তা দেখিয়া জনৈক বন্ধু বিদ্রূপ করিয়া নরেশকে বলিল "ভালুক আসিয়া কানে কানে কি বলিয়া গেল ?"

ঈষৎ হাসিয়া সে উত্তর করিল "ভালুক বলিয়া গেল, যে বিপদের সময় যাহারা ফেলিয়া পলায়, সেরূপ বন্ধুকে কদাচ বিশ্বাস করিও না"।

নরেশ স্ফূর্ত্তি করিয়া কালীঘাট হইতে ফিরিল বটে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা দুশ্চিন্তার বোঝা বহিয়া আনিল। ভাবিল সত্য কি ? সত্যই কি লোকটা ইহা অপেক্ষা অধিক আনন্দ দিবে ? কাজগুলা যে ভাল নহে, তা' নরেশ অবশ্যই বুঝিতে পারিত; মধ্যে মধ্যে অস্পষ্ট স্বপ্ন-দৃশ্যের ন্যায়, বাল্যকালে পিতামহের নিকট পূজা বা চণ্ডীপাঠ শ্রবণের কথা মনে জাগিত; মনে হইলে একটু তৃপ্তিও হইত। সে অবস্থা,—সে নিরাবিল আনন্দ,—পাইতেও ইচ্ছা করিত; কিন্তু সে কর্ম্ম-বিপাকে নেশার দাস; পরিবর্ত্তন অসম্ভব।

সে বন্ধুদের সমস্ত খুলিয়া বলিল,—তা'রা শুনিয়া ত' হাসিয়াই আকুল—বলিল "তুমি ক্ষেপেছ নাকি; দেখ্‌লে একদম্ একটা জানোয়ার। সে তোমাকে 'কাপ্তেন' দেখে কিছু মোটা রকম 'হাতাইবার' চেষ্টায় আছে। তোমার উচিত ছিল, তখনি কিছু নগদ দিয়ে বিদায় করা !"

বিহ্বল নরেশ ভাবিল "হাঁ তাহাই করা উচিত ছিল বটে, সঙ্গে সঙ্গে সব

ঝঞ্ঝাট মিটিয়া যাইত।" অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া নরেশ স্থির করিল, "না আমি যাইব না; বুজরুকীতে আর কাজ নেই।"

বন্ধুরা শুনিয়া বলিল—' মোদের ছেড়ে কোথা যাবে ওরে কাল ভোম্‌রা? কোথায় যাবে? তোমার মাথায় সে লোকটার কথা এখনো ঘুরছে না কি? থাকে ত' (summarily reject) দূর করে দাও।"

নরেশ বস্তুতই একরূপ ভুলিয়া গেল; কিন্তু মাঘী-পূর্ণিমার দুইদিন পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া পড়িল। কে যেন তাহার মনকে 'বলাদপি নিয়োজিত' করিয়া টানিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল "তাহার যাওয়া উচিত, কেন না সে সত্য-বদ্ধ"; ভাবিল "সত্যি ত সে আর এসব আমোদ ছাড়্‌ছে না; তবে মজাটাই দেখা যাক্‌না কেন!" প্রাণের ভাবটা বন্ধুদের খুলিয়া বলিল—তাহারা চীৎকার করিয়া ও হাততালি দিয়া বলিল "Bravo—এ অতি nice idea, বেশ একটা adventure হবে; আমরাও যাব।"

পূর্ব্বরাত্রে নরেশ অত্যন্ত চাঞ্চল্য অনুভব করিল। ভয় হইতে লাগিল, বুঝি বা পরদিন হইতেই এই অপূর্ণ যৌবনের অতৃপ্ত লালসা,—এই স্ফূর্ত্তি, সকলি ছাড়িতে হয়। প্রত্যূষে উঠিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া, নরেশ নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিল। ৺কল্যাণেশ্বরের মন্দিরের সাম্‌নেই লোকটীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তিনি সানন্দে নরেশকে আলিঙ্গন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 'গঙ্গাস্নান করিয়া আসিয়াছ কি?'

ন। "না।"

লো। "এইটী ত' বাপু বুদ্ধির কাজ কর নাই; সারা গঙ্গাটা অতিক্রম করে এলে,আর বুদ্ধি করে 'ডুবটী' দিয়ে আস্‌তে পার নাই! যাও,শীঘ্র স্নান করে এস।"

নরেশ আর দ্বিরুক্তি করিতে পারিল না;—ধীরে ধীরে স্নান করিয়া আসিল।

তা'র পর যাহা হইল, তাহা আর বলিতে পারিব না। কে যেন তা'র বহুদিনের আঁধার ঘরে বাতি জ্বালিয়া দিল। নির্ম্মল সৌরকর যেমন ধরণী-বক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া চারিদিক্‌ ঝক্‌মক্‌ করিয়া তুলে;—পূর্ণিমার কৌমুদী যেমন সারা বিশ্বকে প্লাবিত করিয়া পুলকিত করিয়া তুলে;—নরেশেরও বোধ হইল যেন 'কি একটা' তা'র ভিতরের চিত্ত বুদ্ধি, মন, বাসনা,—সমস্ত প্লাবিত আপ্লুত, ও বিশুদ্ধ করিয়া দিতেছে। মাথার ভিতরে একটা নূতন সুরের, নবীন

ছন্দের আলোড়ন অনুভব করিল; প্রাণটা যেন এক নূতন ভাবে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া গড়িয়া উঠিতেছে। যেন সে নব জীবন যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছে। কেমন করিয়া মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ণ ও প্রদোষ কাটিয়া গেল, তা' সে নিজেই ভালরূপ বুঝিতে পারিল না।

নগ্নপদে, মুণ্ডিত মস্তকে, তন্ময়চিত্তে, আপন ভাবে বিভোর হইয়া, যখন গভীর রাত্রে বাটী ফিরিল,—তখন শান্তি দেবী তাহার এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন দেখিয়া স্তম্ভিত; তাঁহার নিজের চক্ষুকে নিজেরই বিশ্বাস হইতেছিল না।

গদ-গদ কণ্ঠে, অশ্রুসিক্ত নয়নে গৃহ দেবতার উদ্দেশে ভূমিতে লুটাইয়া শান্তিদেবী হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাইলেন—ভাবিলেন বুঝি বা তাঁ'র পুণ্যশ্লোক শ্বশুর মহাশয়ের ভবিষ্যদ্বাণী এতদিনে সার্থক হইল। (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অর্ঘ]

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সন্ন্যাসী। "সে জন্য তুমি ভাবিও না। তাঁহার কোন সেবার ক্রটী হইবে না। অবশ্য হিন্দু বিধবারা এখনও বৈধব্য-ব্রত পূর্ণভাবে প্রতিপালন করিতেছে। তাহারা এখনও ধর্ম্ম হারায় নাই। কি ভয়ানক দেশের অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এই সকল স্ত্রীলোকেরা পুরুষের চক্ষে কুসংস্কারাপন্না—অশিক্ষিতা; আর সেই আত্মাভিমানী, ধর্ম্ম-বিহীন আর্য্য-বংশধরগণ আপনাদিগকে কৃতবিদ্য মনে করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহেন। আজকাল ধর্ম্মের ঠিক আবশ্যকতা আছে, এ কথা কেহ বিশ্বাস করিতে চায় না। কেবল 'যেন তেন প্রকারেণ' অর্থ সঞ্চয় হইলেই হইল।"

হেমলতা। "সংসার করিতে হইলে অর্থেরও প্রয়োজন আছে।"

সন্ন্যাসী। "আমি সে কথা অস্বীকার করি না; তবে উহাই জীবনের লক্ষ্য, ও উদ্দেশ্য কি না, ঠিক করিতে হইবে। লক্ষ্য ঠিক না হইলে, পথ নির্দ্ধারণ হইবে কেন? আমাদের জীবনের সার্থকতা কি, ইহা বাহিরের সুখের দিক্ হইতে বুঝিতে গিয়া,আমরা কেবল স্বার্থকে বরণ করিয়াছি। এই স্বার্থপরতাই

এখন আমাদের মূল মন্ত্র জপ ও ধ্যান। ইহাতে কেহ বাধা দিলে, সে শত্রু ও পথের কণ্টক। কিন্তু মনুষ্য যদি বুঝে যে তাহার এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ গুলি বস্তুত এই জীবন নাটকের পরিসমাপ্তির পথ,—এই ক্ষুদ্রের সহিত সেই মহতের মিলনও আনন্দকণার সহিত আনন্দময় মহা-সমুদ্রের মহা-সঙ্গমের উপায়;—যদি জীব বুঝে এই জীবন-রঙ্গভূমির সকল খেলার পর্য্যবসান সেই ভূমার উপলব্ধিতে, যদি জীব বুঝে যে এই গ্রহণাত্মক অহং-ভাবের পরিপূর্ণতা সেই বিশ্বাতিগ পরমাত্মা তত্ত্বে,—এই অহংএর সার্থকতা জগতের ব্রীহি পশু বা স্ত্রী জন্য নহে, পরন্তু চরম উদ্দেশ্য সেই ভূমা আত্মা,—তাহা হইলে কি দেশের অবস্থা ক্রমে এইরূপ দাঁড়ায়? তা' হলে সংসারে কি স্বার্থের এই ভীষণ সংগ্রাম দৃষ্টিগোচর হয়?"

হেমলতা। "এই চরম উদ্দেশ্য কি একেবারে বুঝা যায়? সর্ব্বদা এই ক্ষুদ্র ভাবে বর্ত্তমান থাকিয়া, এই উন্নত আদর্শ কিরূপে হৃদয়ে পরিস্ফুট হইবে? পিতঃ! এক্ষণে আমাদের কর্ত্তব্য কি?"

সন্ন্যাসী। 'কর্ত্তব্য সেই ঋষি মহাপুরুষদের পথে তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ—

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন গচ্ছেৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন রিষ্যতে॥

সেই ঋষিগণ এই জগতে আসিয়া সেই পরম একই বস্তুর অন্বেষণ করিতেন। যিনি আদিত্যের প্রকাশক, যাঁহাতে এই জগৎ অবস্থিত, যিনি জগৎময়, যিনি সত্যস্বরূপ জ্ঞান স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, সেই একই বস্তুর সন্ধানে তাঁহারা জীবন অতিবাহিত করিতেন; শিষ্যদিগকেও বলিতেন—

তমেবৈকং জানথ আত্মানমন্যাবাচো বিমুঞ্চথ অমৃতস্যৈষ সেতুঃ॥

"একমাত্র তাঁহাকে জান; তাঁহার কথাই আলোচনা কর; অন্য কথা ছাড়িয়া দাও; কারণ এই মর জগৎ অতিক্রম করিয়া, অমৃতত্ব লাভ করিতে হইলে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মই একমাত্র সেতু"। হায়! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! এইরূপ মহান্ আদর্শ যে জাতির সম্মুখে প্রতিক্ষণ প্রকাশিত হইত, সেই জাতি সত্য ও অমৃতের পদ ছাড়িয়া দিয়া মিথ্যার আবরণের প্রতি নিয়ত ছুটিতেছে। সেই পবিত্রতা, সেই পরার্থ-পরতা, সেই তত্ত্বজ্ঞান এখন অন্তর্হিত। হেমলতা, এস প্রাণ ভরিয়া "ভারতকে এই অবস্থা হইতে উদ্ধার কর"—বলিয়া মায়ের নিকট

প্রার্থনা করি। 'মা ইচ্ছাময়ি! ভারতের জীবকুলকে একবার বুঝাইয়া দাও, যে জীব, এই জগতের সমগ্র ভোগেও লালসা পূর্ণ হইবে না।" যেন একবার তাহারা হৃদয়ের মধ্যে সেই পূর্ণামৃত আস্বাদন করে ও সেই নষ্ট ধনের উদ্ধার করিতে শিখে।'

বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী যেন কি এক অপূর্ব্ব ভাবে জ্যোতিষ্মান্ হইয়া উঠিলেন! যেন তাঁ'র বদন দিয়া অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বহির্গত হইতে লাগিল! সন্ন্যাসী যেন এজগতের নয়, যেন অপূর্ব্ব দেব-শক্তির প্রকট ভাব। ভৈরবী ও হেমলতা নিঃশব্দে করযোড়ে সম্মুখে বসিয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী পুনরায় যেন আপন মনে বলিতে লাগিলেন—"সে দিন গিয়াছে;—সে শিক্ষা এখন লুপ্ত-প্রায়। এখন জীবকুল বহিরঙ্গে মাতোয়ারা, সর্ব্বদাই উচ্ছৃঙ্খল। কিরূপে আবার সেই দিন আসিবে? জীব কিরূপে আবার আপনার স্বরূপ চিনিতে পারিবে? জড়ত্ব ঘুচিয়া যাইবে।"

হেমলতা। 'কেন এরূপ হইল প্রভু! আবার কি সে দিন আসিবে?'

সন্ন্যাসী। 'ভগবান জানেন সে দিন আসিবে কি না! আমি যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেছি—তাহারই চেষ্টা করিতেছি; ফলাফল তিনিই জানেন। তখন ও এখনকার শিক্ষার অনেক পার্থক্য। তখনকার শিক্ষাতে ভিতরের বিকাশ হইত, যাহাতে চিত্ত সেই ভগবানের দিকেই যায়। এখনকার শিক্ষা ত' ধর্ম্মহীন শিক্ষা; এ শিক্ষায় সর্ব্ব-স্বরূপ শ্রীভগবান লক্ষ্য নহেন। আমি তোমায় যাহা বলিলাম, হেমলতা, তাহাই সাধন কর। তোমার দ্বারা জীবের মঙ্গল হউক। ভৈরবী! আমি কিছু দিনের মত এস্থান পরিত্যাগ করিব; হেমলতার ভার তোমার উপর বিশেষভাবে অর্পিত হইল।'

হেমলতা সন্ন্যাসীর কথায় শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়া উপদেশানুযায়ী চলিতে লাগিল। একে এই স্থানে প্রকৃতির অনাবৃত সৌন্দর্য্য, তাহাতে আবার তাহার চিত্তের প্রবণতা ভগবৎ-অভিমুখী। সেই ঊর্দ্ধে উদার অনন্ত মহাকাশের শশী-তারকা-সমলঙ্কৃত শোভা সন্দর্শনে হেমলতার হৃদয়ে এক বিরাট ভাবের অনুভূতি হইতে লাগিল। সে এতদিন সেই আকাশ, সেই তারকা দেখিত; তাহাতে তাহার চিত্ত এমন ভাবে অনুপ্রাণিত হইত না। কিন্তু শিক্ষা-গুণে এবং ভৈরবীর সহবাসে সে সর্ব্ব বস্তুর ভিতর দিয়াই 'এক'কে দেখিতে শিখিল।

সুদূর নীলবর্ণাচ্ছাদিত নয়নাভিরাম গিরি-শোভা দর্শন করিয়া, তাহার শ্যামবর্ণা মাতৃমূর্ত্তির কথা মনে পড়িতে লাগিল। স্রোতস্বিনীর কল-কলে, ও বিহগকুলের প্লুতস্বরে সে জগদম্বার আহ্বান ধ্বনি শুনিতে শিখিল। সেই মধুর স্রোতে সংসারের সৌন্দর্য্য ও ভোগবিলাস স্মৃতিপট হইতে একেবারে মুছিয়া গেল। এই প্রাকৃতিক অননুভবনীয় মাধুর্য্যে এবং সেই মহাজ্ঞানী যতি-প্রবরের একান্ত আশীর্ব্বাদ বলে ও ভৈরবীর পবিত্র প্রেম এবং ভালবাসায়, হেমলতার হৃদয় সদ্য-বিকশিত কমলের ন্যায় কমণীয় শোভা ধারণ করিল। সেই সন্ন্যাসীর জ্ঞান, বৈরাগ্য ও পরার্থ-পরতা ক্রমে তাহার হৃদয়ে সংক্রমিত হইতে লাগিল।

যথারীতি ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে, জগদম্বার চিন্তা ও আরাধনা; তা'র পর শ্রীগুরুচরণে প্রণাম করিয়া পাঠাভ্যাস। সময়ে সময়ে রন্ধন নিমিত্ত ইন্ধন, জল আনয়ন ও ফলমূল সংগ্রহাদির জন্য সামান্য পরিশ্রম করায়, তাহার স্বাস্থ্যেরও উন্নতি সাধিত হইল। এইরূপে দেহ ও মন এক সঙ্গে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। ভৈরবী হেমলতার অবস্থা ও বুদ্ধির বিকাশ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

ভৈরবী একদিন হেমলতাকে বলিলেন যে, "আমি তোমার বুদ্ধি-বৃত্তির বিকাশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। আমি যাহা অভ্যাস করিতে একমাস অতিবাহিত করিয়াছি, তুমি তাহা অতি অল্প সময়ে অভ্যাস করিতে সমর্থ হইয়াছ। তোমায় দেখিয়া আমার আশা হইতেছে যে পিতার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে। তুমি ব্রাহ্মণ কন্যা, তোমার এ বুদ্ধি সহজেই বিকশিত না হইবে কেন?"

হেমলতা সলজ্জভাবে বলিলেন,—"তুমি ভালবাস তা'ই এরূপ বলিতেছ। আচ্ছা দিদি! পিতার উদ্দেশ্য কি?"

ভৈরবী। "পিতা শম,দম ও তিতিক্ষা সম্পন্ন ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসু, ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণদিগের অভ্যুদয়ের কামনা করেন। তাঁহার মনের আশা, যে এই ব্রাহ্মণ অভ্যুদয়ে সিদ্ধর্ষি, ব্রহ্মর্ষি এবং রাজর্ষি সেবিত এই ভারত ভূমে আবার সেই ভগবৎ-জ্ঞানের শুভ্র পতাকা উড্ডীয়মান হউক। তা'ই তিনি সুদূর হিমালয় হইতে এই বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত, সর্ব্বস্থানেই, সেই চেষ্টা করিতেছেন। এস, আমরা ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহার প্রেমে বলীয়ান্ হইয়া, যথাসাধ্য সেই মহাকার্য্যে যোগদান করিয়া, মনুষ্য জীবন সার্থক করি।"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

হিমালয় বিধাতার এক অপূর্ব্ব সৃষ্টি ;—উচ্চতায় পৃথিবীর শীর্ষস্থান ; শোভায়, সৌন্দর্য্যে ও ভাব-গাম্ভীর্য্যে দেব-ভূমি। শোক, দুঃখ, জ্বালাময় সংসারের অশান্তিকর উত্তাপ এখানে নাই ; তা'ই মহান্ স্নিগ্ধতাই এখানকার বিশেষত্ব। পাপ তাপাদির কলঙ্ক কালিমার রেখা পর্য্যন্ত এখানে নাই। তা'ই গিরি-শ্রেণীর আকাশ-চুম্বি শিখর, পুণ্যময় শুভ্র তুষারে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন। কাম ক্রোধাদির তীব্র কষাঘাত, লোভ মোহাদির অসহ্য তাড়না এখানে নাই; তা'ই দেবাদিদেব মহেশ্বরের কাঞ্চনজঙ্ঘায়, জীবকুল খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ রহিত হইয়া নির্ভয়ে বিচরণ করে। সাধনার অতুলনীয় স্থান,—তা'ই এখানে নর-নারায়ণাশ্রম, ওখানে ব্যাসাশ্রম এবং মহর্ষি দেবর্ষি প্রভৃতি মহাপুরুষদিগের বিচরণ স্থান। মোহান্ধ হৃদয়ে তীব্র জ্যোতি বিকীর্ণ করিতে, পাপ কুজ্ঝটিকার অস্পষ্ট অন্ধকারে শুভ্রালোক বিস্তার করিতে, মলিন প্রাণে পুণ্যের পীযূষধারা প্রবাহিত করিতে, এমন স্থান আর নাই। হিমগিরির বিশাল বক্ষঃস্থিত নিত্যোৎসব-সমন্বিত স্থানে একবার গমন করিলে, অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও ক্ষুদ্র সংসার চিন্তা দূরে যায় ; বাসনার উদ্বেগ খর্ব্বতা প্রাপ্ত হয়; মহান্-সঙ্গ-লাভেচ্ছায় হৃদয়ে কি এক অভূতপূর্ব্ব প্রেমের উৎস বহিতে থাকে। এই পর্ব্বতে এখনও কত সিদ্ধ মহাত্মগণ বাস করিতেছেন ; কত যোগীগণ যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া ধ্যান মগ্ন ; কত শত ভক্তগণ তীর্থক্ষেত্রের ভিতর দিয়া ভগবানের অনন্ত লীলা প্রত্যক্ষ করিতেছেন। এই পর্ব্বতে কত অমল প্রস্রবণ, কত শান্তিময় কন্দর ও গুহা, তাহা কে বলিবে। কোথাও বা মদান্ধ ভ্রমর সমূহের গুন্ গুন্ প্রতিধ্বনিত রব, কোথাও বা বিবিধ বৃক্ষসমূহের উচ্চ শাখা প্রশাখায় নানারূপ পক্ষীকুলের প্লুত স্বর, কোথাও বা নির্ঝর হইতে সশব্দে ভূপৃষ্ঠে বারিপাত। সেই অভ্রভেদী হিমাদ্রির নির্জ্জন নিস্তব্ধ প্রদেশের পুণ্য-রেণুকা যাহাদের হৃদয় স্পর্শ করিবে, নিশ্চয়ই তাহার মৃতকল্প প্রাণও ক্ষণকালের জন্য পুনরুজ্জীবিত হইবে, সন্দেহ নাই। সেখানকার সেই উন্মুক্ত প্রসারিত ও সজীব প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য সন্দর্শনে, হৃদয় ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণতা ভুলিয়া যায় ; মনুষ্য-শিল্পের অহংকার দূরে গিয়া, তৎপরিবর্ত্তে চিত্ত সেই বিশ্ব-শিল্পীর মহান্ শিল্প-সৌন্দর্য্যে অভিভূত হয়। চির-হিমানী-মণ্ডিত হিমাদ্রি শৃঙ্গ প্রত্যক্ষ করিলে,—তুষারস্পর্শী

সমীরণ প্রবাহ উপভোগ করিলে, বোধ হয় যে জীবের মোহ ক্ষণকালের জন্যও অন্তর্হিত হয়। কত শত পুণ্যসলিলা নদীকুল এই পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ভারতকে পবিত্র করিতেছে। কুল কুল বাহিনী পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী, কৃষ্ণ-লীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী স্বরূপা প্রেমপূরিতা যমুনা, কোথাও ক্ষুদ্রাকারে স্খলিত-গতি, কোথাও ফেনীল মূর্ত্তিতে কবির বর্ণনার যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়া প্রবাহিতা। এইরূপ স্থানকে লক্ষ্য করিয়াই জ্ঞানী শিহ্লন মিশ্র বলিয়াছেন,—

গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলাবদ্ধপদ্মাসনস্থ
ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতস্য।
কিস্তৈর্ভাব্যং মমসুদিবসৈ র্যত্রতে নির্ব্বিশঙ্কঃ।
সাপ্রাপ্যন্তে জর-ঠহরিণা গাত্রকণ্ডুবিনোদং।

আমরাও কবির সহিত বলি, যে তেমন শুভদিন আমাদের কবে হইবে, যেদিন জাহ্নবী তীরে, হিমগিরির শিলাতলে, বদ্ধ-পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস বিধানে নিযুক্ত থাকিয়া, যোগনিদ্রায় মগ্ন হইব; আর প্রবীণ হরিণগণ আমার তাৎকালিক স্পন্দবিহীন দেহে নির্ভয়ে স্বদেহ ঘর্ষণ করিয়া, গাত্রকণ্ডুয়ণ সুখ অনুভব করিবে।

এইরূপ একটী স্থানে ভৈরবীর পিতা, সেই সন্ন্যাসী, একটী আশ্রম স্থাপনা করিয়াছেন। আশ্রমের নিম্ন দিয়া শ্রীহরির চরণকমলের রজঃস্পর্শে পবিত্রাকৃত অলকানন্দা দিবারাত্রি অবিরামে প্রবাহিত হইতেছে। আশ্রমের ফলমূল-শোভিত স্বভাবজাত বিটপীরাজির শোভা মনোমুগ্ধকর। একটী লতাবিতান-মণ্ডিত নিকুঞ্জকাননও আশ্রমের সন্নিহিত। সন্ন্যাসী সেই আশ্রমে কয়েকটী শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করেন। যে কয়জন ছাত্র তথায় আছেন, তন্মধ্যে উমাপদই প্রধান। সন্ন্যাসীর শিক্ষায় তাহারা জ্ঞানে, বৈরাগ্যে ও ধৈর্য্যে অতুলনীয়। উমাপদ, ধ্যান সমাপনান্তে অলকানন্দার তটে বসিয়া আপন মনে বলিতেছেন,—

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে॥
রোগং শোকং পাপং তাপং, হরমে গঙ্গে কুমতি কলাপং॥
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসিগতির্মম খলু সংসারে॥

অনেকক্ষণ অলকানন্দার স্তব পাঠ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। সন্ন্যাসী উমাপদকে আসিতে দেখিয়া, দেবীদাসকে বলিলেন "উমাপদকে এখানে

ডাক।" উমাপদ তথায় আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"দেখ উমাপদ, আজ কয়েক বৎসর হইতে তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছি। সেই শিক্ষার ফল একবার কিছুদিনের জন্য দেখিতে চাই। কতদিন বলিয়াছি এই জগৎ মহামায়ার খেলা। ঈশ্বর চৈতন্যময়ী দেবী মায়ারূপে আপাততঃ পরিদৃশ্যমান সর্ব্বরূপ অনন্ত কোটীব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবানে প্রকাশ করিয়া, পুনরায় তাঁহাতেই লয় করিয়া "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই ভাবের সংস্থাপনা করেন। কিন্তু তবুও সংসারের উপর একটু দ্বেষভাব বর্ত্তমান আছে বলিয়া, কিছুদিনের জন্য তোমাদিগকে লোকালয়ে পাঠাইতে চাই।"

উমাপদ। "প্রভু! কি ভাবে একথা বলিতেছেন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।"

সন্ন্যাসী। "তুমি মহামায়ার ভক্ত, সর্ব্বদাই সেই পরাভাবের উপাসনা করিতেছ। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য আজ অন্যরূপ। ভারত এখন তমসাচ্ছন্ন – শিক্ষায় দীক্ষায় ভারতে এখন আসুরিক ভাবের স্রোত প্রবাহিত। জীবকুলের চিত্ত এখন ভেদভাবে বিমুগ্ধ। ত্যাগধর্ম্মে জীব এখন পরাঙ্মুখ; দ্বৈতভাবাপন্ন ভেদবুদ্ধিই এখন ভারতে সংক্রামক ব্যাধি। তোমরা সেইখানে গিয়া সর্ব্বাত্মিকা জগন্মাতার পূজা কর।"

উমাপদ। "সর্ব্বত্রই কি এইরূপ অবস্থা? দান, সেবা, পরহিত কি একেবারে লোপ পাইয়াছে? দেবপূজা, ধর্ম্মানুষ্ঠান কি আর ভারতে কেহ সাধন করে না?"

সন্ন্যাসী। "একেবারে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে ত' অবতারের প্রয়োজন হইত। এখনও সে অবস্থা হয় নাই। তবে আসুরিক ভোগ-ভাবের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। এখন সকলে জীবহিত করিতে গিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতেছে; দেবীর পূজা করিতে গিয়া "আমি"কে প্রতিষ্ঠা করিতেছে। জীব এখনও সাধনায় একেবারে বিরত হয় নাই বটে; কিন্তু অহঙ্কারস্থিত রক্তবীজ সাধনার ফল খাইয়া ফেলিতেছে। যোগাদির ক্রিয়া করিতে গিয়াও "আমির" বৃদ্ধি সাধন করিতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি। এখন তোমরা সংসারে গিয়া মায়ের সর্ব্বায়ুধ-সমন্বিতা মহাবিদ্যার প্রতিষ্ঠা কর। জীবের আবার সেই দিকে মতি হউক। জীবের চিত্তে চৈতন্যের ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষদ, শুদ্ধ স্বপ্রকাশ স্বয়ং জ্যোতিরূপ মহাভাবের বীজ আবার উপ্ত হউক।"

সমীরণ প্রবাহ উপভোগ করিলে, বোধ হয় যে জীবের মোহ ক্ষণকালের জন্যও অন্তর্হিত হয়। কত শত পুণ্যসলিলা নদীকুল এই পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ভারতকে পবিত্র করিতেছে। কুল কুল বাহিনী পতিতোদ্ধারিণী জাহ্নবী, কৃষ্ণ-লীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী স্বরূপা প্রেমপূরিতা যমুনা, কোথাও ক্ষুদ্রাকারে স্খলিত-গতি, কোথাও ফেনীল মূর্ত্তিতে কবির বর্ণনার যাথার্থ্য সম্পাদন করিয়া প্রবাহিতা। এইরূপ স্থানকে লক্ষ্য করিয়াই জ্ঞানী শিহ্লন মিশ্র বলিয়াছেন,—

গঙ্গাতীরে হিমগিরিশিলাবদ্ধপদ্মাসনস্থ
ব্রহ্মজ্ঞানাভ্যসনবিধিনা যোগনিদ্রাং গতস্য।
কিন্তৈর্ভাব্যং মমসুদিবসৈ র্যত্রতে নির্ব্বিশঙ্কঃ।
সাপ্রাপ্যন্তে জরঠহরিণা গাত্রকণ্ডুবিনোদং।

আমরাও কবির সহিত বলি, যে তেমন শুভদিন আমাদের কবে হইবে, যেদিন জাহ্নবী তীরে, হিমগিরির শিলাতলে, বদ্ধ-পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া, ব্রহ্মজ্ঞানের অভ্যাস বিধানে নিযুক্ত থাকিয়া, যোগনিদ্রায় মগ্ন হইব; আর প্রবীণ হরিণগণ আমার তাৎকালিক স্পন্দবিহীন দেহে নির্ভয়ে স্বদেহ ঘর্ষণ করিয়া, গাত্রকণ্ডুয়ণ সুখ অনুভব করিবে।

এইরূপ একটী স্থানে ভৈরবীর পিতা, সেই সন্ন্যাসী, একটী আশ্রম স্থাপনা করিয়াছেন। আশ্রমের নিম্ন দিয়া শ্রীহরির চরণকমলের রজঃস্পর্শে পবিত্রাকৃত অলকানন্দা দিবারাত্রি অবিরামে প্রবাহিত হইতেছে। আশ্রমের ফলমূল-শোভিত স্বভাবজাত বিটপীরাজির শোভা মনোমুগ্ধকর। একটী লতাবিতান-মণ্ডিত নিকুঞ্জকাননও আশ্রমের সন্নিহিত। সন্ন্যাসী সেই আশ্রমে কয়েকটী শিষ্যকে শিক্ষা প্রদান করেন। যে কয়জন ছাত্র তথায় আছেন, তন্মধ্যে উমাপদই প্রধান। সন্ন্যাসীর শিক্ষায় তাহারা জ্ঞানে, বৈরাগ্যে ও ধৈর্য্যে অতুলনীয়। উমাপদ, ধ্যান সমাপনান্তে অলকানন্দার তটে বসিয়া আপন মনে বলিতেছেন,—

অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু ময়ি করুণাং কাতরবন্দ্যে॥
রোগং শোকং পাপং তাপং, হরমে গঙ্গে কুমতি কলাপং॥
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসিগতির্মম খলু সংসারে॥

অনেকক্ষণ অলকানন্দার স্তব পাঠ করিয়া আশ্রমে প্রত্যাগত হইলেন। সন্ন্যাসী উমাপদকে আসিতে দেখিয়া, দেবীদাসকে বলিলেন "উমাপদকে এখানে

ডাক।” উমাপদ তথায় আসিয়া প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—“দেখ উমাপদ, আজ কয়েক বৎসর হইতে তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়া আসিতেছি। সেই শিক্ষার ফল একবার কিছুদিনের জন্য দেখিতে চাই। কতদিন বলিয়াছি এই জগৎ মহামায়ার খেলা। ঈশ্বর চৈতন্যময়ী দেবী মায়ারূপে আপাততঃ পরিদৃশ্যমান সর্ব্বরূপ অনন্ত কোটীব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবানে প্রকাশ করিয়া, পুনরায় তাঁহাতেই লয় করিয়া “সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম” এই ভাবের সংস্থাপনা করেন। কিন্তু তবুও সংসারের উপর একটু দ্বেষভাব বর্ত্তমান আছে বলিয়া, কিছুদিনের জন্য তোমাদিগকে লোকালয়ে পাঠাইতে চাই।”

উমাপদ। “প্রভু! কি ভাবে একথা বলিতেছেন ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।”

সন্ন্যাসী। “তুমি মহামায়ার ভক্ত, সর্ব্বদাই সেই পরাভাবের উপাসনা করিতেছ। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য আজ অন্যরূপ। ভারত এখন তমসাচ্ছন্ন – শিক্ষায় দীক্ষায় ভারতে এখন আসুরিক ভাবের স্রোত প্রবাহিত। জীবকুলের চিত্ত এখন ভেদভাবে বিমুগ্ধ। ত্যাগধর্ম্মে জীব এখন পরাঙ্মুখ; দ্বৈতভাবাপন্ন ভেদবুদ্ধিই এখন ভারতে সংক্রামক ব্যাধি। তোমরা সেইখানে গিয়া সর্ব্বাত্মিকা জগন্মাতার পূজা কর।”

উমাপদ। “সর্ব্বত্রই কি এইরূপ অবস্থা? দান, সেবা, পরহিত কি একেবারে লোপ পাইয়াছে? দেবপূজা, ধর্ম্মানুষ্ঠান কি আব ভারতে কেহ সাধন করে না?”

সন্ন্যাসী। “একেবারে ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হইলে ত’ অবতারের প্রয়োজন হইত। এখনও সে অবস্থা হয় নাই। তবে আসুরিক ভোগ-ভাবের প্রাবল্য দেখা যাইতেছে। এখন সকলে জীবহিত করিতে গিয়া আত্ম-প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিতেছে; দেবীর পূজা করিতে গিয়া “আমি”কে প্রতিষ্ঠা করিতেছে। জীব এখনও সাধনায় একেবারে বিরত হয় নাই বটে; কিন্তু অহঙ্কারস্থিত রক্তবীজ সাধনার ফল খাইয়া ফেলিতেছে। যোগাদির ক্রিয়া করিতে গিয়াও “আমির” বৃদ্ধি সাধন করিতেছে। এই অবস্থা দেখিয়া পূর্ব্ব হইতেই তোমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছি। এখন তোমরা সংসারে গিয়া মায়ের সর্ব্বায়ুধ-সমন্বিতা মহাবিদ্যার প্রতিষ্ঠা কর। জীবের আবার সেই দিকে মতি হউক। জীবের চিত্তে চৈতন্যের ধর্ম্মার্থ, কাম, মোক্ষদ, শুদ্ধ স্বপ্রকাশ স্বয়ং জ্যোতিরূপ মহাভাবের বীজ আবার উপ্ত হউক।”

উমাপদ। "এ কি কঠোর আদেশ, প্রভু! সংসারের সুখভোগের কামনা ত' অণুমাত্র হৃদয়ে নাই। স্বপ্নেও পুনরায় সংসারের মাধুরীর কথা মনে হয় নাই। তবে এই পারিজাত শোভিত ভূ-স্বর্গ পরিত্যাগ করিতে আদেশ করিতেছেন কেন? আপনার সেবায় এ জীবন অতিবাহিত করিব, ইহাই ত' কামনা ছিল। "আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ," এই জ্ঞানে আপনার পূজা করি—সেবা করি। তাহা হইতে বঞ্চিত করিতেছেন কেন প্রভু?

সন্ন্যাসী। ঠিক কথা—"আচার্য্যো ব্রহ্মণো মূর্ত্তিঃ" গুরু বা আচার্য্য ব্রহ্মের মূর্ত্তি। কিন্তু এই দেহ ত' আর গুরু নহে, সে তো যন্ত্র মাত্র; এই যন্ত্রের ভিতরে সেই "কেবলং জ্ঞানমূর্ত্তিং" অবস্থিত; তিনিই এই যন্ত্র সাহায্যে সেই ভগবৎ জ্ঞান উপদেশ করেন। তিনি স্বয়ং কেন্দ্রাতীত হইলেও গুরুরূপ কেন্দ্রে আপনাকে প্রকাশ করেন; সেই দক্ষিণামূর্ত্তিই জগদ্‌গুরু। "আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তং, যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং, শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি"॥ সেই বন্ধন-বিমুক্ত চৈত্ত-গুরু সর্ব্বদাই তোমার নিকটে। তাঁহার সেবার কোন ত্রুটি হইবে না; সেই গুরুর সহিত তোমরা সর্ব্বদাই যোগযুক্ত হইয়া অবস্থান করিবে; সর্ব্বদাই সেই গুরুর উপদেশ পাইবে। তবে আর বিশিষ্ট-কেন্দ্রের মোহ ত্যাগ করিতে অসমর্থ হইবে কেন?"

উমাপদ। "আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। তবে এই নন্দন-কানন পরিত্যাগ করিয়া যাইতে চিত্তের বড় চাঞ্চল্য উপস্থিত হইবে।"

সন্ন্যাসী। "অবশ্য এ চাঞ্চল্য স্বাভাবিক, তবে তোমাদের ন্যায় ভগবৎ-পরায়ণের তাহাতে বিচলিত হইবার কারণ নাই। "নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপো-বনম্"। এতদ্‌ব্যতীত তোমাদের জন্য যেস্থান আমি নির্ব্বাচন করিয়াছি, তাহাও ভূকৈলাস,—উত্তরবাহিনী গঙ্গা দ্বারা শোভিত পবিত্র বারাণসীধাম। ইহাও জীবের পরম শান্তিস্থান;—সদানন্দময় শঙ্করের ক্রীড়াক্ষেত্র। সেই স্থানই তোমাদের কর্ম্মের কেন্দ্রস্বরূপ হইবে।"

উমাপদ। "কিরূপে কার্য্যে অগ্রসর হইব?"

সন্ন্যাসী। "তোমরা লোকালয়ে কিছুদিন অবস্থান করিলেই তোমাদের কর্ত্তব্য বুঝিতে পারিবে। তোমরা দেখিতে পাইবে যে, জীবকুল সংসারকে ধরিয়া আছে; কেবল বাহিরের সাজ লইয়া ব্যস্ত। তাহারা বাসনার তরঙ্গে সর্ব্বদাই হাবুডুবু

থাইতেছে। কিন্তু সেই বাসনা, যাহা হইতে—“যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী”, সেই পরম-পুরুষের দিকে ফিরিতে চায় না। তোমরা সংসারে সংসারী সাজিয়া, সংসারের সকলের মত কর্ম্ম করিয়া, আর সেই সঙ্গে সর্ব্বদা ভগবানে মতি রাখিয়া বুঝাইয়া দেও, যে এই সংসারের ভিতর দিয়া শ্রীভগবানের মঙ্গল-গীত সর্ব্বদাই সুনিনাদিত হইতেছে। তোমরা এই সংসারে ষোড়শোপচারে নিত্যা পরা বিদ্যারূপিণী মাতার পূজার আয়োজন কর। যথাসাধ্য চেষ্টা কর; তিনি আপনিই স্বপ্রকাশ হইবেন। কায়মনোবাক্যে আশীর্ব্বাদ করি, যেন তোমরা সকল কার্য্য করিয়াও সকল দুঃখ বহন করিয়াও, বিশ্ববিমোহিনী মহাবিদ্যার চরণ-কমল হইতে স্খলিত না হও।”

উমাপদ। আপনার আশীর্ব্বাদই আমাদের নিত্য সহচর। জানি না, এই গুরুতর কার্য্যের ভার কেন দিতেছেন? অধিকারী হইবার মোহ চাহি না। এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন আপনার শিক্ষা ব্যর্থ না হয়; যেন অহংকারে ডুবিয়া না যাই। আর এক কথা প্রার্থনা যে, আমরা যন্ত্র-পুত্তলীবৎ কার্য্যে অগ্রসর হইলে, আপনি যেন বুদ্ধি মধ্যে প্রকাশিত হইয়া পথ দেখাইয়া দেন।”

সন্ন্যাসী। “ঠিক কথা। মানুষ অহংকারেই আপনাকে কর্ত্তা মনে করে; বস্তুতঃ হৃদয়-দেশস্থ সেই ভগবান্‌ই যন্ত্রীস্বরূপ এই যন্ত্র পরিচালনা করেন। জীব বস্তুতঃ ভগবানকে ইঙ্গিত করিবার জন্যই বর্ত্তমান; আমি বা জীব বস্তুতঃ বস্তু নহে। এই কথা ভুলিয়া যাওয়াতেই জীবের অহংকার এবং তাহা হইতেই সংসৃতি। “তুমিই বিশ্বের আশ্রয়” এই জ্ঞানে কর্ম্ম করায় অহংকার আসে না। আশীর্ব্বাদ করি, তোমাদের কর্ম্ম, জীবত্বকে সূচনা না করিয়া, সেই সার্ব্বভৌম ভগবৎতত্ত্বের ব্যঞ্জনা করে।”

উমাপদ। “আমাদের একমাত্র সম্বল আপনার আশীর্ব্বাদ। তাহাতে আমরা সকল ভার, সকল ক্লেশ ভগবৎ-আশীর্ব্বাদ বলিয়া মনে করিব। সেই আশীর্ব্বাদে আমাদের হৃদয় ‘পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা’ মহাবিদ্যার দিকে সর্ব্বদা ছুটিবে।”

সন্ন্যাসী। ‘কল্যই তোমরা এখান হইতে হরিদ্বার হইয়া বারাণসীধাম যাইবে। খুব সম্ভবতঃ দশাশ্বমেধ-ঘাটের নিকটেই একটী আশ্রম স্থাপিত হইবে। প্রথমে একটী মন্দিরে আশ্রয় লইবে, পরে মহামায়া আপনি সকল বিষয় নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। তোমাদের আদর্শ—“কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।” পরে আশ্রমে জগদম্বার মূর্ত্তি স্থাপনা করিবে।

উমাপদ। মায়ের কোন্ মূর্ত্তি স্থাপনা কবিব?

সন্ন্যাসী। যাঁহার কৃপায় এই জগৎ প্রকট হইয়াছে, সেই কাল স্বরূপ শক্তির স্থাপন করিও। ইনিই মহাকালী। মহাকালীর কৃপা ভিন্ন জগৎ প্রকট

হয় না। জীবের গ্রন্থির মোহ অতিক্রম করিতে হইলে, এই মহাশক্তির প্রয়োজন। তোমরা পূতমনে মায়ের পূজা করিও ও জীবের সেবা করিও।

উমাপদ। আপনি দেশের যে অবস্থার কথা বলিলেন, সে অবস্থায় যে সহসা লোকে আমাদের সহিত যোগদান করিবে, এরূপ ত' বোধ হয় না, তবে আমরা সর্ব্বদা চেষ্টা করিব।

সন্ন্যাসী। সৎকার্য্য আরম্ভ হইলে ভগবান্ নানাভাবে তাহার উদ্ধার সাধন করেন। সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিও, তোমাদের কার্য্য দ্বারা লোকের মনে কি ভাব উদয় হয়। তোমাদের বাক্য তাহাদের জীবনে কিরূপ কার্য্য করে। জগতের দুঃখ তোমারই দুঃখ, এই বিবেচনায় কার্য্যে অগ্রসর হইলে দেখিতে পাইবে যে, সেই 'সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোক্ষি শিরোমুখং' তোমার সহায়তা করিতেছেন। যেখানে দুঃস্থ অনাথা দেখিবে, কোলে করিয়া লইয়া আসিবে। যেখানে দীন-দুঃখী আতুর দেখিবে, সর্ব্বতোভাবে তাহাদের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করিবে। যেখানে ক্ষেত্র দেখিবে, সেখানে পরাবিদ্যার বীজ বপন করিবে। সর্ব্বভূতে সমভাবে দয়াই, মায়ের পূজা কিন্তু চাই আন্তরিকতা, চাই হৃদয়ের ঐকান্তিকতা, চাই প্রাণের একাগ্রতা। তাহা হইলে লোকের অভাব হইবে না, অর্থের অভাব হইবে না।

এই বলিয়া সন্ন্যাসী গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহারা কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে তথায় অবস্থান করিয়া থাকিতে থাকিতে একজন বলিলেন,—"দাদা! কালই আমাদের এ-স্থান ত্যাগ করিতে হইবে। এমন শান্তিময় স্থান ত্যাগ করিয়া কিরূপে লোকালয়ে যাইব, মনে ভয় হইতেছে।"

উমাপদ। ভয় কি ভাই? সবই ত তাঁর লীলাক্ষেত্র। বিশ্ব তাঁহার বিরাট দেহ। যেখানেই যাই, তাঁহার সহিত বিচ্যুত হইবার সম্ভাবনা নাই। যেখানেই যাই, তাঁহারই করুণাময় হস্ত বিস্তৃত; মনুষ্য হইতে তৃণ পর্য্যন্ত, হিমালয়ের তুষার-মণ্ডিত শৃঙ্গ হইতে মহাসাগরের তরঙ্গোচ্ছ্বাস পর্য্যন্ত প্রত্যেকের ভিতরেই সেই অনন্তের আভাষ। আমরা শম দমাদির অভ্যাস করিতেছি, কিন্তু জীবের সেবা না করিলে ভেদভাব দূরে যাইবে কেন? তা'ই মহত্তর প্রজ্ঞার পিপাসায় সহিত পিতা আমাদিগকে জীবে দয়া প্রকাশের ক্ষেত্রে পাঠাইতেছেন। তাঁহার কতই করুণা। আমরা বেশ বুঝি যে, মানব চিত্তক্ষেত্রে সমতা বা একত্ব আনয়ন জন্য কর্ম্মের প্রয়োজন। কেবল বুঝিলে হইবে না বলিয়াই, পিতা কর্ম্মরাজ্যে প্রেরণ করিলেন। আবার যখন সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে, তখন অন্য কার্য্যের ভার দিবেন। তোমার যে কষ্ট বা ভয় হইতেছে, ইহা একটী সঞ্চিত সংস্কারমাত্র; অহংকারের উপর সেই সংস্কার স্থাপিত। ঐ সংস্কার পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবের চরণপদ্মে মন সংলগ্ন করিয়া তাঁহার শরণাগত হইয়া, এস কার্য্যে অগ্রসর হই। ক্রমশঃ।

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

২য় ভাগ। আসাঢ়, ১৩২০। ৩য় সংখ্যা

মোক্ষ]

মদন-মোহন।

সজল জলদকান্তির্জ্জীবনানন্দশান্তি-
র্ব্বিরচিতনববেশো গোপসীমন্তিনীভিঃ।
বনকুসুমবিলাসী কৌমুদীকুন্দহাসী,
ত্বমসি মম মুরারে! মোহনং মোহনানাম্॥

জিনি নব-জলধর, কান্তি অতি মনোহর,
তুমি দেব! শান্তি নিকেতন।
গোপবধূগণ তব, কোমলাঙ্গে অভিনব,
সাজায়েছে কিবা আভরণ॥
নব নব বনফুলে, খেলা কর কুতূহলে,
মধুর অধরে কিবা হাসি।
আহা কিবা মনোরম, মোহন মোহনতম;
আমি ঐ কাল রূপ ভালবাসি।

করধৃতকলবেণুঃ কুণ্ডলাশোভিগণ্ডঃ,
সুরুচিরকরপদ্মে পদ্মমেকং দধানঃ।
সহচরকৃতকেলির্মালতীপুষ্পমালী,
ত্বমসি মম মুরারে! মোহনং মোহনানাম্॥

কুণ্ডল শোভিত গণ্ডে, মনোহর ভুজ-দণ্ডে,
বিনোদিয়া বাঁশরী বিরাজে।
মনোহর শতদল, আহা কিবা নিরমল,
অন্য কর-কিশলয়ে সাজে॥
সহচরগণ সঙ্গে, খেলা কর নানা রঙ্গে,
গলে দোলে মালতীর মালা।
তুমি মোর মনোরম, মোহন মোহনতম,
তুমি মম হৃদয়ের আলা॥

মলয় পবনলোলং কুন্তলং স্কন্ধদেশে,
পদসরসিজযুগ্মে রত্নমঞ্জীর-রাজিম্।
দধদভিনবকণ্ঠে মৌক্তিকং হারমেকং,
ত্বমসি মম মুরারে! মোহনং মোহনানাম্॥

অভিরাম স্কন্ধদেশ, তাহে সুচিকণ কেশ,
মৃদুমন্দ পবনেতে দোলে।
পদযুগ সরসিজে সোনার নূপুর বাজে,
রুনু ঝুনু রুনু ঝুনু বোলে॥
তুমি দেব নিরঞ্জন, কণ্ঠে অতি সুশোভন,
ধরিয়াছ মুকুতার হার।
তুমি মোর মনোরম, মোহন মোহনতম,
লয়ে মরি বালাই তোমার॥

শতদলদলনেত্রং মোহনং গোপিকানাং,
বিজিতমদনচাপং ভ্রূযুগং তে মুকুন্দ!
অভিলষতিমিদং মে হে হরে! হে মুরারে!
ভবতু হৃদমুরক্তং নাম-পীযূষপানে॥

রাজীব-নয়ন তব,　　　　হেরে গোপবধূ সব,
আপনারে আপনি পাসরে ।
হেরে ভুরু মনোহর,　　　　লাজ পেয়ে পঞ্চশর,
নিজ চাপ ফেলে দেয় দূরে ॥
আমার মনের সাধ,　　　　শুন ওহে গোপীনাথ,
নিবেদন করি তব পায় ।
তব নামামৃত-পানে,　　　　মত্ত হ'য়ে অনুক্ষণে,
দিন মোর কেটে যেন যায় ॥

শ্রীতারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য

মোক্ষ]　　মহামায়া ।

জগৎ জননি,　　　　জগৎ তারিণি,
তুমি মহামায়া কলুষ-হরা,
তব মায়াবলে　　　　সৃষ্টি স্থিতি লয় ;
আদ্যাশক্তি তুমি পরাৎপরা ।
অবিদ্যারূপিণি !　　　　তব মায়াবলে,
পুরুষ প্রকৃতি কারণ যার,—
সেই মহত্তত্ত্ব　　　　'আমিত্ব' প্রকাশে
অহঙ্কার আদি নানা বিকার ।
সত্ত্ব রজ তম　　　　হিংসা প্রলোভন
কাম ক্রোধ আদি রিপুনিচয় ;
তোমার মায়ায়,　　　　এ বিশ্ব প্রকাশ ;
তব মায়াজাল এ বিশ্বময় ।
তুমি মায়াবিনী.　　　　বাজীকর-সুতা !
মায়া-সূতে জীবে বাঁধিয়া গলে,—
নাচাও সতত,　　　　সাজাও কখন
নানাবিধ সাজে মায়ার বলে ।

'তুমি আমি' জ্ঞান,　　　　দ্বেষা-দ্বেষী ভাব
এ বিশ্ব ব্যাপিয়া মায়ার খেলা ;
পুত্রাদি সম্বন্ধ　　　　মায়ার বিকার
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মায়ার মেলা ।
মায়াময়ি মা গো !　　　　কত উপাদানে,
পূর্ণ সদা তব মায়ার ঝুলি ;
কুহকে তোমার,　　　　অসতেরে সৎ,
ভাবে সদা জীব আপনা ভুলি ।
লীলার কারণে　　　　মঙ্গল-বিধানে,
ভ্রম নিরন্তর এ বিশ্বমাঝে ;
ধর নানারূপ　　　　বিবিধ বরণ
সাজ মা কল্যাণি ! বিবিধ সাজে ।
কভু ষষ্ঠীরূপে　　　　ভ্রম দ্বারে দ্বারে
রাখিতে শিশুর কোমল প্রাণ,—
কভু বা অন্নদে !　　　　অন্নপূর্ণারূপে,
জীবকুলে অন্ন করিছ দান ।

অসি করে যুঝি নাশি দৈত্যকুল
দেবগণে তুমি করিলা ত্রাণ,
ছিন্নমস্তারূপে নিজমুণ্ড করে
কাঁপাইলে ভীত ভোলার প্রাণ।
মহিষ মর্দ্দিনি! ভগবতী হ'য়ে,
নাশি অবহেলে মহিষাসুরে;
দশ করে ধরি অস্ত্র-শস্ত্র-চয়
তুমি মা অভয় দিয়াছ সুরে।
অকালে বোধন করি রঘুবর,
পূজিলা তোমায় নীলোৎপলে;
সবংশে নাশিয়া রক্ষ-কুল-রাজে
উদ্ধারিলা সীতা পূজার ফলে।
শরতে পূজিলা, তদবধি তাই,
হিন্দুসন্তানের লইতে পূজা।
দিনত্রয় তরে কর আগমন
দয়া করি তুমি মা দশভূজা॥
তা'ই দেখি মা গো! তব আগমনে,
শত্রু মিত্র মিলি একই ঠাঁই;
সকলেরি যেন এক মনপ্রাণ
হিংসা দ্বেষ আর কুভাব নাই।
এই ভাব যদি থাকে মা নিয়ত,
স্বরগ সমান হয় এ ভূমি;
তব লীলা খেলা কে বুঝিবে মা গো;
এ ভব-খেলার কারণ তুমি।

শুভদে বরদে! দাও মা এ বর,
হিংসা দ্বেষ আর না পারে ছুঁতে;
দয়া করি মা গো ছেদি মায়া-সূত
ত্রাণ কর দুর্গে এ দীন সুতে।
কর্ম্মে কর্ম্ম নাশ শাস্ত্রের বচন,
তোমার কৃপায় জেনেছি সার,—
বিশ্ব ভগবানে বিশ্বে ভগবান্;
সুকর্ম্ম,—যাহাতে সন্তোষ তাঁর।
সবে সম জ্ঞান, "কর্ত্তা" অভিমান
ত্যজি, যেই কর্ম্ম সুকর্ম্ম তাই;
জীবে দয়া, ভক্তি তুল্য বিভু-সেবা
পর কি আপন প্রভেদ নাই।
নিষ্কাম ভাবেতে জীব-সেবারত,
বিশ্ব-প্রেমে প্রাণ ঢেলেছে যেই;
আমিত্ব ভুলিয়া ছেদি মায়াপাশ,
বিভুর সদনে চলে'ছে সেই।
নাহি হিংসা দ্বেষ ভেদাভেদ জ্ঞান,
জন্মমৃত্যুহীন সে সুখ স্থান;
আনন্দ-পাথার নিত্যানন্দ ধাম,
বিভুসেবা-রত সতত প্রাণ।
দয়াময়ি মা গো! করুণা বিতরি,
এ দীন কুমারে দেহ এ মতি;
সাধুসঙ্গ লয়ে সানন্দ অন্তর
সেবাকার্য্যে থাকে সতত রতি।

শ্রীপ্রসন্নকুমার দাস।

কুঞ্জ-ভঙ্গ।

আজ কত যুগের যোগে, কত জন্মের সাধনায়, ভক্তের সাধন-কুঞ্জে, শরীরিণী ভক্তি-রূপিণী রাধিকার মানস-কুঞ্জে আরাধিতের শুভাগমন ঘটিয়াছে। সংসার ভুলিয়া, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া, রসিক-শেখরের রস শরীর প্রেমার্দ্র বক্ষে ধারণ করিয়া, পুলকাঞ্চিত ভুজ-পাশে বাঁধিয়া, কিশোরীর রস-দ্রব হৃদয় আজ সমাধি-মগ্ন; সুষুপ্তির অগাধ সলিলে নিমজ্জিত। প্রাণ-বন্ধুর দেহাতীত প্রেমময় স্পর্শে দেহের চেতনা বিলুপ্ত; সুখাতিশয্যে সুখানুভূতি বিবশা; ভাব-তরঙ্গ ধ্যান-সিন্ধুর অতল দেশে সুপ্ত; নাথসঙ্গম-জনিত আনন্দের অমৃত-ধারা সর্ব্বত্র প্রবাহিত। নিদ্রার পালঙ্কে, আলিঙ্গনাবদ্ধ যুগল মূর্ত্তি, একাঙ্গীকৃত,—যেন 'বহু' ভাবময়ী দ্বৈত-বুদ্ধি অদ্বৈতানুভূতির একত্বে অধিষ্ঠিত!

মীটল চন্দন, টুটল আভরণ, ছুটল কুন্তল-বন্ধ।
অম্বর খলিত, গলিত কুসুমাবলী, ধূসর দুঁহুমুখ-চন্দ॥
হরি! হরি! অব দুঁহু শ্যামর গোরী!

দুঁহুক পরশে	রভসে দুঁহু মুরুছিত,	শুতল হিয়ে হিয়ে জোরি॥
রাইক বাম	জঘন পর নাগর	ডাহিন চরণ পঁহু আপি।
নওল কিশোরী	আগোরি কোলে পঁহু	ঘুমল মুখে মুখ ঝাপি॥
কি এ মদন-শর	ভীত হি সুন্দরী	পৈঠল পিয়-হিয় মাহ।
কব বলরাম	নয়ান ভরি হেরব,	করব অমিয় সিনান॥

যিনি মদন-মোহন,—যাঁহার চিন্ময় স্পর্শে ভোগেন্দ্রিয়গণের রূপাদি-বিষয়জ মত্ততা নির্ব্বাপিত হয়, যাঁহার অকৈতব প্রেমের আস্বাদনে সংসারের মোহ ভাঙ্গিয়া যায়, দেহের সম্ভোগ বাসনা আপনা আপনি পরিতৃপ্তির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়,—সেই অপ্রাকৃত, মদনের জনয়িতা শ্যামসুন্দরের অমৃতময় বক্ষে যিনি একবার প্রবেশ করিয়াছেন—সংসারের কামনা-কণ্টক, মদন-শর আর তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারে না। তাই বুঝি আজ ব্রজ-সুন্দরী ব্যাধ-শর-ভীতা কুরঙ্গিনীবৎ জগদাশ্রয় কৃষ্ণচন্দ্রের নিবিড় মর্ম্ম-গহনে মুক্তির আশয়ে প্রবিষ্ট হইলেন; এবং তথায় আশ্রয় লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে নিঃশঙ্ক অন্তরে নিদ্রামগ্ন হইলেন!

দেখিতে দেখিতে মিলন-রজনীর শুভ্র জ্যোৎস্না ম্লান হইয়া আসিল, কুঞ্জ-ভঙ্গের সময় হইল, সমাধি-ভঙ্গের উপক্রম ঘটিল। কৃষ্ণ-গত-প্রাণা প্রেমময়ী রাধিকা বুদ্ধি-দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধ্যান-কক্ষে কৃষ্ণ-বক্ষে নিদ্রিত ছিলেন ; প্রেমের রত্ন-প্রদীপ জ্বলিয়া জ্বলিয়া কখন্ নিভিয়া গিয়াছিল ; সোহাগের সুগন্ধী ধূপ কক্ষময় আপনার গন্ধ-সম্ভার ছড়াইয়া দিয়া ধীরে ধীরে নিঃশেষ ভাবে পুড়িয়া গিয়াছিল ; শান্তির বিমল চন্দ্রালোকে সুষুপ্তির গাঢ় স্তব্ধতা, মহাভাবের সান্দ্র নীরবতা সর্ব্বত্র ফুটিয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় কোথা হইতে সংসারের ভগ্নদূত লোক-লজ্জারূপী কোকিল গাহিয়া উঠিল, শীলসঙ্কোচরূপী শুকসারী ঝঙ্কার দিয়া উঠিলঃ—

"রাই, জাগো—রাই, জাগো" সারী-শুক বোলে।
"কত নিদ্রা যাও কালো মাণিকের কোলে॥"

ধ্যান-ভঙ্গে অর্দ্ধ-বাহ্যদশায় রাই-কমলিনী স্বপ্নাতুর নেত্র-পল্লব একবার ঈষৎ উন্মীলন করিলেন ; কিন্তু পার্শ্বে—

নাগর হেরি,' পুন হি দিঠি মূদল, পুলক-মুকুল ভরু অঙ্গে।

এমনি ঘটিয়া থাকে। বাহ্য চেতনা ধীরে ধীরে দেহের কূলে আসিয়া আঘাত করিতে থাকে ; কিন্তু সেই অর্দ্ধ জাগরণের মৃদু আঘাতে যোগারূঢ় চিত্ত, ক্ষুদ্র লোষ্ট্রনিক্ষেপে ঈষদান্দোলিত সরোবরবৎ কিঞ্চিন্মাত্র বিলোড়িত হইয়া, পুনর্ব্বার ধ্যান-সাম্য প্রাপ্ত হয়। তখন সংসারের কোলাহল, দরদী সঙ্গিগণের সশঙ্ক আহ্বান, শ্রুতির ভিতর দিয়া চিত্তের বাহ্য স্তরে তরঙ্গিয়া উঠে ; কিন্তু নিগূঢ় মর্ম্মমধ্যে তাহার কঠোরতা প্রবেশ করিতে পারে না। দেখিতে দেখিতে নবোত্থিত ধ্যান প্লাবনে, নিঃস্বপ্নতার খরস্রোতে, নেত্র-পুট পুনরায় ঢুলিয়া পড়ে ; প্রাণ-বঁধুয়ার শীতল স্পর্শে শারীর-চেতনা তন্ময়তার অগাধ সলিলে আবার ডুবিয়া যায় !

জীবন সঙ্গিনী সখীগণ কলঙ্ক-শঙ্কায় কাতরকণ্ঠে শ্রীমতীর উদ্দেশে বলিতেছেন :—

"কি জানি সজনি ! রজনী ভোর, ঘূ ঘূ ঘন ঘোষত ঘোর,
গত যামিনী, জিত-দামিনী কামিনীকুল লাজে।
ফুকরত হতশোক কোক, জাগহুঁ অব সব লোক,
শুক-শারীর কল-কাকলি নিধুবন ভরি আজে॥"

কিন্তু সে ধ্বনি কিশোরীর গূঢ় মর্ম্ম-কন্দরে প্রতিধ্বনি তুলিতে পারিতেছে না।

সেই অরুণোদ্ভাসিত মিলন-কুঞ্জে—

তড়িত-জড়িত জলদ ভাঁতি, দোহে সুখে শুতি রহল মাতি,
জিনি ভাদর রস-বাদর শেযে।
বরজ-কুলজ-জলজ-নয়নী ঘুমল বিমল-কমল-বরণী,
কৃত-লালিস ভুজ-বালিস আলিস নাহি তেজে॥

বুঝি, সখীদিগের সেই জাগরণ-চেষ্টা বিফল হইল। অথবা সহচরী-বৃন্দের মৃদু ভর্ৎসনায় যদি বা শ্রীমতী জাগরিত হইলেন, তথাপি সেই ধ্যান ভঙ্গ জনিত জাগরণ প্রেমালিঙ্গিত ভুজ-বন্ধন শিথিল করিতে পারিল না, সঙ্গম সুখ-নিমীলিত নয়ন উন্মীলিত করিতে পারিল না; সমাধি-কালীন অজস্রধারে ক্ষরিত আনন্দ-স্রোত মন্দীভূত করিতে পারিল না; চিত্তের তন্ময়তা খণ্ডিত করিতে পারিল না!

শুনইতে জাগি' রহল দুঁহু ভোর। নয়ান না মেলই, তনু তনু জোর॥

আহা! ধ্যান-যোগে সংসার-বন্ধন-বিমুক্ত প্রেম-পূর্ণ হৃদয় যদি প্রাণবল্লভের প্রীতি-বন্ধনে বাঁধা পড়িল, তবে কে এমন হতভাগিনী আছে যে, সেই চির-বাঞ্ছিত বন্ধন-পীড়ার সুখময়ী বেদনা ভুলিয়া পুনরায় সংসারের তুচ্ছ সুখ স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া লইবে? ধ্যান-স্তিমিতলোচনে যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, এমন কে মন্দভাগিনী আছে যে, চক্ষু খুলিয়া সেই অপূর্ব্ব স্বপ্ন ধরণীর কঠিন স্পর্শে নিষ্ফল করিয়া দিবে? তাই জাগরণে নিদ্রা-ভান করিয়া শ্রীমতী নাথ-স্পর্শের নিবিড়তায় নিমগ্ন রহিলেন।

সখীগণ তৈখণে করে অনুমান, কপট কোটী কত করত ভিয়ান॥

হায়! কতক্ষণ আর কিশোরী কপট-নিদ্রার অন্তরালে আত্ম-গোপন করিয়া রহিবেন? সখীগণের শাসন-বাক্যে, কপট কোপে উপেক্ষা সম্ভব; কিন্তু তাহাদিগের কাতর বাণী,—প্রাণসখীর কলঙ্ক-শঙ্কায় তাহাদিগের ব্যাকুলতা শ্রীমতীকে চঞ্চল করিল। রুদ্ধ রোদনের প্রবলতা অন্তরে চাপিয়া, আসন্ন বিপুল উৎকণ্ঠা চিত্তমধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া, প্রাণনাথের আকাঙ্ক্ষিত বাহু-বন্ধন

শিথিল করিয়া, শিশিরসিক্ত ব্রজ কমলিনী সখী-কর-অবলম্বনে ধীরপদে গৃহপানে গমন করিতে লাগিলেন—যেন বৃন্তচ্যুত পুষ্প সুমন্দ মলয় সমীরণে বাহিত হইয়া অনির্দ্দিষ্ট পথে ভাসিয়া চলিল !

প্রেমিকযুগলের সেই নিশান্ত বিদায়ের বিচিত্র চিত্র, বৈষ্ণব কবির অমর তুলিকার অক্ষয় রেখায় অঙ্কিত রহিয়াছে।—

নিজ নিজ মন্দিরে যাইতে, পুন পুন,
দোঁহে দোঁহে বদন নেহারি।
অন্তরে উরল প্রেম-পয়োনিধি,
নয়ানে গলয়ে ঘন বারি ॥
কাতর নয়ানে হেরইতে দোঁহে দোহা
উথলল প্রেম-তরঙ্গ।
মুরুছল রাই, মুরছি পড়ি মাধব,
কব হব তাকর সঙ্গ ॥
ললিতা "সুমুখি ! সুমুখি !" করি ফুকরত,
রাইক কোরে আগোর।
সহচরী "কানু ! কানু !" করি ফুকরত,
চরকত লোচন-লোর ॥

তখন, যে লোক-নয়ন-রূপী নিষ্ঠুর দিবাকরের রোষারুণ উপহাস-দৃষ্টির ভয়ে সখীগণ শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই প্রভাত-সূর্য্যের আলোক-দীপ্ত কুঞ্জ-পথে দাড়াইয়া, লোক-লজ্জা ভুলিয়া—নিন্দা গঞ্জনা তুচ্ছ করিয়া, সহচরীবৃন্দ রাধার চৈতন্য-সম্পাদনে নিযুক্ত হইলেন !

কতি গেও অরুণ কিরণ-ভয় দারুণ,
কতি গেও লোকক ভীত।
মাধব ঘোষ এতহুঁ নাহি সমুঝল
উদভট মুগধ চরিত ॥

অন্যত্র :—

পদ আধ চলত, খেলত পুন বেরি। পুন ফিরি চুম্বই দুঁহু মুখ হেরি ॥
দুঁহু জন-নয়ানে গলয়ে জলধার। রোই রোই সখীগণ চলই ন পার ॥

প্রেমরাজ্যে ক্ষণিকের অদর্শন, যুগ বিরহবৎ অনুভূত হয় সত্য। কিন্তু এই আকুলতা ভগবানের ক্ষণিক অদর্শনে ভক্তের হৃদয়ে কতদূর তীব্র হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্ত আমাদের গৌরচন্দ্র। মনে পড়ে—একদা শ্রীগৌরাঙ্গ, জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহ সমীপে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া, শ্রীমতীর ভাবে বিভোর হইয়া, চির সুন্দরের অমৃত-স্যন্দী বদন-মণ্ডল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে মহাভাবের প্রবল বন্যায় বাহ্য-বোধ বিলুপ্ত হইল; সন্ন্যাসীর তপঃক্লিষ্ট সুগৌর দীর্ঘ দেহ বাত্যাহত-কদলী-তরুবৎ পাষাণ ভূমিতে লুটাইতে লাগিল। সঙ্গিগণের অবিশ্রান্ত কৃষ্ণধ্বনিতে যখন বাহ্যদশা ফিরিতে লাগিল, তখন সকলে মিলিয়া তাঁহাকে বিগ্রহ সন্নিধান হইতে দূরে আশ্রমের দিকে লইয়া চলিল। যন্ত্র চালিতের ন্যায় নত-নেত্রে কয়েক পদ মাত্র গমন করিয়াছেন,—সহসা দীর্ঘায়ত-নেত্র তুলিয়া প্রেমোন্মাদী সন্ন্যাসী বিগ্রহ-বদন পুনর্ব্বার অবলোকন করিলেন;—আর চরণ চলিল না—নেত্র-পলক পড়িল না—বাণী ফুটিল না; দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া ভাব-সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে দুলিতে লাগিলেন; পুলক কদম্ব-মুখে রক্তরেণু জমিতে লাগিল, সম্ভ্রম সঙ্কোচ, লোক-লজ্জা লুকাইল, অঙ্গাবরণ ভূমিতে লুটিতে লগিল! যে চিত্ত ভগবানের, চিণ্ময় মূর্ত্তিতে তন্ময় ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা তন্ময়তার সীমা ছাড়াইয়া, না জানি অনুভবাতীত কোন্ শূন্যে উড্ডীন হইল, কে তাহার সন্ধান করিবে? এই অপূর্ব্ব ভাবের প্রতিচ্ছায়া, সেই মৃণ্ময় মূর্ত্তির ভাবাভাব-বিবর্জ্জিত চিন্ময় বদন-মণ্ডলে কোনও রেখাপাত করিয়াছিল কিনা কে বলিতে পারে?

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

মোক্ষ]

বীণা

প্রভু! বাজাও তোমার বীণা
মন প্রাণ মোর ভরিয়া,
সকল তার ছিঁড়ে যাক্ আজি
তোমার চরণে কাঁদিয়া॥

মম প্রাণ ভরে উথলি উঠুক্
তোমার প্রেম-অমিয়া,
নয়নেতে চাপা আছে যে অশ্রু
তা' পড়ুক অঝরে ঝরিয়া॥

হৃদি প্রস্তর কাটিয়া বহুক্
অমৃত তব বরণা,
চৌদিক হ'তে ছুটিয়া আসুক
দুঃখরূপে তব করুণা!
মোহ-কুহেলিকা সরে যাক্, সখা!
হেরি তব ঐ মহিমা,

হৃদয় আকাশে উঠুক্ উজলি,
তোমার কণক প্রতিমা॥
(তব) চরণ পরশে হৃদি শতদল
উঠিবে উঠিবে ফুটিয়া,
তা'ই চরণ ধুলায় লুটাতে এসেছি,
দেখ সখা দেখ চাহিয়া।

ধর্ম্ম]

ব্রহ্মবিদ্যা-রহস্য।

(গতবৎসরের পূজার সংখ্যার পর)

(২)

পূর্ব্ববারে শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতি। ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক আচার্য্যত্ব সুস্পষ্টরূপে নিরূপিত হইলেও, তাহা আরও সুদৃঢ় করিবার নিমিত্ত পুনরায় সংশয় উত্থাপন পূর্ব্বক নিরাশ করা যাইতেছে। উপনিষদাদিতে ব্রাহ্মণ হইতে ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তি এবং ক্ষত্রিয় হইতেও ব্রহ্মবিদ্যা প্রাপ্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়। এই উভয় প্রকার বাক্যের মধ্যে কোন্‌টী প্রমাণ-সিদ্ধ, তাহাই নিরূপণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যথা তত্ত্বজিজ্ঞাসু সন্দেহ-দোলায় আরোহণ করিয়া বস্তু নির্ণয় করিতে সমর্থ হন না; অতএব সংশয় অনুমোদন করা সর্ব্বাগ্রে বিধেয়। 'স্বাধ্যায়োঽধেতব্যঃ" অর্থাৎ 'বেদ অধ্যয়ন করিবে' এই বিধিবাক্য দ্বারা সমস্ত বেদ প্রমাণভূত ও সার্থক বলিয়া জানা যায়; এরূপ অবস্থায় সেই বেদবাক্যের একটী পদকেও অপ্রমাণ বা নিরর্থক বলা যাইতে পারে না। সুতরাং কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের আচার্য্যত্ব প্রতিপাদক বাক্যের যথার্থতা প্রতিপাদন করিতে গেলে, ক্ষত্রিয়ের আচার্য্যত্ব মূলক বাক্য সমূহ ব্যর্থ হয়; এবং কেবল ক্ষত্রিয়ের আচার্য্যত্ব সূচক বাক্যের সার্থকতা প্রতিপন্ন হইলে, ব্রাহ্মণের আচার্য্যত্ব প্রতিপাদক বাক্যগুলি নিরর্থক হয়। এরূপ ঘোর সমস্যায় পড়িয়া কিরূপে উভয়বিধ বাক্যের মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, তাহাই বিচার্য্য। বেদের কোন এক অংশের অপ্রামাণ্য ঘটিলে, অপর অংশের প্রামাণ্যে

সংশয় জন্মে ; এইরূপে সমস্ত বেদই অপ্রমাণতা পিশাচীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পান না। অতএব সর্ব্বদিক্ রক্ষা করিয়া শাস্ত্রের যথার্থ মীমাংসা করা শাস্ত্রদর্শিগণের একান্ত কর্ত্তব্য।

উপনিষৎ পাঠে অবগত হওয়া যায়—জানশ্রুতি, জনক প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, গার্গ্য, প্রাচীনশাল প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণও ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এবংবিধ উভয় জাতির উপদেষ্টৃত্ব বোধক বাক্য থাকায়, সংশয় হয় যে, ক্ষত্রিয় জাতিই ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য, অথবা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উভয় জাতি, কিংবা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণই আচার্য্য। এই পক্ষত্রয়ের মধ্যে, প্রথম পক্ষ অর্থাৎ ক্ষত্রিয় জাতিই আচার্য্য—গ্রহণ করা যাইতে পারে না ; যেহেতু ব্রাহ্মণের আচার্য্যত্ব প্রতিপাদক শ্রুতি-বচনগুলি জলে ভাসিয়া যায়। যদি তাদৃশ শ্রুতি সমূহের প্রামাণ্যরক্ষার জন্য ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় জাতির আচার্য্যত্ব স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে এক্ষণে বিচার করা যাউক যে, উভয়ের আচার্য্যত্ব শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র ও সদাচার সম্মত এবং যুক্তিসহ কি না?

"তমুপনয়ীত তমধ্যাপয়ীত" * এই শ্রুতি এবং

"উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্দ্বিজঃ। †
সকল্পং সরহস্যঞ্চ তমাচার্য্যং প্রচক্ষতে॥"

এই মনুস্মৃতি দ্বারা জানা যাইতেছে যে, উপনয়ন ও অধ্যাপনের কর্ত্তা একই ব্যক্তি। যিনি শিষ্যকে উপনয়ন দিবেন, তিনিই বেদ অধ্যাপন করাইবেন। এখন দেখা যাউক, শাস্ত্রে কোথায়ও ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন-কর্ত্তৃত্ব আছে কি না? যদ্যপি পূর্ব্বোক্ত মনু-বচনে "দ্বিজ" পদ থাকায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে পাওয়া যায়, তথাপি পৌর্ব্বাপর্য্য পর্য্যালোচনা করিলে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণকেই বুঝায়। অন্যথা বৈশ্যেরও উপনয়ন-কর্ত্তৃত্ব আসিয়া পড়ে। বৈশ্য উপনয়নের কর্ত্তা হইলে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও অধ্যয়ন কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন। তাহা হইলে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় জাতির আচার্য্যত্ব নিয়ম ভঙ্গ হইল। শাস্ত্রে কুত্রাপি বৈশ্যকে উপনয়ন কিংবা;

---

* তাহাকে উপনয়ন দিয়া বেদ পড়াইবে।

† যে দ্বিজ (ব্রাহ্মণ) শিষ্যের উপনয়ন দিয়া কল্প ও রহস্যের (বেদান্তের) সহিত বেদশিক্ষা প্রদান করেন, তাঁহাকে আচার্য্য বলা যায়।

অধ্যাপনের কর্ত্তা বলিয়া শুনা যায় না। সুতরাং "দ্বিজ" পদকে সঙ্কোচ করিতে হইলে, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণে রাখাই যুক্তি সঙ্গত। কেবল যুক্তি বলে নহে, সমগ্র-শাস্ত্র পর্য্যালোচনা করিলে জানিতে পারা যায় যে, মনু-প্রোক্ত আচার্য্য লক্ষণে "দ্বিজ" শব্দে "ব্রাহ্মণ" এই অর্থ ব্যতীত অর্থান্তর করা যাইতেই পারে না। ভগবান্ মনু প্রথমাধ্যায়ে বলিয়াছেন —

অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ ॥ ৮৮ ॥
প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ॥ ৮৯ ॥
পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেব চ ॥ ৯০ ॥
একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া ॥ ৯১ ॥

অর্থাৎ, স্বয়ম্ভু ব্রাহ্মণদিগের অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম নির্দ্দেশ করিলেন। ক্ষত্রিয়দিগের প্রজা পালন, দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞ ও স্রক্-চন্দন-বনিতাদির অনবরত অসেবন সংক্ষেপে নিরূপণ করিলেন। বৈশ্যদিগের পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য এবং কৃষিকার্য্য বৃদ্ধির জন্য ধন-প্রয়োগ কল্পনা করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা শূদ্রগণের পক্ষে অসূয়াবিহীন হইয়া ত্রৈবর্ণিকের শুশ্রূষার ভার অর্পণ করিবেন।

ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে যে, ক্ষত্রিয়ের অধ্যাপনে অধিকার নাই। অধ্যাপনে অধিকার না থাকায়, উপনয়ন দিবারও অধিকার নাই; যেহেতু 'উপনীয়' এই 'ক্ত্বা' প্রত্যয় দ্বারা উপনয়ন ও অধ্যাপনের কর্ত্তা একই বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। সুতরাং মনুবচন দ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, এখানে দ্বিজ শব্দ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে বাধিত: কেবল মাত্র ব্রাহ্মণেই প্রযুক্ত হইবে। টীকাকার কূল্লূকভট্টও 'যো ব্রাহ্মণঃ শিষ্যমুপনীয় কল্পরহস্যসহিতাং বেদশাখাং সর্ব্বামধ্যাপয়তি মাচার্য্যং পূর্ব্বে মুনয়ো বদন্তি' * এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণে সগরের প্রতি ঔর্ব্বের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপদেশেও ব্রাহ্মণবর্ণেরই

* এখানে কল্প ও রহস্য দ্বারা সমস্ত বেদের উপলক্ষণ বুঝিতে হইবে।

উপনয়ন ও অধ্যাপন কর্তৃত্ব অবগত হওয়া যায়। তথায় এবংবিধ বাক্য পরিদৃষ্ট হয়—

সগর উবাচ। তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি বর্ণধর্ম্মানশেষতঃ।
তথৈবাশ্রমধর্ম্মাংশ্চ দ্বিজবর্য্য ব্রবীহি তান্॥

সগর বলিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি আপনার নিকট বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি তৎসমুদায় বিবৃত করুন।

ঔর্ব্ব উবাচ। ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রানাঞ্চ যথাক্রমম্।
তদেকাগ্রমনা ভূত্বা শৃণু ধর্ম্মান্ ময়োদিতান্॥
দানং দত্যাদ্ যজেদ্ দেবান্ যজ্ঞৈঃ স্বাধ্যায় তৎপরঃ।
নিত্যোদকী ভবেদ্বিপ্রঃ কুর্য্যাচ্চাগ্নি পরিগ্রহম্॥
বৃত্ত্যর্থং যাজয়েচ্চন্যান্ অন্যানধ্যাপয়েত্তথা।
কুর্য্যাৎ প্রতিগ্রহাদানং গুর্ব্বর্থং ন্যায়তো দ্বিজঃ॥
সর্ব্বভূতহিতং কুর্য্যান্নাহিতং কস্যচিদ্দ্বিজঃ।
মৈত্রী সমস্ত ভূতেষু ব্রাহ্মণস্যোত্তমং ধনম্॥
গ্রাবে রত্নে চ পারক্যে সমবুদ্ধিভবেদ্দ্বিজঃ।
ঋতাবভিগমনঃ পত্ন্যাং শস্যতে চাস্য পার্থিব॥

ঔর্ব্ব কহিলেন,—আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের ধর্ম্ম যথাক্রমে বলিতেছি, তুমি একাগ্রমনা হইয়া মৎ কথিত ধর্ম্ম শ্রবণ কর। ব্রাহ্মণ, দান করিবেন, যজ্ঞদ্বারা দেবগণের পূজা করিবেন, বেদপাঠে নিরত হইবেন, নিত্য স্নান তর্পনাদি কর্ম্মে তৎপর হইবেন এবং অগ্নি রক্ষা করিবেন। ব্রাহ্মণ জীবিকার নিমিত্ত অন্য ব্রাহ্মণাদির যাজন ও অধ্যাপন করিবেন এবং গুরু দক্ষিণার জন্য বিধি পূর্ব্বক. প্রতিগ্রহ করিবেন। ব্রাহ্মণ সর্ব্ব প্রাণীর হিতসাধন করিবেন; কখন কাহারও অহিত আচরণ করিবেন না। সর্ব্ব প্রাণীর প্রতি মৈত্রীই ব্রাহ্মণের উৎকৃষ্ট ধন। ব্রাহ্মণ পরকীয় রত্নকেও প্রস্তরতুল্য বিবেচনা করিবেন, অর্থাৎ কদাচ লোভ পরবশ হইবেন না। হে রাজন্! ঋতুকালে পত্নীগমন করাও ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

উল্লিখিত বিষ্ণু পুরাণের বাক্য দ্বারাও যাজন এবং অধ্যাপন একমাত্র ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম বলিয়া জানিতে পারা যায়। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম প্রসঙ্গে প্রথমে

'বিপ্র'পদ প্রয়োগের পর তিনটী স্থলে 'দ্বিজ'পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে 'দ্বিজ' শব্দে ব্রাহ্মণকেই বুঝিতে হইবে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অর্থ গ্রহণ করা যাইতেই পারে না। যেহেতু পরবর্ত্তী বাক্য সমূহের ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদির ধর্ম্ম উপদিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং মনুপ্রোক্ত আচার্য্য লক্ষণে 'দ্বিজ' শব্দ যে ব্রাহ্মণ বাচক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 'দ্বিজ' শব্দ যে কেবল মাত্র ব্রাহ্মণে প্রযুক্ত হইতে পারে, ইহাও একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ইহার পরে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বিষয়ে যে সমস্ত বাক্য প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে সন্দেহের লেশমাত্র থাকিতে পারে না। তাহার একটী বাক্য এখানে প্রদর্শিত হইল—

দানানিদদ্যাদিচ্ছাতো দ্বিজেভ্যঃ ক্ষত্রিয়োঽপি হি।
যজেচ্চ বিবিধৈর্যজ্ঞৈরধীয়ত চ পার্থিব॥

হে রাজন্! ক্ষত্রিয় ইচ্ছানুসারে ব্রাহ্মণগণকে দান করিবে, বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে এবং বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে।

এই বচনে ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম নির্ণীত হওয়ায়, ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য সমূহ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম নিয়ামক বলিতে হইবে, এবং এই বাক্যেও দ্বিজেভ্যঃ' এই দ্বিজ শব্দে ব্রাহ্মণকেই বুঝাইবে; কারণ ব্রাহ্মণ ব্যতীত ক্ষত্রিয়াদির প্রতিগ্রহ ধর্ম্ম নহে।

অপিচ, মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ষষ্টিতমাধ্যায়ে যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভীষ্ম যে চাতুবর্ণাদি ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবগত হওয়া যায় যে, ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন ও অধ্যাপনে কর্ত্তৃত্ব নাই। তথায় এইরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়—

ক্ষত্রিয়স্যাপি যোধর্ম্মস্তং তে বক্ষ্যামি ভারত!
দদ্যাদ্রাজন্নযাচেত যজেত ন চ যাজয়েৎ॥
নাধ্যাপয়েন্নাধীয়ীত প্রজাশ্চ পরিপালয়েৎ।
নিত্যোদ্যুক্তো দস্যুবধে রণে কুর্য্যাৎ পরাক্রমম্॥

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন,—হে ভারত! হে রাজন্! ক্ষত্রিয় দান করিবে, প্রার্থনা (প্রতিগ্রহ) করিবে না; যজন করিবে, যাজন করিবে না; বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, অধ্যাপন করিবে না; প্রজা পালন করিবে, দস্যু বিনাশে সর্ব্বদা উদ্যোগী হইবে এবং যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিবে।

ক্ষত্রিয়প্রবরের বাক্যে ক্ষত্রিয়ের যাজন ও অধ্যাপন স্পষ্টই নিষিদ্ধ হইয়াছে।

সুতরাং ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন এবং অধ্যাপন কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহা সমীচীনরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণের নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করা একান্ত অনুচিত। শাস্ত্রে বহুস্থানে এতদ্বিষয়ে কথিত হইয়াছে। ভবিষ্যপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

ইতিহাস পুরাণাদি শ্রুত্বা ভক্ত্যা বিশাংপতে।
মুচ্যতে সর্ব্বপাপেভ্যো ব্রহ্মহত্যাদিভি র্বিভো॥
ব্রাহ্মণঃ বাচকং কুর্য্যান্নান্যবর্ণজমাদরাৎ।
শ্রুত্বান্যবর্ণজাদ্রাজন্! বাচকান্নরকং ব্রজেৎ॥

হে বিশাংপতে! ভক্তিসহকারে ইতিহাস, ও পুরাণ শ্রবণ করিবে। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বাচকের নিকট শ্রবণ করিলে শ্রোতা নরকে গমন করে।

ইহা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, শ্রুতি ও স্মৃতির কথা দূরে থাকুক ইতিহাস পুরাণেও অন্য বর্ণের নিকট শ্রবণ করাও অত্যন্ত গর্হিত বলিয়া স্থির হইয়াছে। সদাচারও ধর্ম্মে প্রকৃষ্ট প্রমাণ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। মনু বলিয়াছেন—

বেদঃ স্মৃতি সদাচার! স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ
এত চতুর্ব্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাদ্ধর্ম্মস্যলক্ষণম্॥

বেদ, স্মৃতি, সদাচার ও আত্মতুষ্টি এই চারিটী সাক্ষাৎ ধর্ম্মের লক্ষণ বলিয়া ঋষিগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

সমগ্র ভারতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অন্বেষণ করিলে জানিতে পারা যায় যে, উপনয়নদাতা ও বেদশিক্ষা দাতা একমাত্র ব্রাহ্মণই। সমস্ত ভারতবর্ষে অবিচ্ছিন্নভাবে বহুকালব্যাপী যে আচার বলিয়া আসিয়াছে, ইহা যে ধর্ম্মবিষয়ের একটী প্রকৃষ্ট প্রমাণ, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। মীমাংসা শাস্ত্রপ্রণেতা ভগবান্ জৈমিনি হোলাকাদি আচার দ্বারা ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াছেন।

শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস, পুরাণ ও সদাচার দ্বারা ব্রাহ্মণেরই আচার্য্যত্ব নিরূপিত হইল। তথাপি কেহ যদি আশঙ্কা করেন,—শ্রুতি প্রভৃতিতে ক্ষত্রিয়াদি বর্ণের নিকট হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বিদ্যাপ্রাপ্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়, তাহার উপায় কি? তাহার উত্তর এই যে, শাস্ত্রে কোথায়ও ক্ষত্রিয়াদির নিকট হইতে বেদ-বিদ্যাদি লাভের বিধি নাই; পক্ষান্তরে নিষেধ ও নিন্দা পরিশ্রুত হয়। কেবলমাত্র ২।৪টী আখ্যায়িকা পাঠে ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে ব্রাহ্মণের বিদ্যাপ্রাপ্তির বিষয়

অবগত হওয়া যায়। আখ্যায়িকা দ্বারা কর্ত্তব্যতা নির্ণীত হয় না, বিধি নিষেধ বাক্যই কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করে।

পূর্ব্ববারে ছান্দোগ্যের পঞ্চাগ্নিবিদ্যা ও বৃহদারণ্যকের গার্গ-অজাত শত্রু সংবাদ দ্বারা ক্ষত্রিয়ের আচার্য্যত্ব প্রতিপন্ন হয় না, তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈশ্বানর বিদ্যা সম্বন্ধে আভাস প্রদান করা হইয়াছিল, এক্ষণে অবসর ক্রমে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাইতেছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদে পঞ্চমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন ও বুড়িল এই পাঁচজন বেদবিদ্ গৃহস্থ ব্রাহ্মণ। ইঁহারা পরস্পর মিলিত হইয়া বিচার করিয়াছিলেন,—আত্ম—ব্রহ্ম কাহাকে বলে?

অতঃপর তাঁহারা নির্ণয় করিতে অসমর্থ হইয়া স্থির করিলেন, "সম্প্রতি উদ্দালক বৈশ্বানর আত্মাকে স্মরণ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার নিকট যাই।' তাঁহারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া উদ্দালকের নিকট গমন করিলেন। উদ্দালক তাঁহাদিগকে দেখিয়া তাঁহাদের আগমন ও প্রয়োজন অবগত হইয়া, মনে মনে বিচার করিলেন, 'এই সমস্ত বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ আমার নিকট বৈশ্বানর আত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা করিবেন। কিন্তু আমি সমগ্র প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ নহি। অতএব আমি ইহাদিগকে একজন উপদেষ্টা স্থির করিয়া দিব।' এইরূপে মনে মনে চিন্তা করিয়া সমস্ত ব্রাহ্মণগণকে বলিলেন,—"সম্প্রতি রাজা অশ্বপতি বৈশ্বানর আত্মাকে স্মরণ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহারই নিকট গমন করুন।" এই সংবাদে তাঁহারা সকলে অশ্বপতির নিকট গমন করিলেন। রাজা অশ্বপতি তাঁহাদিগকে সমাগত দেখিয়া প্রত্যেককে পৃথক্‌ভাবে যথাযোগ্য পূজা করিলেন, এবং মনে মনে চিন্তা করিলেন, "যদি এই সমস্ত শ্রোত্রিয় আমার দোষ দেখেন, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে নিশ্চয়ই প্রতিগ্রহ করিবেন না।' এইরূপ বিবেচনা করিয়া স্বীয় সদ্‌বৃত্ততার পরিচয় প্রদান করিলেন। বলিলেন—' আমার রাজ্যে কেহই পরস্বাপহারী নাই, ধনী হইয়া অদাতা কেহই নাই, কোন ব্রাহ্মণই মদ্যপান করেন না। সামর্থ্য সত্ত্বে দ্বিজাতি হইয়া অগ্নিহোত্র গ্রহণ করেন, এমন কেহই নাই। অবিদ্বান্ কেহই নাই, পরদারগামী কোন পুরুষই নাই, সুতরাং দুষ্টাচারিণী স্ত্রীর থাকিবার ত' কথাই নাই। আমি যাগ করিব বলিয়া কয়েকদিন হইতে সংযত আছি। যাগে এক একজন ঋত্বিক্ কে (পুরোহিত) যে পরিমাণে ধন দান

করিব,আপনাদের মধ্যে প্রত্যেককে তৎপরিমাণে ধন প্রদান করিব।" তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণগণ বলিলেন,—"যে প্রয়োজন উদ্দেশে লোক অন্যের নিকট গমন করে সেই তাহার অর্থ। আমরা বৈশ্বানর-বিদ্যার্থী, ধনার্থী নহি। আপনি বৈশ্বানর আত্মাকে অবগত আছেন, তা'ই আমাদিগকে বলুন।" তচ্ছ্রবণে রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—'আগামী দিবসে প্রাতঃকালে আপনাদিগকে উপদেশ দিব।" অতঃপর ব্রাহ্মণগণ সমিৎপাণি হইয়া যথাকালে রাজার নিকট গমন করিলেন; রাজাও তাঁহাদিগের উপনয়ন না দিয়াই বৈশ্বানর-বিদ্যা প্রদান করিলেন। এস্থলে এরূপ শ্রুতি বাক্য দৃষ্ট হয়,—

"তান্ হোবাচ প্রাতর্ব্প্রতিবক্তাস্মীতি তে হ সমিৎপানয়ঃ পূর্ব্বাহ্নে প্রতিচক্রমিরে তান্হানুপনীয়ৈবৈবদুবাচ।"

এই শ্রুতি-বচন দ্বারা অবগত হওয়া যায়,—রাজা তাঁহাদিগেব উপনয়ন না দিয়াই বিদ্যাদান করিয়াছিলেন। যদি ক্ষত্রিয়েব উপনয়ন-কর্ত্তৃত্ব থাকিত, তাহা হইলে অবশ্য উপনয়ন দিয়াই বিদ্যাদান করিতেন। কিন্তু উপনয়ন দানের অধিকার না থাকায়, কেবলমাত্র বিদ্যাদান করিয়াছিলেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা হইতে পারে—ক্ষত্রিয়ের যেমন উপনয়ন কর্ত্তৃত্ব নাই, তদ্রূপ অধ্যাপনেও অধিকার নাই। কিন্তু এস্থলে অধ্যাপনে অধিকার কিরূপে হইল? ইহার উত্তরে বলা যাইতেছে যে ইহা মুখ্য অধ্যাপন নহে। তৎকালে তাঁহারা বৈশ্বানর-বিদ্যা ব্রাহ্মণের নিকট না পাইয়া, নিকৃষ্টবর্ণ ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন,—

"অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে।
অনুব্রজ্যা চ শুশ্রূষা যাবদধ্যয়নং গুরোঃ॥

অব্রাহ্মণ অর্থাৎ দ্বিজাতির নিকট অধ্যয়ন আপৎকালে বিহিত হইতে পারে; কিন্তু পাদবন্দনাদিরূপ শুশ্রূষা করিবে না। যে পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিবে, তাবৎকাল অনুগমনই শুশ্রূষা স্থানীয় হইবে। এখানে আপৎকাল শব্দের অর্থ—ব্রাহ্মণাধ্যাপকাভাব; অর্থাৎ তদ্দেশে তৎকালে যদি ব্রাহ্মণাধ্যাপক না পাওয়া যায়, তবে অগত্যা দ্বিজাতি অধ্যাপকের নিকট হইতে বিদ্যা গ্রহণ করিবে। বস্তুতঃ শ্রুতিতে "অনুপনীয়ৈব" এই পদ দ্বারা মুখ্য উপনয়ন সংস্কার বুঝা যায় না। কারণ পূর্ব্ববাক্যে "মহাশালা" "মহাশ্রোত্রিয়াঃ" এই দুইটী পদ দ্বারা তাঁহাদিগকে

গার্হস্থ্য ধর্ম্মাবলম্বী ও বেদবিৎ বলিয়া জানা গিয়াছে। সুতরাং পূর্ব্বেই তাঁহাদের উপনয়ন সংস্কার হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। বহু বিদ্যায় পারদর্শী নারদ যেমন আত্মজ্ঞান লাভের জন্য ভগবান্ সনৎকুমারের নিকট গমন করিয়াছিলেন, তদ্রূপ প্রাচীনশাল প্রভৃতি গৃহস্থ ও শাস্ত্রবিৎ হইয়াও বৈশ্বানর বিদ্যালাভের নিমিত্ত গুরুর অন্বেষণ করিতেছিলেন। আনন্দগিরি এস্থলে উপনয়ন শব্দে "পাদয়োর্নিপাতনম্" এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। অর্থাৎ রাজা অশ্বপতি ক্ষত্রিয় বলিয়া, উৎকৃষ্ট বর্ণ ব্রাহ্মণ প্রাচীনশাল প্রভৃতির নিকট হইতে পাদবন্দনরূপ শুশ্রূষা গ্রহণ না করিয়াই, তাহাদিগকে বৈশ্বানর বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত মনু বচনের সহিত একবাক্যতা করিলে আনন্দগিরি কৃত অর্থ সমীচীন বলিয়া প্রতিভাত হয়, এবং কোনরূপ বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—আখ্যায়িকা কোনরূপ বিধায়ক নহে; ইহার একটী বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে বলিয়া গিয়াছেন—"যত এবং মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াব্রাহ্মণাঃ সন্তো মহাশালত্বাগুভিমানং হিত্বা সমিদ্ভারহস্তা জাতিতো হীনং রাজানং বিদ্যার্থিনো বিনয়েনোপজগ্মুঃ। তথাঽন্যৈর্বিদ্যোপাদিৎসুভির্ভবিতব্যম্। তেভ্যশ্চাদাদ্বিদ্যামনুপনীয়ৈবোপনয়নমকৃত্বৈবতান্। যথা যোগ্যেভ্যো বিদ্যামদাত্তথান্যেনাপি বিদ্যা দাতব্যেত্যাখ্যায়িকার্থঃ। এতদ্বৈশ্বানর বিজ্ঞান মুবাচেতি বক্ষ্য মানেন সম্বন্ধঃ।" অর্থাৎ যে হেতু এইরূপ গৃহস্থ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ অভিমান ত্যাগ করতঃ বিদ্যার্থী হইয়া সমিধ্ গ্রহণ পূর্ব্বক নিজ হইতে নিকৃষ্ট জাতি রাজার নিকট বিনীত ভাবে গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ অপর যে কেহ বিদ্যালাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহারও তদ্রূপ আচরণ করা কর্ত্তব্য। রাজো তাঁহাদিগকে উপনয়ন (পাদবন্দনরূপ শুশ্রূষা) ব্যতীত বৈশ্বানর বিদ্যা দান করিয়াছিলেন। রাজা যেমন যোগ্য পাত্রে বিদ্যা দান করিয়াছিলেন, তদ্রূপ অন্য উপদেষ্টারও এইরূপ যোগ্য পাত্রে বিদ্যা দান করা উচিত।"

এইরূপ আখ্যায়িকার মুখ্য তাৎপর্য্য এই যে, বিদ্যা গ্রহণ করিতে হইলে, বিনয়াদি সম্পন্ন হইতে হয় এবং যোগ্য পাত্রে বিদ্যা দান করিতে হয়। সম্পূর্ণ মহাবাক্যের এইরূপ তাৎপর্য্য হইলেও অবান্তর বাক্যদ্বারা অবশ্য ক্ষত্রিয়ের নিকট হইতে বিদ্যা প্রাপ্তির বিষয় অবগত হওয়া যায়। কিন্তু ইহা আপদ্ধর্ম্ম।

শাস্ত্রে যেমন ব্রাহ্মণের নানাপ্রকার আপদ্ধর্ম্মের বিষয় কথিত হইয়াছে; ইহা তন্মধ্যে একটী। অতএব কোন প্রকারেই ক্ষত্রিয়ের আচার্য্যত্ব প্রমানিত হইল না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পক্ষ ত্রয়ের মধ্যে অন্তিম পক্ষই গ্রাহ্য।

যদি কেহ বলেন,—অন্য বিদ্যার আচার্য্য ব্রাহ্মণ হউন, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যার আচার্য্য ক্ষত্রিয়ই হইবেন। তাহার উত্তর এই,—এরূপ বলা নিতান্ত কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ মনূক্ত আচার্য্য লক্ষণে 'রহস্য' শব্দ আছে, এই 'রহস্য' শব্দের অর্থ বেদান্ত। বেদান্তবিদ্যা ও ব্রহ্মবিদ্যা একই পদার্থ। বেদের এক অংশের আচার্য্য ব্রাহ্মণ ও অপর অংশের আচার্য্য ক্ষত্রিয়, ; এইরূপ 'অদ্ধ জরতীয় কল্পনা' নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ। শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা যখন একমাত্র ব্রাহ্মণেরই আচার্য্যত্ব স্থিরীকৃত হইল, তখন শাস্ত্রে যে স্থলে ক্ষত্রিয়াদির নিকট হইতে বিদ্যা প্রাপ্তির বিষয় শুনিতে পাওয়া যায়, তাহা আপদ্ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে।

এতদ্ভিন্ন উপাধ্যায় ও ঋত্বিক্, ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য বর্ণে হইতেই পারে না। সুতরাং 'মহামহোপাধ্যায়' উপাধি একমাত্র ব্রাহ্মণেই যথাশাস্ত্র-সঙ্গত হইতে পারে। অবসর ক্রমে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা আছে। এক্ষণে নিরপেক্ষ পাঠকগণ ইহার সত্যাসত্য নিদ্ধারণ করুন।

কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত-মীমাংসা-দর্শনতীর্থ বিদ্যারত্নোপনামক
শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী।

ধর্ম্ম]

সদাচার।

আচারঃ পরমোধর্ম্মঃ শ্রুত্যুক্তঃ স্মার্ত্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তো নিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজঃ॥

আচার পরম ধর্ম্ম। ইহা বৈদিক ও স্মার্ত্ত ভেদে দ্বিবিধ। জ্ঞানবান্ দ্বিজগণের সর্ব্বদাই আচার অনুষ্ঠানে যত্নশীল হওয়া উচিৎ। যাহা সাধুগণের আচরণীয় তাহারই নাম আচার। শ্রৌর্ত্ত স্মার্ত্ত অর্থাৎ ভগবদুপদিষ্ট বা ঋষি বিহিত বিধি ব্যবস্থাগুলি বংশ-পরম্পরা ক্রমে চলিয়া আসিয়া আচার আখ্যা ধারণ করে। যদি কোন বিধি বংশানুক্রমে ভ্রমবশতঃই চলিয়া আসিতেছে

—এরূপ আশঙ্কা করা যায়, তজ্জন্যই 'সৎ' এই বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের যে আচার—তাহাই প্রকৃত সদাচার।

তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পরম্পরাক্রমাগত।
বর্ণানাং সান্তবালানাং সদাচার স উচ্যতে॥
সাধবঃ ক্ষীণদোষাশ্চ সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ।
তেষামাচরণং যত্তু সদাচার স উচ্যতে॥

'সৎ' শব্দটা সাধু বাচক। তাঁহাদের যাহা আচরণীয়; তাহাই সদাচার। অনুপকারী, অনুপযোগী বা অন্যায় বিধি, সাধুর আচার হইতে পারে না। গতানুগতিকতার অনুরোধ, ভ্রান্ত বিশ্বাস, কুশিক্ষা-সম্ভূত অশ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের অভাব, সাধু ব্যক্তিতে সম্ভব নহে। আচার পালন গৃহস্থের পক্ষেই প্রধান ভাবে বিহিত।

গৃহস্থস্য সদা কার্য্যমাচারংপরিপালনং।
সদাচারবিহীনস্যভদ্রমত্র পরত্র চ॥

আচার পালন গৃহস্থের ধর্ম্ম। সদাচার বিহীন বক্তির কি ইহকালে—কি পরকালে মঙ্গল নাই।

ধর্ম্মই সদাচারের মূল। কারণ যে আচারগুলি ধর্ম্ম মূলক, শাস্ত্র বিহিত ও মহাজন স্বীকৃত—তাহাই সদাচার। ধন সম্পত্তি এই সদাচার তরুর শাখা। কাম এই তরুর পুষ্প; ফল,—মুক্তি বা স্বর্গাদি। শাস্ত্রে যখন সদাচারের এমন মাহাত্ম্য, তখন ইহাকে পূর্ব্বপুরুষ-পালিত বিধান বলিতে পারা যায় না।

পথ সরল বা প্রশস্ত হইলেই অশ্বারোহীর গমনের সুবিধা, তদ্রূপ সনাতন আচার পদ্ধতি অক্ষুন্ন থাকিলে, ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তির তাহার পালন সহজ সাধ্য।

"ধর্ম্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং"

এই ধর্ম্মপথ বড় জটিল। চিত্ত তাদৃশ প্রশান্ত নহে; কাজেই আমরা শাস্ত্রের মর্ম্ম ঠিক মত বুঝিতে পারি না। শাস্ত্রাধ্যাপকগণও সেরূপ যুক্তিগর্ভ করিয়া যথার্থ মর্ম্ম সাধারণকে বুঝাইতে পারেন না; তাহার উপর অর্থলোভে শাস্ত্রের বিকৃতি হইতেছে। এ অবস্থায় সন্দিগ্ধ দোলাচল-চিত্তবৃত্তি অজ্ঞ মানব কি করিবে? শাস্ত্রে নানামত; ঋষিরা ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বী; সুরগুরুকল্প অধ্যাপকগনের ঐক্যমত নাই; তবে সাধারণ লোক কোন পথে চলিবে? কেহ বলিলেন দক্ষিণে, কেহ

পশ্চিমে, কেহ উত্তরে, কেহ বা পূর্ব্বে বলিলেন। কাজেই তখন আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ কোন্ পথে চলিয়াছেন, বর্ত্তমান মহাত্মাগণই বা কোন পথে চলিয়াছেন, ইহা জানা আবশ্যক পড়ে। তা'ই শাস্ত্রের আদেশ "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা" মহাজন যে পথে গমন করেন তাহাই পথ। অতএব সদাচার ধর্ম্মের মুল হইল না কি ? ধর্ম্ম সার্ব্বভৌগিক হয় হউক ; কিন্তু জগতের সকল লোকের পক্ষে এক ধর্ম্ম সম্ভব নহে, এক প্রকার সদাচার পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। কেহ জ্ঞানী, কেহ অজ্ঞানী ; কেহ পণ্ডিত, কেহ মুর্খ ; কেহ বৃদ্ধ, কেহ বালক ; কেহ বিশ্বাসী, কেহ বা সন্দিগ্ধ ;—এমত অবস্থায় রুচি বা প্রবৃত্তি ভেদে ধর্ম্ম ও আচার পদ্ধতি নানাবিধ না হইয়া যায় না। অতএব আমাদের সদাচাব অপরিবর্ত্তনীয় হইলেই দেশ-ভেদে বা কাল ভেদে তাহার যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সাধিত হইবে তাহা অবশ্যম্ভাবী।

কেহ কেহ সার্ব্বভৌমিকতা ও সার্ব্বজনীনতার দোহাই দিয়া জগতে এক মহা-ধর্ম্মের সৃষ্টি বাঞ্ছনীয় মনে করেন ;—ইহা আকাশ কুসুম। ভাল হইতে পারে, কিন্তু সম্ভব নহে। অধিকারী ভেদ অপরিহার্য্য ; অতএব অধিকারের তারতম্য ও স্বাভাবিক। "বর্ণপরিচয়"-পাঠী ও উপাধি পরীক্ষার্থীর এক পাঠ্য হইতে পারে না। এই অধিকারী ভেদ করিয়াই শাস্ত্রের উপদেশ, সকল মানবের পক্ষে একরূপ হয় নাই। তজ্জন্যই কাহাদের পক্ষে স্বার্থ ত্যাগ ; কাহাদের পক্ষে নিষ্কাম মার্গ ; কাহাদের পক্ষে বা ভক্তিপথ ইত্যাদি বিহিত।

তোমার কোন ব্যবস্থার প্রয়োজন। ভট্টপল্লী, নবদ্বীপ বিক্রমপুর হইতে ব্যবস্থাপত্র আনাইয়া দেখিলে যে, কোন মতের সহিতই কোন মতের ঐক্য নাই ; বরং বিরোধই আছে। এ অবস্থায় যাহা তোমার পিতৃপরুষগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত, তাহাই মানা উচিৎ। তবে যদি নিঃসন্দেহে বুঝা যায় যে, তাহা ভ্রান্ত—তখন অন্য কথা। ইহা জানিও—যাহা ভ্রান্ত, তাহা সমাজে আদৃত হওয়া বা সাধু কর্ত্তৃক আচরিত হওয়ার সম্ভাবনা অত্যল্প।

"আচারেন তু সংযুক্ত সম্পূর্ণফলভাগ্ ভবেৎ"। আচার পালনকারীই পুণ্য-ফলের সম্পূর্ণ অধিকারী। সদাচার ত্যাগ করিয়া যজ্ঞ, দান, তপস্যা কিছুই সফল হয় না। যাহা তোমাদের পক্ষে অবলম্বনীয়, তোমাদের দেশ, তোমাদের প্রবৃত্তি, তোমাদের অবস্থায় যাহা ঠিক উপযোগী, তোমাদের মন বুদ্ধির গ্রহণ যোগ্য, তাহাই

ত' সদাচার। সে সদাচারের সহিত ধর্ম্মের বিরোধই সম্ভব নহে। সেজন্য কোন কোন স্থানে ধর্ম্ম অপেক্ষাও সদাচারের সম্মান অধিক হইয়া পড়িয়াছে। ইহার হেতু 'এই ধর্ম্ম ঠিক' নিঃসন্দিগ্ধ ইহা প্রমাণিত হইল না; কিন্তু সদাচার এতকাল যথাযথ পালিত হইয়া আসিতেছে বলিয়া উহা নিঃসন্দিগ্ধ।

"আচারাদ্বিচ্যুতো বিপ্রো ন বেদফলমশ্নুতে"

আচার বিচ্যুতবিপ্র বেদের ফল লাভে অধিকারী নহেন। আচার পালনেই ধর্ম্ম পালন। কারণ আচার ধর্ম্মমূলক। তবে যদি কোন আচার অশাস্ত্রীয় বুঝায়, তবে উহা পরিত্যজ্য।

তবে সর্ব্বত্র আচারই যে সদাচার ও শাস্ত্র বিহিত, তাহা বলা যায় না। কোন কোন আচার সামাজিক ও পরিবারিক; কিন্তু ইহা মনে রাখিতে হইবে, সামাজিক ও পরিবারিক বলিয়া পরিহার্য্য নহে। কেন সামাজিক ও পারিবারিক হইল, কেনই বা এতকাল চলিয়া আসিল? অনুপকারী বা অনুপযোগী কোন আচার, অনুষ্ঠান বা প্রথা এতকাল দাঁড়াইতে পারে না। কালের কষ্টি পাথরে যাহা কষিত হইয়াছে, তাহার গুণ, তাহার উপকারিতা, তাহার শক্তি অসামান্য।

'অতীতে যাহা সদাচার -- বর্ত্তমানে তাহা সদাচার নহে - অতীতে তাহা উপযোগী, বর্ত্তমানে তাহা অনুপযোগী, অতএব বর্ত্তমানে ইহা পরিত্যজ্য'—এইরূপ আশঙ্কাই উঠিতে পারে না। অতীতে যাহা সাধু আচরণীয়, বর্ত্তমানেই তাহা সাধুদিগের আচরনীয় হইল না কেন? অতীতে যাহা উপযোগী বর্ত্তমানে তাহা অনুপযোগী - ইহাই বা কি প্রকারে জানিব? তুমি বলিবে অনুপযোগী, অতএব আমি তাহা মানিয়া লইব, ইহাই কেমন কথা! তুমি বলিবে, ইহা সমাজ অনিষ্টকর; আমি দেখিতেছি সমূহ হিতকর। অতএব মীমাংসিত হইবে কেমন করিয়া? তুমি যাহার ধ্বংসে বদ্ধপরিকর; তাহা আমি বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাইতেছি; কাজেই তাহার প্রবর্ত্তনে বা রক্ষণে ইচ্ছুক। কু-সংস্কার কাহার? আর যদি এগুলি সর্ব্ব প্রকারেই, সর্ব্বসম্মতিক্রমেই বর্ত্তমানে অহিতকর বিবেচিত হয়—তাহা ঐ আচারের দোষ, কি আমাদের দোষ।—ইহা কে বলিবে? নদী শুকাইয়া আসিয়াছে—এই কারণে অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিতেছে। তাহার সংস্কার করিয়া আবার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিলে দেশের উপকার। অতএব নদীর ধ্বংস

প্রার্থনীয়, না সংস্কার প্রার্থনীয়? আচার দুষ্ট হইলে, সে দোষ দূরীকরণেই যত্নবান্ হওয়া উচিত।

সদাচার সাধারণতঃ শাস্ত্রমূলক। শাস্ত্রমূলক না হইলে শাস্ত্রশাসিত ভারতবর্ষে আদর হইবে কেন? সামাজিক ও পারিবারিক সদাচারের শাস্ত্রমূলকতা সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় না, তাহার দুইটী কারণ এই হইতে পারে। এক আমরা সমস্ত শাস্ত্র দেখি নাই, কিম্বা সেই মূল শাস্ত্র লোপ হইয়া গিয়াছে। কোন আচারকে যদি সামাজিক ও পারিবারিকই ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ইহা অপরিত্যাজ্য। কারণ, সমাজ বা পরিবারের হিতকর না হইলে, ইহা চলিবে কেন?

কতকগুলি সদাচার কুসংস্কারজাত বলিয়া উহা পরিত্যাজ্য, এইরূপ কেহ কেহ মন্তব্য দিয়া থাকেন; কোন কোন মাসিক পত্র জলদগম্ভীর স্বরে বলেন, "এইগুলি ত্যাগ করিতে না পারিলে দেশোদ্ধার হইবে না, ভারতবাসী মানুষ হইবে না।" কোন্‌গুলি কুসংস্কার, ইহা বুঝা বড়ই কঠিন। এই যে প্রেততত্ত্ব—যাহা শিক্ষিতগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইত, বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকেও এই শিক্ষা দেওয়া হইত; আজি কালি সেই প্রেততত্ত্ব সত্য হইয়াছে। কতকগুলি আচার কিছুদিন পূর্ব্বে অবজ্ঞাত ছিল, এক্ষণে বিজ্ঞান তাহার উপকারিতা স্বীকার করিতেছে। হইতে পারে, দুই একটী কুসংস্কারজাত; কিন্তু তাহা বাছিব কেমন করিয়া? ধান্যক্ষেত্রে তৃণ জন্মে, তৃণ বাছিয়া লওয়া যায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ভয় যে, নকল দুএকটীকে ত্যাগ করিতে যাইয়া, আসল হারাইব। তবে কোন আচার অশাস্ত্রীয় ইহা নিঃসন্দিগ্ধ প্রমাণ হইলে অবশ্য পরিত্যাজ্য।

বর্ত্তমানে ধর্ম্মহীন শিক্ষা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন, আর সেই কুশিক্ষা-জন্য শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা বা বিশ্বাসের অভাব—এই দুইটী আমাদের কার্য্য নাশের হেতু। এই দুইটী কারণ দূর করিতে হইলে প্রথম কর্ত্তব্য, শাস্ত্রের মতগুলি যুক্তিনির্ণীত ও অনুভবগম্য করিয়া উপস্থাপিত করা। এক্ষণে আমরা দুই একটী সনাতন আচার পদ্ধতির কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করিব, এবং দেশের মধ্যে তাহার প্রচলনে উপকার কি অনুপকার, তাহারও আলোচনা করিব। আর যাহা মাত্র সামাজিক—তাহারও যে উপযোগিতা আছে, তাহাও দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান, উষাকালে পুষ্পচয়ন, সূর্য্যাভিমুখে স্তবাদিপাঠ সন্ধ্যা

গায়ত্রী, উপাসনা, দেবপূজা, জপ, হোম তর্পণ—এক কথায় বলিতে গেলেও সমস্ত শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মকার্য্যই সদাচারের অন্তর্ভূত। খাদ্যাখাদ্য বিচার, সৎপ্রতিগ্রহ, বিধিপালন, নিষিদ্ধ বর্জ্জন—এ সকলও সদাচার।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে উত্থান যে স্বাস্থ্যকর ও মানসিক প্রফুল্লতার কারণ - ইহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। উষাকালে উদ্যানে পুষ্পচয়নার্থ ভ্রমণে চিত্তের ঔদাস্য, ইন্দ্রিয়ের অবসাদও শারীরিক গ্লানি বিদূরিত হইয়া থাকে। সেই পুষ্প আবার দেবতার পূজার্থ এই জ্ঞানে কত সুখ। প্রাতে সূর্য্যাভিমুখী থাকার ফল যাবতীয় রোগের আক্রমণ নাশ. ইহা আজিকালি চিকিৎসকেরা পর্য্যন্ত বলিয়া থাকেন। স্তবাদি পাঠ করিতে কি বিমল আনন্দ, কি তৃপ্তি, তাহা পাঠকারীই জানেন। সামান্য নায়ক নায়িকার রূপবর্ণাত্মিকা কবিতা যদি মিষ্ট লাগে, তাহা পাঠ করিতে যদি তৃপ্তি হয়,—রঙ্গমঞ্চে অভিনেতা সাজিয়া অ্যাক্ট্ করিতে যদি আনন্দ হয়,—তবে ভগবানের গুণগান সংস্কৃত সুললিত ছন্দে আবৃত্তি কত তৃপ্তিজনক; সে মহিমময় সৌন্দর্য্যগানে নয়নে প্রেমাশ্রু, শরীরে কম্পন, প্রাণে তন্ময়তা সুখ হয় না কি?

গায়ত্রী ব্রহ্মশক্তি। গায়ত্রী দ্বারা ব্রহ্মোপাসনা বেদবিহিত। সেই প্রকাশশীল ব্রহ্ম-জ্যোতি চিন্তা করি—যাহা আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রচোদিত করিতেছে। সন্ধ্যা ব্রহ্মোপাসনা, ইহা ব্রহ্মেরই বিভূতির উপাসনা! অগ্নি, বায়ু, তেজ, সলিল, সূর্য্য—সমস্তই ব্রহ্মের কার্য্য ও বিভূতি; এই কার্য্যোপাসনা, এই বিভূতি উপাসনাও ব্রহ্মোপাসনা; কারণ, নির্গুণ অনন্ত ব্রহ্মের ইয়ত্তা শান্ত পরিচ্ছিন্ন চিত্তে অসম্ভব। কার্য্য ও বিভূতি উপাসনা অপেক্ষা দেবমূর্ত্তি গড়িয়া পূজায়, সৌন্দর্য্যের অনুভূতি সহজে জাগিয়া উঠে, ভক্তিভাব উচ্ছ্বলিত হইয়া পড়ে, কেমন একটী প্রাণবত্তা অনুভবে আইসে। আমরা যাহা ভালবাসি, তাহাই দেবতাকে দিই। শীতের রাত্রে কষ্ট পাই, দেবতার গাত্রে শীতবস্ত্র জড়াইয়া রাখি। গ্রীষ্মে আমাদের প্রাণ আই ঢাই করে, ঝারায় দেবতার জন্য জলস্নিগ্ধ পুষ্পশয্যা বিছাইয়া দিই। আত্মমত সেবা, আত্মমত ভোগ। আর আমরা ভাল ভাল দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া দেবতাকে নিবেদন করিয়া খাই। ইহাতে অহঙ্কার কমে ও বিমল আনন্দ পাওয়া যায়। ভগবান্ সর্ব্বব্যাপী যে আকারে আমরা আহ্বান করিব, সেই আকার তখন তাঁহার। তিনি জগদাকার;—জগতের প্রস্তর, বৃক্ষ ও মৃত্তিকাদি তাঁহারই রূপের আলম্বন।

জপ একাগ্রতা শক্তির বৃদ্ধি করে। ধ্যেয় বিষয়ে মন স্থির করার নামই,—উপাসনা। তাহা দুই প্রকারে হইতে পারে, এক স্তব পাঠ বা বেদ গানের দ্বারা, আর জপাদি দ্বারা। আমাদের মন ও ইন্দ্রিয় বিষয়-প্রবণ। তাহাকে অন্তর্মুখীন করা সাধন-সাপেক্ষ। জপাদি অভ্যাসই সাধনা। সম্মুখে দেবতার মূর্ত্তি দেখিয়াই, চক্ষু মুদিয়া সেই মূর্ত্তি হৃদয়-সিংহাসনে বসাইলাম ; এক মনে তাঁহার চিন্তা করিলাম। কিন্তু দেখিতে হইবে, বিষয়-চিন্তা সেই পরমার্থ চিন্তাকে বিচ্ছিন্ন না করে। তজ্জন্যই মনটিকে আয়ত্তে আনা আবশ্যক। সে আয়ত্ত জপাদি-সাধ্য। চিন্তাশক্তি তড়িৎশক্তি উৎপন্ন করে, সেই তড়িৎ গিয়া চিন্তনীয় পদার্থ স্পর্শ করে। ইহা দ্বারা আমরা অভীষ্ট রূপ দর্শন করি।

খাদ্যাখাদ্য বিচার—সদাচার। নিষিদ্ধ অন্ন বর্জ্জন কেহ কেহ কুসংস্কার ভাবিয়া থাকেন। যথা—"আহারশুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ।" আহার শুদ্ধিতে, চিত্তের শুদ্ধি। কোন কোন খাদ্য রক্ত দূষিত করে, তমোগুণ প্রবল করে, ক্রোধাদি বৃত্তিগুলিকে উত্তেজিত রাখে এগুলি বর্জ্জনীয়, তাহার পর চণ্ডালাদি বা পাপী ব্যক্তির পাচিত অন্ন দূরের কথা—স্পৃষ্ট জল পানেও পাতিত্য জন্মে। পাপীর পাপ সেই অন্নে প্রবিষ্ট থাকে—সেই অন্ন খাইলে পাপীর নিকৃষ্ট তড়িৎ ভোক্তার শরীরস্থ উৎকৃষ্ট তড়িৎকে নিকৃষ্ট করে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ প্রমাণিত করিয়াছেন যে, পাপী যে মদের বোতল স্পর্শ করে, তাহাতে পর্য্যন্ত সেই পাপময় চিহ্ন থাকে। সেই কারণে পাপী বা চণ্ডালাদির সহিত একাসনে পর্য্যন্ত বসিতেও নিষেধ। সম ও বিষম তড়িতের মিলন হিতকর নহে। নিকৃষ্টবর্ণ বিবাহের ত' কথাই নাই। সম মিলনই আবশ্যক। যদি বিষম মিলন হিতকর হইত, তাহা হইলে মনুষ্য ও পশু মিলনই ত' ভাল! আর্য্য-অনার্য্য মিলনই ত' শুভদ!

বংশপরম্পরাক্রমে দীক্ষা গ্রহণ কাহার কাহার মতে ব্যবস্থা। আমরা বংশপরম্পরাক্রমে এক বংশীয়ের নিকটেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া থাকি। ইহাও আচার। উত্তরে বক্তব্য, সাধারণতঃ যেমন কুম্ভকারের পুত্র ঘটাদি নির্ম্মাণে অধিক পারগ, তদ্রূপ যে বংশে যাহার জন্ম, সেই পূর্ব্বপুরুষ-রচিত ব্যাপার নির্ব্বাহ তাহার পক্ষে সহজ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে প্রকার ঈশ্বরোপাসনা করিয়া গিয়াছেন ঈশ্বরের অনন্তরূপের মধ্যে যে মূর্ত্তি ধ্যান করিয়া গিয়াছেন—সেই মন্ত্রের উপাসনায় আমরা

সহজে কৃতকার্য্য হই। কারণ প্রকৃতির ভিত্তি পূর্ব্বেই নির্ম্মিত হইয়াছে। সেই মূর্ত্তির ধ্যানই যাচিত ফল প্রদানে সক্ষম। এই কারণে গুরু, মন্ত্র, দেবতা—এই তিনের মধ্যে একটি আধ্যাত্মিক সংযোগ ঘটিয়া যায়; তাহারই ফলে গুরু ত্যাগ, ইষ্ট দেবতা পরিবর্ত্তন, ও মূল মন্ত্র বর্জ্জন অবিধি। এই তিনের ঐক্য-মূলক সংযোগ অসামান্য শক্তি বৃদ্ধি করে। "আত্মা বৈ জায়তে পুত্র" পিতাই পুত্র হইয়া জন্মেন। পিতা যে সাধনার কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাহার দ্বিতীয় মূর্ত্তি বলিয়া পুত্র সেইখান হইতেই আরম্ভ করিবেন। নূতন আরম্ভ করিলে, আবার গোড়া পত্তন করিতে হইবে। তাহা বলিয়া যে বংশানুরোধে কুক্রিয়াসক্ত, পাপাচরণ ব্যক্তিকে গুরু করিতে হইবে, পাপিষ্ঠকে মন্ত্র দিতে হইবে, শাস্ত্র এমন বলে না; আচার এ শিক্ষা দেয় না। এই ত' গেল বিধিমূলক সদাচার।

এইবার নিষেধমূলক সদাচারের কথা উল্লেখ করিব। পাপান্ন ভোজনে পাপ। ইহা কি কুসংস্কার? পাপাচারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট অন্ন যে দূসিত, ইহা পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইতেছে। পাপীর পাপ ছবি স্পৃষ্ট অন্নাদির উপরও প্রতিফলিত হয়। নিম্ন জাতীয়েরা সাধারণতঃ কুক্রিয়াসক্ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যহীন, পাপকর্ম্ম-রত,—এই হেতু তৎস্পৃষ্ট বা তৎপাচিত অন্নাদি তাহাদিগের সেই নিম্নজাতীয় তড়িৎ অন্নাদির অভ্যন্তরে বর্ত্তমান থাকে। কেহ অন্নাদি ভোজন করিলে, নিকৃষ্ট শক্তি ভোক্তার শরীরে প্রবিষ্ট হইয়া সমুদায় উৎকৃষ্ট শক্তিকে পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট করিয়া দেয়। পাপীরা যাহা স্পর্শ করে, তাহাতেও পাপ কার্য্যের ছায়া ঘটে। এই অন্নাদি গ্রহণ নিষিদ্ধ. এই নিষিদ্ধ কর্ম্ম বর্জ্জনেও সদাচার পালন।

তাহা হইলে বিধি ও নিষেধমূলক শাস্ত্রীয় সদাচারগুলি যে উপকারক - তাহা স্থির। এক্ষণে দেখিব, যাহা শাস্ত্রবাক্য বলিয়া সাধারণতঃ প্রসিদ্ধ নহে, অথচ চলিয়া আসিতেছে, তাহার উপযোগিতা আছে কি না? যেমন, বিবাহে স্ত্রী-আচার। বিবাহ রাত্রে পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া সুসজ্জিতা পুর-ললনারা বরণ ডালা ইত্যাদি মাঙ্গল্য বস্তু হস্তে করিয়া বর-কন্যার চতুর্দ্দিকে প্রদক্ষিণ ও বরণ করিয়া থাকেন। প্রদক্ষিণ ও বরণের উদ্দেশ্য—বর কন্যার মানসিক একীকরণ, পরস্পরের সমতা বিধান করা। 'পান' ইহার উৎকৃষ্ট উপকরণ; পানের দ্বারা এই আকর্ষণ সহজে হয়। শুভদৃষ্টির পূর্ব্বেই এই মানসিক একীকরণ বা বিষমতার সমীকরণ করাই উচিত। আজি কালি "হিপনটিজম্" প্রভৃতি পাশ্চাত্য

যোগ শক্তির অনেকেই অনুশীলন করেন। তাহাতে শরীরের উপর দিয়া এমন ভাবে হস্ত চালন ক্রিয়া হইয়া থাকে, যাহাতে অঙ্গস্পর্শ না ঘটে, অথচ দেহে তড়িৎ আকর্ষণও করিতে পারা যায়। শুনা যাইত যে, এটি কিছুকাল পূর্ব্বে কতকগুলি আচার সম্বন্ধে প্রথা ও একটি উৎসব মাত্র; আমোদের কুসংস্কার। এক্ষণে সে ভাবের পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। নতুবা "ব্রাহ্মণ সমাজে" উৎসবাদির আদর দেখিতাম না।

শাস্ত্রীয় ও সামাজিক আচারগুলির নিরর্থকতা দূরের কথা,প্রত্যুত উপকারক। আমরা কুশিক্ষা ও উপদেশের অভাবে তাহার যাথার্থ্য বুঝিতে পারি না, বুঝিবার জন্য চেষ্টাও করি না। আর বুঝাইয়া দিবার মত লোকেরও অভাব, তবে বর্ত্তমানে যেরূপ অনুকূল বাতাসের সাড়া পাওয়া গিয়াছে, এবং শিক্ষিত ব্যক্তিগণের যেরূপ সনাতন ধর্ম্ম ও রীতিনীতির উপর শ্রদ্ধার ভাব দেখা যাইতেছে, তাহাতে আশা হয়, যে আবার আমাদের সনাতন আচার পদ্ধতি নির্দ্দোষভাবে জাগরিত হইবে। ইহাই আমাদের আশা। তবে ভরসা,—মঙ্গলময় পরমেশ্বর।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ (ভট্টাচার্য্য)।

ধর্ম্ম]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

পঞ্চম অধ্যায়—কর্ম্ম-সংন্যাস যোগ।

অর্জ্জুন কহিলেন—

কর্ম্মের সংন্যাস, পুনঃ প্রশংসিছ যোগ, কৃষ্ণ।
কহ মোরে সুনিশ্চিতে, তা'র মাঝে কোন্ শ্রেষ্ঠ? ১

শ্রীভগবান্ কহিলেন—

সংন্যাস ও কর্ম্মযোগ, দুই-ই নিঃশ্রেয়স্কর।
কর্ম্মের সংন্যাস হ'তে, কর্ম্মযোগ মহত্তর॥ ২
জেনো সে নিত্য সন্ন্যাসী, দ্বেষ লিপ্সা নাহি যা'র।
নির্দ্বন্দ্ব, হে মহাভুজ! সুখে হয় বন্ধে পার॥ ৩

'সাংখ্য আর যোগ ভিন্ন'—কহে অজ্ঞে, না পণ্ডিতে।
উভয়ের লভে ফল, একে সম্যগ্‌স্থিতে ॥ ৪

সাংখ্যে লভে যেই স্থান, যোগে পৌঁছে তথাকার।
'সাংখ্য আর যোগ এক'—যে দেখে সে দেখে সার ॥ ৫

দুর্ল্লভ সংন্যাস, মহাভুজ! বিনা যোগ (জেনো)।
যোগযুক্ত মুনি, ব্রহ্ম, অচিরে লভয়ে পুনঃ ॥ ৬

যোগযুক্ত, শুদ্ধচিত্ত, আত্মেন্দ্রিয়-জয়ী জন,
সর্ব্বভূতে একীভূত যাঁহার আত্মা এমন।
করিলে (কর্ম্ম) তিনি বদ্ধ না হন কখন ॥ ৭

দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, স্পর্শ, ভোজন, গমন,
নিদ্রা, শ্বাস, আলাপন, কিংবা বর্জ্জন, গ্রহণ,
উন্মেষ নিমেষ সব, করিলেও তত্ত্বজ্ঞানী,
'ইন্দ্রিয় ইন্দ্রিয় অর্থে বর্ত্তে—ইহা স্থির জানি'
সমাহিত মনে ভাবে—'কিছু নাহি করি আমি' ॥ ৮—৯

ব্রহ্মে অর্পি' কর্ম্ম যেবা করে, আসক্তি বর্জ্জিত।
পদ্মপত্রে বারি সম, হয় না সে পাপাশ্রিত ॥ ১০

ফলাসক্তি ত্যজি যোগী, কেবল ইন্দ্রিয়ে করে।
কায়, মন, বুদ্ধি দ্বারা কর্ম্ম, আত্মশুদ্ধি তরে ॥ ১১

লভয়ে নৈষ্ঠিকী শান্তি, যুক্ত, ত্যজি, কর্ম্মফল।
অযুক্ত, কাম প্রবৃত্ত, আবদ্ধ ফলে কেবল ॥ ১২

মনে ত্যজি সর্ব্ব কর্ম্ম, বশী দেহী বাস করে।
—না করি না করাইয়া—সুখে নবদ্বার পুরে ॥ ১৩

না সৃজে লোকের, প্রভু, করম কিম্বা কর্ত্তৃত্ব।
না ফল সংযোগ; স্বভাবে কিন্তু হয় প্রবৃত্ত ॥১৪

বিভু না লয়েন কভু কারো পাপ বা সুকৃত।
অজ্ঞানে আচ্ছন্ন জ্ঞান, তাহে জীব বিমোহিত ॥ ১৫

আত্মজ্ঞানে সে অজ্ঞান কিন্তু যাদের নাশিত ।
করে জ্ঞান, রবি সম, সে পরমে প্রকাশিত ॥ ১৬
তদ্‌বুদ্ধি, তদ্গত আত্মা, তন্নিষ্ঠ, তৎপরায়ণ ।
জ্ঞানে ধৌত পাপ, করে পুনর্জ্জন্ম অতিক্রম ॥ ১৭
বিদ্যা ও বিনয় যুক্ত ব্রাহ্মণে আর শ্বপাকে ।
গো, হস্তী, কুকুরে, দেখে পণ্ডিত সমান লোকে ॥১৮
সাম্যেস্থিত যাঁর মন, ইহ লোকে সর্গজিত ।
ব্রহ্ম,—সম, দোষশূন্য ;—তাই তাঁরা ব্রহ্মে স্থিত ॥ ১৯
প্রিয় লাভে নহে হৃষ্ট, অপ্রিয়ে না বিষাদিত ।
স্থির বুদ্ধি, অসংমূঢ়, ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মে স্থিত ॥ ২০
বাহ্যস্পর্শে অনাশক্ত, লভে যে আত্মায় সুখ ।
ব্রহ্ম যোগে যুক্তাত্মা সে অর্জ্জয়ে অক্ষয় সুখ॥ ২১
দুঃখের কারণ ভূত, সংস্পর্শজ ভোগ যত ।
কৌন্তেয় ! অনিত্য ; তাহে জ্ঞানী নাহি হন রত ॥ ২২
দেহপাত পূর্ব্বে হেথা, রোধিতে সমর্থ যেই ।
কাম ক্রোধ-হেতু বেগ, যুক্ত সুখী নর সেই ॥ ২৩
অন্তর্জ্যোতি, অন্তঃসুখ, যে জন অন্তরারাম ।
যোগী সেই ব্রহ্মভূত, লভয়ে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ ॥ ২৪
লভয়ে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ, ঋষিরা পাপ বিগত ।
দ্বিধাশূন্য, যতাত্মারা সর্ব্বভূত হিতে রত ॥ ২৫
কাম ক্রোধ হীন, বশীচিত্ত, আত্মজ্ঞানবান্ ।
যতিদের উভ-লোকে রহে সে ব্রহ্ম নির্ব্বাণ ॥ ২৬
বাহ্যস্পর্শ বহিঃ রাখি',—ভ্রূযুগ অন্তরে আঁখি,
সম করি প্রাণাপান বায়ু নাসারন্ধ্রচারী ॥ ২৭
যতেন্দ্রিয় বুদ্ধি মন,—যেবা মোক্ষ-পরায়ণ,
সদামুক্ত সেই মুনি ইচ্ছাভয় ক্রোধবারী ॥ ২৮

যজ্ঞ-তপঃ-ফল-ভোক্তা, সর্ব্বলোক মহেশ্বর,

সর্ব্বভূত মিত্র,—মোরে, জানি লভে শান্তি নর ॥ ২৯

শ্রীভবেন্দ্রনাথ দে

ধর্ম্ম]

প্রণব রহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

চৈতন্যের দুইটি মৌলিক প্রবৃত্তি বা প্রবণতা,—অহং ও সর্ব্ব। ছান্দোগ্য শ্রুতি মতে একটির নাম বাক্ অপরটির নাম প্রান্। পুরুষস্য বাক্ রসঃ (১।১।২) বাক্,—পুরুষের রস বা সারভূত। এই কথার মর্ম্ম কি ? পুরুষ শব্দে ইতিপূর্ব্বে চৈতন্যের (Transcendent) পরা ভাবের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই ভাব বা প্রবৃত্তির অন্ত কোথায়, তাহা বুঝাইবার জন্য শাস্ত্র বলিলেন, যে বাক্ই পুরুষের রস বা সার।

অর্থাশ্রয়ত্বম শব্দস্য দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বমেবচ

তন্মাত্রত্বঞ্চ নভসো লক্ষণং কবয়ো বিদুঃ ॥ ভাঃ—৩।২৬।৩৩।

"অর্থাশ্রয়ত্বং—অর্থবাচকত্বং ;—দ্রষ্টুর্লিঙ্গত্বং কুড্যান্তরিতস্য বক্তুর্জ্ঞাপকত্বং—তদুক্ত লিঙ্গংযদদ্রষ্টদৃশ্যয়োরিতি"—শ্রীধর।

অর্থাশ্রয়ত্ব দ্রষ্টা-লিঙ্গত্ব ও তন্মাত্রত্ব এই তিনটি শব্দের লক্ষণ। অর্থের আশ্রয় অর্থাৎ শব্দে তজ্জাতীয় সমস্ত সংস্কার ঘনরূপে থাকে। যেমন কুড্যা বা প্রাচীরের অন্তরালে স্থিত বক্তা অদৃশ্য হইলেও, উচ্চারিত বাক্যের দ্বারা তাহাকে ও তাহার ভাব বুঝা যায়, যেমন ঐ শব্দের দ্বারা এক সঙ্গে তাহার প্রয়োজন তাহার স্বরূপ ও আমার সহিত সম্বন্ধ এই তিনটি ভাবই বুঝিতে পারি, তদ্রূপ বাক্ বা ভগবানের প্রকাশ ভাবে, আমার আমিত্ব সিদ্ধির সহিত ভগবৎ প্রকাশের ইঙ্গিত ও ভগবৎ ইচ্ছা, এই তিনটি সিদ্ধ হয়। জীব ভগবানের ভাষা বা প্রকাশিত শব্দ। ভগবৎ প্রকাশেই পুরুষের রস। Bible শাস্ত্রেও দেখা যায় "In the beginning there was the Word. The Word was with God and

the Word was God," সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষতত্ত্বের সারভূত বাক্ বা জীব প্রকৃতি শ্রীভগবানে পরিসমাপ্ত হইয়া মিশিয়াছিল। তখন "অহম্" বা পুরুষ, পরাভাবে বা "সোহং" রূপে অবস্থিত ছিল। এই বাক্ শরীরী হইয়া (Word made flesh) প্রকৃতির ক্ষেত্রে জীব বা পুরুষরূপে খেলা করে। ইহাই পুরুষের প্রকৃত ভাব। পুরুষের সহিত 'সর্ব্বের' সম্বন্ধ আছে। পুরুষ,—কেন্দ্র ; সর্ব্ব— বৃত্ত। সর্ব্বের সাহায্যে পুরুষ বা অহম্‌কে স্থির করিতে হইবে। রাম শ্যামের পুত্র ; বিভার স্বামী, ও যতীনের পিতা। শ্যামের পুত্রত্ব, বিভার স্বামীত্ব ও যতীনের পিতৃত্ব প্রভৃতিকে 'সর্ব্ব' ভাব বলে ; তদ্দ্বারা রামের আমিটি বাহিরের সর্ব্বের সহিত সম্বন্ধ হইয়া স্থির হইতেছে। সম্মোহন বিদ্যায় রামকে অভিভূত করিয়া রামের 'সর্ব্ব' ভাবগুলি সরাইয়া লইলে, রাম তাহার আমিটিকে "আমি রাম" বলিয়া স্থির করিতে পারে না। এ রহস্য বারান্তরে বিশদ্‌রূপে আলোচিত হইবে। কিন্তু তা'ই বলিয়া রামের 'আমি' সর্ব্বাবস্থায় ঐ 'সর্ব্ব' ভাব মনে রাখিয়া কি কার্য্য করে? সে কি সকল সময়েই 'আমি শ্যামের পুত্র' 'আমি বিভার স্বামী,' 'আমি যতীনের পিতা' এই সম্পর্ক জ্ঞানগুলি মুখস্থ করিতেছে? না, ঐ সম্পর্ক জ্ঞানগুলির দ্বারা রামের আমিত্ব স্থির হইলে, ঐ জ্ঞানগুলি 'আমির' ভিতর লীন হইয়া স্থির ভাবে থাকে ; তখন আর ঐ জ্ঞানগুলি বাহিরে আসিয়া আপন আপন ভাবে খেলিতে প্রবৃত্ত হয় না।—যেমন গর্ভস্থ শিশুর চারিদিকে জরায়ুস্থ কতকগুলি কোষ থাকে ; ঐ কোষগুলির মধ্যে সূক্ষ্মতর কোষগুলি শিশুর চর্ম্ম প্রভৃতিরূপে শিশুর শরীরে মিশিয়া যায়।

ইহাও তদ্রূপ ; প্রকৃতির 'সর্ব্ব'ভাবের উচ্চতর কোষগুলি 'আমির' সহিত মিশিয়া থাকে এবং আত্মজ্ঞানের উদয়ে 'আমির' প্রকৃতি হইয়া যায়। রামের 'আমি' জ্ঞানে, সম্পর্ক জ্ঞানগুলি (Relational mode) ডুবিয়া থাকে ; ও আবশ্যক হইলে অনুরূপ স্মৃতির সাহায্যে সেইগুলি প্রবণতা (Tendency) রূপে প্রকট হইয়া যায়। 'অহং'এ পুর বা দেহের 'সর্ব্ব' ভাব মিশিয়া গিয়া স্থির হয় বলিয়াই, 'আমির' নাম পুরুষ। এই জন্য যতক্ষণ কোন ভাব 'আমির' সহিত মিশাইতে না পারা যায়, ততক্ষণ আমি সক্রিয় বা চঞ্চল থাকে ; স্থির হয় না। উপর হইতে দেখিলে, যখন 'সর্ব্ব' ভাবে আমিকে দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই আমিটি স্থির হয়। ব্যবহারিক জীবনে যখন স্ত্রী, পুত্র ও বাহ্য ঘটনাগুলি

আমাদের ক্ষুদ্র 'আমির' অনুরূপ ভাবে থাকে, তখন বেশ এক মিষ্টতা অনুভব করা যায়, আমিটিও সুস্থির থাকে। কিন্তু ঐ সকল ভাবের যখন ব্যভিচার ঘটে, তখন আমাদের 'আমি' জ্ঞানটিও চঞ্চল হয়। সেই জন্যই আমাদের দেহাত্ম বুদ্ধি ভাঙ্গিবার জন্য ভগবানের করুণা দুঃখ ও বিপদ রূপে আমাদের নিকট উপস্থিত হয়; তদ্দ্বারা আমরা উচ্চ জাতীয় 'আমি'র স্থাপনা করিতে শিখি। 'আমির' বিষয়ে অনেক কথা বলিবার রহিল।

সর্ব্বভাবের ভাষাটি একদিকে যেমন সহজ, অপর দিকে তেমনি জটিল। সকলেই জানেন যে যদি শুধু 'আমি'টি থাকিত ও আমির অবলম্বন বা আধার রূপ 'সর্ব্ব' ভাবগুলি না থাকিত, তাহা হইলে জীবন দুঃসহ হইত। এই 'এক ঘেয়ে' আমিতে অতৃপ্তি হয় বলিয়া, অনেক সময় মানব আত্মঘাতী হয়। সকল ভাব ত্যাগ করিলে, বিশিষ্ট ও প্রকট 'আমি' ভাবটি ত' থাকে না। সেই জন্য 'সর্ব্ব ভাবকে' আমির পাদ বলে। সর্ব্বভাব একেবারে যাইতে পারে না, সেই জন্য ভগবানকেও 'সর্ব্বময়' 'সর্ব্বরস' 'সর্ব্বগন্ধ' ভাবে দেখিতে হয়। "সর্ব্বই ইংরাজির *omni* যথা; omnipresent, omniscient। এই omni বা সর্ব্বই,—হিন্দুর প্রকৃতি। সর্ব্ব বা সর্ব্বাত্মিকা ভাবের উপর অধিষ্ঠিত না হইলে কি জৈবিক কি ঐশ্বরিক 'অহং' সিদ্ধ হয় না। এইজন্য উপনিষদে ভগবানকে নির্ণয় করিতে গিয়া বলা হইয়াছে—

বিশ্বরূপম্ হরিণম্ জাতবেদসম্ পরায়নম জ্যোতিরেকম্ তপন্তং।
সহস্ররশ্মিঃ শতধা বর্ত্তমানঃ প্রাণঃ প্রজানামুদয়ত্যেষ সূর্য্যঃ॥—প্রশ্ন ১।৮

বিশ্বরূপম্ = সর্ব্বরূপম্; অর্থাৎ 'সর্ব্ব' যাহার প্রকাশ ভাব; হরিণম্—রশ্মিবন্তম্, হরণশীলম্ সর্ব্বসংহারকারণম্ অর্থাৎ রশ্মিরূপে যিনি সর্ব্বকে প্রদ্যোতিত করিয়া রশ্মি সংহরণ পূর্ব্বক স্বরূপে স্থিত হন; জাতবেদসম্ = জাতপ্রজ্ঞানম্; জাতানি বেদাংসি সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানানি যস্মাৎ; অর্থাৎ সমস্ত প্রজ্ঞার উৎপত্তি বা যোনি; পরায়নম্ = পরঞ্চ অয়নঞ্চ, অর্থাৎ যিনি সর্ব্বদা পর (transcendent) ও অয়ন বা আশ্রয়; একম্ = অর্থাৎ অদ্বিতীয় ও ভেদশূন্য, তপন্তম্ = অর্থাৎ তাপরূপে সর্ব্বভাবের জনক ও প্রেরয়িতা, সহস্ররশ্মি = অর্থাৎ মন বুদ্ধি প্রভৃতি অনন্তভাবে সর্ব্বকে প্রকাশশীল; শতধাঃবর্ত্তমান = অর্থাৎ অনেক প্রাণীরূপে অবস্থিত; প্রাণঃ প্রজানাং প্রজা সকলের প্রাণ বা প্রেরক শক্তি এই প্রত্যক্ষরূপে সূর্য্য উদিত হইতেছেন।

এখানে দেখুন বিশেষণগুলি সকলেই সর্ব্বভাবের ; কোন্‌টিতে সর্ব্বভাবের উৎপত্তি রূপে সম্বন্ধ (Relation) ; কোন্‌টিতে সর্ব্বভাবে স্থিতি বা প্রকাশক সম্বন্ধ ও অপরগুলিতে 'সর্ব্ব' ভাবের সংহরণ বা লয় সম্বন্ধ উক্ত হইতেছে। কিন্তু সকলেই 'সর্ব্ব'ভাব আছে। এই 'সর্ব্ব' ভাবের মধ্যে, তৎসাহায্যে অহংকে চিনিতে শিখিতে হইবে। ইহাই সার্ব্বজনীন ভ্রাতৃভাবের বীজ।

'সর্ব্ব' স্বরূপে 'অহং' কে দেখিতে হইবে। ইহার জন্য সন্ধ্যা মন্ত্রে সূর্য্যোপস্থানের বিধি আছে ; সে কথা পরে বলিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলব্ধ-বেদান্ত।

কাম]

ভাব-লহরী।

নিরভিমান।

হে বন্ধো ! আজ যদি জাগিয়া থাক, আর তাঁহাকে দেখিতে পাও নাই এমনই হয়, তবে তাঁহার উপর অভিমান করিও না। তিনি তোমার দ্বার হইতে বহুদিন ব্যথিত-চিত্ত লইয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। ত'ার জন্য একটি দিনও তিনিত' অভিমান করেন নাই। তিনি এত অপেক্ষা করিয়াছেন ; আজ তুমি জাগিয়া উঠিয়াছ, আর তিনি আসিতেছেন না দেখিয়া, তাঁহাকে সন্দেহ করিও না। আজ তাঁহার বিলম্ব হইতে পারে ; কিন্তু তুমি অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছ অথচ তিনি আসিবেন না, ইহা হইতে পারে না।

বেসুরা।

এ জগতে সকলের সঙ্গে আমার এত কলহ বিসম্বাদ কেন তা' জান ? কারু সঙ্গে আমার মন মেলে না। আমার মনকে কেমন আমি এক রকম করে তুলেছি ; সে সমনস্ক হতে কিছুতেই পার্‌লো না—সদাই 'অন্য'মনস্ক ! তা'ই সে সংসারে কেবল দুঃখের গানই গাহিয়া বেড়ায়; আনন্দ সঙ্গীতের কোন খবর রাখে না। এই সুমধুর শ্যামল প্রান্তর, এত যে সুন্দর বনভূমি, ওই নীলাকাশ এবং ত'ার বক্ষ শোভিত সদা হাস্যময় সুধাংশু, কলকল সুরে প্রবাহিতা ওই নির্ঝরিণী,

এই সব নর নারীর সুন্দর মুখ, পশু পক্ষী কীট পতঙ্গদের নৃত্য ও কাকলী, সংসারের কত আনন্দ সঙ্গীত ; ত'াই কিছুতেই কা'রু সঙ্গে আমার সুর মেলাতে পারি না। যেন সব তারই বেসুরা বাজে, সবই খাপছাড়া বলে ঠ্যাকে। কিন্তু হয়ত' প্রকৃত কিছুই খাপছাড়া নয়, অসরসও নয়। এ জগতের সমস্ত জিনিষই, প্রত্যেক মানব-মানবী, কীট পতঙ্গটি পর্য্যন্ত, সমস্ত আকাশ—এমন কি এই শ্যামল তৃণগাছটি—এই ধূলিকণা পর্য্যন্ত সমস্তই রসে ভরপুর। সবই সুন্দর, সবই অপরূপ। কিন্তু এই সকল বুঝিবার বা উপলব্ধি করিবার মনের একটি অনুকূল অবস্থার প্রয়োজন ; তা' না হলে সবই মাটি !

কে আমার মনকে বিগড়িয়েছে ? সেতার ত' বাজে মিঠেই বটে, কিন্তু বাজাতে জানা চাই যে। আমি বাজাতে জানি না, ত'াই আমার সেতার রাগ রাগিণী আলাপ করে না ; পদে পদে তার কাণ মলে দিয়ে কেবল তার ছিঁড়ে ফেলি !

মুক্তি।

মুক্তির জন্য ভাব্‌তে হবে না। যেদিন তাঁ'র বাশরী শুন্‌তে পাবে, সেদিন সব দরজাই খুলে যাবে। বন্ধন, মায়া—কিছুর জন্যই আর তখন ভাব্‌তে হবে না, জগতের সব আকর্ষণই তখন ছিন্ন হয়ে যায়, সব বাঁধনই খসিয়া পড়ে। প্রবল বন্যা যখন দুকুল ছাপাইয়া নাচিতে নাচিতে ছুটিয়া চলে, তখন তাহার সেই প্রবল টানে, মোটা মোটা শক্ত কাছিগুলো পট্ পট্ করে ছিঁড়ে যায়। তেমনি ধন, মান, কুল-অভিমান যত শক্তই হ'ক, যত দৃঢ়ই হ'ক, প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া যায় ! সর্প যেমন সুমিষ্ট স্বরে মুগ্ধ হইয়া আপনার খল স্বভাবকে বিস্মৃত হয়, তেমনি হৃদে যখন তাঁর বাঁশি বেজে উঠে, তখন সব রিপু এবং তা'দের সব দৌরাত্ম্য স্বপ্নের মত অদৃশ্য হয়ে যায় ! বাঁশি শুনতে শুনতে মন সরে দাঁড়ায়, কর্ম্ম-বন্ধন খসে পড়ে, সব দরজা খুলে যায়—জগতের মায়ার সম্বন্ধ সব চুকে বুকে যায় ! তখন আর কিছুরই প্রয়োজন থাকে না ! তখন দেখা যায় সর্ব্বত্রই আমার অবাধ গতি, সর্ব্বত্রই "আমি"।

কামায় কামপতয়ে।

(পূর্ব্ব প্রাপ্তির পর)

বিষয়াকর্ষণের ন্যায় বিষয়ে দ্বেষও কামেরই ভাষা। এই ভাষায় আপাততঃ আকর্ষণের বিনিময়ে দ্বেষ ও প্রীতির পরিবর্ত্তে বৈর লক্ষিত হয়। সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামির যে বংশী ধ্বনিতে সকল গোপ গোপী, ধেনু ও রাখালগণ আকৃষ্ট, সেই বংশীধ্বনিও সেই—ব্রজপুরও সেই; তবে জটিলা কুটিলা তাহার বৈরী কেন? কাম-মন্ত্রের আকর্ষণী শক্তি কি সুপ্ত; না লুপ্ত হইয়াছে? না তাহা নহে; ইহাও আক-র্ষণের ব্যতিরেক ক্রম মাত্র। না হ'লে, সেখানে শ্রীমতী অতি সঙ্গোপনে প্রিয়তমের মিলনের জন্য সমাগতা, ঠিক সেইখানেই ধূমাবৃত, বিষানল-বর্ষিণী কুটিলার মূর্ত্তি দেখিতে পাই কেন? ইহাই কামবীজের রূপ ভাব। কাম অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অতি গোপনে প্রবাহিত; ইহার বহির্ব্বিকাশ নাই; অন্তরের টান অতি গভীর ও প্রবল। এই মন্ত্র তোমার 'আমি'কে সর্ব্বের অতি নিকটে লইয়া যায়। কিন্তু বহিঃস্থ ধূম্রবরণের বিশিষ্টতাটুকু পরিত্যাগ করিতে না পারা পর্য্যন্ত "আমি পড়ি-পড়ি—পড়িনা'-ভাবে 'সর্ব্বরূপ সমুদ্র তীরে দাঁড়াইয়া থাকে' ডুবিতে পারে না—ডুবিয়া মরিতে পারে না।

তুমি বাহ্য বা আত্মাতিরিক্ত 'বহু' দেখ; বহু বস্তুর প্রতি তোমার আকর্ষণ অনুভব কর। তুমি মনে কর তুমিই সকলকে চাহিতেছ; সকল যেন তোমাকে চাহে না; তুমি বুঝিতে পার না তুমি যাহাকে সর্ব্বস্ব দিয়া ভালবাস সেই প্রগল্‌ভও তোমার জন্য তোমারই মত আকুল। কিন্তু বাহিরের আবরণ ভেদ করিয়া কাহারও অন্তরের ভাবটী দেখিতে পারিতেছ না বলিয়া, এত হতাশ হইতেছ ও বিরহ সন্তাপে তাপিত হইতেছ। বহির্বস্তুতে তাঁহার আকর্ষণ ভুল কর বলিয়াই ত, তিনি তোমার অভিপ্সিত অনন্ত বস্তুরূপে তোমার কাছে আসিয়া দেখাইয়া দিতেছেন, যে তাঁহার আকর্ষণী মন্ত্র কাম-বীজ কেবল একটী বা এক জাতীয় বস্তুতে বা একমাত্র ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নহে; ইহা বহুত্বে বা বহুত্বের পরিসমাপক সর্ব্বে অধিষ্ঠিত; তিনি সর্ব্বময়। আরো দেখাইতেছেন যে এই কাম অহং-কেন্দ্রেও অধিষ্ঠিত নহে। তাহা হইলে একবার একমাত্র কাম্যবস্তুর লাভে, দ্বিতীয়বার দ্বিতীয় কামবস্তু লাভের লোভে লালায়িত হইতে না। বিশিষ্ট ভেদবুদ্ধিতে ভ্রান্ত রাধারাণী অভিমান বশে সর্ব্বস্ব-

রূপ শ্রীকৃষ্ণকে কুঞ্জাবাস হইতে বিতাড়িত করিয়া, মানের অবসানে, বিরহদহনে দগ্ধীভূত হইয়া, রোদন করিতে লাগিলেন। সখীগণ কতই প্রবোধ দিতে লাগিল প্রাণত' তাহা মানে না ; প্রাণ যে সর্ব্বময়ের পদে বাঁধা পড়ে আছে ; প্রাণের টান যে তাঁহারই দিকে ? এদিকে রসময় নটরাজ দেখিলেন তাঁহার এই মূর্ত্তিতে শ্রীমতীর মানের বাঁধ ভাঙ্গিতে পারিলেন না ; তখন রাধাকুণ্ডতীরে কুন্দলতিকাকে দেখিতে পাইয়া বলিলেন—

(আমার) "মনে উপজয় যেরূপ তিতিক্ষা, নাহি মানে প্রাণে সময় প্রতীক্ষা।
দিয়ে বক্ষে কর, তা'র পরীক্ষা কর, জীবন রক্ষা কর মিলাইয়া ত'ায়।"

"আমি আমার শেষ-চিকিৎসা করিয়া আসিয়াছি ; আমি মানিনীর পদধারণ করিয়াও তাহার মানের ক্ষমা পাই নাই—

বিনা দোষে মোরে উপেক্ষিল রাই
তবু নির্ব্বোধ প্রাণ কাঁদে ব'লে রাই,
(এখন) হা ! রাই, হা ! রাই, ক'রে প্রাণ যদি হারাই
(তাহ'লে) বাঁচ্‌বে না যে রাই,—ভাবি তাই।"

আহা ! সর্ব্বময়ের জীবের প্রতি কি অগাধ প্রেম ! কি প্রবল টান !! বিশিষ্ট জীব যদি আমার সহিত মিলিত হইতে না পারিল, সর্ব্বময় আমি 'সর্ব্ব' র'হিতে পারিলাম না ! আমার সর্ব্বময়ত্বে দোষ পড়িল ! ওগো তাই ;

"আজি এ বিপদে হইয়ে সহায়া
হবে প্রকাশিতে চিরগত মায়া।"

* * * * *

জন্মের মত কেনো দিয়ে রাধিকায়। (কৃষ্ণকমল বিচিত্রবিলাস)

তখন কুন্দলতিকা বলিলেন,—'রসরাজ' তোমার সর্ব্বময় মূর্ত্তি ক্ষণেকের জন্য খর্ব্ব কর ; ছদ্ম আবরণে বিশিষ্টের ভিতর গিয়া বিশেষভাবে, বিশিষ্টকে আকর্ষণ না করিলে, সে আকৃষ্ট হইবে কেন ? তা'ই

"বলি শুন হে নাগর, রসিক সাগর, নটবর শিরোমণি !
সে মানিনীর মান, ভাঙ্গিতে এই সন্ধান,—
সাজ্‌তে হবে তোমায় নবীণা রমণী।" (ঐ)

সর্ব্বস্বরূপ তখন বিশিষ্টের অনুরূপ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন

বিদেশিনী বেশ ধারণ করিলেন ; নাম হইল কলাবতী। নাদ, বিন্দু শক্তির পর যে কলা,—সেই কলাবতী।

এদিকে কৃষ্ণগত-প্রাণা বিরহ বিধুরা শ্রীমতীর দারুণ উৎকণ্ঠাতিশয্য দর্শনে বৃন্দা শ্রীকৃষ্ণান্বেষণে বৃন্দাবনে ;—

যুগল কুণ্ডের তটে উত্তরিল যাইয়া
* * * বসি তমালের তলে
দেখে চূড়া বাঁশি বাঁধা আছে তার ডালে ;

মুগ্ধা বৃন্দা মনে করিল, কৃষ্ণ বুঝি উপেক্ষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। ত'াই মর্ম্ম যাতনায় অধীর হইয়া শ্রীনাথের ত্যক্ত চূড়া বাঁশী লইয়া রাধা-সদনে উপনীতা হইলে—উৎকণ্ঠিত-প্রাণা রাধা শশব্যস্তে জিজ্ঞাসা করিল "কই আমার প্রাণকান্ত কই! তুমি একা ফিরে এলে কেন ?" কৃষ্ণশোক-কাতরা বৃন্দা আনুপূর্ব্বিক সকল ঘটনা বিবৃত করিলেন। শ্রীমতী অমনি কৃষ্ণশোকে মূর্চ্ছিত হইয়া ধরা-শায়িনী হইলেন। শ্রীকৃষ্ণসম-রূপবতী শ্যামলা সখী তথায় উপস্থিত হইয়া যথাযথ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শ্রীমতীকে উৎসঙ্গে স্থাপন করিলেন, অপর 'সখীরা কৃষ্ণ এল' বলে কৃষ্ণ জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। "শ্যামলার অঙ্গ শ্যাম সম গুণ ধরে," তাহার স্পর্শে শ্রীমতী সর্ব্বময়ের স্পর্শানুভবে চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন,—

"প্রেম কল্প-তরুবরে বাড়াবার তরে
সেচিলাম মান জলে * *
* * * * *
(আমার) মান গেল, প্রেম গেল, প্রাণবল্লভ শ্যামও গেল।

শ্যামলা তখন সান্ত্বনাবাক্যে শ্রীমতীকে কহিলেন, "তুমি বুদ্ধিমতী হ'য়ে এমন অবোধ হ'লে কেন ? যে জগতের প্রাণ, তা'র প্রাণ যাওয়া কি সাধারণ কথা! যিনি সর্ব্বময়, তিনি কি প্রাণত্যাগ কর্‌তে পাবেন ? তুমি কি পরম কৃষ্ণতত্ত্ব কি, তাহা জান না ?

তুমি সুচতুরা, সখীরাও চতুরা
তবে কেন সবে এত শোকাতুরা!
কেন না জেনে না শুনে ত্যজিতে চাও প্রাণ!"

এমন সময় বিদেশিনী-বেশধারিণী রসরাজ কুন্দলতাসহ কুঞ্জদ্বারে আবির্ভূত হইলেন। সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ, মাধুরীময়, পর পুরুষকে 'লীলয়া দধতঃ কলা'—কলাবতী বেশে, স্বজাতীয় প্রকৃতির রূপে, দেখিয়া রমণীগণ আনন্দাতিশয্য অনুভব করিতে লাগিল। বিশিষ্ট নামরূপের ভিতর সর্ব্বময়ের অদ্বিতীয়তা কি চাপা থাকে; সকলেই কৃষ্ণভাবের আভাষ পাইল। কহিবে না কেন! তিনি ত' তাই।

আকৃতি প্রকৃতি হেরি, বোধ হয় যেন বংশীধারী
চূড়া বাঁশী পরিহরি রমণী সাজে সাজিল;

কুন্দলতা বিদেশিনীকে কলাবতী বলিয়া পরিচয় দিলেন,—

নাম ইহার কলাবতী, মথুরাপুরে বসতি,
জন্মেছেন দ্বিজরাজ বংশে;
অশেষ গুণের খণি, সঙ্গীতের শিরোমণি,
রূপে গুণে কেবা না প্রশংসে।"

কলাবতী তখন শ্রীমতীর নিদেশক্রমে বীণা যন্ত্রে মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত গাহিলেন; সখীগণ সহ শ্রীমতি মদনমোহনের বীণাতে বাঁশীর গান ও তান (টান) অনুভব করিতে পারিল; বিহ্বল রাধা সেই নারীরূপাকে আলিঙ্গন করিলেন; অমনি তাহার ছদ্মবেশ পড়িয়া গেল। সর্ব্বময়ের মদন-মোহন মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া সকলে আনন্দ-সাগরে নিমজ্জিত হইল। ইহাতেও সর্ব্বময়ের মনের তুষ্টি হইল না। তিনি সেই দ্বেষ্য ভাবের ভিতর দিয়া মিলন সংঘটন করিলেন; বলিলেন,—

যে না পারে আমার নাম গন্ধ সহিতে,
এখন আসিব তাহারই সহিতে।

ছলনাময় তখন এক মজার খেলা খেলিলেন। জটিলার গৃহে যাইয়া জটিলার নিকট তাঁহার প্রকৃত পরিচয়ই দিলেন; সে তাহা বুঝিতে পারিল না। পরিচয়টা এইরূপ—"আমার পিতার বাড়ী বর্ষাণে, কীর্ত্তিদা (যশোদার ভগ্নি) আমার মাসী; সেইখানে রাধার সহিত আমার দেখা হয়েছিল। আজ তাই ছদ্মবেশে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে বড়ই অপমানিত হইয়াছি।" একেত' জটিলা—তা'তে বধূর দোষের কথা। সাত তাড়াতাড়ি বধূর ঘরে এসে, ভারি তর্জ্জন গর্জ্জন করে, বধূর হাত ধরে, গলায় গলায় ধরিয়ে বিবাদ মিটিয়ে দিয়ে গেল; বলে গেল,—

আমার শপথ বাছা উঠ গো সত্বর,
কলাবতী সঙ্গে বাছা আলিঙ্গন কর।
নির্জ্জনে দুজনে কর সুখ আলাপন
একত্র ভোজন, আর একত্র শয়ন।

ফলতঃ ইতিহাস ও পুরাণে প্রায়ই দেখা যায় যে ভগবানের সহিত বৈরভাব করিতে গিয়া অতি শীঘ্রই ভগবৎ সমপবর্ত্তী হইতে পারা যায় বটে; কিন্তু; তাহা তন্ময়তা হইতে পারে নাই। তাহাতে ভগবানের প্রহরীর স্থান পর্য্যন্ত লাভ হয়; অন্তঃপুরে যাইতে পারা যায় না।

সকল মানব হৃদয়ের অহংভাব বিশিষ্টতা রাহু মুক্ত হইয়া পরপুরুষ কৃষ্ণচন্দ্রে লীন হউক। কৃষ্ণের কাম-মন্ত্রাকৃষ্ট রাধারাণী নিত্য রাসমণ্ডলে পরম পুরুষের সহিত লীলামগ্ন থাকুন। হরিঃ ওঁ তৎ সৎ শান্তি! (ক্রমশঃ)

শ্রীচিন্তা—

কাম]

সহজ যোগ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

'সাধ্য'যোগ প্রাকৃতিক; অর্থাৎ প্রকৃতির খেলা গুলিকে এক বিশেষভাবে পুরুষের জন্য প্রয়োগ করিলে, বৃত্তির নিরোধের সহিত পুরুষ ভাবে স্থির হওয়ার নাম যোগ। ইহাতে 'সর্ব্ব'ভাবের প্রবণতা আছে। এক্ষণে প্রকৃতি ও পুরুষ কি, তাহা প্রথমে বুঝিতে হইবে। অনেকে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও এমন কি অহংকার ও মহৎ তত্ত্বের অতীত একটা 'কিম্ভূত কিমাকার' পদার্থকে প্রকৃতি বলেন। কেহ বা গম্ভীর ভাবে "প্রকৃতি কি বুঝ্‌লে না।—প্রকৃতি Root matter, not-I" ইত্যাদি বাক্যে প্রকৃতিকে বুঝাইয়া দিলেন। কেহ বা বলিলেন—ত্রিগুণই প্রকৃতি। কিন্তু আমরা root matter বলিলেও যেরূপ বুঝি, ত্রিগুণ বলিলেও তদ্রূপ। সুতরাং প্রকৃতির বিবেকও হইল না, আমার যোগ করাও হইল না। আর যদি প্রজ্ঞার (Consciousness) অতীত কিছু প্রকৃতি থাকে, তাহা জানিয়া বা বুঝিয়া আমার ইষ্টাপত্তি কিছুই হইতে পারে না।

আমরা মানব চৈতন্যের খেলাগুলি অনুশীলন করিলে দেখিতে পাই যে মান-

বের চৈতন্যে দুইটি আপাতঃ-বিভিন্ন প্রবণতা বা গতিশীলতা (tendency) দৃষ্ট হয়। যাহাই করি বা ভাবি না কেন,—আমাদের বৃত্তিগুলি ইন্দ্রিয়, মন বা যে কোন প্রকারে খেলুক্ না কেন,—ঐ খেলাগুলি একটা 'আমি বোধে' স্থির না হইলে তৃপ্ত হয় না। আমরা দেখিতো,—গাছ, পালা, পশু, পক্ষী, শুনিতো—অ, আ, প্রভৃতি নানা কথা। এ তো গেল ইন্দ্রিয়ের কথা। কামের দ্বারা সুখ, দুঃখ প্রভৃতি নানা প্রকার বোধ করি। মনে সেই বোধগুলিকে সংকল্পিত ও বিকল্পিত করিয়া দেখি। বুদ্ধি দ্বারা সেই বোধ শ্রেণীকে বাহিরের বস্তুর সহিত এক করিয়া দেখি। তবে কেন বল, এই সকল খেলার মধ্যেও "আমি" ও "আমার" বুদ্ধি ফুটিয়া উঠে। যেমন যাদুকর একটি পাত্রে কতকগুলি 'ভূষি' রাখিয়া কাপড় ঢাকা দিয়া তাহা হইতে পরক্ষণে সুন্দর সুস্বাদু আহার্য্য দ্রব্য বাহির করিয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দেয়,—সেইরূপ 'মোটা ভাবে দেখিলে কতকগুলি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি ভাবগুলি একত্র করিয়া, বিশ্বের অন্তরালে স্থিত কোন মহান্ যাদুকর তাহা হইতে একটা 'আমি' বোধ ফুটাইয়া দিতেছেন। যেমন কলিকাতার ফিরিওয়ালা "দুধ আছে, চিনি আছে, সুজি আছে, জল নাই; কেক্, কেক্ গরম," বলিয়া দুধ, চিনি প্রভৃতি সমন্বয়ে এক অদ্ভুত কেক্ পদার্থ আমাদিগকে দেখাইয়া দিল। আমাদের "আমি" জ্ঞানও কতকটা সেইরূপ। ভূপেন দাদা ভাবেন, এটর্ণিগিরি, হুজুগে মাতা কাউন্সিল বা রাজনৈতিক সভার সভ্য হওয়া, বিধবা ও সধবা বিবাহ সমর্থনেই—আমি"। তদ্রূপ সুরেন বাবুর "আমি" ঐরূপ কতকগুলি বৃত্তির সমন্বয় হইতে ফুটিয়া উঠে। পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়ের "আমি"টি,—আবার পোয়াটাক আচার, আধসের শাস্ত্র জ্ঞান, কাঁচ্চাখানেক সংসার-বুদ্ধি সমন্বয়ে ফুটিয়া উঠে। ভূপেন বাবু যখন পরজন্মে আমেরিকায় জন্মগ্রহণ করিবেন, তখন হয় ত' তাঁহার 'আমিটি' সিনেটের সভাপতিত্ব, ব্যবসায়ে লক্ষপতিত্ব প্রভৃতি অন্য জাতীয় ভাব রাশির মধ্যে ফুটিয়া উঠিবে। তাহা হইলে আমি বোধটা কি প্রকৃতপক্ষে বৃত্তিগুলির সমষ্টি? তাহা হইলে বৃত্তির বিপর্য্যয়ে আমিত্ব বদলাইয়া যাইত। আজ পাপ কার্য্যে যে 'আমি' আছে, কাল ধর্ম্মাচরণে অন্য 'আমি' হইয়া যাইত। কিন্তু তাহা ত' হয় না। জন্ম জন্মান্তরের আমিও এক জীবরূপ আমি বোধে এবং বিভিন্ন প্রজাপতি ও মানস-পুত্র রূপ একত্বে স্থির হয়। এইরূপে ক্রমে ক্রমে, স্তরে স্তরে, অহং বোধের লক্ষ্যটি উপরে উঠিতেছে।

প্রবৃত্তিগুলির মধ্যে এই এক 'আমি' ভাবে স্থির হইবার গতি বা প্রবণতাকে পুরুষ বলে। যদি বল জাতি, তত্ত্ব, প্রভৃতি ভাবে বৃত্তিগুলিকে এক করা যায়, তাহা হইলে পুরুষের আবশ্যকতা কি? এ কথার উত্তরে বলি– জাতি, তত্ত্ব প্রভৃতি বুদ্ধিগুলিতে 'আমি' স্থির হয় না। পাপ কার্য্যে আমি পাপী এই জাতি বোধক জ্ঞানটী যদি শেষ কথা হইত, যদি 'আমি' পদার্থটি জাতিগত হইত, তাহা হইলে পাপ ত্যাগ করিয়া পুণ্য আচরণ করিলে, আমি পুণ্যবান' রূপ জাতি বোধে পূর্ব্বেকার 'আমি' হারাইয়া যাইত। ইহাতে বুঝা গেল যে আমি অজাতি বা জন্ম ও জাতি রহিত পদার্থ; জন্ম ও জাতির ভিতর আমির প্রকাশ হয় বটে; কিন্তু আমি উহাতে আবদ্ধ নহে। শুধু জাতি বুদ্ধিতে অর্থাৎ 'আমি' হইতে জাতিকে পৃথক্ করিয়া দেখিলে, জাতিগত ভাবও অসম্পূর্ণ বলিয়া উহাতে অতৃপ্তি আছে। আমি ভিন্ন পরিপূর্ণতা নাই; সেই জন্য বৃত্তিগুলির লয়-স্থান, বা যে 'আমি' বোধে বৃত্তিগুলি অবসান বা স্থির হয়, তাহাকেই আমি বা পুরুষ বলে।

'আমি রাম' এই বুদ্ধিতে অনন্ত ভাব বিকাশ ও বৃত্তির গতি একরূপে স্থির হয়। তাই অনন্ত কার্য্য করিয়া, রাম কার্য্যগুলির বিভিন্নতার মধ্যে, যতক্ষণ 'আমি রাম' বোধটি রাখিতে পারে, ততক্ষণই তাহার তৃপ্তি।

যদি বল স্মৃতিই এই অহং বোধের কারণ; তাহা হইলেও কথাটা বুঝা গেলনা। স্মৃতিদ্বারা অনুভূত বিষয়গুলি বোধরূপে চৈতন্য ক্ষেত্রে, পুনঃ প্রকাশিত হয়। কিন্তু ঐ বিশিষ্ট বোধগুলি হইতে কি প্রকারে 'এক আমি' বুদ্ধি জাগিয়া উঠে, তাহা কে বলিতে পারে? ঐ বিচ্ছিন্ন বোধগুলি হইতে কি প্রকারে স্থির 'আমিটি' প্রকট হয়? ঐ বিচ্ছিন্ন বোধগুলিকে কে একত্র করিয়া রাখিয়াছে? বোধগুলি জাতি জ্ঞানে একত্রিত হয় না; কারণ এক জাতীয় বস্তুর স্মরণ করিতে, অন্য জাতীয় বোধও স্মৃতির ক্ষেত্রে জাগিয়া উঠে। অথচ এই পরস্পর-বিরুদ্ধ ও বিচ্ছিন্ন বোধগুলিকে দেখিয়াও কি অভিনব ভাবে তদ্বিপরীত অহং বোধ স্থির হয়। আজ ধনের কথা ভাবিতে ভাবিতে, বাল্যকালের দারিদ্র্য ভোগের কথা মনে পড়িল; এই দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু এই বিরুদ্ধ প্রবাহ হইতে 'এক আমি' এই জ্ঞান জাগিয়া উঠিল। সুতরাং পুরুষ বা 'আমি' পদার্থটী যদি এই বিভিন্ন স্মৃতির অতীত না হইত, তাহা হইলে এই বিভিন্নতার মধ্যে, বিশ্লিষ্টতার ক্ষেত্রে বৃত্তির অতীত শুদ্ধ আমি জ্ঞান আসিতে পারিত না।

তবে কি 'আমি' অহংকার? দৃক্—দ্রষ্টা বা আমি এবং দর্শন বা চৈতন্যের খেলা যেন এই দুইয়ের একাত্মতার নাম অস্মিতা বা অহংকার। শুদ্ধ 'আমি'র সহিত চৈতন্যের শক্তিগুলি যেন এক হয়। ঐ তাদাত্মকে অস্মিতা বলে।

"দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকাত্মতেবাস্মিতা।" পাতঞ্জল।

উহা সংযোগিনী শক্তিবিশেষ। এই অহংকার তত্ত্বের আকর্ষণে বাহিরের 'সর্ব্ব'ভাবগুলি বিচ্ছিন্ন ও বিশ্লিষ্ট না হইয়া, এক অহং অভিমুখী হয়; বৃত্তি ও শক্তিগুলি 'আমার' ভাবে ভাবিত হয়। আজকাল অনেকেই অহংকার ও অহংএর পার্থক্য বুঝিতে পারেন না।* ইংরাজীতেও 'I by itself I' 'আমি' স্বরূপতঃই 'আমি' এই ভাবে বালকদিগকে বুঝান হয়। কিন্তু অনেক যোগীও 'অহং' যে শুদ্ধ ও নিষ্কল বিশ্বাতিগ পদার্থ, তাহা বুঝেন না। কোনও বৃত্তি থাকুক বা না থাকুক, অহং সর্ব্বদাই আছে। তবে সেই 'অহং' যে কি এইরূপ বিশিষ্টভাবে নির্দ্দেশ করিতে গেলে, তাহাকে সর্ব্বভাবের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেখান আবশ্যক। আজ এই পর্য্যন্ত বলিয়াই ক্ষান্ত হইব যে অহং শুদ্ধ, স্থির, গতিশূন্য; অহংকার প্রাকৃতিক বা সর্ব্বভাবাপন্ন, ঊর্দ্ধ বা অহং-অভিমুখী প্রবণতা বা গতি। অহং অপরোক্ষ; অহংকার পরোক্ষ বা বাহিরের 'সর্ব্বের' সাহায্যে এক অহংকে দেখাইবার প্রবৃত্তি। সাধারণে যে এই প্রভেদ দেখিতে পান না, তাহার আর একটি কারণ আছে। অনেকে শরীর হইতে অতিগ 'আমিকেও' দেখিতে পান না। কিন্তু যখন শারীরিক কার্য্যে অভিমান ত্যাগ করিয়া ঐ কার্য্যগুলির মধ্যে সর্ব্বাত্মিকতা (universality) দেখিতে পাওয়া যায়, যখন কার্য্যগুলির মধ্যে স্বাভাবিক নিয়ম পরিদৃষ্ট হয়, তখন তাহাতে বিশিষ্ট অহং-বোধ থাকে না। এই কথাটী বলিয়াই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। দেহাত্মবোধ নিবিষ্ট বালক যখন হস্ত পদাদি চালনা করে, তখন সে মনে করে যে, ঐ পরিচালনাদিতে তাহার 'আমি'র একটা মস্ত বাহাদুরী দেখান হইতেছে। কিন্তু যখন ঐরূপ পরিচালন, সর্ব্ব দেহীর প্রাণ-ধর্ম্ম ও সর্ব্বাত্মিকা প্রকৃতির স্থূল নিয়মের অনুযায়ী বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখন আর ঐ ক্রিয়াগুলিতে তাহার

* এ বিষয়ে 'অহং ও অহংকার' নামে এই সংখ্যায় প্রকাশিত আধ্যাত্মিক ঘটনাটি দ্রষ্টব্য। পং সং।

অভিমান থাকে না। সেইরূপ সুন্দর প্রবন্ধ লিখিলে, বা নূতন ভাব ভিতরে ফুটিলে, অনেকে ঐ ব্যাপারে আপনার বাহাদুরী বুঝেন। তাঁহারা জানেন না যে ঐ ব্যাপার সর্ব্বাত্মিকা প্রকৃতির মনস্তত্বের ও বুদ্ধিতত্বের খেলামাত্র। অনেকে যোগাভ্যাসে অদ্ভুত ঘটনাদি ঘটিলে, তাহাকে নিজের বা গুরুর বাহাদুরী দেখেন। কিন্তু যখন ঐ ব্যাপারে সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তিটি দেখিতে পাইবেন, তখন আর অহং অভিমানের বৃদ্ধি হইবে না। যেটি সর্ব্বভাবে দেখা যায়, তাহা অহংকারের পুষ্টি করে না। ইহাই গীতার অর্থ ;—

"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মানানি গুণৈঃ ক্রিয়াণি সর্ব্বশঃ
অহংকার-বিমূঢ়াত্মা-কর্ত্তাহং ইতি মন্যতে ॥"

প্রকৃতির কার্য্য প্রকৃতিকে দেওয়ার নাম, সাংখ্যযোগ। যা' তোমার নয়, তা' তুমি কেন দখল করিতে যাও। ইহাই সাংখ্যযোগের মূল সূত্র। তারপর যখন ঐ কার্য্যগুলিতে ভগবানেরই বিকাশ দেখিতে পাইবে, যখন বুঝিবে প্রকৃতির খেলা একমাত্র ভগবানকেই লক্ষ্য করিয়া হইতেছে, যখন "তদর্থ এব দৃশ্যাস্যাত্মা" (পাতঞ্জল ২। ২১) বুঝিয়া প্রাকৃতিক সর্ব্ব ব্যাপারে ভগবানই অর্থ, ইহা বুঝিতে পারিবে, তখন বেদান্তে অধিষ্ঠিত হইয়া এককে লাভ করিবে। সিদ্ধগণের পূর্ব্ব-জন্মার্জ্জিত সর্ব্বাত্মিকা জ্ঞান ও তৎকরণাদি জন্ম-জন্মান্তরে তাঁহাদের 'আমির' সহিত যুক্ত থাকে ; কিন্তু তখনও তাঁহারা মুক্ত নহেন। যখন প্রাকৃতিক ও এমন কি দেহজ সিদ্ধিগুলি জ্ঞানীর স্বভাব বা প্রকৃতিগত হয়, তখনই তিনি প্রকৃতির অতীত হয়েন। এই নিয়মটির মূলে একই তত্ত্ব রহিয়াছে। যে সিদ্ধি গুলি সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির সাহায্যে ভগবানের 'সর্ব্ব'ভাবের বিকাশ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ভগবানের প্রকৃতিগত হয়। আর যাহা জীবের সোপার্জ্জিত বলিয়া বোধ হয়, জীবই তাহার ফলভোগ করিতে থাকে। ভগবান্ যীশু সর্ব্বাত্মিকাভাবে শ্রীভগবান্‌কেই সংসার বন্ধের পরিত্রাতা বুঝিয়া, যখন নিজের মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও ভগবদুদ্দেশে ত্যাগ করিলেন, তখন সেই ত্যাগে সর্ব্বজীবের হৃদয়ে অবিশেষ ভগবদভিমুখী বৃত্তির বীজ পড়িয়া গেল। এই জন্য প্রাকৃতিক সর্ব্ব ব্যাপারের মূলে ভগবান্‌কে দেখিয়া, শ্রীভগবানে ঐ ফল ত্যাগ করেন বলিয়া, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণকে সর্ব্বজীবের মঙ্গলের আকর সিদ্ধগণকে, Initiate বলেন। তাঁহারা এখনও মুক্ত হন নাই, তবে মুক্তির রাস্তায় চলিতেছেন। বৌদ্ধমতে 'ধ্যানী বুদ্ধাবস্থা' মুক্তাবস্থা ;

এ সম্বন্ধে শ্রীমতী ব্লাভাট্‌স্কি বলেন "Mental or intellectual gifts and abstract knowledge follow an Initiate in his new birth; but he has to acquire phenomenal powers anew, passing though all the successive stages. The four degrees of contemplation or Sam-tan (*Sanskrit—Dhyana*) once acquired, everything becomes easy. For once that man has entirely got rid of the idea of individuality, merging his self in the Universal Self, becoming so to say, the bar of steel to which the properties inherent in the loadstone (Adi Buddha or Anima Mundi) are imparted, powers hitherto dormant in him are awakened, mysteries in invisible Nature are unveiled, and becoming a *though—lampa* (a seer) he becomes a *Dhyani Buddha*.—Secret Doctrine.

অর্থাৎ মানসিক সিদ্ধিসমূহ ও অবিশেষ আত্মজ্ঞান পরজন্মে সিদ্ধ পুরুষকে অনুসরণ করে। কিন্তু নানাপ্রকার স্মৃতি ও পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া, বিশিষ্ট প্রাকৃতিক সিদ্ধিগুলি লাভ করিতে হয়। ধ্যানের চারিটী পাদ একবার সাধিত হইলে, সকল বিষয়ই সহজ সাধ্য হইয়া আসে। যেহেতু যিনি একবার মাত্র সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে, বিশিষ্ট 'আমি' বোধকে নিমজ্জিত করিয়া, বিশিষ্টতার সীমা অতিক্রম করিয়া'ছন, যিনি আপনাকে চৌম্বক শক্তির ক্রীড়া-ক্ষেত্র ইস্পাতখণ্ডে পরিণত করিতে পারিয়াছেন, সেই হৃদয়ে এ যাবৎ সুপ্ত শক্তি সকল জাগরিত হইয়া উঠে। তাহাতেই প্রকৃতির রহস্য সমূহ প্রকট হইতে থাকে; তিনি তখন "ধ্যানী বুদ্ধ" হয়েন। সর্ব্বাত্মিকা ভাবে না বুঝিলে, সর্ব্বেতে না দেখিলে, কোন পদার্থই দান করা যায় না। এজন্য বংশানুক্রমে (heredity) জ্ঞান সঞ্চারে বা গুণসঞ্চারে এই নিয়মই দৃষ্ট হয়। শারিরীক ধর্ম্মাদি সর্ব্বাত্মিকা ভাবে দেখা যায় বলিয়া, পিতা হইতে পুত্রে ঐ গুণগুলি অনুস্যূত হয়। কিন্তু সাধনা ও সিদ্ধি প্রভৃতিকে আমরা 'নিজের' বলিয়া ভাবি। সেই জন্যই সাধক স্বীয় সন্ততিতে, ঐ উচ্চজ্ঞান সংক্রমিত করিতে পারেন না। কিন্তু যখন প্রত্যেক জ্ঞানের মূলে ভগবানের পরম তত্ত্ব বা সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায় এবং তত্ত্বগুলিকে 'পরম আমি'তে পরিসমাপ্ত দেখা যায়

যখন এই তত্ত্ব-জ্ঞানের উপর ক্ষুদ্র 'আমিত্বে'র দাবী থাকে না, তখন উহা ভগবানে ন্যস্ত হয় ও আপনা আপনি সর্ব্ব জীবের ভিতর প্রবণতার বীজরূপে থাকিয়া যায়। ইহাই ঋষিগণের মহান্ "যজ্ঞ"। তাঁহারা ভগবানে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করেন, বলিয়াই সর্ব্ব জীবের ভিতর বোধ-সংক্রমণ করিতে পারেন। অথচ এই সংক্রমণে অহঙ্কার নাই। এ বিষয়ে এক মহাপুরুষের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া আজ ক্ষান্ত হইব ;—

Lead the life necessary for the acquisition of such knowledge and powers , and wisdom will come to you naturally. Whenever you are able to attune your consciousness to any of the seven chords of the 'Universal Consciousness,' those chords that run along the sounding-board of Kosmos, vibrating from one Eternity to another ; when you have studied thoroughly the 'Music of the Spheres', then only will you become quite free to share your knowledge with those with whom it is safe to do so

ভাবার্থ এই যে, এবম্বিধ শক্তি ও জ্ঞানার্জ্জনের উপযুক্ত পন্থা অবলম্বন কর। জ্ঞান স্বতঃই তোমার নিকটে আবির্ভূত হইবে। যখনই তুমি তোমার বিশিষ্ট অহং বোধকে সর্ব্বাত্মক অহংএর,—বিশ্ব হইতে বিশ্ব পর্য্যন্ত বিলম্বিত সপ্ত-তন্ত্রীর যে কোনও তন্ত্রীর সহিত সমতানে লয় করিতে সক্ষম হইয়াছ দেখিবে, যখনই তুমি সম্যক্‌রূপে বিশ্বের মহা-সঙ্গীত বা 'ভগবদ্গীতা' আয়ত্ত করিতে পারিয়াছ বুঝিবে, তখনই কেবল তোমার জ্ঞানফল, যাহাদের সহিত তোমার ভোগ করা উচিত, তাহাদের সহিত ভোগ করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে।

(ক্রমশঃ)

শ্রী যোগানন্দ ভারতী।

কাম]

রাস।

পর্জ্জন্য-সলিল স্নাত, স্নিগ্ধ বসুন্ধরা পূত,
পবন পূরিত ফুল্ল মল্লিকার বাসে;
সুনীল গগন তল, সুবিমল ঢল ঢল,
দিক্‌গণ সহ দিক্‌বধূগণ হাসে।

এইত' পূর্ণিমা নিশি, ওইত' শারদ শশি,
এইত' যমুনা বহে কল্লোল-লহরে;
হৃদয়-কদম্ব তলে, ব'সে আমি কুতুহলে,
বাজাও বাশরী, প্রিয়! কামবীজ পুরে।

আজি ছার গৃহ কায, দেহ, গেহ, লোক লাজ;
বিরহ-বিধুরা মুগ্ধা মানসী আমার;
আলু থালু বেণী বাসে, মিলিতে তোমারি রাসে,
রসময়! ঊর্দ্ধশ্বাসে করে অভিসার।

কুঞ্জদ্বার দাও খুলি, ভেদ ভাব যাক ভুলি,
দেখুক 'সবার' মাঝে তোমারি আসন;
এক তুমি একাধারে, সবারই গলে ধরে,
বহুরূপ মাঝে তুমি রাজ প্রাণধন!

একেতে, বহুতে—তুমি, বিশেষে, সর্ব্বেতে— তুমি,
তোমা বিনা স্থূল সূক্ষ্ম কিছু নাহি আর;
তোমারই লীলার নাটে, সংসারে, ভোগের হাটে,
কাম মন্ত্রে ডাকিতেছে বাঁশরী তোমার।

হৃদে তব ভালবাসা, কর্ণ-পুটে তব ভাষা,
সর্ব্ব অঙ্গে জাগে, নাথ! পরশ তোমার।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, তোমারই রূপ দেখি,
তোমারি জ্যোতিতে ভাসে সকল সংসার।

তোমারই সুমধুর;　　　　অশ্ব-গন্ধ ভরপুর,
নিশ্বাসে প্রশ্বাসে প্রাণে বহে প্রাণধন।
যেভাবে, যেদিকে চাই,　　　　দেখি তুমি সব তাই.
'সর্ব্ব' ভাবে বুঝি, প্রিয়, তব আকর্ষণ।

"মুখরা"

অর্থ]

হরিবোলা পাগ্‌লা ছেলে।

একদিন চন্দ্রগ্রহণ যোগে যখন সমগ্র হিন্দুস্থান মধুমাখা হরিবোল হরিবোল' রবে মুখরিত, তখন নবদ্বীপের জনৈক ব্রাহ্মণ-দম্পতীর ঘর আলো করিয়া এক 'হরিবোলা পাগ্‌লার' জন্ম হয়। বালকের অপূর্ব্ব রূপ;—এমনি মোহনরূপ, যিনি দেখিতে আসেন, তিনিই বিমোহিত হইয়া যান। সৌন্দর্য্যের আধার চোখ-দুটীর চাহনিতে যেন দর্শকবৃন্দের হৃদয় কাড়িয়া লয়। পিতা মাতার আনন্দ আর ধরে না। বালকের যেমন অপরূপ রূপ, তেমনি অদ্ভুত ভাব। বালক যখন কাঁদিতে আরম্ভ করে, তখন এক মধুর "হরিবোল হরিবোল" শব্দ ভিন্ন আর কিছুতেই শান্ত হয় না। এমনি তাহার প্রকৃতি,—যেন হরিবোলের অবতার। যিনি বালকের অদ্ভূত চরিত্রের কথা শুনিতেছেন, তিনিই তাহাকে দেখিতে আসিতেছেন ও মন প্রাণ চিরদিনের জন্য তাহার কাছে রাখিয়া যাইতেছেন।

পঞ্চম বর্ষ বয়সেই বালক পিতৃ সন্নিধানে বর্ণমালা শিক্ষা করিয়া, পিতাকে বিস্মিত করিয়া তুলিল। তাহার এমনই অলৌকিক স্মৃতিশক্তি যে, যাহা এক-বার শুনে, তাহা পাষাণের রেখার ন্যায় তাহার চিত্তপটে চিরমুদ্রিত হইয়া যায়।

অতঃপর 'হরিবোলা পাগ্‌লা' ব্যাকরণ অধ্যয়নার্থ নবদ্বীপের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্যের টোলে প্রবিষ্ট হইল। অল্পদিনের মধ্যেই পণ্ডিত গঙ্গাধর—তাহার অমানুষী মেধা দৃষ্টে চমকিত হইলেন। কখন কখন তাহার অলৌকিক কার্য্যগুণে মোহিত হইয়া ভাবিতেন,—"ওকি মানুষ—না শাপভ্রষ্ট দেবতা?

মানুষের ত' কখনও এরূপ শক্তি হইতে পারে বলিয়া জানিতাম না? এ কি শঙ্করাচার্য্য—না বেদব্যাসের অবতার? না, এ যে, আরও অধিক শক্তিধর বলিয়া বোধ হয়; তবে—এ কে?"

এই হরিবোলা ছেলেটী অধ্যয়নে যেমন অদ্বিতীয়, বাল্য চাঞ্চল্যেও তেমনি অসাধারণ। প্রত্যহ টোল হইতে বাহির হইয়া, সমপাঠীদের সহিত খেলা করিতে করিতে দুপুরবেলা সদলবলে গঙ্গায় নামিয়া উদ্দাম জলক্রীড়া করতঃ জল একেবারে কর্দ্দমাক্ত করিয়া তুলিত। অন্য লোকের পক্ষে তখন সে জলে স্নান করা কঠিন হইয়া পড়িত। তা'ছাড়া, হয়ত' কোন ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তি জাহ্নবীতটে বসিয়া ফুল, বিল্বপত্র ও নৈবেদ্যাদি সাজাইয়া চক্ষু মুদিয়া ধ্যান বা পূজা করিতেছেন, পাগ্‌লা তখন চুপে চুপে আসিয়া নৈবেদ্যের কলা ও বাতাসাটী লইয়া পলায়ন করিল,—না হয় ফুল, চন্দন গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া খল্‌ খল্‌ করিয়া হাসিতে লাগিল। ধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিটী যখন চোখ মেলিয়া চাহিলেন, দেখিলেন, বালকটা একটী কাণ্ড করিয়া বসিয়া আছে। যেমন কুপিত হইয়া কিছু বলিতে গেলেন—অমনি বালক বলিয়া উঠিল, "রাগ করিতেছ কেন? এইত' আমি সম্মুখে, তুমি চক্ষু মুদিয়া কাহাকে ধ্যান করিতেছিলে?" বাস্তবিক তাহার দেহে এমনি একপ্রকার জ্যোতি ও মধুর ভাবের সমাবেশ ছিল যে, এরকম অবস্থায়ও কেহ তাহাকে মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহস করিতেন না; তাহার মুখের দিকে চাহিলেই যেন সব ভুলিয়া যাইতেন।

কখনও বা কোন স্ত্রীলোক গঙ্গার ধারে বসিয়া সুদীর্ঘ বেণী খুলিয়া এক মনে জলে কেশ মার্জ্জনা করিতেছেন, পাগ্‌লা ধীরে ধীরে আসিয়া, পরিষ্কৃত কুন্তলদামে কতকগুলি কুম্‌ড়ার বীচি নিক্ষেপ করিয়া চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকটী বিব্রত হইয়া পড়িল; কিন্তু করিবে কি? পাগ্‌লা ততক্ষণে পলায়ন করিয়াছে।

কখনও এমন ঘটিত,—স্নান ঘাটে লোকেরা, তীরে বস্ত্র রাখিয়া, স্নান করিতে নামিয়াছে। পাগ্‌লা আসিয়া একজনের বস্ত্র অন্য একজনের বস্ত্রের স্থানে রাখিয়া, আবার তাহার বস্ত্র অপর একজনের বস্ত্রের স্থানে রাখিয়া একটা মহা বিশৃঙ্খল ঘটাইয়া দূরে সরিয়া গেল।

কোথাও বা কেহ গলাজলে নামিয়া অবগাহন করিতেছে, এখন সময় পাগ্‌লা

দূর হইতে ডুব্‌ দিয়া আসিয়া তাহার পায়ে ধরিয়া টানিতে লাগিত; সে বেচারা কুম্ভীর ধরিয়াছে মনে করিয়া ভয়ে চীৎকার করিত।

'হরিবোলা পাগ্‌লার' এরূপ চপলতা একরূপ নিত্য ক্রিয়ায় পরিণত হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন সে শ্রীহট্টবাসী মুরারি গুপ্ত প্রভৃতিকে "শ্রীহট্টিয়া বাঙ্গাল" বলিয়া ও তাঁহাদের ভাষা লইয়া বিদ্রূপ করতঃ ক্ষেপাইতে চেষ্টা করিত। তাহাতে তাঁহারা উত্তেজিত হইয়া বলিতেন, "আচ্ছা! আমরা ত' শ্রীহট্টিয়া বাঙ্গাল; কিন্তু বল'ত দেখি তোমার পিতা জগন্নাথ পুরন্দর ও তোমার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন প্রভৃতির বাড়ী কোন্‌ দেশে?" পাগ্‌লা এই সব শ্লেষ বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া, তাহাদিগকে আরও বিদ্রূপ করিত। ইহাতে মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি আরো ক্ষেপিয়া উঠিতেন। পাগ্‌লার তাহাতে আনন্দ বাড়িত ও কেবল হাসিত।

তৎকালে নবদ্বীপ বাঙ্গালার সারস্বত কেন্দ্র ছিল; তা'ই বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে অনেকেই উচ্চশিক্ষা লাভার্থ নবদ্বীপে যাইতেন। শ্রীহট্টবাসী জগন্নাথ মিশ্রও বিদ্যাশিক্ষার জন্য নবদ্বীপ গমন করিয়াছিলেন। পরে 'পুরন্দর' উপাধি—লাভ করতঃ তৎকালীন বঙ্গের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষাচার্য্য নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর তনয়া শচীদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়া তথায়ই বাস করিতে থাকেন। আমাদের 'হরিবোলা পাগ্‌লা', শচী ও জগন্নাথের নয়নমণি তাহার 'গৌর,' 'নিমাই' প্রভৃতি অনেক আদুরে নাম আছে। এখন হইতে আমরা তাহাকে তাহার 'আদুরে নামেই' অভিহিত করিব। গৌর বাহিরে হাজার চপলতার কার্য্য করিলেও, পিতা মাতার নিকট যতক্ষণ থাকিতেন, ততক্ষণ সুবোধের ন্যায় কালযাপন করিতেন; তা'ই বাহিরের লোকেরা নিমাইয়ের নামে তাঁহাদের নিকট অভিযোগ করিলে, সহজে তাঁহাদের বিশ্বাস হইত না।

'হরিবোলা পাগ্‌লা' নিমাই ব্যাকরণ পাঠ শেষ করিয়া—ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইলে, 'দীধিতি'-প্রণেতা কুশাগ্রবুদ্ধি একচক্ষু রঘুনাথের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ্য জন্মে। নিমাইকে দেখিলে টোলের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রগণ বড়ই ভীত হইত। কারণ, নিমাই তাহাদের সাক্ষাৎ পাইলেই শাস্ত্রযুদ্ধে আহ্বান করিয়া, তাহাদের লাঞ্ছনার একশেষ করিত। অধিক কি সুবিখ্যাত নৈয়ায়িক রঘুনাথের প্রতিভা-সূর্য্যও তাঁহার নিকট মলিন হইয়া যাইত।

একদা, রঘুনাথ গুরুদত্ত একটী প্রশ্নে বিভোর হইয়া বাহ্যজগৎ ভুলিয়া, মুদিত নয়নে এক বৃক্ষতলে বসিয়া আছেন। পূর্ব্বের সূর্য্য, পশ্চিমে হেলিয়া পড়িয়াছে; অঙ্গে পক্ষী পুরীষ ত্যাগ করিয়াছে; কিন্তু রঘুনাথের সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। নিমাই ভ্রমণ করিতে করিতে, সেই বৃক্ষতলে যাইয়া রঘুনাথকে তদবস্থায় দেখিতে পাইয়া,—তাঁহার ধ্যানভঙ্গ করতঃ জিজ্ঞাসা করিলেন - "ভাই, তুমি কি ভাবিতেছিলে? তোমার গায়ে যে পক্ষীরা বিষ্ঠা-ত্যাগ করিয়াছে, তাহা কি দেখিতে পাও নাই? তোমার এরূপ চিন্তার কারণ কি আমায় বল?" রঘুনাথ তখনও 'হরিবোলা পাগ্‌লা' নিমাইকে চিনিতে পারেন নাই। তাই, তাঁহার মন হইতে "নিমাই – পাগ্‌লা" "নিমাই—ছেলেমানুষ" ইত্যাদি ভাব বিদূরিত হয় নাই; এবং সেই জন্যই যেন একটু অবজ্ঞাভরে বলিলেন, "নিমাই! তুমি ইহা শুনিয়া কি করিবে? ইহা একটী কঠিন সমস্যা, আমি কিছুতেই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিতেছি না।" নিমাই প্রশ্নটী জানিতে চাহিলে, প্রথমতঃ রঘুনাথ বলিতে অস্বীকার করিলেন; পরে নিমাইয়ের 'জেদে' তিনি প্রশ্নটী বলিলেন। নিমাই প্রশ্নটী শুনিবামাত্র তাহার এমনই সুমীমাংসা করিয়া দিলেন যে, রঘুনাথের তখন বিস্ময় ও আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি গৌরকে আলিঙ্গন করিয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। সেই দিন হইতে গৌর পাগ্‌লা' নেহাৎ ছেলেমানুষ' প্রভৃতি ভাব রঘুনাথের মন হইতে অন্তর্হিত হইল। তিনি গৌরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন।

আর একদিন গৌর ও রঘুনাথ এক নৌকায় আরোহণ করিয়া, গঙ্গা পার হইতেছেন; গৌরের হাতে একখানা হস্তলিখিত ক্ষুদ্র গ্রন্থ। তাহার হাতে পুঁথি দেখিয়া রঘুনাথ বলিলেন—"ওহে গৌর! তোমার হাতে ও কি বহি? গৌর সহাস্যে বলিলেন—"ভাই আমি ন্যায়ের একখানা টীকা লিখিতেছি—এ—তাহাই।" রঘুনাথ বলিলেন "আমাকে ও বহিখানা দেখিতে দিবে কি?" গৌর বলিলেন—"সে কি? তুমি আমকে ছোট ভাইয়ের মত আদর কর; অথচ জ্ঞানে ও বয়সেও শ্রেষ্ঠ, তোমাকে আমার বহি দেখাইব না কেন?" এই বলিয়া রঘুনাথের হাতে বহিখানা দিয়া বলিলেন –"এই দেখ ভাই, আমার লেখাটা কিরূপ হইয়াছে?"

রঘুনাথ বহিখানার অল্প একটু পড়িয়াই, আর পড়িতে পারিলেন না। তাঁহার ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল, নয়ন দিয়া অবিরল ধারে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। রঘুনাথকে এরূপ কাঁদিতে দেখিয়া, গৌর অতি বিস্মিত হইয়া কোমল স্বরে বলিলেন,—"ভাই রঘুনাথ! তুমি হঠাৎ এরূপ কাঁদিতেছ কেন? তোমার কি হইয়াছে আমায় বল?" গৌরের সরল সম্ভাষণে রঘুনাথ একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিলেন—"ভাই গৌর! আমার বড় সাধ ছিল যে, ন্যায়ের টীকা লিখিয়া চিরস্মরণীয় হইব; কিন্তু, তোমার এ অমূল্য নিধি ছাড়িয়া, আমার এ ছাই কে পড়িবে? আমি এক পৃষ্ঠায় শত চেষ্টা করিয়া যাহা স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে পারি নাই, তুমি তাহা অতি সংক্ষেপে অথচ সরলভাবে লিপিবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছ।" কোমল-প্রাণ, দয়াল গৌর রঘুনাথের ব্যথা সহ্য করিতে না পারিয়া, তখনি তাঁহার হাত হইতে বহিখানা লইয়া জাহ্নবীর অতল জলে নিক্ষেপ করিলেন। রঘুনাথ আকুল কণ্ঠে "গৌর কি করিলে,—কি করিলে" বলিয়া হায় হায় করিতে লাগিলেন। জগতের একখানা অমূল্য গ্রন্থ চিরদিনের জন্য অন্তর্হিত হইল। কি অলৌকিক ত্যাগ! কি অভাবনীয় দয়া!

'হরিবোলা' গৌরের পাণ্ডিত্যে পণ্ডিত-সঙ্কুলা নবদ্বীপ বিস্মিত হইলেও, তখন পর্য্যন্ত গৌরের চপলতা যায় নাই। তিনি বড় আমোদ প্রিয় ছিলেন। মধ্যে মধ্যে শাক-শব্জী-বিক্রেতা নিরীহ শ্রীধরের নিকট যাইয়া, তাহাকে ক্ষেপাইয়া রঙ্গ করিতেন। কখনও বা বৈষ্ণবদিগকে ক্ষেপাইতেন; এমন কি শ্রীবাসাদি বৈষ্ণবাচার্য্যকেও কটাক্ষ করিতে ছাড়িতেন না। একদিন শ্রীবাসকে বলিয়াছিলেন—"দেখুন আচার্য্য! আমি এমন বৈষ্ণব হইব যে বিধি ও ভব আমার দ্বারস্থ হইবেন।" তখন শ্রীবাস নিমাইকে পাগ্‌লা মনে করিয়া, 'বিষ্ণু বিষ্ণু' বলিয়া চলিয়া গিয়াছিলেন। বাস্তবিকই, হরিবোলা পাগ্‌লা' গৌর এ বাণী কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন। প্রকৃতই বিধি ও ভব তাঁহার দ্বারস্থ হইয়াছিলেন। তিনি পূর্ণত্ব লাভ করিয়াছিলেন। একদিন এই পাগলের প্রেমের বন্যায় "শান্তিপুর ডুবু ডুবু, নদীয়া ভেসে যাওয়ার" উপক্রম হইয়াছিল। আজ এই পাগলের পাগ্‌লামীতে জগৎ পাগল। তাঁহার পাদস্পর্শে ভারত ধন্য; বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল।

শ্রীবিনোদবন্ধু গুপ্ত।

দর্শন-সমন্বয়।

(১)

বিবিধ জ্ঞান-বিজ্ঞানের আকর, আর্য্যগণের লীলানিকেতন, পবিত্র ভারতভূমি যত প্রকার রত্ন প্রসব করিয়াছেন, তন্মধ্যে দর্শন শাস্ত্রের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিলে বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না। যখন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসিগণ ঘোরতর অজ্ঞানে সমাচ্ছন্ন, জ্ঞানালোকের ক্ষীণজ্যোতিঃ মানবের হৃদয়ে অণুমাত্রও প্রবেশ করে নাই, তখন ভারতবর্ষে বহু নর নারীর অন্তঃকরণে এই দার্শনিক ভাব পরিস্ফুট হইয়াছিল। অধিক কি, অনাদিকাল হইতে ভারতে এই পরতত্ত্বের অধ্যয়ন অধ্যাপনা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে। অপৌরুষেয় সনাতন বেদ যাহার মূল, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ যাহার প্রচারক, তাহার ত্রৈকালিকত্ব ও অবিনশ্বরত্ব যে অবশ্যম্ভাবী, তদ্বিষয়ে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই।

এই সংসারে মানব মাত্রেরই একটি প্রধান লক্ষ্য আছে, সে তাহা যতদিন না পায়, ততদিন তাহার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হয় না ; সে তাহার জন্য ইতস্ততঃ ছুটিতে থাকে। বাস্তবিক পক্ষে মানবের প্রকৃত প্রাপ্তব্য কি, তাহা অবশ্য বিবেচনীয়। মানব সুখের আশায় ও দুঃখ-নিবৃত্তির জন্য চারিদিকে ধাবিত হয়, এবং তাহার উপায় অন্বেষণে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত। পরন্তু সুখ এবং দুঃখ নিবৃত্তির প্রকৃত সাধন কি—তাহা জানিতে না পারিয়া লৌকিক সাধনকে অবলম্বন করে। তা'ই ক্ষুধাতুর অন্নের চেষ্টা করে ; তৃষ্ণার্থ বারি আশায় ছুটিয়া বেড়ায় ; বিধুর কামিনীর অন্বেষণ করে। এই সমস্ত লৌকিক সাধনের দ্বারা আপাততঃ কথঞ্চিৎ সুখলাভ ও দুঃখ-নিবৃত্তি হয় বটে ; কিন্তু তাহাতে ঐকান্তিক ও অত্যান্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না। এই জন্য এই সমস্ত সাধনকে অসাধন কিংবা সাধনাভাস বিবেচনা করিয়া, প্রকৃত সাধনের দিকে অগ্রসর হওয়া বিধেয়। সেই সাধন লোক-প্রসিদ্ধ নহে ; শাস্ত্রের আশ্রয় ব্যতীত সেই সাধনকে অবগত হইতে পারা যায় না। সেই শাস্ত্র বেদ ; কিন্তু সেই দুরূহ বেদের অর্থ নিরূপণ করা অতীব কঠিন। তজ্জন্য দর্শন শাস্ত্রের শরণ লইতে হয়। বেদে আপাততঃ নানাবিধ বিরুদ্ধ বাক্য পরিদৃষ্ট হয়, দর্শন শাস্ত্রের সাহায্য ব্যতীত সেই সমুদায় বাক্যার্থ বোধ হইতে পারে না। অতএব বেদের তাৎপর্য্য অবগতির জন্য দর্শন সমূহের আশ্রয় লওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। দৃশ্ ধাতুর করণবাচ্যে

অনট্ বা টন্ প্রত্যয় করিয়া 'দর্শন' পদ নিষ্পন্ন হয়; যদ্দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ পরমার্থতত্ত্ব অবগত হইতে পারা যায়, তাহাকে 'দর্শন' বলা যায়। এই দর্শন ছয় ভাগে বিভক্ত,—ন্যায় বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল (যোগ), পূর্ব্ব-মীমাংসা ও উত্তর-মীমাংসা। গৌতম, কণাদ, কপিল, পতঞ্জলি, জৈমিনি ও ব্যাস এই ছয় জন নিত্য জ্ঞান সম্পন্ন মহর্ষি যথাক্রমে ইহাদের রচয়িতা। চার্ব্বাক, বৌদ্ধ, আর্হত প্রভৃতি আরও অনেক দশন বিদ্যমান আছে; কিন্তু তাহা বেদ বিরুদ্ধ বলিয়া আস্তিকগণের গ্রহীতব্য নহে। শিষ্টগণ তাদৃশ দর্শন সমূহকে আদর করেন না; এবং তদুক্ত বিষয়গুলি মুক্তির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মহর্ষিগণ প্রণীত ন্যায়াদি ছয়টী দর্শনের বিষয় প্রথমতঃ বিচারিত হই তেছে; অবসর ক্রমে অন্যান্য দর্শনেরও সমালোচনা করা যাইবে।

যেমন কোন নরপতির প্রাচীর-বেষ্টিত রমণীয় উদ্যানে, সহকার প্রভৃতি তরু সমূহে নানাবিধ সুস্বাদু ফল বিদ্যমান থাকে, এবং তাহার রক্ষার ভার দৌবারি-কের উপর ন্যস্ত থাকে, তদ্রূপ এই সংসার-মহীরুহের চারিটী শাখায় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ নামক ফল ঝুলিতেছে। চারিটি ফলই মধুর; তন্মধ্যে চতুর্থটি অতি মধুর। প্রথমোক্ত তিনটীর আস্বাদ গ্রহণ করিলে পরিতৃপ্তি হয় বটে, কিন্তু যে একবার চতুর্থটির স্বাদ পাইয়াছে, তাহার আর কোন বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা থাকে না। এই চারিটি ফল বেদরূপ দুর্গ দ্বারা পরিবেষ্টিত; তাহার ছয়টি দ্বার আছে। এক একটী দ্বার অতিক্রম করিয়া অপর দ্বারে প্রবেশ করিতে হয়! এই দ্বারের নাম পূর্ব্বোক্ত 'ন্যায়' 'বৈশেষিক' প্রভৃতি ছয়টি। প্রত্যেক দ্বারে একজন করিয়া রক্ষক দণ্ডায়মান আছে। যদি কোন দুর্বৃত্ত কদর্থ-রূপ অস্ত্রের আঘাতে, কূট প্রহারে ঐ দুর্গটীকে ভঙ্গ করিয়া ফেলে, কেহই উক্ত শূরগণের মধ্যে একটীকেও পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু যিনি সাধু ও সরল, ঐ দুর্গ-স্বামীর উপাসক, তাঁহার কোনরূপ বাধা বিঘ্ন নাই; অনায়াসে ঐ সরল পথে অগ্রসর হইয়া চারিটী ফল আস্বাদন করিতে পারিবেন। কিন্তু ষষ্ঠদ্বার অতিক্রম করিলে, চতুর্থ বা মোক্ষফল প্রাপ্ত হইবেন; তাহার রস আস্বাদন করিলে প্রাণ ও মন জুড়াইবে; আর তাঁহাকে এই নশ্বর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হইবে না, সেই অনন্ত মহাকাশে এক হইয়া যাইবে।

এই দর্শন সমূহ আপাততঃ পরস্পর বিরুদ্ধার্থক বলিয়া প্রতীত হইলেও

উত্তমরূপে বিচার ক'রিয়া দেখিলে কাহরো সহিত কাহারো বিরোধ নাই ; সকলেই একদিকে ছুটিতেছে, সকলেরই লক্ষ্য—একই বস্তু। আপাততঃ পথ ভিন্ন হইলেও, প্রকৃত প্রাপ্তব্য কাহারও ভিন্ন নহে। অধিকারীর তারতম্যে, শাস্ত্রেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে। তা'ই এক একটী সোপানে আরোহণ করিয়া অপরটীর আশ্রয় লইতে হয়। যদি ছয়টী দর্শন পরস্পর বিরুদ্ধ হইবে, তাহা হইলে ছয়টীরই উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য ভিন্ন বুঝিতে হইবে; সুতরাং কোনটীও প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না। গৌতম, কণাদ, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণের সঙ্গে প্রত্যেকেই নিঃসন্দিগ্ধভাবে বেদের তাৎপর্য্য অবগত হইয়াছিলেন ; সুতরাং তাঁহাদের পরস্পর বিরোধ অথবা ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকিতেই পারে না। তাঁহারা পার্থিব লোকের উপকারার্থে পার্থিব ভাষায় শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। লোকে যাহাতে অনায়াসে পরম পথে অগ্রসর হইতে পারে, সেইরূপে শাস্ত্র রচনা করা কর্ত্তব্য ভাবিয়া তাঁহারা আপাততঃ বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছেন ; বস্তুতঃ সকলেরই তাৎপর্য্য ঐ একটীর দিকে।

এই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক তাপত্রয় হইতে আত্মাকে পরিত্রাণ করিবার চেষ্টা সকল মানবেরই দেখিতে পাওয়া যায় ; মুক্তি লাভের জন্য সকলেই ব্যগ্র। সেই মুক্তি সমস্ত দর্শনের অভিমত পদার্থ, ইহা সর্ব্বতন্ত্র-সিদ্ধান্ত।

প্রথমতঃ এই ছয়টী দর্শনকে দুই ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে, প্রমাণ ও প্রমেয়। তন্মধ্যে 'ন্যায়,'—প্রমাণ দর্শন ; অপর কয়টী প্রমেয় দর্শন। প্রমাণ ব্যতীত প্রমেয় নিশ্চিত হইতে পারে না। তা'ই ন্যায় দর্শনে প্রধানতঃ প্রমাণ বিষয়ে বিচার করা হইয়াছে,। 'বৈশেষিক' হইতে আরম্ভ করিয়া 'উত্তরমীমাংসা' পর্য্যন্ত কয়টী দর্শনে প্রমেয় উত্তমরূপে নিরূপিত হইয়াছে ; উত্তরোত্তর দর্শনে প্রমেয়ের উৎকর্ষ প্রদর্শিত হইয়াছে। 'বৈশেষিক' দর্শনে বাহ্য পদার্থ সমীচীন ভাবে বিচারিত হইয়াছে ; অন্যান্য দর্শনে আন্তর পদার্থের বিচার বহু পরিমাণে দর্শিত হইয়াছে। যদ্যপি ন্যায় দর্শনে আত্মা প্রভৃতি প্রমেয় ও তাহার পরীক্ষা বিবেচিত হইয়াছে, এবং অন্যান্য দর্শনে প্রমাণের বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে, তথাপি যাহা প্রধানতঃ বাহুল্যরূপে বিচারিত হয়, লোকে তাহারই ব্যপদেশ করিয়া থাকে। সুতরাং 'ন্যায়ে' প্রমেয় অল্প বিচারিত হইলেও প্রমাণ দৃঢ়রূপে বিচারিত হইয়াছে ; এবং অন্যান্য দর্শনে প্রমাণের কথা সামান্য পরিমাণে থাকিলেও প্রধানতঃ প্রমেয়েরই

বিচার করা হইয়াছে। অতএব 'ন্যায়'—প্রমাণ দর্শন; এবং অপর গুলিকে প্রমেয় দর্শন বলা যাইতে পারে।　　(ক্রমশঃ)

কাব্য-সাংখ্য-বেদান্ত মীমাংসা-দর্শন-তীর্থ-বিদ্যারত্নোপাধিক,শ্রীঅক্ষয়কুমার শাস্ত্রী।

অর্ঘ]

আধ্যাত্মিক ঘটনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

অহং ও অহংকার।

"গতবারে" বিশদ্‌ভাবে "সর্ব্বে আমি" বুঝাইয়াছেন, কিন্তু তাহাতে পূর্ণ বিশ্বাস হয় না কেন? প্রাণ ঘটনার মূল-সত্য গ্রহণ করে, কিন্তু মন ও বুদ্ধি তাহা স্বীকার করিতে নারাজ কেন?

"তাহার কারণ চিত্তের সংস্কার। "চিত্ত" বা চৈতন্যের গ্রহণ শক্তি Receptivity of consciousness; উহা চৈতন্যের স্রোতকে "পর" পুরুষে সমাপ্ত করিবার জন্য খেলে। সদাই পুরুষাভিমুখী বলিয়া, যাহার যেরূপ পুরুষজ্ঞান 'চিত্ত' তাহার ভিতর সেইরূপ ভাবে অবসান হয়। তোমার এখনও 'বাহ্য সত্য' ভাব আছে বলিয়া বোধটী সম্পূর্ণরূপে তোমার 'আমিতে' মিলিতে পারিতেছে না। 'বুদ্ধিগম্য হইতেছে না।"

"বুদ্ধিগম্য কিরূপে হয়?"

বুদ্ধির বিশেষরূপে অবসান বা 'ব্যবসায়' বৃত্তিটী ভাল করিয়া বুঝ। তারপর "অহংকার" বুঝিবে। বুদ্ধি—চৈতন্যের অনুভূত ভাবরাশিকে এক বিশেষ বা পদার্থ ভাবে এক করিবার চেষ্টা করে। চক্ষুর অনুভূত রূপ প্রভৃতি মনের দ্বারা সংযোজিত হয়; ঐ যোগফল বুদ্ধির দ্বারা একাভিমুখী হইয়া এক বিশেষ ভাবে স্থির হয়। "অহংকার",—এই একত্ব ভাবটী যে অহংজাতীয়, ও যে 'আমি বা আমার' তাহা নির্ণয় করিয়া, ভাবগুলিকে 'আমির' সহিত সংযুক্ত করিয়া দেয়। আমিটী ভেদাত্মক হইলে, আমির ভাব প্রকাশ জন্য, আমির বিপরীত ভাবের বাহ্য বোধ আবশ্যক। সেইজন্য যে 'স্থূল আমি' বলিয়া ভাবে, স্থূল বাহ্য বুদ্ধির দ্বারা তাহার 'আমি ভাব' স্থির হয়। বিশেষ ভাব দুই-জাতীয়; এক ভেদমূলক, অপরটী অদ্বৈত। আম্র কি জানিতে গেলে, অন্য বস্তু হইতে আম্রকে ভিন্ন করিয়া দেখি; তাহার কারণ

এই যে আমার আমি-জ্ঞান এখনও ভেদবিশিষ্ট। বস্তুর বিশেষ জ্ঞানে ভেদ আছে; কিন্তু আমার অহংতত্ত্ব ঐ জাতীয় ভেদমূলক নহে।

সত্য বটে 'আমি জ্ঞানী' 'আমি যোগী' ইত্যাকার বাক্যে আমিটী ত' বিশেষ বলিয়া মনে হয়। উহা বাস্তব নহে। কোন বাহ্য ভাব 'আমিতে' সাক্ষাৎ ভাবে পৌছায় না; ও সেইজন্য ভেদভাবে 'আমি' সিদ্ধ হয় না। যে যোগের সহিত সংযুক্ত করিয়া আজি 'আমিকে' যোগীভাবে বিশিষ্ট করিতেছ, কাল মোহের বশে যোগচ্যুত হইলে আমি ত' বদলাইয়া বা হারাইয়া যাইবে না। 'আমি' এই বোধ সদা শাশ্বত স্থির; উহা সর্ব্বভাবের মধ্যে এক অদ্বিতীয় রূপে থাকে।"

"কিন্তু বৃত্তির বিশেষত্ব না থাকিলে ত' 'আমি' বোধটী থাকে না?"

"না তাহা নহে। একটু চিন্তা করিলে বুঝিবে যে বৃত্তিগুলি অহংকার তত্ত্বের এক অহং-অভিমুখী ক্রিয়ার ফলে আমির দিকে আমির সহিত এক হইয়া মিলিতে চায়। অহংকার সর্ব্ব-ভাব-রাশিকে এক করিয়া ত্রিভুজ আকারে পরিণত করিয়া সর্ব্ব বস্তুতে একাভিমুখী গতি দেয়। বুদ্ধিতত্ত্ব ও অহংকারের এই পার্থক্য

বুদ্ধিতত্ত্ব যেন এইরূপ। ক খ গ ঘ—বৃত্তি; এই বৃত্তিগুলির গতি সাধারণতঃ বিভিন্ন দিকে। পুত্র-বুদ্ধি পুত্রের দিকে, স্ত্রী-বুদ্ধি স্ত্রীরূপে ন্যস্ত। এই বিভিন্ন গতিগুলিকে একমুখী করিয়া এককে শেষ করে বলিয়া বুদ্ধির ফল অধ্যবসায়, অর্থাৎ এক অধিকরণে বিশিষ্ট ভাবগুলিকে মিলাইয়া দেয়। অহংকারের মূর্ত্তি এইরূপ। বুদ্ধির একীকরণ শক্তি

যে অহং বা 'আমিতে' অবস্থিত, তাহাই অহংকারের ভাষা। অহংকারের গতি ত্রিভুজাকৃতি উহাতে 'সর্ব্ব'-ভাব-রাশি 'আমির' অভিমুখী হইয়া 'আমি'তে মিশিতে চায়। তবে অহংকারের শুদ্ধ-গতি না বুঝিয়া, আমরা ঐ গতির সহিত বৃত্তির বিশিষ্ট ভাবগুলি রাখিয়া দিই। সেই জন্য যে প্রকার বা জাতীয় বৃত্তি, সেই জাতীয় 'আমি' জ্ঞান হয়। এই অহংকারের তত্ত্ব যখন শ্রীভগবান-রূপ পরম আমির সহিত মিলিত হয়, তখন
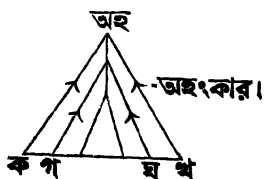
চিত্ত আর বাহ্য দেখে না। তখন 'সর্ব্ব' ভাবের মধ্যে সেই পরম 'আমির' বোধ হয়।

"সন্দেহ হইতেছে? অহংকার কিরূপে প্রকৃত অহংকে বুঝাইতে পারে? শুদ্ধ ও পরম 'আমি' বোধটী সকলেরই আছে; সেইজন্য সকলেই বাহ্য ব্যাপারে, অতিগ-ভাবে 'আমিকে' সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে। শাস্ত্র উহাকে কণ্ঠহার-ন্যায় বলেন। কণ্ঠে হার আছে; অথচ সেই হারটীকে ভ্রমের বশে কণ্ঠে না দেখিয়া 'আমার হারটী বাহিরে হারাইয়া গিয়াছে' ভাবিয়া, নানাস্থানে তাহার অন্বেষণ করিতেছি। বহুমূল্য হারটী হারাইয়াছে বলিয়া কত কষ্ট অনুভব করি; বাহিরে খুঁজিতে কত ব্যস্ত হই। এমন সময় একজন বলিল, "ঐ যে তোমার কণ্ঠেইত' হারটী রহিয়াছে।" অমনি সব কষ্ট, সব দুঃখ, সব ব্যস্ততা ও আগ্রহ দূর হইয়া, অবসান বা শান্ত হইয়া গেল। আমিই আমি'; উহা সদা স্থির ও নিত্যসিদ্ধ। তবে 'আমি কি পশু, আমি কি মানব, আমি কি দেবতা' ইত্যাকার ভাবে বাহিরে সর্ব্বভাবের মধ্যে, সেই এক আমিকে অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়া আমরা অশীতিলক্ষ জন্ম গ্রহণ করি; পরে যখন শাস্ত্র ও শ্রীগুরুদেবের ইঙ্গিতে বুঝিতে পারি যে আমি প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বভাবের অতীত, তখন নিবৃত্ত বা বৃত্তের দিকের গতির অবসান হইয়া, স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হই।

শাখা চন্দ্র ন্যায়টী আরো মধুর। চন্দ্র পৃথিবীর সর্ব্বভাবে অতিগ স্থির পদার্থ। পৃথিবীর বস্তুর সহিত তাহার ত' কোন সম্পর্ক নাই। বস্তুর তারতম্যে চন্দ্রের ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না। মনে কর একজন ব্যক্তি পর বা অতিগ একত্বের জ্ঞান নাই। একদিন রাত্রিকালে দেখিল, যে পৃথিবীর সমস্ত বস্তুগুলি কি এক লাবণ্যে উজ্জ্বলিত; আর একদিন দেখিল উজ্জ্বলতা কমিয়া গিয়াছে; অপর এক দিন দেখিল সর্ব্ব বস্তু ঘনান্ধকারে আবৃত। তাহার দৃষ্টি বস্তু বা নিম্নের দিকে; সুতরাং মনে করিল যে বস্তু গুলির ধর্ম্মই আলোক দেওয়া। চন্দ্রালোক হইতে বস্তুগুলি আদর করিয়া ঘরে লইয়া গেল; দেখিল পূর্ব্বের সে দীপ্তি অন্তর্হিত হইল। এইরূপে বিশিষ্ট ভাবে ব্যাপৃত আমাদের বুদ্ধিও বস্তুগত; আমরা,—

যাহা পাই, তাই ঘরে লয়ে যাই, আপনার মন ভুলাতে।
'শেষে দেখি সব, ঘনে মিশে যায়, জ্যোতিহীন হয়ে তমেতে॥'

জড়বিজ্ঞান জড়ের ধর্ম্মানুশীলনে সেই চন্দ্রালোকের ভাষা বুঝিতে যাইয়া

অতৃপ্ত হইয়া ফিরিয়া আসে। তা'র পর একজন হিতৈষী বলিলেন যে বস্তুর দীপ্তি চন্দ্রের উপর নির্ভর করে; চন্দ্র আকাশে আছেন, উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে তাহাকে দেখিতে পাইবে। বলিলেন,—

"যে জ্যোতি সবেতে হয় প্রকাশিত,
যাহাতে সরব রহে অনুভাত,
সুধাংশু কিরণ—নহে বস্তুগত
হৃদয়-আকাশে ছায়।
সর্ব্বরূপে দেখ 'সম' ভাবে ভাসে—
সবারি মাঝেতে সে জ্যোতি বিকাশে,
পর-বুদ্ধি লয়ে হৃদয় আকাশে
(দেখ) চাঁদিমা বিমল ভায়॥"

তখন চন্দ্রকে একবার দেখিতে বড় সাধ হইল। তখন গুরুদেব 'বি-শাখা' রূপে আছেন;—

হাম যে অবলা হৃদয় অচলা
ভাল মন্দ নাহি জানি—
বিরলে বসিয়া পটেতে লিখিয়া
বিশাখা দেখাল' আনি।

ইহাই, হৃদয়ে কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথম প্রকাশ। চাঁদ ধরিতে গেলাম, দেখিলাম হৃদয়ে প্রতিভাত মূর্ত্তি, তাঁহার প্রতিবিম্ব। বি শাখা বলিল—"ওরূপে পারিবে না। পর বা বিশিষ্টের অতীত, প্রকৃতির 'অতিগ' বুদ্ধি না জন্মিলে তাঁহাকে পাইবে না। চল, সর্ব্ব প্রথমে উর্দ্ধমূল অধঃশাখ অশ্বত্থের নিকটে যাই।" এই বলিয়া প্রাকৃতিক বিকাশ, সংসার বৃক্ষের নিকটে গিয়া আমাকে সর্ব্বভাবের মধ্যে সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি শিখাইয়া দিল। এই বৃক্ষটি কখন বীজ, কখন বা প্রকট বৃক্ষরূপে থাকে; বিশেষ ও অবিশেষ এই দুইটি উহার ভাব। বুঝিলাম, প্রকৃতি বিশেষ ও অবিশেষ গুণপর্ব্বযুক্তা।

বি-শাখা প্রথমে বৃক্ষের ফল দেখাইল; ফলে তৃপ্ত হইয়া ভাবিলাম 'ফল বড় মধুর।' পরে পুষ্প, ও পুষ্প হইতে পল্লব, পল্লব হইতে বৃন্ত, বৃন্ত হইতে ছোট প্রশাখা, প্রশাখা হইতে শাখা, ও শাখা হইতে ত্রিধাবিভক্ত মূল শাখা ও

তৎপরে স্কন্ধদেশে অঙ্গুলি নির্দ্দেশে দেখাইল। বড় আনন্দ হইল; ভাবিলাম 'কত নূতন তত্ত্ব জানিলাম।' এইরূপে কর্ম্ম ফল' হইতে কামনা 'পুষ্প' ও তাহা হইতে মন, মন হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে ত্রিবৃৎ অহঙ্কার ও তাহার মূল প্রকৃতি তত্ত্ব বুঝিয়া বড় খুসী হইলাম। লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া অনেকদিন বৃক্ষের রূপ অনুসন্ধানে নিযুক্ত রহিলাম। তা'র পর, প্রাকৃতিক পর্য্যঙ্কে সুখনিদ্রায় শায়িত আছি —

পালঙ্ক শয়ন রঙ্গে　　বিগলিত কিবা অঙ্গে
নিদ্রা যাই মনের হরষে।

সেই স্বপনে, সেই সুষুপ্তির মধ্যে কে, এক কালশশী—

রূপে গুণে রসসিন্ধু　　মুখছটা জিনি ইন্দু
মালতির মালা গলে দোলে,—
বসি মোর পদতলে　　গায়ে হাত দেই ছলে
"আমা কিন, বিকাইনু" বলে॥

সখি! সে 'গায়ে হাতের' কথা কি বলিব, তাহা বড় মধুর; মধু হইতেও মধুর; অথচ ঘুম ভাঙ্গিয়া দিল বলিয়া, বড় কঠোরে, বড় ভয়াবহ মনে হইয়াছিল।

বি-শাখা বলিল—"তুমি ত' চাঁদ দেখিলে না, তাই কালশশী স্বপনে তোমাকে আহ্বান করিলেন"। পুনরায় বৃক্ষতলে গেলাম; এবার আর গাছ দেখিবার সাধ নাই; আর পত্র পুষ্প লইয়া খেলিবার ইচ্ছা নাই। বি-শাখা অঙ্গুলি নির্দ্দেশে, পত্র হইতে উচ্চ ও উচ্চতর অংশ দেখাইতে লাগিল; কিন্তু তখন প্রাণে, সেই কালশশী দেখিবারই সাধ; কাজেই বিশিষ্ট ডাল পালা দেখিলাম না। তারপর বি-শাখা স্কন্ধদেশে যাই অঙ্গুলি স্থাপন করিল, অমনি বৃক্ষের পার্শ্বে আকাশস্থ নিষ্কল চন্দ্রের বিমল জ্যোতি চক্ষে পড়িল;—অমনি সেই গৌর কান্তি-ছটায় প্রাণ ভরিয়া গেল। দেখিলাম হরিদ্রাবর্ণের রশ্মিগণে সমগ্র বিশ্ব প্লাবিত হইতেছে। দেখিলাম সেই কিরণমালা ঘন হইয়া পরাভাবে কি এক অনিন্দিত স্নিগ্ধ জ্যোতির্ম্ময়ে পরিসমাপ্ত। মনে পড়িল সন্ধ্যার সূর্য্যোপস্থান –"আদিত্যং জাতবেদসং বৃষে বহন্তিকেতবঃ বিশ্বায় বিশ্বং"। ঘন নীলাভের মধ্যে, অরুণ বরণের ঘনত্বের মধ্যে, কি এক পর পদার্থ। বুঝিলাম পত্র হইতে পুষ্প, পুষ্প হইতে বৃন্ত, শাখা প্রশাখা দ্বারা যে জাতীয় ক্রম বা উচ্চ বুদ্ধি জন্মিতে ছিল, এ কালশশীতে

জাতি-বোধ নাই। এ পরে—পরাৎপরে—প্রাকৃতিক ঊর্দ্ধ জ্ঞানের মত, 'গতি' নাই; তিনি গতিশূন্য, স্থির বা অ-গতির গতি। উহাতে বাহ্য পত্র-পুষ্পের ভাব নাই; উহাতে সামান্য নাই, বিশেষও নাই। উহাতে পত্রের সবুজ, পুষ্পের লাল প্রভৃতি কোন রং নাই; উহা নিষ্কল। উহাতে,—পল্লবগণের বহুত্ব যেরূপে বৃন্তে এক হয়, বৃন্তগুলি প্রশাখায় এক হয়, সেইরূপ বহুত্বের সমষ্টি-বাচক সংগ্রহসূচক একত্ব নাই। উহা ঘন এক; উহাতে বহুত্বের লেশ নাই, ভেদ-বিবক্ষা নাই। উহা স্বজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদ শূন্য, অপ্রাকৃত অদ্বিতীয়, এক।

বি-শাখা বলিল—"আমাতে আর পূর্ণচন্দ্রের শাখাস্থভাব নাই; আমার 'আমি' হইতে শাখা-ভাব বিগত হইয়াছে ও আমার দ্বারা শাখা ভাব দূর হয় বলিয়া আমাকে লোকে বি-শাখা বলে।'

'এ বিষয়ে তোমাকে একটী ঘটনা বলিব। পূর্ব্ববর্ণিত ঘটনার দুই বৎসর পরে তাহা সংঘটিত হয়। গুরুদেব দেবাপী ঋষির শরীরে, সর্ব্ব ভাবের সমন্বয় দেখিয়া সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যার আভাষ প্রাপ্ত হইয়া, এই দুই বৎসর তাঁহাকে সর্ব্ব-ভাবে দেখিতে অভ্যাস করিতেছিলাম। তাঁহাতে 'সর্ব্ব' ও 'পর' এতদুভয়ের একতা দৃষ্টে, প্রেমে আমার সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলাম। তিনি আমার জগৎভাবের সর্ব্বভাবে, প্রাণের সর্ব্বক্রিয়াতে, বাসনার সর্ব্ব-আকর্ষণে মনের সর্ব্বসংগ্রহে অধিষ্ঠিত হইয়া, বুদ্ধিদ্বারা সেই সর্ব্বগুলিকে এক করিয়া, পর পুরুষে আমিকে' মিশাইয়া দিতে লাগিলেন বাহিরের সর্ব্বগুলি একভাবে, সহজে, বিনাশ্রমে, তাঁহাতে প্রত্যাহৃত—হইল। তখন,—

দেখিলাম— যাঁহা যাঁহা নিকসয়ে তনু তনু জ্যোতি।
তাঁহা তাঁহা বিজুরী চমৎকার হোতি॥

'সর্ব্ব' বস্তুতেই, তাঁহার মাধুরী চমকিতে লাগিল—
যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ যুগল চলই।
তাঁহা তাঁহা থল কমল দল ফলই॥

তখন— অঙ্গ-ভঙ্গিমা দেখি—প্রেম পূরিত আঁখি
মোর মনে আঁন নাহি চায়।

সুতরাং অমনী হইলাম ; মন আর, তদ্ব্যতীত ভাব গ্রহণ করিতে চায় না। 'অন্তের' ভাষা পড়িয়া গেল ; 'সর্ব্ব প্রত্যয়' গুলি প্রত্যয়রূপে, তাঁহারই অভিমুখী হইয়া অখণ্ড-ধারাতে প্রবাহিত হইল ; সদাই তাঁ'রই ধ্যান, সদাই তাঁ'রই জ্ঞান।

এইরূপে তদ্‌গত ভাবে অনেক দিন ছিলাম। বিরহ প্রেমিক হৃদয়ে যেমন সর্ব্ব বস্তুতেই প্রেমময়ের ভাব জাগাইয়া দেয়, তখন আমারও সেই অবস্থা। সর্ব্ব বস্তুই তাঁহাতে সন্ধিত। তখন জীবনটী সন্ধ্যাময় ; সেই সন্ধিস্থলে-স্থিত চৈতন্যে আলোকিত। একদিন এরূপ ভাবে ধ্যান করিতেছি, এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে কি এক অভিনব 'আমি' হৃদয়ে ফুটিয়া উঠিল। তাঁহার সর্ব্বই জ্যোতি ; সবটুকুই স্বপ্রকাশ ; সে 'আমি না তুমি'—তা' ঠিক বলিতে পারিব না। তাঁহাকে 'আমি' বলিলেও যেরূপ তৃপ্তি, 'তুমি' বলিলেও সেইরূপ।

জাগতিক সময়ের হিসাবে দুইঘণ্টা পরে, বাহ্য প্রবণতা ফিরিয়া আসিল ও আমিটীকে বিশেষভাবে নির্দ্দেশ করিয়া দেখিতে প্রবৃত্তি হইল। কিন্তু কিছুতেই পারিলাম না। মনে হইল এ 'আমিটী' কি ? মনে মনে জিজ্ঞাসা করিলাম,—

কি জাতি　কি নাম তার　　বিহারের ক্ষেত্র আর,
বিশেষ স্বরূপ কিবা তার,
কত শক্তি, কত জ্ঞান,　　কিবা তা'র পরিমাণ,
কিবা রূপ কেমন আকার ?

ভাবে বিহ্বল-চিত্ত, বিকল নির্দ্দেশ-শক্তি, স্তব্ধ হইয়া আছি, এমত সময় সেই চির-পরিচিত শ্রীগুরুদেবের বাণী হৃদয় মধ্যে শব্দহীন ভাষায় বাজিয়া উঠিল। তাঁহার সঙ্গে ভক্তিভরে বলিলাম—'ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ, উগ্রায় বায়ুমূর্ত্তয়ে নমঃ, উগ্রায় অগ্নিমূর্ত্তয়ে নমঃ, ভবায় জলমূর্ত্তয়ে নমঃ, সর্ব্বায় ক্ষিতিমূর্ত্তয়ে নমঃ।' মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে আকাশাদি-ক্রমে নামিয়া আসিয়া স্থূলে জাগ্রত হইলাম। কিন্তু সে 'সর্ব্ব' বিশিষ্ট, ছিন্ন নহে। তাহা প্রত্যেক পদার্থ মধ্যে 'আমি'রূপে পরিসমাপ্ত। একটী বস্তুতেও আর অপূর্ণতার বোধ নাই। কি ক্ষুদ্র কি মহৎ, সকলেই ঐ আমিটী পূর্ণ, পরিপূর্ণ, বাহ্যমন্তরঃ অজঃ। গুরুদেব বলিলেন—"এই সর্ব্ব ভাবই ক্ষিতি-তত্ত্বের মৌলিক ভাব। পার যদি বিশিষ্ট বস্তুর ভেদাত্মক কল্পনা করিতে চেষ্টা কর"। তা'ত, পারিলাম না।

বুঝিলাম, কিরূপে তিনি কৃষ্ণ বা সর্ব্বভাবের পরম আকর্ষক অদ্বয় তত্ত্ব ; প্রত্যেক

রূপে ভক্তের নিকট স্বয়ং দৌত্য করিতেছেন। বুঝিলাম, এই ভাবে তিনি শ্রীরাধার প্রেমে পরমাদ্বৈত ভাব জাগাইয়া দেন।

ধরি নাপ্‌তিনী বেশ মহলেতে পরবেশ
যেখানে বসিয়া তাঁ'র রাই।

রাধার—নাপতিনী বোধটী ভাসিয়া গেল।

আবার মালিনী হইয়া রসিকরাজ
ফুলমালা গাঁথি, ঝুলায়ে হাতে
'কে নিবে কে নিবে' ফুকারে পথে।

আবার দেখি পশারীর বেশে—সেই সর্ব্বাত্মক ভগবান্—
কহয়ে পশারী, "সব' দ্রব্য আছে
যে নিতে চাহ যে ধন",—

বলিয়া,—এ ভবের দোকানদারীতে যেন তিনি বড়ই ব্যস্ত।

চকিতের মধ্যে রূপ পরিবর্ত্তিত হইল। দেখি তিনি, হৃদয় মহলে—"দেয়াসিনী দেশে মহলে প্রবেশি" চৈতন্যের গতি বুঝাইবার জন্য কহিতেছেন,—

"পর পতি সনে, বেঁধেছ পরাণে,
ইহাই দেবতা কয়।

পুনরায় দেখি, সেই সর্ব্বের ঈশ্বর, দেবগণেরও নিয়ন্তা—
বেদিয়ার বেশ ধরি, বেড়ায় সে বাড়ী বাড়ী,
খেলাইয়ে মাল 'পুরন্দর'।

পাছে তাঁহাকে সামান্য সাপুড়ে বলিয়া ভ্রান্তি হয়, তা'ই কহেন যে "আমি সংসার অরণ্যে বাস করি, জগৎ ছাড়া নহি"—

"থাকি বনের ভিতরে 'নাগদমন' বলে
মোর নাম জানে সব জনে।

যে অধঃ-কুণ্ডলিনী শক্তি,—যাহ'তে বিষয়-বুদ্ধি, শরীর-বুদ্ধি জীবে জাগ্রত হয়, তিনি সেই কুণ্ডলিনীর বিষয়-বিষ হরণ করেন। 'সর্ব্বে' থাকেন, অথচ ভক্ত-হৃদয়ে কৃতাধিবাস,—ভক্তের দ্বারাই তাঁহার প্রকাশ ; তা'ই—

"বসন মাগিবার তরে আইনু তোমার ঘরে,
বস্ত্র দেহ আনিয়া আপনি।"

জীব যে সর্ব্ব'ভাব' অর্জ্জন করেন তাহাই ত' তাঁহার প্রকাশ ক্ষেত্র; তবে জীবকে স্বয়ং তাহা দান করিতে হইবে। ছিন্ন অহংবোধে সেই পূর্ণের প্রকাশ হইতেই পারে না। তা'ই বলিলেন ; -

ছেঁড়া বস্ত্র নাহি লব ভাল একখানি পাব,
দেখি দাও "অহমিকা" খানি

আবার দেখি সেই ভব-রোগ-বৈদ্য কহিতেছেন, -

গোকুল নগরে প্রতি ঘরে ঘরে,
বেড়াই চিকিচ্ছা করি—
যে রোগ যাহার দেখি একবার,
ভাল যে করিতে পারি।

পুনরায় দেখি সেই মহা-ঐন্দ্রজালিক,—"যস্যাদ্ভুতং কল্পিতং ইন্দ্রজালং চরাচর ভাতি মনোবিলাশং"—যাহার মনঃকল্পিত ভাব মাত্রই এই বিশ্বরূপে প্রতি-রত, তিনি,—

কুহক লাগাঞা ঝুলি যে খুলিয়া,
মুকুতা বাহির করে।
উগারে বসনে বহু মূল্য ধনে,
রাখে সব পর পরে॥

কিন্তু তিনি ত' সামান্য পারিতোষিক চান না ; তিনি মহাচোর, সর্ব্বের অপহারী। তাই,—

বসন না লয় আর ধন চায়,
কহে ত'—'সবার পাশে—
হিয়ার মাঝারে হেম ঘট আছে,
দিয়া পুর অভিলাষে।'

শুনিলাম— "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং"। ও
"সর্ব্বস্যচাহং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।"

বুঝিলাম— "হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্মনিষ্কলং॥—"

বুঝিলাম অহং বা আমি, এক ও অদ্বিতীয়। তিনি সর্ব্বেই আছেন ; কিন্তু আমরা বিশিষ্ট বুদ্ধি লইয়া ব্যস্ত বলিয়া 'আমিকে' ক্ষুদ্রভাবে সমাপ্ত করিতে চেষ্টা করি। তা'ই সে পরম আমিকে চিনিতে পারি না। তবে ইন্দ্রিয়-ব্যাপার যখন আত্মতত্ত্বের আভাষ দেয়, মনের অনন্ত সংকল্প বা অনুবৃত্তি (association) বিকল্প বা ব্যাবৃত্তি (Difference) হইতে যখন সর্ব্ব-সমন্বয়-বুদ্ধি জাগ্রত হয়—যখন পরা-ভাবে-পরিস্কৃত বুদ্ধির গতির দ্বারা সর্ব্বভাবের অবসান বা পরিসমাপ্তি তত্ত্ব বুঝিতে পারিয়া, মানব সেই পরাগতি সদা হৃদয়ে অনুভব করে, ও তাহার পর অহঙ্কার-তত্ত্বের নিকট 'সেই গতি যে অহং অভিমুখী' তাহা শিক্ষা করিয়া সর্ব্ব ব্যাপারে সেই স-হজ 'আমি'কে দেখিতে পায়, তখন জীবের নিকট তাঁহার স্বয়ং দৌত্য। অহঙ্কার তত্ত্ব না বুঝিলে সাধনা হয় না ; উহা যে সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তি, সর্ব্বজীবে সমান ভাবে খেলিতেছে, তাহা বুঝিলে আর আমরা আমাদের ছোট 'আমি' স্থাপনে ব্যস্ত হই না। তখন ঐ অহমাভিমুখী গতিতে চিত্তের 'সর্ব্ব' ভাব ছাড়িয়া দিলে, সেই টানে শ্রীভগবানে পৌছান যায়। রাস্তায় দেখিলাম লিখা আছে "শ্যামবাজার ষ্ট্রীট"। কিন্তু কেহই ত' এই টিন্ ফলক্‌কে শ্যামবাজার রাস্তা বলিয়া ভাবি না। উহাকে ইঙ্গিত বলিয়াই ত' বুঝি। তদ্রূপ, যখন অহঙ্কারের ইঙ্গিত বা রহস্য শ্রীগুরুদেবের কৃপায় বুঝা যায় তখন 'অহংকে' কাহারও নিজস্ব বলিয়া না বুঝিয়া, উহা যে গতি বা স্রোত মাত্র তাহা আয়ত্ত করিয়া, আর ঐ 'পর' পুরুষাভিমুখী গতিকে ক্ষুদ্র 'আমির' সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করিনা। তখন দেখা যায় যে সর্ব্বভাবের মধ্যে ঐ অহং-প্রবণতা সদাই বর্ত্তমান। তখন ভেদ বা প্রকাশের মোহ ত্যাগ করিয়া, ক্ষুদ্র আমিকে সেই স্রোতে ছাড়িয়া দিলে,—সেই স্রোতই পর-আমি বা 'পর' পুরুষে সমাপ্ত হইয়া স্থির হয়। 'কে বোঝে,—এ কথা বিষম ভারী'। তবে যে বুঝিতে পারিয়াছে, তাহার ত' আর স্থৈর্য্য নাই। এ আকর্ষণ ত' একক্ষণও স্থির নহে ; তোমার জাতি যাইবে, কুল যাইবে, 'সব' যাইবে। তখন মহাপ্রভুর ন্যায় তোমাকে সর্ব্বত্যাগী হইতে হইবে ; তখন তুমিই গাহিবে ;—

কালশশী বাজালে বাঁশী, ছিনু গৃহবাসী করলে উদাসী ;
এখন কুল ত্যেজে হে অকূলে ভাসি
হৃদ-বিহারি ! কোথায় হরি ! পিপাসু প্রাণ তোমায় চায়।

(ক্রমশঃ)

ভারদ্বাজস্য।

পরিচয়

চিনিব বলে তোমারে আজি,
রয়েছি চেয়ে বসে;
কত যে দিন বহিয়া গেছে,
তোমার আশা আশে।
তোমার রথ এসেছে হেথা,
এসেছ তুমি নিজে ;—
তবু তোমায় দেখিনি, নাথ!
ছিলাম চক্ষু বুজে ॥
আজিও হেথা বসিয়া আছি,
তব দরশ তরে ;—
যেরূপে আস, যে ভাবে আস,
ফেলিব আজি ধরে।
ফাঁকি দিয়েছ কত যে মোরে,
লইব তা'রি শোধ ;—
'তুমি যে আছ,' এ জ্ঞান আর,
দিব না হতে রোধ ॥
মরণ মাঝে, আছ যে তুমি
মরণ-রূপ ধরি ;—
দুখের মাঝে, তুমিই আছ,
দেখে না যেন ডরি ॥
বঁধুর বেশে মিলন আশে,
যাচিছ মোরে যত ;—
দিতেছ দেখা হৃদয়-সখা!
হৃদয় হ'তে কত।

তবু যে হায় ভুলিয়া আছি,
তব সুন্দর মুখ ;—
সুখের আশে, ভোগের মাঝে,
(শুধু) কুড়াইয়ে মরি দুঃখ।
কতরূপ যে হে বহুরূপী!
ধরিয়া কর খেলা ;—
সুখ ও দুঃখে রেখেছ পূর্ণ
তোমার নাট্যশালা ॥
প্রিয় যে, তারে লয়েছ কাড়ি ;
দিয়েছ কত ব্যথা ;—
ব্যথার মাঝে, জীবন-সখা,
দিয়েছ তবু দেখা।
"তুমি' সতত 'আমি'র সাথে"
বুঝাতে এই কথা ;—
বেদনা দিয়ে, তাড়না করে,
জাগাও ব্যাকুলতা।
সুখের মাঝে তোমাকে পাই ;
দুঃখে নাহি কি তুমি ?
সুখ দুখ্ যে তোমারি ছায়া,
বুঝেছি তা'গো, স্বামি!
তুমি যে মোর জীবন-বন্ধু,
সবার চেয়ে বড়,
ভুলি না যেন এই কথাটি,
এইটি তুমি কর ॥

মোক্ষ]

'এই—আমি'।

(উত্তর)

"সস্নেহ চুম্বন, গায়ে হাত দেওয়া ;
সবি ত' আমার , দেখ না বুঝিয়া।
এ বিশ্ব সুন্দর, কেন সুখ-ভরা !
কেন প্রীতি-মাখা অমৃতের ছড়া ?
জান না কি তব, প্রাণ যারে চায়,
সেই সর্ব্বঘটে মহিমা বিলায়।
অঙ্কেতে রেখেছি জননী রূপেতে ;
পালন করেছি জনক রূপেতে ;
'ভাই ভগ্নী' হয়ে, দেখ তব সনে
করিতেছি খেলা কত যে যতনে।
'দাস দাসী' হয়ে করিতেছি সেবা,
সেই খাটে, দেখ! তুমি খাট কিবা ?

তবু বল "নাহি, দেখিনু তোমারে,
নিদয় হইয়ে কোথা আছ দূরে" ?
সঙ্গে সঙ্গে তব ফিরি চিরকাল
তবু ভাব অন্য, এ বড় জঞ্জাল !
আছি নিকটেতে, যাও গৃহে তুমি,
যে 'আমি' অন্তরে,—বাহিরে সে
আমি,—
ভাই ভগ্নী আমি,—আমি মাতা পিতা
আমি সখা তব, তনয় দুহিতা।
'তোমা' ছাড়া কভু, নাহি থাকি
'আমি',
আমি যে তোমার,
'আমিরই স্বামী'।

ধর্ম্ম]

প্রণব রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চৈতন্যের 'অহং' ও 'সর্ব্ব' অভিমুখী দুই মহাগতি বা প্রবৃত্তির কথা গতবারে বলিয়াছি। এই দুইটী,—পুরুষ ও প্রকৃতি ক্ষেত্রজ্ঞ ও ক্ষেত্র, প্রভৃতি নামা মিথুন (couple) ভাবে অভিহিত করা হয়। এই দুইটী কোন বিশেষ বস্তু নহে ; কেবল প্রবৃত্তি (Tendency) বা গতি (Trend) মাত্র। উহারা 'সত্য' কোন পদার্থ নহে। কারণ,—যাহার কথন ব্যভিচার হয় না, যাহার যেরূপে অবধারিত হয়, তাহার ব্যতিক্রম হয় না, তাহাই সত্য। "যদ্রূপেণ যন্নিশ্চিতং তদ্রূপং ন ব্যভিচরতি তৎ সত্যং",— শঙ্কর.—তৈত্তিরীয় ভাষ্য। "যদ্বিষয়া বুদ্ধির্ন ব্যভিচরতি

তৎ সৎ; যদ্বিষয়া ব্যভিচরতি তদসৎ ..সর্ব্বত্র দ্বে বুদ্ধিঃ সর্ব্বৈরূপ লভ্যতে সমানাধি। করণে';—গীতা ভাষ্য (২।১৬)। যে বিষয়ে বুদ্ধির একাগ্রতা ভাব বা 'ব্যবসায়' স্থির হয়, তাহা সত্য। যে বিষয়ে তাহা হয় না, তাহা অসৎ। সৎবুদ্ধিকে, প্রকৃত ব্যবসায় বলে। বুদ্ধি, দুইভাবে সর্ব্বের সাহায্যে, সমান-অধিকরণে, রূপলাভ করে। কারণ 'সর্ব্ব' ভিন্ন কোন বস্তুর রূপ হয় না। সমান জাতী বা সমান অধিকরণে 'সর্ব্ব' ভাবকে এক করিলে, 'রূপ' জ্ঞান হয়। একটী আম্রকে সমস্ত আম্রজাতির সহিত সমানাধিকরণে (same denominator) আনিলে বিশিষ্ট দ্রব্যটার 'আম্ররূপ' সিদ্ধ হয়। কিন্তু এইরূপে প্রাকৃতিক সর্ব্ব-ভাব জুড়িতে পারা যায় না বলিয়া, আম্রবুদ্ধি প্রকৃত সৎবুদ্ধি নহে। যাহাতে ব্যক্ত ও অব্যক্ত সর্ব্বভাব, সর্ব্বাবস্থায় একরূপে মিলিতে পারে, তাহাই প্রকৃত সত্য। এ ভাবে দেখিলে, বুঝা যায় যে আমির 'রাম' 'শ্যাম' প্রভৃতি নাম বা 'কেন্দ্র'ভাব, ও বস্তুর স্বভাব বা ধর্ম্ম,—প্রকৃত নহে। প্রকৃতি ও পুরুষ, বা অপরা ও পরা প্রকৃতি কেবল ভগবানের সত্ত্বা বা স্বরূপের অভিমুখী হইয়া, তাঁহাকেই ইঙ্গিত করিবার জন্য খেলিতেছে। উহারা গতি বা চৈতন্যের স্রোত মাত্র। দুরূহ ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদন জন্য শাস্ত্র ব্যাকরণেও তত্ত্ব-কথা কহিয়া গিয়াছেন। যাহা দ্বারা প্রবৃত্তি বা বৃত্তাভিমুখী প্রকাশের মার্গে শুদ্ধ আত্মা যেন ব্যাকৃত (specialise, individualise) হন; এবং নিরোধাভিমুখে যাহা আভাষ দ্বারা সেই ব্রহ্মকে ইঙ্গিত করে, তাহাই হিন্দুর 'ব্যাকরণ' শাস্ত্র। বর্ণগুলিকে মূল প্রকাশ-বীজ (ultimates) বলা যাইতে পারে। এই মৌলিক বীজগুলি, 'স্বর' ও 'ব্যঞ্জন' এই দুই ভাগে বিভক্ত। তন্ত্রশাস্ত্রে 'স্বর' গুলিকে 'সৌম্য' বর্ণ বলে। উহারা মহাযোগিনী বা বিদ্যাভাবের ব্যঞ্জক। উহাতে কেবল সংযোগ ও গতি (flow) আছে, অন্য বিশেষ নাই। ব্যঞ্জনগুলির মধ্যে কতগুলি 'স্পর্শ,' কতগুলি 'অন্তস্থ' ও আর কতকগুলি 'উষ্ম' বর্ণ। উহারা অপরা-বিদ্যার স্থানীয় ও বিশেষভাবে পরিণামাত্মক। অনেকে, তন্ত্র শাস্ত্রের এই বিজ্ঞান কল্পনা-মূলক বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ছান্দোগ্য-ভাষ্যে পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীশঙ্করও এইরূপে বর্ণগুলির ব্যাখ্যা করিয়া তন্ত্র-শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সত্যের আভাষ দিয়াছেন। 'এ' কারটী তাঁহার মতে নির্দ্দেশমূলক (definitive) গতির ব্যঞ্জক। "একার স্তোভ; এহীতি চাহ্বয়ন্তীতি" (ছা-ভাষ্য ১।১৩।১০০।২)

সমস্ত বর্ণমালা, 'ভেদভাব' নামক অসুরগণ কর্ত্তৃক দুষ্ট হইলে, দেবতাগণ মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া ব্যঞ্জন বা বিশিষ্ট প্রকাশ ভাব ত্যাগ করিয়া স্বরের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।" তেণু (ক) বিদিত্বোদ্ধা ঋচঃ সাম্নো যজুষঃ স্বরমেব প্রাবিশন্"। * পুনরায় "কা সাম্নো গতিরীতি স্বরইতি হোবাচ। স্বরস্য কা গতিরীতি প্রাণইতি হোবাচ। † (১।৮।৮৭) দেবতারা বিভিন্নভাবে গৃহীত ঋচঃ প্রভৃতিতে মৃত্যুর প্রবৃত্তি দেখিয়া, স্বর বা প্রণবের গতির বাচক ঊর্দ্ধ-ভাবাত্মক স্রোতে প্রবেশ করিলেন। সামের বা সংযোগিনী বিদ্যাভাবের গতি (trend) কি ? না ;—স্বর। স্বরের গতি কি ? না,—প্রাণ। শ্রুতিবাক্য। আধুনিক ভাষায় বলিতে গেলে উহার ভাবার্থ এই ;—যেমন শরীরে বিশিষ্ট ও বিভিন্ন কার্য্যগুলিকে (function) অবলম্বন করিলে, প্রকাশ-ভাব সিদ্ধ হয় ; কিন্তু উহা মৃত্যু দ্বারা কবলিত। কোষানু (cells) ও তাহাদের কার্য্যকে আমরা 'ব্যঞ্জন বর্ণ' বলিতে পারি। ঐ ব্যঞ্জক ভাবগুলি, সংযোগিনী স্নায়ু-মণ্ডলে অধিষ্ঠিত স্নায়ুর দ্বারা সংহত হইয়া থাকে। এই স্নায়ু বা নাড়ীর কার্য্য সদা পুরুষ বা অহং-অভিমুখী। যদ্দ্বারা এই শরীরস্থ স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণগুলি একত্রিত হইয়া, তাহাদের অতীত শুদ্ধ কেন্দ্ররূপ অহং-তত্ত্বের দিকে প্রধাবিত ও নিয়মিত হয়, যদ্দ্বারা এই বাহ্য ভাবের বীজগুলি 'আমির' দিকে "উৎ + নত" বা উন্নত (converge) হয়) তাহাকে প্রাণ বলে। 'পরম বিশিষ্টে'র দিকে টানিয়া তুলে বা উত্থিত করে বলিয়া, তাহাকে 'প্রাণ' বলে। স্বরগুলি এই ভেদাত্মক প্রকাশভাবে মধ্যে, প্রথমে সংযোগিনী শক্তির ইঙ্গিত করিয়া, বা 'বস্তুর' অতীত গতির (flow) ভাষা বুঝাইয়া দেয়। পরে সেই স্রোতকে যখন 'রাম শ্যাম' প্রভৃতি বিশিষ্ট জীবের নহে বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, যখন এই স্রোতটাকে সেই পরম, অদ্বিতীয় অহং-অভিমুখী বলিয়া বুঝা যায় তখনই প্রাণকে চিনিতে পারা যায়। তা'ই ছান্দোগ্য বলিলেন—"প্রাণ এবোৎ প্রাণেন হ্যত্তিষ্ঠতি, বাগ গী বাগেহগির ইত্যচেক্ষতে ; অন্নং অথ"। ১।৩।৩০।৬ ‡

* লোটাস লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত ছান্দোগ্য উপনিষৎ প্রথম খণ্ড ৬৮ পৃঃ। † ঐ ১০৫পৃ

‡ লোটাস্ লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত ছান্দোগ্যোপনিষৎ ৫৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

"উৎ ইতি অক্ষরে প্রাণ দৃষ্টিঃ ; কথং .প্রাণেন হি উত্তিষ্ঠতি সর্ব্বঃ। বাচোহি গির ইত্যাচক্ষতে শিষ্টাঃ ;—শাঙ্কর ভাষ্য। অর্থাৎ প্রাণই 'উৎ' বা পরা-ভাব ; কারণ প্রাণের দ্বারাই সর্ব্ব বা বিভিন্ন বহুত্বভাব সংহত হইয়া পুরুষাভিমুখী হয় বা উত্থিত হয় ; প্রাণহীনের অবসাদ হয়। 'বাক্য গী,' এইরূপে শিষ্টেরা দেখেন।

'গী' শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে শ্রীশঙ্কর বলেন—"গী গীরণাৎ লোকানাং" লোক সকল বা বহুভাবকে গিলিয়া ফেলে,অর্থাৎ বহুভাব একত্র সংযমিত করিয়া ধারণ করে বলিয়া বাক্ বা নাম বা অহংএর কেন্দ্র-ভাবকে 'গী' বলে। আর অধিষ্ঠানকে 'থ' বলে। ইহাই "স্থা" ধাতুতে আছে॥

অপরা প্রকৃতির সমস্ত খেলা প্রাণ দ্বারা ধৃত হইয়া উন্নত হইতেছে। সেইজন্য মাণ্ডুক্য-কারিকায় প্রাণ বা বীজাত্মা বা মায়োপাধিক ব্রহ্মকে 'সর্ব্ব' ভাবের জনক বলিয়া উক্ত হইয়াছে :—

প্রভব সর্ব্বভাবানাং সতামিতি বিনিশ্চয়ঃ
সর্ব্বং জনয়তি প্রাণ শ্চেতোংশূন্ পুরুষঃ পৃথক্ ॥ ৩

ভাষ্যে শ্রীমদাচার্য্য বলেন—"নহি নিরাস্পদা রজ্জুসর্পমৃগতৃষ্ণিকাদয়ঃ কচিৎ উপলভ্যন্তে কেনচিৎ। যথা রজ্জ্বাং প্রাক্ সর্পোৎপত্তেঃ রজ্জ্বাত্মনা সর্প সন্নেবসীৎ এবং সর্ব্ব ভাবানাং প্রাক্ প্রাণ বীজাত্মনৈব সর্ব্বামতি।" অর্থাৎ আধার বা আস্পদ ভিন্ন, 'সর্পরজ্জু' মৃগতৃষ্ণিকা' প্রভৃতি ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় না। রজ্জুতে সর্প ভ্রান্তির পূর্ব্বে, সর্প রজ্জুতে সৎ বা বর্ত্তমান ছিল ; তদ্রূপ 'সর্ব্ব' ভাবাত্মক প্রকৃতি, প্রাণ বা 'বীজ'রূপ ভাবে ছিল।" এই প্রাণকে হিরণ্যগর্ভ বলা হয়। প্রাণ হইতে ভিন্ন, চেতন বা 'পুরুষ ভাব' হইতে জীবভাব উৎপন্ন হয়। যেমন পিতার অবয়বী-ভাবস্থিত প্রাণশক্তি মাতৃগর্ভে বীজরূপে পতিত হইয়া সর্ব্ব-ভাবাত্মক দেহ নির্ভিন্ন করিলে, তাহাতে পরম 'আত্মার' আভাষরূপ 'আমি' বা জীব ভাব প্রকট হয় ; তদ্রূপ প্রাণাত্মার দ্বারা 'সর্ব্ব'ভাব প্রকট ও উন্নত হইলে, তাহাতে 'পরা' বা জীবভাব প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রকৃতি বা 'সর্ব্ব'ভাবের গতি, প্রাণের দ্বারা 'উন্নত' হইয়া কতকটা পুরুষাভিমুখী হইয়া, পরম পুরুষাভিমুখী হইয়া, সেই অদ্বিতীয় অহংকে প্রকৃষ্ট-রূপে দেখায় বলিয়াই,—প্রকৃতি।" বিষ্ণোরেব পরমপদং দর্শয়িতুং অয়মুপন্যাসঃ (শঙ্কর,—বেদান্ত ভাষ্য ১।৪।৪) "পরম-পুরুষ বিষ্ণুর পরম পদ দেখাইবে বলিয়া অব্যক্ত প্রকৃতির এই খেলা।"

প্রকৃতির এই 'প্রাণ'-গতিকে, সাংখ্য শাস্ত্র 'পরার্থতা' নামে অভিহিত করিয়াছেন। দেবাপি ঋষি প্রকৃতি বা Nature এর এই পরার্থপরতাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য বিজ্ঞানের গতির প্রভেদ এই যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান প্রাকৃতিক সর্ব্ব ব্যাপারকে বিচ্ছিন্ন ভাবে অনুশীলন করিতেছে; পাশ্চাত্য বিজ্ঞান জানেন না যে প্রকৃতির সমস্ত খেলায় পর বা অহং অভিমুখী একটি গতি আছে।

May I ask then...whatever the Laws of Faraday,Tindal and others to do with philanthropy in their abstract relations with humanity as an intelligent whole.........And yet even there scientific facts never suggested any proof to the world of experimenters that Nature... works slowly but incessantly towards the realization of this object—the evolution of conscious life out of inert materials. Occult World.

প্রকৃতির খেলা এই কেন্দ্র বা পরাভিমুখী গতি সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হয়। এই গতিরই, একটা বৃত্তাংশ (arc) মাননীয় বসু মহাশয়ের নবাবিষ্কৃত 'ধাতুগত প্রাণ'। এই গতি আছে বলিয়াই বৃক্ষাদিও পূর্ব্বানুভূত ভাবগুলি সংস্কার-রূপে ধরিয়া রাখে ও সেই সংস্কারের উন্নতির সহিত বৃক্ষজাতির উন্নতি (evolution) দৃষ্ট হয়। এই গতির বশেই পশুগণ মধ্যে ক্রমোন্নতি সাধিত হইতেছে; এই গতির বলেই আমাদিগের শরীরের স্নায়ু গুলি, পূর্ব্বানুভূত বৃত্তিগুলিকে প্রবণতা (tendency) রূপে উর্দ্ধভাবে পরিণত করিয়া সংরক্ষিত করিতেছে। এই কথাই শাস্ত্র বলেন—

মূলপ্রকৃতিরেবৈষা সদা পুরুষসংগতা।
ব্রহ্মাণ্ডং দর্শয়ত্যেষা কৃত্বা বৈ পরমাত্মনে॥

* * * *

তস্যৈষা কারণ সর্ব্বা মায়া সর্ব্বেশ্বরী শিবা। দেবী-ভাঃ ৩।৫১-৬১

এই সর্ব্বাত্মিকা প্রকৃতি সর্ব্বদা 'পুরুষ' অভিমুখিনী; এবং যখন ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেন, তখনও সেই 'পরম অহং'কে অবলম্বন করিয়া ও তাঁহাকে দেখাইবার জন্যই করেন। পুনরায়—

প্রকৃষ্ট বাচকঃ প্রশ্চকৃতিশ্চ সৃষ্টিবাচকঃ
সৃষ্টৌ প্রকৃষ্টা যা দেবী প্রকৃতিঃ সা প্রকীর্ত্তিতা॥

ত্রিগুণাত্মস্বরূপা যা সা চ শক্তিসমন্বিতা
প্রধানা সৃষ্টিকরণে প্রকৃতিস্তেন কথ্যতে। দেবী ভাগবত।

'প্র'শব্দ প্রকৃষ্টতা (uniqueness) বাচক, 'কৃতি' শব্দ সৃষ্টি বা প্রকাশবাচক। যাঁহার সৃষ্টি, সেই প্রকৃষ্ট পরাভাবের ইঙ্গিতের জন্য, তাঁহাকেই প্রকৃতি বলে। ইহাই পাশ্চাত্য দার্শনিক Hegel সাহেবের "The Unconscious becoming conscious to evolve self-consciousness" সুতরাং সর্ব্বাত্মিকা প্রকৃতিকে আমরা উচ্চমুখী ত্রিভুজের ভাবে বুঝিব। উহা প্রকাশিত সর্ব্ব বা অনন্ত ভাবের উপর স্থাপিত; সর্ব্বাত্মিকা বা universality বুদ্ধি উহার আধার; উহা সর্ব্বদা সর্ব্বাভিমুখিনী; ইহাই উপনিষদের প্রাণতত্ত্ব। পুরুষ বা অহং অভিমুখী অপর একটী প্রকৃতি আছে। উহাতে প্রযত্ন নাই; উহা অদ্বিতীয়। "পুরুষ" ও "প্রকৃতি" সম্বন্ধে অনেক কথা বলিবার আছে। তাহা বারান্তরে বিশদরূপে আলোচিত হইবে। আজ 'অহং' শব্দের ভিতর যে নিগূঢ় রহস্য সংরক্ষিত হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য রহস্য-যবনিকা কথঞ্চিৎ মাত্র উদ্ঘাটিত হইবে।

রাম আজ পাপী, পাপ কার্য্যেই ব্যাপৃত। কিন্তু সেই পাপ কার্য্যের বৃত্তিগুলি যখন তাহার অহংজ্ঞানে মিশিয়া যায়, তখন সেই অহং-বোধে কি এক অদ্ভুত স্থৈর্য্য ও পরিসমাপ্তির ভাব লক্ষিত হয়। "তখনই বলেছিলুম, শুন্‌লে না, এখন বুঝলে ত' এই প্রকার ভাবে তাহার 'অহংটী' পাপবৃত্তির উপরে উঠিয়া,এক স্তবভাবে সমাপ্ত হয়। এই জন্য সকলেই সর্ব্বাবস্থায় 'অহংকে' প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতেছে। রাম পুণ্যাত্মা হইল, পাপ পথ ত্যাগ করিল; কিন্তু তখনও কি পাপ জীবনের বৃত্তিগুলি তাহাতে পরিসমাপ্ত হইতেছে না? তখনও সে পাপ জীবনের ভাবগুলি আপনাতে পরিসমাপ্ত করিয়া, গম্ভীরভাবে অন্যকে উপদেশ দেয়,—'তোমরা ত' ভুগে দেখনি; আমি ভুগে দেখিছি বলে বল্‌চি। আমার কথা শোন।" সর্ব্ববৃত্তিগুলি আমিতে পরিসমাপ্ত না হইলে, আমরা সুস্থির হইতে পারি না; যাহা অ হইতে হ পর্য্যন্ত সর্ব্বভাবের বৃত্তিগুলিকে কবলিত করিয়া, ম অর্থাৎ ব্যক্তাতীতভাবে স্থির হইতে প্রয়াস করে, সেই অদ্ভুত চৈতন্য বৃত্তির নাম অহং। 'অ' সর্ব্ববর্ণের ভিতর অনুস্যূত বোধ লক্ষিত করে। উহা দার্শনিক ভাষায়, ব্যক্ত সর্ব্বের আধার বা আস্পদ; 'হ' কে aspirate বা ব্যক্ত বীজ বলে। এই জন্য

ছান্দোগ্যে 'হ্রীংকার'কে আধারভূত মায়াতত্ত্ব বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে উচ্চারণে 'অ' ও 'হ' এ প্রভেদ নাই ; কেবল মাত্র aspirate বা ব্যক্ত বীজ দ্বার বিশেষিত হইয়া অ-ই হ্ রূপ ধারণ করিয়াছে। এই হ্'য়ের মধ্যে স্বর বা দেবতা বাচক, স্পর্শ, অন্তঃস্থ, উষ্ম, প্রভৃতি ব্যঞ্জনা বা প্রকাশের বীজভূত ব্যঞ্জনবর্ণগুলি নিহিত রহিয়াছে ; এই গেল অ—হ্। উহা দেবতা, পিতৃ, প্রজাপতি, সমস্তের প্রকাশ যে মাত্রা বা বীজগুলিকে অধিকৃত করিয়া রহিয়াছে। তারপর ম। 'ম উচ্চারণে ব্যঞ্জন-শব্দ (sound) স্ফোট-রূপে অব্যক্তে মিশিতে যায়। সুতরাং অহং শব্দে সর্ব্ব প্রাকৃতিক ও বৈকারিক ভাব ও সমস্ত তত্ত্বের আধারভূত অথচ এক ও অদ্বিতীয়-স্বরূপ ও সর্ব্বদা ব্যক্ত হইতে পরাভাবে স্থির হইবার প্রবৃত্তি মূলক এক অদ্ভুত চৈতন্যের স্রোতকে ইঙ্গিত করে। ইহাই আমাদের আমি বা অহং ; উহা সর্ব্বকে গ্রাস করিয়া সর্ব্বদা পর ভগবানকে ইঙ্গিত করিবার প্রয়াস করিতেছে। এই জন্য অহংএর ভিতর পাপ ও পুণ্য, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, জ্ঞান ও অজ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য, যাহা কিছু দাও না কেন,—সবই কবলিত করিয়া 'এক আমি' এই পরাভাবে,—দেখ, কাহার দিকে চলিয়া যাইতেছে। এই জন্য আমাদিগকে অহং-তত্ত্বের রহস্য বুঝাইবার জন্য, অনন্ত জন্মে, দেবতা প্রভৃতি অনন্ত যোনির ভিতর দিয়া, ভগবান্ জীবের অহংকে লইয়া যাইতেছেন। অনন্তযোনি পরিভ্রমণে, জীব একদিন বুঝিতে পারে, যে তাহার অহংটী বাস্তবিক বহ্নির ন্যায় সর্ব্বভুক্ ; সর্ব্ব বা প্রাকৃতিক খেলা, তাহার গভীরতার পরিমাণ করিতে পারে না। তখন সে দেখে, যে অগ্নির ন্যায়, প্রকৃতিরূপ কাষ্ঠ হইতে প্রকট হইলেও উহা অগ্নি-শিখারূপে 'কেন্দ্র-জ্ঞান'রূপে, কাষ্ঠ হইতে পরাভিমুখী হইতেছে। উহা সর্ব্বের সহিত খেলা করিয়াও এক : অগ্নির ন্যায় নির্লিপ্ত ও কেবল প্রকাশধর্ম্মী। এই জন্য অহংকে তটস্থা শক্তি বা ব্যঞ্জনা বলিয়া অভিহিত করা হয়।

পর পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত চিত্রে আমরা প্রকৃতির সর্ব্বাত্মিকা পরা-ভাব ও 'অহং' এর বিপরীত ক্রমে সর্ব্বভুক্, সর্ব্বভস্মকারী, কেন্দ্র বা অদ্বিতীয়তা বাচক একত্ব, প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি। পাঠক দেখিবেন, যে প্রকৃতি, বিচ্ছিন্ন, বহুভাবের উপর অধিষ্ঠিত হইয়া কিরূপে সর্ব্বদা, সেই পর, অতিগ ভগবানকে দেখাইবার চেষ্টা করিতেছে। অহং বা পুরুষের গতি ঠিক বিপরীত। উহা শ্রীভগবানের ঘন এক-রস সর্ব্বভাবে প্রতিষ্ঠিত ; অথচ নিজের বিশিষ্টতা বা অদ্বিতীয়তা উপলব্ধি
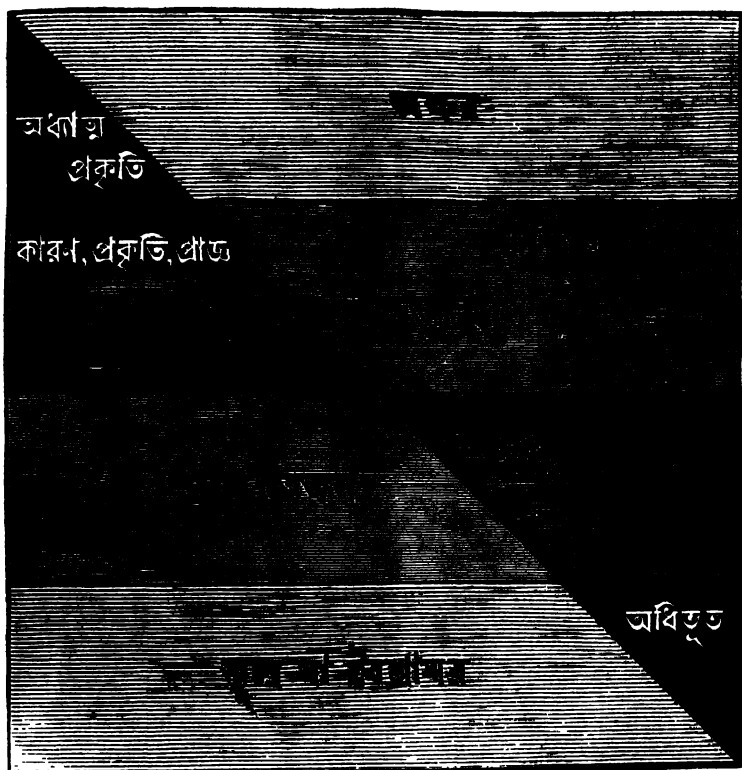
করিবার জন্য 'সর্ব্ব' ভাবগুলিকে, 'বীজ' বা কেন্দ্রভাবে গ্রাস করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। দুইটী যেন দুটী ত্রিভুজ। কিন্তু পাঠক ভুলিবেন না, এই দুইটী স্রোত বা প্রবণতা মাত্র। যে যতগুলি বাহিরের ভাব কবলিত করিতে পারিয়াছে, সে তাহার 'অহংকে' ততটুকু বলিয়া মনে করে। যেমন গঙ্গার স্রোত সাগরাভিমুখী হইলেও, রাম মনে করে যেন উহা তাহাকে 'বৈদ্যবাটীর হাটে' আলু বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। শ্যাম মনে করে যেন স্রোতটী তাহার শ্বশুরালয় কোন্নগরে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য আছে। প্রকৃতির খেলার মধ্যে, কেহ বা ইন্দ্রিয়শক্তি দেখিয়া তৃপ্ত হইতেছেন। কেহ মনস্তত্ত্ব, কেহ বা বুদ্ধিতত্ত্বে প্রকৃতিকে পরিসমাপ্ত মনে করিতেছেন। কিন্তু স্রোত দুইটাই শ্রীভগবানের অভিমুখী। পুরুষরূপে

তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব (transcedence) এবং প্রকৃতিরূপে তাঁহার সর্ব্বাত্মক মহিমা (universality.) দেখাইবার জন্য খেলিতেছে। বারান্তরে আমরা দেখিব—এই দুইটী স্রোতের মূল-ভাষা।

শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলব্ধ-বেদান্ত।

ধর্ম্ম]

উষস্তির ভিক্ষা *

১

শস্য ভরা কুরুদেশ প্রকৃতি শ্যামল বেশ,
দেখা দিল পঙ্গপাল শত ;
মুহূর্ত্তে সে শ্যাম দ্যুতি, ঈশলব্ধ সেই ভূতি,
সকলই হ'ল অপগত।

২

প্রকৃতির অলঙ্কার বড়ই যে শোভা তার—
দস্যুদলে লইল লুটিয়া,
না রাখিল অঙ্গে আর একখানি অলঙ্কার,
পরিধেয় লইল কাড়িয়া।

৩

মরু-ভূমি হ'ল ক্ষেত্র, অশ্রু-ভরা ঋষি-নেত্র,
হেরি এই শোচনীয় দশা !
দুর্ভিক্ষ করাল ছায়া বিস্তারিল নিজ কায়া ;
দুঃখে মৌনী ধরণী বিবশা।

৪

আত্মঘাতী প্রেত মত নর নারী শত শত,
ঘুরিছে ফিরিছে চারিধার।
কঙ্কালাবশেষ দেহ, শ্মশান সদৃশ গেহ ;
দেশময় উঠে হাহাকার।

* ছান্দোগ্য উপনিষদের উষস্তি সংবাদ।

৫

উষস্তি ব্রাহ্মণ সুত, দেহ-মন তপঃ পূত,
বহুদিন থাকি অনশনে—
বালিকা-বধূর সনে ঘোর রাত্রে শূন্য মনে ;
গৃহ ছাড়ি চলিল দুজনে !

৬

নদী, বন, শৈল ভূমি বহুদেশ অতিক্রমি,
পাইল সুভিক্ষ এক দেশ।
হেরিল অনার্য্য ব্যাধে, খায় মাস মন-সাধে ;
কুৎসিৎ বিকট তা'র বেশ।

৭

বহুদিন উপবাসে কাতরে ব্যাধের পাশে,
দাঁড়াইল যাচক সমান।
ভক্ষ্যাভক্ষ্য নাহি মানি অস্ফুট কহে বাণী;
'অন্ন দিয়া বাচাও পরাণ'।

৮

সসম্ভ্রমে কহে ব্যাধ, "কি করেছি অপরাধ,
হে ঠাকুর, কি ভুল বকিছ ?
একে নীচ জাতি, তায় উচ্ছিষ্ট এ মাস কলায় ;
দিতে তুমি কেমনে বলিছ ?"

৯

কহিল ব্রাহ্মণ তবে "অন্ন বিনা মৃত্যু হবে,
প্রাণ-রক্ষা-তরে আমি চাই।"
এতেক কহিয়া ব্যাধে দুইজনা মন-সাধে ;
খেয়ে নিল উচ্ছিষ্ট তাহাই।

১০

ব্যাধ জলপাত্র দিল ; ব্রাহ্মণ নাহিক নিল,
দাড়াইল মুখ করি ভার।
নিষাদ বিস্মিত হ'ল, ক্ষণেক নিস্তব্ধ র'ল ;
ব্রাহ্মণের হেরি ব্যবহার !

১১

"হে ঠাকুর, কি এ ধর্ম্ম! কিবা এর গূঢ়মর্ম্ম ?
উচ্ছিষ্ট খাইতে নাহি দোষ ;
তৃষ্ণা-কণ্ঠাগত প্রাণ, না করিলে জলপান ;
ইথে পুনঃ কর তুমি রোষ !"

১২

ব্যাধের এ বাক্‌ছলে ব্রাহ্মণ হাসিয়া বলে,
"জীব-রক্ষা নরের ধরম ;
"সে ধর্ম্ম রক্ষার তরে, খাইলাম অবহেলে ;
এবে রক্ষা হয়েছে জীবন।

১৩

"রসনা তৃপ্তির তরে লোভ বা যথেচ্ছা-ভাবে,
করি নাই এ নিন্দ্য করম !
"জলপান ইচ্ছাধীন, না পেলে হব না ক্ষীণ ;
তবে কেন ত্যজিব ধরম !"

১৪

উষস্তি এতেক ক'য়ে বালিকা বধূরে লয়ে,
ব্যাধ-গৃহ ছাড়িয়া চলিল।
পবিত্র আশীষ তার ঘেরি ব্যাধে চারিধার ;
শান্তিময় করিয়া রাখিল।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

ধর্ম্ম] মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য।

জড়তত্ত্ব-বাদের প্রভূত প্রচারে যদিও আমাদের চিন্তাশক্তিকে বহির্মুখ করিয়া ফেলিয়াছে, যদিও আমরা আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণের আচার অনুষ্ঠানের প্রতি আজকাল সে অটুট শ্রদ্ধা বহন করি না,—যদিও ঋষি-সেবিত ভারতবর্ষে আর সে তপশ্চর্য্যার বিমল প্রভা দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া তুলে না, যদিও আর উষা-কালে স্থূল জগতে বিহঙ্গ-কাকলীর সহিত ঋষি-বালকদের সুকোমল-কণ্ঠ-নিঃসৃত সামগীতি তপোবন সমূহকে মুখরিত করিয়া রাখে না— ঋষিদের সে অতুল জ্ঞান-প্রবাহ যদিও আজ নিদাঘ-সন্তপ্তা স্রোতস্বতীর ন্যায় আপাততঃ অতিশয় শীর্ণদশা-গ্রস্ত, সুতরাং ভারতের সৌভাগ্যরেখা অস্তোন্মুখ সূর্য্যের ন্যায় যথেষ্ট হীনপ্রভ ও মলিন, তথাপি আমরা এখনও জীবিত রহিয়াছি এবং এখনও আমাদের নাম জগতের ইতিহাসে স্থান পাইতেছে কেন,—এ কথা যখনই ভাবিয়াছি তখনি বিস্মিত হইয়াছি। মৃত্যুর বিরাট্ ছায়া আমাদের চারিধারে ছাইয়া রহিয়াছে; রোগের দারুণ যন্ত্রণায় মুহূর্ত্তও আমরা স্থির নহি; তবু এ জাতির আজিও কেন ধ্বংস ঘটিল না? এ বিষয়টা একটু বিশেষভাবে ভাবিয়া দেখিবার কথা বটে!

আমরা অনেকেই হয়ত' দেখিয়াছি রোগী মৃত্যুশয্যায় শায়িত; চিকিৎসক ভরসা ছাড়িয়া দিয়াছেন, আত্মীয় স্বজনেরা তাঁহার ভাবী বিরহব্যথায় ব্যাকুল,—রোগী স্বয়ং জ্ঞানহীন ও মূর্চ্ছিত; কি জানি এখনও কি একটি অজ্ঞাতসূত্র এই পৃথিবীর সহিত তাহার সম্বন্ধ রক্ষা করিতে যত্নবান্। ভারতবর্ষীয় আর্য্য-জাতিদিগের সহিত এই রোগীর বেশ তুলনা হয়।

অন্তিম নিঃশ্বাসটি পরিত্যাগ করিবার পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত, রোগী যেমন তাহার বিচ্ছেদোন্মুখ শরীরটির সহিত সম্বন্ধ রক্ষা করে, তদ্রূপ ভারতের প্রাচীন রীতি-নীতি ধর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি যদিও সমস্তই প্রায় লোপ পাইয়াছে; তথাপি তাঁহাদের স্থূল বা বাহ্যিক অনুষ্ঠানগুলি পূর্ব্বকালের সহিত এখনও সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

একে জরাগ্রস্ত, তারপর রোগে ধরিয়াছে; এখন তাহার মৃত্যুকে রোধ করিবে কে? বৃদ্ধ শরীরে সমস্ত রোগই প্রবলভাবে আক্রমণ করে: সমস্ত দোষ

আজ তেমনি আমাদিগকে আশ্রয় করিয়াছে। তা'ই আমাদের উদ্যম নাই,—উৎসাহ নাই,—শুভকর্ম্ম করিবার স্পৃহা পর্য্যন্ত নাই; কুক্রিয়াসক্ত, কদাচার-লিপ্ত, রোগ-মসী-ঢালা বীভৎস মূর্ত্তিতে, এক একটি জীবিত প্রেতের মত,—আমরা মৃত্যুর অপেক্ষায় জীবন ধারণ করিতেছি মাত্র। যেন জীবনের আর কোন উদ্দেশ্য নাই, লক্ষ্য নাই। মরিবার সমস্ত আয়োজনই প্রস্তুত; আশ্চর্য্যের বিষয় যে তবু মৃত্যু হইতেছে না।

এ দশা আমাদের হইল, কেন? আমরা সে তপস্তেজ, সে বীর্য্য, হারাইলাম, কিরূপে?—আমরা পাপের গভীর পঙ্কে কেন নিমজ্জিত হইলাম? এ প্রশ্নের সমাধান করা নিতান্ত সহজ নহে! কিন্তু আমাদের কৃত কর্ম্মের যে আমরা এক্ষণে ফলভোগ করিতেছি, সে বিষয়ে সন্দেহ নিরর্থক। ভারতবর্ষের প্রাচীন, পবিত্র-আদর্শ জীবন যাপনের সুন্দর ব্যবস্থা আর আমাদিগকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে না; কারণ আমরা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছি। বর্ত্তমান কালে পাশ্চাত্য শিক্ষা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান তাহাদের বাহিক সম্পদ্, ভোগ-বিলাস ও পারিপাট্য আমাদের চিত্তকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের ঘরের জিনিস হইতে, আমাদের মন সরিয়া গিয়াছে; অথচ পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রকৃত আদর্শও গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। এ অবস্থায় আমাদের উভয় বিভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনাই অধিক। সুতরাং যদি আমরা কোন প্রতীকারের পন্থা অবলম্বন না করি, তবে 'মৃত্যুই' আমাদের অনিবার্য্য নিয়তি।

প্রত্যেক দেশের, প্রত্যেক সমাজের এক একটি বিশেষ ভাব বা বিশেষত্ব থাকে। সেই ভাবকে ফুটাইয়া তোলাই, সেই দেশের প্রাণ-সঞ্চারের পক্ষে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ উপায়। হিন্দু সমাজের বিশেষত্ব,—ইহার **ধর্ম্মপ্রাণতা**। কি ব্যক্তিগত জীবন যাত্রা প্রণালী, কি সামাজিক রীতি নীতি, কি রাজনীতি ও শাসনপ্রথা, ভারতবর্ষের সমস্তই,—ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং এই ধর্ম্ম ভারতবর্ষের চরিত্রগত, অনুষ্ঠানগত। ধর্ম্ম ভারতবর্ষের নিকট একটা কাল্পনিক উৎপত্তি মাত্র নহে; ইহা তাহার নিকট সুস্পষ্ট, মূর্ত্তিমান্ ও জীবন্ত। এই ধর্ম্মকে উপেক্ষা করিয়া আমরা যাহা কিছুই করিতে যাইব, তাহাতে শ্রেয়ঃ-লাভ করিতে পারিব না। বিরোধী সভ্যতার সহসা সংঘর্ষণে, ভারতবর্ষীয় আর্য্যদিগকে তমোগুণান্বিত নিদ্রাভাব ত্যাগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু তৎসঙ্গে আমরা সনাতন আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া

পড়িয়াছে। আজ তা'ই হিন্দু আপনার চিরন্তন আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া বিজাতীয় সভ্যতার ঐশ্বর্য্যোজ্জ্বল রাজমূর্ত্তির দিকে লুব্ধ নেত্রে চাহিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু এ আশা সফল হওয়া দুরাশা মাত্র। নদী যেমন পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে অবতরণ করিয়া অল্পে অল্পে আপনার পথ করিয়া, অনুকূল স্থান নির্ণয় করিয়া ধীরে ধীরে সাগরে আসিয়া পড়ে,—জাতীয় জীবনের বিশেষত্বও তেমনি অল্পে অল্পে আপনার উদ্দেশ্যের অনুকূল ভাব, অভ্যাস ও রীতি গ্রহণ করিয়া এবং তাহার প্রতিকূল আচার, প্রথা ও আদর্শ পরিবর্জ্জন করিয়া, ধীরে ধীরে আপনার পথ স্থির করিয়া লয়। নদীকে অন্য খাতে প্রবাহিত করিতে গেলে, বিস্তৃত বালুকারাশির মধ্যে যেমন তাহার বিলুপ্ত হইয়া যাইবার আশঙ্কা,—জাতীয় জীবনের স্রোতকে তাহার চিরন্তন সাধনার পথ হইতে ফিরাইতে গেলেও, সেই আশঙ্কা। আমাদের সনাতন পথে ইউরোপের ঐশ্বর্য্য,* ইউরোপের বিলাস, ইউরোপের ভোগ, আমাদের না ঘটিতে পারে; কিন্তু ভারতবর্ষের শান্তি, উদারতা, প্রেম ও আনন্দ আমাদের লাভ হইবেই।

সুতরাং আমাদের পূর্ব্ব পিতামহগণ যে সনাতন মার্গ অনুসরণ করিয়া, আপনাদের জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ করিয়াছিলেন, যাঁহারা ধর্ম্মের উজ্জ্বল দীপ্তি আপনাদের হৃদয়ের অভ্যন্তরে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন যে সেই **পরব্রহ্মই আর্য্যদের সর্ব্বাপেক্ষা** প্রিয়তম বস্তু. 'তিনি পুত্র হইতে শ্রেয়ঃ, বিত্ত হইতেও শ্রেয়ঃ'—অতএব যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অন্তরতম, সেই প্রিয়তম পরমাত্মাকে উপলব্ধি করিয়া জীবনকে কৃতকৃত্য করিতে হইবে!" ভারতবর্ষীয়-দিগের নিকট ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা লোভনীয় বস্তু। তাঁহারা বিলাসোপকরণ, দ্রব্য-সম্ভার, বিদ্যা, অর্থ, খ্যাতি প্রার্থনা করেন না। তাঁহাদের একমাত্র প্রার্থয়িতব্য বস্তু,—

* ইউরোপের সভ্যতা বাহ্য মূর্ত্তি ভোগ-বহুল বলিয়া মনে হইলেও আমাদের বোধ হয় উহার মহান্ ভাব আমাদের ত্যাজ্য নহে। ধর্ম্ম অর্থে লীন যে বিশ্বজনীন ও অবয়বী ভাব (universal and organed life) তাহা আমরা ভুলিয়া আছি বলিয়াই, ঐ ভাব গুলি আমাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইংরাজ সভ্যতার ভিতর দিয়া পুনরায় আমাদের কাছে আসিতেছে। পং সং

"যদর্চ্চিমদ্‌যদণুভ্যোঽণু চ, যস্মিঁল্লোকা নিহিতা লোকিনশ্চ।
তদেতদক্ষরং ব্রহ্ম স প্রাণস্তদু বাঙ্মনঃ তদেতৎ সত্যং তদমৃতং।

'যিনি দীপ্তি-শালী, যিনি অণু হইতেও অণু, এবং যাঁহাতে লোকসমূহ ও লোকবাসী সমূহ অবস্থিত রহিয়াছে, তিনি এই অক্ষর ব্রহ্ম, তিনিই প্রাণ এবং তিনিই বাক্য মন; তিনি সত্য, তিনি অমৃত'। তাঁহারা জানিতেন 'নহ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবং তৎ', —অধ্রুবের দ্বারা সে ধ্রুব পদার্থকে পাওয়া যায় না।

ভারতের সে একদিন গিয়াছে, যখন সে জোরপূর্ব্বক বলিতে পারিত 'বহুল উপকরণ লইয়া কি করিব, যদি অমৃতকে লাভ করিতে না পারি— 'যেনাহং নামৃতস্যাব তেনাহং কিম কুর্য্যাম্'। আজ কাল ঘরে, বাহিরে ও মনে; রিপুর দাসত্ব করিতেছি। পূর্ণতম আচার্য্যগণ ব্রহ্মকে হস্তামলকের ন্যায় আয়ত্ত করিয়াছিলেন এবং উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে 'আমরা তাঁহাকে পাইয়াছি, আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি'—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তম্'। সে কথা এখন দুর্ভাগ্য আমরা আর বিশ্বাস পর্য্যন্ত করিতে পারি না।

এই তো আমাদের অবস্থা, এখন কথা এই, যে মুমূর্ষু তাহাকে মরিতে দেওয়া হইবে, না তাঁহাকে বাচাইবার চেষ্টা করা যাইবে? যদি মৃত্যুই বাঞ্ছনীয় হয়,— তবে আমরা যে পথে আজ কাল চলিতেছি, তাহা বেশ প্রশস্ত; এবং সরল ভাবেই উহা মৃত্যুর দিকে প্রসারিত হইয়াছে। কিন্তু শুনিয়াছি নাকি কাহারও কাহারও মত এই যে রোগীকে অনায়াসে অপ্রতিহত-গতিতে মৃত্যুর পানে যাইতে দেওয়া, তাহাকে বিনাশের পথে ঠেলিয়া দেওয়া উচিত নহে; তাঁহাকে বাচাইবার জন্য সাহায্য করাই আবশ্যক। বিশেষতঃ যাঁহার বাঁচিবার আবশ্যকতা আছে, তাঁহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা যুক্তিসঙ্গত ও পুণ্যপ্রদ। যাহারা শুধু মরিবার জন্যই বাচে, তাহাদের মৃত্যু হ'ক; তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু যাহারা অমৃত লাভের জন্য একদিন মরণ পর্য্যন্তও পণ করিয়াছিল, পরহিতার্থে সর্ব্বস্ব-ত্যাগ করিতেও কুণ্ঠা অনুভব করিত না—যাঁহারা একদিন অমৃতের অনুসন্ধানে ধন জন-পুত্র-পরিবার অকাতরে বিসর্জ্জন দিয়া; শরাহত মৃগের ন্যায় আকুল বেদনাভরে হিমাদ্রির শিখরে শিখরে, গুহাতে গুহাতে, হৃদয়ের গভীর মর্ম্মবেদনা আর্ত্তস্বরে বিশ্বদেবতার চরণপ্রান্তে উপস্থিত করিয়াছিলেন,—সেই ভরদ্বাজ, গোতম, কশ্যপ, শাণ্ডিল্য, বাৎস্য, গোত্রোদ্ভূতদিগকে অনায়াসে মৃত্যুর দিকে

অগ্রসর হইতে দেওয়া উচিত নয়; অন্ততঃ তাঁহাদিগকে উন্নত ও পবিত্র করিবার চেষ্টা করিয়া দেখার আবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয়।

এক্ষণে এই নিরানন্দের দিনে, উৎসাহ ও উদ্যমের একান্ত অভাবের দিনে, আমাদের কর্ত্তব্য কি, তাহা বিশেষ ভাবে ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। বাঁচাইবার চেষ্টাই যদি করিতে হয়, তবে মুমূর্ষুর শক্তি যাহাতে ক্ষয় না হয়,– পরন্তু বৰ্দ্ধিত হয়, সেই দিকেই বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক হইবে। অন্ন যেমন স্থূল শরীরকে পোষণ করে, ধর্ম্মই তদ্রূপ অধ্যাত্ম জীবনকে পোষণ করিয়া থাকে। ধর্ম্মই জগতের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আশ্রয়, এবং 'ধর্ম্মেণ পাপং অপনুদতি'—ধর্ম্মেই পাপ ধ্বংস করে। সুতরাং ভারতবর্ষকে বাঁচাইতে হইলেও তাহাকে ধর্ম্মরূপ পথ্য প্রদান করিয়া, তাহার শক্তি রক্ষা করিতে হইবে, এবং তাহার পাপরূপ জরার ধ্বংস সাধন করিতে হইবে।

ধর্ম্মই ভারতবর্ষের ভেষজ ও পথ্য। ক্ষুদ্র শিশু যেমন জননীকে পূর্ণ নির্ভয়ের সহিত জড়াইয়া ধরে, তদ্রূপ ভারতবর্ষের প্রাচীন ঋষিগণ ক্ষুদ্র শিশুর জননীকে জড়াইয়া ধরার মত, ধর্ম্মকে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু জ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদেরই ধর্ম্মের বলে ভারতবর্ষ এখনও এত প্রতিকূল ঘটনার মধ্যে পড়িয়াও আপনার বিশেষত্বকে আংশিক পরিমাণে রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছে। নচেৎ অতীত ইতিহাস অন্বেষণ করিলে জানিতে পারা যায়, এই পৃথিবী-তলে কত শত প্রাচীন জাতি, কত শত প্রভাব সম্পন্ন সাম্রাজ্য, কত বিশ্ব-বিজয়ী সম্রাট্ এক সময় অভ্যুদয় লাভ করিয়া,—আবার অতীতের অন্তরালে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে;–কিন্তু এই যে সুপ্রাচীন জাতিটি কোন্ অতীতের মেঘহীন, শুভ্র কিরণ-লাঞ্ছিত, অম্বর-তলে একদিন জাগ্রত হইয়া সবিস্ময়ে জগৎ প্রসবিতার বরণীয় ভর্গকে প্রণাম করিয়াছিল,—আর আজ এই কত শত যুগ বহিয়া গিয়াছে, ইহাদের উপর দিয়া কত দুর্য্যোগ কত দুর্দ্দিন চলিয়া গিয়াছে,—তথাপি এমন কোন একটি যুগই তিবোহিত হয় নাই, যাহা তাহাদের কোন না কোন স্থানীয় ঘটনায় বিজয়-বৈজয়ন্তীকে বক্ষে বহন না করিয়া অতীত গর্ভে বিলীন হইয়াছে। দৃষ্টিপাত করিয়া সাশ্রুনেত্রে মরণের জন্য শুধু অপেক্ষা করিয়া থাকিবে,—একথা স্মরণ করিতে কাহার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া না যায়? তা'ই বলিতেছি এ জাতি বাঁচিয়া থাকিলে সমগ্র জগতের লাভ আছে। সুতরাং স্বেচ্ছায় মরণকে যেন আমরা

ডাকিয়া না আনি, স্বহস্ত-খোদিত সলিলের মধ্যে যেন আমাদিগকে ডুবিয়া মরিতে না হয়। কিন্তু খুব সাবধানে, খুব সতর্কতার সহিত আমাদিগকে পিতৃ-পিতামহ-সেবিত প্রাচীন পথে, আপনার গৃহে ফিরিতে হইবে। সে পথ বড় বন্ধুর, অত্যন্ত দুর্গম ও বিকট,—হটকারিতা করিয়া আমরা যেন আত্ম-বিনাশ না করি।

পূর্ব্বকালে ঋষিদিগের কাম্যবস্তু সমূহের মধ্যে পুত্রলাভ একটি বিশেষ অভীষ্ট বস্তু ছিল। বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক পুত্রলাভের জন্য কত না তীব্র তপস্যা পর্য্যন্ত করিতেন; তাঁহারা পিতৃপুরুষদিগের নিকটে প্রার্থনা করিতেন,—

'দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মাভ্যগমদ্বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি।"

'হে পিতৃগণ! আমাদের কুলে যেন দাতা লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি হয়; অধ্যয়ন অধ্যাপনা ও যাগাদির অনুষ্ঠান দ্বারা বেদ শাস্ত্রের যেন সম্যক্ আলোচনা হয়; আমাদের পুত্র পৌত্রাদি বংশপরম্পরা যেন চিরকাল বিস্তৃত থাকে, বেদের উপর অটল শ্রদ্ধা যেন আমাদিগের কুল হইতে তিরোহিত না হয় এবং দান করিবার জন্য দেয় দ্রব্যেরও যেন কখন অসদ্ভাব না হয়।'

বর্ত্তমান যুগে মানবের সহিত ঋষিদিগের প্রভেদ এই যে, তাঁহারা যখন কাম্য-বস্তু প্রার্থনা করিতেছেন—তাহার মধ্যেও তাঁহারা জগতের মঙ্গল ভাবনা বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। শুদ্ধ আপনার কথা ভাবিয়া, তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইতে পারেন না। সমস্ত বিশ্বটের সহিত যে তাঁহাদের কত নিগূঢ় সংযোগ, এ কথা পৃথিবীর আর কেহ উপলব্ধি করিয়াছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু সর্ব্বোচ্চ প্রার্থনা তাঁহাদের এই ছিল যে—'মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং, মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদ্" 'আমি ব্রহ্মকে অস্বীকার করিব না, এবং ব্রহ্মও যেন আমাকে অস্বীকার না করেন।" আর এখন নিজের কথাই এত বড় হইয়াছে, যে জগতের মঙ্গলের কথা দূরে থাক, নিতান্ত প্রতিবেশীর কথাও আমাদের অন্তঃকরণে স্থান পায় না। ইহা অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন অনার্য্য-সুলভ চিত্তের লক্ষণ। কিন্তু আমাদের চিত্তের অবস্থা এইরূপই দাঁড়াইয়াছে, তাহা আর অস্বীকার করিবার উপায় নাই। পূর্ব্বে বলিত 'কোঽর্থঃ পুত্রেণ জাতেন যো ন বিদ্বান্ ন ধার্ম্মিকঃ'—এখন সে কথা আর নাই। ছেলেপিলেরা যথার্থ ধার্ম্মিক হইল কি না, বা সংযত হইল কি না, এজন্য

আমাদের বিশেষ কোন ব্যাকুলতা নাই; অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিলেই আর আমাদের কোন অভিযোগই থাকে না। এই যে অর্থের জন্য উৎকট লালসা, ইহা ভারতবর্ষীয় সভ্যতার অনুমোদিত নহে।

আমরা যখন সংসার করি, তখন সংসারকেই প্রাণপণে জড়াইয়া ধরি; সংসারের অতীত কাহারও কথা সুস্পষ্ট ভাবে ধারণাই হয় না। কিন্তু প্রাচীন-কালে তাঁহাদের সংসারের সমস্ত কর্ম্মই ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া অনুষ্ঠিত হইত; সুতরাং সংসার কোন দিনই তাঁহাদের স্কন্ধে ভর করিতে পারিত না। তাঁহারা বলিতেন,—"যৎকরোমি জগন্মাতস্তদেব তব পূজনং।"

সমস্ত জীবন-যাত্রার মধ্যে, সমস্ত আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে ধর্ম্মকে তাঁহারা প্রত্যক্ষরূপে দেখিতে পাইতেন, এবং উহাকে জীবন্তরূপে ভাবিতে পারিতেন বলিয়াই শোকে, দুঃখে, লাভে, অলাভে, জীবনে, মরণে তাঁহাদের চিত্তের শান্তির কখন অভাব হইত না! এখন আমরা প্রাণের সহিত ধর্ম্ম পালন করি না; লোক-দেখানো কতকগুলি বাহ্যানুষ্ঠানই এখন ধর্ম্মের স্থান অধিকার করিয়াছে, তা'ই চিত্তেও শান্তি পাই না;—প্রাণেও আরাম পাই না। কতকগুলি শুষ্ক অর্থ-হীন নিয়ম-প্রতিপালনই ধর্ম্ম নহে। যাহা বহুর সহিত একের এবং একের সহিত বহুর ঐক্য স্থাপন করে, যাহা সান্তের সহিত অনন্তের এবং মৃত্যুর সহিত অমৃতের মিলন করায়, তাহাই ধর্ম্মশব্দবাচ্য। এই ঐক্যের ভাবটিকেই—এই মিলনের মাধুর্য্যকেই আমাদের গন্তব্য পথের দিক্-দর্শন করিয়া লইতে হইবে। যেখানে দেখিব এই ভাবের অভাব হইতেছে, বুঝিতে হইবে সেইখানেই ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম প্রশ্রয় লাভ করিতেছে। আজকাল আমাদের আচারে, ব্যবহারে, ও অনুষ্ঠানে এই অধর্ম্মের প্রবল আক্রমণ দেখা যাইতেছে।

ঋষিরা সংসারের অগম্য জীবকে অসংখ্যভাবে দেখিতেন না;—তাঁহারা সমগ্র সংসারটিকে একটি বৃহৎ শরীরের মত ভাবিতেন। এই সুবৃহৎ সংসার দেহটির মধ্যে, কেহ বা শির, কেহ বা বাহু, কেহ বা গাত্র, কেহ বা পদ ইত্যাদি নানাস্থান, স্ব স্ব অধিকার মত অধিকার করিয়া আছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যাদি তাহারই বাহ্যিক অভিব্যক্তি। তাঁহারা স্বার্থপরবশ হইয়া ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদিকে কর্ম্মক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, এরূপ মনে করিবার কোন কারণ বিদ্যমান আছে বলিয়া মনে হয় না। কেবল জীবনযাত্রা প্রণালীকে

সহজ করিবার জন্য, বহির্মুখী বৃত্তিকে আত্মাভিমুখ করিবার জন্য, আধ্যাত্মিক জীবন লাভে সকলকে অধিকারানুরূপ সুযোগ ও সুবিধা দিবার জন্যই তাঁহাদের এই ব্যবস্থা। ইহা তাঁহাদের অসাধারণ সূক্ষ্ম-দৃষ্টিরই পরিচয় প্রদান করে। যদি স্বার্থ থাকিত, তবে জনসাধারণ এত সাগ্রহে এ ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিত না তাহা নিশ্চিত। (ক্রমশঃ)

আহ্বান

তুমি ডাকিয়াছ, তাই আসিয়াছি ;
তুমি নেবে পূজা, তাই বসে আছি।
তুমি গাবে গান, তাই শুনিবারে,
ধূলা মলা ল'য়ে এসেছি ছুটিয়ে॥
তোমার পূজার, অর্ঘ্য-মালিকা,
তোমার আসনে, দীপ্ত দীপিকা।
তোমার হাতের, আশীষ কণিকা,
অকৃপণ করে বিলাবে সবে ;—
তাই গো তপনে, করিয়াছি বাণী,
তাই গো পবনে, শুনায়েছি ধ্বনি ;
পরমাণু সনে বিশ্বে ডাকিয়া,—
রুদ্ধ উচ্ছ্বাসে এসেছি ছুটিয়া॥
তোমার আসনে, তুমিই বসিবে,
তোমার গগনে, তুমিই হাসিবে ;
তোমার আলোকে, গৃহ ভরে দিবে,
অমার আঁধার দূরে সরে যাবে।
আবেগের ভরে, হ'য়ে ভগ্নপুর,
ঘুরিয়াছি কত বার. কত দূর ;
জ্বালাময় হৃদে, এসেছি ছুটিয়া ;
হৃদয় চাঞ্চল্য করিবারে স্থির।
চির জনমের, পূজা দিতে মোর,
স্ফীত নয়নের, মুছাইতে লোর ;
যাচিয়া আপনি, এসেছ শুনিয়া,—
প্রগাঢ় আবেগে ভেসে গেছে হিয়া।
শত জনমের, বিরহ বেদন,
শত জ্বালাময়, অশনি দহন ;
পলকে স্নিগ্ধ, চরণ পরশে ;—
মুছাইবে বলি দাঁড়ায়েছি পাশে॥
পূজা রাখি, নাহি চাহি আলিঙ্গন,
নাহি চাহি তব অগাধ মিলন ;
চাহি মাত্র সুখ, করিতে পূজন ;—
শীর্ণ হৃদয় করি বিসর্জ্জন।
ভগ্ন-প্রাঙ্গণে, লালায়িত প্রাণে,
আবেশ-কম্পিত, কর পরশনে ;
তুচ্ছ মালিকা পরাইব গলে ;—
সাধ এ আমার করিব পূরণ॥

তুমি আসিয়াছ, আর কারে ভয়,
তোমার চরণ, দিয়েছে অভয় ;
তোমার নামের বিজয় ডঙ্কা ; -
পরাণের বেণু শিখেছে আজ।
যাও, কাল ! যাও আপনার মনে,
ব'য়ে যাও তব অনন্ত গহনে ;
আমার দেবতা আমার কুটীরে,—
আমি তাঁরে আজ পূজিব আদরে।
আমার দেবতা আসিয়াছে আজি,
হৃদয়-আসনে বসিয়াছে সাজি ;
নাহি চাহি দান ; না আছে বাসনা ;
পূজিব চরণ,—এ শুধু কামনা।
সাঙ্গ হ'লে পূজা, যেথা ল'য়ে যাবে,
যে পথ দেবতা দেখাইয়া দিবে ;
সে যদি গো হয় শ্মশান-চুল্লী ;—
অস্থি চর্ম্ম হীন, মরণ পল্লী,—
হিংসার ঘোর আরক্ত-নয়ন,
অথবা অশনি-কূপে নিমগন,—
দাড়াক সেথায় হাসি মুখ ল'য়ে,
প্রকৃতির রাণী গান গেয়ে গেয়ে ;
সারা নিশি জাগি তুষিবে শ্রবণ ;—
দেবতার পায়ে রহিবে জীবন।
ভয় কি আমার, পাপের পরশে,
সে পরশ যাবে, দেবতার পাশে ;
অগাধ বোধেতে, ভরা রবে প্রাণ ;—
হৃদয়ে জাগিবে তাঁহারি গান ॥

শ্রীনরেশ ভূষণ দত্ত।

কাম]

কামায় কামপতয়ে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

আজ কৈশোর জীবনের সীমান্তে উপনীত। নবাগত যৌবন-বসন্তের উষ্ণ নিশ্বাসে হৃদয় উৎফুল্ল ; জগতের যাহা কিছু আমার সম্মুখীন, তাহার সকলই অভিনব আনন্দচ্ছটায় উজ্জ্বল দেখাইতেছে। আমার অতীত জীবনের দিন কয়টা, শিশিরে কুজ্ঝটিকাময় অন্ধকার-আবরণের অন্তরালে থাকিয়া একটী দূরগত অতীতের স্মৃতিমাত্র জাগাইয়া দিতেছে। আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেমন করিয়া এই কুহেলিকাময় অতীত-দেশ অতিক্রম করিলাম ! এতদিন এই মধুরতা কোথায় ছিল ? অদূরে চক্রবাল-সীমা ভেদ করিয়া ভবিষ্যতের শুভ্র-রজত-কিরণস্রাবী উত্তুঙ্গ গিরিশ্রেণী শোভা পাইতেছে। সম্মুখে বহু-বর্ণ বিভূষিত, কুসুমদাম সুশোভিত, আনন্দময়, মধুর কোকিল-কূজন-মুখরিত, শ্যাম-শষ্যাকীর্ণ

বিস্তীর্ণ কর্ম্মক্ষেত্র। ইহার প্রত্যেকেই আজ কি মধুর স্বরে আমাকে আহ্বান করিতেছে! আহা, ইহারা আমার কত আপন!! আমারই সুখের তরে, আমারই তৃপ্তির জন্য—ইহারা ব্যাকুল; সকলেই, যাহার যাহা শ্রেষ্ঠ—যাহা মধুর, তাহারই বরণডালা সাজাইয়া আমাকে উপহার দিতে সমাগত। ঐ প্রকৃতি ক্ষীরোদবাবুর সুমধুর স্বরে গাহিতেছে—

"এসেছি তোমারে বঁধু দিতে উপহার।
তুমি সকলের বঁধু, তুমি সকলের বঁধু, সকল হিয়ার তুমি সার;
ধর হে, প্রিয় হে; ধর হে—সখা হে; ধর হে—ধর উপহার।"

আকুল-হৃদয়ে প্রকৃতিকে সম্ভাষণ করিলাম "আমি ক্ষুদ্র, আমি তুচ্ছ, অতি নগণ্য। দেবি! তোমার এত স্নেহ, এত আদর,—আমি ত' একত্রে গ্রহণ করিতে পারিতেছি না; তোমার 'সর্ব্ব'-রূপে আমাকে বিহ্বল করিও না। এক এক করিয়া তোমার স্নেহ-উপহারগুলি দেও; আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব।" প্রশান্ত প্রকৃতি নীরবে হাস্য করিলেন; কিছুই বলিলেন না। সে হাসির অর্থ তখন বুঝিলাম না। প্রকৃতি-দেবী "বহু" কার্য্যে, "বহু" রূপে, "বহু" ভাবে, তাঁহার শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদির সম্ভার সমূহের আবরণ উন্মোচিত করিয়া দিলেন। আহা, তাহার প্রত্যেকটাই কি অগাধ-রস-ভাণ্ডার; কাহাকে প্রধান বলি!!

"এ কি দেবি! তোমার এই রস-ভাণ্ডারে তৃপ্তি কোথায়? আমি যতই তৃপ্তির আশায় অগ্রসর হইতেছি, ততই যে অভিনব আকাঙ্ক্ষার প্রবল তরঙ্গাভিঘাতে কি জানি কোথায় সরিয়া যাইতেছি;—

"কোন সুদূর দেশে, কি জানি যেতেছি ভেসে,
ধূ—ধূ, করে দুই পাশে, বিজন বেলা"—

তোমার সুখের ভোগ এত ক্ষণিক কেন? ক্ষণিক ভোগের লালসা ছাড়িতে পারিতেছি না ত'? তোমার এই সুখময় তরঙ্গ-শিরে নাচাইতে নাচাইতে আমাকে কোথায় লইয়া যাইতেছ? নিত্য নূতন ভোগের ক্ষুধা জাগিয়া উঠিতেছে, এই ক্ষুধার ত' শান্তি নাই,—অবসান নাই!! তোমার এই অতৃপ্তি-বিজৃম্ভিত মধুর সঙ্গীতের ভাষা কি?—রহস্য কি?"

প্রকৃতি নীরবে হাসিল। সে হাসির অর্থ বুঝিলাম না! আবার পিছনের দিকে ফিরিয়া চাহিলাম; দেখিলাম,—সকল "অতীত" বেড়িয়া একখানি স্বচ্ছ

কুহেলিকাময় আবরণ আস্তীর্ণ হইয়া রহিয়াছে। সেই আবরণের অন্তরালে সকলই প্রহেলিকাময়,—ভ্রান্তিময় বোধ হইতে লাগিল। মনে করিলাম,—'আমি এতকাল কি অসার স্বপ্নে নিমগ্ন রহিয়াছিলাম ;

I slept and dreamt that life was beauty ;
I awoke and found that life is duty ;
ঘুমায়ে ঘুমায়ে দেখিনু স্বপন এ জীবন শুধু সৌন্দর্য্যের খেলা।
জাগিয়া উঠিয়া দেখিনু সম্মুখে, সংসার কঠিন কর্ত্তব্য-মেলা।

বুঝিলাম, আমার করণীয় অনেক আছে ;—বহু কর্ত্তব্য আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। আবার সম্মুখে চাহিয়া দেখিলাম ; সুদূর ভবিষ্যৎ' সেই সমান দূরেই রহিয়াছে ; কিন্তু তাহার সেই রজতচ্ছটা তরল অন্ধকারে আবৃত হইয়া গিয়াছে ; 'বর্ত্তমান' ক্ষেত্র শোভাহীন কর্কশতা ধারণ করিয়াছে। কিন্তু আশার আশ্বাস-বাণী, বাসনার আকর্ষণ গীত সেই একই প্রকার রহিয়াছে। কামরূপ প্রদেশের অজ্ঞাত জীবের গুঞ্জন-ধ্বনি অহনিশি সমভাবেই চলিয়াছে।* ধন মান, যশ, সম্ভ্রম ও ধর্ম্মের লোভে জগতের বিরুদ্ধে অভিযান করিলাম। হায়! যাহাকেই আমার 'আমি'র তৃপ্তির আশায় 'আমার' বলিয়া আলিঙ্গন করি, অমনি সে বিদ্যুতচ্ছটার ন্যায় অতি ক্ষণভঙ্গুর, একটু মাত্র সুখের আলো ঝলসিয়া তখনই নিবিয়া যায়। 'সর্ব্বনাশি প্রকৃতি! তোমার ভাণ্ডারে কি স্থায়ী কিছুই নাই! তবে "সর্ব্বভাবে" প্রয়োজিত কর কেন?' আবার—প্রকৃতির সেই হাসি। এই হাসি আজ অতি মধুর ও কোমল বোধ হইল। মনে হইল তবে কি এতদিন প্রকৃতির ইঙ্গিত বুঝিতে পারি নাই! প্রকৃতি এই অতৃপ্তির ভাষায়, ক্ষণভঙ্গুরতার অঙ্গুলি সঙ্কেতে কি দেখাইতেছে? এই কামপূর্ণ আকর্ষণ কোন্ দিকে আকর্ষণ করিতেছে? এই আকর্ষণের আধার কোথায়? তবে কি এই আকর্ষণের গতি বুঝিতে পারি নাই! ভাবিতে ভাবিতে হৃদয়-বেগ শ্লথ হইয়া আসিল। তখন দেখিলাম জগৎ এক মহা আকর্ষণের লীলাভূমি। এখানে মহতে মহতে, অণুতে অণুতে, বড়তে ছোটতে এক আকুল আকর্ষণ ও আলিঙ্গন। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, মহৎ হইতেও মহৎ, কেহই কাহাকে ত্যাগ করিতে চাহে না। সকলেই সকলকে

* কামাখ্যা পাহাড়ে এক প্রকার গুঞ্জন ধ্বনি অহরহঃ ধ্বনিত হইয়া থাকে। তত্রত্য অধিবাসীরা ঐ শব্দকে 'ঘুনঘুনিয়া' পোকার শব্দ বলিয়া অভিহিত করে।

কি এক মহান্ আকর্ষণে আপনার করিয়া রাখিতে ব্যাকুল। কিন্তু হায় এই আকর্ষণ অনন্তকালব্যাপী হইলেও আকর্ষক ও আকৃষ্টের মিলন হইতে না হইতেই, উভয়ের একটী বা উভয়ের বিশিষ্টতা কোথায় কি হইয়া যাইতেছে। নাম ও রূপের খেলায় নাম রূপ পরিবর্ত্তিত হইতেছে; কিন্তু আকর্ষণের ত' বিরাম দেখি না।

জড়-জগৎ ছাড়িয়া জীব-জগতের দিকে দৃষ্টি পতিত হইল। দেখিলাম, সেখানে আকর্ষণ আরো প্রবল, আরো ঘনীভূত। ব্যাধের বংশীধ্বনিতে কুরঙ্গ-যূথ, করেণুকরস্পর্শে মত্ত মাতঙ্গ, জ্বলন্তবহ্নিরূপে পতঙ্গ ও মধুগন্ধ-লুব্ধ ভ্রমরের ন্যায় জগতের যাবতীয় জীব ইন্দ্রিয় মাত্রায় আকুল ও উন্মত্ত হইয়া, আপনার বিশিষ্ট 'আমির' অবশ্যম্ভাবী বিনাশকে আলিঙ্গন করিতেছে। আর মানব জগতের শ্রেষ্ঠতাভিমানী জীব—শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদির আকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া আপনার বিশিষ্টতাকে নিরন্তর এই ইন্দ্রিয়াগ্নিতে দগ্ধীভূত করিতেছে। মানুষের কি কেবল এই কয়টিই আকর্ষণের স্থান! ইহা ভিন্ন আরো কতকগুলি,—যশ, মান, ধর্ম্ম আদি অগ্নিকুণ্ড আছে; হাসিতে হাসিতে জগতের শ্রেষ্ঠ জীব তাহাতে ঝম্প প্রদান করত দগ্ধ হইতেছে; ও পুনঃ পুনঃ দগ্ধ হইয়াও তাহাতেই ঝাঁপাইয়া পড়িতে ব্যগ্র। হায় মানব, এই কি তোমার বিদ্যা বুদ্ধির অভিমান!! জানিয়া শুনিয়াও এ আগুনে দগ্ধ হইতেছ কেন? ভাবিলাম, হায় বিদ্যা-বুদ্ধিতে জগতের শ্রেষ্ঠ-জীব মানব কি এতই নির্ব্বোধ মূর্খ, যে এই দারুণ দুঃখের হাত হইতে নিস্তার পাইবার চেষ্টাও করিতেছে না। তখন অশরীরী বাণীর ন্যায় মহামন্ত্রে—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

এই বাক্য হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে ধ্বনিত হইতে লাগিল। তবে এই কি মায়া! এই কি মায়ার আকর্ষণ!! নিতান্ত বিহ্বল ও বিভ্রান্ত চিত্তে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। তখন কি এক দিব্যোন্মাদক, মধুময়, স্পন্দনে হৃদয় স্পন্দিত হইতে লাগিল। ক্রমে সেই স্পন্দন মধুর ও মধুরতর বংশীর নিক্বণে পরিণত হইল। সেই সঙ্গীত-লহরী হইতেও মধুরতর একখানি মন-প্রাণহর সঙ্গীতের মত মূরতি ফুটিয়া উঠিল। আহা,—

"জগতের সব শোভা করি সমাহারে,
কোন রসজ্ঞ বিধি গঠেছে উহারে!"
(বিধি) বিরল করিয়ে সার, নব-নবনীত-সার
নিয়ে এ সৌন্দর্য্য সার মানসে কি গঠে ছিল!" (কৃষ্ণকমল)
(তাঁর) ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী, অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে, মদন মূরছা পায়॥ (গোবিন্দ দাস)

দেখিলাম, বুঝিলাম জগতের যাবতীয় আকর্ষণ উঁহারই পদমূলে পরিসমাপ্ত হইয়াছে। হ্লাদিনী তাঁহার শক্তি, কাম তাঁহার বীজ, শ্রীনন্দ-নন্দন স্বয়ং দেবতা। তাঁহার আনন্দ-মন্দাকিনী ধারা কত কোটী বিশ্ব প্লাবিত করিয়া,—পবিত্র করিয়া,—দ্রব করিয়া, কোন অসীমে লুকাইল; আবার কোন অজ্ঞাতের মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া, আবার সেই পদতলে আসিয়া আশ্রয় লইল। এই গতির বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই। এই আনন্দময় আকর্ষণ, প্রবাহ বা টান অন্তর্মুখী ও বহির্মুখী ভাবে প্রেম ও কাম নামে অভিহিত। বিশ্ব-জাগরণের ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে প্রজাপতি দক্ষের অশিব-যজ্ঞে ভব-ভামিনী যখন শঙ্কর-বিদ্বেষী পিতার গঠিত-দেহ বর্জ্জন করিয়া গিরিরাজ-তনয়া-রূপ দেহ ধারণ করত, পরিগৃহীত-কাষায়-বাসা ব্রত-পরায়ণা, বীরাসনোপবিষ্টা হইয়া ধ্যান-স্তিমিত দেবাদিদেব মহেশ্বরের পরিচর্য্যায় নিরতা;—যখন তারকাসুর (Astral Light) পরাক্রান্ত হইয়া ভেদাত্মক আসুরিক ভাবের বিকীরণে বিশ্ব প্লাবিত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিল,—যখন আর মঙ্গলময়ের সমাধি ভঙ্গ ব্যতিরেকে বিশ্বের মঙ্গল সাধিত হয় না,—তখন বিশ্বপতি শঙ্কর সমাধি ভঙ্গে সম্মুখে মূর্ত্তিমান্ কন্দর্পকে দেখিতে পাইলেন। কাম তখন ত' শরীরী রূপে বর্ত্তমান। জীব 'সর্ব্ব'-ভাবে কামের আকর্ষণ না পাইয়া,—'সর্ব্ব' বিমুখী অসুর-শক্তির নিকট বিধ্বস্ত। কাম জ্ঞান তখন 'সর্ব্ব'ভাবে খেলিতে ছিল না; শিশু জীব আকর্ষণ না পাইয়া উন্নত হইতে পারিতেছিল না। তাই মঙ্গল-আলয় মহাদেব সমাধি ভঙ্গে মূর্ত্তিমান্ কামকে দেখিতে পাইয়া, স্বীয় নয়ন-বহ্নিতে কন্দর্প দেহ ধ্বংস করত তাহাকে 'অনঙ্গ' করিয়া দিলেন। দেবাদিদেবের প্রসাদে কাম, 'অনঙ্গ' (formless)

হইলেন। "ভবতু কামস্বনঙ্গ মৎপ্রসাদাৎ সুলোচনে" *। ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধিও অহঙ্কারাদি বিশিষ্টের সকল স্তরে কামদেব খেলা করিতে লাগিলেন। বিশিষ্ট জীব, 'সর্ব্ব'ভাবে 'পর'পুরুষের আকর্ষণ অনুভব করিতে পারিয়া, বহুত্বের মধ্যে সেই আকর্ষক-তত্ত্বের অন্বেষণ করিতে লাগিল। সে ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির মধ্যে, কামের এই আকর্ষণে "সর্ব্ব-কাম" হইল; তাহার ভেদবুদ্ধি প্রশমিত হইতে লাগিল। সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইল; বিজ্ঞানের সাহায্যে 'পর' আমির আভাস দেখা গেল। পরে পরপুরুষাভিসারিকার সমীপে সেই 'পর পুরুষের, আত্মা হইতে সঞ্জাত প্রদ্যুম্ন বা প্রেম পর (Transcendent) ভাবে আকর্ষণ করিয়া জীবকে—'সর্ব্ব'-ত্যাগিনী অভিসারিকাকে, নিভৃত-নিকুঞ্জের শয়ন-খট্টাঙ্গে উপস্থাপিত করিল। শ্রীভগবানের এই অন্তরঙ্গ কেলী মন্মথসহচরীগণেরও অবিদিত। শ্রীভগবানের একই আনন্দময় আকর্ষণ বহির্ম্মুখী ও অন্তর্ম্মুখী ভাবে, আনন্দ প্রবাহরূপে নিরন্তর প্রবাহিত; কেবল আত্মাভিমুখী ও 'সর্ব্বা'ভিমুখী, এই নামের প্রভেদ মাত্র। এই আকর্ষণই বহির্মুখীভাবে কাম রূপে জীবকে সর্ব্বময়রূপে প্রকাশ করে। সর্ব্বময় ভাবে, ছোট 'আমি' পড়িয়া গেলে, অহংকারের পর— "আমি" প্রকট হয়'। তখন কাম "আমি"কে সর্ব্বে ও 'সর্ব্ব'কে আমিতে প্রদর্শন করত, তাহার অন্তে সর্ব্বকেও পরিত্যাগ করাইয়া, প্রেমরূপে এক 'পর-পুরুষ' 'আত্মা' বা 'ভগবানে' সম্যক্‌রূপে পর্য্যবসিত হয়। বিশিষ্টতার পাষাণ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন পূর্ব্বক 'সর্ব্ব'স্বরূপের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের 'অন্ত'-প্রদেশে, লহরী-লীলাময় আত্ম-সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া পড় দেখি। দেখিতে পাইবে, তুমি তাঁহার প্রেমময়-অঙ্কে অধিরোহণ করত চির শান্তিতে নিমগ্ন রহিয়াছ; তোমার পাপ তাপ কিছুই নাই;—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥"

কামের নাম শুনিয়াই চমকিত হইও না। যে আকর্ষণ;—

"বিশিষ্ট আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তি বাঞ্ছে, তাহে কহে কাম।
(তাহাই) যখন— "কৃষ্ণেন্দ্রিয় তৃপ্তি বাঞ্ছে তারে কহে প্রেম।

ভেদাভিমুখী যে প্রবাহ কাম নামে প্রবাহিত, তাহাই সর্ব্বস্বরূপের ক্রীড়ার

* সৌরপুরাণ পং সং।

অবসানে যখন শ্রীভগবানে শান্ত হয়, তাহারই নাম **প্রেম**। যে আকর্ষণ 'বহু'ভাবে বিক্ষিপ্ত 'আমি'কে কাম পথে লইয়া 'সর্ব্বে' পরিসমাপ্ত করে,—সেই আকর্ষণই কামপতির পাদমূলে প্রেমরূপে পর্য্যবসিত হয়। কুরুক্ষেত্র সমরের চতুর্থ দিবসের সংগ্রাম সময়ে ভীষ্মদেব কৃত ত্যক্ত যে ব্রহ্মাস্ত্র অপরাঙ্মুখ পাণ্ডব বাহিনী ধ্বংস করিতে কালানল উদ্গীরণ করত, শূন্যমার্গে পাণ্ডব-সৈন্যাভিমুখে আগমন করিতেছিল, সেই শর,—যখন ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডু-বাহিনীকে সর্ব্বরূপে আচ্ছাদন করিলেন—তাহাই তখন সর্ব্বস্বরূপ ভগবানের বক্ষে বৈজয়ন্তী মালার শোভা ধারণ করিল। যে অবিশিষ্টতারূপ অব্যক্ত সমুদ্র মন্থন সময়ে বিশ্বধ্বংসী বিষানল উদ্গীরণ করত প্রকাশিত হইল,—তাহাই যখন সর্ব্বমঙ্গলময় শঙ্করের কণ্ঠগত হইল, তখন অপূর্ব্ব নীলদ্যুতি মৃগমদসারসম শোভা পাইতে লাগিল। তা'ই, যাহা বিশিষ্ট ও বহুর নিকট অনর্থকর বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহাই সর্ব্ব স্বরূপে শ্রীভগবানের নিকট পরম শোভার আস্পদ। সকল প্রকার কামেরই,—আনন্দে পরিসমাপ্তি। ক্ষুদ্র-পরিসর বিশিষ্ট আমির' বিশিষ্টতার মাত্রানুসারে আনন্দেরও স্থায়িত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। ফলতঃ যে এই আনন্দ প্রবাহে পতিত,—তাহার 'আমিই' বা কোথায়! 'তুমি'ই বা কোথায়!!

"ভবে সেই সে পরমানন্দ যে জন আনন্দময়ীরে জানে।" (রামকৃষ্ণ) মানস নয়নে হঠাৎ পলক পড়িল; আবার বিশিষ্ট—'আমি' জাগিয়া উঠিল। আমার আর দেখা হইল না। ভক্ত-কবি কৃষ্ণকমলের সুরে শ্রীমতীর রোদন ধ্বনি মনে পড়িল,—

> "আমি কি হেরিব শ্যামরূপ নিরুপম নয়ন ত' মম মনোমত নয়।
> যখন নয়নে নয়ন, মন সহ মন হ'তেছিল সম্মিলন,
> নয়ন পলক দিল এমন সুখেরই সময়।'

হায়! অরসিক বিধি ত' বিধিমত সৃজন জানে না!! না হ'লে—

> "যে দেখিবে কৃষ্ণানন তা'রে কোটীনেত্র না দেয় কেন?

যদি দিলে বা দুটী নয়ন,—

> তাতে কেন আবার দিলে পক্ষ্ম-আচ্ছাদন?
> দিলে পক্ষ্ম তাহে না হইত ক্ষতি,
> যদি দি'ত আঁখির উড়িতে শকতি;

তবে চকোরেরই মত সে লাবণ্যামৃত
উড়ে উড়ে পান করিত,
আঁখির পিপাসা মিটিত. হেন মনে লয়।"

তখন বহির্জ্জগতের দিকে দৃষ্টি পড়িল। বন্ধুর,—প্রাণের প্রাণ সর্ব্বস্বরূপের স্বপ্নময় পরশ কি তবে বাহিরের জগতেও লাগিয়াছে? আহা কি মধুর! কি সুন্দর! এই কি সেই জগত!! এ যে দেখি সকলই মধুময়! এই যে,—

"মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা, মধুমান্নো বনস্পতিঃ, মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধুনক্তমুতোশসেঃ। মধুমাংহস্তু সূর্য্যো মাধ্বির্গাবো ভবন্তু নঃ॥" তখন মনে হইতে লাগিল,—"নাথ হে, সকলেরই মূলে তুমি আছ ব'লে মধুময় এ সংসার।" তখন বুঝিতে পা'রিলাম, জগতের এই আকর্ষণ—এই কামের টান ত' তাঁহারই; তিনিই ত' তাঁহার নবরন্ধ্রবতী বংশীধ্বনিতে তাঁহারই দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু আমি ছার, ক্ষুদ্র—তুচ্ছ 'বিশিষ্টতার' মোহে তাঁহার দিকে ফিরিয়া চাহি না। হে সর্ব্বময় স্বামিন্, হে প্রাণেশ্বর! কবে আমার নয়ন ও দৃষ্টি তোমাতেই পরিসমাপ্ত হইবে! "কবে,—

তব সুখ-সম্মিলনে প্রাণ জুড়াব, হৃদয়-স্বামি!
(কবে) বসিব একান্তে প্রাণকান্ত লয়ে তোমায় আমি।
হৃদয়ে ধরি শ্রীপদ, বিপদ ঘুচাব হে
আমি সকলই ভুলিব কেবল হৃদয়ে জাগিবে তুমি।"

তখন জগদ্বস্তুর আকর্ষণ অতিশয় শ্লথ হইয়া পড়িল। জগতের যাবতীয় বস্তু 'সম'স্বরে তাঁহাকেই ইঙ্গিত করিতে লাগিল। দেখিলাম, উলঙ্গিনী শ্যামা মার বক্ষস্থলে দোদুল্যমান মুণ্ডমালা; আর ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্যামচাঁদের হৃদয়-স্থিত কৌস্তুভহার একই শোভা ধারণ করিয়াছে। 'সর্ব্ব'-নাম্নী 'বিশিষ্ট' 'বহু'কে সংহনন করত সামবেদরূপ এক মহাসূত্রে গ্রথিত করিয়া স্বকীয় হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। বিশিষ্ট 'বহু'ভাবের দ্যোতক মুণ্ডগুলির বিভিন্ন আকৃতি; কিন্তু মালা একই। আর শ্যামচাঁদের গলার মণিমালার মণিসমূহ সংখ্যাতে 'বহু' হইলেও আকৃতি প্রকৃতিতে এক; এবং মাল্য স্বরূপেও এক। প্রভেদ ধর্ত্তব্য নহে; যে হেতু প্রত্যেক মণিই শ্যামচাঁদের মনোমোহনরূপের প্রতিবিম্ব হৃদয়ে ধারণ করত সর্ব্বতোভাবে এক হইয়াও, বাহ্য ও বিশিষ্ট দৃক্ জনের সমক্ষে

পৃথক্‌রূপে প্রতীয়মান। আহা লীলাময়ীর কি মধুর লীলা! জগতের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া, মা আমার কি খেলা খেলিতেছে; ঐ দেখ—

"জগত জোড়া মা যে আমার, জগতেরি গা'য়ে গা';
জগতেরই মাঝে আবার, জগন্ময়ী ঢালে গা'।
জগতেরি কাণে কাণ, জগতেরি প্রাণে প্রাণ,
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং মন্ত্র তা'ই ঘোষে অমনি।" গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী)

বুঝিলাম,—'সদ'ভাবে সর্ব্বময়ী জননী অবোধ শিশুকে তদীয় সুকোমল অঙ্কদেশে আহ্বান করিতেছেন। জগতের আকর্ষণও সেই সর্ব্বময়ী মায়ের স্নেহ-আহ্বান। স্তন্যভারাক্রান্তা "উশতীরিব মাতরঃ" জননী সুধাময়-স্তন্য পান করাইবার জন্য ব্যাকুল হৃদয়ে সন্তানকে আহ্বান করিতেছেন। ভাই! একবার শোন দেখি, উহা মায়ের ডাক কি না? অমন করুণা, অমন কোমলতা, অমন মধুরতা কি মহামায়া মা ভিন্ন আর কারো আছে? জগতের যত কিছু শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধাদির আয়োজন;—এ সকলই ত' মায়ের

"পেয়ে মায়ের রূপের আভা, আকাশ-পথে প্রকাশে রবি;
তাঁরি আভা পেয়ে আবার খেলায় শীতল চাঁদের ছবি।"
"মা যে আমার সকল রূপের খনি।" (গোবিন্দ চক্রবর্ত্তী)

কাত্যায়নী মহামায়া জননী রূপ রসাদির ভাষায়, ঐ দেখ, 'সকল রসের রস' 'ব্রজেন্দ্রনন্দন' পরপুরুষের দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে কি দেখাইয়া দিতেছেন? ঐ যে ষোড়শী ব্রজবালা কাহার বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়া উন্মাদিনী হইল? আর ত' ঘরে থাকিতে পারিল না; 'সর্ব্ব'স্ব ত্যাগ করিয়া ঘরের বাহির হইল; কৃষ্ণসাগরের জলে ডুবিতে চলিল। লোকের লাঞ্ছনা, গুরুর গঞ্জনা কিছুই ত' তাহাকে ফিরাইতে পারিতেছে না।

আরোহণ করিয়া মনোরথ রথে
জ্ঞানেন্দ্রিয় পঞ্চ অশ্ব জুড়ি তাতে
রথের সারথি করি মনমথে

ঐ যায় শ্যামবিনোদিনী উন্মাদিনীর প্রায় বনপথে॥" (কৃষ্ণকমল)

যে প্রাণনাথের মোহন বংশীধ্বনি শ্রবণ করিয়াছে, সে কি ছার সামান্য বিশিষ্টতার প্রাচীরের অভ্যন্তরে বদ্ধ থাকিতে পারে! পরম-পুরুষ কৃষ্ণ পাদমূলে প্রাণ সঁপিতে

সে কি আর কিছুর বাধা মানে? প্রিয় সঙ্গমাভিসারিকার কি সংসার-পথের কণ্টকাদির ভয় আর আছে; তাহার কি আর পথাপথ আছে? সকল পথই যে প্রাণনাথের কেলি-কুঞ্জদ্বারে পরিসমাপ্ত! যে তাঁহার বাঁশী একবার শুনিয়াছে, সে কি আর 'সে' আছে? সে যখন যাহা দেখে, যাহা শোনে, তাহাই প্রাণনাথকে স্মরণ করাইয়া দেয়; সে'ও সকলের মধ্যে তাঁহারই প্রতিবিম্ব দর্শন করে। জগতের বহুভাবের মধ্যেও সে সর্ব্বস্বরূপের ভাবাদির অনুভব করে; সকল কর্ম্মে কর্ম্মাদ্বৈত ও সকল বস্তুতে দ্রব্যাদ্বৈতরূপে তাঁহাকেই অনুভব করে। তখন তাহার বহু, সর্ব্ব ও আত্মা এক হইয়া যায়। তখন নুনের পুতুল লবণাম্বুধিতে মিশিয়া যায়।

শ্রীকৃষ্ণ-বিরহ-বিধূরা শ্রীমতী রাধিকা কাননে কৃষ্ণান্বেষণে বহির্গত হইয়া তমাল দর্শনে ও স্পর্শে প্রাণনাথের মিলনানুভবে মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন।

(কিবা) দলিত কজ্জল কলিত উজ্জ্বল।
সজল জলদ শ্যাম সুন্দর।
(যেন) বকালী সহিত,— ইন্দ্রধনুযুত—
তড়িত জড়িত নব জলধর ॥
স্থূল মুক্তাহার দুলিতেছে গলে,
জ্ঞান হয় যেন বক পাঁতি চলে,
চূড়ার শিখণ্ড ইন্দ্রের কোদণ্ড
সৌদামিনী কান্তি ধরে পীতাম্বর ॥ (কৃষ্ণকমল)।

ইহা কি ভ্রম! না। যে সর্ব্বরূপে আত্মসমর্পণ করিয়াছে, তাহার কাছে যে জগত আর জগত নাই; জগদ্বস্তু যে সেই সর্ব্বরূপ ভিন্ন কাহাকেও ইঙ্গিত করেনা; সে যে;—

'স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
যাঁহা নেত্রে পড়ে হয় ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি ॥" (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)।

তখন সে তাহার আপনাতে ও আরাধ্য দেবে অভেদ দর্শন করে; হৃদয়ে শ্রীভগবানের সত্ত্বানুভবে ভেদ-জ্ঞান বিস্মৃত হইয়া যায়।

' বাপু! সমগ্র জগতে যদি সেই "সর্ব্বস্বরূপ" ভগবানেরই আকর্ষণ, তাঁহারই আহ্বান,—আমরা তাহা বুঝিতে পারি না কেন? ও হরি! এমন কোন্ পাষাণময়

জীব-হৃদয় আছে, যে কামের রসে, বাসনার রসে তাহাকে দ্রবীভূত করে না? ভাই, দু'খানি বই পড়ে তোমার বিদ্যা হ'ল যে কামকে ঘৃণা কর্‌তে হবে। কামুক হওয়া মহাপাপ; কামের ত্রিসীমানায় যাইও না। তোমার গুরু ... দেবশর্ম্মা উপদেশ দিলেন, 'কামকে দমন করিতেই হইবে।' তুমি বাপু, সকল ইন্দ্রিয়ে 'ঠুলি' দিয়া ভস্ম-লোচন হয়ে বস্‌লে; মনও কিছুদিন পরে বেশ সুশীল, শান্ত ছেলেটী হয়ে পড়'ল, আর নড়া-চড়া করে না। মনে মনে ভাব্‌ছ তুমি একটা খুব কিছু হয়েছ, না? দুদিন পরেই "ইন্দ্র-চন্দ্রলোকে" যাবে, না হয় একটা কিছু হবে! ভাই ঐ শুন গীতামুখে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে কি বলেছেন,—"বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥"

ইন্দ্রিয় ও মন বিষয় হ'তে নিবৃত্ত, 'মাছ না পেয়ে বিড়াল তপস্বীর' মত থাকে বটে, কিন্তু গোড়ার রসটুকু (স্বাদটুকু) ভুলে না। ঐ যে ছেলেরা বলে;—

'ওরে ভাই কল্‌মি লতা; জল শুকুলে থাক্‌বে কোথা?"
থাক্'ব যেয়ে পাঁকের তলে লাফিয়ে উঠ্‌ব বর্ষা এলে।"

কামও তেমন হয়ে থাকে; যাই ভোগ্য বস্তু এল অমনি রস ছুটল। 'পর' পুরুষকে না পাইলে আর কাম ও বাসনা যায় না। সর্ব্ব বিষয়ই সেই 'পর'কেই ইঙ্গিত করে। নাক-কান মুখ চোখ বন্ধ করে কি কাম-জয় চলে, বাপু! কাম যে ভগবানের ছেলে। তা'কে জোর ক'রে জয় কর্‌তে গিয়ে জান ত' বাণরাজার রাজ্য—শোণিতপুরে কি হ'য়েছিল?

কথাটা হ'ল এই যে, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির ক্ষেত্রে কামের কাজ হবেই; বাসনার খেলা হবেই। কামই বল আর বাসনাই বল, সকলই তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার শক্তি, তাঁহারই খেলা। তিনি এই সকল কলে ফেলেই সকল গঠন করেন। তুমি মনে কর্‌ছ যে তুমি কাম জয় করেছ, কেননা কামাতুরা রমণীর পাশ দিয়ে চলে গেলে তোমার চিত্তের বৈকল্য হয় না। কামটাকে যেমন মোটা ভাবে দেখ, তার চাইতে একটু সুক্ষ্ম করেই ভাবনা কেন? বাপু, আগে না হয় 'শশাটা কলাটার' দিকে মন ছিল, এখন না হয় লোহা-সিন্ধুকের দিকে না হয় অধিকারী হবার জন্য মন পড়েছে। বাপু, 'যোগক্ষেম' লাভের কামটা কি কাম নয়? কামের চ'খে দেখিলে মোক্ষ-কামও

কাম বটে। ঠাকুর বলেছেন—'সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ' তুমি ধর্ম্মা-কাঙ্ক্ষাই কর আর মোক্ষাকাঙ্ক্ষাই কর, যখনই তোমার তৃপ্তির জন্য—বিশিষ্ট আমির তৃপ্তির জন্য যাহাই লাভ করিতে চাহিবে, তাহাই তোমাকে তোমার বিষয় কামের পথেই লইয়া যাইবে। বিশিষ্টরূপে বৃত্তি সকল, বা 'আমি' যাহাতে শায়িত বা অবসান হয় তাহাই বিষয়। মোক্ষে যদি তোমার বিশিষ্ট আমির তৃপ্তি হয়; তবে তাহাই তোমার বিষয়; এবং সেই কামনাও তোমার বিষয় কামই ত' হইল। তবে সেই বিষয়টা যে জাগতিক স্থূল বিষয় হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ তাহাতে সন্দেহ নাই। শাস্ত্রোক্ত মোক্ষ,—পরম আমির স্থাপনা। তাহাতে ভেদ নাই, কাযেই শাস্ত্র মোক্ষ-কামীকে অকামী বলিয়া ইঙ্গিত করে। আবার যখন এই বোধ হইবে যে যত কিছু বিষয় দেখিতে পাই, সকলই একমাত্র 'পর' পুরুষে পরিসমাপ্ত হইয়াছে,— যখন 'সর্ব্ব' বিষয় তাঁহাতে পরি-সমাপ্ত জানিয়া, তাঁহাকেই একমাত্র বিষয় বোধে তৎকামী হইবে,— তখনই দেখিতে পাইবে যে, যে কাম বিশিষ্ট বস্তুর মোহে তোমাকে বশ করিয়া নানাবিধি বহুর মধ্যে আন্দোলিত ও বিক্ষিপ্ত করিতেছিল, সেই কামই তোমাকে 'সর্ব্ব' ও 'বহু'

> গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
> প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্।—

পরপুরুষের অঙ্কে শায়িত করিয়াছে। স্থূল সূক্ষ্মাদি ভেদে কামের ও কাম্যবস্তুর যত প্রকারই অনুভূত হউক না কেন,—কাম চিরকালই সেই একমাত্র চরম নিবৃত্তি লাভের জন্যই প্রধাবিত হইতেছে। কামের এক লক্ষ্য সেই বস্তু, যাহা পাইলে আর কামকে অন্যত্র যাইতে হয় না—

> যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
> যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

ভাই! কামকে হেয় ও তুচ্ছজ্ঞান না করিয়া, কামের প্রকৃত লক্ষ্যাভিমুখী হইয়া তাহার দিকে অগ্রসর হইতে থাক; দেখ যে কাম তোমাকে কোথায় লইয়া যায়। পথে চলিতে চলিতে অহঙ্কার বশে কামের—লক্ষ্য ঘুরাইয়া দিয়া গতি পরিবর্ত্তন করিও না। কাম যাহার সে তাঁহার কাছে যাইবেই যাইবে। কামের লক্ষ্য সেই আনন্দময়ই ত'। হরিঃ ওঁ॥

চিন্তা-

ওঙ্কার তত্ত্ব।

জনশূন্য গভীর অরণ্যে জননী সন্তান প্রসব করিয়াই মূর্চ্ছিতা হইয়াছেন। স্নেহময়ী ধরিত্রী ধাত্রীর মত সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া আছেন। ভূমিষ্ট হইবামাত্র সন্তান কাঁদিয়া ফেলিল, জননী বুঝিলেন সন্তান ভূমিষ্ট ও জীবিত। অতিব ক্ষীণ পাণ্ডুমুখে হাসির ক্ষীণ জ্যোৎস্না ফুটিয়া উঠিল; এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা, আজ শেষ হইয়া গেল। এস্থলে শিশুর এই প্রথম ক্রন্দন তাহার প্রাণবত্তার লক্ষণ এবং জননীর নিকট উহা বড় শ্রুতি-সুখকর;—কারণ ঐ ক্রন্দনই জানাইয়া দিল যে তাঁহার সন্তান হইয়াছে।

নিশ্বাসের মত বিশ্ব-চরাচর যখন পরমেশ্বর হইতে বাহির হইল বা পরমেশ্বরই "বহু হইব" এই সঙ্কল্প করিয়া আপনিই বিশ্ব-চরাচররূপে বিবর্ত্তিত হইলেন,—তখন ঐ বিশ্ব চরাচর বহির্গত বা প্রকাশিত হইলে, তাহা হইতে একটী গম্ভীর ব্যাপক 'অ—অ—অ—উ—উ-উ—ম্' ধ্বনি উত্থিত হইল। তাহাই ওঙ্কার-ধ্বনি। এই ওঙ্কারধ্বনিই যেন পরমেশ্বরকে জানাইয়া দিল যে, জগৎ বহির্গত বা বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এই ওঙ্কারে জগতের প্রথম অভিব্যক্তি ঘটে বলিয়াই, ওঙ্কার পরমেশ্বরের বড় প্রিয়,—ব্রহ্মের একটী নাম। ব্রহ্ম বা পরমেশ্বর বা তদঙ্গীভূতা মায়াই জননী; জগৎ এই প্রসূত শিশু; শিশুর প্রথম ক্রন্দনই এই ওঙ্কারধ্বনি।

ওঙ্কার ব্রহ্মেরই নাম। ওঙ্কারে ব্রহ্মদৃষ্টি করার নাম ওঙ্কারোপাসনা। ওঙ্কারে তিনটী বর্ণ আছে—তাই ত্র্যক্ষর। এই তিনটী অক্ষরকে এক করা হইয়াছে—একাক্ষরও বটে। অ—উ—ম,—সত্ত্ব, রজঃ তম—এই ত্রিবিধ গুণে সৃষ্টি স্থিতি লয়।

"অকারো বিষ্ণুরুদ্দিষ্ট উকারস্তু মহেশ্বরঃ।
মকারেণোচ্যতে ব্রহ্মা প্রণবেন ত্রয়ো মতাঃ॥"

অ—সত্ত্বগুণ, উ—রজোগুণ, ম—তমোগুণ, ওঙ্কার ত্রিগুণ।

ছান্দোগ্যের প্রথমেই দেখিতে পাই—"ওমোমিত্যেতদক্ষমুদ্গীথমুপাসীত।" এই ওঙ্কারোপাসনা বৈদিক কাল হইতেই প্রচলিত। উদ্গীথ সামাবয়ব।

"অথ য উদ্গীথঃ স প্রণবো ; যঃ প্রণবঃ স উদ্গীথঃ"। বাক্যের সার গায়ত্রী। "যা সর্ব্বং ভূতং গায়তি ত্রায়তে চ" সা গায়ত্রী। সেই গায়ত্রীর সার ওঙ্কার।

সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি, তপাংসি সর্ব্বাণি চ যদ্বদন্তি।

যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তেপদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ।

যে পরম পদ বেদ কীর্ত্তন করে, তপস্যা যাহার বিষয় বলে, যাহার জন্য ব্রহ্মচর্য্য আচরিত হয়,—সেই পদই সংক্ষেপে বলিতেছি ;—"ওঁম্"।

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম হ্যেতদেবাক্ষরং পরং

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥

এই ওঙ্কারই অক্ষর ব্রহ্ম, এই উপাসনায় যাহার যে ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ হয়।

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠ এতদালম্বনং পরং।

এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

এই ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ ও পর আলম্বন। এই আলম্বন-স্বরূপ ওঙ্কার-তত্ত্ব অবগত হইলে ব্রহ্মলোকে বাস হয়। উপাসনার্থ ব্রহ্মের নামরূপ কল্পনা ; চিত্ত স্থিরতার জন্য আলম্বন আবশ্যক। বিনাবলম্বনে যেমন মানব শূন্যে অবস্থান করিতে পারে না, তদ্রূপ আলম্বন না পাইলে কেহ উপাস্যে একাগ্রচিত্ত হইতে পারে না। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন ত্রিগুণ, সেই ত্রিগুণ ব্রহ্মের বীজই এই ওঙ্কার বা প্রণব। ওঙ্কারে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছে। বাস্তবিক ওঙ্কার-তত্ত্ব জানিলেই ব্রহ্মতত্ত্ব জানা হয়।

নির্গুণ ব্রহ্মে ধ্যান সম্ভব নহে। কারণ "প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং" ; কোন একটী বস্তুকে আলম্বন স্বরূপ রাখিয়া, তৈল-ধারার মত চিত্তের যে একাগ্রতা তাহাই ত' ধ্যান ? সে ধ্যান সগুণ ব্রহ্মেই সম্ভব। অতএব সগুণ নামরূপাত্মক ব্রহ্মই উপাস্য। ওঙ্কার ব্রহ্মের নাম ইহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ওঙ্কারই ব্রহ্মের রূপ। "ওমিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং"– আত্মাকে ওঙ্কাররূপেই ধ্যান কর!

যে কোন নামেই পরমেশ্বরকে আহ্বান করা যাউক—তাহাই তাঁহার নাম ; চিত্তের একাগ্রতার জন্য যে কোন আলম্বনই গৃহীত হউক না কেন—তাহাই তাঁহার আলম্বন। তথাপি ওঙ্কারই প্রকৃত নাম, ওঙ্কারই শ্রেষ্ঠ আলম্বনরূপে শ্রুতিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে। কারণ ওঙ্কারই ব্রহ্মের নিকটতম নাম ; ইহা প্রথমেই বলা হইয়াছে। সৃষ্টির প্রথম শব্দ, বিশ্বের অনাহত ধ্বনি বলিয়াই পরমেশ্বরের

এই নাম বড় প্রিয়। অভীষ্ট বস্তুকে স্বানুকূল করিতে হইলে, প্রিয় নাম দ্বারা আহ্বানই কর্ত্তব্য। তবে সে আহ্বানে আকুলতা, ভক্তিভাব না থাকিলে অবশ্য বিফল হইবে। ওঙ্কার মাঙ্গলিক শব্দ,—

ওঙ্কারশ্চাথ শব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা।
কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্যাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ।

জপাদি কর্ম্ম পরমাত্মোপাসনার সাধনরূপে নির্দ্দিষ্ট বলিয়া ওঙ্কারের শ্রেষ্ঠতা। ওঙ্কারই পরমাত্মার নিকৃষ্টতম—প্রতীক। ওঙ্কারে পরমাত্ম-দৃষ্টি পূর্ব্বক উপাসনার নাম প্রতীকোপাসনা। ব্রহ্মদৃষ্টি ওঙ্কারোপাসনার মত আদিত্যাদিদৃষ্টে ওঙ্কারোপাসনার ব্যাপার, ছান্দোগ্যে কীর্ত্তিত আছে। তবে উভয়ের ফলের বিভিন্নতা আছে। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"

ওঁ উচ্চারণ করিয়াই ব্রহ্মবাদী মহাপুরুষগণ যজ্ঞ, দান, তপস্যাদি যাবৎ ক্রীয়াতেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রোক্ত যাবৎ কর্ম্মেই ওঙ্কার উচ্চারণ পূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিতে হয়। পুরাণে ওঙ্কারের অর্থ, অ—ভূর্লোক, উ—ভুবর্লোক, ম্—স্বর্লোক, মোট কথা সমস্ত বিশ্বের শক্তি, সমগ্র বেদবেদ্য তত্ত্বই এক ওঙ্কারেই নিহিত।

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি॥

<u>বীজমন্ত্র অল্পাক্ষরেই হওয়া উচিত।</u> কারণ মন্ত্রের ভিতর দিয়া উপাস্যের দিকে চিন্তাধারা লইয়া যাইতে হয়। সেই মন্ত্র অধিকাক্ষর হইলে শব্দের উচ্চারণের দিকেই লক্ষ্য থাকে বলিয়া, তাদৃশী একাগ্রতা জন্মে না। সমস্ত পৃথিবীকে যেমন আমরা মানচিত্রের ভিতর ধরিয়া রাখি, মানচিত্র দৃষ্টে সমস্ত বিশ্বের ইয়ত্তা করি,—তদ্রূপ অচিন্ত্য অননুমেয় মহান্ তত্ত্বকে ওঙ্কাররূপ ক্ষুদ্র বীজ মধ্যে পুরিয়া রাখি; ওঙ্কারজ্ঞানে জ্ঞানাতীতের অবধারণ, ওঙ্কার-ধ্যানে পরমাত্মার ধ্যান করি। তবে তাদৃশী ভক্তি একাগ্রতা-সহকারী হওয়া আবশ্যক যাহার যাহা নাম, সেই নামে ডাকিলে তবে সে শুনিতে পায়। তবে স্বরের উচ্চতা, প্রতিরোধক ব্যবধানের অভাব, প্রভৃতির সহকারিতা অবশ্য প্রয়োজনীয়। তদ্রূপ ওঙ্কার পরমেশ্বরের প্রিয়-নাম, শ্রেষ্ঠ আলম্বন ও স্বরূপ হইলেও, ভক্তি, উপাসনাত্মক জ্ঞান, কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ও যোগ প্রভৃতিরও সহকারিতা আবশ্যক।

ধ্বনির স্বভাবই আহত হওয়া; ওঙ্কার ধ্বনি কিন্তু আনহত। কারণ ওঙ্কার অন্য ধ্বনির মত নহে, তাহা বলিয়াছি। ওঙ্কার ধ্বনি সৃষ্টির প্রথম ধ্বনি—স্বভাবতঃই অনাহত। সাগরের কল্লোল-রব, বাতাসের শন্ শন্ শব্দ, যেমন তাহাদের প্রকৃতিজ, এই ওঙ্কারও বিশ্বের অনাদি অনন্তকালস্থায়ী প্রকৃতিজ ধ্বনি।

আমরা উপাস্যে যে একাগ্রতা দিতে পারি না, তাহার প্রধান প্রতিবন্ধক, বাহ্য-বিষয়ে চিত্ত-বিক্ষেপ। এই চিত্ত-বিক্ষেপ আমাদিগের প্রতিনিয়তই ধ্যানের বিঘ্ন করে। ওঙ্কার বিশ্বের সহিত ওতঃপ্রোতঃ; কাজেই ওঙ্কার যদি ঠিক মত উচ্চারণ করা যায়, তাহা হইলে বিশ্বের যাবতীয় শব্দকেই জয় করা হয়। বিশ্ব আর প্রতিবন্ধকতা করে না। তখন অন্তঃকরণ বাহ্য বিষয় হইতে বিমুক্ত হইতে থাকে। এই ওঙ্কারধ্বনির ইহাই বৈচিত্র্য। স্বরবর্ণ ও এবং হসন্ত ম্=ওম্, এই বলিলেই ওঙ্কার উচ্চারণ হইবে না। এই উচ্চারণে চিত্তে একাগ্রতা উপদেশ সাপেক্ষ। মার্জ্জিত-চিত্ত ব্যক্তিই এই উপদেশের অধিকারী। এই ওঙ্কার উচ্চারণ শিক্ষা আজি কালিকার অধিকাংশ ব্রাহ্মণই জানেন না। বঙ্গদেশে এই ওঙ্কারোচ্চারণের ক্রম, আরোহ, অবরোহ প্রণালী শিক্ষা দিবার কেহই নাই বলিলেই হয়। উপযুক্ত গুরুর নিকট শিক্ষা, ফলবতী করিবার জন্য আকুলতা ও অধ্যবসায় না থাকিলে কেহই সফলকাম হইবেন না।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ

অর্থ]

চিল্কা

সিন্ধু-জননীর কণ্ঠ বাহু-পাশে করিয়া বন্ধন,
রজনীর শেষ যামে ওই হের নিদ্র-নিমগন,—
চিল্কা সুকুমারী।

শুভ্র নেত্রে শুক-তারা চেয়ে আছে বালার বদনে,
কুঞ্চিত কুন্তলদল আশে পাশে লুটিছে চরণে,
স্নিগ্ধ নীলাম্বরীখানি উড়িতেছে ঊষার পবনে;—
স্বচ্ছ নগ্ন বক্ষমাঝে স্বপ্ন ঊর্ম্মি মৃদু আন্দোলনে
পড়িছে বিথারি’।

নীরবে, নীরদাকৃতি　নভশ্চুম্বী　তালীবনাবৃত,
স-চ্ছায় শ্যামল-কায়　শৈলপুঞ্জ.　মেঘ-মেদুরিত,
বিরচি' বিপুল ব্যূহ,　দিক্-চক্র　করিয়া বেষ্টিত ;—
রক্ষিছে প্রহরীরূপে　প্রকৃতির　নিভৃত-রক্ষিত
সে দিব্য কুমারী।

অনাঘ্রাত ঘনীভূত　সুধা যেন,　ধরিয়া শরীর,
এলাইয়া আপনারে,　ছড়াইয়া　ধারা মাধুরীর,
রচিয়াছে কিশোরীর　অপূর্ব্ব সে　লাবণ্য রুচির ,—
নেত্র পরশনে বুঝি　হ'বে ম্লান　সে রূপ মদির
স্বপন-সঞ্চারী !

সহসা বিচিত্র-পক্ষ　লক্ষ লক্ষ　বিহঙ্গম-রবে,
জাগি' বালা, আলুথালু　দিঠি তুলি　চাহিল নীরবে ;—
পূর্ব্বাশার পানে ;—

অমনি পশিল নেত্রে　আধ-ঘুমে　আধ-জাগরণে,
রবির রক্তিমচ্ছবি,—　যেন মরি　যাদু-পরশনে,
গূঢ় মর্ম্ম-স্তর ভেদি'　না জানি কি　অবিদিত ক্ষণে ;—
ফুটিয়া উঠিল বুঝি　স্বপ্ন-ফুল　স্মৃতি সমীরণে
নিশি অবসানে !

শিথিলিল বাহু-বন্ধ ;　ভুরু ভঙ্গে　গ্রীবা উত্তোলিয়া,
বিস্ময়ে চাহিলা বালা ;　দীর্ঘায়ত　নেত্র-পুট দিয়া,
সদ্য-বিকশিত মরি　সে মাধুরী　বার বার পি'য়া ;—
না মিটিল তৃষা তা'র !　চিত্ত-হ্রদ　উঠিল নাচিয়া
কি অজ্ঞাত টানে !

মুহূর্ত্তে ভুলিয়া গেল　জননীর　আজন্ম-যতন,
নিমিষে কিশোর হিয়া　আস্বাদিল　তরল যৌবন,
পাগ্‌লী করিল তারে　নবোত্থিত　প্রেমের স্বপন ;—
গর্ব্ব ভুলি, সর্ব্ব ভুলি,　আপনারে　দিল বিসর্জ্জন
কা'রে—কেবা জানে !

মধুর মধ্যাহ্ন তা'রে মধু-স্রোতে করিল বিহ্বল,
দীপ্ত রবি কোটি করে স্পর্শ সুখে করিল চঞ্চল ;—
যুবতীর হিয়া !

কভু বা মেঘের খেলা শৈল-চূড়ে রচে ইন্দ্রজাল,
কভু বক্ষে ফেলে ছায়া সৃজি' গূঢ় স্নিগ্ধ অন্তরাল,
প্রচণ্ড কিরণে কভু ধূম সম ধীরে গিরিমাল ;—
ধীর পদে অপসরে ; কভু তুঙ্গ তরঙ্গ বিশাল
ছুটে গরজিয়া ।

তার পর, অতি ধীরে সন্ধ্যা যবে নামে নম্রমুখে,—
দিক্ হ'তে দিগন্তরে ঢলে' পড়ে সে মথিত বুকে,
অস্ত রবি, ঢালি' তার শেষ রশ্মি আরক্ত চিবুকে ;-
সোহাগে যতনে : তবু প্রেম গর্ব্বে মাতৃ-অঙ্কে সুখে
রহে সে ডুবিয়া !

রসময়ী চিল্কা-বালা সে মুহূর্ত্তে হয় রে চিন্ময়,
প্রেমের আনন্দ-সুধা চিত্ত তার করে রে তন্ময়,
মরি সে অপূর্ব্ব-দৃষ্ট নব-ভুক্ত অমর প্রণয় ।—
যামিনীর সারা যাম রাখে তারে সফলতাময়
স্বপ্নে নিমজ্জিয়া !

মায়াময়ী প্রকৃতির তপ্ত অঙ্কে স্নেহ-রস-পানে,
বর্দ্ধিত ভকত-চিত্ত ওই মত ক্রীড়া-রত প্রাণে
কিছু না জানিত ;

'বিষয়'-পর্ব্বত কত ঘিরি' সেই কুমারী-হৃদয়,
কৌতূহলী নেত্র হ'তে রক্ষিবারে সদা রত রয়,
জননীর স্নেহ বিনা না বুঝিত অপর প্রণয়,
উতলা আপনা-ভোলা দিব্য প্রেম চির মধুময়,
ছিল অ-স্বাদিত ।

ছায়াচ্ছন্ন সে দুর্গম গিরি-চক্র ভেদি' অকস্মাৎ,
আমর্ম্ম করিয়া দীপ্ত, ঢালি' স্নিগ্ধ জ্যোতির প্রপাত,
চিন্ময় পুরুষ এক সমুদিল করি' আত্মসাৎ;—
অখণ্ড হৃদয় খানি! অভিনব ভাব-অভিঘাত
উচ্ছ্বাসিল চিত!

তুলিল জননী-স্নেহ; স্বপ্ন-মগ্ন রহি' জাগরণে,
দেশ কাল গেল ভুলি' ছবি যবে লুকাল গোপনে,
না ভাঙ্গিল স্বপ্ন তবু; জননীরে বাঁধি' আলিঙ্গনে,—
সার্থক ভাবিল জন্ম; বিরহিণী মানস-মিলনে,
আনন্দ-মূর্চ্ছিত!

শ্রী ভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

অর্থ]

প্রস্থান-ভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পাণিনির ব্যাকরণ সুবিপুল; সূত্র সংখ্যাও অত্যধিক কিন্তু সূত্রবিন্যাস প্রণালী ভাল নয়। গ্রন্থাভ্যাসেও সুদীর্ঘ কালের প্রয়োজন হয় এবং বিচারেরও বাহুল্য আছে; কিন্তু সংস্কৃত ভাষাজ্ঞানে সমধিক উপযোগী, শাস্ত্রান্তরের অধ্যয়নে অতিশয় সহায়ক, প্রাচীন শব্দাবলীর অববোধে বিশেষ সহায়ক। পাণিনি ব্যাকরণের উপযোগিতা সম্বন্ধে, তদীয় মহাভাষ্যের প্রারম্ভে বহু প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। 'সারস্বত' ও 'চন্দ্রিকা' প্রভৃতি ব্যাকরণ ভাষাজ্ঞানে বিশেষ উপকারক বলিয়া প্রতীতি হয় না। ব্যাকরণাবলীর মধ্যে পাণিনির পর দ্বিতীয় স্থানের অধিকার-যোগ্যতা 'কলাপ' ব্যাকরণেরই রহিয়াছে। কোন কোন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বলেন, যে "শতাচ্চ ধন্যতাবশতে" (পাঃ সূঃ ৫।১।২১) এই সূত্র দ্বারা কাশকৃৎস্ন-কৃত ব্যাকরণের অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু আমরা সূত্র, বার্ত্তিক, তত্ত্ববোধিনী পড়িয়া অনুমানের কোন হেতু পাই নাই।

পাণিনি ব্যাকরণের অপর নাম ত্রিমুনি-ব্যাকরণ *, যে হেতু পাণিনির সূত্রের, বৃত্তি-প্রণেতা বররুচি, ভাষ্যরচয়িতা পতঞ্জলি ; এই তিন মুনির কৃত সন্দর্ভ ত্রিতয়ে মিলিত হইয়াই পাণিনির বৃহদ্ব্যাকরণরূপে পরিণত হইয়াছে। পাণিনির স্বর ও বৈদিক প্রক্রিয়ার আশ্রয় ভিন্ন বৈদিক পদ সমূহের সাধুত্ব ও অসাধুত্ব নির্ণয় বড়ই কঠিন হয়। এইরূপ প্রাচীন কিম্বদন্তী আছে যে, মহর্ষি কাত্যায়ন বররুচির শরীর ধারণ করিয়া "কৃৎপ্রকরণ" প্রণয়ন করিয়াছিলেন। বেদান্ত দর্শনের "শাস্ত্র-যোনিত্বাদধিকরণের" ভাষ্যে,ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রসঙ্গ বা উদাহরণচ্ছলে বলিয়াছেন, যথা—"যে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ হইতে বিপুল অর্থ-পূর্ণ শাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হয়, সে পুরুষে সেই শাস্ত্র অপেক্ষা অধিক বিজ্ঞান বিদ্যমান থাকে ; ইহা সকলেই জ্ঞাত আছেন। পাণিনির শাস্ত্রে যে জ্ঞান লাভ করা যায়, সে জ্ঞান অপেক্ষা পাণিনি মুনির নানাবিধ জ্ঞান ছিল"†। (বেদান্ত দঃ ১।১।৩)।

ভাষ্যকার মহর্ষি পতঞ্জলি সম্বন্ধে ব্যাকরণ শাস্ত্রীয় প্রণামাঞ্জলি শ্লোকে এইরূপ কথিত আছে যে, "যিনি স্বয়ং অনন্তদেবের অবতার, যিনি যোগদর্শন প্রকাশ করিয়া নিখিল-মানবের চিত্ত-মল বিদূরিত করিয়াছেন, ব্যাকরণ বিবরণ করিয়া বাক্য-দোষ পরিহার করিয়াছেন, এবং চরক-সংহিতা নামক মহাগ্রন্থ দ্বারা শরীর-মল (ব্যাধি প্রভৃতি) ক্ষালিত করিয়াছেন, সেই পন্নগরাজকে অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া নমস্কার করিতেছি।" ‡ পাণিনি সম্বন্ধে স্বতন্ত্র বিবরণ প্রবন্ধান্তরে প্রকাশ্য। পাণিনির সময়-নিদ্ধারণ সম্বন্ধে, সাহেবদের মত ঠিক বলিয়া আমাদের বোধ হয় না।

সংক্ষেপে ব্যাকরণের কথা শেষ করিয়া, অধুনা চতুর্থ বেদাঙ্গ নিরুক্ত গ্রন্থের বিষয় সংক্ষেপে লিখিতেছি। এই গ্রন্থ বেদাঙ্গ ষট্‌কের মধ্যে চতুর্থ অঙ্গ। যদ্দ্বারা নিশ্চয়রূপে বৈদিক শব্দরাশির অর্থ নির্ণীত হয় তাহাই "নিরুক্ত" গ্রন্থ নামে

(*) বৃত্তিকারং বররুচিং ভাষ্যকারং পতঞ্জলিং, পাণিনিং সূত্রকারঞ্চ প্রণতোঽস্মিমুনিত্রয়ং"। (সিদ্ধান্তকৌমুদী)।

(†) যদ্বিস্তারার্থং শাস্ত্রং যস্মাৎ পুরুষবিশেষাৎ সম্ভবতি যথা ব্যাকরণাদি পাণিন্যাদেঃ, জ্ঞেয়ৈকদেশার্থমপি সতথোঽধিকতর বিজ্ঞান ইতি প্রসিদ্ধং লোকে" (ভাষ্য° ১।১।৩)

(‡) 'যোগেন চিত্তস্য, পদেন বাচা, মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন, যোঽপাহরৎ পন্নগরাজঃ পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরানতোঽস্মি"।

অভিহিত। নির্-বচ্+ক্ত, ভাবে অথবা যাহা বৈদিক শব্দের অর্থ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক বিশেষরূপে কথিত। *

এই গ্রন্থ প্রণেতা মহর্ষি যাস্ক, বৈদেশীয় পাণ্ডিত্যাভিমানীরা, মহর্ষি যাস্ক ও মহর্ষি বাৎস্যায়নকে প্রচীন ঋষিগণের মধ্যে স্থান দিতে চাহেন না। তাঁহারা এই ঋষিদ্বয়কে আধুনিক অর্থাৎ চাণক্যের সম-সাময়িক বলিয়া থাকেন। চাণক্য সম্বন্ধে সামান্য ভাবে প্রমাণ থাকিলেও, যাস্ক সম্বন্ধে আধুনিকত্বের বিশেষ প্রমাণ না থাকাতে, আমরা তাঁহাদের ভ্রান্ত মতের সমর্থন করিতে পারিনা। যাস্কের মত ভগবান্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় ভাষ্যে প্রীতি সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন।। ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকা মতে নিরুক্ত বেদ-ব্যাখ্যার এক প্রধানতম উপকরণ। তন্মতে ১ম বেদব্যাখ্যাতা নিরুক্তকার, ২য় শাকপুণি, ৩য় ঔর্ণবাব, ৪র্থ স্থৌলাষ্টিবী। কাহারো মতে যাস্ক শাকপুণি প্রভৃতির পরবর্ত্তী। নিরুক্তের ১ম ব্যাখ্যাকার উগ্রাচার্য্য, দ্বিতীয় দুর্গাচার্য্য, ৩য় স্কন্দস্বামী, ৪র্থ দেবরাজ যজ্বা। সাধারণতঃ প্রতিপাদ্য বিষয় (১) নাম (২) আখ্যাত (৩) উপসর্গ (৪) নিপাত-লক্ষণ (৫) ভাব বিকার লক্ষণ। ‡ কোন কোন মতে নিরুক্ত গ্রন্থে চৌদ্দটী অধ্যায়ে ৪৮০টী বর্ণিত বিষয় আছে। অপর আচার্য্যের মতে ৪৪৮টী ভাগ বা প্রকরণ আছে। অন্য ব্যাখ্যাতৃর মতে ৪৪৩টী অধ্যায় বা কাণ্ড আছে। ১ম, নৈর্ঘণ্টু কাণ্ডে ৫টী অধ্যায়, ২য় নৈগম কাণ্ডে ৬টী অধ্যায়, ৩য় দৈবত কাণ্ডে ৬টী অধ্যায়, ৪র্থ পরিশিষ্টে ১টী অধ্যায়। উদাহরণ-স্বরূপ বেদ বাক্যকে নিগম বলা হয়; নিগমাংশের ভাষ্যকার স্কন্দস্বামী।

* "বর্ণাগমো বর্ণবিপর্য্যয়শ্চ দ্বৌ চাপরৌ বর্ণবিকারনাশৌ।
ধাতোস্তদর্থাতিশয়েন যোগস্তদুচ্যতে পঞ্চবিধং নিরুক্তম্"।

† "শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং" ইত্যাদি। (পাণিনীয়-কাবিকা)
....নিরুক্তং জ্যোতিষন্তথা। (মাণ্ডূক্যোপনিষদ্)
"ছন্দশ্চেতি ষড়ঙ্গানি বেদানা· বৈদিকা বিদুঃ।" শব্দরত্নাবলী
"প্রস্তাবস্তু প্রকরণং নিরুক্তং পদভঞ্জনং।" হেমচন্দ্র-কোষঃ।
"যাস্কপরিপঠিতানান্ত ষড়্ভাববিকারাণাং ত্রিধেবান্তর্ভাবাৎ" ইত্যাদি।—

‡ "নামাখ্যাতোপসর্গ-নিপাতাশ্চেতি।" শঙ্কর ভাষ্য (১।১।২) নিরুক্ত এবং মহাভাষ্য। ।১।২।

নির্ঘণ্টু কাণ্ডের ছয়টী অধ্যায়ের "ঋজ্বর্থ" নামক ব্যাখ্যাকার জম্বুপথাশ্রম-বাসী দুর্গাচার্য্য। দেবরাজ যজ্ঞকৃত নির্ঘণ্টু কাণ্ডের ৫টী অধ্যায়ের ব্যাখ্যা রহিয়াছে; এই ব্যাখ্যার নাম "নির্ব্বচন"। এতদ্ভিন্ন ক্ষীর স্বামী, অনন্তাচার্য্য কৃত টীকাও ছিল। কোন কোন গ্রন্থে ইহাঁদের ব্যাখ্যাতৃ-রূপে নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই নিরুক্ত, নির্ঘণ্টুর নাম বহু গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। যাস্ক ঋষি, ভাব (পদার্থ) বিকার ছয় প্রকার স্বীকার করেন। যথা—(১) অস্তি, (২) জায়তে, (৩) বর্দ্ধতে, (৪) বিপরিণমতে, (৫) অপক্ষীয়তে, (৬) নশ্যতি। ভাষ্য-কার শঙ্করাচার্য্যপাদ, এই ষড়্ভাব বিকারকে শ্রুতি-প্রতিপাদিত 'জন্ম,' 'স্থিতি' ও 'ভঙ্গের' অন্তর্গত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রাচীন ঋষি কৌৎস বেদের বিরুদ্ধে যে মত উত্থাপন করিয়াছেন, যাস্ক স্বকীয় নিরুক্তে সেই মত খণ্ডন করিয়াছেন। বহু স্থানে মহর্ষি জৈমিনি ও যাস্কের এক মত দেখা যায়। (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র সাংখ্য-সাগর-বেদান্ত-ভূষণ।

অর্থ]

বিবর্ত্তবাদ।

প্রাকৃতিক ও আধ্যাত্মিক

কোনও একটী বস্তুর কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করা মানবের প্রকৃতি। এই প্রকৃতি অনুসারেই আদিমকাল হইতে সকলে জগতের কারণ অনুসন্ধানে ব্যস্ত। জগতের কারণ কি—এ জগত কি নির্ম্মিত? যদি নির্ম্মিত হয়, তবে নির্ম্মাতা কে,—কবে নির্ম্মাণ হইল? এই সকল প্রশ্ন চিরকালই উত্থিত হইতেছে। কে বলিবে ইহার কোনও মীমাংসা হইয়াছে কি না, কিম্বা হইবে কি না।

পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক প্রচলিত ধর্ম্মই কতকগুলি বিশ্বাসের উপর স্থাপিত। এই সকল বিশ্বাসের ভিত্তি কি, বা ইহারা আমাদের বুদ্ধির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে কি না,—ইহা কোন ধর্ম্ম-গ্রন্থই মীমাংসা করিতে প্রস্তুত নহেন। এই প্রকাণ্ড বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড কোনও এক সময়বিশেষে এবং কোনও নির্ম্মাতাদ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে, এই বিশ্বাস—এই তত্ত্ব সকল ধর্ম্ম-গ্রন্থই মানিয়া লয়। খৃষ্টিয়ানেরা বলেন 'God created the world in six days' ঈশ্বর ছয়দিনে* এই পৃথিবী

* এই ছয়দিন বোধ হয় আমাদের ছয় ক্রমভিব্যক্তির স্তব। পং সং

সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম-গ্রন্থাদিও এই মতের সমর্থন করেন। এই বিশ্বাস যে শুধু কেবল ধর্ম্মগ্রন্থেই দৃষ্ট হয় তাহা নহে। অনেক দার্শনিক পণ্ডিতও এই মত যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। আমাদের ন্যায়-দর্শন ও বৈশেষিক দর্শন সৃষ্টিতত্ত্বে বিশ্বাস করেন। বৈশেষিক সূত্রে ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও কার্য্যকারিত্ব এইরূপে প্রমাণিত হইয়াছে "ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ ইতি" অর্থাৎ ক্ষিতি, অপ ইত্যাদি কার্য্য স্বরূপ (Effect) সুতরাং ইহাদের কর্ত্তা (Cause) আছেন, তিনিই ঈশ্বর। ন্যায়-দর্শনের সিদ্ধান্তও অনেকটা এইরূপ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন, ঈশ্বর ও জগতের মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ স্থাপন করিতে চান।* তাঁহাদের মতে এই সান্ত জগৎ কোনও এক বিশেষ সময়ে ও বিশেষ প্রয়োজন (purpose) হেতু ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছিল। অধিকাংশ গ্রীক দার্শনিকেরা এই মতের সমর্থন করেন। আধুনিক ইউরোপীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে Liebnitz ও Martineau এই মত দার্শনিক ব্যাখ্যাদিতে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। Liebnitzএর মতে ঈশ্বর monad† নামক কোনও একটী পদার্থের সৃষ্টি করিয়াছেন। Monadএর কতকটা অংশ প্রাকৃতিক ও কতকটা আধ্যাত্মিক। সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড এই সকল monadএর একটা সমষ্টি মাত্র। ভগবান্ দয়াময়, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিও সুন্দর। এই জগৎ সর্ব্বোৎকৃষ্ট জগৎ (the best of all possible worlds) Martineauএর মতে ভগবান্ শূন্য শক্তি বহীন দিক্ (pure unresisting space) হইতে এই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর অনন্ত,—জগৎ সান্ত, ঈশ্বর স্রষ্টা,—জগৎ সৃষ্ট।

উপরোক্ত মতের বিরুদ্ধে আমরা কতকগুলি কথা বলিব। সৃষ্টিতত্ত্ব ঈশ্বর ও জগৎকে পৃথক্ করিয়া দেয়;—ইহা ঈশ্বরকে জগতের বাহ্যিক কারণরূপে (External cause) প্রতিপন্ন করে। কিন্তু ঈশ্বর যদি অনন্ত—অসীম হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার বাহিরে অন্য বস্তুর অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব? ঈশ্বর কি নিমিত্ত এ ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিলেন? কেহ বলেন লীলার জন্য; কেহ বলেন

* বা, কার্য্যকারণ শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া জগতের দ্বারা ঈশ্বরের স্থাপনা। পং সং

† Monad ভাগবতের জীব যথা, স এব জীব বিবরপ্রসূতিঃ। ১১।১২।১৭।

দয়া-প্রকাশের জন্য। কিন্তু এই উভয় উত্তরই অসন্তোষজনক। তাহার পর শুদ্ধ শূন্য হইতে (nothingness) এ পৃথিবীর সৃজন অসম্ভব। শূন্য হইতে কোনও বস্তুর উদ্ভব আমাদের কল্পনা বহির্ভূত। Martineauএর শূন্য শক্তি বিহীন (space—স্বভাব) কল্পনাতীত। এই নিমিত্ত হিন্দু ধর্ম্মে বলে যে, প্রথমে ঈশ্বরেও chaos ছিল। ঈশ্বর chaos হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হিন্দু দার্শনিকের মধ্যে বৈশেষিকেরা ও গ্রীক দার্শনিকদিগের মধ্যে Democritus ইত্যাদি বলেন,—যে ঈশ্বর পরমাণু হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে ঈশ্বর অনন্ত হইলেন কিরূপে? অনন্ত কেবল একটী হইতে পারে, জগতে দুইটী অনন্তের অস্তিত্ব অসম্ভব; সুতরাং ঈশ্বরের অনন্তত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, তাঁহাকে জগতের কার্য্যকারী কারণ ও উপাদান কারণ উভয়ই বলিতে হয়। তারপর, কোনও এক সময় বিশেষে এই জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধেও ঘোরতর আপত্তি হইতে পারে। ঈশ্বর পূর্ব্বে পৃথিবী সৃজন করেন নাই—সেই সময়েই বা করিলেন কেন? তিনি কি জগৎ সৃষ্টি দ্বারা নিজের প্রকৃতির কোনও অভাব মোচন করিলেন? জগৎ-বিহীন ঈশ্বর অপেক্ষা কি তবে জগৎ স্রষ্টা ঈশ্বর পূর্ণতর?* এই সকল আপত্তির এ পর্য্যন্ত কোনও সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। তাহার পর আমার বোধ হয় নিতান্ত ধর্ম্মের গোড়া ভিন্ন আর কেহই বলিতে পারিবেন না, যে এই জগৎসৃষ্টি সম্পূর্ণ সুন্দর। যাঁহারা একটু দেখিয়াছেন—একটু চিন্তা করিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য Schopenhauerএর মত সমর্থন না করিলেও তাঁহাদের স্বীকার করিতে হইবে, যে এ জগতে অনেক অসম্পূর্ণতা রহিয়াছে। কবি জিজ্ঞাসা করিয়াছেন *'অশুভ সৃজন কার?'* *কিন্তু ইহার উত্তর এ পর্য্যন্ত কেহ দিয়াছেন কি? ঈশ্বর যদি একই সময়ে জগতের প্রত্যেক বস্তু সৃজন করিয়া থাকেন, তাহা* হইলে তিনিই সে সময়ে অশুভ সৃষ্টি করিয়াছেন। খৃষ্টানদের শয়তান-তত্ত্ব আমাদের নিকট বড়ই অদার্শনিক বলিয়া বোধ হয়। ঈশ্বরের কি শয়তানকে পরাভব করিবারও ক্ষমতা ছিলনা?

উপরোক্ত আলোচনার পর আমরা বোধ হয় বলিতে পারি যে, সৃষ্টিতত্ত্ব

* এ বিষয়ে আধুনিক থিয়সফিষ্টদের মত এই যে, জীব ঈশ্বরাংশ হইলেও সংসার ভ্রমণের ফলে পূর্ণতর হয়। ইহা বেদান্ত স্বীকার করেন না। পং সং।

ভ্রমাত্মক। ইহার বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি উত্থাপিত করা হইয়াছে, তাহার সন্তোষজনক মীমাংসা করিতে হইলে, আমাদিগকে সৃষ্টিবাদ ত্যাগ করিয়া বিবর্ত্ত-বাদের আশ্রয় লইতে হইবে। এখন দেখা যাউক বিবর্ত্তন কাহাকে বলে। কোনও একটী নিম্নতর বস্তু হইতে শ্রেষ্ঠতর বস্তুর উদ্ভবকে এবং কোনও বস্তুর অবিশেষ অবস্থা হইতে বিশেষ অবস্থা প্রাপ্তিকে বিবর্ত্তন কহে। সুতরাং যে সকল মতে এই সমস্ত ব্যাপারকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরের ক্রমবিকাশ বলে, অবিশেষ (homogeneous) হইতে বিশেষের বিকাশ বলিয়া মনে করে, সেই সমস্ত মতই বিবর্ত্তবাদের অন্তর্ভুক্ত।

বিবর্ত্তবাদীদিগকে আমরা সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি। কোনও বিবর্ত্তবাদী বলেন যে, এই জগতের ক্রমবিকাশ সম্পূর্ণরূপে প্রাকৃতিক। কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই এই সমস্ত জটিল বিশ্বব্যাপার সংসাধিত হইতেছে। ইহার মধ্যে কোনও চিন্ময় সর্ব্ব-নিয়ন্তা জ্ঞানী পুরুষের (subject) আবশ্যক নাই। আবার কেহ কেহ বলেন যে, এই ক্রমবিকাশের মধ্যে জ্ঞান বা বুদ্ধি না থাকিলে এ বিশ্ব-বিবর্ত্তন চলিতে পারে না। এখন আমরা এই দুই মতের আলোচনা করিব।

আমাদের হিন্দু-দর্শনের মধ্যে সাংখ্য-মতকে প্রাকৃতিক বিবর্ত্তন বলা যাইতে পারে। সাংখ্যের মতে প্রকৃতি ও পুরুষ জগতের চরম দ্বৈত (Duad)। এই প্রকৃতি ও পুরুষের সংমিশ্রণেই জগতের উৎপত্তি। প্রকৃতিই জগতের মূল উপাদান। ইহার আদি নাই—অন্ত নাই; ইহা অতি সূক্ষ্ম ও নির্ব্বিশেষ। ইহার পরিণামে এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। সাংখ্য সূত্রে লিখিত আছে 'প্রকৃতেরাদ্যোপা-দানতা'—প্রকৃতিই জগতের আদি ও উপাদান। সাংখ্যেরা প্রকৃতির আর একটী নাম দেন 'অব্যক্ত'—অর্থাৎ প্রকৃতি, প্রকৃতি-অবস্থাতে আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নহে। এখন দেখা যাউক যে এই অব্যক্ত, নির্ব্বিশেষ প্রকৃতি হইতে এই অনন্ত বস্তু সমাহিত, অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগতের উৎপত্তি কি প্রকারে সম্ভব। সাংখ্য-মতে প্রকৃতির স্বভাবই পরিণাম—প্রকৃতি কথনই অব্যক্ত অবিশেষ অবস্থায় থাকিতে পারে না; ইহা স্বভাবতঃই পরিণামগ্রস্ত হয়। প্রকৃতির নির্ব্বিশেষ অবস্থার বিচ্যুতি ঘটিলে, ইহা হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। আবার মহত্তত্ত্বের বিকারে অহঙ্কার তত্ত্বের উৎপত্তি; তাহা হইতে আবার পঞ্চতন্মাত্র বা সূক্ষ্ম পঞ্চ-

ভূতের উদ্ভব হয়। এইরূপে সেই এক অনাদি, অনন্ত, নির্ব্বিশেষ প্রভৃতি হইতে সমস্ত জড় ও আধ্যাত্মিক জগতের উৎপত্তি! কিন্তু এক প্রশ্ন হইতে পারে—যে প্রকৃতির বিবর্ত্তন বা পরিণাম কাহার দ্বারা সংঘটিত হয়? ইহার উত্তরে সাংখ্যেরা বলিবেন যে, প্রকৃতি স্বভাবতঃই এইরূপ। দুগ্ধ যেরূপ স্বতঃই দধিতে পরিণত হয়, এক ঋতু যেরূপ আর এক ঋতুর স্বতঃই অনুবর্ত্তী হয়, প্রকৃতির বিবর্ত্তনও ঠিক সেইরূপ স্বভাবসিদ্ধ। এই বিষয়ে সাংখ্যদিগের সহিত ইউরোপীয় দার্শনিক Spinozaরেরও এক মত। তিনি বলেন যে মাকড়সা যেরূপ নিজের অভ্যন্তর হইতে জাল বিস্তার করে, অপর কোনও বাহ্যিক বস্তুর সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না, প্রকৃতিও সেইরূপ আপনা হইতে আপনিই বিবর্ত্তিত হয়, অপর কোনও বাহ্যিক চেতন কর্ত্তার (Conscious Subject) মুখাপেক্ষী হয় না। প্রকৃতির বিবর্ত্তন কিন্তু নিজের জন্য নয়;- এই বিবর্ত্তন পুরুষের ভোগের জন্য। প্রকৃতি জড়—পুরুষ চেতন। জড়ের বিবর্ত্তন, জড় কখনও নিজে অনুভব (perceive) করিতে পারে না; সুতরাং এই জড়ের বিবর্ত্তনের অনুভূতি ও ভোগের জন্য চেতন পুরুষের আবশ্যক। কিন্তু ইহা নিশ্চয় যে এই বিবর্ত্তনের জন্য পুরুষ কোনও প্রকারে কর্ত্তা নয়—পুরুষ শুধুই দ্রষ্টা—শুধুই ভোক্তা।

অতএব এখন দেখা যাইতেছে যে সাংখ্য-মত প্রাকৃতিক বিবর্ত্তবাদ এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড প্রকৃতির বিকৃতি মাত্র। প্রকৃতির বিবর্ত্তন Wilson সাহেবের ভাষায় বলিতে হইলে intuitive necessity—স্বভাবসিদ্ধ। এই বিবর্ত্তনের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতন কর্ত্তার হস্তক্ষেপের কোনই আবশ্যকতা নাই। সাংখ্য-মতের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার পর আমরা আধুনিক ইউরোপীয় দাশনিকদিগের বিবর্ত্তবাদের আলোচনা করিব।

আলোচনার সুবিধার জন্য আমরা প্রথমে Laplace ও Herschelএর (Terrestrial Evolution জাগতিক বিবর্ত্তবাদ ও Lamarck এবং Darwinএর জৈবিক বিবর্ত্তন (Animal Evolution) ব্যাখ্যা করিব।

কথিত আছে যে Laplaceএর জগদ্বিখ্যাত (Celestial Mechanics) পুস্তক প্রণয়নের পর একদিন সম্রাট্ Napoleon তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি আকাশ সম্বন্ধে যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বরের বিষয় কিছু বলেন নাই কেন। ইহাতে Laplace গর্ব্বিতভাবে উত্তর করিয়াছিলেন, সম্রাট্ ঃ

জগৎ-নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও আবশ্যকতা উপলব্ধি করিতে পারি-নাই। সুতরাং Laplaceএর জাগতিক বিবর্ত্তন সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক। Laplace এবং Herschelএর মতে সমস্ত জগৎ প্রথমে (Nebulous) অবস্থায় ছিল। এ অবস্থা কঠিনও নয়, তরলও নয়।—ঠিক বাষ্পীয়ও নয়; এখনও অনেক নক্ষত্র এইরূপ অবস্থাতে আছে। সেই বৃহৎ (Nebulous) বস্তু কোনও ক্রমে নিজের ব্যাসের উপর অত্যন্ত বেগে আবর্ত্তিত হইতে থাকে; এই আবর্ত্তনের ফলে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। আমাদের এই পৃথিবী এই সকল বিক্ষিপ্ত খণ্ডের অন্যতম। আকাশের মধ্যে একাকী থাকিয়া পৃথিবী ক্রমশঃ ইহার তাপ নষ্ট করিতে লাগিল, সেই নিমিত্ত ইহার উপরিভাগ কঠিনীকৃত হইয়া স্থূলরূপে পরিণত হইল।

এই পৃথিবীর মধ্যস্থলে কি আছে তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই—কিন্তু বৈজ্ঞানিক Sir Archi Giekiর মতে প্রায় ১০০ মাইল পর্য্যন্ত গলিত অবস্থায় আছে; তাহার পর নিম্নদেশ বাষ্পীয়। এই মত গ্রহণ করিলে ভূমিকম্পন, অগ্ন্যুৎপাত ইত্যাদির ব্যাখ্যা সহজ হয়। Herschel অনেক পর্য্যবেক্ষণের পর দেখিয়াছেন যে, মানুষও যেমন বাল্য হইতে যৌবনের ভিতর দিয়া বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হয়, আকাশের নক্ষত্র সকলও এইরূপ এক অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে উন্নীত হয়। নক্ষত্রের মধ্যেও বালক, যুবা ও বৃদ্ধ আছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ অবস্থার উল্লেখ করিয়াও ইহারা নিজেদের মতের পোষকতা করেন। Sir William Thomson এক স্থানে বলিয়াছেন, যে আমরা যদি মাঠের মাঝে একটা তপ্ত প্রস্তরখণ্ড দেখি, আমরা নিশ্চয়ই মনে করিব যে অল্পকাল মধ্যে প্রস্তরখণ্ডটী কোনও উত্তপ্ত স্থান মধ্যে ছিল, সুতরাং পৃথিবীর ভিতরের উচ্চ তাপ দেখিয়া ইহা মনে করা যাইতে পারে, যে ইহা এক সময়ে কোনও একটা অত্যন্ত তাপযুক্ত বস্তু হইতে আসিয়াছে। সুতরাং আমাদের এই সৌর জগৎ ও গ্রহ নক্ষত্রাদি যে একটা বৃহত্তর উত্তাপশালী বস্তুর অংশ ছিল এবং ক্রমশঃ প্রাকৃতিক নিয়মানু-সারে উপস্থিত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এখন জড়জগতের বিবর্ত্তনের আলোচনার পর আমরা প্রাণিজগতের অভি-ব্যক্তির আলোচনা করিব। অনেকেরই হয়ত ধারণা আছে যে Darwinই এই

মতের প্রবর্ত্তক, কিন্তু Darwinএর পূর্ব্বে ফরাসী পণ্ডিত Lamarck এ বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সে সময়ে প্রাণি-বিজ্ঞানের এত উন্নতি হয় নাই, সুতরাং তাঁহার মত কেহই তখন গ্রহণ করেন নাই। Darwinএর মতে 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' (Natural selection) এবং 'যোগ্যের স্থায়িত্ব' (survival of the fittest) এই দুই নিয়মেই সমস্ত প্রাণি-জগতের অভিব্যক্তি চালিত হইতেছে।

'সন্তোষজনক প্রবর্ত্তনের স্থায়িত্ব ও ক্ষতিকর প্রবর্ত্তনের ধ্বংসের নামই প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন। "And this preservation of favourable variations, I call natural selection' (Darwin's Origin of Species) প্রকৃতির রঙ্গভূমিতে সমস্ত প্রাণীই জীবনের জন্য পরস্পরের প্রতি-যোগিতা ও জীবন-সংগ্রাম করিতেছে—এই সংগ্রামে, এই অনন্তকালব্যাপী যুদ্ধে যে শ্রেষ্ঠ, যে বলবান্ সেই বাঁচিতেছে। মনে করুন পুরাকালে ছাগলের শৃঙ্গ ছিল না—কিন্তু আহার্য্য সংগ্রহের নিমিত্ত তাহাদের পরস্পরের মস্তকের দ্বারা যুদ্ধ করিতে হইত। এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে কতগুলি ছাগলের মস্তকের দুই কোণ একটু কঠিনতা প্রাপ্ত হইল। এই কঠিনতার জন্য তাহারা অন্যান্য ছাগলদিগকে পরাভব করিতে লাগিল ক্রমশঃ এই প্রবর্ত্তন উত্তরাধিকার নিয়মে (Law of Heridity) তাহাদের পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে স্থায়ী হইল। তাহার পর এই কঠিনতা হইতে শৃঙ্গের উৎপত্তি হইল। ক্রমশঃ 'যোগ্যের স্থায়িত্ব' এই নিয়মানুসারে যাহাদের শৃঙ্গ নাই, সেরূপ ছাগল সবই ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। সুতরাং সমস্ত ছাগলই শৃঙ্গযুক্ত হইল। এই সমস্ত নিয়মানুসারেই Ape 3 Chimpanzee বনমানুষ হইতে মানবের অভিব্যক্তি। মানুষের ও (Chimpanzee) বনমানুষের মস্তিষ্কের পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভিন্নতা ভিন্ন দুইটী মস্তিষ্ক বাহ্যতঃ প্রায় এক প্রকারের পণ্ডিত Huxley তাঁহার 'Man's place in Nature' পুস্তকে দেখাইয়াছেন, যে মানুষ 3 Chimpanzeeর দৈহিক গঠনপ্রণালী ও মস্তিষ্কাদি মধ্যে বিভিন্নতা এত অল্প যে Chimpanzee হইতে মানুষের বিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহ করা যাইতে পারে না। Apeএর সম্মুখের পদদ্বয় মানবের হস্তরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। মস্তিষ্ক যত উৎকৃষ্ট হইতে থাকে; জীবের কার্য্যও তত বিভিন্ন প্রকারের হইতে

থাকে; সুতরাং কেবলমাত্র চারিটী পদ দ্বারা সে সকল কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর হয় না। সেই জন্যই সম্মুখের পা দুইটী ক্রমশঃ বিভিন্ন প্রকারের এবং সূক্ষ্মতর কার্য্য করিবার উপযোগী হইয়া হস্তের আকার ধারণ করে। Wallace তাঁহার—'Darwinism' নামক পুস্তকে Chimpanzee ও Apeএর এরূপ সমস্ত কার্য্যাদি বর্ণনা করিয়াছেন এবং সেই সকল কার্য্যের সহিত আমাদের সাধারণ কার্য্যের এরূপ সাদৃশ্য দেখাইয়াছেন, যে তাহাতে মানবের দৈহিক বিবর্ত্তন সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকিতে পারে না। জীব বিবর্ত্তনে প্রাকৃতিক বস্তু সকলও যথেষ্ট সহায়তা করে। দেশের জল ও বায়ুর যে জীবের উপর যথেষ্ট ক্ষমতা আছে, তাহাও আমরা সকলে দেখিতে পাই। Lamarckএর মতে 'অভাব'ও একটী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বস্তু। যদি কোনও প্রাণীর একটী অবয়বের বিশেষ আবশ্যক হয়, তাহা হইলে সেই নূতন অবয়বের উৎপত্তির বিশেষ সম্ভাবনা আছে।

'Darwin'এর মত কিন্তু ইহার বিরুদ্ধ। তাঁহার মতে সমস্ত প্রবর্ত্তনই আপনা হইতে হইয়াছে। 'প্রাকৃতিক নির্ব্বাচন' কোনও পরিবর্ত্তন আরম্ভ করিতে পারে না—কেবল একবার আরম্ভ হইলে তাহাকে জীবিত রাখিতে পারে। Darwinএর শিষ্য Weissmann ও Wallace তাঁহার মতের কতকাংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছেন, কিন্তু মোটের উপর Darwin এর মত তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের মতের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। (ক্রমশঃ)

শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

অর্ঘ]

সম্মোহন বিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এই সময়ে ইংলণ্ডে ডাঃ জন্ ইলিয়টসন্ Elliotson) ও কলিকাতার ডাঃ জেমস্ ইস্‌ডেল (Esdale) মিস্‌মেরিসমের প্রচার কল্পে বহু পরিশ্রম করেন ও কতক পরিমাণে ইহার বিস্তৃতি সাধনে কৃতকার্য্য হন। ডাঃ জন্ ইলিয়টসন্ নানা প্রকার রোগ আরাম করেন ও জেমস্ ইস্‌ডেল রোগী সমূহকে মিস্‌মেরিসমের দ্বারা

অঘোর নিদ্রাভিভূত করিয়া অনেক কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসা সম্পন্ন করেন। রোগীদের এই অবস্থায় 'ক্লোরোফরমে'র ন্যায় সম্পূর্ণ চৈতন্য-লোপ হইত, এবং তাহারা অস্ত্র প্রয়োগজন্য কষ্ট কিছুমাত্র বুঝিতে পারিত না।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে লা ফোঁটেন (Le Fontain) নামক জনৈক ফরাসী ম্যাঞ্চেষ্টারে মিস্‌মেরিসমের অদ্ভুত ঘটনাবলী দেখান। তদ্দৃষ্টে জেমস্ ব্রেড (Braid) নামে একজন স্থানীয় চিকিৎসক ইহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। তিনি দেখেন যে মিস্‌মেরিসমের ঘটনাবলী অকৃত্রিম বটে, কিন্তু ইহার সমর্থক-বাদীর মতের সারবত্তা নাই। তিনি আরও দেখেন যে মিস্‌মেরিসমের প্রক্রিয়া অনুসরণ না করিয়া, অন্য নিয়মে এক প্রকার মোহ নিদ্রা আনয়ন করা যায় এবং এই অবস্থায় মিস্‌মেরিসমের অধিক ংশ ঘটনাবলী দেখাইতে পার' যায়। তিনি মিস্‌মেরিসমের প্রক্রিয়ামত দেহের উপর কোন প্রকার হস্ত চালনা না করিয়া, কেবল মাত্র লোকের দৃষ্টি কোন উজ্জ্বল বস্তুর উপর স্থির করাইয়া মোহ-নিদ্রা আনয়ন করেন। এই অবস্থাকে তিনি প্রথমে বিভিন্ন অবস্থা বলিয়া মনে করেন; এবং ইহাকে মোহ-নিদ্রা (Hypnosis) ও এই বিজ্ঞানকে সম্মোহন বিদ্যা (Hypnotism) নাম প্রদান করেন।

প্রথমে ডাঃ ব্রেডের ধারণা ছিল যে, কেবলমাত্র দৃষ্টি স্থির করিলে মোহ-নিদ্রার আবেশ হয় এবং সেই অবস্থায় শারীরিক ক্রিয়ার পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়। কিন্তু পরে তিনি সেই মত পরিবর্ত্তন করেন। তিনি বলেন যে দৃষ্টি ও মন দুইই স্থির করিলে মোহ-নিদ্রার আবেশ হয়, এবং এই অবস্থাতে শারীরিক ও মানসিক উভয় জাতীয় ক্রিয়ারই ব্যতিক্রম ঘটাইতে পারা যায়।

ব্রেড আবিষ্কার করেন যে মিস্‌মেরিষ্টদের মত কোনরূপ হস্ত চালনা (Pass) বা স্পর্শ না করিয়া, মোহ-নিদ্রা আনয়ন করিতে পারা যায়। তিনি আরও বলেন, যে কোন লোককে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিতে হইলে, কোনরূপ শক্তি বা চিন্তার আবশ্যক হয় না। কেবল মাত্র রোগীর মন ও দৃষ্টি স্থির করাইতে পারিলেই, মোহ নিদ্রা আপনিই আবির্ভূত হয়। ইহার স্বপক্ষে তিনি নিম্নলিখিত ঘটনাটী উল্লেখ করিয়াছেন।

"১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে, ১লা মার্চ্চ তারিখে একটী ভদ্রলোক মোহ-নিদ্রাবিষ্ট হইবার মানসে আমার বাটীতে আগমন করেন। তিনি লা ফোঁটেন ও অপরাপর

সম্মোহন-বিদ্যাবিৎ পণ্ডিতগণের নিকট বিফল মনোরথ হইয়া একবার আমার নিকট চেষ্টা করিতে কৃত-সঙ্কল্প হন। যখন তিনি আসেন, তখন আমি বাটীতে ছিলাম না; ওয়াকার নামে আমার এক বন্ধু ছিলেন, তিনি এই ভদ্র লোকটীর অভিপ্রায় শুনিয়া, নিজেই তাঁহাকে তন্দ্রাভিভূত করিবার উদ্যোগ করেন। যখন বাটী ফিরিয়া আসিলাম, তখন দেখি যে সেই ভদ্র লোকটী মিঃ ওয়াকারের অঙ্গুলির অগ্রভাগে দৃষ্টি স্থির করিয়া বসিয়া আছেন, এবং মিঃ ওয়াকার তাঁহার চক্ষুর উপর দৃষ্টি স্থির করিয়া স্থির ভাবে দণ্ডায়মান আছেন। কিছুক্ষণ পরে অপর কার্য্য শেষ করিয়া যখন আমি পুনরায় সেই ঘরে আসিলাম, তখন দেখি যে মিঃ ওয়াকার, অঘোর নিদ্রায় সমস্ত দেহ কাষ্ঠের মত শক্ত হইয়া একভাবে দণ্ডায়মান আছেন, এবং সেই ভদ্রলোকটী মিঃ ওয়াকারের অঙ্গুলির দিকে চাহিয়া আছেন।"

এই ঘটনাটীতে দেখা যায় যে মিঃ ওয়াকার ভদ্রলোকটীকে নিদ্রাভিভূত করিতে গিয়া এমনই একাগ্র-ভাবে মন ও দৃষ্টি স্থির করেন, যে আপনার অজ্ঞাতসারে আপনিই মোহ-নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়েন। দৃষ্টি ও মন-স্থির করিলে যে মোহ-নিদ্রার আবেশ হয়, তাহা বিশেষরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য ব্রেড নিম্নলিখিত আর একটী ঘটনার উল্লেখ করেন ;—

'একদা আমার একটী ভৃত্যকে বিশেষ মনোনিবেশের সহিত একটী রাসায়নিক পরীক্ষা দেখিতে বলিলাম। এই ভৃত্যটী সম্মোহন-বিদ্যা সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। রাসায়নিক ক্রিয়া দেখিতে দেখিতে ২।৩ মিনিটের মধ্যে তাহার চক্ষুর পাতা কাঁপিতে কাঁপিতে বন্ধ হইয়া গেল; তাহার চিবুক বক্ষের উপর পতিত হইল এবং একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল। এইরূপ এক মিনিটকাল নিদ্রার পর তাহাকে জাগাইয়া চলিয়া যাইতে বলিলাম, এবং তাহাকে অনবধানতার জন্য অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়া বলিলাম 'তিন মিনিটও আমার আদেশ পালন করিতে পারিলে না।' কিছুক্ষণ পরে পুনরায় তাহাকে ডাকিয়া আর একবার অতি মনোযোগের সহিত রাসায়নিক পরীক্ষা দেখিতে বলিলাম এবং সাবধান করিয়া দিলাম যেন পুনরায় নিদ্রাভিভূত না হয়। সে এবার অতি সতর্ক হইয়া পূর্ব্বের মত একাগ্রমনে রাসায়নিক ক্রীয়া দেখিতে লাগিল; কিন্তু ঠিক পূর্ব্বের মত ৩ মিনিট অতিবাহিত হইতে না হইতেই, তাহার চক্ষুদ্বয় বন্ধ হইল এবং সে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইল।" এই ঘটনাটীতে স্পষ্টই

প্রতিপন্ন হয়, যে কোন লোককে মোহ-তন্দ্রাভিভূত করিতে হইলে, তাহার মন ও দৃষ্টি স্থির করা আবশ্যক।

ডাঃ ব্রেডের পর অধ্যাপক চার্লস্ রিকেট (Richet) ও অধ্যাপক চারকট্ (Charcot) সম্মোহন-বিদ্যার বিস্তৃতি কল্পে ১৮৭৮ খ্রীঃ পারিস নগরে সণ্টপিটার নামক একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ইঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্নায়ুরোগ-গ্রস্ত ব্যক্তিগণের উপর পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং অবশেষে নিম্নলিখিত ভ্রান্তি-মূলক সিদ্ধান্তে উপনীত হন;—

(১) মোহনিদ্রা স্নায়ু-মণ্ডলীর বিকৃত অবস্থা মাত্র। ইহা মূর্চ্ছা ও বায়ুগ্রস্ত ব্যক্তিগণের মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) এই অবস্থা কেবল মাত্র স্নায়ুরোগ-গ্রস্ত স্ত্রীলোকদিগের উপর আনয়ন করা যায়।

(৩) ইহা কেবল মাত্র শারীরিক ক্রিয়ার দ্বারা আনয়ন করা যায়।

(৪) পুরুষ, বালক ও বৃদ্ধগণের উপর এই অবস্থা আনয়ন করা যায় না।

(৫) সম্মোহন বিদ্যার প্রভাবে কোন প্রকার রোগ আরোগ্য করা যায় না।

(৬) চুম্বক বা কোন ধাতু দ্বারা ইহার ক্রিয়ার বিকাশ ও চালনা করিতে পারা যায়।

১৮৬০ খৃঃ ডাঃ লিবল্ট (Liebault) সম্মোহন-বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হন। ১৮৬৪ খৃঃ তিনি ন্যান্সীতে স্থায়িভাবে বাস করেন; এবং ঔষধাদি বন্ধ করিয়া কেবল মাত্র সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাবে চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। তত্রত্য ফরাসী কৃষকগণ এই নূতন চিকিৎসায় উপকারিতা দৃষ্টে, তাঁহার নিকট ক্রমশঃ দলে দলে আরোগ্যের জন্য আসিত। কিন্তু স্থানীয় ডাক্তার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ এই নূতন চিকিৎসা পদ্ধতি লইয়া তাঁহাকে তাচ্ছিল্য ও সময়ে সময়ে অপদস্থ করিত।

ডাঃ লিবল্ট বলেন, যে সম্মোহন বিদ্যার প্রধান মন্ত্র "আদেশ বাক্য" প্রয়োগ (Suggestion)। কেবল মাত্র সঙ্কেত-বাক্য প্রয়োগ করিয়া মোহ-তন্দ্রা আনয়ন করা যায় এবং নানাপ্রকার ক্রিয়ার বিকাশ করা যায়। এই বাক্য প্রয়োগ করিয়া বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য করা যায়। তিনি আরও বলেন যে মোহ-তন্দ্রার ক্রিয়া-বিকাশের ভিত্তি,—মানসিক, শারীরিক নহে। আধুনিক পাশ্চাত্য সম্মোহন-বিদ্যা

তাঁহারই হস্তে উন্নতি লাভ করে। ১৮৬৬ খৃঃ তিনি একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন; তাহাতে তাঁহার উপরোক্ত সম্পূর্ণ নূতন মত বিন্যস্ত করেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ কেহ তাঁহার পুস্তক পাঠ করেন না, বা তাঁহাব নূতন চিকিৎসা পদ্ধতির অনুকরণ করেন না; উপরন্তু এই বিষয় লইয়া সকলে তাঁহাকে অপদস্থ ও লাঞ্ছিত করেন।

এই প্রকারে তিনি অজ্ঞাতভাবে কিছুকাল কাটাইবার পর ১৮৮২ খৃঃ, ডাঃ বার্ণহীমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ডাঃ বার্ণহীম একটী কুমুরী বাতগ্রস্ত (Sciatica) রোগীকে ৬ মাস যাবৎ চিকিৎসায়ও আরাম করিতে পারেন না। এই রোগীটী ডাঃ লিবল্টের মোহন-বিদ্যার প্রভাবে অতি সত্বর আরোগ্য লাভ করে। ইহা শুনিয়া ডাঃ বার্ণহীম ন্যান্‌সীতে আসিয়া লিবল্টের সহিত সাক্ষাৎ করেন ও তাঁহার চিকিৎসা প্রণালী দেখেন। যদিও তিনি সম্মোহন বিদ্যার একজন বিদ্বেষী ছিলেন; কিন্তু লিবল্টের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া ও তাহার অদ্ভুত কার্য্য-কলাপ দেখিয়া সম্মোহন বিদ্যার সারবত্তা উপলব্ধি করেন, এবং তৎক্ষণাৎ মত পরিবর্ত্তন করিয়া লিবল্টের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেই অবধি তিনি তাহার অধীনস্থ চিকিৎসালয়ে লিবল্টের পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া, কেবল মাত্র সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাবে রোগীর চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৮৩ খৃঃ তিনি একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন; তাহাতে এইমতে চিকিৎসার ফলাফল বিশদভাবে বিবৃত আছে। তাঁহারই উদ্যোগে সম্মোহন বিদ্যার বহুল প্রচার হয়, এবং ইউরোপ ও আমেরিকার চিকিৎসক ও বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ অতি আগ্রহের সহিত নব প্রণালীমতে সম্মোহন বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন।

লিবল্ড, বার্ণহীম (Bernheim) প্রভৃতি ন্যান্‌সী সম্প্রদায়ভুক্ত মনীষিগণের মধ্যে সম্মোহন বিদ্যা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত তিনটী প্রধান মত দেখিতে পাওয়া যায়।

(১) মোহ-নিদ্রাবস্থা আনয়ন করা কেবল মাত্র লোকের (যাহাকে নিদ্রিত করা হইবে) মানসিক ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।

(২) যাহার দেহ ও মন সুস্থ, তাহার উপর সম্মোহন বিদ্যার ক্রিয়া অতি উত্তমরূপে বিকশিত হয়।

(৩) মানসিক ক্রিয়া ও তন্নিবন্ধন শারীরিক ও মানসিক ঘটনা বাক্য-প্রয়োগ বা যে কোন প্রকার সঙ্কেত (Suggestion) দ্বারা আনয়ন করিতে

পারা যায়। ১৮৮২ খৃঃ মানবের মনস্তত্বানুসন্ধানকল্পে ইংলণ্ডে Society for Psychical Research স্থাপিত হয়। এই সমিতির সভ্যমণ্ডলী, সুস্থদেহে মানবগণের উপর অনেক প্রকার পরীক্ষা করেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের অনুসন্ধানের ফল, সমিতির কার্য্যবিবরণীতে প্রকাশ করেন। ১৮৯৯ খৃঃ British Medical Association হইতে একটী সমিতির অধিবেশন হয়। এই সমিতি এক বৎসর অনুসন্ধানের পর, সম্মোহন বিদ্যার ক্রিয়া কলাপ ও চিকিৎসাতত্ত্ব এবং ইহার দ্বারা কি উপকার সাধন হইতে পারে, এই সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়।

মৃত্যুপথ।

প্রথম অধ্যায়।

পথিক।

জন্মিলে মরিতে হয়, মরিলে জন্মিতে হয়।
যেই আসে সেই যায়, সেই আসে যেই যায়॥

এই নিয়ম অনিবার্য্য, অব্যভিচারী। তবে কে আসে, কোথায়? কে জন্মে, কে মরে? কাহার নাম মৃত্যু, কা'র নাম পথ? যাতায়াত কার? পথিক কে? শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত,—আত্মা জন্মে না, মরে না; সে অশরীরী বিভু; সুতরাং যাতায়াত নাই। যাতায়াত শরীরের ধর্ম্ম, শরীর বিহনে যাতায়াত অসিদ্ধ; এ নিয়মের ব্যভিচার কোন কালেই নাই। দেহই এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যায়; সুতরাং যাতায়াত করিতে গেলে, শরীর থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি শরীর বিহনে যাতায়াত একান্ত অসম্ভব হয়, তবে পরলোকে কে যায়? মৃত্যুর অন্তে ভস্মান্ত শরীরের যাতায়াত অসম্ভব; আত্মারও গমন নাই, তবে যায় কে, আসে কে? মৃত্যুর অন্তে মৃত্যুর পরপারে কোন্ দেহ যাতায়াত করে? স্থূল জগতে যাতায়াতের জন্য স্থূল শরীর থাকা যেমন অনিবার্য্য, তদ্রূপ সূক্ষ্ম জগতে যাতায়াতের জন্য সূক্ষ্ম শরীর থাকাও অনিবার্য্য। পরলোকে যাতায়াত সেই সূক্ষ্ম দেহেরই ধর্ম্ম। আদি-সর্গ কালে অর্থাৎ প্রকৃতির প্রলয়ান্তে, প্রত্যেক আত্মার জন্য প্রকৃতি একটী সূক্ষ্ম দেহ

নির্ম্মাণ করেন; উহার উপর এখন স্থূল-দেহ অবস্থান করিতেছে। মরণান্তে বারংবার যাতায়াত, ঐ সূক্ষ্ম দেহেরই হইয়া থাকে। ঐ সূক্ষ্ম-দেহাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব। জীব শরীরী হইয়া যাতায়াত করেন এবং জন্ম মৃত্যুর অধীন হন। এই সুদীর্ঘ পথের জীব সকলই পথিক। যথা,—

পাতালতলমারভ্য সত্যলোকাবধি ধ্রুবম্।
ব্রহ্মাণ্ডং সকলং ব্যাপ্তং শূন্যং নৈব কদাচনম্॥ শিব পুরাণ।

পাতাল হইতে ব্রহ্মলোকাবধি এমন একটু শূন্য স্থান নাই, যাহা জীব দ্বারা ব্যাপ্ত নয়। জগৎ সংসারে অগণন জীব রহিয়াছে; ঐ অগণন জীবের জন্য বহু প্রকার কর্ম্ম রহিয়াছে; তদ্ধেতু অসংখ্য গতি রহিয়াছে এবং অসংখ্য গতির বিশ্রাম-নিকেতন অগণন স্থানও নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। অসংখ্য স্থানে যাইবার জন্য অসংখ্য পথ; আবার অসংখ্য পথে চলিবার জন্য বিবিধ যান ও ভিন্ন ভিন্ন পাথেয় আছে। অগণন পথিক, অসংখ্য পাথেয় সংগ্রহ করিয়া, অসংখ্য গতিতে, অসংখ্য পথে, অগণন পান্থশালায় একবার প্রবেশ ও একবার বহির্গমন করিতেছে। এই পাথেয়ের রাজ্যে পাথেয়-সংগ্রাহী জীবই পথিক।

জীব যখন এই রঙ্গমঞ্চের অভিনয় শেষ করিয়া অন্য রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন সে কোন্ সাজে সজ্জিত হইবে,—দানব কি মানব, স্থাবর কি জঙ্গম; রোগী কি ভোগী? সং সাজিতে হইবে, ইহা অনিবার্য্য; এ রঙ্গ-মঞ্চের ইহাই অভিনয়। এই রঙ্গ-পথে যিনি পদার্পণ করিয়াছেন, করিতেছেন ও করিবেন, তিনিই পথিক।

এই পান্থনিবাস অবশ্যই একদিন ত্যাগ করিতে হইবে। জীবের কর্ত্তব্য, এই সুদীর্ঘ মহা-খরতর বা মহা-সুশীতল পথ অতিক্রম করিবার জন্য পথ চিনিয়া রাখা এবং সু-পাথেয় সঙ্গে লওয়া। পথিক, পথ ও পাথেয় এই তিনটি প্রশ্নের মীমাংসা হইলেই মৃত্যুপথ নির্ণয় করা যাইতে পারে। এ সংসারে প্রাণীমাত্রেই পথিক। পান্থশালায় যেমন বিবিধ প্রকারের পথিক কিয়ৎকালের জন্য বাস করণান্তর তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পান্থনিবাসকে আশ্রয় করে; এই শরীররূপ পান্থশালায়ও জীব কিয়ৎকালের জন্য বাস করণান্তর তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য

পান্থনিবাস আশ্রয় করে; সুতরাং ক্ষণ-পান্থ-নিবাসাশ্রয়ী জীব মাত্রেই পথিক। আব্রহ্মকীট পর্য্যন্ত সকলেই 'ঠিকা' প্রজা।

জীব যখন এই পান্থনিবাস হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া অন্য পান্থশালায় প্রবেশ করিবেন, তখন কোন্ পথে যাইবেন, কি পাথেয় সঙ্গে লইবেন? পথ অতি দীর্ঘ ও দুর্গম, সুপথে না চলিলে পদে পদে বিপদ—অশেষ যন্ত্রণা। সুপাথেয় সঙ্গে না লইলে, সে পান্থনিবাসে সুখভোগ মিলিবে না, দুর্ভোগই ভুগিতে হইবে। কর্ম্মের হস্ত হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই। কি দেব, কি দানব, কি মানব, সকলেরই কর্ম্ম-সৃষ্ট দেহ নশ্বর; একদিন তাহা অবশ্য ত্যাগ করিতে হইবে। যখন রাগাদি ইন্দ্রিয় সমূহ স্ব স্ব ব্যাপার শূন্য, মুমূর্ষুর চক্ষে জাল পড়িয়াছে; আর দেখিতে পায়না, শুনিতে পায়না, বিজ্ঞানাত্মা জীব দেহ ত্যাগে উদ্যত হইয়াছে; তখন জীব যে গতি প্রাপ্ত হইবে—যে পথে যাইবে, যেরূপ কর্ম্মানুসারে যাদৃশ ফলের অধিকারী হইবে, তাহার পরিজ্ঞান হইলে অন্ততঃ সাবধানতা আসিবে ও চেষ্টা হইবে; এবং পুরুষকার-প্রভাবে মায়ামোহ-পাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া নিত্যত্ব লাভের প্রয়াস জন্মিবে। এইরূপে ক্ষণিক উদ্বোধনও সমূহ কল্যাণজনক; অতএব উৎক্রমণ বিষয়ক জ্ঞান ও ভাবনা উত্তেজিত করা বিধেয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।

অর্থ]

প্রত্যাবর্ত্তন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভবতারণ তখন আলীগড়ে। একদিন আপিস হইতে অপরাহ্নে বাসায় ফিরিয়া দেখিল তাহার নামে একখানা চিঠি আসিয়াছে। হস্তাক্ষর যেন বিশেষ পরিচিত; কিন্তু ঠিক্ কা'র হাতের লেখা তাহা বিশেষ অনুধাবন করিয়াও বুঝিতে পারিল না। আগ্রহ সহকারে খাম্ ছিঁড়িয়া পড়িল।

৮ কাশীধাম

"মহাশয়,

আপনার যদি ভক্তি-সহকারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া, একত্র ব্রাহ্মণ ও অতিথি-সেবার পুণ্যফল অর্জ্জন করিবার প্রবৃত্তি থাকে, তাহা হইলে এই অজ্ঞাতশীল পত্র-লেখক আপনার সে সুবিধা ঘটাইয়া দিবার জন্য প্রস্তুত আছে। অতএব বিশেষ অনুরোধ এই যে, ব্রাহ্মণ অতিথিকে পরম সমাদরে সেবা করাইয়া, সস্ত্রীক ধর্ম্মাচরণ করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। অতিথি শীঘ্রই পৌছিতেছে। আশা করি আপনার ও আপনাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল। ইতি—

কস্যচিৎ প্রবাসী,—"

ভবতারণ এই হেঁয়ালীপূর্ণ পত্র পাইয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইল। নাম, ঠিকানা বা তারিখ কিছুই নাই; খামের উপর পোষ্টাপিসের ছাপ "সিটি বেনারস"। চিঠি কাশী হইতে আসিতেছে; কিন্তু কে লিখিল? হস্তাক্ষর ও লেখক যেন খুব পরিচিত বলিয়া বোধ হইল; কিন্তু কিছুতেই প্রকৃত লেখক কে, তাহা স্থির করিতে পারিল না। পরদিন চিঠিখানা অনেক বন্ধু বান্ধবকে দেখাইল, কিন্তু কেহই কিছু ঠাওরাইতে পারিল না; রহস্যজনক পত্র, রহস্যপূর্ণ রহিয়া গেল।

ইহার চার পাঁচ দিন পরে, অপরাহ্নে একখানা একা আসিয়া ভবতারণের বাসার সম্মুখে থামিল। একাওয়ালা বলিল, "এহি কোঠি।" শব্দ শুনিয়া ভবতারণ দ্রুতপদে বাহিরে আসিয়া দেখিল একারোহী—নরেশ। উভয়ে উভয় বন্ধুকে বহুদিন পরে পাইয়া প্রাণ ভরিয়া আলিঙ্গন করিল। সমাদরে বাটীতে লইয়া গিয়া উভয় বন্ধুতে কত কথা—কত পুরাতন গল্প—সেই আমোদ উল্লাস—দেশের সেই আনন্দ স্ফূর্ত্তির বিষয় তন্ময় হইয়া আলোচনা করিতে লাগিল।

উভয়ে উভয়কে বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিল;—সেই নরেশ, তা'দের প্রধান ইয়ার, দলের কাপ্তেন—নরেশ। বিশেষ কিছু পরিবর্ত্তন হয় নাই; তবে দেহ কিছু মাংসল হইয়াছে; চাহনি যেন কিছু উদাস ও লালিত্যপূর্ণ; মুখে চোখে দিব্য একটা স্নিগ্ধ শান্তি ও স্মিত আনন্দের হিল্লোল বহিতেছিল। ভবতারণ নরেশের এই কম-কান্তি ও শান্ত প্রফুল্লভাব দেখিয়া, বড়ই তৃপ্তি অনুভব করিল। বিশেষ পরিবর্ত্তনের মধ্যে—মুণ্ডিত-গুম্ফ। ভবতারণ কৌতুক করিয়া বলিল, "আরে

গোফ কামিয়েছ দেখছি!—এ সখ আবার কেন? আবার কি ছেলে মানুষ না মেয়ে মানুষ সাজ্‌তে সখ গেছে না কি? না ওটা আজকালের ফ্যাসান!” নরেশ কোন উত্তর না দিয়া মৃদু হাস্য করিল।

নরেশও ভবতারণকে লক্ষ্য করিল;—তাহারও বিশেষ কিছুই পরিবর্ত্তন হয় নাই; তবে মুখের উপর অর্থোপার্জ্জনের ক্লেশ ও দাসত্বের ছাপ বেশ একটু পড়িয়াছে।

ভবতারণ বন্ধুর সাদর অভ্যর্থনার নিমিত্ত বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়াছিল; “পোলাও, মাছ, মাংস, মটন, পেঁয়াজ, রসুন, চাট্‌নী, রাবড়ী” প্রভৃতি।

নরেশ শুনিয়া বলিল,“ভাই, তুমি কি জাননা যে ও সব আর আমি খাই না?”

ভ। সে কি? এ সব দেব-দুর্ল্লভ জিনিষ খাবে না ত’ শরীর ঠিক্ থাক্‌বে কেন? তারপর মরে গেলে যমের বাড়ী গিয়ে কৈফিয়ৎ দিবে কি?

ন। কি কর্‌ব বল ভাই,—যখন একবার ছেড়েছি, তখন আর লোভ কর্‌ব না। যা’হোক আমার আগে বলা উচিত ছিল; তা হ’লে আর তোমার এসব কর্ম্মভোগ ও জিনিষ পত্র নষ্ট হোত না!

ভ। আরে নষ্ট হবার জন্য নয়; কিন্তু তুমি যে অবাক্ কর্‌লে? এই বয়সে এ সব ভোগ ছেড়ে দিবে, কি বল? এই ত’ ভোগের সময়, এখন খাবে না ত’ কবে খাবে? নেশা পত্রও ছেড়েছ না কি?

ন। হাঁ, জানই ত’ সেই দিন থেকে আগেকার সব কু-অভ্যাস ছেড়েছি।

ভ। সর্ব্বনাশ করেছ; সেই Vagabondটা তোমার মাথা খেয়েছে দেখ্‌ছি। আমি কোথায় তোমাকে দেখে মনে কর্‌লাম, যে এখন ক’দিন ‘নরক গুল্‌জার’ করা যাবে—দিন কতক স্ফূর্ত্তি, নাচ গান,—মহাবীর প্রসাদের বাগানে ‘ফিরোজা’র মুজরা দেওয়া যাবে; আর তুমি কি না সব সাধে বাদ সাধ্‌লে? ও সব চল্‌বে না, নষ্টামি ছেড়ে দাও; এসেছ যখন, তখন দুদিনের জন্যে স্ফূর্ত্তি করা যাক্।

ন। না ভাই আর কেন? বাকী ত’ কিছু রাখিনি—দু’দিকই ত’ দেখ্‌লাম;—যখন গুরু কৃপায় ও সব পাপ একবার ছাড়্‌তে পেরেছি, তখন আর ফির্‌ব না। ক্ষমা করো ভাই!

ভ। আচ্ছা দু’ একদিন খেলে কি একেবারে তোমার ধর্ম্ম ও মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যবে?

ন। অবশ্য আমার মত লোকের পক্ষে খুব যে বিশেষ দোষ হবে, তা' নয়।

ভ। তবে তোমার এতটা আপত্তি—এমন ধনুর্ভঙ্গ-পণ কেন ?

ন। ভাই, আপত্তির অনেক কারণ আছে। প্রথম বাল্যে ও যৌবনে ব্রহ্মচর্য্য ও আচার প্রতিপালন করি নাই ; তা'র জন্যে যে কতটা কষ্ট ও অনুতাপ করতে হচ্ছে, তা' নারায়ণই জানেন। এখন সাধনপথে এসে, যাতনাটা আরো তীব্রভাবে অনুভব করছি। একদিকে অন্তঃকরণের সৎবৃত্তিগুলির বিকাশ ও মনের উর্দ্ধগতি; অন্যদিকে পূর্ব্ব পাপ ও অনাচার প্রভৃতির জন্য নীচ কামনার প্রবল আকর্ষণ ; এই দুই,—দোটানায় পড়লে যে কি কষ্ট হয়, তা ভুক্ত-ভোগীই জানে। কি রকম হয় জান,—যেন উড়িবার শক্তি ও চেষ্টা আছে, অথচ হাত পা মাটীর সঙ্গে বাঁধা। এক এক সময় মনে হয়, যেন পূতিগন্ধময় নর্দ্দামায় পড়িয়া গিয়াছি, উঠিতে পারিলে বাঁচি ; কিন্তু পাপে ও আচার-ভ্রষ্ট হওয়ায় উঠিবার শক্তি নাই। তারপর মাছ মাংস খাওয়ার কথা ;—এখন মধ্যে মধ্যে বেশ বোধ হয়, যেন সমস্ত একটা অখণ্ড চৈতন্য। পূর্ব্বে কোন জীবহত্যা করলে, কখন কখন 'জীবহত্যা' বলিয়া দয়া, সহানুভূতি ও কষ্টের উদ্রেক হইত। কিন্তু এখন সে কষ্ট হয়—অন্য প্রকারের—আরো তীব্র। কোন জীবহত্যা দেখলে মনে হয়, যেন সে আঘাত আমার শরীরেও কিছু কিছু লাগছে। কেন না আমরা সকলেই এক ; একই চৈতন্যের স্থূল বিকাশ। তারপর, আমরা এত রোগ ভোগ ও শরীরিক যাতনা পাই কেন ? এত অকাল মৃত্যু হয় কেন ? মনে কর দেখি, আমাদের এই ক্ষণ-ভঙ্গুর নশ্বর দেহ-সুখের জন্য, নিজের মানসিক তৃপ্তি ও শারীরিক পুষ্টির জন্য, কত জীবহত্যা করেছি ও কত জীবের অঙ্গে আঘাত করিয়া নষ্ট করেছি ? এ সকলেরও ত' একটা প্রতিক্রিয়া আছে ; সে সমস্ত ফল যাবে কোথায় ? ভবতারণ এতক্ষণ নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতেছিল ; পরে বলিল, "তুমি যে অত আচার নিষ্ঠার কথা বললে, কিন্তু কৈ সাধুরা ত' সেই জন্য ঘুরে মরে না।"

ন। অবশ্য সাধুরা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও আচার ব্যবহারের অতীত ; কিন্তু তা' বলিয়া, তাঁহারা কি বিশেষ কারণ ব্যতীত লোক-সমাজে কোন গর্হিত কর্ম্ম করেন ? -কখনই না ! তা' ছাড়া যদি প্রকৃতই সাধু হ'তে পারতাম,—বৈরাগ্যের আগুণে যদি প্রবৃত্তি সকল ভস্ম হ'য়ে যেতো, তা' হলে স্বতন্ত্র কথা ; কিন্তু তা' যখন নয়, তখন সাবধান থাকাই মঙ্গল। সত্য কথা বলিতে কি, এখন আর

পাতে মাছ মাংস থাকিলে, গণ্ডূষ করিতে ভরসা হয় না। ভগবানের সন্তান,—'কৃষ্ণের জীব'কে হত্যা ক'রে সেই মাংস আবার কি বলিয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া দিব ?

ভবতারণ বাড়ীর মধ্যে গিয়া নরেশের উপযোগী আহারের বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া কহিল, "ভাই আমিও আজ তোমার সহিত নিরামিষ আহার করিব।"

ন। সে কি ? তুমি কি দুঃখে আমার মত আহার করিবে ?

ভ। না, আজ হ'তে মৎস্য মাংস আহার ত্যাগ করিলাম। তুমি আমাকে আজ যথেষ্ট শিক্ষা ও জ্ঞান দিলে।

ন। ভাল কথা, যদি তোমার মনে এইরূপ প্রবৃত্তি হ'য়ে থাকে, তা হ'লে ত্যাগ কর। নচেৎ একটা খেয়ালের বশে কিছু করো না। তবে এই সঙ্গে কিছু কিছু চিত্ত সংযমও চাই, নহিলে কোন ফলই হইবে না। ছাগলেও নিরামিষ খাইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে ফল কি ?

কিছুক্ষণ পরে আহারাদির পর উভয় বন্ধুতে বহুক্ষণ ধরিয়া তা'দের দলের অন্যান্য সকলের বিষয় আলোচনা করিল। প্রসন্ন, হরিদাস, নিবারণ; চারু, অনাথ প্রভৃতি সকলের কুশল বার্ত্তা ও সংবাদাদি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইলে, ভবতারণ জিজ্ঞাসা করিল,—"নরেশ! তোমার ছেলে পিলে কি হইয়াছে!"

ন। কিছুই না।

ভ। কিছুই না! সে কি, তবে কি ছেলে পিলে হবার সম্ভাবনা নাই ?

ন। সম্ভাবনা আছে কি না জানি না। তবে এখনো বিবাহই করিনি, তা' ছেলে হবে কোত্থেকে ?

ভ। তুমি অবাক্ করলে দেখছি, এখনো বিবাহ না কর্‌লে, কবে কর্‌বে ? সেই ১৮ বৎসর বয়সের সময় তোমার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দশ বৎসর কেটে গেল ; আমি মনে করেছিলাম, হয়ত' বিবাহ করে ছেলে পিলেয় তোমার ঘর সংসার ভর্ত্তি হয়ে গেছে। তোমার মতলব কি বল দেখি ? বিবাহ কর্‌বেনা কি ?

ন। তা' এখনো ঠিক্ বল্‌তে পারি না। তবে যতদূর মনে হয়, হয়ত' বিবাহ কর্‌তে হবে ; তবে মনে মনে স্থির করেছি, যে কাম-লালসা পরিতৃপ্তির জন্য বিবাহ কর্‌ব না। যদি কখন স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণীরূপে দেখ্‌তে পারি, তবেই বিবাহ

করবার ইচ্ছা আছে। শৃগাল, কুক্কুর এবং বন্য পশুও ত' কাম-লিপ্সা চরিতার্থ করে; তবে এই দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম—ব্রাহ্মণ-দেহ লাভ করিয়াছি কেন?

ভ। তুমি হাসালে দেখ্‌ছি; তোমার ও সব ধর্ম্মের কথা—ন্যাকামি রেখে দাও। তুমি আর আমি কি ছিলাম, তা' ত' আমরা বেশ জানি; অপরে না জান্‌তে পারে। কিন্তু মনের অগোচর ত' পাপ নাই। তা'ই বলছি, তোমার আমার মুখে ও সব ধর্ম্মের 'বড়াই' ভাল লাগে না।

ন। আমরা কি ছিলাম তা' কি আমারো মনে নাই? এক কথায় বল্‌তে গেলে, আমরা এক একটী কালাপাহাড় ছিলাম। কিন্তু তা' বলে কি চিরকালই সেই পথে চল্‌তে হবে। একবার পাপের পিচ্ছিল পথে নেমে পড়েছি বলে কি আর ফের্‌বার চেষ্টা কর্‌ব না? পাপী বলেই ত' এত চেষ্টা কর্‌তে হচ্ছে। ভাই! অসৎ যদি না আবার ঘুরে সৎ হতে পার্‌ত, পাপীর যদি মুক্তি হবার আশা বা পথ না থাক্‌ত, তা'হলে যে জীবন ও সংসারটা বিড়ম্বনা ময় হয়ে উঠ্‌ত। ক্ষণিক মোহে, যৌবনের ভ্রান্তিতে, ভ্রান্ত সুখ ও তৃপ্তির লালসায়, যে ভুল একবার করেছিলাম, তা'র কি আর শোধরাইবার উপায় নাই!—নিশ্চয় আছে। সেই আশা বা পথের একটু আভাষ পেয়েছি বলেই, আমার মত লোকেও আজ ফিরে দাঁড়াতে পেরেছে। তোমাকে আমি আর কি বল্‌ব বল; তবে আমারও আশা আছে, আমরা দলে যে কয়জন ছিলাম, এক দিন না এক দিন সকলেই ফিরে দাঁড়াবে; সকলেরই সুমতি হবে।

ভ। অবশ্য এ কথা গুলা আমি বুঝেছি, কেন না খুব reasonable; কিন্তু এটাও খুব ঠিক্, যে, সেই idiotটাই তোমার মাথা খেয়েছে;—কোথাকার একটা street beggar এসে তোমাকে ডেকে চুপিচুপি কি বল্লে,—আর তুমিও Stupidএর মত তা'ই শুনে ঘুর্‌তে লাগ্‌লে।

এ সব কথাগুলা নরেশের মোটেই ভাল লাগিতেছিল না; তা'ই কতকটা উদাসীন ভাবে বলিল, "তুমি কি এতই পণ্ডিত হয়েছ, যে এক কথায় বুঝে গেলে জিনিষটা সবই খারাপ।"

ভ। All humbug! ও সব বুজ্‌রুকি সেকালেই ভাল ছিল, এ বিংশ শতাব্দীতে ও সবে আর কেউ ভুল্‌ছে না—humanity এখন ঢের civilized; বিশ্ব অনেক উচ্চে ও উন্নত।

ন। আচ্ছা, যাঁ'র বিষয় তুমি কিছুই জান না, এমন একজন নিরীহ লোকের প্রতি কি করে এমন মন্তব্য প্রকাশ কর্‌ছ তা' ত' বুঝতে পার্‌ছি না। নরেশ একটু বিরক্ত ভাবেই কথাগুলি বলিল ;—ভবতারণও উত্তেজিত হইয়া উত্তর দিল—"These bloody scoundrels are the curse and nuisance to the society ;—আমিও ঢের দেখেছি ; সব বেটাই পাঁড় বজ্জাত।" উত্তেজিত হইলে আমাদের আর হিন্দি বা ইংরাজী শব্দের জন্য ভাবিতে হয় না।

ন। আচ্ছা, শুধু শুধু সাধু-নিন্দা করে তোমার কি লাভ হচ্ছে বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। ইহাঁরা ত' জগতের ইষ্ট বই, কোন অনিষ্টই করেন না।

ভবতারণ পূর্ব্ববৎ উত্তেজিত স্বরে বলিল—"D do I care your devil Sadhus ? আমার ও সব বজ্জাতি বুজরুকির সঙ্গে কোনই Sympathy নেই। —হ'তে পারে তিনি তোমার গুরু ; কিন্তু What obligation have I to pay him respect। নরেশ এতক্ষণ কতকটা ধীরভাবেই কথাবার্ত্তা বলিতেছিল, কিন্তু ক্রমাগত সাধু ও গুরু নিন্দা শুনে গর্জ্জন করিয়া বলিল "দেখ ভবতারণ, তোমার ও সব dam, devil, beggar, ও সব ফিরিঙ্গিয়ানা বুলি, এক সময় খুব আওড়েছি। কিন্তু তুমি মনে করোনা যে, ওই সব বুলি কপ্‌চে নিজেকে খুব সভ্য বা খুব বাহাদুরী দেখাচ্ছ। আমি তোমার কাছে আনন্দ পাব বলে বেড়াতে এসেছি ; তোমার কাছে থেকে এই রকম uncalled-for সাধু ও গুরু-নিন্দা শুন্‌তে আসিনি।"

ভবতারণ লজ্জিত হইল ; বুঝিল উত্তেজনার বশে ঐরূপ গালাগালি করাটা ভাল হয় নাই ; পরে বলিল "ভাই মাপ করো, জান ত, আমার মন সাদা, যা বুঝি তাই নিঃসঙ্কোচে বলে ফেলি।"

ন। "তুমি সরল অন্তঃকরণ, তোমার মনে কোন ঘোর ফের নাই বলেই ত' তোমার কথাতে রাগ হয় না। তবে দুঃখও হয় sympathyও হয়।" (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

২য় ভাগ। ভাদ্র, ১৩২০। ৫ম সংখ্যা।

মোক্ষ]

ভাব-রূপ ভগবান্।

"যং ক্রোধকামসহজপ্রণয়াদিভীতি-"
বাৎসল্যমোহ গুরুগৌরবসেব্যভাবৈঃ,—
সঞ্চিন্ত্য যস্য সদৃশীং তনুমাপুরেতে;
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ব্রহ্মসংহিতা।

নাহি ভাবাভাব, সত্য-নিত্য ভাব,
অব্যক্ত স্বভাব যা'র
স্বকীয় প্রভাবে, পুনঃ প্রতিভাবে,
ব্যক্ত ভাব হয় তা'র॥
সূক্ষ্ম হ'তে সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতম সূক্ষ্ম,
অতীত, অলক্ষ্য যিনি।
ভাবে কি অভাবে, সদা সর্ব্ব-ভাবে,
সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ তিনি॥

'সর্ব্ব'ভাব-আদি পুরুষ অনাদি,
অজ অকারণ যেই।
স্বয়ম্ভূ স্বভাবে হর্ত্তা কর্ত্তা ভাবে,
কারণ-কারণ সেই॥
ভাবের গোপক, সর্ব্বত্র ব্যাপক,
যেবা থাকে অগোচরে।
সেই চরাচরে, পুনঃ সুগোচরে,
খেচরে ভূচরে চরে॥

যে ইন্দ্রিয় হীন, বিকার বিহীন,
নির্গুণ নিরীপ্স বিভু।
সেই ত' আবার, বহু হইবার,
স্বেচ্ছাময় পর-প্রভু ॥
অতি অপরূপ রূপ অনুরূপ,
কোন রূপ নাই যার।
ষড়ৈশ্বর্য্য ভাব, রূপের প্রভাব,
'সর্ব্ব'-রূপ নাম তার ॥
রূপে নিরাকার, গুণে নির্ব্বিকার ;
যা'র নাহি নাম ধাম।
তাহারি আবার শ্রুতিতে প্রচার,
যত ধাম, তত নাম ॥
এক, নিরাকার; দ্বিতীয়, সাকার,
একের প্রকার দ্বয়।
বিভিন্ন ভাব—না, বিভিন্ন ভাবনা ;
ছায়া,—দেহ ছাড়া নয় ॥
যা হ'তে মানব, দেবাদি, দানব,
পশুপাখী আদি স্থূল।
লতা, গুল্ম, তরু, মোটা কিবা সরু,
কভু শাখা, কভু মূল ॥
'ওই' 'এই' ভাবে, ভাব! দুই ভাবে,
ভাব আছে যত তা'র।
কোন্ ভাব সাঁচা, কোন ভাব কাঁচা,
সেই জানে ভাব যা'র ॥
'ও' ভাব 'এ' ভাব, দ্বিভাব, স্বভাব,
পুরুষ প্রকৃতি ভাবে।
কত ভাব ধরি, কত ভাব গড়ি,
ভাব করে এই ভাবে ॥

'ও' ভাবে 'এ' ভাবে, ভাবি দুই ভাবে,
নিজ ভাব অনুরূপ।
গড়িয়া 'স্বভাবে', কেহ কেহ ভাবে,
'ও' ভাব অভাব-রূপ ॥
কেহ বা 'স্বভাব', কেহ ভাব-ভাব,
কেহ বা 'প্রভাব', ভাবে।
আর কত ভাবে, সেই ভাব্য-ভাবে,
ভাবে, যে যেমন ভাবে ॥
কেহ ভাবে 'দৃশ্য', কেহ বা 'অদৃশ্য',
যার ভাবে যাহা হয়।
কেহ ভাবে 'গম্য', কেহ বা 'অগম্য',
ভাব ছাড়া তাহা নয় ॥
কেহ বা 'অচল', কেহ ভাবে 'চল',
চলাচল যাহা ভাবে।
এদিকে ওদিকে, যে ভাবে যে দিকে,
এক দিকে সরে যাবে ॥
ভাবিয়া যেমতি, যার যথা মতি
মুরতি গড়িয়ে মোরা।
যার যাহা ভালো, ধলো, লাল, আলো,
কালী, কাল কেহ গোরা ॥
কেহ ভাবে-ভোলা হ'য়ে ভাবে 'ভোলা'
কটিতটে বাগছাল।
ভিক্ষু, যোগী বেশ জটাজুট-কেশ
বব-ব্যোম বাজা গাল ॥
কেহ 'গজানন,' মুষিক বাহন,
রূপ অতি অদ্ভুত।
কিবা লম্বোদর চতুর্ভুজ-ধর,
বিঘ্ন-হর শিবসুত ॥

কেহ গড়ি, রবি　—আলোকের ছবি
মণ্ডল মূরতি কিবা।
যাহার প্রকাশে,　তমোতম নাশে,
ধরায় বিকাশে দিবা॥
কেহ ভাবে শশি　গড়ে,—করে অসি
মুণ্ডমালা দোলা গলে।
সদা সুশঙ্করে　রাখি সে শঙ্করে
তাঁ'র রাঙ্গা পদ-তলে॥
কেহ 'গোপসুতে'　বেষ্টিত পশুতে
ব্রজের রাখাল করি।
করে দিয়া বেণু,　ধেনুচড়া কানু,
ভেবে যায় গড়াগড়ি॥
সাধিবারে কাম,　কেহ ভাবে, 'রাম,'
দূর্ব্বাদল-শ্যাম-ভূপে।
কেহ কেহ শিশু　রূপে ভাবে 'যীশু,'
'রহিমা'দি নানারূপে॥
কেহ সে বঁধুর　উজ্জ্বল মধুর,
যুগল মূরতি গড়ি।
স্বকীয়া প্রকৃতি,　করিয়া প্রকৃতি,
সখি ভাবে সেবা ধরি॥
এই এইভাবে　সেই ভাব্য-ভাবে,
ভাবিতে কেবা না চায়?

কি জানি কি ভাব,　ভাবনার ভাব,
স্বভাবে আপনি ধায়॥
যেবা যেবা ভাবে　ভাবয়ে সে ভাবে,
ডুবিয়া ভাবের সরে।
তা'রে ভাবিলেই,　ভাবগ্রাহী সেই,
ভাব-রূপ ভাব ধরে॥
সে ভাব বিকার,　অনেক প্রকার,
ভ্রান্তি নহে—তাহা ফলে।
সব ভাব শেষে,　'একে' যায় মিশে,
জল-বিম্ব যথা জলে॥
'সর্ব্ব'ভাবাধারে,　ভাবের বিচারে;
পক্ষপাত নাহি তথা।
ভাবের নিধান,　করেন বিধান,
ভাবের যেমন প্রথা।
ভাবিতে ভাবিতে,　কখন ভাবিতে,
ভাব যদি হয় আলো।
তখন কিরূপ,　সে ভাব-স্বরূপ,
দেখায় গোরা কি কালো?
গোরাতে কালোতে, মিশাল আলোতে,
লাগে যদি প্রেমরেখা।
সে প্রেম শিখায়,　যেরূপ দেখায়,
সেই দেখা হয় দেখা॥

কবিরাজ শ্রীউমেশচন্দ্র রায়

মোক্ষ]

ভক্ত।

(বাউলের সুর।)

ভক্ত হওয়া মুখের কথা নয়,
(দেহে) প্রাণ থাকিতে মর্‌তে হয়;
(ও ভাই) ভক্ত হয় যে জন, তা'র জীয়ন্তে মরণ,
(সে) হাবা বোবা কাণা কালা পাষাণ হ'য়ে রয়;
(ও সে) আপন ভাবে সদাই থাকে শুধু দু'নয়নে অশ্রু বয়।
(তার) মুখে কথা নাই (সে) যায় না কোন ঠাঁই,
ঘরে বসে কাঁদে হাসে, একা সব সময়;
(ও সে) কিল খেয়ে কিল চুরী ক'রে (সদাই) ভূতের বোঝা মাথায় বয়
(সে) ভবের ভাবনা কিছুই ভাবে না,
চুপ্‌টী ক'রে ঘাপ্‌টী মেরে সকল জ্বালা সয়;
(ও সে) কাদায় গুণ পেতে শুয়ে, (করে) দিনগত পাপ ক্ষয়।
কারোর কথা শোনে না, কারোর কথায় থাকে না,
কারোর কথার ধারধারে না, নাহি লজ্জা ভয়:
(তারে) যে যা বলে শুনে শোনেনা সে (শুধু) দেলের সঙ্গে কথা কয়।
প্রাণের মাঝে যে সদাই বিরাজে,
তারই সনে প্রেমে মজে হয় প্রেমময়;
(আবার) যার প্রাণ ভাই, তারেই দিয়ে, (করে) আপন অস্তিত্ব লয়।

গোবিন্দলাল—

মোক্ষ]

উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।

উঠ অমৃতের— পুত্রেরা সব, কর উন্মীলন প্রজ্ঞা নয়ন,
হের নয়ন মেলিয়া; হের অপূর্ব্ব রূপ;
কে তব অন্তরে, নিভৃত কন্দরে, (তাঁর) অনিদ্র আঁখি, বিশ্বপানে রাখি
রয়েছে নিত্য জাগিয়া। (ঐ) জাগিয়া বিশ্বভূপ।

শিব-সুন্দর মূরতি শুভ্র,
আলোকরশ্মি জালে ;
দিক্‌দিগন্ত ফেলিল ছাইয়া,
স্বর্ণ-কিরণমালে।
হাস্য-ছটায় হরিছে আঁধার,
মানস কলুষ নাশে ;
প্রেম-পুলকিত হৃদয় তাঁহার,
হাসে কুসুম-বাসে।
দেখনা দাঁড়ায়ে, বরাভয়করে,
মুখে আনন্দ রাজে ;
শূন্যে সুদূরে, মেঘ গম্ভীরে,
"মাভৈঃ" শব্দ বাজে।
তিনি সখা তব, রাজ-অধিরাজ,
নিত্য তোমার সাথে ,
ভয় কেন তবে, রে পান্থ তোর,
এ ভব গহন-পথে।
মৃত্যু ! মৃত্যু ! কোথায় মৃত্যু ?
(শুধু) ছায়া বিভীষিকাময়ী .
তুমি যে অমৃত, তুমি যে নিত্য,
তুমি যে মরণজয়ী।
ইন্দ্রিয় ক্ষোভে হয়েছ মুগ্ধ,
আপনা চেননা কভু ;
তুমি যে সত্য, পরম তত্ত্ব,
তুমি যে তাদের প্রভু।
কেন সংশয়, কেন এ ভ্রান্তি,
কেন এ অজ্ঞানতা ;
আপন শক্তি, কর জাগ্রত,
ঘুচে যাক্ মলিনতা।

অসীম শক্তি, আছে যে তোমাতে,
তাহা নাহি তুমি জানি' ;—
শোকে মোহে সদা, ব্যর্থ করিছ,
অমূল্য জীবন খানি।
অমোঘ তোমার, আত্মশক্তি,
প্রত্যয় কর যথা ;
দেখ কি অপার বল, সাধনার ;
এ নহে শুধুই গাথা।
জাগিয়া বসিয়া দেখহ চাহিয়া,
তুমি কাহার পুত্র ;
চৌদিকে দেখ তাঁহার আনন্দ,
ভয় নাহি হের কুত্র।
আপন ঘরেতে আপন পিতাকে,
"হে পিতঃ" বলিয়া ডাক ,
সকল কাজেতে সকল ভাবেতে,
তাঁহাতে যুক্ত থাক।
সাগরের ঢেউ,— উপরে শুধুই ;
নিম্নে অতল স্থির ;
বাহিরে মায়ার প্রকোপ ; শান্তি,
অন্তরে সুনিবিড় ॥
তিনি—তোমাদের, তিনি—জগতের,
তিনি— সকলের পিতা ;
আনন্দময়ের হইয়া পুত্র,
কেন এই ব্যাকুলতা।
লভহ শান্তি চির বিরাম,
তাঁহার সত্তা মাঝে,
হের গো মুগ্ধ, হৃদয়ে, শুদ্ধ—
কাহার জ্যোতি রাজে।

সব চরাচরে হের হে তাঁহার,
এক অখণ্ড ভাতি ;
সূর্য্য চন্দ্র, কনক কিরণে,
ফুটিছে তাঁ'রি জ্যোতি।

ভয় নাহি ভীরু! ভয় নাই হের,
অভয় পরম ধাম ;
প্রকাশিত আছে অন্তরেতে তব,
লভহ তা'হে বিশ্রাম।

——:*:

মোক্ষ] হৃদয়-সখা !

(তুমি) নির্ম্মল মম সুন্দর তুমি,
হৃদয় জুড়ানো সখা ;
(বসে)আছি তব আশে—আকুল পিয়াসে,
কত যুগ ধরি একা।
নির্ম্মল আকাশে—প্রকাশে তব,
হেম কিরণমালা ;
(আজি) সর্ব্ব জগত চকিত—বিস্মিত,
হেরি মধুর তব লীলা।
জনম মরণ আসে ছুটিয়া—কাঁদিয়া,
(তব) চরণে পড়ে লুটিয়া ;
(এ কি) আনন্দ গগনে চন্দ্র কিরণে,
হাসিছ দিবা রাকা।
তুমি নির্ম্মল মম সুন্দর তুমি,
হৃদয় জুড়ানো সখা॥

ফুল পল্লব তরুশাখে,
কত বিহগ বিহগী ডাকে—
তারা যাচে, তারা নাচে—হেরিতে
তব ওই নয়ন বাঁকা।
(কে তুমি) অপূর্ব্ব বঁধুয়া—মন মোহিয়া,
বাজাইছ বাঁশী দিবানিশি,
হৃদয়ে একা।
হৃদি-যমুনা কো তীরে,
বাঁশরীর সুরে—
গাহিছ অধীরে—সংগীত সুধা মাখা।
তুমি নির্ম্মল মম সুন্দর তুমি,
হৃদয় জুড়ানো সখা॥

ধর্ম্ম] মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যেমন মস্তিষ্কের কাজ 'পা' করিতে পারে না, পায়ের কাজও মস্তিষ্ক দ্বারা হইবার নয়, তথাপি আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্রে সকলেই স্বাধীন, সকলেই স্বতন্ত্র ; কিন্তু প্রত্যেকটিই আবার সূক্ষ্মসূত্রে সকলের সহিত মিলিত ও যুক্ত। মস্তিষ্কের

চিন্তা-শক্তি আছে বলিয়া, 'পা'কে উপেক্ষা করিবার উপায় নাই; 'পা'রও মস্তিষ্কের কার্য্য করিবার জন্য বিশেষ উদ্বেগ নাই। স্ব স্ব কর্ম্মক্ষেত্রে এবং স্ব স্ব কর্ম্মে, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্বাধীনতা ও বিশেষত্ব আছে। অথচ কোন অঙ্গের—কোন স্থানের ক্ষতি হইলে, সকলেই স্ব স্ব স্থানের ক্ষতি অনুভব করে এবং সেই আহত দুর্ব্বল স্থানটিতে বলাধান করিবার জন্য সকলেই নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্যের ব্যয় করিয়া থাকে।

আমাদের সমাজের আদর্শও এইরূপ হওয়া উচিত। পূর্ব্বকালে এইরূপ আদর্শে আমাদের সমাজ গঠিত হইয়াছিল। শরীরের যে কোন স্থানে আঘাত লাগিলে সমস্ত শরীর ও ইন্দ্রিয় তাহার বেদনা ঘোষণা করে কেন? কারণ তাহারা এক পক্ষে যেমন স্বাধীন, অপর দিকে আবার কাহাকেও ছাড়িয়া দিয়া কেহ স্বয়ং সম্পূর্ণ নহে। যদি তাহাই হয়, তবে সমাজস্থিত কাহারও কোন অভাব অভিযোগে আমাদের উদাসীন থাকা কর্ত্তব্য নহে। কারণ, আমরা কাহাকেও ছাড়িয়া দিলে একা সম্পূর্ণ নহি। ভূমির সঙ্গে প্রথম'তলার' এবং প্রথম তলার সঙ্গে দ্বিতলের খুব ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই, ভূমির সঙ্গে দ্বিতলেরও সম্বন্ধ প্রমাণিত হইতেছে। তদ্রূপ এই জনসঙ্ঘের সকলের সহিত সকলের একটি নিগূঢ় সম্বন্ধ ও আত্মীয়তা রহিয়াছে. তাহা আমরা গায়ের জোরে উপেক্ষা করিলে মূঢ়তা প্রকাশ পাইবে। দ্বিতল, দ্বিতল থাকিয়াও যেমন ভূমির সঙ্গে সম্বন্ধহীন নয়; তদ্রূপ ব্যবহারিক মতে আমরা কেহ পণ্ডিত বা মূর্খ, ধনী বা দরিদ্র হইলেও আমাদের পরস্পরের স্বার্থ পরস্পরের সঙ্গে এত অবিচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত যে, আমরা কাহাকেও উপেক্ষা করিতে পারি না। ইহা শুধু স্বার্থের বন্ধন নহে; ভাবিয়া দেখিলে ইহাই প্রেমের বন্ধন। এইরূপে জগতের মধ্যে এই সত্য সম্বন্ধকে স্বীকার করাই পরম ধর্ম্ম এবং আমাদের মধ্যে যিনি যত উন্নত, তিনি এই সত্যকে তত পরিস্ফুট ভাবে দেখিতে পান। সুতরাং যাঁহার হৃদয়বৃত্তি যতটা অধিক সম্প্রসারিত, তিনি সেই পরিমাণে জ্ঞানী ও ভক্ত; এবং সেই পরিমাণে তিনি লোকসমাজের শিক্ষক ও গুরু।

সহৃদয় চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রকেই স্বীকার করিতে হইবে, যে তাঁহার একার কল্যাণ কল্যাণই নয়। সুতরাং সকলের কল্যাণকে নিজের কল্যাণ বলিয়া যতদিন আমরা স্বীকার করিতে না পারিব, ততদিন সংসারের মোহাবেশ হইতে

পরিত্রাণ লাভের কোন ভরসা নাই। যদি আমরা মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে চাই, তবে স্বার্থপরতার বিপুল বোঝাটিকে আমাদের স্কন্ধ হইতে নামাইয়া ফেলিতে হইবে। সমস্ত অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যকে উপলব্ধি এবং সমস্ত বিভিন্নতার মধ্যে এক অভিন্ন সদ্‌বস্তুকে হৃদয়ে ধারণা করাই ভারত-বর্ষীয় সাধনার চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে ঠিক বুঝিয়া, তথায় পৌঁছিবার জন্য যে পাথেয় প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহ করিতে বিলম্ব করিলে বিষম অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা আছে। সুতরাং হৃদয়ের প্রবল আবেগে, বিপুল পুরুষকার সহযোগে, এই সাধনার সুদুর্গম পন্থাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। বাসনার বন্ধন, প্রবৃত্তির তাড়না, সময়ে সময়ে গমনপথকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া তুলিবে; তথাপি শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে বিশ্বাস রাখিয়া, ভগবৎপদে মনোনিবিষ্ট করিয়া, বিষয়ের আকর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া, ধীরে ধীরে লোকে যেমন পর্ব্বত লঙ্ঘন করে, তদ্রূপ ধৈর্য্যের সহিত এই পথ বাহিয়া চলিতে হইবে।

জানি না জীবন-সংগ্রামের ঘোরতর যুদ্ধক্ষেত্রে আজকাল এ পথকে কেহ অনুসরণযোগ্য বলিয়া মনে করিবেন কি না; তথাপি একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি, পথ দুর্গম হউক, কিন্তু এই পথেই মনুষ্য-জীবনের চরম বাঞ্ছিত স্থানে পৌঁছিতে পারা যায়; অন্য উপায় নাই। অবশ্য লক্ষ্য লাভে যাহার একান্ত আগ্রহ আছে, লক্ষ্যস্থলে পঁহুছিবার কষ্টকে সে কখন বড় করিয়া দেখে না। আর্য্য-সভ্যতার ইহাই এক বিশেষত্ব ছিল, যে লক্ষ্য-লাভকেই তাঁহারা চরমলাভ মনে করিতেন। সুতরাং পথের কষ্টকে পুনঃপুনঃ স্মরণ করিয়া অযথা মনকে ভারগ্রস্ত করিয়া তুলিতেন না। কিন্তু যে দিন হইতে আমরা সংসারকে বড করিয়া দেখিতে শিখিয়াছি, সেই দিন হইতে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি চলিয়া গিয়াছে। যে দিন হইতে সংসারের বিবিধ প্রলোভন, এবং তাহার অর্থ সাধক অর্থের জন্য একটা মস্ত কোলাহল সৃষ্টি করিয়াছি—সংসারের বাহ্য চাকচিক্য আমাদের দৃষ্টিকে মোহিত করিয়াছে—সেদিন হইতেই আর আমরা অন্তরের মধ্যে অন্তরাত্মার 'সাড়া' পাই না এবং সেই দিন হইতেই কর্ণ বধির। স্বার্থের বিপুল চীৎকারের মধ্যে, প্রিয়তম পরমাত্মার সুমোহন বংশী-রব আর কর্ণকুহরে প্রবেশ করে না। আমরাও আর সেই সত্য সুন্দরের সুবিমল কিরণোদ্ভাসিত চরণপদ্মের অমল ও শুভ্র জ্যোতির আর কোন সন্ধান পাই

না। আমাদের চারিধারে সংসারকেই বড় করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছি। তাই যিনি প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা, বিশ্বের অধীশ্বর, সেই শিব-সুন্দরের শিব-ভাবকে আর উপলব্ধিই করিতে পারি না। তিনি যেন কতদূরে সরিয়া গিয়াছেন, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় সামান্য সামান্য দ্রব্য অপেক্ষাও ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু এই কথাই কি ঠিক্—যে তিনি দূরে সরিয়া গিয়াছেন? তিনি দূরে সরিয়া যান নাই, আমরাই এত বড় মিথ্যা মায়ার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছি, যে আমরা আর আমাদের যথার্থ আপনাকে চিনিতে পারি না। সংসার-সাগরে তরঙ্গের পর তরঙ্গ উঠিতেছে ও পড়িতেছে; তাহাতেই আমাদের নয়ন মন ধাঁধিয়া যাইতেছে। চিরস্থির চিরসুহৃদ্ আমার চিরপ্রেমিক যে আমারই নিকটে নিকটে রহিয়াছেন, আমরা আর তাহা দেখিতেও পাইতেছি না।

কিন্তু একথা খুব সত্য, যে যদিও সংসার তাহার প্রলোভন বলে ডালি সাজাইয়া বসিয়া আছে, তাহার প্রতি আমাদের আসক্তির ত' ন্যূনতা নাই; তবু এই মন-পক্ষী থাকে থাকে কোথায় পলাইতে চায়, সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডী ছাড়াইয়া কোন্ অনন্ত শূন্যের যাত্রী হয়। মুগ্ধ করিয়াও, সংসার কেন আমাদিগকে সম্পূর্ণ মোহিত করিতে পারে না। ইহাতেই বোধ হয় সংসার অপেক্ষা আরও কোন প্রিয়তর বস্তু আছে, যাহার জন্য মন সময়ে সময়ে ছুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে; কিন্তু সংসারের মোহিনী শক্তি আবার তাহাকে ভুলাইয়া দেয়।

কেন এমন ভুল হয়? আমরা ছাড়িতে চাহিলেও, কে আমাদের বন্ধনে আবদ্ধ করে? একি ভ্রান্তি! একি মায়া! কত পান্থ, কত যাত্রী, আমাদের চক্ষের সাম্‌নে, এই মায়ার স্রোতে ভাসিয়া গেল; তবুও আমাদের চেতনা হয় না। কে যেন মায়ায় জড়াইয়া রাখে?

নদীর স্থানে স্থানে অনেক ঘূর্ণাবর্ত্ত থাকে,—তাহা বোধ হয় অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। সেই ঘূর্ণাবর্ত্তের অধিকার মধ্যে আসিয়া পড়িলে, আর কোন যাত্রী বা তরণীর উদ্ধারের আশা থাকে না; সে তলাইয়া যাইবেই। সংসারের ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়াও ঠিক আমাদের সেইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছে।

এই আবর্ত্তই বিশিষ্ট অহংজ্ঞান বা আত্মাভিমান। ঘূর্ণাবর্ত্তের টানে যে পড়ে, সে সেই আবর্ত্ত-কেন্দ্রের মুখে সবেগে আসিতে আসিতে ডুবিয়া যায়, আমরাও তেমনি অহংজ্ঞানের প্রবল টানের মধ্যে হাবুডুবু খাইয়া ডুবিতে বসিয়াছি। নিজের

দিকে মানুষের কি প্রবল টান! সমস্ত সংসার উন্মত্তের মত স্ব স্ব কেন্দ্রের চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতেছে। কবি গাহিয়াছেন "আপনারে শুধু ঘেরিয়া ঘেরিয়া, ডুবে মরি পলে পলে।" আমরা কেবল নিজের সুখ দুঃখ, নিজের অভাব অভিযোগ, কেবল নিজের কথাই লইয়া ভোর হইয়া আছি; কেবল "আমি" "আমি"—"আমার আমার" রব!! ইহাই মমতাবর্ত্তের গভীর টান, এই টানে পড়িয়া যাঁহার চৈতন্য লোপ পায়, তাঁহার আশা ফুরাইল; কিন্তু যিনি সুকৃতি ফলে আবর্ত্তের বাহিরের দৃঢ় কোন খোঁটা বা অবলম্বনকে শক্ত করিয়া ধরিতে পারেন, তাঁ'র আর ভয় নাই—তিনি মুক্তিলাভ করেন। এই ভব-জলধির সব স্থানেই যে আবর্ত্ত আছে তাহা নহে; আবর্ত্তহীন স্থানও যথেষ্ট আছে। সঙ্কীর্ণ স্থান জুড়িয়াই আবর্ত্ত; তাহার বাহিরে অনন্ত-মুক্ত জলরাশি, তাহা ধীর, স্থির ও প্রশান্ত। মন "আমি—আমি" করিয়াই আবর্ত্ত রচনা করিয়াছে। যার মন "অহং"কে ছাড়াইয়া বিশ্বের দিকে একবার বাহির হইয়া পড়ে, সেই সৌভাগ্যবান্ পুরুষই মুক্তিলাভ করে। পেষণ-যন্ত্রটি অবিরত ঘুরিতেছে, সেই যন্ত্রের মধ্যে শস্য পড়িলেই পিষিয়া যায়, কিন্তু যে শস্যটি খোঁটার গায়ে লাগিয়া থাকে, তাহার কোন অনিষ্ট হয় না। তদ্রূপ এই সংসারাবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া, যে সেই সত্যস্বরূপ পরম আত্মাকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করে, তাহার বিনষ্ট হইবার কোন আশঙ্কা থাকে না। ভগবান্ বলিয়াছেন, "যদিও মায়া অনতিক্রমণীয়, তথাপি—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"। এতদপেক্ষা ভরসার কথা আর কি থাকিতে পারে? অনেকে মুক্তির অভিলাষ করিয়া এমন একটি ভাব অবলম্বন করেন, যেন জগতে তাঁহার অন্য কর্ত্তব্য নাই, এবং তাঁহার এই কর্ত্তব্য-হীনতাই যেন তাঁহাকে মুক্তিদান করিতে বাধ্য। কিন্তু মনে রাখা কর্ত্তব্য, যে পথ আমাদের মনকে সর্ব্বসাধারণ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখে, আমাদের পরস্পরের বিচ্ছেদ-ব্যবধানকে আরও বৃহত্তর করিয়া ফেলে, তাহা অহংকারের ঘূর্ণাবর্ত্ত। তাহাতে পড়িলে কিছুতেই মুক্তিলাভ করা সম্ভব হয় না; কারণ পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি সমস্ত অনৈক্যের মধ্যে ঐক্যকে উপলব্ধি করাই মুক্তির নামান্তর।

সঙ্কীর্ণ হইতে অসঙ্কীর্ণ, ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ, আবর্ত্ত হইতে আবর্ত্তহীন স্থানেই আমাদের যাইতে হইবে। "বৃহৎ"কে বুঝিতে পারাই, বৃহৎকে লাভ করাই যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ লাভ। কারণ "ভূমাই" আমাদের পরমধাম এবং

"ভূমাই" আমাদের পরম আনন্দ। বিশ্ব-জলধির মধ্যে যে একটি মমতার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আবর্ত্ত সৃষ্ট হইয়াছে, তাহা ক্ষুদ্র হইলেও তাহার আকর্ষণ অত্যন্ত প্রবল,—তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন সেই আবর্ত্ত হইতে লাফাইয়া যদি একবার আবর্ত্তহীন জলরাশির মধ্যে গিয়া পড়িতে পারি, সেখানে আর অভিমান আবর্ত্তের টান নাই, সেখানকার যা কিছু সমস্তই আনন্দামৃ-পরিপূর্ণ; সেই খানেই আমাদের পরম নিষ্কৃতি। সীমাবদ্ধ স্থানের মধ্যেই মোহের আকর্ষণ; অসীমের মধ্যে কোন মোহ নাই। আমরা যদি এই মোহময়ী আকর্ষণ হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে চাই, তবে এই ক্ষুদ্রত্বের প্রণয় ত্যাগ করিতে হইবে। ক্ষুদ্রতা লইয়া—হীনতা লইয়া সেখানে যাওয়া যায় না। সেখানে যাইতে হইলে প্রদীপ্ত ব্রহ্মানলে আপনার ক্ষুদ্র স্বার্থ ও অভিমানকে হোম করিতে হয়; নচেৎ যজ্ঞেশ্বরের তৃপ্তি লাভ হয় না।

এ কথা যদি আমরা সত্য বলিয়া ধারণা করিতে পারি, তবে আমাদের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, লাভালাভ মানাপমানকে অনায়াসেই আমরা উপেক্ষা করিতে পারি। বিশ্বের মধ্যে 'আমি' কতটুকু? সুতরাং তাহার সুখ দুঃখের মূল্য কি? আমার অভাব কতকটা কল্পনা? যেমন বৃহৎ স্বার্থের জন্য অল্প স্বার্থকে ত্যাগ করা কিছুমাত্র কঠিন নয়, তদ্রূপ জগতের সুখের জন্য, জগতের মঙ্গলের জন্য, নিজের সুখ-স্বার্থ বিসর্জ্জন করা কিছুমাত্র কষ্টকর হওয়া উচিত নহে। আমরা আপাত দৃষ্টিতে যাহাকে দুঃখকর মনে করি, তাহা যে ঠিক দুঃখকরই তাহা নহে। অনেক সময় কল্পনায় আমরা দুঃখানুভব করি। অনেক সময় অবিচারে একটা অবস্থাকে দুঃখজনক বলিয়া ঘোষণা করি। মনে করুন, যখন একটি প্রবল বাত্যা একটি ক্ষুদ্র কুটীর বা গ্রাম উড়াইয়া লইয়া যায়, তাহাতে কতিপয় লোকের কষ্ট হয় বটে, কিন্তু তথাপি ঐ প্রচণ্ড বাত্যার বিশ্বের মধ্যে প্রয়োজনীয়তা কত অধিক, তাহা মনে করিলে তোমার আমার সামান্য সুখ দুঃখের কথা ভাবিতে ইচ্ছা হয় কি? প্রবল বন্যায় ধন জন গৃহ, সব ভাসাইয়া লইয়া আমাকে আশ্রয়হীন করে বটে, কিন্তু বন্যাতে জগতের যে প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়, তাহা ভাবিয়া দেখিলে আমার নিজের ক্ষতির কথা মনে করিতে লজ্জানুভব হয়।

যে কেহ ভগবানের জগচ্ছরণ্য পদারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ করিতে চেষ্টা করে, সে আর ক্ষুদ্রের জন্য ভাবেনা, নিজের জন্য চিন্তা করে না। বিশ্ব তখন তার

গৃহ ; বিশ্ববাসী তখন তাহার আত্মীয়। আপনাকে পৃথক্ বলিয়া সে মনে করিতেই পারে না। শাস্ত্রে ইহাকেই পরাভক্তি বলিয়াছেন। কবে আমরা এই পরম ভক্তির কথা হৃদয়ে ধারণা করিতে পারিব ? কবে আমরা বৃন্দারবৃন্দ, মুনি-পূজিত, দেবাদিদেব-বন্দিত চরণকমলে মত্ত মধুকরের ন্যায় লুটাইয়া যুগযুগান্তর-সঞ্চিত কলঙ্ক-কালিমা ধৌত করিব ? হৃদয়ে যদি তাঁহার অভাব জাগিয়া থাকে, তবে প্রাণের সে আকুল পিয়াসাকে না মিটাইয়া কেহ থাকিতে পারে কি ? সুতরাং ব্যাকুল ভক্তকে "ইহা করিও আর ইহা করিও না" বলিয়া সাবধান করিয়া দিতে হয় না। তিনি যথার্থ বিধি-নিষেধের বহির্ভূত হইয়া পড়েন। যাহার মোহ ছুটে নাই, যাহার বিবেক জন্মে নাই, তাহাকেও চেষ্টা করিতে হইবে—যাহাতে এই ব্যাকুলতা বৃদ্ধি পায়। যতক্ষণ রোগ থাকে, ততক্ষণ ক্ষুধা থাকে না—কোন জিনিষ খাইতে ভাল লাগে না—সত্য ; কিন্তু একবার রোগ ছুটিয়া গেলে, দারুণ ক্ষুধায় সে আর চোখে কিছু দেখিতে পায় না। তদ্রূপ সাধুগুরুর প্রসাদে যাহার ভবরোগ ছুটিতে আরম্ভ করিয়াছে, তাহারও ভগবৎ-সঙ্গ লাভের দারুণ ক্ষুধা আসিয়া উপস্থিত হয়,—তখন সে আর স্থির থাকিতে পারে না। ভক্ত যখন ভগবানের জন্য ব্যাকুল হ'ন, ভগবান্ও তখন আত্ম প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তখন শুধু কোন মূর্ত্তির মধ্য হইতে নহে, কোন চিহ্নিত স্থান হইতে নহে, তিনি বিশ্বেশ্বর হইয়া; বিশ্বের স্থাবর, জঙ্গম—সজীব নির্জীবের মধ্য দিয়া আমাদের পূজা পাইবার জন্য হাত দু'খানি পাতিয়া রাখেন। শিশুর যেমন মাতৃস্তন্যের জন্য আগ্রহ থাকে, মাতারও শিশুকে স্তন্য পান করাইবার জন্য প্রাণের ব্যাকুলতা থাকে। ভক্ত যেমন তাঁহার জন্য ব্যাকুল হয় ভগবান্ও তেমনি ভক্তের জন্য ব্যাকুল। ভগবান্ এক স্থান হইতে নয়—বহুস্থান হইতে, একের মধ্যে নয়—বহুর মধ্য হইতে আমাদের প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন। তাঁহার সেই করুণার্দ্র হৃদয়ের নীরব-বাণী কি আমাদের মর্ম্মে মর্ম্মে কাঁদিয়া উঠে না ? তবে কেন আমরা ব্যথিতের ব্যথায় ব্যথা পাই ? ব্যথিতের বেদনা তিনিই আমাদের হৃদয়ে ফুটাইয়া তুলেন। কারণ তিনি ঈশ্বর এবং এই বিশ্বের পরম অধীশ্বর।

(ক্রমশঃ)

সিদ্ধ কি সাধ্য ?

(গত বৎসর ৯ম সংখ্যার পর।)

পূর্ব্ব প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটিতে যে পুরুষকার-পন্থী মানবের দৈবপন্থী উপল-খণ্ড হইতে অগ্রে মোক্ষপদবী প্রাপ্ত হওয়ার আলোচনা করা গিয়াছে, তৎপ্রতি মনোযোগ দিলে এই মাত্র বুদ্ধিতে আইসে, যে যদি পুরুষকার-পন্থী একই জীবনে প্রকৃত মোক্ষ অর্থাৎ নির্ব্বাণ লাভে সক্ষম হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে সেই এক জীবনে বহু আয়াস সহকারে সমগ্র সংস্কার নিষ্প্রভ করিয়া, শুদ্ধ-সত্ত্বাবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে; অথবা তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের কৃত উন্নতির উত্তরোত্তর বৃদ্ধি স্বীকার করিতে হইবে। জীবের প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হইতে বন্ধনরূপ সংস্কার জন্মিয়া স্বকৃত ডোরক নির্ম্মিত গুটিকাবদ্ধ প্রজাপতির ন্যায় জীবকে বদ্ধ করে। ইন্দ্রিয়গণ স্বাধীন ও নিরঙ্কুশ। মর্ম্মাঘাতী বিবেকাঙ্কুশ প্রহার ব্যতীত তাহাদিগকে বশীভূত করিবার উপায়ান্তর নাই; তাই সেই ক্ষমতা লাভে বিবেকী মানব জৈবীক সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ রচনা সন্দেহ নাই। অত্যন্ত কামপরায়ণ ছাগের অঙ্গচ্ছেদন করিলেও ত' তাহাকে পূর্ব্বাভ্যাস বা সংস্কারবশে বিফল কামচর্চ্চা করিতে স্বতঃ প্রণোদিত দেখা যায়। সুতরাং অভ্যাস বা অভ্যাসের চরম ফল সংস্কার যে জীবের বন্ধনের প্রধান ও দৃঢ়তর রজ্জু, তদ্বিষয়ে মতান্তর হইতে পারে না। বন্ধনের মোচন যখন জীবের মুক্তি, এবং তন্মধ্যে আবার শ্রেষ্ঠ মোচন—নির্ব্বাণ, তখন সর্ব্ব প্রযত্নে ইন্দ্রিয়জয়ী হওয়াই সাধনা বা পুরুষকার এবং ইহার ফল নিষ্পত্তির নামই দৈব। সাধক বা কর্ম্মযোগীর কর্ম্ম প্রতি ক্ষমতার নামই পুরুষকার এবং সেই কর্ম্ম-ফলকেই দৈব নিষ্পত্তি বলা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ। দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।" কোন পুরুষকারপন্থী দৈবকে একেবারে ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন; তাঁহার বাক্যের ভিত্তিহীনতা সম্বন্ধে এই বলা যায় যে,—শাণিত খড়্গ হস্তে কীলকাবদ্ধ পশু হননে প্রযুক্ত কর্ম্মকারকেও যখন ক্ষেত্রান্তরে পশুচ্ছেদন পরিবর্ত্তে ভগ্ন-খড়্গ বিফল-মনোরথ দেখা যায়, তখন বিচার করিলে আমরা কোন্ শেষ ফলে উপনীত হইতে পারি? সে ক্ষেত্রে কি খড়্গের তীক্ষ্ণতার বৈপরীত্য বা কর্ম্মকারের কর্ম্মে অযত্ন বা শৈথিল্য

অনুমান করিতে হইবে ? ইহা হইতে সসীম মানবজ্ঞান না হয় এই পর্য্যন্ত বলিতে সক্ষম, যে কর্ম্মকার অস্ত্রবল পরীক্ষান্তে দৃঢ়মুষ্টি হইলে ও লক্ষ্যস্থির করিয়া আঘাত করিলে তাহাকে বিফল-মনোরথ হইতে হইত না ; কিন্তু ইহাতেও বিরোধ আছে। কারণ অস্ত্রবল পরীক্ষা, মুষ্টির দৃঢ়তা ও লক্ষ্য-স্থিরতা প্রভৃতি পুরুষকার নিয়মে কর্ম্মকার নিশ্চয়ই নিয়ন্ত্রিত, তথাপি অন্যত্র তাহার এতাধিক পরীক্ষা আবশ্যক করে নাই। এই সাহস ও কর্ম্মফল লাভরূপ ভরসা তাহার কর্ম্মের জননী ; সুতরাং দৈব কর্ত্তৃক সে যে প্রতারিত হইল ইহা কেন না বুঝিব ? সতর্ক-নেত্রে লক্ষ্য-স্থির করিয়া বন্দুক হইতে গুলি ত্যাগ বা ধনু হইতে শর নিক্ষেপ পর্য্যন্ত কর্ম্মীর ক্ষমতাধীন ; কিন্তু লক্ষ্যভেদ করা তাহার ক্ষমতার বাহিরে,—তামস দৈব-কন্দরে বিধিবদ্ধ। এমতাবস্থায় কর্ম্ম করিতে হইবে ও ফল যাহা ঘটে, তাহাতেই সন্তুষ্ট হওয়া ব্যতীত জীবের গত্যন্তর নাই। কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে যখন কর্ত্তার, কৃতকর্ম্মের কি ফল পাইবেন তাহা নিশ্চয় করিবার ক্ষমতা নাই, তখন অদৃষ্ট বা দৈব-মুখাপেক্ষী হওয়া বুদ্ধিমান্ জীবের ভ্রান্তির কারণ বলা যায় না। স্রষ্টার নির্ম্মাণ-কৌশলের অমোঘ শৃঙ্খলে সৃষ্টি এতই দৃঢ়বদ্ধ, যে কাহাকেও নিষ্কর্ম্মা থাকিবার উপায় নাই। সকলকেই অনুক্ষণ কর্ম্মের গণ্ডীর মধ্যে থাকিতে হইবে। হাতে মুখে কিছু না করিয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাক, মন নিষ্ক্রিয় থাকিতে পারিবে না ; কেন না কোন বিষয়ে নিযুক্ত থাকিবেই থাকিবে। মানবের কর্ম্ম কেবল স্বতঃ পরিদৃশ্যমান বহির্জ্জগতের সীমাবদ্ধ নহে ; অন্তর্জ্জগৎও তাহার ক্রিয়াভূমি। চিন্তা সুখ দুঃখ বোধাদিও তাহার আন্তর্জ্জগতিক কার্য্য সন্দেহ নাই। সুতরাং যখন কর্ম্ম করাইতে পুরুষকারের এবং ফল-দানে দৈব বা অদৃষ্টের পূর্ণ অধিকার, তখন উভয়ের ক্ষমতার বাহিরে উভয় জগতে কাহারও যাইবার সাধ্য আছে কি ? মুকুন্দ ভক্তি-প্রেম দিতে পারেন ; কিন্তু বিনা কর্ম্মে ভক্তি-প্রেম সীমাবদ্ধ থাকিবার বস্তু নহে। এইরূপে আমরা যতই চেষ্টা বা অনুসন্ধান করিব, ততই বুঝিতে পারিব, পুরুষকার ও দৈবের একটির অভাবে জাগতিক কার্য্য কখনই চলিবে না। পুরুষকার—সাধ্য ও দৈব সিদ্ধ ইহার অধিক বলিতে মানবের রসনা সঙ্কুচিত হয়। সুতরাং সিদ্ধ-ধন প্রাপ্তিহেতু সাধনার আবশ্যকতা বিদ্যমান। সাধক সাধনা করিতে করিতে সিদ্ধধন লাভে সফলকাম হইবেন ইহা সুনিশ্চিত ; তবে কর্ম্ম বা সাধনহীন হইয়া কেহ কখন সিদ্ধি লাভ

করিতে পারিবেন না। কর্ম্ম করিতে করিতে নৈষ্কর্ম্মাবস্থা প্রাপ্তি, শাস্ত্রে যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা কি অযথা প্রলোভন না ভ্রান্তি বলিব? শাস্ত্র কখন মিথ্যা হইতে পারে না; এবং শাসনাস্ত্র আবার একদেশদর্শীও নহে, সমগ্র জগতের উপর তাহার প্রভাব অক্ষুণ্ণ। একবার কোন কর্ম্ম করিলে আর ইহ জীবনে তাহাকে সেই কর্ম্ম করিতে হইবে না এবং সে সেই কার্য্য নিষ্ক্রিয় হইবে, ইহা ভাবিয়া কর্ম্মত্যাগ শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে, বা তাহা স্থূলদেহ থাকিতে কাহার ঘটিতে পারে না। আরব্ধ ক্রিয়ার সমাপ্তি পর্য্যন্ত কর্ম্মের আবশ্যকতা; এবং সেই কর্ম্মের ফলোৎপত্তিই কর্ত্তার সেই কর্ম্মে নিষ্কর্ম্মাবস্থা বুঝিতে হয়। দেহ ধারণ করিতে হইলে অন্য কিছুর অপেক্ষা না করা যদিও সাধন বলে ঘটনা সম্ভব, কিন্তু সহজ-কর্ম্ম শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ না করিয়া দেহ-ধারণ সম্ভাবিত নহে। সেইজন্য শ্বাসের ক্রিয়াকে সহজ-কর্ম্ম আখ্যা দিয়া কর্ম্মের গণ্ডিমধ্যে ফেলিয়াছেন।

সিদ্ধধন নির্ব্বাণ মুক্তি বা ব্রহ্মরূপ পূর্ণে অংশের লয় প্রাপ্তি, এক কেবল পুরুষকার বলে অসম্ভব। ব্রহ্মের পরিচয় কল্প শাস্ত্র কি বলেন দেখা যাউক,—

"যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎ সুখান্নাপরং সুখং।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়।
যদ্দৃষ্ট্বান্নাপরং দৃশ্যং যদ্দৃষ্ট্বা ন পুনর্ভবঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধমধঃ পূর্ণং সচ্চিদানন্দমব্যয়ং।
অনন্তং নিত্যমেকং যত্তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়॥" গন্ধর্ব্ব-তন্ত্র।

"যাহার লাভ হইতে অপর লাভ নাই, যাহার প্রাপ্তি সুখ হইতে সুখান্তর নাই এবং যাহার জ্ঞান হইতে অন্য জ্ঞান নাই, তাহাই ব্রহ্ম। * * * যাহাকে দৃষ্টি করিলে জীবের পুনর্জন্ম হয় না তাহাই ব্রহ্ম" ইত্যাদি উক্ত পরিচয়ে 'লাভ,' 'প্রাপ্তি' 'সুখ' 'জ্ঞান' ও 'দৃষ্টি' প্রভৃতি শব্দ কর্ম্মান্তর্ভুক্ত সন্দেহ নাই।

"ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞান-মূর্ত্তিম্।
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যং॥
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্ব্বদা সাক্ষীভূতম্।
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্গুরুং ত্বং নমামি॥"

শাস্ত্র বলিতেছেন ব্রহ্মই গুরু অর্থাৎ জ্ঞানদাতা এবং ভাববোধ্য হইয়া জীব কর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ বিদ্যমান। এক পক্ষে জীবের কর্ম্মকর্ত্তা বলিলেও অত্যুক্তি

হয় না। তন্ত্রের ইঙ্গিতে ব্রহ্মরন্ধ্রে মনের লয় করিলে ব্রহ্মলাভ হয়। মন কর্ম্মের প্রবর্ত্তক, সেই মনের লয়ে কর্ম্মের শেষ হইলে নির্ব্বাণ লাভ সম্ভবে; অন্যত্র নহে। মন কর্ম্মের প্রযোক্তা, কিন্তু কর্ম্মফল কি হইবে তাহা মনের গণ্ডির বাহিরে। মন পুরুষকার-পন্থার অতীত রাজ্যে অন্ধ এবং সেই অচেনা পথে দৈবাধিকার।

সিদ্ধ সাধ্য না হইলেও সাধনা দ্বারা প্রাপণীয় অসম্ভব নহে। পরন্তু বিনা সাধনায় অর্থাৎ জন্মান্তর পরিগ্রহণে পৃথক্ পৃথক্‌রূপে নানারূপ কর্ম্ম ব্যতীত সিদ্ধ ধন মুক্তি প্রাপ্তি বরং অসম্ভব। এই সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন,—

"গতানুগতিকো লোকে কুট্টিনীমুপদেশিনো,
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে।

কোন সিদ্ধ বিষয়ের প্রাপ্তি এবং কর্ম্মযোগে সেই বিষয়কে সিদ্ধ প্রমাণ করা অবশ্য পৃথক্ কথা। যাহা সিদ্ধ, সাধনাবলে তাহার সৃষ্টি বা প্রকাশে মানব-শক্তি পরাঙ্মুখ হইলেও, তৎপ্রাপ্তি সম্বন্ধে পুরুষকারের মুখাপেক্ষা না করিয়া থাকা যায় না। জীবের জন্ম হইতে দেহাবসান পর্য্যন্ত সমস্তই অন্ধকারপটল-সমাচ্ছন্ন। সেই নিবিড় অন্ধকার মধ্যে, কিছু না কিছু ধ্রুব আলোক স্বীকার বা কল্পনা না করিলে, বিবেকী জীবের চিত্ত সন্তুষ্ট হইতে পারে না। সেই জন্যই পুরুষকার কৃতকর্ম্মের লভ্য, দৈব-শিরে ন্যস্ত না করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না এবং থাকাও অসম্ভব। উপাদেয় অথচ স্বাস্থ্য সুখকর আহার্য্য, কালে রস রক্ত মজ্জা ধাতুরূপে নীরোগে দেহ পুষ্ট করিবে, সহজ বিশ্বাস ইহার অন্যথা কামনা বা ইচ্ছা করে না। কিন্তু স্থলভেদে অবস্থান্তরও দৃষ্টিগোচরীভূত হইতেও অল্প দেখা যায় না। সুতরাং সেই বিপরীত-ক্ষেত্রে ফলভোগী আজীবন কি অনাহারে থাকিবে?—কখনই নহে। তবে নিজ স্বাস্থ্য হিসাবে গুণমত খাদ্যের ব্যবস্থা করিতে তাহার সাময়িক সতর্ক চৈতন্য উদ্বোধিত হইবে মাত্র। তাহা হইলে তাহাকে পুরুষকাররূপ পূর্ব্ববর্ণিত হিসাব কিতাবের অধীন হইতেই হইবে। সেই হিসাব ভ্রান্তিসঙ্কুল হইলে বিপদ্ এবং না হইলে সম্পদ্; ইহাই সেই পুরুষকারের অবশ্যম্ভাবী দৈবনিষ্পত্তি। চৈতন্যময় জীবশরীর যখন কখনই নিষ্কর্ম্মা থাকিতে পারে না, তখন পুরুষকার মুক্তিসিদ্ধ মতে ত্যাগের পদার্থ হইতে পারে না। সুতরাং এমতাবস্থায় সিদ্ধ সাধ্য না হইলেও সাধনলভ্য বলিতে পারা যায়। যে রহস্য-জালে এই ব্রহ্মাণ্ড নিয়ন্ত্রিত, তাহাতে সিদ্ধ ও

সাধনীয় দুটী পন্থাই এক ডোরে সর্ব্বদা গ্রথিত থাকিয়া, স্রষ্টাকে তাহার অতীতাবস্থায় নির্লেপ ও নিঃসম্পর্ক করিয়া রাখিয়াছে। দৈব-পুরুষকার-বাদ লইয়া প্রকারান্তরে অন্তর্লক্ষ্যাভাসে অপৌরুষেয় বেদ বলেন, যে—"অথ যে ইমে গ্রামে ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে তে ধূমমভিসম্ভবন্তি। ধূমাদ্রাত্রিম্। রাত্রেরপরপক্ষম্।" অপরপক্ষাৎ যান্ ষড়্দাক্ষিণাদিত্য এতি মাসাংস্তান্। নৈতে সংবৎসরমভিপ্রাপ্নুবন্তি। মাসেভ্যঃ পিতৃলোকম্। পিতৃলোকাদাকাশম্। আকাশাচ্চন্দ্রমসম্। তস্মিন্ যাবৎ সম্পাতমুষিত্বা অথৈতমধ্বানং পুনর্নিবর্ত্তন্তে।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫ম প্রপাঠক), অর্থাৎ গ্রামে গৃহস্থরূপে প্রতিষ্ঠিত সাধক, ইষ্ট (যাগাদি) পূর্ত্ত (জলাশয় মার্গাদি) ও দানাদি কর্ম্মদ্বারা সাধনা করেন, তাঁহারা মরণান্তে, স্থূলদেহনাশান্তে, প্রথমে ধূমাভিমানিনী দেবতা প্রাপ্ত হয়েন। সূক্ষ্ম বা আতিবাহিক দেহাশ্রয়ে তল্লোক প্রাপ্তি ঘটে। তদনন্তর রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দাক্ষিণায়ন, পিতৃলোক, আকাশদেবতা এবং শেষে চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। ধূমান্ধকারাবলম্বনে স্নিগ্ধ আলোকাধার চন্দ্রলোক-প্রাপ্তিকে, মতান্তরবাদিগণের অন্ধকার হইতে আলোকে যাওয়া বলিলে বোধ হয় অসমীচীন হয় না। চন্দ্রলোক-প্রাপ্ত জীবগণ কর্ম্মফলক্ষয় পর্যন্তকাল তথায় থাকিয়া পুনরায় গম্যপথে প্রতিনিবৃত্ত হয়। ইহা যে পুরুষকারের অবস্থা পরে তদ্বিষয় আলোচিত হইতেছে।

দৈব সম্বন্ধে বেদ বলেন—"যে চে মে অরণ্যে শ্রদ্ধাতপ ইত্যুপাসতে তে অর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি। অর্চ্চিষোহহঃ। অহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষং। আপূর্য্যমাণপক্ষাৎ যান্ ষড়ুদঙ্ঙাদিত্য এতিঃ মাসাংস্তান্। মাসেভ্যঃ সংবৎসরম্। সংবৎসরাদাদিত্যম্। আদিত্যাচ্চন্দ্রমসম্। চন্দ্রমসো বিদ্যুতম্। তৎপুরুষো অমানবঃ স এতান্ ব্রহ্ম গময়তি এষ দেবযানঃ পন্থা ইতি। এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং না বর্ত্তন্তে।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৫ম প্রপাঠক।) অর্থাৎ গৃহত্যাগী, অরণ্যবাসী, শ্রদ্ধাবান্ তপস্বি-সাধক ব্রহ্মোপাসনা করিলে, তাঁহার মরণরূপ স্থূলদেহত্যাগান্তে সূক্ষ্মশরীর প্রথমতঃ অর্চ্চিরাধিষ্ঠাত্রী অর্থাৎ তেজোধিষ্ঠাত্রী দেবতা ক্রমে অহঃ, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণ, সংবৎসর, সূর্য্য, চন্দ্রমা ও পরে বিদ্যুদধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রাপ্ত হন। তথায় ব্রহ্মলোক-প্রেরিত কোন অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক আতিবাহিক দেহ ব্রহ্মলোক লাভ করে। এই দেবযান পথে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া জীবের আর পুনরাবৃত্তি হয় না। বেদের এই বচনকে দৈবাবস্থা বলা যাইতে পারে।

উপরোক্ত বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যে সকল সাধককেই প্রথমতঃ পুরুষকার আশ্রয়রূপ যজ্ঞ-তপাদি আরম্ভ করিতে হয়। তন্মধ্যে দুই পন্থীরই কর্ম্মের আলোচনা করিলে অনুমান হয়, প্রথমোক্ত পুরুষকার-পন্থী, কাম্যকর্ম্মী—অর্থাৎ যশ-সুখাদির অভিলাষী; সুতরাং তাঁহার কর্ম্ম ইষ্টাপূর্ত্তদানাদিতে সীমাবদ্ধ, অথচ আধ্যাত্মিক নহে। দ্বিতীয়োক্ত দৈবপন্থী নিষ্কামকর্ম্মসেবী; যশ সুখাদির প্রতি অন্ধ, সুতরাং তৎকর্ম্ম অসীম ব্রহ্মানুধ্যানে নিষ্কাম, তপঃসংলব্ধ অথচ আধ্যাত্মিক। কামনার অন্ধকার-গুহানিবিষ্ট ফলপ্রাপ্তি পুরুষকার-পন্থীর কাম্য বিধায় পিতৃযানরূপ অন্ধকার পথেরই মূলস্থান ধূম্রান্ধকার হইতে ফলোৎপত্তি আরম্ভ হইয়া চরমে আলোকময় চন্দ্রলোক প্রাপ্তি তৎপক্ষে বিধিবদ্ধ। সুখের চন্দ্রলোক প্রাপ্তি ঘটিলেও কামগন্ধযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান ফলে পুনরাবৃত্তিই তৎপক্ষে নিয়মিত। পক্ষান্তরে আত্মানুসন্ধানরূপ-স্বার্থ-বিহিত, নিষ্কাম, কলঙ্কমসী-লেশ-হীন তপস্যা যাহার কর্ম্ম, তাহার উৎপন্ন ফল নির্ম্মল অকলঙ্ক তেজোধিষ্ঠাত্রী দেবতালোক হইতে উদ্ভূত হইয়া চরমে ব্রহ্মলোক প্রাপণ করে; এবং তত্তৎ কর্ম্মীর আর পূর্ণ হইতে অংশরূপে বিচ্যুতি বা পুনরাবৃত্তি ঘটে না। কর্ম্মানুসারে ফলপ্রাপ্তি হিসাবে যাঁহাকে যে লোকে যাইতে হউক না কেন,—দৈবনিষ্পত্তি বলে উভয় পন্থীরই কর্ম্মের শেষ গণ্ডিরূপ স্থান হইতে কাহাকে পুনরাবৃত্ত, কাহাকে বা ব্রহ্মলোক প্রেরিত অমানব পুরুষ কর্ত্তৃক ব্রহ্মলোকে নীত ও পুনরাবৃত্তির পরিবর্ত্তে ব্রহ্মলোকে ব্রহ্ম হইয়া চিরাধিষ্ঠান বিধিবদ্ধ রহিয়াছে। এই সম্বন্ধে তন্ত্র ও বেদের সহিত ঐক্য আছে;—

"দক্ষিণা পিঙ্গলানাড়ী বহ্নিমণ্ডলগোচরা।
দেবযানমিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী॥"
'ঈড়া চ বাম নিশ্বাসঃ সোমমণ্ডলগোচরা।
পিতৃযানমিতি জ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্যতিষ্ঠতি॥"

ব্রহ্মরন্ধ্রে মনের লয়কেই তন্ত্র কামনা-বাসনা-নাশরূপ মরণের ইঙ্গিত করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে, আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে উপলব্ধি হয়, যে কামনা বাসনাদি চাঞ্চল্যের নিদান মন। কারণ মন হইতে তাহাদের উৎপত্তি বিবৃদ্ধি; সুতরাং মনের লয় হইলে তাহাদেরও মরণ অবশ্যম্ভাবী। পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ী দ্বারা আমাদের দক্ষিণ নাসায় বায়ু বাহিত হয়। উহা তেজোময়ী বায়ুরূপিণী বলিয়া দেবযানাখ্যাতা। যে

যোগী পিঙ্গলায় মন সমাহিত করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে মনের লয়রূপ মরণ প্রাপ্ত হয়েন, তিনিই সিদ্ধধন নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভে ব্রহ্ম হয়েন। আর তাঁহার মনে কামনা-বাসনারূপ জন্ম না ঘটায়, তাঁহার পুনরাবৃত্তি হয় না। ঐরূপ ঈড়ানাম্নী নাড়ী দ্বারা বাম-নাসায় বায়ু প্রবাহিত হয়। উহ চন্দ্রমণ্ডল-তুল্য প্রভাম্বিতা এবং পিতৃযান কথিতা। যে যোগী ঈড়ায় মন সমাহিত করত সাধনা করেন, তাঁহার সীমাবদ্ধ চন্দ্রলোক পর্য্যন্ত প্রাপ্তির অধিক ঘটে না; কারণ তখনও তাঁহার মন থাকে। চন্দ্রলোকে চন্দ্রের হ্রাস বৃদ্ধি থাকায় তাঁহারও পুনরাবৃত্তি, গমনাগমন; অর্থাৎ কর্ম্ম-ফুরায় না। প্রকৃতপক্ষে মনের লয়ই তন্ত্র-প্রদর্শিত মরণ। স্থূলদেহ-নাশান্তে লিঙ্গ-শরীরসহ যে সংস্কার থাকে, তাহারই বলে দৈব ও পুরুষকারাশ্রয়ে পুনরায় জীব জন্মান্তর গ্রহণ করে। তৎপক্ষে অন্য শাস্ত্র কি বলেন দেখা যাউক ;—

"স্বকর্ম্মবশতোজীবো নীহার-কণয়া যুতঃ।
পতিতো ধরণীপৃষ্ঠে ব্রীহি মধ্যগতো ভবেৎ॥ ৮
স্থিত্বা তত্র চিরং ভুক্ত্বা ভুজ্যতে পুরুষৈস্ততঃ।
ততঃ প্রবিষ্টং তন্তোজ্যং পুংসোদেহে প্রজায়তে।
রেতস্তেন সজীবোঽপি ভবেদ্দেহগতস্তদা॥ ৯
ততঃ স্ত্রিয়াভিযোগেন ঋতুকালে মহামতে।
রেতসা সহিতঃ সোঽপি মাতৃগর্ভে প্রযাতি হি॥ ১০
ভদ্রেতো যোনিরক্তেন যুক্তং ভুত্বা মহামতে।
দিনেনৈকেন কললং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্॥ ১৪
নবমে মাসি জীবস্তু চৈতন্যং সর্ব্বতোলভেৎ।
মাতৃভুক্তানুসারেণ বর্দ্ধতে জঠরে স্থিতঃ॥ ২৬
প্রাপ্যাপি যাতনাং ঘোরাং ন ম্রিয়েত স্বকর্ম্মতঃ।
স্মৃত্বা প্রাক্তনদেহোত্থ কর্ম্মাণি বহুদুঃখতঃ॥ ২৭
ইত্যেবং বহুধা দুঃখমনুভব স্বকর্ম্মতঃ।
অস্থিযন্ত্রবিনিশ্লিষ্টঃ পতিতঃ কুক্ষিবর্ত্মনা॥ ৩৩
সুতিবাত বশাদেব পরবশাদিব পাতকী।
মেদোঽসৃক্‌প্লুতসর্ব্বাঙ্গো জরায়ুপরিবেষ্টিতঃ॥" ৩৪ ভঃ গীঃ—১৭ অঃ।

জন্ম-মরণ সম্বন্ধে নানামতবাদীর মধ্যে মতান্তর থাকিলেও, মরণের পর জীবাত্মার

লোকান্তরাশ্রয় সম্বন্ধে সকলেই একবাক্য ; এবং তল্লোকেও আত্মা কর্ম্মাধীন তদ্বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। স্বকর্ম্মবশে জীবাত্মার নীহারকণা সহ মিলন, ভূপৃষ্ঠে পতন, ব্রীহি মধ্যগত হওয়া ও পুরুষ কর্ত্তৃক উক্ত ব্রীহি ভক্ষিত হইয়া রেতাংশে পরিণত হওয়, ঋতুকালে স্ত্রীগর্ভে শোণিতসহ সেই রেতঃ সম্মিলন এবং ভ্রূণের পুংস্ত্ব স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি প্রভৃতি কর্ম্ম-নিষ্পত্তি দৈব-বিধিবদ্ধ বলিতে হইবে। পুরুষকর্ত্তৃক ব্রীহি-ভক্ষণ ও ঋতুকালে স্ত্রী-সহবাস কর্ম্মদ্বয়, পুরুষকারের অঙ্গ হইলেও কোন সংস্কারযুক্ত জীবাত্মা, কোন্ ব্রীহি মধ্যগত, বা কোন্ শস্যটি উক্তরূপ মহিমান্বিত, ইহার নির্ব্বাচন-জ্ঞান অপৌরুষেয় স্বীকার করিতেই হইবে। সসীম মানব-জ্ঞান এখানে পরাস্ত ও বিস্মিত। সুতরাং জনকের কর্ম্ম ফলানুসারে, জাত পুত্রের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত ধরিতে হইলে, কোন্ বিধাতা এই মহা মিলন,—যোগ্যমিলন নিষ্পত্তি করিয়া দেন,—তাহাও মানব-জ্ঞানের সীমার বাহিরে—মহা যবনিকান্তরালে।

জন্মের ন্যায় মরণও অপৌরুষেয় বিধিবদ্ধ ; অবশ্য স্বীকার্য্য। তন্ত্র প্রদর্শিত মনের লয়রূপ মরণ পুরুষকারের সীমান্তর্গত ধরা যাইতে পারে। তা'ই ভক্তবীর সাধক-কবি রামপ্রসাদ গহিয়াছিলেন,—

'বল দেখি ভাই ! কি হয় ম'লে ?
এই বাদানুবাদ করে সকলে।
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই মোক্ষ পাবি,
কেহ বলে সালোক্য লবি, কেহ বলে সাযুজ্য ম'লে।
বেদের আভাষ তুই ঘটাকাশ ; ঘটের নাশকে 'মরণ' বলে,
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, নাশ হয় আবার সেই জলে।''

ধীশক্তি-সম্পন্ন পণ্ডিত কবি মরণের পরাবস্থা গাহিয়া গিয়াছেন। মুক্তি লাভার্থীকে এইরূপে কতবার মরিতে হইবে, তাঁহার সুর তাহারও আভাষ দিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মরন্ধ্রই ইচ্ছা জননী মনের ক্রীড়াভূমি,* তথায় ইচ্ছার জন্ম এবং ইচ্ছানাশরূপ মরণকেই জলবিম্বের জলে জন্ম ও মৃত্যু গাহিয়াছিলেন। কবি এই গীতে পুরুষকার-প্রচ্ছন্ন দৈব-প্রভাব যেমন আঁকিলেন ; আবার তেমনই

*এ কথাটি ঠিক নহে। মন আজ্ঞা-চক্র পর্য্যন্ত, তারপর বুদ্ধি ; তারপর প্রকাশিত ভগবদ্ভাব ক্ষেত্র সহস্রার। পং সং।

পুরুষকারের প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হওয়ায় অমনই দৈব-প্রচ্ছন্ন পুরুষকার উচ্চকণ্ঠে গাহিলেন,—

"মন ! তুমি কৃষি-কায জান না ।
এমন মানবজমী রৈল পতিত, আবাদ করলে ফল্‌তো সোনা ।
গুরুদত্ত বীজ বপন ক'রে, ভক্তিবারি সেঁচে দেনা,
একা যদি না পারিস্ তো, রামপ্রসাদকে সঙ্গে নেনা ।
কালী নামে দেওহে বেড়া, ফসলে তছরূপ হবে না,
সে মুক্তকেশীর শক্ত বেড়া, তার কাছে ত' যম ঘেঁসে না ।"

বীজবপন, জলসেক প্রভৃতি আমাদের কার্য্যগুলি পুরুষকারের অঙ্গ ; এবং ফসল রক্ষাকল্পে কালীনামরূপ বেড়া দেওয়াতে এই দৈবের প্রভাব প্রতি নির্ভর না করিলে উপায় নাই। তাই বলি ভাই সাধক ! মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের পদাঙ্কানুসরণে হরিবোল বল, আর জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের উপদিষ্ট পন্থায় শিব-শক্তির উপাসনা কর, তাহা তোমার কর্ম্মসেবারূপ পুরুষকার। সেই নামের প্রভাবে, নামরূপ-বেড়ার মধ্যে তৎকৃত নিবৃত্তি শিক্ষারূপ ফসল জন্মিবে, বাড়িবে, বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবে ; সুতরাং দৈবপ্রতি বিশ্বাসে নির্ভর না করিলে তোমার উপায় নাই ।

এ সম্বন্ধে লেখকের পরমাত্মীয় গুরুকল্প বন্ধু পণ্ডিত গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের রচিত একটি গীতের উল্লেখ করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করা যাইতেছে। গীতে পুরুষকারের চরম পন্থায় দৈবের প্রতি নির্ভরতারূপ উপরোক্ত ভাবটি নিপুণতার সহিত উত্তম চিত্রিত রহিয়াছে ।

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল মধ্যমান ।

"মনঘড়ি ঐ কচ্ছে মা টিক্‌টিক্ ; কাঁটার নাইক ঠিক্ ।
(ও সে) কেবল ঘোরে, 'ছটা'র ঘরে, মোহঘোরে হ'য়ে বেঠিক্ ॥
'স্লো' 'ফাষ্ট' কল্লেম কত, দম্ দিয়ে তা'য় অবিরত,
তবু, হলোনা সে মনের মত, সদা আমায় করে দিক্ ॥
'অয়েল' ক'রে গোপাল সারা, ঠিক্ করে দে তুই মা তারা,
(গোপাল) সময় যেন হয় না হারা, তারায় তারা রাখিস্ ঠিক্ ॥"

তোমার সাধনা অবশ্য বিশ্বাস বা ভক্তিমূলক হইতেই হইবে, এবং ফল-লাভার্থে

তোমাকে ধীর ও স্থিতধী হইতে হইবে। এইরূপে যতকালে তোমার সংস্কার-দাগ মলিন ও নিষ্প্রভ হইতে হইতে তুমি কলঙ্কহীন শুদ্ধ হইবে, তখন সিদ্ধধন মুক্তির প্রাপ্তি সাধ্য প্রমাণে, তোমার মুখ হইতে পুরুষকারের চরমধ্বনি 'সোঽহং' শব্দ আপনি ধ্বনিত হইবে। আর তোমাকে দেখিয়া তোমার পন্থানুসরণে পার্শ্বচর সাধকবৃন্দ তারস্বরে করপুটে গাহিবেন,—"যস্যার্চ্চনেন বিধিনা কিমপীহ লোকে,—কর্ম্মপ্রসিদ্ধমিতি নামফলং প্রসূতে। ত্বং শান্ততং সকলসাধকচিত্তবৃত্তিং, চিন্তামণিং কুলগণাধিপতিং নমামি।" (শান্তিস্তোত্রে)

শ্রীঅক্ষয়কুমার ভট্টাচার্য্য।

ধর্ম্ম]

প্রণব-রহস্য

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমরা গতবারে অহং ও সর্ব্বাত্মক দুইটী চৈতন্য-প্রবৃত্তির কথা বলিয়াছি। অহমাত্মক প্রবৃত্তিকে শাস্ত্রে 'মাত্রা' শব্দে, ও সর্ব্বাত্মক প্রবৃত্তিকে 'পাদ' শব্দে লক্ষিত করা হয়। 'মাত্রা' পুরুষের, ও 'পাদ' প্রকৃতির অভিব্যক্তি বা বিকাশ। এক্ষণে এই দুই স্রোতের মূল গতি কি, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। শাস্ত্রের কথাগুলির মধ্যেও যে গভীর তত্ত্ব নিহিত আছে, তাহা না বুঝিলে প্রকৃতভাবে শাস্ত্রের মর্ম্ম গ্রহণ করা যায় না।

পুরুষকে 'মাত্রা-শক্তি' বলা হয় কেন, একথাটী আমাদের বুঝা আবশ্যক। পাঠক! সর্ব্ব প্রথমেই পাশ্চাত্য অজ্ঞান-মূলক 'আমি'র সম্বন্ধীয় সংস্কারগুলি পরিত্যাগ করিবেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ 'আমি'টীকে একটী ভিন্ন-জাতীয় বিশিষ্ট অসম্পর্কিত বস্তু বলিয়া মনে করেন। 'পকেটে' 'মার্ব্বেল' থাকিলে যেমন উহা 'পকেটে'র সহিত নিত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ নহে, পাশ্চাত্যদিগের 'আমি'—জ্ঞানটীও সেইরূপ। দেহগুলি,—উচ্চ ও উচ্চতর, পকেট আর 'আমিটী' মার্ব্বেলের মত অসংশ্লিষ্ট পদার্থ। উপরের পকেটেই হউক আর নীচেই হউক মার্ব্বেলটী মার্ব্বেলই থাকে। তদ্রূপ আমাদের আমিটী যেমন অন্নময় বা স্থূলদেহের 'আমি',—অন্যদেহেও ঠিক তদ্রূপ 'আমি'ই থাকে।

আধুনিক থিয়সফিষ্টরাও এই ভ্রমে পতিত আছেন। তাঁহারা বলেন যে—"পৃথিবী জল আকাশ প্রভৃতিতে একই 'রাম' আবশ্যক মত শকট, নৌকা ও Æroplane ব্যবহার করে, তদ্রূপ একই 'আমি' বিভিন্ন দেহে বিভিন্ন ভাবে খেলা করে।" তাঁহাদের ভ্রান্তির কারণ এই যে—'আমি' জ্ঞানটীকে তাঁহারা আমি 'রাম' ইত্যাদি বিশিষ্টভাবে নির্দ্দিষ্ট করেন। 'আমির' একত্ব আমার নাম-মূলক নহে, কারণ নামটী প্রতি জন্মেই বিভিন্ন হয়। রাম শত চেষ্টা করিলেও পরজন্মে 'আমি রাম' এই জ্ঞান রাখিতে পারিবেক না। 'আমি রাম-রূপ' ভাবটী তাঁহার স্বরূপ নহে ; উহা প্রকৃতির সম্বন্ধজাত। 'আমি' পদার্থটীর স্বরূপ সন্ধান (establishment of identity) অথবা স্বরূপ-ভাবে থাকিবার প্রবৃত্তিকে 'প্রতিসন্ধান' বলে। 'প্রতি' অর্থাৎ বিষয়ের দিক হইতে, 'সর্ব্বের' দিক হইতে, ব্যক্তের দিক হইতে ফিরিয়া, অব্যক্ত,ঘন,স্থির একত্বাভিমুখী প্রবৃত্তি (tendency) বুঝায়। 'সন্ধি' শব্দে ব্যক্তের অতীত-ভাবে ব্যক্ত ভাবগুলিকে লয় করিয়া সংযুক্ত করা বুঝায় ;—যেমন মানব ও গো জাতিকে এক করিতে হইলে, কোন এক সামান্য জ্ঞানের সাহায্যে করিতে হয়। মানবকে 'গরুর' উপর বসাইয়া দিলে দুইটীর একত্ব হয় না। এইরূপে পৃথিবী তত্ত্বে সমস্ত পার্থিব ভাব অনুসন্ধান করা যায় বটে ; কিন্তু তদ্দ্বারা অপ্ তত্ত্ব 'যোড়া' যায় না। সুতরাং প্রকৃত 'অনুসন্ধান' করিতে হইলে, এক আত্ম বা ভগবত্তত্ত্বের সাহায্য ভিন্ন করা যায় না। সুতরাং 'প্রতিসন্ধান' শব্দে,—ব্যক্তাতীত 'পর' (transcendent) ভাবে, এক-মাত্র, নিষ্কল (unpolarised) ও শুদ্ধ (ever-free) তত্ত্বের সাহায্যে ব্যক্ত 'বহুকে' সেই 'পর' 'একে সংযোগ করা বুঝায়। সেইজন্য আচার্য্য বলেন :—"ত্রিষু ধামসু জাগ্রদাদিষু স্থূলপ্রবিবিক্তানন্দাখ্যং যদ্‌ভোজ্যমেকং ত্রিধাভূতং ; যশ্চ বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞাখ্যাভোক্তৈকঃ 'সোঽহং' ইত্যেকত্বেন প্রতিসন্ধানাৎ দ্রষ্টৃত্বাবিশেষাচ্চ প্রকীর্ত্তিতঃ ; যো বেদ এতদুভয়ং ভোজ্য-ভোক্তৃতয়া অনেকধা ভিন্নং, স ভুঞ্জানো ন লিপ্যতে ; ভোজ্যস্য সর্ব্বস্য এক ভোক্তৃভোজ্যত্বাৎ। নহি যস্য যো বিষয়ঃ স তেন হীয়তে বর্দ্ধতে বা ন হ্যগ্নিঃ স্ববিষয়ং দগ্ধা কাষ্ঠাদি তদ্বৎ।"—মাণ্ডুক্য-কারিকা ভাষ্য ১।৫

অর্থাৎ জাগ্রত প্রভৃতি ধাম বা প্রকাশ-ক্ষেত্রে, বিষয় স্থূল, সূক্ষ্ম ও আনন্দ নামক হইলেও ভোজ্য (resultant to consciousness) এক ; যেমন

পক্ষে, কর্ত্তৃত্বাভিমানটী 'স'এ দিয়া, জীব আপনাকে 'কৃষ্ণদাস' বলিয়া মনে করিলে আমাদের 'অহং'টীও ক্রিয়ার অতীত ভাবে পরিস্থাপিত হয়! সেই 'স'এ—'অহং'-এর ধর্ম্মাধর্ম্মের অভিমান ত্যাগ করিয়া গোপীরা কুলটা হইলেন। ধর্ম্মাধর্ম্মের অভিমান আমরা 'অহং'এ ন্যস্ত করি বলিয়া, আমরা কুলে বদ্ধ। তা'ই বলি ভাই! 'অহং'কে খুব সাবধানে রাখিও, তাহা হইলেই সাধনা করা হইবে।

পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলা হইয়াছে, যে 'হ্'ই প্রকাশ-বীজ বা মায়াবীজ। বিশিষ্ট-ভাবের 'অহং'এর পিপাসায় কাতর হইয়া আছি, তা'ই নির্দ্দিষ্ট নাম বা কেন্দ্রশক্তিতে 'অহং'তত্ত্ব পর্য্যবসিত হইয়া আছে। স্থূলদেহের যে বীজে সমস্ত শরীরের 'সর্ব্ব' প্রকার সম্বন্ধ ও ক্রিয়ার সংস্কারগুলি লীন হইয়া থাকে, তাহাই স্থূলের 'হ' বীজ। ইহাই ইংরাজীতে Permanent Atom নামে অভিহিত হয়। হিন্দুর পক্ষে এই বীজ ব্যাপ্তিগত Spatial নহে; উহা গোত্র ও গোত্রাধিষ্ঠাতা ঋষির দান। ভরদ্বাজ ঋষির পরিশুদ্ধ পরিষ্কৃত প্রকাশ-কেন্দ্র বা হ্ বীজটী, ভরদ্বাজ-গোত্রোদ্ভূত সকল লোকেরই ব্যক্ত-বীজ। এই বীজ আছে বলিয়াই ত্রিলোকীর মধ্যে পুনরায় শ্রীভরদ্বাজে অনুগত আত্মজ্ঞান, বিশিষ্ট ব্যক্তিতে প্রকাশ হইতে পারে। সুতরাং 'হ' এই ব্যক্তবীজে, বিশিষ্ট "ব্যক্ত' ক্রিয়া ও সংস্কারগুলি লয় হইয়া থাকে। যতদিন 'হ' বীজ থাকিবে, ততদিন পূর্ণ-ভাবে শ্রীভগবানে পৌঁছিতে পারিবে না। কিন্তু 'হ'এ পরাগতি আছে; উহা ব্যক্তের অতীত,—কারণ উহা ব্যক্তের লয় স্থান। বিশিষ্ট অঙ্ক কষিয়া যেমন আমাদের অবিশেষ 'নিয়ম জ্ঞান হয়',—তদ্রূপ 'হ' ভাবে থাকিতে থাকিতে, জীব ব্যক্তাতীত চৈতন্যের গতি বুঝিতে পারে। এই জন্য 'হ্রীং' বা 'হ্রৗং' বীজের উপাসনার প্রথা আছে। 'হ'কে কাষ্ঠরূপে বা অগ্নির প্রকাশক্ষেত্র রূপে বুঝিয়া, তাহাতে 'র' বা অগ্নিবীজ যোগ কর; সাধের 'আমি'টীকে বা নামটিকে প্রকাশ-ভাবের আধার বলিয়া জান; পরে তাহাতে স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব অগ্নির সংযোগ কর,—ভগবানের প্রকাশের জন্য 'আমি'কে ব্যবহার কর। তখন বিশ্বাত্মিকা 'ঈ' 'শক্তির' অনুভব করিতে পারিবে। তারপর সেই সমস্ত শক্তির খেলার মধ্যে যখন এক পরাভিমুখী পরম-পুরুষের অভিব্যঞ্জনা-ভাব দেখিবে, তখন তোমার 'হ'টী উৎকর্ষ বা Transcendence বাচক গতি প্রাপ্ত হইয়া 'উ' হইয়া যাইবে।

ইহাই প্রণবের দ্বিতীয় মাত্রা।

"উকারো দ্বিতীয়া মাত্রোৎকর্ষাদুভয়ত্বাদ্ বা ; উৎকর্ষতি হ বৈ জ্ঞানসন্ততিং সমানশ্চ ভবতি।" মাণ্ডুক্য ১১০

উর্দ্ধে পরাভাবে,—কর্ষণ করে বা তুলিয়া লয় বলিয়া উৎকর্ষ। উহা উভয় ভাব বা জীব ও জগৎ এই দুইকে পরাভাবে এক করিয়া মিশাইয়া দেয়। জ্ঞানের প্রবাহকে 'জ্ঞান-সন্ততি' বলে। ইংরাজী Association of ideas ইহার সর্ব্বনিম্ন দৃষ্টান্ত। এই বিশিষ্ট কর্ত্তা, কর্ম্ম ও ক্রিয়া-রূপাত্মক জ্ঞানের সন্ততিকে (units of psychic states) 'হ্'কে 'কর্ষণ' করিয়া 'এক'ভাবে লইয়া আসিয়া 'পর' পুরুষাভিমুখী করে বলিয়া 'উ'তে—উৎকর্ষ।

কথাটী বুঝা যাউক। এখন যোগই করি, আর কামভোগ করি, জ্ঞানের ফলগুলি,—বিশিষ্ট 'রাম' 'শ্যাম' বা 'Alcyone' ভাবে পরিসমাপ্ত। আজ ভগবানের দর্শনলাভ করিলে মনে হয়, যে আমি রাম এমন কিছু করিয়াছি যে গুরুদেব ভগবানকে দেখাইয়া দিলেন। এইরূপে যাহাই কিছু করি না কেন, সমস্তই 'হ্' মাত্রায় বিশিষ্ট-নির্দ্দেশে পর্য্যবসিত হইতেছে। কিন্তু যখন শ্রীভগবানের দর্শন লাভ করিয়া আর 'আমাকে' মনে পড়িবে না, আর আমার বিশিষ্ট গুরু বা সাধন প্রণালী বা পূর্ব্ব জন্মাদির বৃত্তান্ত হৃদয়ে জাগিবে না, যখন ভগবদ্দর্শনরূপ বিশেষ ঘটনাটী কোন বিশেষভাবে সমাপ্ত না হইয়া বা 'বিষয়'রূপে পরিণত না হইয়া, ঐ ব্যাপারে কেবল শ্রীভগবানেরই জ্ঞান—তাঁহারই স্বরূপ-স্ফূর্ত্তি হইবে, তখন 'হ' মাত্রা ঘুচিয়া 'উ' মাত্রায় পরিণত হইবে। তখন দেখিব, যে একজন আকর্ষক আছেন ও তিনি কৃষ্ণ। তখন আর হৃদয় হইতে 'অ'—'হ'—'ম্' শব্দ উচ্চারিত হইবে না; - তখন শুনিব কি এক মধুরাদপিমধুর অবিচ্ছিন্ন—'অ'-'অ'-'অ'...'উ'-'উ'-'উ'... ম্' 'ম্'-'ম্'—ওঁ।

ইহাই অবিচ্ছিন্ন ঘণ্টা বা বংশীরূপ অনাহত অর্থাৎ 'হ' বর্জ্জিত শব্দ। ইহাই 'অহং'এর ভিতর দিয়া প্রবাহিত 'পর' বা পুরুষাভিমুখী প্রণবের স্রোত। ইহা অবিচ্ছিন্ন বলিয়া একাক্ষর। এই প্রণবরূপ পরম-বিশেষ বা পরম-অদ্বিতীয় ভগবৎস্বরূপে 'সর্ব্ব'বস্তু পুনরায় আহরণ করিয়া, 'অহং'এর পরাভাব শিখিয়া,—সেই স্রোতে গা ঢালিয়া দিলে, আর কখনও ফিরিতে হয় না।

"ওঁ ইত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং॥"

প্রতি হৃদয়েই ত' এই ধ্বনি উঠিতেছে। বিষয় ভোগ করিয়া, বিষয়ের উপরে কাম ভোগ করিয়া, কামের উপরে ত' প্রত্যহই যাইতেছি। তবু জীব এই পরাগতির ভাষা শিখিতে পারিতেছে না। ভগবন্! কবে জীব শিখিবে যে তুমিই হৃদয়-স্বামী; কবে সে জানিবে যে প্রতি হৃদয়েই তুমি আছ বলিয়াই, তোমার নাম 'হৃদয়' (হৃদি+অয়ম্=হৃদয়ং)। কবে হৃদয়রূপ পরা-চৈতন্য-স্রোতে নিমজ্জিত হইয়া জীবের 'ম' মাত্রা ঘুচিবে; কবে 'হ্'টা 'হী'ঙ্কার বা হ্রী'ঙ্কার-রূপিণী আদ্যাশক্তিকে চিনিতে পারিয়া, তোমার 'হ'টা তোমাকে ফিরাইয়া দিবে? মা আনন্দময়ি! তোমার বিশেষ প্রকাশের সময় আসিতেছে। তবে আর ভেদাত্মক বিশেষের প্রকাশ করিও না; একবার সেই পরম বিশেষকে দেখাইয়া দেও,—

"গর গর বাজে বাঁশী নন্দের ভবনে,
যার্ যৈছে মনোভাব সেই তৈছে শুনে॥"

সেই নন্দের পুত্র, আনন্দময় ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত, শ্রীনন্দনন্দনই ত' প্রতি হৃদয়ে এইরূপে বাঁশী বাজাইতেছেন। ব্যক্ত-বিশেষ লোলুপ জীব তোমার 'হ'এর মোহেই সেই ধ্বনির আহ্বান,—ধন, পুত্র, মান, সম্পদ্, যোগ, ঐশ্বর্য্য, অধিকার প্রভৃতির ভাবে ও তাহার টানে শ্রীভগবান্‌কে চিনিতে না পারিয়া, বাহিরে যাইতেছে। মা! সেই পরম প্রকৃষ্ট ভগবদ্রূপে স্থির বা প্র+সন্ন হও। কেননা,

"ত্বং হি প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।" (ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলব্ধ-বেদান্ত।

জাপানের ধর্ম্ম।

সমগ্র জাপানে প্রায় চারিকোটী লোকের বাস; ইঁহারা সকলেই এক সম্রাটের অধীন। সম্প্রতি জাপানে সর্ব্বসমেত চারিটী ধর্ম্ম প্রচলিত;—'শিন্তো', বৌদ্ধ, 'কন্‌ফিউসিয়ান্' এবং ক্রিশ্চিয়ান্ ধর্ম্ম। শিন্তো অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষ বা 'পিতৃ' উপাসনা সর্ব্বাপেক্ষা পুরাতন এবং ইহাই জাপানীদের আদিম ধর্ম্ম। কেহ কেহ বলেন যে এই ধর্ম্ম কোরিয়া হইতে জাপানে প্রচারিত হয়। ৫৩৪ খৃঃ অঃ জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের সূত্রপাত হয়। কথিত আছে যে ঐ সময়ে একজন চীন-

বাসী বুদ্ধদেবের প্রস্তরমূর্ত্তি এখানে আনিয়াছিলেন এবং 'ইয়ামাতো' প্রদেশে একখানি পর্ণকুটীরে উহা স্থাপন করিয়া পূজা করিতেন। জাপানীয়েরা সেই প্রশান্তমূর্ত্তি দর্শন করিবার জন্য দলে দলে আসিয়া উক্ত পুরোহিতের সহিত বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধীয় নানা আলোচনা করিতেন। ৫৫২ খৃঃ অঃ কোরিয়ার জনৈক নরপতি জাপানের সম্রাট্‌কে কতকগুলি বুদ্ধদেবের সুবর্ণমূর্ত্তি উপঢৌকন প্রেরণ করেন। তৎসঙ্গে অনেকগুলি বৌদ্ধধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকও প্রেরিত হইয়াছিল। এই পুস্তকগুলি অদ্যাপিও 'জেঙ্কোজি' মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইয়াছে। ৫৭২ এবং ৫৮৪ খৃঃ অঃ পুনরায় কোরিয়া হইতে কয়েকজন পুরোহিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি ও ধর্ম্ম পুস্তক লইয়া জাপানে ফিরিয়া আসেন। অতঃপর জাপান সম্রাট্ স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তিসমূহ স্বরাজ্যে স্থাপন করিবার জন্য মন্ত্রিবর্গের মতামত জিজ্ঞাসা করেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকেই বৌদ্ধধর্ম্মের বিরোধী ছিলেন, সুতরাং তাঁহারা বলেন যে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এখানে স্থাপিত হইলে, দেশী দেবতাগণকে অপমান করা হইবে; কিন্তু প্রধান মন্ত্রিবর বৌদ্ধধর্ম্মের অনুকূলে মত প্রকাশ করেন এবং মূর্ত্তিগুলি আপাততঃ তাঁহার বাস-ভবনে রাখেন। কালে সেই বাটী মন্দিরে পরিণত হয়।

ইহার কিছুদিন পরেই জাপানে এক ভীষণ মহামারীর প্রাদুর্ভাব হয়। সহস্র সহস্র লোক উহার করাল গ্রাসে পতিত হওয়ায়, বৌদ্ধধর্ম্ম-বিরোধী ব্যক্তিগণ বলিতে লাগিলেন যে দেশী দেবতাগণের অসন্তুষ্টিই উক্ত মহামারীর একমাত্র কারণ। অনন্তর তাঁহারা বৌদ্ধ-মন্দির অগ্নি সংযোগে ভস্মসাৎ করিয়া মূর্ত্তিগুলি নদীগর্ভে নিক্ষেপ করেন। কথিত আছে যে স্বর্গ হইতে অকস্মাৎ এক প্রজ্বলিত বহ্নি নিক্ষেপকারিগণকে দগ্ধ করায় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সাধারণের অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অতঃপর প্রধান মন্ত্রিবর পুনর্ব্বার আর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং কোরিয়া হইতে অনেকগুলি পুরোহিত আনাইয়া রীতিমত পূজার ব্যবস্থা করিয়া দেন। কতকগুলি দুষ্টলোকে আবার সেই মন্দিরটী পোড়াইয়া দেয়। মন্ত্রিবর তৃতীয় বারও আর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং যুবরাজ স্বয়ং বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিলে, তাঁহার চেষ্টায় উহা জাপানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ৬২১ খৃঃ অঃ জাপানে সর্ব্ব সমেত ৪৬টী বৌদ্ধ

মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। এখানকার সমস্ত প্রসিদ্ধ মন্দিরগুলি ঐ সময়ের নির্ম্মিত। ৬৫০ খৃঃ অঃ ইউয়াং চাঙ্‌ (Hiouen Thsang) নামক জনৈক চীন পরিব্রাজক ভারতবর্ষে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করিয়া জাপানে আসিয়াছিলেন। ইঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার জন্য অনেকেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে। ইনি বুদ্ধদেবের জন্মভূমি দেখিয়া আসিয়াছিলেন বলিয়া, লোকে ইঁহাকে পরম পুণ্যবান্ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইহার পর হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি লোকের এমন অনুরাগ হইয়াছিল, যে অসংখ্য যুবক প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া 'জাঙ্কে' (ছোট ছোট সামুদ্রিক নৌকাবিশেষ) চড়িয়া দুস্তর সমুদ্র পার হইয়া চীনদেশে যাইতে লাগিলেন, এবং তথা হইতে মূল ধর্ম্মশাস্ত্র * সংস্কৃত এবং পালিতে পাঠ করিয়া উহার চীন ভাষায় অনুবাদ লইয়া, স্বদেশে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই কারণে পুরোহিতগণ মন্ত্রে প্রচুর পরিমাণে চীন ভাসা ব্যবহার করিয়া থাকেন ; সংস্কৃত এবং পালি শব্দও মধ্যে মধ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

৭১০ খৃঃ অঃ নীরানগরে এক বৃহৎ আশ্রম স্থাপিত হয়। এই সময় হইতে ধর্ম্ম সঞ্চয়ের সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা ভারতীয় সভ্যতার অনুকরণ করিতে থাকে। পুরাতন কুসংস্কার সমূহ বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে একে একে তিরোহিত হইতে লাগিল। পূর্ব্বে জাপানীরা যে বাটীতে লোক মরিত, তথায় বাস করিতে ভীত হইত। এই জন্য প্রত্যেক সম্রাটের মৃত্যুর পর, নব সম্রাট্ অন্যস্থানে রাজধানী স্থাপন করিতেন। 'নীরা' নগরে বৌদ্ধ-মন্দির স্থাপিত হইবার পর ৭৫ বৎসরের জন্য ইহাই জাপানের রাজধানী ছিল। ১৮৬৮ খৃঃ অঃ হইতে 'তোকিও' জাপানের রাজধানী হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ এম, সি, ই (জাপান।)

* বৌদ্ধধর্ম্ম চীনদেশ হইতে জাপানে প্রচারিত হয়। চীন-পরিব্রাজকগণ ভারতবর্ষে আসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র মূল ভাষার পাঠ করিয়া, উহার চীন ভাষার অনুবাদ করিয়াছিলেন। জাপানীরা তাহাই শিক্ষা করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইতেন।

কেবল মাত্র জ্ঞানের সাহায্যে জীবনকে সুপথে লওয়ান যায় না। সাধন অর্থাৎ জ্ঞানে যাহা বলে তাহার অভ্যাস করা চাই; কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সাধন, মানবকে অতিশয় কঠোর-প্রকৃতি করে। নিয়ত শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা প্রভৃতি সাধনের কঠোর কষাঘাতে চিত্ত নিরাশ হইয়া যায়। কাচ যেমন কঠিন হইলেও ভগ্ন-প্রবণ, তাহারাও প্রকৃতিতে কাঠিন্য লাভ করিয়া ভগ্ন-প্রবণ হয়।* এজন্য শুধু সাধনে মানবত্বের পূর্ণতার দিকে যাইবার সহায়তা করে না। কিন্তু সাধন মানবকে ভজনের উপযুক্ত করে, ভজন মানবকে শক্তির উৎস আনন্দ-জনন পরম পুরুষের সন্নিধানে লইয়া যায়; তাঁহার সহিত যুক্ত করে ও সেই যোগ হইতেই প্রাণে আনন্দরস সঞ্চারিত হইয়া প্রাণকে প্রফুল্ল ও সজীব করে।

পরমেশ্বর! নারায়ণ! তোমার এই নির্ব্বোধ সন্তান প্রথমে কেবল সাধনকেই জীবনের উৎকর্ষ দেখিত। তাহার ফলে তোমার সন্তান ভুলিয়া গিয়াছে যে সাধন করিতে হইলে মনকে বলবান্ করা আবশ্যক। বাধ্য হইয়া উপরতি সাধন নহে। পিতা! প্রাণে সে বল দাও; মূঢ় সন্তানকে পদপ্রান্তে টানিয়া লও।

যিনি ভগবান্-বিশ্বাসী, তিনিই সুখী। কেবল ভগবানের নাম লইলে ভগবান্-বিশ্বাসী হয় না। যিনি সামর্থ্য অনুযায়ী সংসারের কার্য্য করেন ও সমস্ত ফলাফল ভগবানে নির্ভর করেন, তিনিই যথার্থ ভগবান্-বিশ্বাসী। স্থির চিন্তার সিদ্ধান্ত এই,—যখন মানুষ সংসারে জন্মগ্রহণ করে, তখন কি ভাবিয়া চিন্তিয়া আসে? কিন্তু আসিয়াই দেখে মাতার যত্ন তাহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে; ফল পুষ্প শোভিত সুন্দর পৃথিবী-উদ্যান তাহার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। কোনও বিষয়ের ত্রুটী নাই, যদি সংসারের সমস্তই পূর্ব্ব কল্পিত হয়, তবে এ জীবনে আমরা আঁকুড়া পাকুড়ি করি কেন? যাঁর ইচ্ছায় জগতের সমস্তই পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারিত,—দিন কতক এ মানব-জীবনে মনের স্বাধীনতা পাইয়া, সেই পরম মঙ্গলময়ের ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হওয়া কি একমাত্র সিদ্ধান্ত নয়?

* অহংকারের দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সাধন করিলে ঐরূপ ফল হইতে পারে, কিন্তু বিশিষ্ট ভাবের অতিগ হইয়া সাধনই ত' প্রকৃত সাধন। সাধন ভিন্ন স্থৈর্য্য লাভ হয় না। পং সং

হে গুরোঃ! হে দয়াময়! তোমারই মঙ্গলময় ইচ্ছা পূর্ণ হউক। জ্ঞান দিয়াছ, বুদ্ধি দিয়াছ, তদ্দ্বারা জীবনকে দীর্ঘ করান ও তদ্দ্বারা সংসারে আমাদের অত্যুৎকৃষ্ট বৃত্তি পরিচালনা করিয়া আমরা তোমার উদ্দেশ্য সার্থক করিতে পারি। যখন দেখিব বুদ্ধিতে পথ স্থির করিতে পারিতেছি না, তখন সন্দিগ্ধমনা না হইয়া তোমাতে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর কেন না করি? তোমারই পদে আজ কেবল এই প্রার্থনা যেন সংসারে সন্দেহ জন্মিলে সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর করিতে পারি। আর কোনও আকাঙ্ক্ষা নাই।

এ জগতে ভগবান্ দিন কতক আমাদের স্বাধীনতা দিয়া দেখেন, আমরা কি করি। যখন জন্ম গ্রহণ করি, তখন আমরা স্বাধীন নহি—বালক অবস্থাও নহি, কেবলমাত্র বৎসর কয়েক। কারণ বৃদ্ধ হইলেও আবার পরাধীন হইতে হয়। এই মধ্য জীবনে তুমুল সংগ্রাম চলিতে থাকে। এক দিকে কামনা, অপরদিকে জ্ঞান। কিন্তু জ্ঞানের জিতিবার কোনও সুবিধা দেখি না; যদি ঈশ্বর ভক্তি ভগবানের দয়া ও আমাদের সেই দয়ার জন্য প্রার্থনা আমাদের জ্ঞানকে সাহায্য করে। নারায়ণ! পরম দয়াল! তুমি আর কতদিন এরূপ প্রলোভনে রাখিবে? এই স্বাধীনতায় বসন্তকালে সেই চির-মলয়-সমাবৃত চির-কোকিল-গুঞ্জর-পরিপ্লাবিত সেই স্বর্গবাসের সুগন্ধ, এই পাইতেছি—আবার কেন হারাইতেছি। সংসারের পাপের পূতিগন্ধ হইতে রক্ষা কর! আমাদের আর যে কেহ নাই। আমার প্রাণ এই কয়েকদিবসের জন্য স্বাধীনতা পাইয়া আত্ম-বিক্রম দেখাইতেছে; সেই স্রষ্টার অনুজ্ঞা এখন তুমি বিচার করিতে চাহিতেছ? মূর্খ কোন্ বলে তোমার এতদূর স্পর্দ্ধা? ডালে বসিয়া সেই ডাল কাটিতে চাও! যাও অতলজলে ভেসে যাও।

নারায়ণ! আমার এই অবোধ প্রাণকে শিক্ষা দেওয়া যে আবশ্যক হইয়াছে! তাই বোধ হয় আমার দুর্দ্দিনের উপর আবার দুর্দ্দিন আসিতেছে। নারায়ণ, তোমার বিচার ঠিক, এরূপ উন্নতমনা সন্তানকে শেষে দুঃখ দেওয়া যে একান্ত কর্ত্তব্য। ইহাতে আমারও ভবিষ্যৎ মঙ্গল নিহিত রহিয়াছে।

"তোমার ইচ্ছা হউক পূর্ণ করুণাময় স্বামী"
আমায় দাও হে সুখ, দাও হে তাপ সকলই সহিব আমি। (ক্রমশঃ)

শ্রীশুকদেব বন্দ্যোপাধ্যায়,

প্রেমলীলা।

প্রেম-মহামন্ত্র মধু ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া রহে,—
প্রেমের স্পন্দন সে যে বিশ্বের নাড়ীতে বহে!
গ্রহে গ্রহে প্রেমভরা,—মোহিত মহী ও রবি,
দোঁহার মিলন রাগে রুচির বসন্ত ছবি!
ভ্রমর কমল মাঝে মুদিত লোচন দুটি,
শশাঙ্ক কিরণ-পাতে কুমুদিনী উঠে ফুটি,
চাতকিনী ঘন হেরি মনসুখে নাচে গায়,
নির্নিমিষে সূর্য্যমুখী ধ্যান করে সবিতায়;
তটিনী সে পাগলিনী সাগরের পানে ধায়,
ইন্দুরে নিরখি সিন্ধু উচ্ছ্বাসে ভরিয়া যায়;
মুগ্ধ সাধক-হৃদি সাধ্যের উদ্দেশে ধায়,
ভক্ত তা'র চিত্তখানি আত্মারামে সঁপে দেয়।
আত্মা পরমাত্মা দুটি চিন্ময় মিলন ধারা,
(যেন) মণি-কাঞ্চনের যোগ সাগর-সঙ্গম পারা;
(হেথা) অমৃত-লহরী-লীলা লীলায়িত সারা বেলা,
সলিলে সলিল রাশি প্রেমানন্দে করে খেলা;
(যত) প্রেমতীর্থ সম্মিলিত নিত্য এর পুণ্যনীরে,
যে নামে সে ফিরে না ক' মজে যায় চিরতরে!

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

কাম]

সহজযোগ।

ভক্তিযোগ।

চুম্বক যেমন লৌহ-শলাকাকে আকর্ষণ করে, এক জাতীয় বিদ্যুৎ যেমন বিরুদ্ধ জাতীয় বিদ্যুৎকে আকর্ষণ করে, আত্মার মধ্যেও তেমনি একটি আকর্ষণী

শক্তি বর্ত্তমান আছে; সেই শক্তির বলে একের আত্মা অপরের আত্মাকে নিকটে টানিয়া আনিতে চায় ও উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া যাইতে ইচ্ছা করে। এই অলক্ষিত আকর্ষণ-সূত্রের ক্রিয়া হৃদয়ে হৃদয়ে অনুক্ষণ চলিতেছে; এবং ইহারই বলে জগৎ এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া চিরকাল চলিতেছে।

'প্রেম' বল, 'ভক্তি' বল, 'স্নেহ' বল, 'ভালবাসা' বল, ইহার অনেক নাম। প্রয়োগের পাত্র ভেদে এবং ক্রিয়ার তারতম্যানুসারে ঐরূপ ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, কিন্তু ব্যাপারটা একই। ব্যাপারটা আর কিছুই নহে,—আকর্ষণ। কিন্তু সেই আকর্ষণ কম, বেশী, উচ্চ, নীচ, স্থায়ী, অস্থায়ী, ইত্যাদি নানা প্রকারের হয় বলিয়া, উহার নামও নানা প্রকারের দেওয়া হইয়াছে। যখন আকর্ষণের প্রবল প্রবাহ আমাদের হৃদয় ও মনকে অভিভূত করিয়া অনন্য-পরায়ণ করিয়া তুলে, অন্য চিন্তা, অন্য ভাবনা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি কোন প্রকারের ভাবকে হৃদয় মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইতে না দিয়া, অভীপ্সিত পদার্থের দিকে ধাবিত করে, এবং তাহাতেই অপার আনন্দের অনুভূতি হয়,—সেই আকর্ষণই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ অঙ্গের আকর্ষণ। ইহা আমরা কখন অনুভব করিয়া থাকি? যখন একটি হৃদয় অপরের প্রণয়ে বা স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাহার পানে ধাবিত হয়; কিম্বা অপরের দুঃখ দেখিয়া, দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে আপনার হৃদয়ে আনিয়া স্থান দেয়। এ সকলই আকর্ষণের কার্য্য সন্দেহ নাই। ইহাতেও পবিত্রতা আছে, উদারতা আছে এবং ভগবদ্‌ভাবও আছে। কিন্তু ইহার তাদৃশ প্রবল বেগ নাই ইহা চিরস্থায়ী নহে এবং অনেক স্থলে ইহা স্বার্থ-শূন্যও নহে। নব বসন্ত সমাগমে, নূতন পল্লব-পরিশোভিত তরুরাজি সন্দর্শন করিয়া, মধুকর-নিকর-কূজিত কুসুমরাশি পরিশোভিত উদ্যান অবলোকন করিয়া, আমাদের হৃদয় ও মন মোহিত হয়; আমরা সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য উপভোগ করিয়া পরমানন্দ লাভ করি। কিন্তু আবার যখন বসন্তাপগমে নিদাঘের দারুণ উত্তাপে মেদিনী তাপিতা হইয়া উঠেন, তখন আর আমরা বসন্ত-সৌন্দর্য্য উপভোগ করিতে পারি না; সে সৌন্দর্য্য কিছুদিনের জন্য আমাদের অন্তঃকরণে আনন্দ উৎপাদন করিয়া আবার চলিয়া যায়। সেইরূপ সহধর্ম্মিণী-ক্রোড়স্থিত নবজাত তনয়ের মুখকমল সন্দর্শন করিয়া, আমরা স্নেহরসে আপ্লুত হই। পুনঃ পুনঃ সন্তানের সুকোমল মুখকমল চুম্বন করিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না।

কিছুকাল এই আনন্দ অনুভব করি, কিন্তু ইহারও শেষ আছে; তখন আমরা এই আনন্দের পরিবর্ত্তে অপার দুঃখসাগরে সন্তরণ করিতে থাকি। কাচের পুতুল ক'দিন থাকে? সেই ভগ্নপ্রবণ পুতুল দিয়া আজ তোমার ঘরটি সাজাইয়াছ, কাল ভাঙ্গিয়া গেলে আব কিছুই থাকিবে না,—আনন্দের পরিবর্ত্তে হাহাকার আসিবে। নশ্বর বস্তুতে অনশ্বর আনন্দ অসম্ভব। এ আনন্দ আদি অন্ত বিশিষ্ট এবং ইহাও বলা আবশ্যক যে ইহা অনেক সময় স্বার্থশূন্য নহে। যখন প্রেম স্বার্থশূন্য, অবিনাশী ও অনশ্বর, যাহার উদার হৃদয়ে অমৃতের ধারা বহিতে থাকে, শরীর পুলকিত হইয়া উঠে, মনঃ প্রাণ অপার আনন্দসাগরে ভাসিতে থাকে, জগৎ প্রেমময় হয়, আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই থাকে না, যখন

"বন দেখে বৃন্দাবন ভাবে—সমুদ্র দেখে শ্রীযমুনা ভাবে"

তখন সেই প্রেম সর্ব্বোচ্চ প্রেম এবং তাহাই আমাদের একমাত্র লোভনীয় বস্তু।

সাধকগণ বলেন, ভগবানের প্রতি যে আমাদের অনুরাগ, তাহাই এই উচ্চ অঙ্গের প্রেম, ইহাকেই ভগবদ্ভক্তি বলে জীব যেমন জীবের প্রতি প্রেমে আকৃষ্ট হয়, তেমনই ভগবানের প্রতিও প্রেমে আকৃষ্ট হয়, তখন সে—

"হাসে কাঁদে নাচে গায়।

*　　*　　*　　*

গোরা ফুকরি ফুকরি কাঁদে
গোরা আপনার পায় আপনি ধরে,
বলে কোথা রাই প্রেমময়।"

এই প্রেম যাহার হৃদয়ে প্রবেশ করে, তিনি অনন্ত সুখে সুখী হন, পার্থিব কোন বস্তুতে তাঁহার মন আর লিপ্ত হয় না; আপাত মধুর পরিণামে অনুতাপ-পূর্ণ পার্থিব প্রেম আর তাঁহার হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হয় না। তিনি ভগবানের প্রতি মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিয়া, তন্ময় হইয়া তাঁহারই অনন্ত প্রেম-পীযূষ পান করিতে করিতে, অবশেষে তাঁহারই সঙ্গে এক হইয়া যান। জীবের প্রতি জীবের প্রেম যেমন স্বাভাবিক, ভগবানের প্রতি আমাদের প্রেমও তেমনি স্বাভাবিক। এই প্রেমের অঙ্কুর প্রত্যেকের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে; জল সেচন দ্বারা সেই অঙ্কুরের বৃদ্ধি-সাধন করা আবশ্যক।

প্রেমের অঙ্কুর আমাদের হৃদয়ে কোথা হইতে আসে? প্রেমেই আমাদের জন্ম,

আমরা প্রেমে গঠিত, প্রেম আমাদের জীবন; সুতরাং আমরা যখন আসি, প্রেমও আমাদের সঙ্গে আসে। নবজাত শিশু জননী-ক্রোড়ে শয়ন করিয়া প্রসূতির মুখপানে তাকাইয়া আনন্দে গদগদ হয়, মাতৃপ্রেমে তাহার নয়ন দুটি ছল ছল করিতে থাকে, শরীর পুলকে পরিপূর্ণ হয়! আবার যখন সেই শিশু আকাশে অমিয়বর্ষী পূর্ণশশধরকে দেখিতে পায়, তখন তাহার আনন্দ উথলিয়া উঠে;—সে এক মনে সেই সুধাকরের পানে তাকাইয়া থাকে, অঙ্গুলি-সঙ্কেত দ্বারা 'আয় আয়' বলিয়া তাহাকে ডাকে। শিশুর হৃদয়ে এই প্রেম কোথা হইতে আসিল? কে তাহাকে এই প্রেম শিখাইল? এই প্রেম—এই শিক্ষা সে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছে, কেহ তাহাকে শিখায় নাই। জীবের উহা সহজ ধর্ম্ম। প্রেম না হইলে জীব থাকিতে পারে না। ভগবান্ অনন্ত প্রেমের আকর, তিনি তাঁহার সেই অনন্ত প্রেমের এক এক অংশ লইয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। তরু, লতা, নদী, হ্রদ, পর্ব্বত, সমুদ্র, গ্রহ, তারা প্রভৃতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তা'ই এই ব্রহ্মাণ্ড এত সুন্দর; তা'ই আমরা এই জগতের প্রত্যেক বস্তু দেখিয়া প্রেমে মুগ্ধ হই। আমাদের ঐ প্রেমও ভগবৎ-প্রেম, তবে আমরা উহার মধ্যে ভগবানকে দেখিতে শিখি নাই বলিয়া উহার অনন্তত্ব অনুভব করিতে পারি না। উহা অল্পকাল স্থায়ী ও সীমাবদ্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়। ভগবৎ প্রেম আমরা কি প্রকারে লাভ করিতে পারি? পূর্ব্বেই বলিয়াছি ইহার অঙ্কুর আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে আছে—সেই অঙ্কুরের পরিবর্দ্ধন করা আবশ্যক। মাতৃরূপেও ভগবান্—পিতৃরূপেও ভগবান্—পত্নীরূপেও ভগবান্—পুত্ররূপেও ভগবান্। ইঁহারা ভগবানের এক এক ভাব প্রকাশ করিতেছেন। তাঁহাদের প্রতি আমরা যে প্রেম প্রকাশ করি, সে প্রেমও ভগবানের প্রতিই প্রকাশ করিয়া থাকি। ইঁহারা যদি ভগবৎ-প্রেমে লিপ্ত না হইতেন, আমরা কখনই ইঁহাদের প্রেমে মুগ্ধ হইতাম না। প্রেম আর কাহারও নহে, প্রেম ভগবানের। আমরা তাঁহার অনন্ত প্রেম-জলধির এক একটি বুদ্‌বুদ্ মাত্র। তা'ই তাঁহার আভাস যেখানে দেখিতে পাই, বুদ্‌বুদ্‌রূপী আমরা সেই খানেই মিশিয়া যাই। আভাস না দেখিয়া যদি তাঁহাকে পূর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাই, তাহা হইলে আমাদের প্রেমও পূর্ণ হইয়া অনন্তের সঙ্গে মিলিয়া যায়। প্রেম-পূর্ণচন্দ্রকে না দেখিলে, প্রেম-

সমুদ্র উথলে না। অতএব প্রেম-সুধাকর ভগবানের দর্শন লাভই ভগবৎ-প্রেম লাভ করিবার একমাত্র উপায়।

ভগবান্ কোথায় এবং আমরা কি প্রকারে তাঁহার দর্শন লাভ করিতে পারি? তাঁহাকে খুঁজিবার জন্য দূরে যাইতে হইবে না, তিনি অতি নিকটেই আছেন, আর খুঁজিতে না জানিলে তিনি দূর হইতে দূরে আছেন। তিনি তোমার অন্তরেই বর্ত্তমান আছেন। তাঁহাকে ভুলিয়া গিয়াছ; তা'ই তাঁহাকে এখন খুঁজিয়া পাইতেছ না। তুমি ভুলিয়া গিয়াছ যে তুমি তাঁহারই একটি জল-বুদ্বুদ; তাই তাঁহাকে পাইতে এত কষ্ট। তুমি তাঁহা হইতে পৃথক্ নও, এই ভাবটি মনে করিয়া, যদি তুমি তোমার অন্তরে তাঁহাকে অনুসাধন কর, প্রাণভরে ব্যাকুল ভাবে তাঁহাকে ডাক, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহাকে পাইবে। কিন্তু ডাকিবার পূর্ব্বে, তিনি আমাতে আছেন এরূপ বিশ্বাস থাকা চাই। বিশ্বাসে পর আপন হয়, আর অবিশ্বাসে আপনও পর হয়। কিন্তু জ্ঞান না হইলে ত' বিশ্বাস হয় না। তবে বিশ্বাস কোথা হইতে আসিবে? জ্ঞান না হইলে বিশ্বাস হয় না, এটা যেমন সত্য—আবার বিশ্বাস না হইলে জ্ঞান হয় না এটাও তেমনি সত্য। সে কখনও আহার করে নাই, (মনে করুন সদ্যোজাত শিশু) আহার করিলে যে পেট ভরে ও শরীর সুস্থ হয়, এই জ্ঞানটা আহার করিবার পূর্ব্বে তাহার কখনও হয় না—আহারান্তে হয়। কিন্তু আহার করিবার পূর্ব্বে ঐরূপ একটা বিশ্বাস চাই; নচেৎ আহারে প্রবৃত্তি হইবে না, এবং আহার না করিলেও ঐরূপ জ্ঞানের উদয় হইবে না; সুতরাং জ্ঞান যেমন বিশ্বাসের কারণ, বিশ্বাসও তেমনি জ্ঞানের কারণ। ভগবান্ আমাতে আছেন, আমি ভগবানের একটি অংশ, এই জ্ঞানটি উদয়ের পূর্ব্বে ঐরূপ ভাবিবার প্রবৃত্তির জন্য—ঐরূপ একটি বিশ্বাসের প্রয়োজন আছে। বিশ্বাস থাকিলেই ভাবিতে পারিব, তাঁহাকে একান্ত মনে ডাকিতে পারিব; ডাকিতে ডাকিতে তাঁহাকে পাইব; পাইলেই তাঁহার জ্ঞান হইবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, যে এই বিশ্বাস কোথা হইতে আসিবে? আহার করিলে পেট ভরিবে ও শরীর সুস্থ হইবে, এই বিশ্বাস সদ্যোজাত শিশুরই বা কোথা হইতে আইসে? এই বিশ্বাস আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আইসে। ইহা আমাদের স্বাভাবিক।—ইহা আমাদের অস্তিত্বের একটি অংশ। আমরা যেখান হইতে

আসি, ইহাও সেই স্থান হইতে আইসে। তিনিই ইহার কর্ত্তা, তিনিই ইহা আমাদের হৃদয়ে জন্মাইয়া দেন। আমরা গুরুমুখে, শাস্ত্রমুখে, পিতৃ-মাতৃ-মুখে এবং কখন কখন বা তাঁহার নিজমুখে এই বিশ্বাসের উপদেশ পাইয়া থাকি। উপরোক্ত বিশ্বাসমূলে যখন আমরা তাঁহাকে ডাকি, অহরহঃ তাঁহার ধ্যান করি, তাঁহার নাম উচ্চারণ করি, তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করি, তখন আমাদের চিত্তবৃত্তি বিশুদ্ধ হইয়া উঠে। বাহ্যিক ও আন্তরিক বিষয় সমূহ একে একে অন্তর্হিত হইয়া, আমরা তন্ময় হইয়া সেই প্রেমের সাগরকে প্রাপ্ত হই। তখন আনন্দের লহরী বহিতে থাকে, অমৃতের উৎস ঝরিতে থাকে, শান্তির সুবাতাস মধুর হিল্লোলে বহিয়া সমস্ত শান্তিময় করিয়া তুলে।

"যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতসাং॥"

তিনি সকল সৌন্দর্য্যের আকর, সর্ব্বগুণের আধার এবং অশেষ ঐশ্বর্য্যের আলয়। তাঁহাতে যাহা নাই জগতে তাহা নাই। জগৎ তাঁহারই এক অংশের আভাস মাত্র। জগতের সৌন্দর্য্য, তাঁহারই সৌন্দর্য্য। জগৎ,—সৌন্দর্য্য কোথায় পাইবে? তিনি দেন তা'ই জগৎ পায়। শিখিপুচ্ছের অনুপম সৌন্দর্য্য, নানা জাতীয় কুসুমের অযুত বর্ণপ্রভা, মেঘমালার কমনীয় কান্তি, গিরিনদী সমুদ্রের অতুলনীয় বিভূতি, অসংখ্য নর নারীর, অগণিত গ্রহ নক্ষত্র তারার, অবর্ণনীয় কল্পনার অতীত রূপরাশি,—কোথা হইতে আসিল? কে ইহাদিগকে এই অনুপম সৌন্দর্য্য-রাশিতে রঞ্জিত করিল? এই সৌন্দর্য্য, এই ঐশ্বর্য্য যিনি কখন দেখেন নাই, তিনি কি ইহা কখনও কল্পনায় আনিতে পারেন? মানবের সসীম অন্তঃকরণে এই অসীমের কল্পনা অসম্ভব! যে অসীম অন্তঃকরণ, এই অসীম ঐশ্বর্য্য কল্পনা করিতে পারে, ইহা তাঁহারই বিভূতি!

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব চ।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।"

যাহাতে আমরা সৌন্দর্য্য ঐশ্বর্য্য গুণ বিভূতি দেখিতে পাই, তাহারই প্রতি প্রেমপরবশ হই। যদি এই অশেষ ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য ও বিভূতির আকারকে

একবার দেখিতে পাই, তবে তাহাকে ছাড়িয়া কি অন্যের প্রতি আমাদের হৃদয় ধাবিত হয় ?

"কানুরে যদ্যপি পাই, অন্য কিছু নাহি চাই।"

তাঁহাকে পাইবার পথ, শাস্ত্রে অনেক প্রকার উক্ত আছে। হঠ, রাজ, রাজাধিরাজ, জপ প্রভৃতি যোগের দ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায়। সকল পথেরই এক গম্যস্থান, এবং সকল পথই এই এক কথা বলে, যে 'চিত্তবৃত্তি নিরোধ কর।' চিত্তবৃত্তি নিরোধ হইলেই ভগবান্ আত্মমধ্যে পকাশিত হইবেন। ভক্তিতে যেমন সহজে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না ; সুতরাং সকল পথ অপেক্ষা ভক্তিপথ অতি সুগম্য। তাঁহাকে যদি একবার ভালবাসিতে পার, তাঁহার প্রেমসাগরে যদি একবার ডুবিতে পার, তবে তোমার হঠ, রাজ প্রভৃতি কিছুই চাই না।

"ভক্তিতে মিলয় কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।"

শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী।

দ্বিতীয় সংখ্যা পন্থায় প্রকাশিত "যোগরহস্য" প্রবন্ধ সম্বন্ধে সম্পাদকীয় প্রশ্নের উত্তর।

১ম প্রঃ। শুচিদেশ কি ?

উঃ। শুচিদেশের ব্যাখ্যা শাঙ্কর-ভাষ্যে নিম্নলিখিত রূপ আছে।—

"শুচৌ শুদ্ধে বিবিক্তে স্বভাবতঃ সংস্কারতো বা। দেশে স্থানে।"

শ্রীধর স্বামী বলেন 'শুচৌ শুদ্ধে' যে স্থান স্বাভাবিক অথবা সংস্কার দ্বারা শুদ্ধ ও বিবিক্ত তাহাই শুচিদেশ। মনস্থির (concentration) এর জন্য শুদ্ধ ও বিবিক্ত স্থান আবশ্যক

২য় প্রঃ। আত্মার আসন কোথায় ?

উঃ। আত্মা অনন্ত ; তাঁহার আবার আসন কি ? তিনি অনন্ত, তাঁহার আসনও অনন্ত।

"স্থিরমাসনমাত্মনঃ" এখানে আত্মা অর্থে 'পরমাত্মা নহে। এখানে আত্মা অর্থে 'দেহ'। আত্মা শব্দের অনেক অর্থ আছে যথা,—"আত্মা দেহে ধৃতৌ জীবে স্বভাবে পরমাত্মনি"—অমর।

৩য় প্রঃ। কে থায় মনের একাগ্রতা হয়?

উঃ। এই প্রশ্নের উত্তর নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্লোকে আছে :—

"যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মন'ত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি॥
সংকল্পপ্রভবান্ কামান্ ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ॥
শনৈঃ শনৈরুপরমেৎ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ॥

৪র্থ প্রঃ। একাগ্রতা কি?

উঃ। ইহার উত্তর উপরোক্ত তিনটি শ্লোকেই আছে।

৫ম প্রঃ। চিত্তে ইন্দ্রিয় কিরূপে সংযত হয়?

উঃ। প্রশ্নটি কি প্রকারে হইল বুঝিতে পারি নাই। উদ্ধৃত ভগবৎবাক্যে চিত্তে ইন্দ্রিয় সংযত হওয়ার কোনও কথা নাই। ''যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ'' এই কথাটি নিম্নলিখিতরূপে ব্যাখ্যা করিতে হইবে।—''চিত্তঞ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ চিত্তেন্দ্রিয়াণি তেষাং ক্রিয়া সংযতা যস্য স যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ''—শাঙ্করভাষ্যং

ভগবদ্‌বাক্যের মহাজন প্রচলিত ও সর্ব্ববাদিসম্মত ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত অংশে দেওয়া হইয়াছে। কার্য্য চলার জন্য (for practical purposes) উহাই যথেষ্ট। ভগবদ্‌বাক্য কামধেনু, মানুষের বুদ্ধিও অসীম, সুতরাং বহুবিধ ব্যাখ্যা হইতে পারে, তাহাতে ভগবদ্‌বাক্যের গৌরবই বর্দ্ধিত হইবে। ইতি গৌরীনাথ—

কাগ]

সুন্দর।

আমায় ডাকিল কে?
কাহার বাঁশরী সুরে পরাণ পাগল করে?
কে আমায় হেসে ভালবেসে বেসে,
কেন সুধাভাষে ডাকে যে সে।
আমার পরাণ মাতাল কে?

কি যে রূপরাশি, আঁধার বিনাশী,
আলোক প্রকাশি উদিল রে,
কেমন চাহনি, কোমল মুখখানি,
চাঁদিমা লাবণী মাখানো রে।

নয়ন-নলিনী,　　　　　পরাণ-হরণী,
নীলকান্ত জিনি তনু সে রে।
আমার নয়ন ভুলালো সে ॥
আসিয়া শীতল করে, পরশ করিল মোরে,
করুণ কোমল স্বরে, আমায় ডাকিল যে।
মাধুরী মাখানো কথা ঘুচায় হৃদয়ব্যথা,
কি যেন অমিয় গাথা,—
আমারে শুনাল সে ?
আমার হৃদয় জুড়ালো কে ?

অর্থ]

সম্মোহন বিদ্যা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পাশ্চাত্য সম্মোহন-বিদ্যা কি প্রকারে মেস্‌মেরিজম্‌ হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়া, পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিতগণের হস্তে পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত-কলেবর হইয়া, বিজ্ঞানশাস্ত্র মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে; তদ্বিষয়ে পাঠকগণের নিকট পূর্ব্বেই কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। মেস্‌মারের সময় হইতে সম্মোহন-বিদ্যাবিদ্‌ পণ্ডিতগণ নিজ নিজ মত প্রকাশ করেন। কিন্তু সেই সমস্ত মত এতই ভ্রান্তিমূলক ও পরস্পরের সহিত এত অনৈক্য, যে তাহা বর্ণনা বা উল্লেখ করা অনাবশ্যক বোধে উহা ত্যাগ করিলাম। ডাক্তার Leibeault ও তাঁহার ছাত্র ডাক্তার Bernhiem যে সমস্ত মত প্রকাশ করেন, তাহা বিজ্ঞান-জগতে সাদরে গৃহীত হয়। তাঁহাদের মতে যে ব্যক্তিকে মোহ-তন্দ্রাভিভূত করা হয়, সে ব্যক্তি সেই প্রেরণার (suggestion) সম্পূর্ণ অধীন এবং এই প্রেরণামূলক বাক্য প্রয়োগ দ্বারা নানা প্রকার অদ্ভুত দৃশ্যাবলী দেখান যায়। তাঁহারা আরও বুঝাইয়াছেন, যে সম্মোহন-বিদ্যার প্রভাব মানসিক-ক্ষেত্রে, উহা শারীরিক নহে। কিন্তু কেবল মাত্র প্রেরণা ও বাক্য প্রয়োগে কেন মোহ-তন্দ্রার আবির্ভাব হয় ও এই অবস্থায় নানাবিধ অদ্ভুত শারীরিক ও মানসিক বিকার উৎপাদিত করা যায়, তাহার কোনরূপ ব্যাখ্যা বা উল্লেখ নাই। অতি অল্পদিন হইল, কয়েকজন বিজ্ঞানবিদ্‌ পণ্ডিত এ বিষয়ে এক নূতন মত প্রকাশ করেন; তাহা বিজ্ঞান-জগতে এখনও সাধ্যন্তভাবে রহিয়াছে। তাঁহারা মানব-মনের দুইটী অবস্থা নির্দ্দেশ করেন এবং তাহাতেই সম্মোহন-বিদ্যার কারণ ও ক্রিয়াদির নির্দ্দেশ এবং সুচারু ব্যাখ্যা করেন।

ইঁহাদের মধ্যে ডাক্তার মায়ার্স (Myers) ও ডাক্তার হড্সনের (Hudson) নাম সর্ব্বাগ্রগণ্য।

ডাক্তার হড্সন (Hudson) নিম্নলিখিত চারিটী প্রধান নিয়ম বা প্রতিজ্ঞা ও একটী সহকারী বা অধীন প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিয়া মনস্তত্ত্ব বুঝাইয়াছেন। ইহা আমাদের আর্য্য ঋষিগণের আবিষ্কৃত মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের নিকট অকিঞ্চিৎকর হইলেও, পাশ্চাত্য জগতে অতি সমাদরে গৃহীত হইয়াছে। তাঁহার Postulaes বা প্রতিজ্ঞাগুলি আমাদের বিবেচনীয়। তাঁহার প্রথম প্রতিজ্ঞা,—মনুষ্যের দুইটী মন আছে। একটী বাহ্যিক বা ইন্দ্রিয়গত (Objective or conscious mind) ও অপরটী আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয়গত (Subjective or Sub cons-cious mind)। দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা;—আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় মন অনুক্ষণ যে কোন প্রেরণা বা বাক্যের (Suggestion) অধীন। বাহ্য মন সেরূপ নহে। সহকারী প্রতিজ্ঞা,—লোকের আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় মন যেমন বাহ্য প্রেরণার অধীন, উহা তেমনই নিজ বাহ্যিক বা ইন্দ্রিয়গত মনের ও প্রেরণার সম্পূর্ণ বশীভূত। তৃতীয় প্রতিজ্ঞা,—আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় মনের আরোহণ-প্রণালী-ক্রমে (inductive) বিচার বা তর্ক করিবার ক্ষমতা নাই। চতুর্থ প্রতিজ্ঞা,—শরীরের কার্য্য, অবস্থা ও ইন্দ্রিয়-বৃত্তির উপর আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় মনের সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে।

ডাক্তার হড্সন (Hudon) এই চারিটী প্রতিজ্ঞা যে পকারে প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা ক্রমান্বয়ে বিবৃত করিব এবং সম্মোহন-বিদ্যার সহিত দ্বিবিধ মনের কি সম্বন্ধ আছে, তাহা আলোচনা করিব।

১ম প্রতিজ্ঞা।—মানব মনের দুইটী অবস্থার কথা অতি প্রাচীন কাল হইতে জগতে সর্ব্বদেশের মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণের নিকট বিদিত আছে; কিন্তু ডাঃ হড্সন আধুনিক বিজ্ঞান-জগতে দেখাইয়াছেন, যে মনের একটী অবস্থা অপরটীর সহিত সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন ও অসংশ্লিষ্ট। তাহাতেই তিনি বলেন, যে মানবের দুইটী মন আছে; একটী বাহ্যিক বা ইন্দ্রিয়গত এবং অপরটী আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয়গত। এই দুইটী মনের ক্রিয়া ও গুণাবলী পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ বিভিন্ন; একটী বর্ত্তমানে অপরটীর তিরোভাব। অবস্থা বিশেষে একটী—অপরটীর বিনা সাহায্যে কার্য্য করিতে সক্ষম। তিনি বলেন যে অভ্রান্ত সিদ্ধান্ত

উপনীত হইতে হইলে, ইহা প্রথমে ধরিয়া লইতে হইবে যে, মানবের দুইটী মন আছে; এবং অবস্থা বিশেষে একটী এক প্রকার কার্য্য করে ও অন্যটী আর এক প্রকার কার্য্য করে। সুবিধার জন্য তিনি একটী মন বা অবস্থাকে বাহ্যিক বা ইন্দ্রিয়গত (Objective or conscious mind) ও অপরটীকে আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয়গত (Subjective or Sub-conscious mind) নামে অভিহিত করেন। তিনি নিম্নলিখিত ভাবে দুইটী মনের পার্থক্য দেখাইয়াছেন। তিনি বলেন,—ইন্দ্রিয়গত মন (Objective mind) পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে, কেবল মাত্র পার্থিব দ্রব্য নিচয়ের অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারে। ইহার আধারস্থান মস্তিষ্কে; এইজন্য মস্তিষ্কের অবস্থা-বিপর্য্যয়ে, ইহার অবস্থা-বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। দোষাদোষ বিচার করিবার ক্ষমতাই ইহার প্রধান গুণ। আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয়গত মন (Subjective mind) পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিনা সাহায্যে দিব্য চক্ষে বা সহজ জ্ঞানে (intuition) সকল বস্তুর অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে পারে। ইহা প্রীতি দ্বেষাদি হৃদয়ের আবেগের (Emotion) আবাসস্থান ও স্মরণশক্তির ভাণ্ডার। যখন ইন্দ্রিয়গত মন বিলুপ্তপ্রায় হয়, তখন ইহারা বিশদভাবে পরিব্যক্ত হয়। যখন মানব গাঢ় মোহ-তন্দ্রায় অভিভূত হয়, তখন এই মন অতি অদ্ভুত ক্রিয়াবলী বিকাশ করিতে সমর্থ হয়। এই প্রগাঢ় মোহ-তন্দ্রাবস্থায় অতীন্দ্রিয় মনের অতি উচ্চতম দৃশ্যাবলী দেখিতে পাওয়া যায়। তখন ইহা চক্ষুর সাহায্য ব্যতীত খামের ভিতরের চিঠি ও পুস্তক না খুলিয়া পাঠ করিতে সমর্থ হয়; দূরদেশে কোথায় কি হইয়াছে, তাহা দেখিতে পায়। এমন কি অবস্থা বিশেষে এই মন দেহত্যাগ করিয়া দূরদেশে যাইয়া তথাকার সংবাদাদি লইয়া আসে। ডাঃ হড্‌সন আরও বলিয়াছেন, যে এই মনই আত্মারূপে দেহে বিদ্যমান আছে; এবং মৃত্যুর পর ইহা দেহ-ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়।

২য় প্রতিজ্ঞা।—আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় মন অনুক্ষণ প্রেরণা বাক্যের অধীন; অর্থাৎ এই মন বা মোহ-তন্দ্রাভিভূত ব্যক্তি, সহজে অপরের নির্দ্দেশে পরিচালিত হয়; এমন কি অতি অসম্ভব প্রস্তাবও বিনা আপত্তিতে গ্রহণ করে ও তদনুযায়ী কার্য্য করে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গত মন বা মনুষ্য স্বাভাবিক অবস্থায় তাহার জ্ঞান বা বিবেচনা শক্তির বিরুদ্ধে বা পঞ্চেন্দ্রিয় সিদ্ধ না হইলে, কোন প্রস্তাব গ্রহণ করে না। এই প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, যখন

রঙ্গমঞ্চে সম্মোহন-ক্রীড়ার কৌতুকপ্রদ খেলা দেখান হয়, তখন দেখা যায় যে, গাঢ় মোহ-তন্দ্রাভিভূত ব্যক্তিকে যাহা কিছু বলা যায়, সে তৎক্ষণাৎ তাহা অবলীলাক্রমে পালন করে। তাহার মানসিক ও শারীরিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য দেখা যায়, তাহাকে উঠিতে বলিলে উঠে ও বসিতে বলিলে বসে। তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন কিম্বা চলচ্ছক্তি ইচ্ছাক্রমে বন্ধ করা যায়। তাহাকে 'বোবা' বলিলে, সে আর কথা কহিতে পারে না। তাহার নাম ভুলাইয়া দিলে, সে নাম বলিতে পারে না। তাহাকে কুক্কুর বলিলে, সে তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে; এবং আপনাকে কুক্কুর বোধে সেই প্রকার ডাকিতে থাকে ও হস্ত-পদভরে চতুষ্পদের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করে। যদি তাহাকে বলা হয়, যে 'তুমি ইংলণ্ডের অধীশ্বর,' সে তৎক্ষণাৎ নিজেকে রাজা জ্ঞানে তদ্রূপ আচরণ করে। যদি তাহাকে বলা হয়, যে তাহার ইষ্টদেব সম্মুখে দণ্ডায়মান, সে তৎক্ষণাৎ গললগ্নীকৃতবাসে উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়। যদ্যপি বলা হয়, যে তাহার সম্মুখে ব্যাঘ্র আসিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ আতঙ্কে অভিভূত হইয়া প্রাণ রক্ষার্থে পলায়নের চেষ্টা করে। যদি মদিরা বলিয়া এক গ্ল্যাস জল তাহাকে পান করিতে দেওয়া হয়, সে তাহা পান করিয়া নেশায় বিভোর হয় ও উন্মত্ততা প্রকাশ করে। যদি বলা হয় যে তাহার প্রবল জ্বর হইয়াছে, তখনই দেখা যায়, যে তাহার মুখ আরক্তিম, দেহ উত্তপ্ত ও নাড়ী দ্রুত হইয়া জ্বরের লক্ষণ সমূহ বিকাশ পাইয়াছে। তাহাকে সত্য হউক—মিথ্যা হউক, যে কোন বিষয় দেখাইতে ও শুনাইতে পারা যায়। একখণ্ড দড়ি বা একগাছি যষ্টি দেখাইয়া তাহার সর্পভ্রম জন্মাইতে পারা যায়। টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিয়া কামানের শব্দ বলিয়া এবং নিকটবর্ত্তী স্থানে যুদ্ধ হইতেছে এরূপ ধারণা করান যায়। তাহাকে একটি আলু দিয়া উৎকৃষ্ট পিয়ারা বোধে খাওয়ান যায়; এমন কি এক শিশি নিশাদল (amonia) নাকের কাছে ধরিয়া, উৎকৃষ্ট আতর বলিয়া আঘ্রাণ লওয়াইতে পারা যায়। তাহার যে কোন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সঞ্চালনী শক্তি একেবারে তিরোহিত করা যায়। এক অঙ্গ একেবারে এত অসাড় করা যায় যে, সূচ-বিদ্ধ কিম্বা ছুরিকাঘাত করিলেও বোধ হয় না। এই অবস্থাতেই ক্লোরোফরম্ ব্যবহার না করিয়া অনেক কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসা সম্পন্ন করা যায়। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, মোহ-তন্দ্রাভিভূত ব্যক্তির উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য বিস্তার করা যায়।

কেবলমাত্র বাক্যের দ্বারা তাহার শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্য করা যায় এবং পঞ্চেন্দ্রিয় ও ইচ্ছাশক্তির বিকার উৎপাদন করা যায়। সেই সময়ে সত্য বা মিথ্যা – সঙ্গত বা অসঙ্গত, সকল প্রস্তাবই বিনা বিচারে পালিত হয়। তখন তাহার ইচ্ছাশক্তি বিলোপ হয় ও তাহার হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। সে এই সকল প্রস্তাব সত্য মনে করিয়া, তাহা পালন করিতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু কাহাকেও স্বাভাবিক অবস্থায় এই প্রকার প্রস্তাব করিলে, তাহার জ্ঞানে ও বিচারে উহা অসঙ্গত বোধে তৎক্ষণাৎ তাহা উপেক্ষিত হয়। সে সহজ জ্ঞানে আপনাকে কুকুর বলিয়া মনে করিতে পারে না; এবং টেবিলের উপর মুষ্ট্যাঘাতের শব্দেও তাহার কামানের আওয়াজ বলিয়া ভ্রম হয় না।

সহকারী প্রতিজ্ঞা।—উপরোক্ত প্রতিজ্ঞা হইতে ডাঃ হড্‌সন একটী সহকারী প্রতিজ্ঞা প্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন যে, লোকের অতীন্দ্রিয় মন কেবল মাত্র অপর লোকের প্রস্তাবে বশীভূত হয় তাহা নহে। তাহার নিজ ইন্দ্রিয়গত মনের প্রস্তাবেও সম্পূর্ণ বশীভূত। ইহার স্বপক্ষে তিনি নিম্নলিখিত কয়েকটী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

কোন লোককে তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে মোহ-তন্দ্রাবিষ্ট করা যায় না। কাহারো যদি ধারণা থাকে যে তাহার মোহ-তন্দ্রা আইসেনা, তাহা হইলে কেহ তাহাকে মোহ-তন্দ্রাভিভূত করিতে পারে না। যদি কোন ব্যক্তিকে মোহ-তন্দ্রাভিভূত করা হয় এবং সে পূর্ব্ব হইতেই কোন কৌতুকাবহ দৃশ্যে নারাজ হয়, তাহা হইলে অতি গভীর মোহ-তন্দ্রাবস্থাতেও তাহার উপর সেই দৃশ্যের সমাবেশ করিতে পারা যায় না। যদি কেহ মদিরা পানে ঘৃণা করে, তাহাকে গভীর মোহ-নিদ্রাবস্থাতেও এক বিন্দু মদিরা পান করাইতে পারা যায় না। এই প্রকার নানা দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝা যায়, যদি কাহারও কোন বিষয়ে নিজ ইচ্ছা বলবতী থাকে, তাহা হইলে অতি গভীর মোহ-তন্দ্রাবস্থাতেও তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনও প্রকার কার্য্য করান যায় না। ইহাতে স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, তাহার অতীন্দ্রিয় মনও তাহার ইন্দ্রিয়গত মনের প্রস্তাবে (auto-suggestion) বশীভূত হয়; এবং তাহা এত প্রগাঢ় হয় যে অপর কাহারো বিরুদ্ধ-প্রস্তাব তাহার উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে পারে না।

ীয় প্রতিজ্ঞা।—ডাঃ হড্‌সন বলেন, যে অধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় মন

আরোহণ-প্রণালীক্রমে বিচার বা তর্ক (inductive reasoning) করিতে অক্ষম। এই বিচার শক্তি লইয়া ইন্দ্রিয়গত ও অতীন্দ্রিয় মনের ক্রিয়ার পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি বলেন, যে ইন্দ্রিয়গত মনের কি একটী সর্ব্বতো ভাবে বিচার করিবার ক্ষমতা আছে। কিন্তু অতীন্দ্রিয় মনের কেবল মাত্র অবরোহণ প্রণালীমতে (deductive) বিচারে সক্ষম। ইহা কখনও পরিজ্ঞাত ঘটনাবলী শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, তাহা হইতে একটী মূল-তত্ত্বে উপনীত হইতে পারে না ; কিন্তু একটী মৌলিক তথ্য হইতে, অনেকগুলি ন্যায্য আনুমানিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। একটী জ্ঞানী ও বিদ্বান্ ব্যক্তিকে সম্মোহন অবস্থায় আনিয়া, তাহাকে যদি দর্শন শাস্ত্রের একটী সাধারণ মূল তত্ত্ব প্রস্তাব করা হয়, তাহা হইলে তাঁহার স্বাভাবিক অবস্থায় তদ্বিষয়ে যে কোন প্রকার মত থাকুক না কেন, তিনি তখন সেই মূল তত্ত্বটী সত্য বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তদ্বিষয়ে অনেকের সহিত তর্ক বিতর্ক দ্বারা সেই সাধারণ মূল তত্ত্বটী হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বিশেষ তত্ত্বগুলির ধারাবাহিকক্রমে সিদ্ধান্ত করিয়া দেন। তিনি যে সকল সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, দেখা যায় যে তাহা সম্পূর্ণ ন্যায় ও যুক্তিসঙ্গত এবং তাহার প্রত্যেকটীই সেই মূল-তত্ত্ব হইতে উপনীত (deduced)।

তিনি আরও বলেন, যে সম্মোহন-বিদ্যাবিদ্ পণ্ডিত মাত্রেই অবগত আছেন, যে কোন ব্যক্তিকে মোহ-তন্দ্রাবস্থায় কোনরূপ প্রস্তাব করিলে, তাহা অতি নগণ্য হইলেও যতক্ষণ তাহাকে মোহ-তন্দ্রা মুক্ত না করা হয়, ততক্ষণ সে সেই প্রস্তাবের শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চেষ্টা করে। যদি এক জনকে বলা যায়, যে 'সে প্রস্তরময়' আর একজনকে 'কোন জন্তু' এবং অপর এক জনকে বলা যায়, যে 'সে পক্ষী' ; তাহা হইলে যতক্ষণ এই প্রস্তাব-শক্তিগুলি অপসারিত করা না হয়, ততক্ষণ প্রত্যেকেই সেই প্রস্তাবানুযায়ী নিজ নিজ মনোভাব অনুসরণ করিতে থাকে। এই প্রকারে যদ্যপি কাহাকেও মদ্য পানের দোষ সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করিতে বলা যায়, তাহা হইলে সে নিজে অত্যন্ত মদ্যপ হইলেও, তাহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সাপেক্ষ সুন্দর বক্তৃতা করে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদি তাহার বক্তৃতা কালে বলা হয়, যে সে যাহা বলিতেছে তাহা সম্পূর্ণ ভুল, মদিরা পানের বিশেষ গুণ আছে, এবং সেই জন্য সে মদিরা পান করে,

তাহা হইলে সে তাহার বক্তৃতার ভাব একেবারেই উল্টাইয়া লইয়া মদিবার উপকারিতা সম্বন্ধে সুন্দর একটী বক্তৃতা করে। এই সকল দেখিয়া স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়, যে অতীন্দ্রিয় মন অবরোহণ প্রণালীমতে একটী মূল তত্ত্ব হইতে তদ্বিষয়ক সূক্ষ্মতত্ত্বে উপনীত হইতে পারে; কিন্তু কতকগুলি পরিজ্ঞাত ঘটনাবলী শ্রেণীবদ্ধ করিয়া, ইন্দ্রিয়গত মনের ন্যায় তাহা হইতে আবোহণপণালী মতে মূল তত্ত্বে উপনীত হইতে পাবে না।

চতুর্থ প্রতিজ্ঞা।—শরীরের যান্ত্রিক কার্য্য, অবস্থা ও ইন্দ্রিয়বৃত্তিব উপর আধ্যাত্মিক বা অতীন্দ্রিয় মনের সম্পূর্ণ আধিপত্য আছে। এই প্রতিজ্ঞা হইতে সম্মোহন-বিদ্যার চিকিৎসাতত্ত্ব বোধগম্য হয়। ডাঃ হড্‌সন এই প্রতিজ্ঞাটী নিম্নলিখিত ভাবে সপ্রমাণ করিয়াছেন। তিনি বলেন, যাহারা সম্মোহনী-ক্রীড়ার কৌতুকাবহ দৃশ্যাবলী দেখিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই এই প্রতিজ্ঞাটী স্বীকার করিবেন। যাহারা মোহ-নিদ্রাবস্থায় কেবল মাত্র বাক্যপ্রয়োগ দ্বারা শরীরের অসাড়তা (Anæsthesia) উৎপাদন করিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা কেহই ইহার প্রতিবাদ করিবেন না। শরীরের যান্ত্রিক ও স্নায়বিক ক্রীয়ার উপর অতীন্দ্রিয় মনের কতদূর অধিপত্য, তৎসম্বন্ধে আবও কয়েকটী ঘটনাব উল্লেখ করিয়াছেন। সকলেই বিদিত আছেন, যে মোহ-তন্দ্রাভিভূত ব্যক্তির উপর বাক্য প্রয়োগে নানা প্রকার ব্যাধি আনয়ন করা যায়। আংশিক বা সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত, আনুষঙ্গিক লক্ষণ সমেত জ্বর, দারুণ যন্ত্রণা প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যাধি,- সুস্থ শরীরে আনয়ন করা যায়। এই সকল ঘটনা দেখিলে প্রতিপন্ন হয়, যে যখন কেবল মাত্র বাক্য প্রয়োগ দ্বারা সুস্থ শরীরকে রোগগ্রস্ত করা যায়, তখন ইহা হইতে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, যে সেই শক্তি প্রয়োগ করিয়া, পক্ষাঘাত, অসাড়তা, জ্বর প্রভৃতি যথার্থ রোগ আরোগ্য করিতে পারা যায়। ক্ষীণ স্নায়ু ও পেশীর দুর্ব্বলতা দূর করিয়া তাহা শক্তিশালা করা যায়। অতীন্দ্রিয় মনের এই ব্যাধি নিবারক ক্ষমতা প্রভাবে বহু রোগী পুনরায় পূর্ব্ব স্বাস্থ্য লাভ করিয়া কার্য্যক্ষম হইয়াছে। ইহার এই প্রকার একমাত্র ক্ষমতা হইতে জগদ্বাসীর অশেষ উপকার সাধিত হইতেছে।

কিরূপে অতীন্দ্রিয় মন শরীরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে, তাহা নির্ণয় করা বোধ হয় মানব-জ্ঞানের অতীত। দেহতত্ত্বে (Physiology) বা মস্তিষ্ক

ব্যবচ্ছেদ দ্বারা (Cerebral Anatomy) ইহার কোনরূপ তথ্য নির্ণয় করা যায় না। কিন্তু ইহার ক্রিয়া প্রমাণযোগ্য ও বিজ্ঞানানুমোদিত; এই সমস্ত কারণে ইহা সকলের গ্রহণীয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়।

অর্ঘ্য]

জন্মাষ্টমী

—:*:-

প্রকৃতি কি হেতু সুহাস বদন ?
কি আনন্দে চিত আজি নিমগন ?
কি কহিলে তুমি,
এ ভারত-ভূমি।—
যাঁর পদরেণু লভি পবিত্রিতা ;—
আজ আবির্ভূত সেই বিশ্ব-পিতা ?

২

যেই পুণ্যনাম ইষ্ট-মন্ত্র করি ;
কত শত ক্লেশে,
হেলে অবশেষে,
লভিল প্রহ্লাদ গোলোকের তরি ;
(আজি আবির্ভূত সেই বিশ্ব-পিতা ?)

৩

বসুন্ধরে ! তেঁই কিগো তব মুখশশী,
ফল পুষ্পে ধরি শোভা,
কম-বন মনোলোভা,
হাসিছে কুমুদসম গাল ভরা হাসি।

অষ্টমী ক্ষণদা মাঝে,
ত্রিদিবে দুন্দুভি বাজে,
সে বাজনা সঙ্গে রাজে—
কংসপতি তমোনাশি,
অমিয় মধুর ভাষী,
বসুদেব কুলশশী—
বিজিত কুমুদ হাসি ;
ভৃগুপদ বক্ষে সাজে (তাঁর গো !

৫

পুণ্যময়ী জহ্নু সুতা,
(যাঁর) পুণ্যপাদ সমুদ্ভূতা,
শঙ্খচক্র করে ধরি,
নাশিতে ত্রিদিব অরি—
আবির্ভূত মর্ত্ত্যধামে,
শোভে যাঁর লক্ষ্মী বামে,
নয়ন ভুলান' মায়া,
নবনীত কম-কায়া,

উজ্জল ধরণী-ছায়া
উদয়েতে যাঁর !
দেবকীর যাদুমণি,
নিখিল গুণের খনি,
শ্রীদাম-সুদাম সখা,—
কৃষ্ণ দ্বারকার ;
কোথা সে মূরতি, আহা !
সুষমা-আধার।

৬

যুগ স্মৃতি জাগরূক তাই কি জননি !
এ শুভ লগনে, মনে
স্মরি সে তাঁহার জনু,
হরষ-সরস রস—
পরশে অবশ তনু,
পুলকাঞ্চিত চিত বিভল এমনি !
উদিছে কি মন-আঁখে—
ধরণি তোমারই !
যুগান্তের সেই ছায়া,
অপরূপ-রূপ কায়া
সিত চন্দন-ঘন-লেপ-প্রসারী,—
যমুনা সৈকত-কুঞ্জ-বিহারী ?

৭

বসুন্ধরে ! তোমার বিলাস হাসি
নেহারি' জগতবাসী,—
হরষিত চিতে তা'রা,
আকাশের তারা-পারা ;
আনন্দে হাসিছে আজি চলিছে খেলিছে !

৮

দেখ দেখ বিশ্বপতি,
আবেশে প্রকৃতি সতী,
তোমার জনম-ক্ষণে
নাচিছে শিখণ্ডী সনে ;—
কি আনন্দ হৃদে তার,
যেমত সে পারাবার,
উদিলে সুধার-আধার
অপার আনন্দ রাশি—
প্রকাশিয়া নাচে (গো !)

৯

এ অতীত গান সনে,
নাচিতেছে এক তানে ;
শাখী শাখোপরি পাখী,
পাবন মাধুরী মাখি,—
আকাশে বিতান মালা—
বিরচিয়া উড়িছে !
বুঝিবা এমন সুখ,
লভেনি জনমে শুক,
'অজানা' আনন্দনীরে
তাই কিগো ভাসিছে !

১০

পতিপুত্র নাহি গণে',
প্রেমদানে তোমাধনে,
তুষিতে নিয়ত চিতে—
অবশ জগত-ভিতে
স্মরিত তোমারে নিতি—
সে সকলি ;

জানি তোমা সারাৎসার,
"এস ভব কর্ণধার,
সংসারে বিষম-জ্বালা,—
পার কর কুলবালা ;"
ডাকিত নিয়ত তোমা,
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি।
নরনারী তোমা-রত,
ভক্তির কাঙাল শত,
ডাকিছে স্মরিছে তোমা
ভুলিয়া সকলি ;
"ভব-পাপতাপ-হারী
দয়াময় হরি!"

১১

'এস সুখ সুধাধার,
এ সংসার কারাগার,
জীবন হইলে ক্ষয়—
তব পদপানে লয়,
ঘটে যেন ওহে প্রভু ভব-কর্ণধার'
প্রতি গৃহে গৃহে আজি,
ভকতি কুসুম-সাজি—
ভরা তোমা তরে,দেব,হৃদি-উপহার ;—
শোক দুখ লাজ ভয়,—
পাপ তাপ বিনাশয়,
তোমার মধুর নাম শত শত বার,—
আকুল ডাকিছে সবে "কর'না উদ্ধার
কৃষ্ণ! কংস-নিসূদন! কর'না উদ্ধার!"

১২

নব-জলধর মূরতি সুন্দর,
পরম-পুরুষ তুমি সারাৎসার !!
গোধন বাঁচাতে, রাখালের সাথে,
ধরিলে চরণে বিশাল ভূধর ;—
ভক্ত দুঃখহারী, ধ্রুব সহচারী,
রাধা তরে তুমি হ'লে বংশীধর,
(তুমি) শ্রীদাম- প্রণয়ে, বনফল ল'য়ে,
আধ খাওয়া তার—ক'রেছ আহার ;—
কে বুঝে অপার, মহিমা তোমার,
ভক্তির কাঙাল তুমি পীতাম্বর !!
পাণ্ডবের সখা! বাঁকা আঁকা পাখা
শিরে, প্রেম মাখা কম-কলেবর !!
অসুর-বল্লব!—গোপী-বল্লভ!
কৃষ্ণ-বৃষ্ণিবংশ যশ-শশধর !!
ভুবন-পাবন, নর-নারায়ণ,
পাবন মোহন নব অবতার!
পাইতে তোমায়, ভস্ম মেখে গায়,
ভ্রমেন শ্মশানে, নাম সুধা পানে,
মাতি, বিশ্বরূপ সদা গঙ্গাধর!
এ মধু লগনে, শুভ জন্মক্ষণে,
যাচে দীনসুত,— বিষয়েতে রত,
মদ-বিহ্বলিত নাহি ভোলে পিতঃ
মত্ত থাকে যেন ও রাঙা চরণ-
মধু পানে সদা 'মন'-মধুকর।

শ্রীমন্মথনাথ কাব্য-ব্যাকরণ-মীমাংসাতীর্থ।

মৃত্যু-পথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

জন্ম-মৃত্যু।

জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে?

জন্ম মৃত্যু কা'রে বলে? গবেষণায় প্রতীত হয়,—জন্মই মৃত্যুর কারণ। উভয়েরই কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ; জন্ম কারণ হইতেই, মৃত্যুরূপ কার্য্য উৎপন্ন। জন্ম না হইলে মৃত্যু হয় না। অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে এমন কাহাকেও দেখি না, যিনি জন্মগ্রহণ করিয়া ষড়্ভাব-বিকারের অতীত হইয়াছেন। জায়মান মাত্রই ষড়্ভাব-বিকার ভজনশীল। সেই ষড়্ভাবের একভাব "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ" জন্মবানের মৃত্যু নিশ্চয়। জগতে সমস্ত অনিশ্চয়তার মধ্যে, সমস্ত অধ্রুবতার মধ্যে এটি ধ্রুব সত্য বিষয়। তা'ই শাস্ত্রে বলিতেছেন—

> অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরং।
> শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং॥ মহাভারত॥
> ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তঃ সর্ব্বলোকশ্চরাচরঃ।
> ত্রৈলোক্যে তং ন পশ্যামি যে ভবেদজরামরাঃ॥ যোগোপনিষৎ॥

ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্যে এমন কাহাকেও দেখা যায় না, যিনি জরা ও মরণ ধর্ম্ম প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং জন্মিলেই মৃত্যু অনিবার্য্য। জন্ম মৃত্যু এক বস্তুরই দুই ভাব বা অবস্থা ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া নাই; ছাড়িয়া থাকিতেও পারে না, হাত ধরাধরি করিয়া অবস্থিতি করিতেছে মাত্র। তা'ই শাস্ত্র বলিতেছেন—

> মৃত্যুর্জ্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
> অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবং॥ ভাগবৎ॥

দেহ গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুও জন্মগ্রহণ করিয়াছে। দেহী যখন জগতে আসিয়াছে; তখন নিশ্চয়ই একদিন ইহা ছাড়িয়া যাইতে হইবে; জানিনা কোন্ বয়সে, কোন্ মুহূর্ত্তে মৃত্যু ঘটিবে। কিন্তু ইহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে ঠিক, যে একদিন

মৃত্যু আসিবেই আসিবে; অদ্যই হউক বা শতাব্দী পরেই হউক, উহার কবলে পড়িতে হইবেই হইবে। তা'ই শাস্ত্র বলিতেছেন—

এবমস্মিন্ নিরালম্বে কালে সতত যায়িনি।
ন তদ্ভূতং প্রপশ্যামি স্থিতির্যস্য ভবেদ্ ধ্রুবা ॥ ২২ ॥
গঙ্গায়াঃ শিকতাধারা স্তথাবর্ষতি বাসবে।
শক্যা গণয়িতুং লোকে ন ব্যতীতাঃ পিতামহাঃ ॥ ২৩॥
চতুর্দ্দশ বিনশ্যন্তি কল্পে কল্পে সুরেশ্বরাঃ।
সর্ব্বলোকপ্রধানশ্চ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ ॥ ২৪ ॥
বহূনীন্দ্রসহস্রাণি দৈত্যেন্দ্রনিযুতানি চ।
বিনষ্টানীহকালেন মনুজেষ্বথ কা কথা ॥ ২৫ ॥
রাজর্ষয়শ্চ বহবঃ সর্ব্বে সমুদিতা গুণৈঃ।
দেবা ব্রহ্মর্ষয়শ্চৈব কালেন নিধনং গতাঃ ॥ ২৬ ॥
যে সমর্থা জগত্যস্মিন্ সৃষ্টিসংহারকারিণঃ।
তেঽপি কালেন লীয়ন্তে কলো হি বলবত্তরঃ ॥ ২৭ ॥
আক্রম্য সর্ব্বকালেন পরলোকঞ্চ নীয়তে।
কর্ম্মপাশবশোজন্তুঃ কা তত্র পরিদেবনা ॥ ২৮ ॥
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
অর্থে দুষ্পরিহার্য্যেঽস্মিন্ নাস্তি লোকে সহায়তা ॥ ২৯ ॥
শোচন্তোনোপকুর্ব্বন্তি মৃতস্যেহজনায়তঃ।
অতো ন রোদিতব্যং হি ক্রিয়াঃ কার্য্যাঃ স্বশক্তিতঃ ॥ ৩০ ॥
সুকৃতং দুষ্কৃতঞ্চোভৌ সহায়ৌ যস্য গচ্ছতঃ।
বান্ধবৈস্তস্য কিং কার্য্যং শোচদ্ভিরথ বা নরাঃ ॥ ৩১ ॥ বিষ্ণুসংহিতা ॥

"এই সদা গতিশীল নিরালম্ব কালে এমন কোন ভূতই দেখিতে পাই না, যাহা চিরস্থায়ী। গঙ্গার বালুকা,—ইন্দ্র যখন বৃষ্টি করেন, তাৎকালিক জলধারা,—গণনা করিতে পারা যায়; কিন্তু এই জগতে কত যে ব্রহ্মা অতীত কালের আশ্রয় লইয়াছেন, তাহা গণনা করা যায় না। প্রতি কল্পে চতুর্দ্দশ ইন্দ্র এবং সর্ব্বলোক শ্রেষ্ঠ চতুর্দ্দশ মনু বিনষ্ট হন। যখন এই অনাদিকাল প্রভাবে বহু সহস্র ইন্দ্র নিযুত নিযুত দৈত্যেন্দ্র বিনষ্ট হইয়াছে, তখন মনুষ্য বিষয়ে আর বক্তব্য কি?

সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বহুতর রাজর্ষিগণ. দেবগণ, ও ব্রহ্মর্ষিগণ কালক্রমে মৃত্যুমুখে নিপতিত হইয়াছেন ; এমন কি, যাঁহারা ইহজগতে প্রভু বা সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারকারী —তাঁহারাও কালক্রমে বিলীন হইয়া থাকেন ; অতএব কালই বলবত্তর। কালই কর্ম্মপাশবশ প্রাণী সকলকে আক্রমণ করিয়া পরলোকগামী করে, তাহাতে আর শোক কি ? জন্মিলেই মৃত্যু নিশ্চয়, মরিলে জন্ম অবশ্যম্ভাবী ; সুতরাং ঐ দুষ্পরিহার্য্য বিষয়ে ইহ জগতে সাহায্য পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। যেহেতু লোকে এখানে শোক করিয়া মৃত ব্যক্তির কোনই উপকার সাধন করিতে পারে না ; অতএব রোদন করা অনুচিত ; যাহাতে উপকার হয়, এইরূপ ক্রিয়া সকল নিজ শক্তি অনুসারে করা উচিত। সুকৃত ও দুষ্কৃত এই দুই সহায় যাহার অনুগমন করে, বান্ধবগণ শোক করুক আর নাই করুক, তাহা আর কি করিতে পারে ? চির-সহচর পাপ-পুণ্যই মৃতের অনুগমন করিয়া কর্ত্তব্য সাধন করে। বান্ধবের শোক কোন ফলদায়ক নহে, কেননা কাল কাহাকেও ছাড়িবে না।” সংসারে এমন কি আছে, যাহা কালের উদরসাৎ না হয় ? যেমন গরুড় সর্পকে, কাল তেমনি সুরূপ, সুকর্ম্মা ও সুমেরু-সদৃশ-গৌরব সম্পন্ন পুরুষকেও ভক্ষণ করে। ক্রূর, কৃপণ, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, মৃদু, কর্কশ, অধম বা নির্দ্দয়, এমন কেহই নাই, যাহাকে কাল গ্রাস না করে। সংহার-নিরত সর্বভক্ষ কাল পর্ব্বতকেও যথন গ্রাস করিয়া থাকে, তখন সামান্য মানুষ ভক্ষণ করিয়া কি তাঁহার তৃপ্তি হইতে পারে ? নটগণ যেরূপ বিবিধ মূর্ত্তিতে ক্রীড়া করে, কালও হরণ, নাশন, প্রাশন প্রভৃতি নানারূপে বিহার করিতেছে। বন্যহস্তী যেমন পাদপদিগকে, কাল তেমনি সংসারকে সমূলে উন্মূলিত করে। কল্পান্ত-সময়ে প্রজাকুল সংহার করিয়া কাল আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন ; মহাকল্পবৃক্ষ হইতে সুর ও অসুররূপ ফল পাতনপূর্ব্বক ভক্ষণ করে এবং মাতার ক্রোড় হইতে তদীয় প্রাণাধিক প্রীতিময় পুত্রকেও অনায়াসে গ্রহণ করে। শত শত মহাকল্প অতীত হইলেও, ইহার শ্রান্তি বা খেদ নাই। ক্ষুদ্র বৃহৎ কোন বস্তুই উহার নিকট পরিহার প্রাপ্ত হয় না। ইহার মহিমা অবগত হওয়া সামান্য বুদ্ধিসাধ্য নহে। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বলশালী। এইরূপে কৃতান্ত ও মৃত্যুস্বরূপ কাল প্রলয়-কালীন নৃত্য হইতে নিবৃত্ত হইয়া, পুনরায় ব্রহ্মাদির সৃষ্টি করিয়া শোক, দুঃখ, জরাশালিনী সৃষ্টিরূপিণী নাট্যশালায় আবিষ্কার করেন এবং বালক যেমন পুত্তলিকাদি নির্ম্মাণ

করিয়া আবার ভগ্ন করে, সেইরূপ চতুর্দ্দশ ভুবন, বিবিধ বনরাজি ও দেশ, নানা জাতীয় জনতা ও আচার-পরম্পর-রচনা করিয়া পুনর্ব্বার সংহার করে। এই কৃতান্তরূপী কাল, তরুণ দেহেও জরার আবির্ভাব করিয়া প্রাণীদিগকে বিনাশ করে। আর্ত্ত ব্যক্তিও ইঁহার কৃপালাভে সমর্থ হয় না। ইঁহার উদারতারও সীমা নাই। ইঁহার কৃপায় আবার আর্ত্ত ত্রাণ পায়। এই কৃতান্তরূপী কাল পক্ষপাত পরিশূন্য হইয়া সকলকেই সমভাবে গ্রহণ করেন। যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী, এই বিশ্বে কত মস্তক উন্নত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে; সেই সব উন্নত মুণ্ড একদিন মহাকালের অঙ্গে শেষ-সমাধি লইবে।

দারা-সুত-ধনজনে বদ্ধ যার মন।
তা'র কাছে মৃত্যু তব মূরতি ভীষণ।
কিন্তু এ সকল যার, নাহিক হৃদয়ে আর,
তা'র কাছে মৃত্যু তব বৃথা আস্ফালন।
তোমারে হৃদয়ে করি, মনোমাঝে সে বিচারি,
প্রদান করিয়া সুখে প্রেম আলিঙ্গন।

মৃত্যু ও জন্ম কারে বলে? এইবার বিপরীত ভাবে দেখুন মৃত্যুই আবার জন্মের কারণ; অর্থাৎ মৃত্যু কারণ, জন্ম কার্য্য; মৃত্যুর পরবর্ত্তী কার্য্য জন্ম, জন্মের পূর্ব্ববর্ত্তী কারণ মৃত্যু। মৃত্যু না হইলে জন্ম হইতে পারে না; কেননা জগতে যখন কোন পদার্থেরই নাশ নাই; সমস্তই নিত্য। সুতরাং সে সকলের রূপান্তরে জন্মগ্রহণের নামই মৃত্যু। নিত্য পদার্থ রূপান্তরিত না হইলে জন্মিবে কি করিয়া? সুতরাং সেই নিত্য পদার্থের রূপান্তরের নাম মৃত্যু ও প্রকাশের নাম জন্ম। মৃত্যু ও জন্ম এক বস্তুরই দুই দিক্, কেহ কাহাকে ছাড়িয়া নাই ও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না; উভয়ের একাত্মা—এক প্রাণ। চির-সহচরবৎ হাত ধরাধরি করিয়া অবস্থিতি করিতেছে; তাই শ্রুতি বলিতেছেন:—"ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ"—মরিলে জন্ম নিশ্চিত। মৃত্যুই যদি জন্মের কারণ হয়, তবে মনে করিতে হইবে, মৃত্যুতে পদার্থ নষ্ট হয় নাই, কেবল রূপান্তরিত হইয়াছে। সেই রূপান্তরিত অবস্থারই নাম দেওয়া হইয়াছে মৃত্যু; সুতরাং মৃত্যু রূপান্তরিত 'অস্তিত্ব' যুক্ত পদার্থটী শরীর বা নব কলেবর; যাহা নব কলেবর তাহাই

নব জন্ম। এখন মৃত্যুর পর সেই নব জন্ম কিরূপে সংঘটিত হয় তাহাই বিচার্য্য। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তি র্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥ গীতা॥
কৌমার যৌবন জরা সুনিশ্চিত যেমতি দেহীর।
দেহান্তর প্রাপ্তি তথা জানি ধীর না হ'ন অস্থির।

আমরা এই স্থূল দেহে যেমন কৌমার, যৌবন ও জরারূপ অবস্থার পরিবর্ত্তন দৃষ্টি করি, অথচ মৃত্যুরূপ অবস্থার পরিবর্ত্তনাদি দৃষ্টি করি না বলিয়াই যত গোলযোগের সূত্রপাত হইয়াছে; এই পরিবর্ত্তনটী এমন সূক্ষ্ম যে তাহা স্থূল দৃষ্টির গম্য নয়। যে চক্ষু দ্বারা পরমাণু দৃষ্টিগম্য হইতে পারে, সেই চক্ষুই ঐ সূক্ষ্ম পরিবর্ত্তন দেখিতে পায়। আমাদের চক্ষুর এমন প্রখর শক্তি নাই, যে সূক্ষ্ম পরমাণু দর্শন করিতে পারে। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের বলে ঐ শক্তি উপার্জ্জিত হয়। সুতরাং মৃত্যুরূপ পরিবর্ত্তন আমরা চক্ষু দ্বারা দৃষ্টি করিতে পারি না; সেই জন্যই যত কান্নার রোল উঠিয়াছে। কিন্তু যদি দেখা যাইত, তবে এমন আশ্চর্য্য হাসি-কান্নার অবসর থাকিত না;—শোকের প্রস্রবণ নির্গত হইত না;—বিয়োগ-সাগরে ডুবিতে হইত না; এত হৃদয় দগ্ধ হইত না,—এত পাগল হইত না। কোন জননী পুত্র-শোকে মৃত, কেহ বা অর্দ্ধমৃত। এ রহস্যের প্রাচীর ভাঙ্গিলেই সব গোলযোগ চুকিয়া যাইত। আবার সেই ব্রহ্মচর্য্য-প্রভাবে চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি যদি প্রবল করা যাইতে পারে, তবে ঐ সাধ মিটিতে পারে। মৃত্যুর পরিবর্ত্তন বা নব কলেবর ধারণ;—সেই চক্ষুই দৃষ্টি করিতে পারে। পাঠকগণ! এখানে 'সর্পের' দৃষ্টান্তটি অনুধাবন করিলে এই দুর্গম রহস্যের প্রাচীর অনেকটা উদ্ঘাটিত হইতে পারে। সর্পের শরীর যেমন কৌমার, যৌবন ও জরাবস্থা ভোগ করিয়া অক্ষম হইয়াছে; সর্প যেমন ঐ শরীর ভোগ করিতে পারিতেছে না, তাহার নূতন শরীরের আবশ্যক হইয়াছে; অমনি সে খোলস ত্যাগ করিল। আমরা ঐ খোলসটি দেখিতে পাই বলিয়া বড় আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম না; কিন্তু ইহা একটি আশ্চর্য্য যে, সর্প কিরূপে ঐরূপ পরিবর্ত্তন ঘটাইতে পারে? যদি আমরা ঐরূপ পারিতাম, তবে এ সন্দেহের মীমাংসা হইত। এখানে মনে করিতে হইবে, ঐ শক্তি উহার প্রকৃতিদত্ত। সর্প ঐরূপ

দেহ পরিবর্ত্তন করিয়া দীর্ঘকাল ভোগ করিতে পারে ; পরে যখন ঐ শক্তির পরিবর্ত্তন ঘটে, তখন আর পারে না। সর্প যেই খোলস ত্যাগ করিল, অমনি তাহার সেই পূর্ব্বেকার শরীরের ন্যায়ই শরীর জন্মিল—চাকৃচিক্যশালী, নূতন ভোগদেহের আবির্ভাব হইল, উহারই নাম ত' মৃত্যু। শ্রুতির সিদ্ধান্ত—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়, নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যনানি সংযাতি নবানি দেহী॥ গীতা॥
জীর্ণবাস পরিহরি, লোকে যথা পরে নব বেশ।
জরাজীর্ণ ত্যজি কায়, অন্য দেহে তেমনি প্রবেশ॥

গীতাকার পুরাতন বস্ত্রত্যাগের সহিত মৃত্যুর তুলনা করিয়াছেন। পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া নব বস্ত্র পরিধানে,'লোকে যেমন আনন্দ অনুভব করিয়া থাকে, তদ্রূপ মৃত্যুতে নবশরীর পরিধানে আনন্দ হইবারই কথা। তবে কেন মৃত্যুর নামে লোকে এত ভীত ; কেন হাহাকারে বসুন্ধরা প্লাবিত ? ইহার কারণ এই যে, দেহের উপর—আত্মীয় স্বজনের উপর মমতা জন্মিয়াছে ; সুতরাং তাহা ত্যাগে দুঃখ পাইবে বলিয়া ভয় উপস্থিত হয়। সুতরাং মমতাই মৃত্যুর রূপকে ভয়াবহ করিয়া তুলে ; বাস্তবিক মৃত্যুতে কোনরূপ ভয় নাই। ছিন্ন বস্ত্রের উপর মমতা জন্মে না ; সুতরাং তাহা ত্যাগে দুঃখও নাই, সুতরাং ভয়ও উৎপন্ন হয় না, প্রত্যুত আনন্দই জন্মিয়া থাকে। তদ্রূপ বিবেক-বলে দেহের প্রতি যদি মমতা না জন্মে, তবে তাহা ত্যাগে দুঃখেরও কারণ থাকে না ; দুঃখাভাবে ভয়ও উৎপন্ন হয় না ; সুতরাং মৃত্যুতে শোকের কোনই অবসর নাই। একদিন মরিতে হইবে—মানুষ মাত্রেই তাহা জানে ; সর্ব্বদা মনে না হইলেও একদিন যে মৃত্যুর করাল কবলে অবশভাবে কবলিত হইতে হইবে, নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত প্রিয়তম ধনজনাদির মমতা পাশ ছেদন করিতে হইবে তাহা নিশ্চয়। তা'ই তাহার নামে আতঙ্ক, স্মরণে লোমাঞ্চ, চিন্তনে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যাহাদিগকে আমি এত ভালবাসি এবং যাহারা আমাকে এত ভালবাসে, তাহাদিগের সঙ্গ ছাড়িতে হইবে, ভাবিলে প্রাণ আকুল হয় ; হৃদয় শোকে অভিভূত হয়। আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইবে ভাবিলে, যাহাদের প্রাণ ব্যাকুল হয়, মৃত্যুর পর আমিই বা কোথায় যাইব, তাহারাই বা কোথায় থাকিবে ? এই সোণার সংসার, স্ত্রী, পুত্র, ভোগ, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া না জানি

কি অত্যদ্ভুত স্থানে যাইয়া পড়িতে পারি, তাহার ঠিক নাই; সুখে থাকি কি দুঃখে থাকি, কিছুই স্থির নাই। আমরা এ জগতের সঙ্গে এক প্রকার আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া লইয়াছি। এখানে যে সকল আত্মীয় স্বজনের প্রেমশৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া সুখে দিন কাটাইতেছি, মরণের পর কি তাহাদের সহিত এই ভাবে মিলিতে পারিব, তাহারাই কি আমার সহিত মিলিতে পারিবে? মরিয়া কি তাহাদের সহিত দেখা হইবে? ইত্যাদি চিন্তায় মানুষকে মরণের নামে ব্যাকুল করিয়া ফেলে। বাস্তবিক পারলৌকিক রহস্য জীবন-যবনিকার চিরান্তরালে রহিয়াছে। জগৎ বা বিশ্ব মহাপ্রলয়ে কাল-কুক্ষিগত হইবে; ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তে লীন হইবে; ইহার কিছুই থাকিবে না। জগৎ শব্দের অর্থ যাহা গতি-শীল; অনন্ত কালাভিমুখে ইহার গতি; অথবা যাহা গত হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে অর্থাৎ থাকিবার নয়,—তাহাই জগৎ। মরণই নিয়তি, নিয়তিই প্রকৃতির গতি; এই গতিতে জগৎ-চক্র নিয়ত কালের পথে চলিয়াছে। অনিত্য সর্ব্বভূত, নিত্য কালের ক্রীড়ার সামগ্রী মাত্র। বাজীকর যেমন বিবিধ খেলনা বস্তুর দ্বারা বাজী দেখাইয়া, আবার সেই গুলিকে থলিয়ার মধ্যে পুরে; বিশ্ব-বাজীকর কালও নিয়ত বিবিধ বিচিত্র ভৌতিক বাজী দেখাইতেছে ও এক একটী খেলনা অতীতের থলিয়ায় পুরিতেছে। কালেই সমস্ত লয় হয়, এই জন্যই লয় বা মরণের আর এক নাম কাল। বকরূপী ধর্ম্ম যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে "কালবার্ত্তা" সমাচার কি? যুধিষ্ঠির উত্তর করিয়াছিলেন,—

মাসর্ত্তু দর্ব্বী পরিবর্ত্তনেন, সূর্য্যাগ্নিনা রাত্রি দিবেন্ধনেন।
অস্মিন্ মহামোহময়ে কটাহে ভূতানি কালঃ পচতীতি বার্ত্তা॥ মহাভারত॥

'ঘোটন কারণ' হল মাস; ঋতু-হোতা; রাত্রিদিবা, কাষ্ঠ তাহে, পাবক সবিতা॥
মোহময় সংসার কটাহে, কাল কর্ত্তা ভূতগণে করে পাক,—এই শুন বার্ত্তা॥

অর্থাৎ কালে সকলই যাইবে, কিছুই থাকিবে না; ইহাই একমাত্র জ্ঞাতব্য। জগতের অনিত্যতাই জ্ঞানের বিষয়। এই সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ব্যাপারটি মায়াজাত, মহামোহেরই মোহিনী-শক্তির ফল। জগতে যিনি যত বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, রূপ, গুণ, যশঃসৌরভ, পদ-গৌরবাদিতে বিভূষিত হউন না কেন, মরণ-হরণের উপায় করিতে না পারিলে সবই বৃথা,—সবই বিড়ম্বনা। এ সংসার থানা, কসাই খানা। আমরা নিতান্ত দীন হীন ছাগ মেষাদির ন্যায়

কর্ম্ম-ডোরে বদ্ধ হইয়া মহাকালের কসাই-খানায় নীত হইতেছি; সময় কালে একটু ছটফটানি ভিন্ন আর কোন ক্ষমতাই নাই; কোন শক্তিই নাই; কি শোচনীয় অবস্থা। তাই রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন —

(আর) খাব না পাতা নেঙ্গুর নেড়ে।
আমার 'ছোরা'র কথা মনে পড়ে॥
এ সংসার কসাই খানা, (কসাই) সমনউদ্দীন আসছে তেড়ে।
বি-এ, এম-এ, জজ্ (ম্যাজিষ্টার) নিভাবনায় নেঙ্গুর নাড়ে।
(যেন) যোনাই জানার, কসাইখানার, ছাগল ভেড়াই সকল ভেড়ে।
নিত্য নূতন ঘাস পাতা খড়, খাচ্চে আর ঘুমাচ্ছে পড়ে।
(কচি) শিং-ল্যাজের বাহারে বিহার, 'জবাই' চিন্তা সবাই ছেড়ে॥
'ছোরা' 'মারা' জানলে যারা, ভাগ্‌ল তারা দড়া ছিড়ে।
আমি রোগা ভ্যাড়া পাকাদড়া, টান্‌লে আরো এঁটে পড়ে॥

এ সংসারে বুদ্ধিমত্তার বিশেষ খ্যাতি আছে বটে; কিন্তু কালের কাল আসিলে সকলেরই বুদ্ধি ফুরায়, তখন আর কাহারও বুদ্ধি বাহির হয় না; যাহার বুদ্ধি তৎপ্রতিকারে সমর্থ সেই বুদ্ধিমান্, নচেৎ নেঙ্গুর নাড়াই সার। মহাপ্রলয়ে দেহ লয় অবশ্যম্ভাবী। অনিত্যের নিত্যবদ্ভাতি মহাপ্রলয়ে থাকে না। কাজেই ভূতের উপর কালের অধিকার হইবেই! পুরুষকার প্রয়োগ দ্বারা যত ইচ্ছা ততকাল বাঁচিতে পার, অসাধরণ শক্তি বলে আসন্ন মৃত্যুর আক্রমণ অতিক্রম করিলেও, একদিন দেহের উপর কালের অধিকার আসিবেই আসিবে

"সমানং জরামরণাদিজং দুঃখম্" ॥ সাংখ্য ॥

কি উর্দ্ধ লোকের জীব, কি অধোলোকগত জীব, জরামরণাদি জনিত দুঃখ ক্লেশ সকলেরি সমান। চিরজীবিত্ব, অমরত্ব, বিরাট্ কালের এক ক্ষুদ্র অংশব্যাপী মাত্র। মৃত্যুর শক্তি সর্ব্বনাশী, কালের কবল বিশ্বগ্রাসী, তাহাতে সংশয় নাই।

যাবৎ স্বস্থমিদং শরীরমরুজং যাবজ্জরা দূরতে।
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়োনায়ুষঃ॥
আত্মশ্রেয়সিতাবদেব বিদুষা কার্য্যঃ প্রযত্নো মহান্।
সন্দীপ্তে ভবনে তু কূপখননং প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ॥ গরুড়, উত্ত, ১৪ অঃ।

যাবৎ এই শরীর সুস্থ ও নীরোগ থাকে, যাবৎ জরা দূরে অবস্থান করে

যাবৎ ইন্দ্রিয়গণের শক্তি অপ্রতিহত থাকে, যাবৎ আয়ুক্ষয় না হয়, সুধীগণ তাবৎ কালই আত্ম-কল্যাণের নিমিত্ত মহা প্রযত্ন করিবেন। প্রদীপ্ত ভবন মধ্যে কখনও কেহ কি কূপ খননের উদ্যম করে? (ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।

অর্থ]

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

নবকুমার উন্মত্তবৎ গঙ্গাগর্ভে ঝম্ফ প্রদান করিবামাত্র, সেই নৌকাখানি কূল হইতে নবকুমারের উদ্দেশে ছাড়িয়া দিল। নৌকাবাহক—সেই গায়ক, যাঁহাকে নবকুমার লক্ষ্য করিয়াছিল এবং তীরে যাইতে দেখিয়াছিল; কিন্তু তিনি তখনি আবার নৌকায় আসিয়া বসিয়াছিলেন। গায়কটী একটী সন্ন্যাসী। আত্মজ্ঞান প্রভাবে নবকুমারের হৃদয়ের অবস্থা বুঝিতে পারিয়াই ঐরূপ গীত গাহিয়াছিলেন। কাম ও প্রেমের পার্থক্য যাহাতে তাহার চিত্তে ফুটিয়া উঠে, তজ্জন্যই আজ তাঁহার চেষ্টা। যাহা হউক সন্ন্যাসী জলে ঝাঁপ দিয়া তাহাকে নৌকায় উঠাইলেন। নবকুমার তখন সংজ্ঞাহীন, তাঁহার শুশ্রূষায় অতি অল্পক্ষণ মধ্যেই চক্ষু উন্মীলন করিল; দুই একবার বমন করায় উদরস্থ জল কতকাংশে নির্গত হইলে ক্রমে তাহার ক্ষীণকণ্ঠে বাক্য নিঃসরণ হইল। সে অতি ক্ষীণকণ্ঠে বলিতে লাগিল—,"কে আপনি, আবার আমায় যাতনা দিতে আরম্ভ করিলেন?"

সন্ন্যাসী সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, তাহার সর্ব্বাঙ্গে সেক্ প্রদান করিতে লাগিলেন, এবং দুই একবার ঔষধ পান করাইয়া দিলেন। এইরূপে দুই এক ঘণ্টার পর নবকুমার ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল ও কাতর ভাবে বলিতে লাগিল—"কেন আপনি এ অভাগার জীবন রক্ষা করিলেন?"

সন্ন্যাসী। ভগবান তোমার জীবন রক্ষা করিয়াছেন, আমি নিমিত্তমাত্র। তবে এই কথাটী জানিয়া রাখ, যে পাপের উপর মহাপাপ—আত্মহত্যা। আত্মহত্যায় পাপের জ্বালা জুড়ায় না,—যন্ত্রণার নিবৃত্তি হয় না,—প্রাণেও শান্তি আইসে

না; পরন্তু আরও বৃদ্ধি পায়। সাধ করিয়া সেই কঠোর ও ভীষণ যন্ত্রণানলে কেন দগ্ধ হইতে গিয়াছিলে?

নবকুমার। বাঁচিয়া থাকিলেই ত যন্ত্রণা! মরিয়া গেলে আর যন্ত্রণা কিসের?

সন্ন্যাসী। ভুল বুঝিয়াছ। আত্মহত্যায় যন্ত্রণার অবসান হইতে পারে না; দেহ নষ্ট হইলেও কামনা, বাসনা এবং চিন্তা ঠিক পূর্ব্ববৎ বিদ্যমান থাকে। মনে কর তুমি যেন একটী স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত; যতদিন বাঁচিয়া থাকিলে, তাহাকে হস্তগত করিবার জন্য কত যত্ন করিলে, বাসনায় উন্মত্ত হইয়া আপনার কর্ত্তব্য—এমন কি মনুষ্যোচিত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, পশুবৎ আচরণ করিলে; কিন্তু সেই পতিব্রতা সতী-শিরোমণি তোমার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিল না, ভুলিয়াও তোমার দিকে ফিরিয়া চাহিল না। সারা জীবন চেষ্টা করিয়া ভাবিও না, যে দেহটী নষ্ট হইলেই কামনা দূর হইল,—কামনার হাত এড়াইলে, কামনা অপরিপূরণের দুঃখ হইতে নিস্তার পাইলে।

নবকুমার যখন কথাগুলি শুনিতেছিল, তখন আপনার অবস্থার কথা ভাবিয়া দেখিতেছিল। সন্ন্যাসী যেন দিব্য চক্ষে তাহার অতীত জীবনের সমস্ত ঘটনা দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় দেখিতে পাইয়াছে,—এই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল। সেই বিশ্বাসে তাহার সন্ন্যাসীর উপর শ্রদ্ধা জন্মিল। তখন করযোড়ে মিনতি বচনে বলিতে লাগিল—"প্রভু আপনি আমার সহিত ছলনা করিতেছেন? আমার জীবনের ঘটনাই আপনি উপমাচ্ছলে বলিতেছেন। আমি ঐরূপ কামনায় দগ্ধ হইয়াই প্রাণত্যাগের সঙ্কল্প করিয়াছিলাম। মনে হইয়াছিল প্রাণত্যাগ করিলেই যন্ত্রণার অবসান হইবে। প্রভু! আপনি মহাপুরুষ, আমার পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধান করুন, আমার যন্ত্রণার অবধি নাই।

সন্ন্যাসী। তুমি কি পাপ করিয়াছ?

নবকুমার—কোন্ পাপের কথা বলিব—আমার পাপের সীমা নাই। অসৎ সঙ্গে আমার মনুষ্য জীবন নষ্ট হইয়াছে; আমি লম্পট, সতীর সর্ব্বনাশকারী বেশ্যাশক্ত—শঠ—প্রবঞ্চক। জানিনা, আমার জন্য কোন্ নরক প্রস্তুত হইবে।

সন্ন্যাসী সস্নেহ বচনে বলিলেন,—বৎস! কোন চিন্তা নাই তুমি যখন অকপটে তোমার পাপ কাহিনী বলিতে সক্ষম হইয়াছ, তখন তোমার অনেক পাপ বিনষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক কামে মানুষকে পশুবৎ করিয়া ফেলে। জগতে

কাম ও কাঞ্চনের মোহে জীবকুল ভাসমান। কাম দমন করা সহজ নহে। আত্ম-তত্ত্ব ভিন্ন কাম দমন হয় না।

নবকুমার। আপনি যখন আমার জীবনরক্ষা করিলেন, তখন আপনি আমার পিতৃতুল্য। আপনি সন্ন্যাসী, সুতরাং আমার গুরুস্থানীয়। আমি আমার অবস্থা আপনাকে সকলি বলিতেছি। আমি নিজে বিবাহ করিয়াছি, কিন্তু কোন দিন সেই স্ত্রীর প্রতি চাহিয়াও দেখি নাই। বরাবরই পরস্ত্রীতে আসক্ত। অভ্যাস-বশতঃ আমি এক সতীর উপর আক্রমণ করিতে গিয়া, সেই সতীর তেজে আমার এই অবস্থা। এই দারুণ পাপানল হইতে উদ্ধারের কি কোন উপায় নাই?

সন্ন্যাসী। বৎস! মাকে ডাক। জগদম্বার মধুর নামে—চির পবিত্র নামে, সকল কামনাই ভস্মীভূত হইয়া যায়। দেখ—মায়ের ন্যায় পবিত্র মূর্ত্তি জগতে আর নাই। মা আমার আনন্দময়ী, তিনি সকলকেই কোলে ল'ন। তুমি প্রাণ ভরিয়া জগতের আধার-স্বরূপিণী মা সর্ব্বমঙ্গলাকে ডাক,—মাকে 'মা' বলিয়া ডাকিলে দেখিবে হৃদয়ের অনেক জ্বালা দূরে গিয়াছে।

নবকুমার। প্রভু! আমার ন্যায় পাপীকে কি মা কৃপা করিবেন?

সন্ন্যাসী। পাগল ছেলে, মা যে পাপী পুণ্যাত্মা সকলেরই পক্ষে সমান। তুমি একবার 'মা পতিতোদ্ধারিণী' জগৎজননীকে ডাক।

তখন—মা! মা! শব্দে জগৎজননীর উদ্দেশ্যে ডাকিতে ডাকিতে নবকুমারের হৃদয়ে অনেকটা শান্তি আসিল। কিন্তু তাহার মনে তখন হেমলতার চিন্তা জাগিয়া উঠিল। সন্ন্যাসীকে বলিল, 'আমি হৃদয়ের অনেক জ্বালা হইতে যেন উদ্ধার পাইয়াছি; কিন্তু আমার বোধ হয় বহু প্রায়শ্চিত্ত বাকী। আমি পতিপ্রাণা বিধবার সর্ব্বস্ব হরণ করিতে গিয়া, না জানি তাহাকে কি কষ্টই দিয়াছি;—তাহার রূপে মজিয়া তাহার কি সর্ব্বনাশই করিয়াছি। এখনও তাহার মুখ মনে পড়িলে চিত্ত উদ্বেলিত হইয়া উঠে; চিন্তা-রাক্ষসী এখনও তাহার রূপ-সৌন্দর্য্য হইতে অবসর লইতে চাহে না; এখনও যেন কোথা হইতে তাহার মধুর মূর্ত্তি উঁকি-ঝুঁকি মারিতেছে।"

সন্ন্যাসী। তুমি যাহা বলিলে, উহা সম্পূর্ণ সত্য। কামের মোহিনী-শক্তিই ঐরূপ। যখনি তোমার মনে এইরূপ ছায়া প্রতিবিম্বিত হইবে, তখনি তুমি একবার ভাবিও যে তুমি কি চাও, অপবিত্রতাময়—কৃমিজাল সঙ্কুল—স্বভাব-দুর্গন্ধ

মূত্র পুরিষ-ভরিত কলেবরের মধ্যে কোন্‌টুকু তোমার লোভনীয়। নবদ্বার দিয়া অবিরত মল নির্গত হইতেছে,—এই শরীরের সৌন্দর্য্য কোথায়। একবার সেই যুবতীর চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, বাষ্প, বারি, পৃথক্ করিয়া, যদি তাহাতে কোনরূপ সৌন্দর্য্য দেখিতে পাও, তবে দেখিতে থাক—নচেৎ মিথ্যা মুগ্ধ হইও না।* এই শত শত কৃমি-পূর্ণ মূত্র-বিষ্ঠানুলিপ্ত দেহ,—ইহার জন্য এত মোহ কেন? এই ক্লেদের ভিতর আরামের বস্তু কোথায়? তুমি কি কোন দিন শ্মশানে গিয়াছ? সেখানে একটী মৃত যুবতীর অস্থি কঙ্কাল দেখিয়া কবি বলিতেছেন,—যাহার সৌন্দর্য্যে ঝাঁপ দিবার জন্য কতলোক ব্যস্ত হইয়াছিল, আজ সেই যুবতীর মাথার খুলি পড়িয়া রহিয়াছে, দাঁতগুলি বাহির হইয়া পড়িয়াছে, বায়ু তাহার ভিতরে প্রবেশ করিয়া, কামান্ধ ব্যক্তিদিগকে তীব্র উপহাস করিবার জন্য যেন মধুর গুঞ্জনে বলিতেছে,—"এই যে, মুখপদ্ম এখন কোথায়?—সেই বিশাল কটাক্ষ এখন কোথায়?—সেই মদন-ধনুর ন্যায় কুটিল ভ্রূবিলাসই বা এখন কোথায়?" এই পরিণামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভোগ-বাসনা অন্ততঃ ক্ষণকালের জন্যও দূরে যাইবে।

নবকুমার। পিতঃ! গভীর জ্ঞানের উপদেশে আমার পঙ্কিল চিত্ত কতকাংশে শান্ত হইতেছে। যাহাতে আমার চিত্ত আর সেরূপ পাপের দিকে অগ্রসর না হয়, তাহাই উপদেশ করুন।

সন্ন্যাসী তোমায় কিছু ভাবিতে হইবে না। এখানে আমার পরিচিত একটী শাস্ত্রজ্ঞ ও দয়াবান্ পুরুষ বাস করেন, তোমাকে আমি তাঁহার কাছে রাখিয়া যাইব। তিনি তোমায় কিছুদিন উপদেশ দানে এবং যত্ন ও শুশ্রূষায় তোমার শরীরের সচ্ছন্দতা সম্পাদন করিবেন। সেখানে তোমার কোন অসুবিধা হইবে না।

নবকুমার। ত্রুটী হইবে না তাহা জানি, কিন্তু আপনার সংস্পর্শে আমার চিত্ত যেরূপ পবিত্রতা লাভ করিয়াছে, বোধ হয় আর কিছুদিন আপনার সহবাসে থাকিলে, আমার পাপচিন্তা একেবারে অপসারিত হইতে পারে। এই অল্প সময়ের মধ্যে আমার চিত্তের এতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যে হেমলতার উপর আমার মানসিক ভাবের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। যদি এখন তাহার দেখা পাই তাহা হইলে তাহার চরণে ধরিয়া কৃতপাপের ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমার জন্য না জানি সে

* ত্বং মাংস-রক্তবাষ্পাম্বু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনং।
সমালোকয় রম্যং চেৎ কিংমুধা পরিমুহ্যসি॥ যোগবাশিষ্ঠ।

কত কষ্টই ভোগ করিতেছে। আপনি মহাপুরুষ, কৃপা করিয়া বলুন হেমলতা এখন জীবিত কি মৃত। আজ হইতে সে আমার মা।

সন্ন্যাসী। বৎস! আমি তোমার কথায় বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম; আমি ঐ কথার প্রতীক্ষাতেই ছিলাম। তুমি যখন হেমলতাকে মাতৃ-সম্বোধন করিতে সক্ষম হইয়াছ, তখন তোমার পাপ-ক্ষয়ের বিলম্ব নাই।

নবকুমার। সে আপনার দয়া। এক্ষণে হেমলতা যদি জীবিত থাকে, তবে তাহার সহিত দেখা হইতে পারে কিনা; সে সতী-শিরোমণি। বুঝিলাম যে সে মাতৃ-শক্তির অদ্ভুত তেজে আমার সংজ্ঞা বিলোপ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার সেই রণরঙ্গিণী বেশ দেখিয়াছি, একবার শান্ত—সৌম্য মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয় পবিত্র করিবার বাসনা আছে। আপনার অনুগ্রহে বুঝিলাম, যে মায়ের নামে আমার ন্যায় পিশাচের হৃদয়ও পবিত্র হয়,—জগতে ইহা শিক্ষার বিষয়।

সন্ন্যাসী। কোন চিন্তা নাই, হেমলতা জীবিত আছে। যদি তুমি তাহাকে দেখিতে চাও, তাহাও হইবে। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া শুইয়া থাক এবং তদ্গত চিত্তে জগদম্বার নিকট তোমার মনের বাসনা জ্ঞাপন কর; তিনি ধর্ম্মার্থ-কাম মোক্ষদা—তাহার নিকট যে যাহা চায় সে তাহাই পায়।

নবকুমার সন্ন্যাসীর উপদেশানুযায়ী কিছুক্ষণ শুইয়া থাকিবার পর নিদ্রিত হইয়া পড়িলে, স্বপ্নে সেই সন্ন্যাসীকে নিকটে দেখিতে পাইল। নবকুমার ঐরূপ ভাবে কিছুক্ষণ থাকিবার পর আপনার স্থূল শরীর দেখিতে পাইয়া, কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্য হইয়া গেল, এবং তাহার চিত্ত যেন ঐ শরীরের সহিত মিশিতে চলিল। কিন্তু সন্ন্যাসী যেন কি এক আকর্ষণে তাহাকে টানিয়া কোন এক অজানিত স্থানে লইয়া গেল। নবকুমার দেখিল যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও কোথায় চলিতেছে। এইরূপে চলিতে চলিতে এক বিজন অরণ্য মধ্যে হেমলতাকে দেখিতে পাইল, তাহার সম্মুখেই নর-মুণ্ডমালা গলে মাতৃ-মূর্ত্তি। নবকুমার সেই অবস্থায় যেন বলিয়া উঠিল,—'একি স্বপ্ন, না সত্যই হেমলতা মায়ের পূজায় ব্যাপৃতা!' কোথা হইতে উত্তর আসিল,—'যাহা দেখিলে তাহা সত্য।' তখন কি এক অনৈসর্গিক আকর্ষণে তাহার পূর্ব্বস্থান ফিরিয়া আসিল। নবকুমার পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থতা লাভ করিল। অতঃপর সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিয়া, যেন কিছুতেই কৃতজ্ঞতা জানাইয়া শেষ করিতে পারিল না।

সন্ন্যাসী। তোমায় কিছু বলিতে হইবে না; আমি আবার তোমার সহিত দেখা করিব। তুমি এখন কিছুদিন অক্ষয়চন্দ্রের আলয়ে অবস্থান কর।

নবকুমার। 'আপনার আদেশ শিরোধার্য্য।' তখন নবকুমারের হাত ধরিয়া সেই দয়াল সন্ন্যাসী সেই কথিত আলয়ের দিকে চলিলেন। পথে যাইতে যাইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার বাড়ীতে কে কে আছেন? একবার তথায় যাওয়া কর্ত্তব্য।

নবকুমার। এখন যে কে কে আছে, তাহা জ্ঞাত নহি। বৃদ্ধা মাতা যে এতদিন দারুণ শোক সহ্য করিয়া বাঁচিয়া আছেন, এমন বোধ হয় না; স্ত্রী যে একাকী কি অবস্থায় আছে, তাহাও বলিতে পারি না।

সন্ন্যাসী। শরীর সুস্থ হইলে গৃহে প্রত্যাগমন করিও। তোমার বাড়ী এখান হইতে প্রায় ২৫ ক্রোশ হইবে। তোমার সংসার ধর্ম্ম এখনও শেষ হয় নাই। এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে অক্ষয়চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তিনি স্থানীয় এক জমীদারের প্রধান কর্ম্মচারী; তাঁহার কার্য্য সমাপনান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেছেন। অক্ষয়চন্দ্র সন্ন্যাসীকে দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন। সন্ন্যাসীও সস্নেহ বচনে কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিলেন। অক্ষয়চন্দ্র পরম সমাদরে তাঁহাদিগকে শীঘ্র বাস-ভবনে লইয়া গেলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন,—"দেখ অক্ষয়! আমি অদ্যই এখান হইতে চলিলাম। তোমার উপর নবকুমারের ভার অর্পিত হইল। তুমি কিছুদিন ইহাকে সামান্যভাবে প্রাথমিক ধর্ম্ম শিক্ষা দিবে; পরে ইহার শরীর কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে গৃহে পাঠাইয়া দিও। ইহার নিকট সমস্ত বৃত্তান্তই অবগত হইতে পারিবে।" অক্ষয়চন্দ্র অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার মহাব্রতের নিকট এ সকল অনুরোধ স্থান পাইল না।

অক্ষয়চন্দ্র ভ্রাতৃ-সম্বোধনে নবকুমারকে গৃহে লইয়া গেলেন। নবকুমার ভাবিল,—এমন সস্নেহ নিঃস্বার্থ সম্ভাষণ বোধ হয় কখনও শুনে নাই। সে জিজ্ঞাসা করিল—'এ স্থানটীর নাম কি?' অক্ষয়চন্দ্র বলিলেন,—'এ স্থানের নাম ডাহাপাড়া, ইহা মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। গঙ্গার অপর পার্শ্বে নবাবদিগের প্রাসাদ। নিকটেই 'কিরীটেশ্বরীর মন্দির। আপনি কিছুদিন অবস্থান করুন সকল স্থানই আপনাকে দেখাইব।' পরে তাহাকে বৈঠকখানা ঘরে বিশ্রাম করিতে দিয়া, তিনি ভিতর বাটীতে তাঁহার পত্নীর সহিত নবকুমারের আগমন ও অবস্থান বিষয়ে কাথাবার্ত্তা কহিতে গেলেন। (ক্রমশঃ)

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

২য় ভাগ। আশ্বিন ও কার্ত্তিক, ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

সর্ব্বময়।

যদি তুমি দূরে থাক,
কেমনে নিকটে যাব ?
কি ক'রে তোমার কাছে,
প্রাণ খুলে কথা কব ?
আর কে শুনিবে কথা,—
গভীর মরম গান ?
থাক দূরে - শুনে মম,
ভয়েতে কাঁপিছে প্রাণ ॥

কে বুঝিবে মন-ব্যথা,
কে দিবে সান্ত্বনা বুকে ?
পরাণের দুঃখ-গীতি,
কে আছে, শুনাব তা'কে ?
তবে কি শ্রবণে তব,
পশে না করুণ-গীতি ?
তবে কি আমার হৃদে,
ফোটে না তোমার জ্যোতি ?

তবে কি দূরেই আছ,
আমার নিকটে নাই ?
কেমনে তবে গো সখা,
তোমার 'নাগাল' পাই ?
ও দুটি চরণ যদি,—
নাহি পাব মনে ভয়।
জীবন ভারের সম,
মরিতে বাসনা হয় ॥

এ জীবনে নাহি পাই,
জীবনের পরপারে।
পাব ত' তোমাকে নাথ!
বল তুমি কৃপা ক'রে ?

না, না, তুমি আছ কাছে ;
কে বলে দূরেতে থাক ?
ঐ যে মধুর স্বরে ;
জগত ভরিয়া ডাক !!
ওই যে গাহিছ গান,
হৃদয় শুনিতে পায়।
'তুমি আছ দূরে' তবে—
কেমনে বিশ্বাস হয় ॥
ওই যে হৃদয় মাঝে,
বসিয়া বাজাও বাঁশী।
হাঁসি-ভরা চাঁদ-মুখে,
ডাকিছ আমাকে হাঁসি ॥
লুকোচুরি খেল তুমি,
কেহ না দেখিতে পায়।
বারেক সাড়াটি দিয়া,
কোথা তুমি সরে যাও ?
চপলার মত তুমি,
কর চিদাকাশে খেলা।
ক্ষণেকে আবৃত কর,
আঁধারে আলোর মেলা ॥
কভু হৃদি-বৃন্দাবনে,
বংশী করে শোভা পাও।
জীব-আত্মা গোপীকার,—
পরাণ কাড়িয়া লও ॥
কখন প্রকাশে তব,
শুভ্র জ্যোতি মনোহর।
কভু দুঃখ শোক রূপে,
কভু মৃত্যু ভয়ঙ্কর ॥

প্রকাশ ও অপ্রকাশ,
সকলি তোমার রূপ।
তুমি বিশ্ব মাঝে একা,
অনাদি অব্যয় ভূপ ॥
তুমি ত' নিকটে থাক,
তবু নাহি দেখি কেন ?
আমার কি আঁখি নাই,
দেখিতে পাই না যেন ?
না, না, তুমি আছ কাছে,
হৃদয়ে বুঝিতে পারি।
ধরিতে জানি না 'কল,'
তা'ই যে ধরিতে নারি ॥
ছোট ছেলে কাণা হ'য়ে,
'কাণামাছি' খেলা করে।
বিফল প্রয়াস তা'র
কাহাকে ধরিতে নারে ॥
দয়ার্দ্র থাকিলে কেহ,
সেই খেলা-সাথী মাঝে।
দেখিয়ে যাতনা তা'র,
এসে ধরা দেয় নিজে ॥
হে সখা ! এ ভবমাঝে,
পেতেছ মধুর খেলা।
কত দিন কত খেলি,
ফুরায়ে এলো যে বেলা ॥
শেষ বেলা হ'য়ে এল,
দাও ধরা এই বার।
তুমি যে দীনের বন্ধু'
কৃপা-সিন্ধু দয়াধার ॥

তোমার মহিমা গায়,—
অনন্ত জগৎ জুড়ে।
শুধু কি ভবের মাঝে,
আমিই মরিব ঘুরে॥
অখিল জুড়িয়ে সবে,
করিছে তোমার গান;
খালি কি আমার হৃদে,
বাজিবে বেসুরা তান?
এ দীনতা জীবনের,
ঘুচিবে কভু কি মোর?
গাহিতে তোমার নাম,
হবে এ জীবন ভোর?
জীবনের দীর্ঘ দিবা,
অপরাহ্ন হের প্রায়;
ভরিছে জীবন-প্রান্ত,
ঘন অন্ধকার-ছায়।
এইবার এস নাথ!
এখনো কি অসময়!
হৃদয়-কমল মম,
পরশ কমল-পায়।
বারেক দাড়াও এসে,
মোহন মধুর ঠামে!
বারেক পূজিব পদ,
বিকচ কুসুম-দামে।
নমিয়া চরণে তব,
নামা'ব হৃদয় ভার;
এস নাথ! এস বন্ধু!
সময় এসেছে তার!

ক্ষণেকের তরে শুধু,
প্রকাশ হৃদয়ে, নাথ!
মনোসাধ মিটে যাক্,
করি পদে প্রণিপাত।
পরে চলে যেয়ো তুমি;
'থাক' বলিব না আর।
এ সাধ এ জীবনের,
পুরাও একটী বার।
আছ তুমি নিকটেতে,
শুনিতে পাও ত' কথা।
তবে কেন দয়াময়!
বোঝনা হৃদয়-ব্যথা?
কঠিন বেদনা যদি,
দিতে হয় দিয়ে নাও।
শুদ্ধ ক'রে—যোগ্য ক'রে,
পদেতে আশ্রয় দাও॥
"তুমি নিকটেতে নাই,
শোননা দীনের কথা।
অটল-কঠোর তুমি."—
শুনিয়ে পাই যে ব্যথা।
যদি কেহ বলে, নাথ!
আছ তুমি কত দূরে।
অমনি নিরাশে প্রাণ,
ডুবে যায় একেবারে॥
মনে হয় কা'রে তবে,
ব'লব প্রাণের ভাষে।
তুমি ত' নিকটে নাই,
আছ কোন দূর দেশে?

তখনি শুনিতে পাই,
বসিয়া হৃদয়ে গাও ;—
"আছি আমি সব স্থানে,"
"কেন বৃথা ভয় পাও ?"

সত্য তবে আছ তুমি,—
সত্য তবে আছ নাথ ?
লও তবে অভাগার
হৃদি-ভরা প্রণিপাত !

মোক্ষ]

স্বামীজির জন্মাষ্টমী।

জনলোক সংবাদ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

(১)

স্বামী 'অনন্তনাম' আজ কয়েক বৎসর হইল ধরাধাম ত্যাগ করিয়া অমর-লোকে নীত হইয়াছেন। অনেক দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই ; সেই জন্য মনটা একটু উদ্বিগ্ন ছিল। তবে 'অসার সংসার কেহ কারো নয়' এই সুরে,—

ঘুরে ঘুরে যথা তথা, পথে দেখা পথে কথা,
তুমি কোথা, আমি কোথা, আবার কোথায় যেতে হয়।

গাহিয়া মনটাকে স্থির করিতাম। কাল শ্রীজন্মাষ্টমী,—আমাদের জন্মাষ্টমী। আমাদের জন্মাষ্টমী মানে—একদিন ছুটী ; একদিন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে সংসারের দাসত্ব হইতে অবসর। মনে মনে ভাবিলাম কাল কতকগুলি সংসারের কাজ এগিয়ে রাখ্‌তে হবে। আবার ভাবিলাম শ্রীভগবানের জন্মাষ্টমীর দিনটা একটু ভাল করে কাটাতে চেষ্টা কর্‌তে হবে। ভেবে জিব্‌ কাটিলাম ;—করিলাম কি ? ভগবানের সঙ্গে আমাদের এমন নিত্য-বৈরী সম্বন্ধ যে, যে দিন ভাল করিয়া কাটাইব মনে করি, সেই দিনই যত প্রকার জঞ্জাল আসিয়া জুটে। ভাল ত' হয়ই না ;—এমন কি দিনটা কাটানও কঠিন হইয়া উঠে। এইরূপে দু'মনা হইয়া চিন্তাভ্রান্ত সুষুপ্তি-সুখের শরণাপন্ন হলেম। আজকাল সকলে যোগ্‌টাকে বাঘ করে তুলেছে। 'প্রণবানন্দ শর্ম্মা' গম্ভীরভাবে বুঝাইয়া দিলেন, প্রকৃত জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থা সাধক ভিন্ন অন্য লোকের ঘটে না। কিন্তু আমি ত' দেখি, আমরা সকলেই 'মহা জাগ্রত' হইয়া রহিয়াছি ; যথা,—পান থেকে চূণ খসিলেই গৃহিণীর প্রতি 'মহা-জাগ্রত' ভাব। তারপর স্বপ্ন ত' সু-অভ্যস্ত ; বসে, দাঁড়িয়ে,

দিনরাত্রিই ত' স্বপ্ন দেখ্‌ছি। কে একজন ইংরাজ কবি নাকি বলিয়াছেন, 'Our little life is rounded with sleep' লোকটা বড় সমজ্‌দার ছিল। একমাত্র ছেলেটা 'বওয়াটে' হ'ল; একটু কষ্ট বোধ হ'ল। অমনি একটু 'স্বপ্ন-মাত্রার' যোগ করিয়া, শ্রীচৈতন্যদেবের বাল্য-জীবনের দুষ্টুমির কথাটা মনে করিলাম। আঃ বাঁচা গেল; ছেলেটা দেখ্‌ছি একটা মহাপুরুষই হবে, তা' নইলে এত বকামী করবে কেন? যেন একটা অবতার হয়েছে বলে গুজব উঠেছে। অমনি এতদিন ধরিয়া যৌবনের চিত্ত-চাঞ্চল্য সুলভ যে কর্ম্মভাব, করণ ও অকরণ জন্য যে প্রত্যবায়-বুদ্ধি নীরবে হৃদয়ে বহন করিতেছিলাম, তাহা একটু স্বপ্ন মাত্রা যোগে অবতারের ঘাড়ে চাপাইয়া দিয়া, বগল বাজাইয়া মুক্ত হইয়া পড়িলাম। তা'ই বলি ভাই, তাড়াতাড়ি জাগিয়া উঠিতে চেষ্টা করিও না। তারপর যখন 'সৎ' ব্যক্তি 'চিৎ' হইয়া 'আনন্দ' উপভোগ করেন, তখনই ত' আমাদের 'ব্রহ্মজ্ঞান' সিদ্ধ হয়।

সে যা হ'ক, স্বপ্ন দেখিলাম যেন 'অনন্তরাম' স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। তাঁ'র সঙ্গে যা' কথাবার্ত্তা হইল, তাহাই পাঠকগণকে উপহার দিতেছি।

(২)

স্বামী। কিরে যোগা! আমায় দ্যাখ্‌বার জন্য বড় ব্যস্ত হয়েছিলি না কি? ও রকম করে বিশিষ্ট কামনা পোষণ করা উচিত নয়। যা হ'ক, বাজে কথা কহিবার জন্য এখানে আসিনি। কাল শ্রীভগবানের জন্মাষ্টমী, তৎসম্বন্ধে তোকে দু'চারটা কথা বলবার জন্য গুরুদেব আমায় পাঠিয়েছেন। স্থির হয়ে শুনে নে।

আমি। এ আর শক্ত কি! আমি ত' সব মন্ত্রগুলি মুখস্ত করে রেখেছি।

স্বামী। তোর হোঁৎকামীটা চিরকালই রইল। ওরে শ্রীজন্মাষ্টমী বড় সহজ ব্যাপার নয়। শুধু বাহ্য ভাবে ঠাকুরের পূজা করলেই পূজা করা হয় না। ইংরাজেরা যাহাকে "Birth of the Christ in the soul" জীবের ভিতরে খ্রীষ্ট-তত্ত্বের পুনরাবির্ভাব বলে, এও অনেকটা সেইরূপ। আমাদের ভিতর শ্রীভগবানের জন্ম হওয়ার নাম, জন্মাষ্টমী। তুই ভাব্‌ছিস্ ভগবানের মূর্ত্তি ধ্যান করার নাম ভগবানের জন্ম! এ তা নয়,—দেহের ভিতরে, মনের ভিতরে বা হৃদয়ের ভিতরে জন্ম নয়; এ আমাদের 'আমি' বা শুদ্ধ জীব-চৈতন্যের স্রোতের মধ্যে সেই 'পর' শুদ্ধ পুরুষোত্তমরূপ গতি সিদ্ধ হইলে, তবে সেই চিত্তে শ্রীভগবানের স্বরূপ প্রকাশ হয়।

আমি। ও ত' আপনি আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ক'চ্ছেন।

স্বামি। 'আধ্যাত্মিক'টা 'ব্যাখ্যা' নয়, ওটা বুদ্ধির গতি। চিত্তের বৃত্তি সকল যে ভাবে অবসান বা স্থির হইতে চেষ্টা করে, তাহাই বুদ্ধি। পুত্রের সত্য ভাব, বাহ্য ভৌতিক পুত্র-ভাবে স্থির হয় বলিয়া, এই প্রকার চৈতন্তের নাম অধিভূত চৈতন্য। পুত্র-ভাব ত্যাগ করিয়া তাহার ভিতর দেবতা-ভাব দেখিলে, তাহার নাম অধিদৈব চৈতন্য। এইরূপে সকল প্রকার চৈতন্যের খেলাগুলি বিশুদ্ধ 'আমি' বা 'আত্ম'ভাবে যখন অবসান হইতে থাকে, যখন 'সর্ব্ব' ব্যাপারের মধ্যে সেই বিশুদ্ধ 'আমির' লক্ষণ বা অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তখনই ঐ স্রোতকে আধ্যাত্মিক স্রোত বলে।

আমি। এ ত' স্বার্থপর চিন্তা।

স্বামি। ওরে ষণ্ডামার্ক! এতদিন পাতঞ্জল ঘেঁটে কি এই জঞ্জাল সংগ্রহ কর্‌লি? স্বার্থ মানে প্রকৃত পুরুষ-ভাব; তাহা মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের অতীত; তাহাতে ভেদ নাই। সকলেই জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে এই নিষ্কল পুরুষ বা 'আমি'কে সিদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এই 'আমি' ভিন্ন কোনও ভাব পরিপূর্ণ হয় না। রাম বড় বিদ্বান্; তুমি এই বিদ্বান্ ভাব দেখিয়াই তৃপ্ত হও না; ঐ বিদ্যাভাব যাহাতে তোমার 'আমি' ভাবের সহিত সংযুক্ত হয়, তাহার জন্য তোমার ভিতর প্রেরণা জাগ্রত হয়। আমাদের 'আমি' সর্ব্বগ্রাসী; বাহিরে কিছুই রাখিতে চাহেনা; সবই 'আমির' সহিত যোগ করিতে চায়। তবে অনেকে 'আমার', এই পর্য্যন্ত সম্বন্ধ সিদ্ধ হইলেই খুসী। আমি যেমন তেমনই ক্ষুদ্র আছি; কিন্তু ভগবানের সঙ্গে আমার একটু সম্বন্ধ হইলে বড়ই আনন্দিত হই। এইরূপে জীব 'আমি' কি তা' বুঝে না। ভগবান বা অন্য কোনও ব্যক্ত পদার্থ কি, তাহাও জানে না; শুধু অস্ফুট 'আমি'-ভাবের সহিত, অস্ফুট ব্যক্ত-ভাব 'আমার'-জ্ঞানে সম্বদ্ধ করিয়া কৃতার্থমন্য হয়। যাহারা রসিক, যাহাদের ক্ষুধা বেশী, তাহারা শ্রীভগবানকেও 'আমি'র সহিত বা ভগবানের সহিত 'আমি'কে স্বরূপ ভাবে যুড়িয়া দিয়া, 'আমার' জ্ঞান অতিক্রমপূর্ব্বক পরা-ভাবে থাকিতে চাহে। "তুমি খাও কি আমি খাই মা, দুটার একটা করে যাব।" রাত্রিকালে বৌ-ঠাকৃরুণ জামা সেমিজ এঁটে শুলে তোর কি তৃপ্তি হয়। যতই দামী জামা হউক না কেন, যখন প্রাণে 'প্রণয়ের' টান জাগে, যখন প্রাণের-বস্তুকে প্রকৃষ্টরূপে নীত (reduce)

করিতে ইচ্ছা হয়, তখন ঐ বহুমূল্য মস্‌লিনের জামাটাও সেই একতার চক্ষে মহা প্রতিবন্ধক বলিয়া মনে হয়। জানিস্ ৺কৃষ্ণকমলের ভাষায় শ্রীমতী কি কি বলেছেন্,—

একদিন কুঞ্জে মিলনে দোঁহার, গলে ছিল আমার 'নীলমণি' হার।

বিচ্ছেদের ভয়ে ত্যজিয়ে সে হার, তুলে নিলেম বক্ষে 'শ্যামচন্দ্র' হার॥

বিশেষ ভাবে ছেদ হয় বলিয়াই, ঐকান্তিকতার হান্ হয় বলিয়াই বিশিষ্টে বিচ্ছেদ। ওরে মুখ্‌খু! এই অহংজ্ঞানের বিশেষটাকে দূর করে ফেলে দে, তবে শ্রীজন্মাষ্টমী হবে। বৈষ্ণবদের ভারী অহঙ্কার; তা'ই 'বিশেষ আমিটা'কে রেখে শ্রীভগবানকে ভোগ কর্‌তে যায়,—আর মুখে বলে প্রেম! ওরে প্রেমে আত্ম-প্রীতি থাকে না।

আমি। 'আমির' ভিতরে শ্রীভগবানকে দেখা, কি বল্‌ছেন?

স্বামী। ভাগবতে পড়িস্ নি, "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি দৃষ্টেবাত্মনীশ্বরে।" নাটুকে ছোঁড়ারা ও ছুঁড়ীরা মনে করে "সে যদি হইত আমার অঞ্চলেরি ধন"; তা'রা মনে করে এরূপ হইলেই বড্ড প্রেম করা হ'ল! ওরে গাধা! ভক্ত ভারী কামুক; সে ভগবানকে চোখে রাখে না; কেননা চখেরও পলক আছে। কামনায় রাখে না; কামনারও অবসাদ আসে। রুচিতে রাখে না; রুচিরও তারতম্য হয়; "বুদ্ধিতে" একটু রাখে বটে, কিন্তু সেটা "ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি" যে বুদ্ধি ভগবান পরম-বিশেষ এইটে বুঝে তাঁ'তেই শান্ত হ'বার জন্য ছোটে। তাহারা জানে যে সব বৃত্তির মূল "অহংবৃত্তি"; তাই অহংরূপ যে পরাস্রোত আছে, সেই স্রোতের মধ্যে—সেই টানের মধ্যে শ্রীভগবানের টান দেখিতে চায়। তা'হলে কখনও বিচ্ছেদ হয় না।

আমি। 'আমির' ভিতর দেখাটা কি রকম?

স্বামী। তোরা 'আমিটা'কে একটা 'বস্তু' ভাবিস্ এবং চৈতন্যময়ীকে 'আমির' দাসত্বে নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সাহায্যে 'আমির' বিশিষ্ট ভাব সিদ্ধি কর্‌বার চেষ্টা করিস্; কিন্তু 'আমি' যদি বিশিষ্ট হ'ত, তা'হলে এক রাম চিরকালই 'রাম' থাক্‌ত। মরে গিয়ে আমার ঐ ভ্রান্তিটুকু গিয়েছে; এখন দেখ্‌ছি যে স্থূল বৃত্তি-গুলিকে স্থূল-ভাবের 'আমিতে' যখন যোগ করিতাম, তখন আমি স্থূলদেহে ছিলাম। তারপর সূক্ষ্মক্ষেত্রে আসিয়া কেবল বাসনা ও মনন-রূপ বৃত্তিগুলিতে খেল্‌তে খেল্‌তে 'আমি সূক্ষ্ম' বলিয়া একটা ভ্রান্তি জন্মিয়াছিল। স্বঃ মহঃ, প্রভৃতি লোক

অতিক্রম করিয়া, সেই ক্ষেত্রে 'আমিকে' আর এক রকম দেখিয়া,—সর্ব্বভাবের 'আমি'গুলিকে একসঙ্গে করিয়া, এখন বুঝ্‌তে পারিয়াছি যে, 'আমি'টা কোনও প্রাকৃতিক পদার্থ নহে, উহা একটা মহান্ 'ভাব' বা 'গতি' মাত্র। **পরম 'আমি' বা পরমাত্মাকে পাইলেই এই গতি স্থির হয়।** তোরা 'আমি'টাকে গোড়া থেকে একটা কিম্ভূত-কিমাকার বলে মেনে নিস্, তা'ই ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্‌লেও তাহাতে 'সূক্ষ্মতর আমি বোধ' ফোটে না। ঐ ছোট আমিটী ধর্ম্ম কর্ম্মেও অক্ষুণ্ণ থাকিয়া যায়। ওরে 'আমি' খোঁজার রাস্তার নামই জন্মাষ্টমী।

আমি। কথাটা কি আর একটু বুঝিয়ে বলুন।

স্বামী। আচ্ছা শোন্; বেশী কথায় বল্‌ব না; তবে কথাগুলি বেশ ভেবে গ্রহণ করিস্। সর্ব্বজীবের হৃদয়ে একটি সর্ব্বভাব সংগ্রহকারী 'আমি' বুদ্ধি আছে। আমরা কেহই ক্ষুদ্র 'আমি'র প্রিয় নই; সেই জন্য ক্ষুদ্র 'আমি'র মোহে নিমগ্ন হইয়াও তাহাতে 'সর্ব্ব'ভাব,—ধন, মান, যশঃ প্রভৃতি যোগ করিতে ব্যস্ত। 'আমি' যদি বাস্তবিক বিশিষ্ট হইত, তাহা হইলে কি অনন্ত-ভাবাপন্ন 'সর্ব্বের' মধ্যে আমার তৃপ্তি হইত? এই সর্ব্বভাবে স্থিত আমি' অতি স্বচ্ছ বলিয়াই, সর্ব্ব বস্তু হইতেই এক 'আমি' ভাব জাগে। উহা অবিকারী বলিয়া সুখ দুঃখ ও জন্ম-মৃত্যুর মধ্য দিয়াও এই 'এক আমি' বোধ বিকৃত হয় না। উহা শান্ত অর্থাৎ সর্ব্বদা স্থির বলিয়া এত গোলমালের মধ্যেও, আভাসে স্থির 'আমির' জ্ঞান হয়। এই **'আমি'** শ্রীভগবানের পদ বা প্রকাশ স্থান। এই 'আমি'কে বসুদেবের 'আমি' বলে।

যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকং॥
স্বচ্ছত্বমবিকারিত্বং শান্তত্বমিতি চেতসঃ। ভাঃ ৩।২৬।২১।২২।

সত্ত্বগুণে 'আমির' প্রকাশ হয়। তবে আমাদের সত্ত্ব মলিন বলিয়া, তাহাতে মলিন 'আমি' ভাব জাগিয়া উঠে যখন আর ক্ষুদ্র 'আমির' পিপাসা থাকে না তখন "শুদ্ধ সত্ত্ব"। এই বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম **বসুদেব।**

সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব শব্দিতং, যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন ভগবান বাসুদেবোহ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধিয়তে॥ ভাঃ ৪।৩।২৩।
বিশুদ্ধং সত্ত্বমন্তঃকরণং, সত্ত্বগুণো বা বসুদেব শব্দিতং বসুদেবশব্দেনোক্তম।

কুতঃ; যৎ যস্মাৎ তত্র তস্মিন্ সত্ত্বে পুমান বাসুদেব ঈয়তে প্রকাশতে। অপগতমাবৃতমাবরণং যস্মাৎ সঃ। অয়মর্থ; বসুদেবে ভবতি প্রতীয়তে, বাসুদেবঃ পরমেশ্বরঃ প্রসিদ্ধঃ; স চ বিশুদ্ধ সত্ত্বে প্রতীয়তে। ততশ্চ বাসয়তি দেবমিতি ব্যুৎপত্ত্যা বসত্যস্মিন্নিতি বা 'বসু,' দীব্যতে দ্যোততে ইতি 'দেবঃ।' বসুভিঃ পুণ্যৈর্দীব্যতি প্রকাশতে ইতি বা বসুদেব শব্দ বাচ্যং, শুদ্ধং সত্ত্বম। ততঃ কিম্, অত আহ। সত্ত্বে চ তস্মিন্ ময়া নমসা নমস্কারেনানুবিধিয়তে সেব্যতে ইত্যর্থঃ। (শ্রীধর) বিশুদ্ধ সত্ত্ব বা অন্তঃকরণ, বসুদেব শব্দে শব্দিত। কেননা সেখানে, সে সত্ত্বে, পরম পুরুষ বাসুদেব লক্ষিত বা প্রকাশিত হ'ন। কিরূপ ভাবে—না অপগত-আবরণ বা আবরণ-শূন্য হইয়া। যেখানে ভগবান বাস করেন তাহাকে 'বসু' বলে; এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া 'দেব।' বিশুদ্ধ সত্ত্ব গুণের অধিষ্ঠাতা 'বসুদেব' ভাব জাগিয়া উঠিলে, তখন আর ছিন্ন 'আমিকে' না দেখিয়া, শ্রীভগবানের 'আমি' লক্ষিত হয়।

বসুদেবের দুই পত্নী, একের নাম স্ব-প্রকাশাত্মিকা দেবকী; ইনিইআমাদের জীব চৈতন্যে সর্ব্ব-গ্রহণ-শীলতারূপে (receptivity or awareness) খেলেন। তাঁহার আর একটী পত্নী আছেন, উহাঁর গতি আর বিশেষ নহে, তিনি আ—রোহিণী বা পরা (transcendent) গতি।

কংস বা বিশিষ্ট অহং-অভিমান দ্বারা আমরা সর্ব্ব প্রথমে বুদ্ধির দ্যোতনশীলতা বুঝিতে পারি; বুদ্ধি দ্বারা বৃত্তি গুলিকে অহং রূপে পরিসমাপ্ত দেখি। তদ্বারা বস্তু, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি প্রাকৃতিক বা গুণজ পরিসমাপ্তির অতিগ গতি বুঝিতে পারি। এইরূপে আমাদের বুদ্ধি পরা-ভাবে শিক্ষিত হইলে বিশিষ্ট 'অহং'এর অতিগ সত্ত্বা দেখিবার সামর্থ্য জন্মে। অহংকারের কণিষ্ঠ, বুদ্ধি দেবী, সর্ব্বাত্মিকা ভাবে প্রয়োজিত হইলে দেবকী শব্দে অভিহিতা হয়েন। জীব যখন সর্ব্ব ব্যাপারে, সর্ব্বভাবে, বিশিষ্ট 'আমি'র পিপাসায় মগ্ন না হইয়া, সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে, তখন তাহার বুদ্ধি চিত্তে পরিণত হইয়া কেবল শ্রীভগবানকে দেখাইতে অভিমুখী হয়। ইহাই সর্ব্বাত্মক বসুদেবের সহিত সর্ব্ব-প্রকাশিণী দ্যোতনশীলা দেবকীর শুভ পরিণয়। এই পরিণয় ব্যাপার, সর্ব্ব প্রথমে অহংকারের দ্বারাই সাধিত হয়। কারণ তখনও জীব "আমি কিরূপে ভগবানকে দেখিব" বা "কিরূপে আমি জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইব" এই প্রেরণায় সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা দেবীর

আরাধনা করিতে যায়। অহমিকা, বসুদেবের সহিত সর্ব্বাত্মিকা-বিজ্ঞান বুদ্ধির পরিণয় দিয়া, দেহরথে অধিষ্ঠিত অহং-সারথীরূপে মথুরাগমন কালে দৈববাণী শুনিতে পাইলেন,—"রে মূর্খ! এই পরিণয়ের ফলে ভগবানের যে 'অষ্টম' অভিব্যক্তি হইবে, তাহাতেই তোর "বিশিষ্ট আমি জ্ঞানটী" ধ্বংস হইবে।"

তোমরা মনে করিতে পার যে এ ত' ভাল কথাই; কিন্তু অহঙ্কারের নাশ যে কি ভয়াবহ, তাহা জান না; তা'ই মনে মনে বৃন্দাবন-লীলা কল্পনা করিয়া, সাধের 'বিশিষ্ট আমিটিকে' বিশিষ্ট-সখী নামে বিবর্ত্তিত করিয়া, অহঙ্কারের পরিপুষ্টি কর। ইহাই অহঙ্কার। তাহার প্রমাণ এই যে, সেই অপ্রাকৃত লীলার কল্পনা করিয়া, তাহার মধ্যে তোমার নাম ও স্থান নির্দ্দেশ করিবার প্রবৃত্তি থাকে; তখনও ভগবানকে ভোগ্য করিয়া ভোগ লিপ্সা চরিতার্থ কর। কৈ আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি কি ছাড়িয়াছ? কৈ প্রাণ ভরিয়া কি বলিতে পার—"আমার 'আমি' যাক্—ধ্বংস হ'ক, যেন ভগবানের মহিমা স্ব-প্রকাশিত থাকে; তিনি স্বরূপ ভাবে জয়-যুক্ত হউন; আমার 'আমি' এই দেখিয়া মরিয়া যাউক।" এখনও আমাদের বুদ্ধিতে 'তত্ত্বেব' জ্ঞান আছে, এখনও শ্রীভগবানকে এক তত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। তা'ই বাসুদেবে সংযুক্তা হইয়াও দেবকী দেবী প্রাকৃতিক বিলাস ভুলিতে পারেন নাই,—তা'ই শ্রীভগবানকে আঁকিবার জন্য অপ বা কাম, অগ্নি বামন, বায়ু বা সর্ব্বভাবের সংগ্রাহক-বুদ্ধির ভাবে একে একে ষষ্ঠ সন্তান প্রসব করেন।

আমি। কথাটা বুঝিলাম না।

স্বামী। কেন, এত বিশেষ শক্ত কথা নহে। ঐ দেখ একদল যোগী শ্রীভগবানকে আরাধনা করিয়া স্থূল দেহে নিরাময়ত্ব আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। আর এক সম্প্রদায় শ্রীভগবানকে বাসনার সমাপ্তি না বুঝিয়া, তাঁ'র আশির্ব্বাদে "ভেঙ্গে বালির বাঁধ পুরায় মনের সাধ"; কিন্তু তাহারা জানে না যে "জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে বোধিবে কে।" ঐ দেখ অপর দল, ভগবদ্ভক্তিকে মানসিক শক্তি-সৌকর্য্যে সমাপ্ত করিতেছে। তাহারা জানে না যে অহঙ্কারের কারাগারে নিবদ্ধ, আমাদের চিত্ত ও চৈতন্য শক্তি বিশিষ্টভাবে ভগবানের দিকে যাইলে, সেই আরাধনার ফল কামরূপের দ্বারা দুষ্ট ও অহংকারের দ্বারা বিনষ্ট হইবে। এমন কি, সর্ব্বত্যাগ করিয়া অহঙ্কার বা বিশিষ্ট 'আমি' স্থাপনার জন্য প্রযুক্ত হইলে, তাহার ফলে ব্রহ্মাদিলোকে স্থিতি ঘটিতে পারে; কিন্তু ঐ স্থিতিও ক্ষণভঙ্গুর। ভাই, শ্রীভগবানের আরাধনায়

ফল কাম নহে,—অহংকারের পরিপুষ্টি নহে। "কত চতুরানন মরি মরি যাওত" "আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকা পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।" সেইজন্য ভাই, ছবি দেখিয়া Initiationরূপ খেলা খেলিয়া, সর্ব্ব-প্রকাশিনী দেবকী দেবীর শুভ পরিণয় ব্যর্থ করিও না।

শ্রীভগবান "সোঽহং" অর্থাৎ অহংএর 'স' বা পরাভাব কিম্বা 'স'এর অহংরূপে প্রকাশশীলতা। কিন্তু দুই ভাবেই অহংটী 'স' অভিমুখী থাকা চাই। দেখিও যেন 'স'কে অহংরূপে নির্দ্দেশ করিও না। যখন ইহা করিতে পারিবে তখন দেখিবে যে তোমার অহংটি সংসার অভিমুখী বা ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখা" অশ্বত্থ বৃক্ষরূপী গতিতে পড়িয়া আর বিষয়রূপে পরিসমাপ্ত হইবে না। তখন দেখিবে যে মহামায়া আর অবিদ্যারূপে না খেলিয়া তোমার সাধের অহংকে সঙ্কর্ষণ করতঃ, আনন্দ-নিলয়-সংস্থিতা বসুদেব পত্নী 'আ'—রোহিণী বা চৈতন্যের পরাগতিতে বীজরূপে সংস্থাপিত করিবেন। বিশিষ্ট 'আমি'র জ্বালায় জগত ব্যস্ত "যস্মাৎ নোদ্বিজতে লোকাঃ" * * * গীতা। সেই বিশিষ্ট অহং পরাভাবে ভাবিত হইয়া আনন্দের দ্বারা পুটিত হইয়া, বৈষ্ণব ধাম অনন্ত মূর্ত্তিতে 'সপ্তমং বৈস্ণবং ধামম্ যং অনন্তং প্রচক্ষতে" (ভাগবত ১০।২।৫) 'পর' শ্রীভগবানের সর্ব্ব-আকর্ষণ শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, "রামেতি লোকরমনাদ্বলং বলবদুচ্ছ্রয়াৎ" (ভাঃ ১০।২।১৩)। সকল লোকের অভিরাম বলিয়া 'রাম' এবং সকল বলে বলীয়ান বলিয়া 'বল' অর্থাৎ 'বলরাম' রূপে, শুদ্ধ আত্মজ্ঞানের শুভ্র জ্যোতিতে শিব-স্বরূপে পরিণত হইবে। কিন্তু তোমার এই সপ্তম গর্ত্ত (seventh principle) 'বলরাম' রূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে, তোমার সর্ব্বাত্মিকা, সর্ব্বস্বরূপিণী, সর্ব্বানন্দদায়িনী জগন্ময়ী, চিদানন্দরূপিণী মহামায়ার শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। সেই জন্য তুমি বৈষ্ণব-বংশ-সম্ভূত হইয়া, মহামায়া বা বিদ্যার আরাধনায় 'বলাদপি' নিয়োজিত হইয়াছ। এস ভাই, আজ সেই পরমা বৈষ্ণবী মহামায়ার শরণ গ্রহণ করি। এস ; তাঁহার কৃপা-লাভে সর্ব্বাত্মক হইয়া বিশিষ্ট অহংকে 'স'এর আধার বা লীলাক্ষেত্র বা তটস্থা শক্তি বলিয়া, তাঁহারই পদে যোগমায়ারূপ চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া উপহার দিই। এস বলি—

দুর্গেতি ভদ্রকালীতি বিজয়া বৈষ্ণবীতি চ। ১১ ॥
কুমুদা চণ্ডিকা কৃষ্ণা মাধবী কন্যকেতি চ।
মায়া নারায়ণীশানী শারদেত্যম্বিকেতি চ ॥১২॥ ভাগ ১০।২।

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে,
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পদারবিন্দে,
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে॥
দুর্গা ভদ্রকালী, মায়া, বিজয়া বৈষ্ণবী।
কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, কন্যকা মাধবী॥
ঈশানী অম্বিকা আর নারায়ণী নামে।
তোমারেই ভজে যত নর ধরাধামে॥
নম শিবে সানুকম্পে শরণ্যে সবার
নম বিশ্বরূপে, নম জগতব্যাপিনি।
জগদ্বন্দ্যে পাদপদ্মে নমি বার বার
ত্রাণ কর দুর্গে নম জগৎতারিণি॥

এইরূপে গায়ত্রী দেবীর আরাধনে বুদ্ধি অবসান প্রাপ্ত হইলে, অহঙ্কার অতিক্রমপূর্ব্বক, তোমার 'আমির' ভিতরে প্রকৃতির অতীত পরম পুরুষের প্রকাশ হইবে। তখন চিতি বা চৈতন্যের পরাক্ষেত্রে 'সর্ব্বভাব' পরিত্যাগ করিয়া 'পর' (transcendent) ভাবে অধিষ্ঠিত চেতনার মধ্যে বর্ণের অতীত সুতরাং কৃষ্ণ-রূপে শ্রীভগবান বালক হইয়া, আপনাকে প্রকট করিবেন। তোমার 'আমি'টি কেবল দ্যোতনশীলা হইয়া সেই অমোঘ বীর্য্য গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে কাম হইতে অহঙ্কার পর্য্যন্ত সমস্ত তত্ত্বগুলিকে পরিশুদ্ধ করিয়া, তদ্দ্বারা সেই শ্রীভগবানের প্রকাশ-দেহ গঠন করিতে হইবে। এই পরিশুদ্ধি-করণই শাস্ত্রোক্ত ভূতশুদ্ধি। সেই পরিশুদ্ধ ভূতগণ দ্বারা আর ক্ষুদ্র অহংভাব জাগিবে না; তখন সকল তত্ত্বই, সেই নিষ্কল পরমদেবের ব্যঞ্জনা করিবে।

সেই ভগবানের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে অহঙ্কারের 'কর্ষণ'শক্তিমূলক হৃদয়-গ্রন্থিগুলি ছিন্ন হইবে এবং তোমার বসুদেব "আমি"তে দেখিবে যে আপনা আপনিই শৃঙ্খল সকল পড়িয়া গিয়াছে,—কারাগারের কপাট খুলিয়া গিয়াছে, প্রহরীগণ ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। তখন দেখিবে,—

"নিত্যোঽসি শুদ্ধোঽসি নিরঞ্জনোঽসি, সংসারমায়া পরিকল্পিতোঽসি।"

তোমার আত্মা হইতে আভির্ভূত,—আত্মজ—শ্রীভগবানে মায়ার লেশ নাই.

বন্ধের চিহ্ন নাই। তারপর শ্রীভগবানের জাত-কর্ম্মাদি করিয়া তাঁহাকে আস্তে আস্তে সেই নিবীড়ান্ধকারের মধ্যে কাম-যমুনার পরপারে "নন্দের" আলয়ে পরিপুষ্টির জন্য রাখিয়া আসিতে হইবে। যতদিন না তিনি পরিপুষ্ট হন, ততদিন আবার মায়ার নিগড়ে বদ্ধ হইয়া থাকিতে হইবে বটে; কিন্তু এখন আর বদ্ধ-ভাব নাই;—এখন আর শৃঙ্খল কাটিবার জন্য অস্ত্রের ও কারাগারের দ্বার ভাঙ্গিবার জন্য কোন যন্ত্রের প্রয়োজন নাই। কারণ তুমি ত' একবার দেখিয়াছ, শ্রীভগবান প্রকাশ হইলে এ সকল আপনা আপনি পড়িয়া যায়।

'সর্ব্ব'ভাবের ত্যাগের নাম সমাধি। যখন 'সর্ব্ব'-বুদ্ধি ক্ষয় হইয়া আমি-স্রোতে মিশিয়া গিয়া পরম আমিতে' পরিসমাপ্ত হয়, তখনই সমাধি। ইহা চৈতন্যের পরাভাবের অভিব্যক্তির অন্টম স্থান। 'আরোহী' সমাধিতে শ্রীভগবান 'আমিতে' আসিয়া অবতীর্ণ হইলে, তারপব সেই সমাধির ফল-স্বরূপ পরমানন্দে পুষ্ট হইলে, সেই স্বার্থশূন্য, সর্ব্বব্যাপী, স্থির আনন্দের মাত্রায় নিম্নতর তত্ত্বগুলি বিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এ বিবর্ত্তন রহস্য ব্রজলীলার অন্তর্গত; তাহা সময় হইলে পরে বিবেচ্য।

যাও সংসারে ফিরিয়া যাও; কারণ ঐ কারাগারের মধ্যেই, পূর্ণ ভগবানের প্রকাশ হইবে। তোমাদের সকলের হৃদয়ে যেন শ্রীভগবান 'জন্ম'গ্রহণ করেন।"

স্তব পাঠ করিতে করিতে একে একে জনাদিলোক অতিক্রম করিয়া, জাগ্রত হইলাম। তখনও দেখি স্থূলে বলিতেছি,—

সচ্চিদানন্দ রূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্ট কারিণেঃ
নমো বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে।
বর্হাপীড়াভিরামং মৃগমদতিলকং কুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডং
কঞ্জাক্ষং কম্বুকণ্ঠং বিকশিতবদনং স্বাধরে ন্যস্তবেণুং
শ্যামং শান্তং ত্রিভঙ্গং রবিকরভূষণং ভূষিতং বৈজয়ন্ত্যা
বন্দে বৃন্দাবনস্থং যুবতীশতবৃতং ব্রহ্ম-গোপালবেশং।

সচ্চিদানন্দঘন, এক রূপধারী,
নমো কৃষ্ণ, আকর্ষক, ক্লেশনাশকারী;

বেদান্তের এক বেদ্য, বুদ্ধি সাক্ষীকারী
নমো নমো কৃষ্ণ গুরুদেবরূপধারী।
বর্হাপীড়ে অভিরাম, গণ্ডেতে কুণ্ডল দাম, মৃগমদতিলক ভূষিত।
কম্বুকণ্ঠ কমলাঁখি, অধরে বাঁশরি রাখি ;—বদন-মণ্ডল বিকশিত ;
ত্রিভঙ্গ, শাঙ্গ, শ্যাম, গলে বৈজয়ন্তী দাম, অরুণ কিরণ বিভূষণ।
নিত্যধাম বৃন্দাবনে, যুবতীগণের সনে, বন্দি গোপ-ব্রহ্মের চরণ ॥

শ্রীযোগানন্দ ভারতী।

মোক্ষ]

প্রভাসে।

কত কোটী যুগ পরে, কত জন্ম-শেষে,
ভিখারিণী কাঙ্গালিনী পাগলিনী বেশে,
আজি আসিয়াছে দাসী, দুয়ারে তোমার—
ধরিতে চরণ তব হৃদয় মাঝার।
না ছিল তাহার জানা—তুমি রাজ-রাজ,
বিরাজে ভীষণ দ্বারী, সিংহ-দ্বারে তব ;
ফিরায়ে দিতেছে তা'রে ; তুমি নিজে আজ,—
না ডাকিলে, প'ড়ে রবে শুধু শব তা'র।
সে জানিত—তুমি তার, সে শুধু তোমার,
আর কিছু মাঝে আছে, জানিত না কভু ;
নিতান্ত অবোধ নারী, নাহি জানে আর,—
তোমার চরণ বিনা ;—ফিরা'য়ো না প্রভু !
ভিখারিণী,—কিন্তু নাথ ! তুমি ভিক্ষা তা'র ;
তা'রে কি ফিরা'তে পার, প্রভাসে তোমার ?

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

নারদের বীণা।

নারদ ঠাকুরটীর নাম বোধ হয় সকলেরই কাছে সুপরিচিত ; তাঁ'র একটি বীণা আছে। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্থানে অস্থানে সর্ব্বত্রই ঘুরে বেড়ান,—সঙ্গে কিন্তু বীণাটি আছেই। লোকের বাড়ীতে বিয়ে, খুব আমোদ প্রমোদ হ'চ্চে,—ঠাকুর বীণা যন্ত্রটি হাতে করে সেখানে উপস্থিত। আবার কোথাও একজন লোক মর্‌চে ; বাড়ীতে কান্নাকাটি লেগেছে ;—নারদ পীড়িং পীড়িং করে বীণা বাজিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত! এ কি রকম তাঁ'র বেয়াড়া রকমের স্বভাব, বল তো ? চক্ষুলজ্জা কিম্বা সভ্যতার ধারটী পর্য্যন্ত ধারেন না! শ্রীকৃষ্ণ ষোলশত রাণীর সহিত কিরূপ ব্যবহার করেন,—এ জান্‌বার তাঁ'র অত মাথা ব্যথা কেন ? এখনকার সময় হলে টের পেতেন ; অর্দ্ধচন্দ্র তো হ'তই,—আবার দীর্ঘকাল সরকার বাহাদুরের হেপাজতে থাক্‌তে হ'তো। তারপর তাঁ'র কাণ্ডজ্ঞানটা একবার দেখ! লোকের সুখ সম্পদের সময় একটু বীণা বাজাও বা একবার গান কর কিম্বা একটু নৃত্য কর,—এ এক রকম সওয়া যায় ; কিন্তু যেখানে মর্ম্ম ফেটে দুঃখের স্রোত কুলকুল করে দুকূল ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্চে,—সেখানেও তোমার বীণা থামাবে না! এ কি রকম বাপু! এ অবস্থায় কেহ বীণা বাজাইলে, এক লগুড়াঘাতে আমি তাহার বীণা ভাঙিয়া দিই কিন্তু। আমি মর্‌চি দুঃখের জ্বালায়, আর তুমি বীণা বাজাতে বাজাতে আমার বাড়ীতে নাচন্ জুড়ে দিলে! একি সব সময় ভাল লাগে—না সহ্য হয় ? ভাগ্যি একালে নারদ ঠাকুর আমাদের দিকে ঘ্যাঁসেন না ; নচেৎ তাঁকে ভাল করে আর একটি বীণার গৎ শিখিয়ে দেওয়া যেতো। বোধ হয় তিনি অন্য কোন যুগে তা' শিখবার সুযোগ পান্ নি।

দুর আহম্মুক! নারদ কি তোর যাত্রাদলের বেহালাদারের মত এক বীণা ঘাড়ে করে সময়ে অসময়ে কোঁ কোঁ করে বাজিয়ে বাজিয়ে বেড়াতেন নাকি ? তোমাদের যেমন বিদ্যে, ধারণা কর্‌বার শক্তিও তেমনি চন্‌চনে! ওরে এ বীণা কাঠের বীণা নয় ; আর তারগুলিও লোহ বা পিতলের নয়! তিনি যে বীণার তানে দিন রাত্রি ভোঁ হয়ে থাকেন—সে এক আজব বীণা। ভক্ত কবি বলেছেন "বিন্নু হাতে নিশুদিন ফিরে, ব্রহ্মধ্যান তাঁহা হোয়ে।" এ বীণার

সুর কি জানিস্? সমস্ত বিশ্বের যে আনন্দ, সেই সুরটি এ বীণাতে বাজে। "ব্রহ্মানন্দ" কথাটা কাণে শুনেছ অবিশ্যি; এ তা'রই অভিব্যক্তি!

এ বীণার কাঠ যে সে কাঠ নয়; এই 'চৌদ্দ পোয়া' শরীরখানিই তা'র কাঠ; সত্ত্ব রজঃ তমোগুণের ত্রিতারে এই যন্ত্রটি বাঁধা; সকলেই আমরা এই বীণা বাজাচ্চি। কিন্তু বাজাতে ঠিক পারি না বলে সুর জমে উঠে না;—শুধু বেসুরা আওয়াজে কাণ 'ঝালাপালা' হয়ে উঠে—মনে হয় থাম্‌লে বাঁচি! কিন্তু যাঁরা বাজাতে জানেন, তাঁরা বড় মিঠে করে বাজান, শুনে মন প্রাণ গলে যায়! ঐ সুরগুলো যেখান থেকে উঠে, আবার সেইখানেই মিশে যায় বা লয় হয়; মন প্রাণও ঠিক সেই রকম তালে তালে সেই অব্যক্তে মিশে যেতে চায়! সমস্ত তারগুলির যুগপৎ ঝঙ্কারে এক অপূর্ব্ব রাগের,—একটি অসীম মাধুর্য্যের ধারা বহিতে থাকে। ভক্ত কবি কি অপূর্ব্ব ভাষায় এই সুরটিকে বর্ণনা করিয়াছেন:—

"রাগ কৌন্ আহদ্ বাজে, নিখিল জীবন ধারে।
তাল কৌন্ লয় ন লেত, অভয় মরণ পারে।

যাঁরা 'ওস্তাদ',—তাঁ'রা সত্ত্ব রজঃ তম গুণের তার তিনটি দিয়ে, এমন একটি ঐক্যতান বার করেন যে, তা'র মধ্যে তিন তারের পৃথক সুরের আর পৃথক উপলব্ধি থাকে না;—সব তারের সুর এক সুরে লয় হয়ে যায়। জ্ঞানীরা ইহাকে জ্ঞানাতীত বা স্বপ্নাতীত অবস্থা ব'লে বর্ণনা করেন; যোগীরা ইহাকে ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্নার অতীত অবস্থা বলেন। বুঝ্‌লে এখন নারদ কি বীণা বাজান্। তিনি তা' আর দিনরাত বাজাবেন না কেন? আর তোমার আমার কান্না-কাটিতেই বা তাঁ'র সে তারের বেতার হয়ে উঠ্‌বার কোন কারণ দেখ্‌চি না তো। গীতাতে তো তাই ভগবান স্পষ্ট করেই বলেছেন—

"যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।"

কিন্তু এ বীণা যাঁ'রা বাজান, তাঁ'রা খালি বীণা বাজিয়েই কাল কাটান্ না; তাঁ'দের অনেক কাজ। কিন্তু সবই সেই বীণার সুরে মিল করানো। সে কাজ আমাদের কাজের মত নয়! আমাদের প্রায় সমস্ত কাজেরই উদ্দেশ্য "অহং অভিমান"কে কেন্দ্র ক'রে ফুটে উঠা;—আর ওসব লোকের কাজ বিশ্ব-কেন্দ্রকে ঘেরিয়া জাগিয়া উঠা, আর এই বিশ্ববীণা যিনি বাজাচ্চেন তাঁরই চরণপদ্মে লীন হওয়া। তা'ই আমাদের কাজগুলো ক্রমশঃই বোঝার মত

হয়ে ঘাড়ে চেপে বসে। আর তাঁ'দের কর্ম্মে নিত্য আনন্দের শান্তি নির্ঝর সুর সুর করে ব'য়ে যেতে থাকে। তা'র কারণ কি জান? কারণ আর কিছুই নয়, —তাঁ'দের কর্ম্ম শ্রীভগবানের উদ্দেশে ত্যাগ যজ্ঞে পরিণত হয় আর আমাদের কর্ম্ম ভূতের বোঝা বহে মরার মত কেবল নিরর্থক ব্যর্থ চেষ্টায় পর্য্যবসিত হয়। আমাদের কাজের পরিণাম শোক আর কষ্ট.—তাঁ'দের কাজের প্রারম্ভেও দুঃখ নাই পরিণামেও তাপ নাই। শ্রীবিষ্ণু-প্রীত্যর্থ কর্ম্ম একেই বলে! এর আদি অন্ত, মধ্য—সমস্তই আনন্দ, সমস্তই শিব।

এই দেখনা দক্ষ* বেচারার পিপীলিকার মত পক্ষ উদ্গত হলো, বেচারা ঘোর আত্মাভিমানে মগ্ন। এখন তাহাকে শিক্ষা দিতে হবে—তা' না' হ'লে বিশ্ব-বীণার তার কেটে যায়; তা'ই নারদ ঠাকুরটি দক্ষকে পরম বন্ধুর মত শিব-রহিত যজ্ঞে উৎসাহ দিয়ে বীণা বাজাতে বাজাতে তখনই শিবের কাছে এসে উপস্থিত। শিব বল্লেন, "যা হবার তা' হ'ক্, আমার তা'তে দুঃখ নেই, কিন্তু সতীর কানে যেন এসব কথা না উঠে!" নারদ ভাব্‌লেন "তা'ও কি হয়, সতী না শুন্‌লে দক্ষের মঙ্গল হবে কি ক'রে?" অমনি বীণা বাজিয়ে সতীর কাছে এসে সব কথা বলে গেলেন। সতী দক্ষালয়ে গেলেন—দেহত্যাগ কর্‌লেন; শিবের রোষ হলো, দক্ষযজ্ঞ* পণ্ড হলো।—দক্ষের দর্প চূর্ণ হলো; তাঁ'র পূর্ব্ব জ্ঞান ফিরে এলো।

* সর্ব্ব কার্য্যে দক্ষতা বা নিপুণতাই হলেন দক্ষ, কিন্তু এই দক্ষতা যদি শিব-রহিত হয়, তবে তাহা তামস অহঙ্কারে পরিণত হয়। সুতরাং 'সৎ'কে ধারণ করে আছেন যে বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী বুদ্ধি তাহার ধ্বংশ হয়। এই প্রকাশাত্মিকা "ধী"র ধ্বংশ বা বিলোপ হইলে, (বুদ্ধি নাশাৎ প্রণশ্যতি শিব অশিবরূপ ধারণ করিয়া যজমানকে বিনাশ করেন। কিন্তু এ বিনাশ শুধু দেহ নষ্ট করা নহে; কুমতির ধ্বংস সাধনই ইহার আসল উদ্দেশ্য। তা'ই দক্ষ একবার মরিয়াও মরিলেন না, শিব-কৃপায় পুনর্জীবিত হইলেন। কিন্তু এবার যে দক্ষতা লাভ হইল, তাহা সংসার বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য নহে—পরন্তু "তত্ত্বং কিমেকং শিবমদ্বিতীয়ং" এই জ্ঞান লাভ করিবার জন্য। কুকর্ম্ম ও কুবাসনার দ্বারা সত্ত্বগুণ যখন আচ্ছাদিত হইয়া যায়—তখন অজ্ঞান তামসে জ্ঞানরশ্মি আচ্ছাদিতবৎ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু মেঘ তো মেঘ হইয়াই চিরকাল সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়া থাকিতে পারে না; তাহা আপনার শক্তিতেই আপনাকে জলধারারূপে পরিণত করিয়া ঘন মেঘের আচ্ছাদন অপসারিত করিয়া ফেলে,—তখন আবার দিক পরিষ্কার হয়, 'সবই' স্পষ্ট হইয়া উঠে! ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। তা'ই হিরণ্যকশিপু, রাবণ, জগাই, মাধাই সকলেই উদ্ধার লাভ করিবে।

তবে এর দুঃখ কোন্‌খান্‌টায়? এর পরিণাম তো অমৃতোপম; সুতরাং এখন ভেবে দেখ 'দিনরাত নারদের বীণা বাজ্‌বে না কেন? তা'ই তিনি দিনরাত বীণাটি বাজাচ্চেন,—অফুরন্ত আনন্দ কি না!! আবার দেখ বনের মাঝে কুম্ভকর্ণ খেয়ে দেয়ে বিশ্রাম কর্‌ছিল, নারদ আকাশ মার্গে বীণা বাজিয়ে যাচ্চেন; কুম্ভকর্ণ তাঁ'কে ডাকলেন—সমাদর করলেন, 'কোথায় যাওয়া হয়েছিল' প্রশ্ন করলেন। নারদ হেঁসে বল্লেন, "দেবসভায় উপস্থিত ছিলাম, সেখানে তোমাদের বধের পরামর্শ হচ্ছিল।" কুম্ভকর্ণের সম্মুখে অমন স্পষ্ট সরল ও নির্ভীক ভাবে তা'দেরই বিনাশের কথা হাঁসিমুখে শুনানো—এ বড় সোজা শক্তি নহে; বিরাট আনন্দের মধ্যে মজে না থাকলে, এ কি কাহারও পক্ষে সম্ভব হয়! এই বীণা বাদনের জোরেই নারদের 'পরম অভয়"-ভাব বুঝ্‌লে?

পরামর্শ কত লোককেই দিচ্চেন; যেখানে যেটি অভাব সেটি যা'তে পূর্ণ হয়, তা'র জন্য তিনি হস্ত প্রসারিত করেই আছেন। অনেক লোকে তাঁ'র পরামর্শ মত কার্য্য করে, আবার করেও না কেউ। তা'তেই কি আর তাঁর দুঃখ আছে? এই দুর্য্যোধন কি তাঁ'র কথা মান্‌লো? কিন্তু তজ্জন্য তাঁ'র ক্ষোভ নাই; হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে এসেছিলেন, হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে দুর্য্যোধনের কাছ থেকে চলে গেলেন। এ সমস্তই সেই বীণা বাজানোর জোরে। গানে আছে "নারদ ঋষি দিবানিশি বীণা যন্ত্রে গান করে।" এটা পদ মিলাবার জন্যই আমরা বলি বটে, কারণ নারদকে আমরা কেউ দেখিনি, আর তিনি দিবারাত্র গান করেন কি ঘুমোন্, তা'রও খবর ঠিক জানি না; কিন্তু এ কথাটার মধ্যে একটা সত্য আছে, তাহা আমরা বুঝি। তাহা এই—যদি বীণাটা কোন গতিকে বাজাতে শেখ, তবে দিনরাত না বাজিয়ে থাকৃতে পার্‌বে না এ প্রদীপ একবার জ্বল্‌লে তো আর নেবে না!!

একটি সুন্দর বীণা আমরাও তো পেয়েছি', যা' শ্রীগুরুর চরণপথ আশ্রয় করে বাজাতে শিখ্‌লে, তা'তে কত রাগ রাগিণীই বেজে, পরদায়—পরদায়, উদারা—মুদারায়, গ্রামে গ্রামে উঠিয়া, ঝণকে ঝণকে জীবন বীণার কত গীত;—কখন ভৈরবী, কখন বেহাগ, কখন মল্লার, কখন ভৈঁরোর বিচিত্র তান লয়ে এই চিত্ত-আকাশকে ভরপুর করিয়া রাখিত! কিন্তু হায় তাহা হইল কৈ? "বাঁশরী বাজাতে চাহি, বাঁশরী বাজিল কৈ"? তা' সত্যি, কিন্তু অমনি অমনি কি বাঁশী বাজাবে?

উঠে পড়ে লাগ, মাথা কুটোকুটি কর, হাঁচড় পাঁচড় কর—তবে তো! আল্‌সের মত শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুণলে আর কি হবে? রামপ্রসাদ বলেছেন,—

মন তুমি কৃষি কাজ জান না।
এমন মানব জমী রইল পতিত, আবাদ কর্‌লে ফলতো সোনা।"

মোক্ষ]

দুর্গোৎসব।

১। আবাহন—মহাসপ্তমী।

এস গো মা দুঃখহরা, দুর্গে দুর্গতি-হারিণি!
(আজ) কোটীকণ্ঠে সকাতরে ডাকে তোরে মা তারিণি
সারা বরষের পরে, তিন দিবসের তরে;
(তুমি) অবনীতে অবতীর্ণ হও গো মা ভবরাণি!
জননীর অদর্শনে, সন্তানে বাচে কেমনে;
(আমি) যে দুঃখে মা দিন যাপি, জান অন্তরযামিনি!
এস এস ত্বরা করি, সদাশিবে সঙ্গে করি,
ভূলোক আলোক কর, ওমা শিবসীমন্তিনি!
তুমি না আসিলে শিবে, অশিব কেবা নাশিবে;
জীবে প্রেমানন্দ দিবে, ওমা আনন্দরূপিণি!

২। মহাষ্টমী।

আজি শুভ মহাষ্টমী, কোথা গো জননি তুমি;
(ওমা) দয়া করে দীনে দেখা দে মা! তারা ত্রিনয়ণি!
সম্বৎসর আশা করে, আছি মাগো প্রাণ ধরে;
তোমারে হেরিব বলে, ওমা মহেশমোহিনি!
দুঃখ তাপ কত শত, সহিতেছি অবিরত;
(আজ) তোমারে হেরিয়া হিয়া জুড়াইব হর-রাণি!
এস এস এস গো মা, শিব-প্রাণ-প্রিয়তমা;
দরশন দিয়ে প্রাণ রাখ মা দুঃখহারিণি!

৩। মহানবমী অবসান।

(হ'ল) নিমেষের মত, তিন দিন গত ;
ভাল করে দেখা হ'লনা।
(মাগো) কথন বা এলি, কেমনে বা গেলি ;
টের পেতে কিছু দিলি না॥
(ছিল) বড় সাধ মনে, ধরিয়া চরণে ;
হৃদয়ে করিব স্থাপনা।
(আর) প্রাণ গেলে তবু, ছাড়িব না কভু ;
ফিরে যেতে তো'রে দিব না॥
(আর) ও রাঙ্গা চরণে, সঁপিয়া জীবনে ;
হেরিব ওরূপ-জ্যোছনা।
(মাগো) কোন্ অপরাধে, বঞ্চিলি সে সাধে ;
বুঝিতে ত' কিছু পারি না॥
(আমি) এই নিবেদন, করি মা এখন ;
আর কিছু আমি চাহি না।
(যেন) জীবনে মরণে, জাগ্রতে স্বপনে ;
ও রাঙ্গা চরণ ভুলি না॥

৪। বিজয়া।

ছেলে ফেলে চলে মাগো যেও না যেও না।
দু'টি পায়ে পড়ি, মোরে ত্যজ'না ত্যজ'না॥
তোমার অদরশনে, বাঁচিব বল কেমনে ;
মা বিনে সন্তান কভু বাঁচেনা বাঁচেনা।
পলকের দেখা দিয়ে, যেতে চাও পলাইয়ে ;
সুতে প্রতারণা এত সাজে না সাজে না॥
দেহে রোমকূপ যত, কোটিগুণ আঁখি হ'ত ;
কোটী কল্প অবিরত হেরে আশ মেটে না।

তা'ই বলি ওমা শুন,   এ দীনের নিবেদন ;
তনয়েরে সঙ্গে নিয়ে চলনা চলনা ॥
কাছে থা ক দিবানিশি,   আনন্দ সাগরে ভাসি ;
হেরিবে ও রূপরাশি, আর সে কাঁদিবে না ॥

গোবিনলাল-

মোক্ষ]

মহাপূজা।

তৃতীয় চরিত্র।

(গত বৎসরের পূজা সংখ্যার পর)

(১)

সৃষ্টি হইয়াছে। ব্রাহ্মী ও বৈষ্ণবীরূপে মহা-বিদ্যার অনুগ্রহে ব্রহ্মগ্রন্থি ও বিষ্ণুগ্রন্থিরূপ অবিদ্যার নাশ হইয়াছে জীব সর্ব্বভাবের ভাষা বা সঙ্কেত অস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারিতেছে। কিন্তু এখনও শিবগ্রন্থী-সম্ভূত অবিদ্যার ক্ষয় না হওয়াতে, শৈবী-মায়ায় বিমুগ্ধ জীব অহঙ্কারের-মোহে নিমগ্ন। 'সর্ব্ব'ভাবের আকর্ষণ বলে বাহিরের জগদ্বস্তুর সহিত জীব মিশিতে শিখিয়াছে; কিন্তু সেই সম্মিলনের ফল এখন অহঙ্কারতত্ত্বে পর্য্যবসিত। উহা শ্রীভগবানে পঁহুছিতেছে না। অহঙ্কার তত্ত্ব কি ? তাহা আমাদের বুঝা আবশ্যক।

চৈতন্যের দুইটী মহাভাব আছে। 'প্রকৃতি'রূপে চৈতন্য সর্ব্বভাবে খেলে, আর পুরুষরূপে শুদ্ধ নিষ্কল অহং-বোধে স্থির হয়। 'সর্ব্ব'-জাতীয়, প্রাকৃতিক চৈতন্য জীবের ক্ষুদ্র অহঙ্কারের সমক্ষে ছিন্নরূপে প্রতীয়মান হইয়া 'বহুর' প্রসবিনী 'প্রকৃতি' বলিয়া বোধ হয়; কিন্তু প্রাকৃতিক 'সর্ব্ব' খেলাই কেবল পুরুষের জন্য। ছিন্ন পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের জন্যও সর্ব্বাত্মিকা প্রকৃতি খেলেন; এই দুইটী ভাব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি মার্গ নামে অভিহিত হয়। পরম পুরুষের ভোগ ও অপবর্গ নাই। শুদ্ধা প্রকৃতি তৎ সমক্ষে ভোগাপবর্গের

খেলা খেলেন না। "বিষ্ণোরেব পরমং পদং দর্শয়িতুময়মুপন্যাসঃ (শঙ্কর—বেদান্ত ভাষ্য ১।৪।৪।) বিষ্ণুর পরমপদ দর্শন করাইবার জন্যই প্রকৃতির এই খেলা-রহস্য। বাহিরের 'বহু'গুলি জীবের ভোগ ও অপবর্গ সাধনের নিমিত্ত-ভূত হইতে গেলে দু'য়ের বিভিন্ন বা ভেদ ভাব দূর হওয়া আবশ্যক। দুইয়ের মধ্যে কতকগুলি 'সংযোগিনী শক্তি' বা ভাব থাকা চাই। প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার প্রভৃতি এই সংযোগিনী শক্তির মূর্ত্ত বা ক্রম বিকাশ। প্রাণ আছে বলিয়াই চিদ্রূপী অহং, অপেক্ষাকৃত অচিদ্রূপী দেহকে আপনার ভাবে চালনা করিয়া বাহ্য বহুর সহিত মিলিত হইতে পারে। ইন্দ্রিয় আছে বলিয়াই বাহ্য বস্তু গুলিকে আমরা আমাদের ব্যক্ত 'অহং'এর সহিত 'সম রাশিতে' পরিণত করিতে চেষ্টা করি। বাহ্য বস্তুগুলি শুধু আর বাহ্য থাকে না ; উহারা আমাদের রূপ রসাদি ভাবের ব্যঞ্জক হয়। কাম আছে বলিয়া ইন্দ্রিয়জ বাহ্য ভাব গুলিকে আমার বলিয়া দেখিতে শিখি। এই আমার রূপ তৃষ্ণার বশে বাহ্য বস্তুগুলি আর সম্পর্ক-শূন্য (unrelated) অসংশ্লিষ্ট থাকে না, তাহারা 'আমার হইয়া' 'আমির' অভিমুখে প্রধাবিত হয়। এইরূপে মনের দ্বারা রাগ ও দ্বেষাদিরূপে বিরূদ্ধ-ভাবাপন্ন বাহ্য ভাবগুলি 'সঙ্কল্প' ও 'বিকল্প' শক্তির সাহায্যে চিণ্ময় রূপ পরিগ্রহণ পূর্ব্বক আমার দিকে প্রধাবিত হয়। কিন্তু, এতক্ষণ তাহারা 'আমার' থাকে ; পূর্ণ ভাবে 'আমি' হইতে পারে না। যে শক্তির বশে বাহ্য ভাব-গুলি 'আমি'রূপে অহং-ভাবাক্রান্ত হইয়া 'আমিতে' মিশিয়া যায় তাহাকে অহঙ্কার বলে। চিত্তবৃত্তিগুলি বৃত্তি-রূপ পরিত্যাগ করিয়া যদ্বারা অহংরূপে প্রতিভাবিত হয়, তাহাই নিবৃত্তি মার্গের অহঙ্কার। অহঙ্কার তিন ভাবে বাহ্য বস্তু বা বোধকে আবৃত করে। তদ্বারা কতকগুলি বৃত্তি বা ভাব-রাশি 'অহং কর্ত্তা' 'আমি কর্ত্তা' এই বোধে পরিসমাপ্ত হয়। আর কতকগুলি 'আমার ক্রিয়া' ও অবশিষ্ট বোধগুলি 'আমার কার্য্য' এইরূপে তিনটী স্রোতে 'অহং'এর দিকে মিশিতে যায়।

যেমন বহু-ভাবাপন্ন বাহ্য-রশ্মিমালা আতসী কাঁচ (lens) সাহায্যে সপ্ত বর্ণের (colour ; স্রোতে বা ধারাতে বিভক্ত হইয়া পুনরায় একের দিকে মিশিতে যায় ; তদ্রূপ পশু, পক্ষী, মানব প্রভৃতি বাহ্য ভাব,-- সুখ, দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ প্রভৃতি কামনার অনন্ত রূপরাশি, মনের অনন্ত ভাবরাশি এই অহঙ্কার-রূপ কাচের (lens) সাহায্যে কেবল মাত্র তিনটী স্রোতে পর্য্যবসিত হইয়া অবশেষে 'আমি'-

রূপ প্রাপ্ত হয়। ভেদবুদ্ধি বশতঃ অল্পমতি বালক যেমন শুভ্র রশ্মিকে সপ্ত-বর্ণের সমন্বয় বলিয়া ভাবে, তদ্রূপ বিশিষ্ট সংস্কারাভিমানী জীব অহংকারের সাহায্যে 'অহং'কে প্রাপ্ত হইয়া, সেই শুদ্ধ অহং জ্ঞানকে কর্ত্তা ক্রিয়া ও কার্য্য এই তিন ভাবের সংস্কার দ্বারা রঞ্জিত করিয়া, বাহিরের বিশিষ্টতার দ্বারা শুদ্ধ অহংকে বিশিষ্ট বলিয়া মনে করে। শুধু তাহাই নহে ; সে মনে করে যে বাহিরের বস্তু, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, ভোগলিপ্সা, সঙ্কল্প বিকল্প প্রভৃতির দ্বারা ঐ অহং ভাবটী পরিস্থাপিত হইতেছে। কিন্তু যেমন (lens) কাচের সাহায্যে আলোক-রশ্মির বাহ্য ভাব ও এমন কি বর্ণমালা প্রকটিত হইলেও, শুদ্ধ শুভ্র আলোক-তত্ত্বে লাল নীল প্রভৃতি বর্ণেরও বাহ্য বস্তুর সমাবেশ নাই ;—যেমন বাহ্য বস্তু ও বর্ণমালা গুলি আপনাদের বিশিষ্ট নামরূপ ত্যাগ করিয়াই সেই শুভ্র জ্যোতিতে পরিসমাপ্ত হয়, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়াদির ভাবরাশি ও অহংকারের ত্রিবৃতত্ব নাম ও রূপ, ক্রিয়া ও সংস্কার ত্যাগ করিয়া, সেই শুদ্ধ অহং সমূদ্রে মিশিয়া যায়। 'সর্ব্ব' ভাবে যাহা দ্বারা অহংএর ছাঁচ পড়ে, তাহাকে অহঙ্কার বলে।

নিবৃত্ত বুদ্ধ্যবস্থানো দূরীভূতান্যদর্শনঃ।
উপলভ্যাত্মমাত্মানং চক্ষুষেবার্কমাত্মদৃক্ ॥
মুক্তলিঙ্গং সদাভাসমসতি প্রতিপদ্যতে।
সতো বন্ধুমসচ্চক্ষুঃ সর্ব্বানুস্যূতমদ্বয়ম ॥
যথা জলস্থ আভাসঃ স্থলস্থেনাবদৃশ্যতে।
স্বাভাসেন তথা সূর্য্যো জলস্থেন দিবি স্থিতঃ ॥
এবং ত্রিবৃদহঙ্কারো ভূতেন্দ্রিয় মনোময়ৈঃ।
স্বাভাসৈর্লক্ষিতোঽনেন সদাভাসেন সত্যদৃক্ ॥ ভাঃ-৩।২৭।১০।১১।

যখন বুদ্ধির জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থা ও মনুষ্য পশু পক্ষী ভাব প্রভৃতি বৃত্ত (circumference ভাব দূর হয়, স্বরূপ নিদ্ধারণ শক্তি বুদ্ধি চৈতন্যের ভাবরাশিকে ভেদ-ভাবে বিশেষ বৃত্তাভিমুখী বস্তুরূপে আর অবসান করে না, (নিবৃত্তানি বুদ্ধ্যবস্থানি জাগ্রদাদীনি যস্যঃ—শ্রীধর)। যখন বিশেষ ভোগাত্মক অহংজ্ঞানের মোহ নিরাকৃত হয় এবং 'আমির' বাহিরে 'অন্য' কিছু দৃষ্ট হয় না, তখন অহংকারের দ্বারা অবচ্ছিন্ন 'আমির' সাহায্যে শুদ্ধ আত্মা দৃষ্ট হন। এই জন্য শ্রীধর বলিলেন,—"আত্মনা অহংকারবচ্ছিন্নেন আত্মানং

শুদ্ধমুপলভ্য, চক্ষুষা চক্ষুরবচ্ছিন্নেন অর্কেণ গগনস্থমর্কমিব।” যেমন চক্ষুতে অবচ্ছিন্ন ও চাক্ষুষ প্রকৃতির দ্বারা রঞ্জিত সূর্য্য প্রতিবিম্বের দ্বারা আকাশস্থ শুদ্ধ রবির দর্শন হয়, ইহাও তদ্রূপ। তখন মুক্তলিঙ্গ অর্থাৎ ত্রিলিঙ্গের সংস্কার অতিক্রম করিয়া ‘অসৎ’ বা অহঙ্কার তত্ত্বে প্রকটিত বা লক্ষিত সদ্রূপে আভাসমান ব্রহ্ম বা শুদ্ধ অহংকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। “মুক্তলিঙ্গ নিরুপাধিকং অনতি মিথ্যাভূতে অহংকারে সদাভাসং সদ্রূপেন ভাসমানং ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি”—শ্রীধর। শুদ্ধ ব্রহ্মরূপী অহং, সৎ বা করণাত্মক প্রধানের বন্ধু বা অধিষ্ঠান ও অসৎ বা কার্য্যাত্মক চক্ষুর বৃত্তির প্রকাশক। তিনি সর্ব্ব কার্য্য-কারণের এক ভাবে পূর্ণরূপে অনুস্যূত ও অদ্বয় বা পরিপূর্ণ। সুতরাং তিনি সর্ব্বভাবেই প্রাপ্য ও সর্ব্বাবস্থায় গম্য। যেমন জলস্থিত সূর্য্যাভাস প্রতিবিম্বিত হইয়া গৃহের দেয়ালে পড়ে এবং তদ্দৃষ্টে গৃহস্থিত বদ্ধ জীব স্থলস্থ বা স্থূল রূপে প্রতিবিম্বিত একই সূর্য্যের সাহায্যে জলস্থিত আভাসকে চিনিতে পারে, ও জলস্থিত আভাসের দ্বারা নিষ্কল আকাশস্থ সূর্য্যকে দেখিতে পায়, তদ্রূপ দেহের ক্ষেত্রে স্থূল অহংকে সর্ব্বাত্মক ভাব বুঝিয়া, ইন্দ্রিয় বা সূক্ষ্ম ক্ষেত্রে প্রকটিত অহংকে জানিয়া, তদ্দ্বারা মন বা কারণস্থিত অহংকে বুঝিয়া, শুদ্ধ অহংকারে গতির অনুধাবন করিয়া নিষ্কল পরম আমিকে বুঝিতে পারা যায় “এবং ভূতেন্দ্রিয় মনোময়ৈঃ দেহেন্দ্রিয়মনোভিঃ অবচ্ছিন্নৈঃ স্বাভাসৈঃ আত্মপ্রতিবিম্বৈঃ ত্রিবৃৎ ত্রিগুনোঽহংকারঃ সতঃ ব্রহ্ম আভাস যস্মিন্ তেন রূপেন লক্ষিতঃ—শ্রীধর।”

অহংকারের এক অহং অভিমুখী আভাস আছে বলিয়া বিষয় ও তাহাতে প্রতিবিম্বিত অহং ভাব গৃহীত হয়। এবং বহু জাতীয় বদ্ধভাবাপন্ন অহং ভাব-গুলি সংগ্রহ হইলে, তাহা হইতে অহংকারের বিশিষ্ট অহং-তত্ত্বের উপলব্ধি হয়। “অহংকারস্য আভাসং বিনা বিষয়াভাসানুপপত্তেঃ”—শ্রীধর। তৎপরে সর্ব্বভাবে এক অহংরূপে পরিসমাপ্তির প্রবৃত্তি দমনে ও মহাবিদ্যার অনুগ্রহে যখন হৃদয় হইতে বিশিষ্ট অহং পিপাসা দূর হয়, তখন অহংকে পরাগতিরূপে বুঝিয়া পরম আমিতে উপনীত হয়। কারণ অহংকাররূপ গতিটি সেই সৎ ‘পরম আমির’ আভাস বা ইঙ্গিতের জন্য আছে। “অনেন অহংকারেণ সদাভাসবতা সত্যদৃক্ পরমার্থজ্ঞপ্তিরূপ আত্মা লক্ষিত ইত্যর্থঃ” ;—শ্রীধর।

অহংকার তত্ত্বের স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে স্পষ্ট নির্দ্ধারিত হইয়াছে। বৃত্তিগুলিকে আত্মা-অভিমুখী করিবার জন্য অহংকার তত্ত্বের খেলা। কিন্তু ভেদ-বুদ্ধি বশে জীব আপনাকে বিশিষ্ট বলিয়া মনে করিলে, তখন অহংকার তত্ত্ব সেই ভেদাত্মক অহং জ্ঞানকেই পরিবর্দ্ধিত করে। তা'ই ভাগবত বলিলেন,—

ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়মনো বুদ্ধ্যাদিষ্বিহনিদ্রয়া।
লীনেষ্বসতি যস্তত্র বিনিদ্রো নিরহংক্রিয়ঃ॥ ভাঃ—৩।২৭।১৪।

ভূতসূক্ষ্ম ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধি প্রভৃতি লীন হইলে অর্থাৎ ইহারা ব্যক্ত বিশিষ্ট 'অহং' ও তাহার বৃত্তি বা বিষয়রূপে যে পর্য্যবসিত হয়, সেই প্রাকৃতিক খেলার নিবৃত্তি হইলে, জীব বিগত-সংসার-নিদ্রা ও নিরহংকার হয়। ইহা প্রথম বা প্রাকৃতিক ভাবের উপদেশ। তারপর যখন অহৈতুকী ভক্তি ও স্বধর্ম্মানু সরণের দ্বারা নির্ম্মল মন ও বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়, যখন শুদ্ধ শ্রীভগবানের কথা বা শাস্ত্র শ্রবণে চিত্তে বিশিষ্ট অহংকারের অতীত তত্ত্বের অববোধ হয়, যখন অভেদ বুদ্ধিরূপ জ্ঞানের সাহায্যে সেই তত্ত্ব দৃষ্ট ও বৈরাগ্যের দ্বারা পরম তত্ত্বের নিষ্কলত্ব সিদ্ধ হয়, যখন তপস্যা যুক্ত যোগ ও তীব্র পরম অহং-অভিমুখী সমাধি-দ্বারা ভেদবুদ্ধি দগ্ধ হয়, তখন কাষ্ঠ হইতে অগ্নি উদ্গত হইয়া যেরূপ কাষ্ঠকে দগ্ধ করিয়া স্বয়ং নিবৃত্ত হয়, তদ্রূপ প্রকৃতির ভোগে যেন জায়মান অহংবুদ্ধি সর্ব্বাত্মিকা জ্ঞানে নির্ম্মলীকৃত হইয়া, সর্ব্বভাবকে ভস্ম করিয়া পরম অহং-তত্ত্বে স্বয়ং নিবৃত্ত হয়।

অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা।
তীব্রয়া ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুত সংভৃতয়া চিরম্॥
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেণ বলীয়সা।
তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্।
তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ॥ ভাঃ--৩।২৭।২১।২২।২৩।

শৈবী-শক্তি যতক্ষণ বিশেষামুখী হইয়া খেলেন্, ততক্ষণ অহংকার-গ্রন্থি চৈতন্য-শক্তিকে প্রকৃত অহংএ মিশিতে দেয় না। অহংকারের কোন দোষ নাই; কারণ অহংকার না থাকিলে বৃত্তি সকল হইতে প্রকৃত অহং-বুদ্ধি উদ্ভূত হইতে পারে না। অহংকারের দ্বারাই প্রাকৃতিক বাহ্য ভাবরাশি পরম অহংকে

নির্দ্দেশ করিতে পারে। কিন্তু অহংকারের বিশিষ্ট খেলায় যিনি মুগ্ধ, যিনি ঐ খেলাটীকে ইঙ্গিত মাত্র বলিয়া বুঝিতে না পারেন, তিনি অহংকারে বিমূঢ় হইয়া আপনাকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করেন। সেইজন্য শ্রীধর বলিলেন,—"ন প্রকৃতি-সম্বন্ধমাত্রং বন্ধহেতুঃ, কিন্তু গুণবুদ্ধ্যা তদাশক্তিঃ; তন্নিবৃত্তৌ সত্যাং মোক্ষোঽপি ঘটতে।" অর্থাৎ প্রকৃতির সম্বন্ধ মাত্র বন্ধের হেতু নহে। কিন্তু প্রকৃতির গুণ সকলকে ভেদাত্মক 'আমার' বলিয়া মনে করিলে ও গুণগুলি যে পরম আমিকে দেখাইবার জন্য তাহা না বুঝিলে তাহাতে আসক্তি হয়; এবং সেই আসক্তি বশতঃ ছিন্ন অহং-জ্ঞান প্রবৃদ্ধ হয়। কিন্তু ভগবানের গুণ শ্রীভগবানকে ফিরাইয়া দিলে ও প্রাকৃতিক তত্ত্বগুলিকে সর্ব্বদা শ্রীভগবানের ব্যঞ্জক বলিয়া তদ্ভাবে ব্যবহার করিলে, গুণ-সম্বন্ধ আমাদের অহংকে ছাড়িয়া দিয়া পরম অহংএ সংযুক্ত হয়। ফলে যে কার্য্য কারণ ও কর্ত্তারূপ সম্বন্ধ ও বোধের দ্বারা অনন্ত যুগ ধরিয়া ক্ষুদ্র অহংকে পরিতুষ্ট করিয়া আসিতেছিলাম, সেই সম্বন্ধ-বুদ্ধি—অনন্ত-বুদ্ধি সর্ব্বস্বরূপ শ্রীভগবানে লীন হইলে, অহং গ্রন্থির মোহ অতিক্রম করা যায়। সেই জন্য Light on the Path বলিলেন,—Live in the Eternal * * * this giant weed cannot function there।

পুরাকালে শুম্ভ নিশুম্ভ নামে দুই দৈত্য ছিল। ইঁহারা অহংকারের বিশিষ্টতা-মূলক প্রবৃত্তি। শুম্ভকে আমরা Individuality ও নিশুম্ভকে Personality বলিয়া লক্ষিত করিতে পারি। দুইটীই বিশিষ্ট অহং স্থাপনের অভিমুখে প্রবৃত্ত। তবে একটীর ক্ষেত্র অবিশেষ ভাব ও তত্ত্ব সকল; অপরটী দেহাভিমান নামে আমাদের ভিতর এখনও খেলা করিতেছে। চৈতন্যের সমস্ত বৃত্তি ও ভাবরাশিকে অহং অভিমুখে আকর্ষণ করাই ইহাদের ধর্ম্ম। সেই জন্য কামরূপী উভয় ভ্রাতা সূর্য্য, চন্দ্র, কুবের, যম ও বরুণের অধিকার কর্ষণ করিয়া ভোগ করিতে লাগিল।

তাবেব সূর্য্যতাং তদ্বদধিকারং তথৈন্দবম্।
কৌবেরমথ যাম্যঞ্চ চক্রাতে বরুণস্য চ ॥ চণ্ডী ৪।১।৩।

শুম্ভ,—ইন্দ্রের ক্ষেত্র, ঐরাবত, তাঁহার পারিজাত প্রভৃতি ভোগ্য ও এমন কি ব্রহ্মার অদ্ভুত হংসযুক্ত রত্নভূত বিমান, কুবেরের মহাপদ্মরূপ নিধি, সমুদ্রের মহাপদ্ম রত্নমালা হরণ করিয়া আপন ভোগে প্রযোজিত করিল। * ব্রহ্মার

* চণ্ডী ৩।২।৯৪—৯৮।

এই বাহনের নাম হংস। ইহাই 'অহং-স'রূপ অহং প্রধান বা অহং-অভিমুখী বিশ্বাত্মিকা চৈতন্য-গতি। নিবৃত্তি মার্গে এই গতিকে সোঽহং বা স-পরতত্ত্বাভিমুখী বলিয়া অহংকে পরতত্ত্বে লীন করিতে হয়। শুম্ভ এই হংস-বাহিনী গতিকে অধিকার করিয়াছিল। সেই বিশিষ্ট অহং-জ্ঞানে জীব নিম্ন দেহাদি অতিক্রম করিয়া ত্রিলোকীর উপরে অবস্থান করিতে পারে। "অবিদ্যয়া মৃত্যু তীর্ত্বা" (ঈশোপনিষৎ)। সেইজন্য শুম্ভ মৃত্যুর উৎক্রান্তিদা নামক শক্তি হরণ করিয়াছিল, "মৃত্যোরুৎক্রান্তিদানাম শক্তিরীশ ত্বয়া হৃতা।" যাঁহারা স্থূল শরীরাদি ত্যাগ করিয়া উচ্চতর লোকে বিশিষ্ট অহং জ্ঞানের সহিত কার্য্য করাকে ঐশ্বরিক শক্তি বলিয়া ভাবেন, তাঁহারা এই কথাটী যেন স্মরণ রাখেন।

নিশুম্ভের কার্য্য ক্ষেত্র নিম্নতর; তিনি বরুণের পাশ-শক্তি হরণ করিয়াছিলেন। যে কামনা বা তৃষ্ণাশক্তির বশে প্রাকৃত জীব বদ্ধ, তাহাকে বরুণ-পাশ বলে। আধুনিক হিপ্‌নটিস্‌ম বিদ্যা এই পাশের একটী সামান্য অংশ মাত্র। এই পাশের অংশমাত্র ব্যবহার করিয়া, আজ কালকার বক্তাগণ শ্রোতার চিত্তে রাগ দ্বেষের মায়া জাল সৃষ্টি করিয়া শ্রোতৃবর্গকে কবলিত করেন। সে যাহা হউক দেবতারা এইরূপে হৃতাধিকার হইয়া সর্ব্বাত্মিকা শৈবী-চৈতন্যের শরণাগত হইলেন; এবং সেই মহান্ প্রকৃতিকে স্তব করিতে লাগিলেন। এই স্তবেও একটু রহস্য আছে। চেতনা, বুদ্ধি· নিদ্রা, ক্ষুধা প্রভৃতি ভাবরাশিকে অহংকারে বদ্ধ জীব 'আমার' বলিয়া ভাবে। দেবতারা সেরূপ ভাবে দেখেন না। তাঁহারা দেখেন, যে ঐ সকল ভাব সেই পরম প্রকাশশীলা, ব্রহ্ম-প্রকাশিনী চৈতন্যময়ী দেবীরই। এইরূপে সমস্ত ভাবরাশিকে সেই সর্ব্বাত্মিকা চৈতন্যে পুনরার্পণ করিবার জন্যই দেবতাদের স্তব। ইহাই যোগশাস্ত্রের সমাধি। প্রত্যয় সকল একতান হইয়া ধ্যানাবস্থা সিদ্ধ হইলে, যখন ধ্যেয় বিষয় মাত্রই নির্ভাসিত হয়, যখন ধ্যাতা স্বরূপ-শূন্য হয়, তখনই সমাধি। "তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব সমাধি।" পাতঞ্জল

যিনি—যে ব্রহ্ম-চৈতন্য পরম অব্যক্ত পরম পুরুষকে সত্ত্ব রজ ও তমোগুণের স্রোতে ফেলিয়া ব্যক্ত করেন;—যিনি সেই অবিভাজ্য পরম অহংকে অর্থরূপে বিভক্ত করিয়া প্রকট করেন;—যিনি নিবৃত্তিমুখে পুনরায় বহু অর্থ হইতে এককে এবং সত্ত্ব রজঃ তমোগুণ হইতে গুণাতীত ভগবানকে প্রকাশ করেন, তাঁহাকেই বিষ্ণুমায়া বলে। "অব্যক্তং ব্যক্তরূপেণ রজঃসত্ত্বতমোগুণৈঃ।"

"বিভজ্যয়ার্থং কুরুতে বিষ্ণুমায়েতি সোচ্যতে"—কালিকাপুরাণ॥ দেবতারা ব্রহ্ম-চৈতন্যে সমাহিত হইবার পর, পরমাদেবী পার্ব্বতী গঙ্গাস্নান ব্যপদেশে দেবতাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনারা কাহার স্তব করিতেছেন। তৎক্ষণাৎ তাঁহার শরীর-কোষ হইতে শিবা-নাম্নী আদ্যাশক্তি সমুদ্ভূতা হইয়া বলিলেন, দেবতারা আমার স্তব করিতেছেন। ব্রহ্মময়ী পার্ব্বতীর শরীর হইতে বিনির্গতা কৌষিকী দেবী নিত্য হিমালয়ে কালিকামূর্ত্তিতে অবস্থিতা আছেন। সেই কৌষিকীদেবীর পদতলে শিবমূর্ত্তি নাই। যে স্বরূপাত্মিকা ব্রহ্ম-চৈতন্য সদা শিবাভিমুখিনী হইয়া আছেন, যিনি সর্ব্বতোভাবে 'সর্ব্বকে' নাশ করিয়া, কেবলমাত্র সোঽহংরূপ শিবরূপে বর্ত্তমানা, যিনি অব্যবহার্য্যা, তাঁহাকে ত' দৈত্য-বধ করিতে হইবে না। তাঁ'র খেলায় সৃষ্টি নাই, লয় নাই, দেবতা নাই, দৈত্যও নাই; আছে কেবল শিবম্ সুন্দরম্ শান্তম্ অদ্বৈতম্। সুতরা তাঁহার অংশ মাত্র যাহা বিষ্ণুমায়ারূপে কোষে অধিষ্ঠিত হইয়া কোষস্থ সর্ব্বকে পরম 'আমির' দিকে লইয়া যাইতেছে, সেই বহু ভাবের অপ্রকাশকারিণী সুতরাং কৃষ্ণা, কৌষিকী দেবীকেই অহংকার-গ্রন্থির মোহ নাশ করিতে যুক্ত করা যায়। বাহিরের 'সর্ব্বকে' পরম 'আমির' দিকে প্রেরণা করাই কোষিকী চৈতন্যের খেলা। ইনি কৃপান্বিতা হইয়া স্বরূপভাবে খেলেন না বলিয়া, আমরা বিশিষ্ট 'অহং'-স্থাপন করিতে পারিতেছি। ভক্ত ইঁহার কৃপা প্রাপ্ত হইয়া কোষাতীত হইলে, তবে মহাবিদ্যা পার্ব্বতীদেবীর কৃপায় শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। এখন শুধু অহংকার তত্ত্বের গ্রন্থিচ্ছেদ আবশ্যক; সুতরাং ব্রহ্ম চৈতন্যের অংশমাত্রেই তাহার সম্ভব হইবে। কোষে অধিষ্ঠিতা সর্ব্বপ্রকাশ-স্বরূপিণী সেই কৌষিকী শক্তির কৃপাবলে মানব বিশ্ব আলোচনা করিয়া আসিতেছে। 'সর্ব্ব' ও 'অহং'কে একত্রে মিশাইয়া অহংজ্ঞানকে সর্ব্বাত্মিকা করিবার জন্যই তাঁহার খেলা। কিন্তু ভ্রান্ত জীব সেই কৌষিকী শক্তির কৃপায় জগদ্বস্তু লাভ করিয়া, তাঁহার কৃপায় বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহাকেই পত্নী রূপে গ্রহণ করিতে প্রয়াস করে। যে শক্তিমাত্রায় দেহাদি ভাবের সংগঠন হয়, সেই শক্তিমাত্রাই অধিকতর বলশালী হইলে শরীরকে ভাঙ্গিয়া দেয়। যে 'অহং' নির্দ্দেশ শক্তিবশে জীব সর্ব্ব ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াও তদ্দ্বারা বিশিষ্ট আমি সংসিদ্ধি লাভ করে, সেই শক্তিই অহঙ্কারের মোহ নাশ করিতে সক্ষম।

দূত মুখে কৌষিকীদেবীর বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে ভার্য্যারূপে গ্রহণ করিতে

শুম্ভের প্রবৃত্তি হইল। এই প্রবৃত্তিই তাহাকে ভগবচ্ছক্তির সহিত সংযোজিত করিল। রাগ হউক আর দ্বেষই হউক, যে কোনও ভাবে ভগবানকে ধ্যান করিলে, তাঁহার সন্নিধি লাভ হয়। যেমন ক্ষুদ্রমতি সাধক সকামভাবে ভগবানকে অবলম্বন করিয়া, তাঁহার পরম চৈতন্যের সংস্পর্শে কাম ত্যাগ করিতে সক্ষম হয়, তদ্রূপ অভিকর্ষণশীল শুম্ভ সেই মহাশক্তিকে অভিকর্ষণ করিতে গিয়া নিজেই রূপান্তরিত হইবে।

বিশিষ্ট অহংজ্ঞানে নিবদ্ধ শুম্ভ দেবীকে বলিয়া পাঠাইল "সা ত্বমস্মানুপাগচ্ছ যতো রত্নভুজো বয়ম্।" "যেহেতু 'আমরাই' যাবতীয় চৈতন্য-রত্নের ফলভোগী, সেই হেতু রত্নস্বরূপা তুমিও আমাদিগেরই ভোগ্য।" "এতদ্‌বুদ্ধ্যা সমালোচ্য মৎ পরিগ্রহতাং ব্রজ॥" এমন কি বুদ্ধি দ্বারা সমালোচনা করিয়া দেখিলে বুঝিবে যে বিশিষ্ট 'আমি'ই চৈতন্যের একমাত্র অবলম্বন। ভাই, শুম্ভকে দোষ দিও না, আমরাও ত' শাস্ত্র ও ধৰ্ম্মালোচনা করিতে গিয়া শ্রীভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া শিব গড়িতে যাইয়া ক্ষুদ্র অহঙ্কারের প্রতিচ্ছায়া মর্কটরূপী অহঙ্কারের উপাসনা করিয়া বসি। ভগবানের উপাসনায় স্বীয় উচ্চাধিকার প্রার্থনা করি। ভগবানকে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রার্থনা করি বটে, কিন্তু সেই ভাবী অবতার খেলার মধ্যে নিজের বিশিষ্ট স্থান ও মর্য্যাদার কথা ভুলি না।

দূতমুখে সংবাদ শ্রবণে দেবী উত্তর করিলেন, তুমি সত্যই বলিয়াছ। শুম্ভ ত্রিভুবনের একছত্রাধিপতি। কিন্তু কি করিব, অল্পবুদ্ধি বশতঃ পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি "যো মাং জয়তি সংগ্রামে যো মে দর্পং ব্যপোহতি। যো মে প্রতিবলো লোকে স মে ভৰ্ত্তা ভবিষ্যতি॥" চণ্ডী ১১২০। বুদ্ধির অবসান বা অহংরূপে পরিসমাপ্তির খেলাটি ভগবতী দেবীর ভগবৎ-মহিমা-প্রকাশরূপ স্রোতের এক অংশ মাত্র। সমস্ত বিশ্ব ব্যাপিয়া এই পর শিবাভিমুখী স্রোত বহিতেছে; সমগ্র বিশ্ব ব্যাপিয়া সেই মহাসঙ্গীতের ধ্বনি ও রেশ চলিতেছে। জৈবী-বুদ্ধির 'অহং'-অভিমুখী প্রয়াসটা এই স্রোতের অতি সামান্য ব্যঞ্জনা মাত্র। বিশিষ্ট অহং বুদ্ধি হ্রাস হইয়া যখন সর্ব্বাত্মিকা পরা প্রবৃত্তিতে মিশিয়া যায়, তখনই মহাদেবীর লীলার আভাস পাওয়া যায়। বহু-শাখা, অনন্ত বুদ্ধির প্রবৃত্তি বশে, আমরা সেই পরমা স্রোতের কথা ভুলিয়া যাই। তাঁহাতে সেই বুদ্ধির খেলা নাই বলিয়াই তিনি 'অল্পবুদ্ধি'।

শুম্ভ তাঁহার ভাব বুঝিতে পারিল না। সে বুঝিল না যে সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তির বিপরীত ভাবে 'সর্ব্বের' নাশ হইলে, তবেই পরম অহংতত্ত্ব সিদ্ধ হয়। সে বুঝিল না যে সেই 'শিবম্ সুন্দরং' অদ্বৈত তত্ত্ব ভিন্ন আর কেহই সেই 'সর্ব্ব' বিনাশিনী শক্তির কাছে দাঁড়াইতে পারে না। এই জন্যই শিবতত্ত্বকে তমোময় বলিয়া বর্ণনা করা হয়। কারণ সেই মহান্ তমঃ ভিন্ন চৈতন্যময়ীর সর্ব্বভাবের সম্প্রসারণ ও সংহরণ এই উভয়াত্মক ব্যাপারের মধ্যে আর কা'র 'আমি' স্থির থাকিতে পারে? আমাদের ছোট অহং 'প্রতিসন্ধান' বা বিপরীত ভাবে সংযোগের ফল। আমরা 'প্রতি' শব্দে 'বিরুদ্ধ' ভাবই বুঝি। সেই জন্য সর্ব্বাত্মিকা দেবীর প্রকাশ হইলে, তাহার বিশেষ দ্রষ্টারূপে আমাকে স্থাপনা করিতে ব্যস্ত। সর্ব্বাত্মিকা 'সর্ব্ব'কে 'অহং'এর প্রতি বা অভিমুখে ও অনুকূলে মিশাইয়া দিতে চেষ্টা করিতেছেন; কিন্তু আমরা কি সম্পূর্ণভাবে 'আমি' ও 'সর্ব্ব'কে মিশাইতে পারি? আমাদের ভয় হয় যে তাহা হইলে 'আমি'টাও হারাইবে। আমাদের 'প্রতি' শব্দের অর্থ 'বিরুদ্ধ', আমরা জোর করিয়া সর্ব্বাত্মিকার খেলা স্তম্ভন করিবার চেষ্টা করি, যাহাতে সর্ব্ব 'আমার' পর্য্যন্ত হয়, যেন 'আমিতে' না মিশিয়া যায়। শুম্ভও দেবীর বাক্যের অর্থ বিরুদ্ধভাবে বুঝিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল।

যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সর্ব্ব প্রথমে ষাট হাজার সৈন্যের নায়ক ধূম্রলোচন দেবীকে কেশাকর্ষণপূর্ব্বক আনয়ন করিতে প্রেরিত হইল। এক 'হুঙ্কারে' ধূম্র লোচন বধ হইল। তারপর চণ্ডমুণ্ড নামক দুই সেনাপতি চতুরঙ্গ বল সহিত যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইল। সেই সময় দেবীর ললাটদেশ হইতে করালবদনা কালী মূর্ত্তি বিনিঃসৃতা হইলেন এবং চণ্ডমুণ্ডের সৈন্য সকল চূর্ণিত করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। অবশেষে 'হুং' মন্ত্রে তাহাদের বধ সাধিত হইল।

চণ্ডমুণ্ড বধের পর প্রতাপশালী অসুরগণ সবলে অভিযান করিল। কম্বু, শম্ভ, ধৌম্র, কীলক প্রভৃতি বিভিন্ন অসুর জাতীয় যোদ্ধৃগণ মহাসহারোহে যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। এই সময়ে,—

"ব্রহ্মেশগুহবিষ্ণুনাং তথেন্দ্রস্য চ শক্তয়ঃ।
শরীরেভ্যো বিনিষ্ক্রম্য তদ্রূপৈশ্চণ্ডিকাং যযুঃ॥"

অসুরগণের বিনাশ জন্য এবং দেবতাগণের কল্যাণ-সাধনানুরোধে ভগবানের প্রকাশ মূর্ত্তি ব্রহ্মাদি দেবগণের শক্তিগণ তত্তৎ দেবতার শরীর হইতে বিনির্গত

হইয়া, যে দেবতার যেমন রূপ, যেমন বসন, যেমন ভূষণ, যেমন বাহন, সেই মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অসুর বধে আগমন করিলেন। ইঁহাদের নাম যথাক্রমে, ব্রাহ্মী বা ব্রহ্মাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, বৈষ্ণবী, যজ্ঞবরাহের মহাশক্তি—বারাহী, নৃসিংহের মহাশক্তি নারসিংহী, ইন্দ্রের শক্তি—ঐন্দ্রী এবং কালী ; ইঁহাদিগকে অষ্টমাতৃকা বলে। ইঁহারা সকলে সর্ব্বাত্মিকা ও সংযোগিনী শক্তি। 'সর্ব্বের' ভাবে পুনরায় ভগবানের একত্বের ব্যঞ্জিকা। শক্তিসকল আবির্ভূতা হইলে, দেবী স্বয়ং মহাদেবকে দৌত্যে লিপ্ত করিয়া শুম্ভ নিশুম্ভের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। বলিলেন,—

"ত্রৈলোক্যমিন্দ্রো লভতাং দেবাঃ সন্তু হবির্ভুজঃ।
যূয়ং প্রযাত পাতালং যদি জীবিতুমিচ্ছথ॥"

"যদি অহংকারের অভিকর্ষণ ত্যাগ করিয়া দেবতার স্ব স্ব অধিকার প্রত্যর্পণ করিতে পার তবেই তোমাদের রক্ষা ; নচেৎ তোমাদের ধ্বংস করিয়া পুনরায় সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে।"

মহাদেবকে দৌত্যে প্রেরণ ব্যাপারে একটী মহান্ সত্যের ইঙ্গিত করা হইয়াছে। প্রত্যেক তত্ত্বের চারিটী ভাব আছে। তন্মধ্যে তিনটী ত্রিগুণাত্মক ও ব্যক্ত-ভাবে শ্রীভগবানের 'সর্ব্ব'-স্বরূপের অভিব্যঞ্জক। তমোভাবে অধিকরণ বা অহংকারের তত্ত্বাংশ ; রজোভাবে অহংকারের অহং-অভিমুখিনী শক্তি ও সত্ত্ব অংশে অধিষ্ঠাতারূপ রুদ্রাংশ,—এই তিনের উপরে যেভাবে তত্ত্ব ও প্রকাশিত বহু বা সর্ব্বভাবে না খেলিয়া, পরাভাবে শুদ্ধ ভগবানকে ইঙ্গিত করে, তাহাকে উপাস্য বা ত্রিগুণাতীত ভাব বলে। শিব বা মহাদেব এই উপাস্যরূপী আত্মা। এই শুদ্ধ বিশ্বাদ্য, বিশ্ববীজ, নিখিল-ভয়হর, আনন্দ ঘন, 'আমিকে' ইঙ্গিত করিবার জন্যই ত্রিগুণের মধ্য দিয়া অহংকারের খেলা। কোটী কোটী জন্মে 'আমি রাম,' 'আমি শ্যাম,' 'আমি বুদ্ধি,' বা 'আমি দেবতা' ইত্যাকার বিশিষ্ট বুদ্ধিতে, জীব যে 'আমি' ও তাহার প্রকাশ ক্ষেত্ররূপ 'আমার' ভাব ছড়াইয়া আসিতেছে, সেই ছড়ান 'আমার' ও 'আমি' কণাগুলি মহাবিদ্যার সাহায্যে অভিমান শূন্য হইয়া, সংগ্রহ করিলে, ধীর সাধক বুঝিতে পারে যে 'আমি'টী প্রকৃত পক্ষে অব্যক্ত, অদ্বৈত, সান্ত, শিব স্বরূপ। শিব-তত্ত্বই অহংকার-তত্ত্বের পরিসমাপ্তি। শিব-তত্ত্বের ভাষাই অহংকারী জীব অপরিস্ফুটভাবে

বলিবার চেষ্টা করিতেছে। সেই জন্যই ইতিহাস ও পুরাণে দেখা যায়, যে দৈত্য ও অসুরেরা প্রায় সকলেই শিবোপাসক এবং সর্ব্বাত্মিকা চৈতন্যময়ীর ভাষা বুঝিতে না পারিয়া ভেদভাবে আপনার শিবত্ব নিষ্কলত্ব ও ব্যক্তাতীতত্ব ভাব সিদ্ধ করিতে চেষ্টা করে; সেই জন্যই দেবী শিবকে দৌত্যে প্রেরণ করিলেন। যদি একবারও শিবত্বের ভাষা তাহাদের অহংকারের ভিতর ফুটিয়া উঠে।

শিব-দৌত্য বৃথা হইল; হওয়া ত' চাই-ই। না হইলে জীব শুদ্ধ অহংকার লইয়াই থাকিত। অহংকারের লক্ষ্য ও লয়স্থান পরম অহংকে চিনিতে পারিত না। 'রক্তবীজ' নিহত হইলে ও তাহার নিধনে অহংকার-শক্তি নিষ্প্রভ হইলে, নিশুম্ভ যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। চক্র ও ত্রিশূলের দ্বারা দেবী নিশুম্ভের চর্ম্ম, খড়্গ ও শূল প্রভৃতি বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল। অবশেষে শূলের দ্বারা চণ্ডিকা দেবী নিশুম্ভের বক্ষঃস্থল বিদারিত করিলেন। এই সময় এক আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল।

ভিন্নস্য তস্য শূলেন হৃদয়ান্নিঃসৃতোঽপরঃ।
মহাবলো মহাবীর্য্যস্তিষ্ঠেতি পুরুষো বদন্॥

নিশুম্ভ হত হইলে, শুম্ভ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "হে বল গর্ব্বিতে দুর্গে! তুমি গর্ব্ব করিও না; কেননা তুমি ব্রহ্মাণী প্রভৃতি অন্যের শক্তি লইয়া যুদ্ধ করিতেছ।" দেবী কহিলেন,—

একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা।
পশ্যৈতা দুষ্ট ময্যেব বিশন্ত্যো মদ্বিভূতয়ঃ॥

"এই জগতে আমি এক চৈতন্যই আছি। সমস্ত আমারই অভিব্যক্তি, আমা ব্যতীত দ্বিতীয় কিছু নাই। রে দুষ্ট! দেখ এই আমার বিভূতিগণ আমাতেই পুনরায় লীন হইয়া যাইতেছে।" সর্ব্বভাব থাকিতে অহংকারের নাশ হয় না। সর্ব্বভাব থাকিলেই ভেদ বিশেষের প্রবণতা থাকে। সর্ব্ব বা বহুকে এক অভিমুখী করিয়া চিন্তা করার নাম **ধারণা**; তারপর 'সর্ব্ব' হইতে উত্থিত চৈতন্য-স্রোত গুলিকে বা প্রত্যয়কে এক করিয়া তৈল-ধারার ন্যায় চিত্ত যখন একের অভিমুখে প্রধাবিত হয়, তাহার নাম **ধ্যান**। ধ্যানে 'সর্ব্ব' স্রোতে মিশিয়া যায়, কিন্তু তখনও গতি আছে; কাজেই বিশিষ্টতার চিহ্ন আছে। তারপর যখন প্রাণ, মন, ইন্দ্রিয়েরা সকলে সর্ব্ব ও সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি ত্যাগ করিয়া ঘন

একত্বে মিশিয়া যায়, তখন আর ভেদ বিবক্ষার চিহ্নমাত্র থাকে না। ইহাই প্রকৃত যোগ, ইহাইপ্রকৃত অহংএর স্বরূপ অভিব্যক্তি। এই 'পর' মহা-ঘন একত্বেই অহংকার তত্ত্ব নিঃশেষিত হইয়া আত্ম-স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

"একত্বং প্রাণমনসো রন্দ্রিয়ানাং তথৈব চ।

'সর্ব্ব'ভাবপরিত্যাগো যোগ ইত্যভিধীয়তে॥'" মৈত্রায়ণ্যুৎপনিষৎ ২৫॥

সেই জন্যই শুম্ভ বধের নিমিত্ত মহাদেবী ব্রহ্মময়ী চৈতন্য-স্বরূপিণী তাহার সর্ব্বাত্মিকা বিভূতিগুলি আপনাতে সংহৃত করিয়া বলিলেন,—

"অহং বিভূত্যা বহুভিরিহরূপৈর্যদাস্থিতা।

তৎসংহৃতং ময়ৈকৈব তিষ্ঠাম্যাজৌ স্থিরো ভবঃ॥"

"আমি বিভূতি সকলের দ্বারা যে বহুরূপে সমাপ্ত হইয়া খেলিতেছিলাম, সেই সকল বিভূতি এখন সংহরণ করিলাম; আমি একাই রহিলাম। হে দৈত্য! তুমি স্থির হও।" যখন চৈতন্যময়ী 'সর্ব্ব'ভাব পরিত্যাগ পূর্ব্বক একে উপরতা হয়েন, তখনই প্রকৃত ব্রহ্ম বা ভগবত্তত্ত্ব আবিষ্কৃত হয়। যখন তিনি সেই 'পরম আমিতে' অনুগত, তখন আর ব্যক্ত ভাব থাকে না। ব্যক্তের আশ্রয়চ্যুত হইলে বিশিষ্ট অহংজ্ঞান থাকিতে পারে না। তখন 'অ' হইতে 'হ' পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যক্ত ভাব লীন হইয়া 'ম' রূপ পরাগতিতে অনাহত নাদে ব্যক্ত 'বিশিষ্ট' অহং লীন হইয়া যাইতে থাকে। কালে সংসিদ্ধ হইয়া এই মহা-সমাধিতে ব্যক্ত 'অহং' লীন হয়।

"ততো নিযুদ্ধং সুচিরং কৃত্বা তেনাম্বিকা সহ।

উৎপাত্য ভ্রাময়ামাস চিক্ষেপ ধরণীতলে॥" চণ্ডী ৩।২৪

তত-উদগাদনন্ত তব ধাম শিরঃ পরমং।

পুনরিহ যৎ সমেত্য ন পতন্তি কৃতান্তমুখে। ভাঃ ১০।৮৭।১৮

সমাধির ঘনাবস্থায় যখন হৃদয় হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রের অভিমুখে পরম গতি প্রকট হয়, তখন সেই স্রোতে পড়িলে আর সংসারে ফিরিতে হয় না। এই অননী ভাব বিক্ষেপ রহিত অর্থাৎ ব্যক্ত সর্ব্বভাবে অতিগ হইয়া লয় রহিত, বা অজ্ঞানে বিলীন হয় না; তখন জীব পরমপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। হৃদয়ে পর-পুরুষাভিমুখী ভক্তিতে 'সর্ব্ব'ভাবকে বিলীন করিয়া, হৃদয়ের রক্তে সাধকের অস্তিত্ব-বুদ্ধি ধৌত হইলে, তৎপরে যদি সেই পর-পুরুষাভিমুখী আকর্ষণ থাকে,

তাহা হইলেই অজ্ঞানের লয়ে অহং লীন হয় না। সেই জন্য Light on the Path বলিলেন ;—Before the soul can stand in the presence of the Master, it feel must be washed in the blood of the heart.—হৃদয়ের রক্তে জীবের চরণ ধৌত না হইলে, জীব পরম গুরুর সমক্ষে দণ্ডায়মান হইতে পারে না।

লয়বিক্ষেপরহিতং মনঃকৃত্বা সুনিশ্চলম্।
যদা যাত্যমনীভাবং তদা তৎ পরমং পদম্॥
তাবন্মনো নিরোদ্ধব্যং হৃদি যাবদ্ গতক্ষয়ম্।
এতজ্জ্ঞানং চ মোক্ষং চ শেষান্যে গ্রন্থবিস্তরাঃ॥ মৈত্রায়ণ্যুপনিষৎ।

যাবৎ পর্য্যন্ত হৃদয়ে আসিয়া সর্ব্বাভিমুখী অজ্ঞানের স্রোত নিরুদ্ধ না হয়, তাবৎ মনের নিরোধ কর্ত্তব্য। ইহাই সর্ব্বশাস্ত্রের উপদেশ। কারণ বিশিষ্টতা ভাবই পৃথক বহু ভাবের কারণ।

জীবং কল্পয়তে পূর্ব্বং ততো ভবান্ পৃথগ্বিধান।
বাহ্যানাধ্যাত্মিকাংশ্চৈব যথাবিদ্যস্তথাস্মৃতিঃ॥
অনিশ্চিতা যদা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিতা।
সর্পধারাদিভির্ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ॥ মাণ্ডুক্য কারিকা।

অন্ধকারের অস্পষ্টালোকে যেমন রজ্জুতে 'সর্ব্ব'ভাবের 'সর্প' 'জলধারা' প্রভৃতি সাদৃশ্য-গত মিথ্যাভাবের আরোপ হয় ; তদ্রূপ অহংই, বিশিষ্টতারূপ মন্দান্ধকারে, জীব, ক্রিয়া, কারক ও ফলভেদে নানাবিধ বাহ্য আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক বহু বা 'সর্ব্ব'ভাবের কল্পনা করেন। পরন্তু যখন ব্রহ্মাত্মিকা ব্রহ্মযোনি আনন্দময়ী দেবীর কৃপায় প্রথমে 'সর্ব্বে একত্ব দর্শন' করিয়া, 'সর্ব্ব'ভাবের মধ্যে এক 'পর' পুরুষকে আভাসে দেখিয়া সর্ব্বাত্মিকা প্রেম ও জ্ঞানের সাহায্যে ভেদজ্ঞান দূরীভূত হয়, তৎপরে সেই পর-পুরুষের প্রতি অহৈতুকী আকর্ষণে তাঁহাতে সর্ব্বত্যাগী কুলটা হইয়া, অবশেষে বিশিষ্ট অহং রূপাত্মক জীব ভাবটীকেও বিনামূল্যে স্ব-প্রেমে পরপুরুষের চরণতলে বিলাইয়া দিতে পারেন তখনই,—

এবং প্রসন্ন মনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে॥

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্যকর্ম্মাণি দৃষ্টএবাত্মনীশ্বরে॥ ভাঃ—১।৩।২০,২১॥

ঘন প্রকৃষ্টরূপে 'সর্ব্ব'ভাব শ্রীভগবানে প্রয়োজিত হইলে, ক্ষুদ্র অহং-পিপাসা-ত্যাগে জীবের হৃদয়ে ভগবৎ-স্বরূপ-বিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। চৈতন্যময়ী মহা সরস্বতী বা পরাবিদ্যা রূপে হৃদয়ে খেলেন এবং জীবের হৃদয়ের অহংকার গ্রন্থি ছিন্ন হয়। 'সর্ব্ব'ভাবের সংশয় বা মন্দান্ধকারজাত মিথ্যা জ্ঞান দূর হয়। জীবের কর্ম্ম ক্ষয় হইলে ও মিথ্যা ভেদজ্ঞান 'সর্ব্ব'বুদ্ধি এবং কর্ম্ম বা গতি (Evolution) বুদ্ধি দূরীভূত হইলে, তৎ-সংস্কারজাত ক্ষুদ্র অহং জ্ঞানটীও দূর হয়। তখন অহংকে স্ব বা পর পুরুষরূপে চিনিতে পারিয়া, জীব আপনার স্বরূপে বা আত্ম-মহিমায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ভাই! এতকাল ধরিয়া যে সাধের 'অহংটী'কে ধর্ম্ম, ঐশ্বর্য্য, জ্ঞান ও ক্রিয়ার দ্বারা পরিপুষ্ট করিয়া আসিতেছ, সেই আদরের বিশিষ্ট 'অহংটী'কে পরাভক্তি ও জ্ঞানে যদি ছাড়িতে পার, তবেই জন্ম সার্থক হইবে। নচেৎ ব্রহ্মময়ী দেবী মহাবিদ্যারূপে—কৌসিকী দেবীরূপে আবির্ভূতা হইয়া তোমার শুম্ভ ও নিশুম্ভকে বধ করিবেন। অহংকার কেবল 'অহং'কে ফুটাইবার জন্য, উহা মানবের নিম্নস্তরের অভিব্যক্তির ভাবা। উহার স্থান প্রকাশিত বিশ্বের পাতালে। উহাকে লইয়া সাধনায় ও জ্ঞান-ভক্তি ব্যাপারে প্রয়োগ করিও না। উহার বশে পরম স্বরূপাভিব্যক্তি মোক্ষাবস্থাকে,—অধিকারীত্ব বা দেবতাদিরূপে সংসারে আধিপত্য লাভে পর্য্যবসিত করিও না। সত্য বটে 'সর্ব্ব'ভাব হইতে 'অহং' ভাবকে সংগ্রহ করাই অহংকারের মূল উদ্দেশ্য। অহংকারের ভ্রামরীই বীজ; ভ্রমর যেমন বিভিন্ন জাতীয় পুষ্পাদি হইতে একরস মধু সংগ্রহ করে, তেমনই অহংকার-তত্ত্ব বিদ্যাভাবে পুটীত হইয়া, বহু ও 'সর্ব্ব' ভাবাত্মক জগৎ হইতে পরমাদ্বৈত শিবরূপ মধু সংগ্রহ করিবার জন্যই আছে। সেই মধু লাভ করিলে আর কিছু লভ্য থাকে না; সে পরম পুরুষের জ্ঞানে সকল জ্ঞান নিবৃত্ত হয়। ঘন জ্ঞানে আর বৃত্তির মোহ বা ভ্রান্তি থাকে না। তবে এই পরম অহংকে পাইতে হইলে, সামবেদের সর্ব্বভূতে সমভাবে অবস্থিত একের ভাষা শিখা চাই। এ ভাষায় বিভিন্ন তত্ত্বজ্ঞান থাকে না। তখন তত্ত্ব শব্দে তৎ+ত, অর্থাৎ সেই 'পর'পুরুষের স্বপ্রকাশ ভাব লক্ষিত হয়। সূর্য্য যেমন সমভাবে সকলকেই প্রকাশ করেন, তদ্রূপ সর্ব্বপ্রকাশিকা সুতরাং সর্ব্বের অতিগ মহান্ 'জ্যোতিষামপিতদ্জ্যোতি'

রূপ তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। এই ভাষা বা জ্ঞানে প্রাকৃতিক 'সমজাতীয়' বা 'বিজাতীয়' বুদ্ধি নাই। এই ছন্দে,—ব্যক্ত অক্ষরে অক্ষরে মিল নাই। মহাবিদ্যাই এই ভাষার প্রকাশিনী শক্তি বা দেবতা। নির্ম্মল বা নিষ্কল অহং ক্ষেত্রেই এই ভাষার অভিব্যক্তি হয়। সেইজন্য অহংকারে অতিগা দেবীর উত্তম অহংকার-বিনাশিনী চরিত্রের দেবতা মহা সরস্বতী—মহাবিদ্যা, থিয়সফি বা ব্রহ্মাবিদ্যা। শুদ্ধ অহংকার তত্ত্ব বা রুদ্রই ঋষি, ভীমা হিমালয়স্থা মহাপুরুষগণের হৃদয়স্থা মহাকালাই—শক্তি। 'সর্ব্বে' অহং বা একরস গ্রহণাত্মিকা ভ্রামরী-বীজ। সূর্য্যতত্ত্ব; সামবেদ-সর্ব্বে একত্বস্বরূপ।

তৃতীয় চরিত্রের ঘটনাগুলি প্রত্যেকে ক্ষুদ্র অহং জ্ঞানে বিরক্ত, পরপুরুষে অনুরক্ত, সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিতে সুসিদ্ধ সাধকের মঙ্গলার্থে এই মহাপথের প্রতিবন্ধক বিঘ্ন ও তাহার দূরীকরণের উপায় স্পষ্টরূপে ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহা জন-সাধারণের বোধাতীত বলিয়া বিবৃত করা হইল না। তবে মহাঋষিগণের কৃপায় ও মহাদেবীর ইচ্ছা হইলে, সাধনার নিগূঢ় রহস্য ও তত্ত্ব বারান্তরে কথঞ্চিৎ উদ্ঘাটন করিবার সাধ রহিল। এ সাধ পূর্ণ হইবে কিনা তাহা পাঠকগণের হৃদয়ের ভাবের উপর নির্ভর করিবে।

মা জগদম্বে! মা ব্রহ্মময়ী! মা সদানন্দের আনন্দরূপিনী! এস, এই কলিকালের এ দুর্দ্দিনে, অহংকারের মন্দান্ধকারে, তোমার সন্তানগণের প্রতি কৃপা করিয়া তোমার সেই পরম গোত্রাকৃতি নামরূপের অতীত, অনেকের মধ্যে একাভিমুখী বিশিষ্ট লক্ষ্যের অতিগ শেষহীন অশেষ ভাবের আকর, প্রপঞ্চ বা প্রকাশিত 'সর্ব্ব'ভাবের প্রবিলাপনকারী, স্থির, আরম্ভশূন্য, পরব্রহ্মরূপ মহাভাবে একবার স্থির হও! একবার আমাদের ক্ষুদ্র 'অহং' পিপাসার মধ্যে শ্রীনন্দ নন্দনের আনন্দ-ঘন সত্ত্বা ও শান্ত অদ্বয় শিবতত্ত্বের আভাস ফুটাইয়া দাও; মা, তুমি প্রসন্ন হও নাই বলিয়াই ত', বিবেকের আলোচনা করিয়াও, বিদ্যাভাবের অনুশীলন সত্ত্বেও, শাস্ত্রাদি চর্চ্চায় নিরত হইয়াও, তোমার ভ্রান্ত সাধকগণ বিশিষ্ট 'অধিকারাদি' মমত্ব-গর্ত্তে পড়িয়া বিঘূর্ণিত হইতেছে।

"বিদ্যাসু শাস্ত্রেষু বিবেকদীপেষ্বদ্যেষু বাক্যেষু চ কা ত্বদন্যা।
মমত্বগর্ত্তেঽতি মহান্ধকারে বিভ্রাময়ত্যেতদতীব বিশ্বম্॥"

মা! দেখ তোমার শাস্ত্র-রূপ এখন ভেদবুদ্ধিতে পরিসমাপ্ত। সকলেই অধিকারী

হইবার জন্য ব্যস্ত। সকলেই তোমার জগৎ-ব্যাপারে এক একটী "কৃষ্ণ বিষ্ণু" হইবার জন্য উন্মত্ত। সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি আর আত্মাভিমুখী না হইয়া, বিভিন্ন লোক সকল আবিষ্কৃত করিতে ব্যবহৃত হইতেছে। তোমার নামের দোহাই দিয়া শ্রীভগবান বর্জ্জিত হইয়া জীব-ঘন-একত্বের পরিবর্ত্তে কত বিশিষ্ট পরস্পর বিরোধী ধর্ম্মসভা ও সমিতি হইতেছে। বিভিন্ন জাতীগণ যে তোমার ব্যক্ত শরীরের অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ, এই তথ্য ভুলিয়া গিয়া আপনাপন উৎকর্ষ স্থাপনে ব্যস্ত। মা বিমলে! তোমার প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব এখন আসুবিক শক্তিকেন্দ্র বলিয়া ও তোমার 'সর্ব্ব'-সংহননকারিণী কালীমূর্ত্তি সাধনার অযোগ্য বলিয়া স্পষ্টভাবে উপদিষ্ট হইতেছে। তোমার পরাবুদ্ধির ভাব-বিকাশরূপ ঋষিগণ এখন বিশিষ্ট ভেদ-ভাবশীল জীব বলিয়া পূজিত হইতেছে। সকলেরই হৃদয়ে কাম ও অভিসন্ধির খেলা; সকলেই শুম্ভ নিশুম্ভের আরাধনে ব্যাপৃত। এ সময়ে যদি না আইস, তবে কবে আসিবে এবং আসিয়াই বা প্রয়োজন কি মা? এস মা, ব্রহ্মময়ী! এস, আবার শ্রীভগবানের মহিমা প্রকট কর। জীব অন্ধকারে পথ দেখিতে পাইতেছ না। সুতরাং কার্য্যতঃ সেই শুদ্ধ পরব্রহ্মকে বাদ দিয়া, অন্ধকার হইতে ঘোর অন্ধকারে পতিত হইতেছে। আমাদিগকে সেই পরব্রহ্মাভিমুখী 'পন্থা' প্রদর্শন কর: কারণ তুমিই,—

অগোত্রাকৃতি ত্বাদনৈকান্তিকত্বাৎ,
অলক্ষ্যগতিত্বাদশেষাকরত্বাৎ।
প্রপঞ্চালু সত্বাদনারম্ভকত্বাৎ,
ত্বমেকা পরব্রহ্মরূপেণ সিদ্ধা॥

[মোক্ষ] মহাকালী স্তোত্র।

"ত্বমেকা পরব্রহ্ম-রূপেন সিদ্ধা"—অবলম্বনে।

স্তবন করিব কা'র,
এ বিশ্ব বিভূতি যা'র;
'শব্দব্রহ্ম অবভাসে' যাঁ'তে অনুস্যূত।

এ বিশ্বের প্রতি অঙ্গ,
খেলি শুক শিব সঙ্গে:
'সর্ব্ব'রূপে—'সর্ব্ব'ভাবে যিনি অবস্থিত।

কে কাহারে করে স্তুতি ?
কে কা'কে করে প্রণতি ?
'সর্ব্ব'ত্র সর্ব্বদা তুমি রাজ 'সর্ব্ব'রূপে।

জগতের গতি মাঝে,
শিবা অদ্বয়তা সাজে ;
তুমি মা সতত সিদ্ধা পরব্রহ্মরূপে।

২

মন-বুদ্ধি-অগোচর,
অচিন্ত্য-স্বরূপ ধর ;
আকারেতে নাম-রূপ-শকতি-আলয়।

শকতি-রূপা 'সাকারে',
প্রকট করি আধারে ;
প্রতিব্যক্ত হও সদা শুদ্ধ-সত্ত্ব-ময়।

কিম্বা তব অধিষ্ঠান,
অব্যক্ত পরম ধাম,—
শুদ্ধ-তত্ত্ব পরব্রহ্মে প্রকাশ ইঙ্গিতে।

দ্বন্দ্বশূন্য, গুণাতীতা !
'বোধমাত্র'-জ্ঞানযুতা ;
মা ! তব অবোধ্য গতি কে পারে নির্ণীতে ?

অদ্বয় চৈতন্য-ঘন,
তাঁ'হে তব সমাপন ;
পরিমাণ নাহি তব ছিন্ন কোনরূপে।

অবাঙ্মনস-গম্যা,
সৌম্যগণে অতি সৌম্যা ;
তুমি মা সতত সিদ্ধা পরব্রহ্মরূপে॥

'গোত্রাকৃতি নাম' ধরি,
অনন্তে প্রকাশ করি ;
স্বরূপ প্রবাহ মাঝে লয় কর তা'র।

অগোত্র অদ্বয় ব্রহ্মে,
কত ভাবে কত পদ্মে,—
'মূলাধারে' 'সহস্রারে' প্রকট আধার।

চিদ্ঘন পরাভাবে,
আনন্দ-স্বরূপে সবে ;
অসংখ্য সে ভাবরাশি একরস করি।

ঐকান্তিক ভাবে খেল,
'সর্ব্ব'মাঝে সদা তোল ;
'পর'-তান, 'বহু'ভাব আপনি সম্বরি।

ভূরাদি সত্যান্ত লোকে,
অবিচ্ছিন্ন গতি রেখে ;
আব্রহ্মভুবনাল্লোকে করিয়া স্ফুরণ।

'সর্ব্ব'ভাব লোপ করে',
অলক্ষ্য সে ব্রহ্মপরে ;
সে গতিতে গতিবুদ্ধি করি সম্বরণ।

সাজি বিশ্বাতিগ সাজে,
সে মহান্ গতিমাঝে ;
বিস্তারিয়া মহাভাব অনাদি নবীন।

অগতি তুমি স্বরূপে,
অগতির গতি রূপে ;
অব্যক্ত পরম ব্রহ্ম মাঝে হও লীন।

অশেষ অনন্ত ভাব-
রাশির আকর তুমি ;
শেষহীন পরব্রহ্মে করহ ব্যঞ্জন।
তাঁহার আধারভূতা,
ব্রহ্মযোনি, বেদমাতা ;
অবভাসে' আপনাতে করি নিমগন।
প্রপঞ্চে প্রবৃত্তি তব,
তা'ই প্রপঞ্চালু তুমি ;
সর্ব্বরি পঞ্চেরে পুনঃ গায়ত্রী স্বরূপে ;—
অনারম্ভ শুদ্ধ ব্রহ্মে,
শুদ্ধ পর ঘন সমে ;
রহিছ সতত সিদ্ধা পরব্রহ্ম রূপে।

৪

বিশিষ্টতা ভেদ-ভাবে,
লুব্ধ-জীব বস্তু লোভে ;
অসামান্য পিপাসায় ধায়গো অজ্ঞানে।
অসামান্য ব্রহ্ম আশে,
মজে সে বস্তু 'বিশেষে' ;
ইহাও তোমারি খেলা পর-অধিষ্ঠানে।
পুনঃ ভেদ সে বিশেষে,
লয় করি অবিশেষে ;
সর্ব্বাত্মিকা সমবুদ্ধি প্রকটি 'বিজ্ঞানে'।
সর্ব্বাত্মিকা ভাবোপরি,
ছিন্নবুদ্ধি লয় করি ;
স্বরূপে প্রকট কর চিদানন্দ-ঘনে।
সে বুদ্ধির অবসানে,
প্রত্যয়ের একতানে ;
ধ্যানরূপে ঘন করি তা'য় সম তান।

সমাধির ভাবে পুন,
প্রকটি অ-সাধারণ ;
অ-সমে পরম ব্রহ্মে হও সমাধান।
প্রথমেতে পরকাশি,
'অসম্বন্ধ' জ্ঞানরাশি ;
ছিন্নবুদ্ধিরূপে যেন 'অবিদ্যা' ভাবেতে।
আবার 'সম্বন্ধ'-জ্ঞানে,
সংযোগী সে ছিন্নজ্ঞানে ;
বিদ্যারূপে অবিদ্যারে সংযমি তাহাতে।
সঙ্গহীন, নিরাশ্রয়,
অক্ষুব্ধ, আনন্দময় ;
'কেবল'-জ্ঞানেতে হও সমাধি নিরত।
নিষ্কল সে শিব-অঙ্কে,
বিরাজ মা ! নিরাতঙ্কে ;
অরূপেতে বোধরূপা বালিকার মত।
(আবার) তমোগুণ করি সঙ্গে,
আরোপিয়া বর-অঙ্গে ;
ধন, পুত্র, আদি বাহ্য বস্তুর আভাস।
বাহ্য চিত্ত-বৃত্তি তা'য়,
স্থিতিশীল করি হায় ;
আলয়, আশ্রয়তত্ত্ব করিছ প্রকাশ।
আনন্দে করিয়া রঙ্গ,
পুনঃ খেলা করি ভঙ্গ ;
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি করি উদ্ভাবন ;
অভিন্ন আশ্রয় ব্রহ্ম,
'সকল' 'আলয়' 'সম' ;
'সকল' প্রকারে তা'হে করিছ স্ফূরণ।

অন্তহীন 'অ-কারণ'
আদি-হীন, নিরঞ্জন;
পরাৎপর পরব্রহ্মে করিয়া স্থাপন।
লীলাময়ি! একি লীলা,
একি পুন তব খেলা;
'সকল কলাতে' তাঁরে কবিছ ব্যঞ্জন।
অনাদি নবীন রঙ্গে,
ভাবের লহরী-ভঙ্গে;
অতি ক্ষুদ্র রূপে পুনঃ খেল বা কখন।
'আপজ্যোতিরসোঽহমৃতে'
'পশি' শুদ্ধ-জীব হৃদে;
কি মধুর প্রেমলীলা করিছ স্ফুরণ!
বিশ্ব হয় বৃন্দাবন,
হৃদয় নিকুঞ্জবন,
বাসনা কালিন্দি-স্রোতে প্রবাহ উজান।
গোপগোপী আদি সবে,
মুগ্ধ করি বেণু রবে;
মাতাও শুনায়ে নিজ প্রেম আবাহন।
শুদ্ধ চিদানন্দ-ঘনে,
নিত্য-নব প্রাণধনে;
নিতি নিতি নন্দসুতে নবভাব দিয়া,—
সেই সনাতন সত্যে,
প্রকাশি আনন্দ-তত্ত্বে;
নিত্য-নব মহাভাবে তোষ ভক্ত হিয়া।
ভকত হৃদয় মাঝে,
বসায়ে সে রসরাজে;
'আপ''জ্যোতি'মাত্র ত্যজি অভিনব রূপে।
অপ্রকটে ব্যক্ত করি,
একি মা! লীলা তোমারি;
তা'ই বুঝি নিত্য-সিদ্ধা পরব্রহ্মরূপে।

৫

বিষ্ণু রুদ্র নাহি যবে,
পিতামহ কোথা তবে?
নাহিকাল, নাহি দেশ, নাহি ভূতগণ।
অকারণারূপা তদা,
কারণ অতীত সদা;
নিত্য-শুদ্ধ-বোধমূর্ত্তি করিয়া গ্রহণ।
পরাৎপরে মিশে তবে,
বিহর কি পরাভাবে,
বল মা চৈতন্যময়ী খেলিতে কিরূপে?
বল মা—বল মা তারা,
ওগো সর্ব্বে! সারাৎসারা;
বুঝিয়াছি নিত্য সিদ্ধা পর-ব্রহ্মরূপে।

৬

তো'র ক্ষুদ্র শিশু নর,
তর্কেতে করিয়া ভর;
কালাদি তর্কেতে চাহে নির্ণীতে তোমারে
সাংখ্য, যোগী, বৈদান্তিক,
মীমাংসক বা তার্কিক;
অহৈতুকী ভক্তি বিনা কে বুঝিতে পারে?
ত্রৈগুণ্য-বিষয় বেদ,
কি বুঝিবে তব ভেদ?
ত্রৈগুণের বহু উচ্চে আসন তোমার।
বাক্য ও মানসাতীত,
হৃদয়ে হও লক্ষিত;
পরব্রহ্মভাবে সিদ্ধ স্বরূপ তোমার।

তো'র নাম গোত্র নাই,
কোথাও নাহিক ঠাঁই ;
জনম-মরণ নাই, নাই পিতামাতা।
জাননা সুখের লেশ,
বুঝনা দুঃখের ক্লেশ ;
নাহি লোভ, লাভে চেষ্টা দুঃখ দরিদ্রতা,
নাহি শত্রু, নাহি মিত্র,
মোক্ষ বা বন্ধন কুত্র ;
স্বপ্রকাশ মাত্র, ঘন আনন্দের রসে।
(যেমন) সাগর লহরী মালা,
সাগরেই করে খেলা ;
(তেমন) ব্রহ্মময়ী তোর খেলা ব্রহ্মরূপে পশে!

৮

পুংস ক্লীব কিবা নারী,
কুৎসিতা কিবা সুন্দরী ;
বয়স্থা, যুবতী, প্রৌঢ়া, বৃদ্ধা কিবা বালা!
স্থলচর, জলচর,
বায়ব্য কিম্বা খেচর ;
স্বর্ণবর্ণ, শ্যামতনু গোরা কিবা কালা ?
সুর কি অসুর তুমি,
আকাশ, সলিল, ভূমি ;
তেজ, বায়ু পঞ্চভূত, দেব কিম্বা নর ?
নহ তুমি,—কিছু, কেহ,
নহ নাম, রূপ, দেহ ;
পর-ব্রহ্মরূপে সিদ্ধা তুমি পরাৎপর ;

৯

নীল শান্ত নভ-তল,
তা'হে ভানু অচঞ্চল ;
কণক কিরণ তাঁ'র বিশ্ব ব্যাপ্ত করি।
সিন্ধুজলে উর্ম্মি মাঝে,
বিম্বে প্রতিবিম্বে রাজে ;
'সকল'ভাবে 'সর্ব্ব'বর্ণে রবিরূপ ধরি।
পর-ব্রহ্ম সদাশিব,—
ভাবে তাঁ'রে ভ্রান্ত জীব ;
'কারক-কারণ'-রূপে অস্থির, চঞ্চল।
স্থিরেতে চঞ্চলে তুমি,
ভেদেতে একত্বে তুমি ;
'স'-কলে' স্বরূপে, শিবে অদ্বয় নিষ্কল।
তুমি শিব, তুমি শিবা,
তোমার তুলনা কিবা ;
তুমিই তোমার শুধু উপমার স্থল,
বিশ্বক্ষেত্রে, সচঞ্চল,
শুদ্ধ ব্রহ্মে, অচঞ্চল,
পর-ব্রহ্মরূপে সিদ্ধা তুমি মা কেবল।

'মুখরা'—

মোক্ষ]

রাধা-তত্ত্ব।

স্ত্রী পুরুষ লইয়াই সংসার, প্রকৃতি পুরুষ যোগেই এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড। প্রকৃতি জগৎ-প্রসূতি, পরম ব্রহ্মের ইচ্ছারূপা মায়া। "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ"। পুরুষ—ব্রহ্ম ; প্রকৃতি—ব্রহ্মশক্তি। অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি

অভিন্ন হইয়াও পৃথক্‌রূপে প্রতিভাসিত; প্রকৃতিও পুরুষের সহিত অভিন্ন হইয়াও ভিন্ন। শক্তিমানকে ত্যাগ করিয়া শক্তির অস্তিত্ব থাকে না, অথচ শক্তির পৃথক অস্তিত্ব অপলাপ্য নহে। তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষাশ্রয়া; পুরুষাশ্রয় ব্যতীত ইহার অন্য আশ্রয় নাই। প্রকৃতির নানাভাবের বিকাশ সকলেরই প্রত্যক্ষীকৃত। প্রকৃতিই জগন্মাতা। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্"

পুরুষযোগে এই প্রকৃতি হইতেই সচরাচর জগৎ প্রসূত হইয়াছে। এই প্রকৃতি চিন্ময়ী হইয়া শরীরিণী; ব্রহ্মশক্তিরূপিনী হইয়া জগদাশ্রয়া; মানসাগম্য হইয়াও প্রত্যক্ষ-গ্রাহ্যা।

এই প্রকৃতির দুইটী ভাগ—মায়া ও অবিদ্যা। যখন পরমেশ্বরাশ্রয়া তখন মায়া, যখন জীবাশ্রিতা তখন অবিদ্যা; এই মায়া বিশুদ্ধ সত্ত্বাত্মিকা। ইহাই আমাদের ব্রহ্মশক্তি. ইহাই ব্রহ্মবিদ্যা, দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী, লক্ষ্মী, স্বরস্বতী. অন্নপূর্ণা—অগ্নির চিন্তাও তাহার দাহিকা শক্তির চিন্তা; স্বরূপতঃ পরস্পরাপেক্ষ্য বলিয়া একত্রিত ব্রহ্ম ও শক্তির আরাধনাও একই।

ব্রহ্মের দ্বিবিধ রূপ,—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। অমূর্ত্ত—"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ম্"। মূর্ত্ত—"প্রসন্নপাবিজাতায় * * কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহেনমঃ"। অমূর্ত্ত—নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ। মূর্ত্ত—সাকার, ভক্তানুকম্পার্থ বিগ্রহবান্ শ্রীভগবান্।

প্রকৃতিও মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত। অমূর্ত্ত—ব্রহ্মশক্তি চিন্ময়ী বিশুদ্ধামায়া। মূর্ত্ত—শরীরধারী দুর্গা, কালী ইত্যাদি। নিরাকার ব্রহ্ম যখন আমাদের উপাস্য নহেন, তখন নিরাকার ব্রহ্মশক্তিও আরাধ্যা হইতে পারেন না। নিরাকারা ব্রহ্মশক্তি যে সকারা, তাহা 'কৈবল্য' ও 'কেন' প্রভৃতি উপনিষদে স্পষ্টই কথিত আছে। "উমাসহায়ং পরমেশ্বরং প্রভুং ত্রিলোচনং নীলকণ্ঠং প্রশান্তং" "স তস্মিন্নেবাকাশে স্ত্রিয়মাজগাম বহুশোভমানামুমাং হৈমবতীং"। দেবীসূক্তে ইহা আরও স্পষ্টীকৃত আছে।

আমাদের আরাধ্যা সাকারা প্রকৃতিই লক্ষ্য। রাধা সাকারা প্রকৃতি, কৃষ্ণও পরমেশ্বর। এই রাধাকৃষ্ণই আমাদের জগৎ-পিতা ও জগন্মাতা। সন্তানের পক্ষে পিতার অপেক্ষা মাতা গরীয়সী। পুত্রের নিকট মাতাই অগ্রে প্রণম্যা। এই কারণেই "রাধাকৃষ্ণ"।

"রাধাকৃষ্ণেতি গৌরীশেত্যেবং শব্দঃ শ্রুতৌশ্রুতঃ।
গরীয়সীতি জগতাং মাতা শতগুণৈঃ পিতুঃ"॥

"পিতুরপ্যধিকা মাতা গর্ভধারণপোষণাৎ ॥"

হরিহর অভিন্ন, পার্ব্বতী রাধা অভিন্ন। গোলকের অধিপতি কৃষ্ণ—অধিশ্বরী রাধা। এই রাধাই সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী, সর্ব্বতীর্থময়ী, অতীতগুণা, ভক্তপ্রিয়া, বুদ্ধি ও মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। পুরুষ দক্ষিণাঙ্গ রমণী বামাঙ্গ; মায়াতীত নির্গুণ ব্রহ্ম চৈতন্যের দুইটী অংশ (ঔপাধিক) দক্ষিণাঙ্গ কৃষ্ণ, বামাঙ্গ রাধা। স্ত্রী পুরুষেরই বামাঙ্গ স্বরূপা।

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" ॥

সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতদিগের বিনাশ ও ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্যই শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, লীলাদেহ ধারণ করেন, ভক্তজনের কামনা পূরণ করেন। পরমেশ্বরী রাধা কেন অবতীর্ণ হইলেন?

উত্তর—লীলাদেহ ধারণের উদ্দেশ্যই যখন ধর্ম্ম সংস্থাপন, ভক্তজনের অভিলাষ পূরণ; তখন রাধা-ব্যতীত ঐ ভক্তজনের অভিলাষ সম্পূর্ণ ভাবে পূরণ হইবার সম্ভাবনা নাই। কেন সম্ভব নহে' তাহাই বুঝাইতেছি।

ব্রহ্মশক্তি যে ভাবে ব্রহ্মাশ্রিতা, সে ভাবে অন্য কিছু আশ্রিত হইতে পারে না। পরমেশ্বরী যে ভাবে পরমেশ্বর-নিষ্ঠ, আর কেহ তেমন পরমেশ্বর-নিষ্ঠ হইতে পারে না। কাজেই শ্রীভগবান্ যেমন লীলাদেহ ধারণ করিলেন তেমনই সেই লীলারস সম্পূর্ণ অনুভব করিবার জন্য ভক্ত-উপাসিকা থাকারও অবশ্যকতা আছে। কি ভাবে শ্রীভগবানে মিশিতে হয়, কি ভাবে মন প্রাণ তাঁহাতে অর্পণ করিয়া আপনার যাহা কিছু অস্তিত্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাহারও সর্ব্বাঙ্গীন আদর্শ থাকার প্রয়োজনীয়তা আছে। ভক্ত ভিন্ন শ্রীভগবানের চিদ্‌ঘন-মূর্ত্তি কে উপলব্ধি করিবে? শ্রীভগবানে সম্পুর্ণ আত্মনির্ভরতা দেখাইবার জন্য গোলক-বাসিনী শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া শ্রীকৃষ্ণ-বক্ষঃস্থল-বিহারিণী শ্রীরাধাকে অবতীর্ণা হইতে হয়। রাধা ব্যতীত প্রকৃত শ্রীকৃষ্ণগতপ্রাণা আর কেহই নাই। কাজেই গোলকপতি শ্রীভগবান্ যদুবংশে বসুদেবের ঔরসে দেবকী গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে মহালক্ষ্মী সুরেশ্বরী রাধা গোপীকুলে বৃষভানুর দুহিতারূপে অবতীর্ণা হইলেন। শ্রীধাম গোলকে রাধার সহিত শ্রীদামের কলহ ঘটে। তাহার ফলে গোলোক হইতে প্রচ্যুতি ও গোকুলে জন্ম, ইহাই পৌরাণিকী বার্ত্তা। "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং

বাসুদেব কৃষ্ণই শ্রীভগবান্, রাধা ভগবতী—ইহা আমরা শাস্ত্র মাহাত্ম্যে বুঝিয়াছি এবং বিশ্বাসও করি, ভক্তিও করি।

রাধা বৃন্দাবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গোলোকে বৃন্দাবন, মল্লিকা-মাধবী কুঞ্জ, রাসমণ্ডল, রত্নসিংহাসন, হৈমদোলা, সমস্তই বর্ত্তমান।

রাশব্দোচ্চারণাদ্ভক্তো যাতি মুক্তিং সুদুর্লভাম্।
ধাশব্দোচ্চারণাদ্দুর্গে ধাবত্যেব হরেঃ পদং॥

বেদান্তে পরব্রহ্মের সিসৃক্ষার নামই মায়া। গোলোকে স্বেচ্ছাময় শ্রীভগবান্ লীলা করিবার ইচ্ছা করিলে, সেই ইচ্ছাই সুরেশ্বরীরূপে প্রকটা হইলেন; আপনাকে স্ত্রীরূপে প্রকাশিত করিলেন। সেই সুরেশ্বরী ভগবানের কামনার বস্তু—কাজেই অমূল্য রত্নাভরণা, বহ্নি-শুদ্ধ বস্ত্রপরিধানা, তপ্তকাঞ্চনাভা, যৌবন-শ্রীমণ্ডিতা, অপরূপ লাবণ্যময়ী সম্মুখে দাঁড়াইলেন। ভগবান্ সুরেশ্বরীকে গ্রহণ করিতে যাইলেন, রমণী সুলভ লজ্জা বশে সুরেশ্বরী পলায়নপরা হইলে, ভগবান্ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম রাধা। রাধা ভগবানের কামনার পাত্রী বলিয়া, আমাদেরও আরাধনার বস্তু।

গোলোক—গোকুল হইল। তত্রস্থ বৃন্দাবন—বৃন্দাবন হইল! পার্শ্বদগণ শ্রীদাম সুদাম সুবল হইয়া জন্মিলেন। কংস-ভয়ে বসুদেব গভীর দুর্য্যোগে রাত্রে শ্রীকৃষ্ণকে বুকে করিয়া নন্দগৃহে রাখিয়া আসেন। "তস্যাশ্চাংশাংশ-কলয়া বভূবুর্দেবযোষিতঃ" গোলোকেশ্বরী রাধার অংশস্বরূপা দেবযোষিংগণ গোপী হইয়া গোকুলে লীলাময়ের মধুর লীলারস আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

"চতুর্ভুজস্য যা পত্নী দেবী বৈকুণ্ঠবাসিনী।
তদংশা রাজলক্ষ্মীশ্চ রাজসম্পৎ-প্রদায়িনী॥
তদংশা মর্ত্ত্যলক্ষ্মীশ্চ গৃহীণাঞ্চ গৃহে গৃহে।
শস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ সা এব গৃহদেবতা।
স্বয়ং রাধা কৃষ্ণপত্নী, কৃষ্ণবক্ষঃস্থলস্থিতা॥
প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী চ তস্যৈব পরমাত্মনঃ॥

পরমাত্মার প্রাণাধিষ্ঠাত্রী দেবী বৈকুণ্ঠ-বাসিনী পত্নীরই অংশ—রাজলক্ষ্মী, মর্ত্ত্য-লক্ষ্মী ও গৃহলক্ষ্মী।

বৃন্দাবন মর্ত্ত্যের নন্দন কানন, গোলোকের বৃন্দাবন। এই বৃন্দাবনে রাধা

কৃষ্ণের মিলনে যে ঘনামৃত-ধারা সহস্র সহস্র ভক্ত উপভোগ করিয়া আসিয়াছেন, তাহা অপূর্ব্ব—অনির্ব্বচনীয়। এই মিলনে দৈহিক মিলনের যে মলিনিমা অভক্ত দেখিতে পান, তাহা বিস্ময়াবহ! "কৈশোররূপং কৃষ্ণং" তখন কৃষ্ণের কৈশোরাবস্থা; সে অবস্থায় যুবতী, পূর্ণযুবতী গোপিকাগণের যে ভাবোন্মাদ, যে 'রাস দোল ঝুলন' প্রভৃতি ক্রীড়া, তাহা নিকৃষ্ট ইন্দ্রিয় সম্ভোগ নহে, তাহা কুৎসিত কামের বিকাশ নহে।

রাধাকৃষ্ণ মিলনে যোগতত্ত্ব।

প্রকৃতি পুরুষের আসক্তিই রাধাকৃষ্ণের মিলন। প্রকৃতি পুরুষের আসক্তির ফলে জগৎ সংসার, জীব প্রভৃতির জন্ম। এই আসক্তির মলিন অংশ রজস্তমোভাব, সাংসারিক মোহ। অনর্থকরী অবিদ্যা হইতে আত্মা যখন পরিব্রাজিত হন, তখনই প্রকৃত ব্রজভাব। সেই ব্রজভাবে প্রকৃতি ব্রজেশ্বরী। ভক্তি-বিহগ-কাকলী-মুখর, অশ্রুবারি-প্রবাহ-বিধৌত, দৈন্য-মমতা-কোমল অন্তরই বৃন্দাবন। সেই বৃন্দাবন-বিহারী রূপে যোগী ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেন—মধুর রস-উপভোগ করেন। যতদিন আত্মার সংসার বীজ নষ্ট না হয়, ততদিন আত্মা বদ্ধ, ততদিন আর মুক্তির সম্ভাবনা নাই। এই বদ্ধভাব, এই সাংসারিকতা নির্ব্বাণার্থই কৃষ্ণ-বিরহ।

বলিয়াছি প্রকৃতি পুরুষ মিলনেই জগৎ সংসার। বিচ্ছেদেই উভয়ের মুক্তি, জগদ্বাসীর লীলাখেলা শেষ। রাধার বহু বৎসর ব্যাপী কৃষ্ণ-বিরহ ও আত্মার বহু কালের অনাসক্তি উভয়ই তুল্য। জীবাত্মা—পরমাত্ম-তত্ত্বের সমস্ত স্তরই শ্রীকৃষ্ণ-লীলায় পরিদৃষ্ট হয়।

পুরুষ প্রকৃতিস্থ হইয়াই শব্দাদি বিষয় ভোগ করেন; কৃষ্ণও বৃন্দাবনে থাকিয়া নানাবিধ মধুর ক্রীড়া করেন। বৃন্দাবনের ভাব মধুর, প্রেমরসে ঐ মধুর ভাব বড়ই কোমল, বড়ই মনোমোদ।

কৃষ্ণ যখন মথুরায়; তখন তিনি সাংখ্যের উদাসীন পুরুষ—প্রকৃতিতে অনাসক্ত। শাস্ত্র "তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ" বলিয়া এই উদাসীন ভাব ঈশ্বরেও আরোপ করিয়াছেন। মথুরায় বাস্তবিকই কৃষ্ণ অনাসক্ত,—গীতার নিষ্কাম-আদর্শ। কৃষ্ণ মথুরায় যাইয়া কংসকে বিনাশ করিয়া দেশকে উপদ্রব হইতে রক্ষা করিলেন, উগ্রসেনকে রাজ-সিংহাসনে বসাইলেন; শিশুপালকে শতবার ক্ষমার পরিচয় দিলেন। কৃষ্ণ যদি স্বার্থপর হইতেন তবে স্বয়ং রাজা

হইবার লোভ কথনই সম্বরণ করিতে পারিতেন না। কৃষ্ণ প্রজাপালন রূপে গোপালনে সংসার-গোষ্ঠে বিহার করিয়া, মথুরায় প্রজাপালনেই মন দিলেন। রাধার অনুরাগ যোগীর ঈশ্বরানুরাগ অপেক্ষাও অধিক প্রগাঢ়।

প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে রাধাকৃষ্ণের মিলন পবিত্র হইলেও অভক্ত জন কামনার চক্ষুতে স্ত্রীপুরুষের গোপনীয় ঘনিষ্ঠ অনুরাগ দেখিতে পাইল; যুবক যুবতীর পঙ্কিল কামভাবের গন্ধ পাইয়া নিন্দা করিতে দ্বিধা করিল না। রাধার হৃদয় প্রেমে উচ্ছ্বাসপূর্ণ; সে হৃদয়ে যমুনার কলতান নিয়তই ছুটে, প্রিয়তম শ্যামের বাঁশরী নিরন্তরই বাজে, শ্রীকৃষ্ণের তমালবর্ণচ্ছবি সর্ব্বদাই ভাবের তরঙ্গ ছুটায়। সে হৃদয়ে ধর্ম্ম, লজ্জা, ভয় ছিল না; লাঞ্ছনা, গঞ্জনা, তিরস্কার, প্রহার পর্য্যন্ত অঙ্গের ভূষণ করিতে হইয়াছিল। প্রতিবেশীর নিন্দা রাধার সংকল্প টলাইতে পারে নাই। সে সংকল্প মহান্ পর্ব্বতের মত অটল; সে হৃদয়ের গভীরতা মহাসমুদ্রের মত অতলস্পর্শ। শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরী বাজিতে না বাজিতেই "কোথা কোথা কৃষ্ণ" বলিয়া রাধা পাগলিনী হইয়া ছুটেন; বাতাসের মৃদু সঞ্চালনে কম্পমান পত্রে শ্যামের কম্পিত বর্ণচ্ছবি কল্পনা করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়েন। এই প্রগাঢ় প্রেম বৈষ্ণবের সাধনার বস্তু, আদর্শ কল্পনা। এই প্রগাঢ় প্রেমের মূল বল্লী শ্রীরাধা। প্রেমভক্তি—শুদ্ধা ভক্তি, শ্রীভগবানের বড়ই আদরের। সেই আদরেই রসময়ী কল্পনা—মান। প্রেমের সহিত প্রেমময় আকৃষ্ট হইয়া থাকেন বলিয়া শ্রীমতী মানিনী। প্রেমেরই পরিপুষ্টি সাধনের একমাত্র উপায়,—বিরহ! বিরহই প্রেমকে প্রগাঢ় করে, মলিনিমা কাটাইয়া বিশুদ্ধ করিয়া তুলে, চরম উৎকর্ষে পরিণতি লাভ করাইয়া দেয়। "বিরহে তন্ময়ং জগতে" বিরহে যে তন্ময়তা, তন্ময়তায় যে আত্মবিস্মৃতি—তাহা কারুণ্য মধুর, মর্ম্মস্পর্শী, তৃপ্তিপ্রদ। তন্ময়াবস্থায় প্রিয়জন মূর্ত্তিমান্ হইয়া নয়নের সম্মুখে বিরাজ করেন, হৃদয়-সিংহাসন জুড়িয়া বসেন। তন্ময়তার বিচ্ছেদ ততোধিক কষ্টকর; —প্রিয়জন মূর্ত্তি আর দেখা যায় না, প্রিয়জন-স্মৃতি বিলুপ্ত হয়। মিলনে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব থাকে, বিরহে তাহার লোপ ঘটে। তবে মিলনে ঐ অস্তিত্ব মধুময়, উন্মাদক, সৌন্দর্য্যানুভূতি কর। প্রকৃত তন্ময়তা বাহ্য জগতের লোপ ব্যতীত জন্মে না, বিরহে অন্তর্জগতেরই ক্রীড়া।

রাধার এই প্রগাঢ় প্রেমের অভিব্যক্তি, তন্ময়তার এই আত্মবিস্মৃতি, বৈষ্ণব-

সাহিত্যে গীতি কবিতা সৃষ্টি করতঃ জগতের কবিত্বের একটি নূতন দ্বার খুলিয়া দিয়াছে। বৈষ্ণবের ইহাই উপজীব্য ও জয়দেবের পদাবলীতে উচ্ছ্বসিত, চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি প্রভৃতির গীতি কবিতায় বিস্তারিত। রাধার এই প্রেমাভিব্যক্তির একটী অংশমাত্র জয়দেব পদ্মাবতীতে দেখিতে পাইয়াছিলেন; বিদ্যাপতি লছিমা দেবীতে কল্পনা করিয়াছিলেন; চণ্ডীদাস রাসমণিতে উপভোগে সক্ষম হইয়াছিলেন।

শ্রীভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ রাধার মত কেহ করিতে পারে নাই বা পারিবার সম্ভাবনা নাই। রোধ না পাইলে স্রোতস্বিনীর কত বেগ, তাহা জানা যায় না; বিপদ ব্যতীত সাধুতার পরীক্ষা হয় না। তদ্রূপ বাধা না পাইলে প্রেম পরিপুষ্টি লাভ করে না বা চরম পরিণতি পাপ্ত হয় না। অপরের পত্নীত্ব, ধর্ম্মের অনুশাসন, কুলমর্য্যাদা, গুরুজনের শাসন, প্রতিবেশীর নিন্দা আর শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে মধ্যে অদর্শন—এই গুলিই বাধা। রমণী সর্ব্বস্ব অর্পণ করিতে পারে, কিন্তু সহজে স্ত্রীধর্ম্ম ত্যাগ করে না, লজ্জাশীলতার মাথায় পদাঘাত করিতে সক্ষম হয় না। অথচ যদি লজ্জা, ধর্ম্ম, নিন্দা প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব চিহ্ন স্বরূপ অহঙ্কার রহিল, তবে সর্ব্বস্ব অর্পণ হইল কৈ? রূপ, যৌবন, পতি, পত্নী, পুরুষ, নারী, কিশোরী, যবতী—সকল ভাবই যদি পূর্ণভাবে প্রকট রহিল, তাহা হইলে শ্রীভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণই করা হয় না! ব্যক্তিত্বাভিমান থাকিতে শ্রীভগবানে সম্পূর্ণ নির্ভরতা জন্মে না। রাধার এই আত্ম-নির্ভরতা ছিল;—তাই শতবাধা অতিক্রম করিয়া শ্রীকৃষ্ণে মিশিতে পারিয়াছিলেন। তটিনী যখন সাগরে মেশে, তখন সে কি বাধা মানে? রাধার প্রেম এমনই উন্নত যে, তাহা ধারণা করা সাধারণের পক্ষে অসম্ভব। অজ্ঞ, ভক্তিবিহীন, যুক্তিমাত্র বাদীরা এই রাধার প্রেমে ইন্দ্রিয় লালসার বিকাশ দেখেন। অবশ্য তাঁহাদের সহিত আমাদের তর্ক নাই। রাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব সম্যক্ আলোচনা ও সাধনা না করিয়া নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হওয়া প্রকৃত মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে। পরিশেষে আমাদের প্রার্থনা যে,—"প্রণবা প্রণবেশী চ প্রবণার্থ স্বরূপিণী"—শ্রীরাধা আমাদের হৃদয়ে ভক্তি দান করুন।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ।

বেদে শ্রীভগবানের যে মাধুর্য্যলীলার ঈষৎ ইঙ্গিত আছে, উপনিষদে "রসোবৈ সঃ" বলিয়া শ্রীভগবানের 'রসরাজমূর্ত্তির' যে ছায়া দৃষ্ট হয়, ভাগবতে সর্ব্বভূত হৃদয় শুকদেবের মুখে তাহার পরিপুষ্টি। ভাগবতের অকৈতব গোপীপ্রেম জীব শাস্ত্রের বর্ণনার ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিল না; মহাভাব-স্বরূপিণী রাধা ঠাকুরাণীর সে প্রেম, জগতের জীব বুঝিতে পারিল না। শ্রীরাধার সে কামগন্ধহীন কৃষ্ণসুখ-তাৎপর্য্য-মূলক অদ্ভুত মাধুরিমা, পরিচ্ছিন্ন ব্যক্তজীবে প্রকাশিত হইল না। পরম পুরুষের সেই প্রেমলীলা জয়দেবের কুঞ্জকুটীরে, চণ্ডীদাসের মর্ম্মকন্দরে প্রকটিত হইলেও, সাধারণ জীব সেই প্রেমসুধায় বঞ্চিত থাকিল। সাধকের সাধনার স্তর নিজে আচরণ দ্বারা না দেখাইলে জীব বুঝিতে পারিবে কেন? তা'ই শ্রীমতী রাধার ভাব ও কান্তি অবলম্বন করিয়া স্বয়ং শ্রীভগবান বঙ্গের নবদ্বীপা-কাশে গৌরাঙ্গচন্দ্ররূপে উদিত হইলেন। রাধাকৃষ্ণের মিলন, দেহাত্মসর্ব্বস্ব কামুক কামুকীর মিলন নহে, ভেদাত্মক পরিচ্ছিন্ন মানব মানবীর দেহাসক্তি নহে, ইহা সেই "অহং"এর সহিত পরের মিলন। মদনের যিনি জনয়িতা, যাহার অপ্রাকৃত চিদানন্দঘন রূপস্পর্শে জীবের কামনা একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়, যাঁহার শ্রীমুখের নিনাদিত বংশীধ্বনি শ্রবণ করিলে সংসারের মোহ অন্তর্হিত হয়, বিশিষ্টতার প্রাচীর চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়,—সর্ব্বস্ব ত্যাগ করানই যাঁহার বংশী-ধ্বনির বিশেষত্ব, সেই পরমপুরুষের দেহাতীত প্রেমময় স্পর্শে অংশরূপী জীবের 'সর্ব্ব'ভাব "এক"ভাবে অধিষ্ঠিত না হইয়া থাকিতে পারে না। যে তাঁহার বংশীধ্বনি একবার শুনিতে পায়, সে এই বদ্ধ-ভাবের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে পারে না, তাহার ইন্দ্রিয় নিচয় তখন সেই সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস সর্ব্বভাবের ভিতর দিয়া সেই প্রাণাকর্ষক মুরলী-বাদকের প্রতিবিম্ব অনুভব করে। ঋষি-দিগের অমর তুলিকায় যে ভাবের চিত্র অঙ্কিত আছে, ভাগবতে গোপীদিগের সেই ভাব বর্ণিত আছে। ভাবের বর্ণনায় প্রেম চিত্রের চিত্র তুলনায়, নায়ক-নায়িকার প্রেমোন্মাদনায় তাহা অতুলনীয়, সন্দেহ নাই। ভক্ত ভগবানের এই অপূর্ব্ব মিলন পাঠ করিলে, হৃদয়ে ভাবতরঙ্গ উত্থিত হয় সন্দেহ নাই; কিন্তু সেই

গোপীদিগের প্রেম, বিরহ, আশা ও নৈরাশ্যের বর্ণনা যে কবির স্বকপোল-কল্পিত ভাব সমষ্টি নহে,—সেই রসভাবের সমুজ্জ্বল বর্ণনা-মাধুর্য্য যে কেবল সুললিত পদ-বিন্যাস নহে, ইহা সাধক জীবনে সত্য ও প্রত্যক্ষ,—ইহাই জীবকে দেখাইবার জন্য পরম-দয়াল রসিকশেখর ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া জন্মগ্রহণ করিলেন। বাহিরের লোক বুঝিল যে শ্রীচৈতন্যদেব,—

বাহু তুলি হরি বলি প্রেম দৃষ্টে চায়।
করিয়া কল্মষ নাশ প্রেমেতে ভাষায়॥

কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ বুঝিলেন যে ইঁহার আগমনের গূঢ় তাৎপর্য্য শ্রীমতীর ভাবে বিভোর হইয়া সেই ভাব জীবকে শিক্ষা দেওয়া। এই অপূর্ব্ব প্রেমধর্ম্মের বীজ তিনি স্বীয় আচরণ দ্বারা জগতে বপন না করিলে, ভবিষ্যতে অধিকারিগণ যে বঞ্চিত থাকিবে।

শ্রুতিতে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য ও মাধুর্য্যময় ভাবের উল্লেখ থাকিলেও, মাধুর্য্য ভাবের উপাসনা শ্রীচৈতন্যদেবের আগমনের পূর্ব্বে এরূপ প্রকট ভাবে বিকশিত ও সমুন্নত ছিল না। জয়দেব ও বিদ্যাপতি অদ্ভুত সাধনাবলে সেই উজ্জ্বল রস বর্ণনা করিলেও, চণ্ডীদাস সেই মধুর ভজন সুস্বর সুতানে সাধারণ ভাষায় বঙ্গের দুয়ারে দুয়ারে উপহার প্রদান করিলেও, লোকে সে বর্ণনা অলীক কবিকল্পনা বা ভাষামাধুর্য্য বলিয়া মনে করিত। কিন্তু যখন আমাদের গৌরচন্দ্র গয়ায় বিষ্ণু-পাদপদ্ম দর্শন করিয়া অবিরল নয়নাশ্রুধারার সহিত নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তাঁহার হৃদয়ের তাপ জননীর সুমধুর স্নেহ সঞ্চারণে—প্রেমপ্রতিমা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেমালিঙ্গনে—বন্ধুগণের সস্নেহ বচনেও নির্ব্বাপিত হইল না। জানি না, তাঁহার সেই অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্য, জ্ঞান-গরিমা, স্বভাবের উদ্ধতা, ভক্তদিগের প্রতি বিদ্রূপ, সহসা কোন্ অতল সাগরের জলে ডুবিয়া গেল। তখন কাহার জন্য চিত্ত সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন, কাহার জন্য সংসারে সর্ব্ব-বন্ধন শিথিলীকৃত? কাহার জন্য এমন উৎকণ্ঠা, এমন চিত্তবিভ্রম, এমন অনাসক্তি? এই অবস্থা দেখিয়া কবি বলিলেন,—

আজ হাম পেখনু নবদ্বীপ চন্দ।
করতলে করই বয়ান অবলম্ব।

* * *

ঢুল ঢুল নয়নে কমল সুবিলাস।

* * *

পুলক-মুকুলবর তরু সব দেহ।

এই অবস্থা বৈষ্ণব কবির পূর্ব্বরাগ। পূর্ব্বরাগ অর্থে 'অঙ্গসঙ্গাৎ পূর্ব্বং যা উৎকণ্ঠাময়ী রতিঃ স পূর্ব্বরাগঃ। (উজ্জ্বল নীলমণি) অঙ্গসঙ্গের পূর্ব্বে গোপীহৃদয়ে যে আকর্ষণ অনুভূত হয় এবং যে আকর্ষণে আকৃষ্ট হইলে বাহিরের সর্ব্বপ্রকার টান যেন বিপরীত অভিমুখী হইয়া ছুটীতে চায়, তাহাই পূর্ব্বরাগ। শ্রীভগবানের সঙ্গলাভ তখনও হয় নাই, কিন্তু তাঁহার আলিঙ্গন-পিপাসা জাগিয়া উঠিয়াছে; ক্ষুদ্র ব্যক্ত মোহ ও ক্ষুদ্র অহংকার তখনও জাগিয়া আছে, অথচ জনম-ভরি সুখের একটী চিত্র সম্মুখে অহরহ খেলিতেছে; কি যেন অজানিত, অনাস্বাদিত, অপূর্ব্ব ভাব, মর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাণকে আকুল করিতেছে। তখনও বাহিরের 'বহু' আছে; কিন্তু তাহাদের মাঝে সেই কাল-শশীর রূপের ছায়া অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে; কেবল নামটী শ্রুতিপথে প্রবেশ করিয়াছে ও প্রবেশ করিয়াই, ভেদভাবকে শিথিল করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শ্রীচৈতন্যদেবের যেন এখন সেই অবস্থা; পদচিহ্ন দর্শনে ও "ইহা সেই বিষ্ণুর পরমপদ" এই বাক্য শ্রবণেই চিত্ত অস্থির হইল। সেই অস্থিরতা লইয়াই গৃহে ফিরিলেন; কিন্তু তবুও সেই অস্থিরতা।

পুনঃ পুনঃ গতাগতি করু ঘর পন্থ।
খেনে খেনে ফুলবনে চলই একান্ত॥

তখনকার সেই ভাব কবির তুলিকায় চিত্রিত হইল,—

পরাণ না ধরে, ধক্‌ধক্ করে, রহে দরশন আশে।
যবহু দেখিবে, পরাণ পাইবে, কহয়ে উদ্ধব দাসে॥

পূর্ব্বরাগের এই ভাব শ্রীমতী রাধিকার ভাবের সহিত মিলাইয়া দেখুন, কোন পার্থক্য নাই; যেন সেই বর্ণনার যাথার্থ্য আজ শ্রীচৈতন্য-জীবনে প্রকট।

সখি! কেবা শুনাইল শ্যাম নাম
না জানি কতই মধু শ্যাম নামে আছে গো

কহিতে বদনে নাহি সরে।
জপিতে জপিতে নাম অবশ করিল গো।

নাম পরতাপে যার ঐছন করিল গো,
অঙ্গের পরশে কিবা হয়,
যেখানে বসতি করে সেখানে কেমনে গো
যুবতী ধরম কৈছে রয়?

এই ভাব সামান্য ক্ষণের জন্য হৃদয়ে একবার উদিত হইলে, চিত্তের গতি বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। 'বহুর' দিকে জীবনের আর প্রবণতা থাকিবে না; যুবতী-ধরম, জীবের জীবত্ব ও পরিচ্ছিন্ন ভাব, সবই তখন লোপ পাইতে চায়। তখন সেই পরপুরুষ ভিন্ন জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া পড়ে। সাধক-জীবনে ইহা প্রত্যক্ষ সত্য। শ্রীচৈতন্যদেবের এই অবস্থা দেখিয়া অনেকে চিন্তিত হইলেন; কিন্তু তখন তাঁহার হৃদয়ে সেই ত্রিলোকসুন্দর ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমার ছায়া পড়িয়াছে। এই আকুলতা, পূর্ব্বরাগের এই সূচনা, তাহার জীবন কিরূপ ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল, তাহা সকলেই অবগত আছেন। তাঁহার জীবনের শেষ সময়ের লীলা, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। তিনি যখন পর ধ্যেয় বস্তুর সহিত এক হইয়া যাইতেন, যখন তাঁহার চির-আকাঙ্ক্ষিত নবজলধর শ্যামসুন্দর তাঁহার হৃদয়ে উদিত হইতেন, তখন তিনি স্থির, ধীর, নির্ব্বাক্, নিস্পন্দ! কিন্তু অন্য সময়ে প্রায়ই তাঁহার লীলা যেন প্রগাঢ় বিরহ-ভাবে পুটিত। সাধক জীবনে বিরহ না থাকিলে, মন সর্ব্ববস্তুতে সেই সর্ব্বেশ্বরকে দেখিতে পাইবে কেন? সেই কালশশীকে জগৎ ছাড়া ভাবিলে চলিবে কেন? বিরহের জ্বালায় সমস্ত ক্ষুদ্র জ্ঞান ভস্মীভূত হইয়া গেলে, তখন আর প্রিয়তমের সঙ্গচ্যুতি ঘটে না। বিরহ জীবের সাধনার মধ্যে আসিবেই আসিবে। বিরহ দ্বারাই গোপীগণ বৃক্ষ পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। গোপীগণের বিরহ শ্রীচৈতন্য-জীবনে অক্ষরে অক্ষরে প্রতিফলিত।

কৃষ্ণের বিয়োগে গোপীর দশ দশা হয়।
সেই দশ দশা হয় প্রভুর উদয়।

এই দশ দশা 'উজ্জ্বল নীলমণিতে' শ্রীরূপ-গোস্বামী উল্লেখ করিয়াছেন,—

চিন্তাজাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপোব্যাধি উন্মাদো মোহোমৃত্যুর্দ্দশাদশ॥

পাঠক শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তলীলার দিব্যোন্মাদের ভিতর প্রত্যেক ভাবেরই পরিপুষ্টি দেখিতে পাইবেন। ঐ দেখুন জয়দেব তাঁহার অমিয় লেখনীতে শ্রীরাধার যে বিরহোৎকণ্ঠা বর্ণন করিয়াছেন; সেই পদটী বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করুন; আর মহাপ্রভুর সেই বিরহোন্মাদ একবার কবির লেখনীর সাহায্যে অনুমান করুন; দেখিবেন অনুমাত্রও পার্থক্য নাই, দেখিবেন যেন একই ভাবে—একই রসে উভয় হৃদয় মিশিয়া গিয়াছে;—যেন দুইয়ে এক হৃদয়, এক মন, এক প্রাণ। জয়দেব যেন ধ্যান-সহায়ে শ্রীরাধার বিরহ মূর্ত্তি দেখিতে পাইয়া ভাষায় ব্যক্ত করিলেন,—

বহতি চ বলিত বিলোচনজলধর মাননকমলমুদারং।
বিধুমিব বিকটবিধুন্তুদদন্ত দলনগতিলামৃতধারং।
বিলিখতি রহসি কুরঙ্গমাদন ভবন্তমসমশরভূতং।
প্রণমতি মকরমধো বিনিধায় করে চ শরং নবচূতং॥ গীতগোবিন্দ।

"অশ্রুধারা যুত, সুষমা শোভিত,
বদন কমল করে সে ধারণ।
হেন লয় মনে, রাহুর দংশনে,
সুধাধারা শশী করিছে ক্ষরণ॥
তোমারে মদন, ভাবিবা কখন,
মৃগমদে চিত্র করে সে অঙ্কন।
করে চূত শর, চরণে মকর,
আঁকি নিরজনে প্রণমে চরণ।" (সতীশচন্দ্র রায়)

চৈতন্য-ভাগবতেও দেখিতে পাই,—

ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ আকৃতি।
চাহিয়া রোদন করে, ভাসে সব ক্ষিতি॥

আবার সেই সাধক-প্রবরের বর্ণিত চিত্র পানে দৃষ্টিপাত করুন, দেখুন অতি ব্যগ্রতা বশতঃ শ্রীমতী সমাধিনিষ্ঠ হইয়া সেই ধ্যেয় বস্তু—সেই দুর্লভ বস্তুর

দর্শন পাইয়া, কখনও বা বিলাপ করিতেছেন কখনও বা হাসিতেছেন, কখনও ভ্রমন উল্লাস—কখনও রোদন।

ধ্যানলয়েন পুরপরিকল্প্য ভবন্তমতীব দুরাপং।
বিলপতি হসতি বিষীদতি চঞ্চতি মুঞ্চতি তাপং॥ গীতগোবিন্দ।

ভাগবতে ঋষিমুখেও ঐ কথা,—

এবং ব্রত স্বপ্রিয় নাম কীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়তুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ১১।২।৩৯

মহাপ্রভুর অবস্থা বর্ণনা করিয়া ঠাকুর নরহরি লিখিয়াছেন,—

আরে আমার গৌর কিশোর
নাহি জানে দিবানিশি, কারণ বিহীন হাসি,
মনের ভরমে পহুঁ ভোর।
ক্ষণে উচ্চৈঃস্বরে গায়, কারে পহুঁ কি সুধায়,—
'কোথায় আমার প্রাণনাথ';
ক্ষণে শীত, ক্ষণে কম্প, ক্ষণে ক্ষণে দেয় লাফ,
'কাঁহা পাউ, যাউ কা'র সাথ॥'
ক্ষণে উর্দ্ধ বাহু করি, নাচি বলে ফিরি ফিরি,
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে বিলাপ।
ক্ষণে আঁখি যুগ মুন্দে, 'হা নাথ' বলিয়া কান্দে,
ক্ষণে ক্ষণে করয়ে সন্তাপ।

এইরূপ বিরহে থাকিতে থাকিতে কখন সেই হৃদয়-সখার আনন্দময় স্পর্শ পাইয়া দেহের ও বাহিরের জ্ঞান ক্ষণকালের জন্য অন্তর্হিত, সেই প্রেমমদিরায় চিত্ত বিবশ, 'পরপুরুষের' প্রেমালিঙ্গনে সেই প্রেমানন্দ যেন ধমনীতে ধমনীতে শিরায় শিরায় প্রবাহিত, যেন এতদিনের উদ্বেগ এতদিনের কামনা সেই কামনাপতির চরণ-সরোজে পরিসমাপ্ত; যেন বিরহ-বিধুরা শরীরিণী ভক্তিদেবী মধু-রিপুর মধুময় মর্ম্ম-গহনে, মুক্তির আশ্রয়ে অনুপ্রবিষ্ট ও সেই আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত মনে তদগত চিত্তে ভাবমান। বদনে শঙ্কা ও ছায়া নাই, ভাবনার চিহ্ন মাত্র নাই, গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন, যেন সুষুপ্তির অগাধ সাগরে নিমজ্জমান। আবার যেন সে অপূর্ব্ব ভাবাবেশ ভাঙ্গিয়া গেল; কৃষ্ণ-গতপ্রাণা, বিনিবর্ত্তিত-সর্ব্বকামা গোপীহৃদয় যেন

আবার কৃষ্ণ অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া উঠিল, সে মহাভাবের নীরবতা নিস্তব্ধতা যেন দূরে গেল। অমনি ব্যাকুল হইয়া, সেই ভাবাবেশেই বাহ্য ভাব না আসিতেই, সংসারের 'বহু'ভাবের সহিত চিত্তের সম্পূর্ণ সংযোগ না হইতেই বলিয়া উঠিলেন,—

হা হা [illegible] প্রাণধন, হা হা পদ্মলোচন,
হা হা দিব্য সদ্‌গুণ-সাগর।
হা হা শ্যামসুন্দর, হা হা পীতাম্বর-ধর,
হা হা রাম বিলাসনাগর।
'কাঁহা গেলে তোমা পাই, তুমি কহ তাঁহা ধাই,'
এত কহি চলিল ধাইয়া,—

শ্রীচৈতন্যদেবের এই দিব্যোন্মাদ, 'স্বরূপ' 'রামানন্দ' রায় প্রভৃতি কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহারা সর্ব্বদাই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন; প্রলাপ ও উন্মাদের সময় তাঁহারা শুশ্রূষা করিতেন। যখন ৺জগন্নাথের শ্রীমন্দিরে দাঁড়াইয়া, থাকিতে থাকিতে রাধাভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বিগ্রহ-মূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্র নন্দন রূপে দর্শন করিয়া, মহা আবেগে আলিঙ্গনপূর্ব্বক ও সেই প্রস্তরময় প্রাঙ্গণে লুণ্ঠিত হইতেন,—তখন ইহারাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ ধ্বনিতে আবার প্রভুকে বাহ্যাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতেন। তাঁহারাই তাঁহার হৃদয়ের নীরব ভাষা বুঝিতে পারিতেন, আর তদনুযায়ী ভাগবতের শ্লোক বা ভগবানের লীলা-ব্যঞ্জক নাটকাদি তাঁহার কর্ণে উচ্চারণ করিতেন। আবার কখন কখন সে গৌরতনু ধূলায় ধূসরিত, প্রেমোন্মাদে মত্ত হইয়া, ভাবসমুদ্রের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে, শ্রীবিগ্রহের বদন পানে দীর্ঘায়ত-নেত্র তুলিয়া নর্ত্তন করিতে করিতে চলিতেন; তখন বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্তপ্রায়। তাঁহার বিরহ, প্রলাপ, ব্যাধি, উন্মাদ সকলই শ্রীভগবানকে লইয়া; —তাঁহার এই ভাব অন্তরঙ্গ ভক্ত হৃদয়ে সেই রাধাঠাকুরাণীর মহাভাবের ইঙ্গিত করিত।

পাঠক! গৌরাঙ্গ-জীবনের এই বিরহোন্মাদ, এই বিচিত্র ভাবোদ্গার, এই অপার্থিব কৃষ্ণপ্রেমের আলোচনায় জীবের সার্থকতা কি? শ্রীভগবানে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবিহীন শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি সহজে লাভ হয় না। দেহাত্মবুদ্ধির বিসর্জ্জন দিয়া, দেহ ও মনের অতীত সেই মহাভাব সমাধি-রূপ আনন্দ সহজসাধ্য নহে। এই অত্যুন্নত গোপীপ্রেমের উপলব্ধি, বাসনার কুহকে ও মোহান্ধকারে নিমজ্জিত

জীবের দুঃসাধ্য। কিন্তু তবুও ইহার আলোচনায় আবশ্যকতা আছে। গোপী-শক্তি যেরূপ শ্রীভগবানের স্বরূপ শক্তি, জীবও তদ্রূপ তটস্থ। ভক্তি-সাধনা বলে এই শক্তি সেই স্বরূপের সহিত একীভূত হইতে পারে। কবে জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস হইবে! শ্রীচৈতন্যদেব জীবের স্বরূপ বলিতে গিয়া স্পষ্টতঃই বলিয়াছেন,—

জীবের স্বরূপ হয়—কৃষ্ণের নিত্য দাস।
কৃষ্ণের তটস্থ শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।

তটস্থিত বৃক্ষ যেমন নদীকে ইঙ্গিত করিবার জন্যই আছে, জীব স্বরূপতঃ কেবল শ্রীভগবানকে ইঙ্গিত করিবার জন্য আছে। জীবশক্তি গীতার পরা প্রকৃতি। ইহাকে জীব "অহং" বা পুরুষরূপে বুঝে, "অহমিতি প্রবদন্তি জীবং" (ভাগবত ১২।৩০।৭) সেই জীবকে পরম আকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদাই সপ্ত-প্রকাশ-রন্ধ্রযুক্ত প্রেম-মুরলী ধ্বনিতে নাম ধরিয়া ডাকিতেছেন। এই ধ্বনি ধীরে ধীরে তাঁহার চরণ কমলের মধুপানের জন্য জীবকে তৃষিত করিতেছে। কিন্তু বিশিষ্ট "আমি"র আবরণে আবৃত হইয়া, সেই আনন্দ-খনিতে যাইতে পারিতেছে না। প্রত্যেক কাম্যবস্তুর ভিতর দিয়া সেই ভূমারই আনন্দ প্রকাশিত হইতেছে; কিন্তু জীব তাহার মোহে বুঝিতে পারিতেছে না।

ভেদবুদ্ধি এই মিলনের অন্তরায়, বিশিষ্টতা এই মিলনের বাধা, পরিচ্ছিন্নতা এই মিলনের মহা বিঘ্ন। এই ভেদবুদ্ধির জন্যই ত' গোপীদিগের মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধান হইয়াছিলেন। তাঁহার সেই মুরলী নিঃস্বনে জীব আপনার অজ্ঞাতসারে 'সর্ব্ব'ভাবের ভিতর দিয়া, অচল স্থির ও উদ্ধতব স্তরে স্থিত, একত্বকে সর্ব্বদাই পাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু জীব ঠিক পথে চলিতে পারিতেছে না। সেই অত্যুচ্চ অবস্থার কথা ছাড়িয়া দিলেও, যে অবস্থায় শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বরাগ, যে অবস্থায় মদনমোহনের মুরলী-তানে প্রাণ আকুল অথচ সেই এক রস ভিতরে প্রকটিত হয় নাই, যে অবস্থায় পার্থিব সর্ব্ব বস্তুতে বিরক্তি, কেননা জীব বুঝিতে পারিয়াছে যে জগতে এই এক পুরুষ বর্ত্তমান জীব তাঁহার দাস বা শক্তি মাত্র অথচ সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিতে পারিতেছে না, সেই প্রাথমিক অবস্থা যতদিন জীবের না আসিবে ততদিন গোপীভাবের সাধনা স্বপ্নময়, কল্পনাময় বা অসম্ভব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তবে আমাদের উপায়—উপায় ভগবানের নাম রূপগুণাদির কীর্ত্তন। তাঁহারই বাণী—

সঙ্কীর্ত্তন হইতে সর্ব্বানর্থ নাশ
সর্ব্ব শুভোদয় কৃষ্ণ-প্রেমের উল্লাস।

এই বিশিষ্টতারূপ অনর্থের নাশ না হইলে, জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণ-প্রেম অঙ্কুরিত হইবে না। তা'ই তিনি আপামর চণ্ডাল সকলকেই এই সঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়াছেন। ভাই সব! সেই অকৈতব প্রেমের অধিকার আমাদের আসে নাই ত'াই তিনি সাধারণভাবে হরিনামের মহিমা প্রকাশ করিতে বলেন। কেবল স্বরূপ ও রামানন্দের সহিত সেই 'ব্রজভাব' উদ্দীপনার নিমিত্ত চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির বর্ণিত মধুর রসের আস্বাদন করিয়া উহার পবিত্রতা প্রচার করিয়াছেন—

চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি রায়ের নাটক গীতি
কর্ণামৃত শ্রীগীতগোবিন্দ।
স্বরূপ রামানন্দ সনে মহাপ্রভু রাত্রদিনে
গায় শুনে পরম আনন্দ।

যাঁহারা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুমধুর প্রেমলীলা স্মরণ করিতে করিতে বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছিলেন, সেই নিষ্কাম প্রেমের মহান্ আদর্শ যাঁহাদের চিত্তে স্পষ্ট উদিত হইয়া স্পর্শমণি-স্পর্শে লৌহের ন্যায় যাঁহারা কামকে নির্ম্মল স্বর্ণে পরিণত করিয়াছে, সুতরাং যিনি সেই ব্রজ-প্রেমের অধিকার লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সেই ব্রজের রস আস্বাদন করুন, সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মধুর ভাবার্থক উপাসনায় মনো-নিবেশ করুন! কিন্তু আমাদের ন্যায় বহির্ম্মুখী জীবে অবলম্বনীয় তাঁহারই উপদিষ্ট শ্রীহরি-সংকীর্ত্তন। একবার মনে নিষ্ঠা করিয়া হরিনামকে আশ্রয় করুন্, দেখিবেন চিত্তরূপ দর্পণ আপনি মার্জ্জিত হইয়াছে; বাসনার কুহক-জাল আপনি তিরোহিত হইয়াছে। চিত্তরূপ দর্পণ মার্জ্জিত হইলেই, দেখিবেন সেই চিত্ত সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করিতে সক্ষম হইয়াছে। যদি সংসার-দাবানলের দারুণ সন্তাপ নির্ব্বাপিত করিতে চান, শ্রীহরি সংকীর্ত্তনকে আশ্রয় করুন। আমাদের গৌরচন্দ্রের উদয়ে এই সংকীর্ত্তন-রূপ আনন্দ জলধি উচ্ছ্বসিত হইয়া মানব হইতে পশু পর্য্যন্ত এই প্রেমসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছিল। এই সংকীর্ত্তন বন্যায় সর্ব্বত্রই পরম শ্রেয় কুমুদকুল ফুটিয়া উঠিয়া ভক্ত চক্রবাক-গণকে পরম আনন্দ প্রদান করিয়াছিল; মৃতপ্রায় বিদ্যাবধূ অবিদ্যার হস্ত

হইতে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল, জীবের মন বুদ্ধি বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া ভগবৎ সেবার অধিকার লাভ করিয়াছিল। তা'ই মহাজনের ভাষায় বলি কলিযুগের অবলম্বনীয় শ্রীহরি সংকীর্ত্তন—জয়যুক্ত হউক।

চেতো দর্পণ মার্জ্জনং ভব মহাদাবাগ্নি নির্ব্বাপনং
শ্রেয়ঃ কৈরব চন্দ্রিকা বিতরণং বিদ্যাবধূ জীবনং
আনন্দাম্বুধি বর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্ম স্বপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্ত্তনং।

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দাস।

ধর্ম্ম]

প্রণব-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গতবারে আমরা অহংতত্ত্ব-বিশ্লেষণে দেখিয়াছি, যে অহং বাস্তবিক ওঙ্কারেরই অভিব্যক্তি। উহা 'অ' অর্থাৎ 'সামান্য' ভাব হইতে উত্থিত হইয়া, 'হ' অর্থাৎ বিশেষ মাত্রায় পরিস্থাপিত হইয়া, পরে 'ম' রূপে কোথায় কি এক মহান্ অব্যক্তে মিশিয়া যাইতেছে। এই 'হ' মাত্রাটী আছে বলিয়া, আমরা আমাদিগকে বিশেষভাবে 'রাম', 'শ্যাম' বা দেবতারূপে কল্পনা করি। কিন্তু যখন 'হ' মাত্রাটীকে শ্রীভগবানে প্রত্যর্পণ করিতে পারি, তখন সর্ব্ব ব্যাপারে ভগবদ্‌শক্তি ও ভগবদ্ ব্যাপারের লক্ষণা দেখিতে পাইয়া, ওঙ্কারের 'পরাস্রোতে' মিশিয়া আমাদের চৈতন্য শ্রীভগবানে পরিসমাপ্ত হয়।

সাধারণতঃ মানব তাহা দেখে না। সেইজন্য জন্ম-জন্মান্তরে বিশিষ্ট 'হ' লইয়া খেলা করে, এবং কালবশে মৃত্যু নামক 'ম'এর 'পরাস্রোতে' পড়িয়া, তাহার কল্পিত 'হ' মাত্রাটীকে ত্যাগ করিয়া অব্যক্তে মিশিতে যায়। এই 'হ' মাত্রাটী অধিভূত অধিদৈব ও অধ্যাত্ম ভাবে থাকে। যাঁহারা প্রণবের এই তিন মাত্রাকে পরস্পর মিলাইয়া এক মহান্ বিশেষ অথচ সর্ব্বাত্মক ভগবানের দিকে প্রযুক্ত করেন, তাঁহারা বাহ্য, অভ্যন্তর ও মধ্যম অর্থাৎ জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি ব্যাপারের মধ্যে এক 'পরাগতি' দেখিতে পাইয়া আর কম্পিত

হন্ না। কিন্তু যাঁহারা মাত্রাগুলিকে পৃথক করিয়া প্রয়োগ করেন, তাঁহারা মৃত্যু হইতে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হন। সেইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন,—

ত্রিস্রোমাত্রা মৃত্যুমত্য প্রযুক্তা অন্যোন্যসক্তা অনবিপ্রযুক্তাঃ।

ক্রিয়াসু বাহ্যাভ্যন্তরমধ্যাসু সম্যক্ প্রযুক্তাসু ন কম্পতে জ্ঞঃ। প্রশ্ন ৫৮।৬।—

"যিনি স্বপ্নের অন্ত ও জাগ্রতের অন্ত, অর্থাৎ স্বপ্ন ও জাগ্রত প্রভৃতি অবস্থার মধ্য দিয়া প্রবাহিত শুদ্ধ-তত্ত্বকে অভেদভাবে দর্শন করেন, সেই মহান্ বিভু আত্মাকে জানিয়া ধীর অর্থাৎ বুদ্ধির ভাষায় পরিপুষ্ট ব্যক্তি আর শোক করেন না। তা'ই শ্রুতি বলিয়াছেন,—

স্বপ্নান্তং জাগরিতান্তং চোভৌ যেনানুপশ্যতি।

মহান্তং বিভুমাত্মানং মত্বা ধীরো ন শোচতি ॥ কঠ ২।৭৫।৪॥

'অনুপশ্যতি' কথার অর্থ কি? অনেকে দার্শনিক ভাষাকে বৃথা 'কচ্‌কচি' বলিয়া মনে করেন এবং ভাবেন যে, ভক্তি গ্রন্থাদি পাঠ করিলেই ভগবদ্‌ভাব সহজেই প্রকটিত হয়। আত্মা অতি সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম বলিয়াই দুর্বিজ্ঞেয়। বাহ্য বা দৃশ্যভাবে জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতির অনুশীলন করিলেই, সেই অবস্থাগুলির ক্রিয়া হইতে আত্মা লক্ষিত হইতে পারে; কিন্তু বাহ্যভাববশতঃ প্রকৃত আত্ম-স্বরূপ জানা যায় না। ভিতর হইতে—'অনু'ভাবে দেখাই প্রকৃত দর্শন। সেইজন্য ভাষ্যে আচার্য্য বলিয়াছেন,—তং মহান্তং বিভুম্ আত্মানং মত্বা অবগম্য আত্মভাবেন সাক্ষাৎ 'অহমস্মি পরমাত্মা' ইতি ধীরো ন শোচতি।" ধীর ব্যক্তি সেই মহান্ বিভু আত্মাকে মনন করিয়া,—অর্থাৎ "আমিই পরমাত্ম-স্বরূপ" এইরূপে আত্ম-সাক্ষাৎকার করিয়া আর শোক করেন না। 'আমিই' তিনি বা 'আমি' তাঁ'র, এই বুদ্ধি না আসিলে প্রকৃত পরমাত্মতত্ত্বের অবগতি হয় না। এইরূপ ভাবে দেখাকেই 'অনুপশ্যতি' বলে। ইহা প্রাকৃতিক খেলার সহিত 'আমি'কে মিশাইয়া দেখা নহে। ইহাই বুঝাইবার জন্য 'ধীর' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। 'ধীর' শব্দে নিরীহ গো-বেচারা ব্যক্তি নহে; ধী অর্থাৎ বুদ্ধির ভাবে পরিপুষ্ট। বুদ্ধির কার্য্য অধ্যবসায়, অর্থাৎ একই অধিকরণ বা আধারে, বৃত্তি বা ভাবরাশিকে অবসান বা শান্ত অর্থাৎ শেষ করিয়া দেখা। ভেদভাবে অবস্থিত জীবের বুদ্ধি বাহিরের দিকে প্রধাবিত; তাহার পুরুষজ্ঞান হয় নাই বলিয়া, সে ভিতরের ভাবরাশিকে বাহিরের দিকে প্রধাবিত ও বাহিরের সেই

আধারে ভাবগুলিকে স্থির করিতে চেষ্টা করে; যেমন পুত্র বা স্ত্রী বুদ্ধি। আমাদের পুত্র ও স্ত্রী বাহিরে নাই; তত্তৎ-সম্বন্ধীয় ভাবরাশিকে যে আধারে স্থির করিয়া দেখিতে পাই, তাহাই আমাদের নিকট পুত্র বা স্ত্রীরূপে পরিণত হয়। পুত্র বা স্ত্রী যদি বিশিষ্ট ব্যক্তিকে বুঝাইত, তাহা হইলে বহু পুত্রে বা জন্ম-জন্মান্তরে বিভিন্ন পুত্রে ও স্ত্রীতে বৃত্তিগুলিকে স্থির করিতে পারিতাম না। সুতরাং এই আপেক্ষিক (relative) স্থৈর্য্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগত নহে—উহা বুদ্ধিগত। বুদ্ধি যে ভাবে খেলে, সেই ভাবে আমরা বৃত্তিগুলিকে স্থির করি; সুতরাং বুদ্ধির গতি ও রহস্য না বুঝিতে পারিলে, প্রকৃত 'অনুপশ্যন্' ক্রিয়া সিদ্ধ হইতে পারে না। বুদ্ধির এই অধ্যবসায় সাধারণতঃ বহুরূপে বাহিরের পদার্থের দিকে থাকে। সেই জন্য এই বুদ্ধিকে শাস্ত্রে অবুদ্ধি বা অব্যবসায়ী বুদ্ধি বলে; কারণ প্রকৃত বুদ্ধি একাভিমুখী।

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধিরব্যবসায়িনাম্॥" গীতা।

তা'ই শ্রুতিও বলিলেন,—

এষ সর্ব্বেষু ভূতেষু গূঢ়াত্মা ন প্রকাশতে।
দৃশ্যতে ত্বগ্র্যয়া বুদ্ধ্যা সূক্ষ্ময়া সূক্ষ্মদর্শিভিঃ॥ কঠ ৩।১।৬।১২॥

এই পুরুষস্বরূপ যে পরাগতি, তাহা উপলব্ধির প্রকার কি? তা'ই শ্রুতি আবার বলিলেন,—এই পুরুষ সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে নিহিত, সেই জন্য স্বরূপতঃ ইহাকে চিনিতে পারা যায় না। তবে "সূক্ষ্মদর্শিভি সূক্ষ্মত্বাদিবিশ্রামস্থানত্বেন যে আত্মানং পশ্যন্তি তৈঃ, অগ্র্যয়া একাগ্রতাসম্পন্নয়া, সূক্ষ্ময়া যোগোপাসনাদি-সংস্কৃতয়া, বুদ্ধ্যা তু নতু বহিরিন্দ্রিয়ৈঃ এষ আত্মা দৃশ্যতে যথাযথ রূপং গৃহ্যতে।" (শাঙ্কর ভাষ্য) 'সূক্ষ্মদর্শী' অর্থে সূক্ষ্মতা প্রভৃতি বিশ্রাম স্থানের দ্বারা যাঁহারা আত্মাকে দেখেন, আচার্য্য এই অর্থ করিলেন। যাহারা স্থূলাদি বৃত্তি ও শক্তি-নিচয়ের খেলা দেখিয়া তাহাতে বিক্ষিপ্ত না হইয়া, এক বুদ্ধির গতির দ্বারা সেই খেলার সূক্ষ্ম কারণ প্রভৃতির 'পর' (Transcendent) বিশ্রামস্থান বা লয়-স্থান দেখিতে পান, যাঁহারা বৃত্তি প্রভৃতির দ্বারা সদ্বস্তুর পরিমাণ না করিয়া, সেই অনন্ত বৃত্তিগুলি যে পরা বা চৈতন্য-ঘন ভাবে লয় হইয়া স্থির হয়; সেই লয় বা স্থির ভাব দেখিতে প্রয়াস করেন, তাঁহারাই প্রকৃত সূক্ষ্মদর্শী।

যাঁহারা জাগতিক কোনও ব্যাপারে বাহ্য কারণ-নির্দ্দেশ করিয়া তৃপ্ত না হ'ন, যাঁহারা এইরূপে সর্ব্বপ্রকার কার্য্য-কারণ রাশিকে এক চৈতন্ত-ঘন 'পর'-পরিপূর্ণ পুরুষেই লয় করিয়া বাহ্য খেলার প্রকৃত কারণ পুরুষ-ভাবে নির্ণয় করিতে প্রয়াসী হয়েন, তাঁহারাই সূক্ষ্মদর্শী। এই লয়-দর্শনকে পূর্ব্বে 'অন্ত দর্শন' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই কথাই শ্রুতি অন্যত্রে বলিয়াছেন,—"অনধ্বগা অধ্বসু পারয়িষ্ণব" অর্থাৎ যাঁহারা কোন প্রকারে ব্যবহারিক পথের অনুগমন না করিয়া, পথের দ্বারা পার গমন বা পরাভাবে যাইতে পারেন, তাঁহাদেরই প্রকৃত বুদ্ধি হইয়াছে। তোমার পুত্র মরিয়া গেল। এই মরণরূপ ব্যাপার বুঝাইবার নিমিত্ত চিকিৎসাশাস্ত্র বলিলেন, 'উহার 'টাইফয়েড' রোগ হইয়াছিল।' এতদ্বারা তুমি ব্যবহারিক পথ বা অনুসন্ধান অতিক্রম করিতে পারিলে না। আর একজন বলিল, 'এই ব্যাপার কর্ম্ম-জন্য;' এবং তুমিও কর্ম্মরূপ স্থূল হইতে সূক্ষ্ম পর্য্যন্ত যে পথ বিস্তৃত আছে, সেই পথের স্বরূপ নির্দ্ধারণে ব্যস্ত রহিলে ; তুমিও ব্যবহার-পন্থী। আর একজন বলিলেন, "তোমার চিত্তশুদ্ধির জন্য ভগবান এই পুত্রশোক দিয়াছেন।" ইহা দ্বারা তুমি চিত্তশুদ্ধি স্বরূপ অপরিজ্ঞাত অবস্থা (x), ভগবানরূপ অচিন্ত্যনীয় পুরুষ (y) ও সেই পুরুষের দ্বারা অনির্ব্বচনীয় শোক ও মোহরূপ আত্মজ্ঞানের বিপর্য্যয়কারী (z) পদার্থের প্রাপ্তির কথা ভাবিতে লাগিলে। কিন্তু তোমার ভাবনায় x. y. z. প্রভৃতি অপরিজ্ঞাত অপরিসমাপ্ত বুদ্ধির গতি রহিয়া যায় বলিয়া, তুমি প্রকৃত রূপে শোকের কারণ বুঝিতে পার না। এ পথে তোমার চিন্তার সূক্ষ্ম বিশ্রামস্থান অর্থাৎ 'কর্ম্ম,' 'ভগবান,' 'চিত্তশুদ্ধি' প্রভৃতি সূক্ষ্ম কর্ম্ম, পদার্থ বা ভাব দেওয়া হইল বটে ; কিন্তু ঐ অপরিজ্ঞাত ভাবগুলি প্রত্যেকটী তোমার 'আমির' বাহিরে। সেই জন্য তোমার বুদ্ধির একাগ্রতা গতি হইল না এবং শোকের দিকে দৃষ্টি থাকাতে তোমার চৈতন্য সূক্ষ্মভাবে খেলা করিয়াও পরাভাবে অবস্থিত হইল না। কারণ এই সূক্ষ্মানুন্ধানেও কয়েকটী বিশিষ্ট 'হ' মাত্রা আছে।

এইরূপ ভাবে 'অ' অর্থে জাগ্রত, 'উ' অর্থে সূক্ষ্ম, 'ম' অর্থে কারণ-অবস্থাস্থিত শক্তি বা চৈতন্যের ভাবগুলিকে বিভিন্ন ভাবে দেখিলে, তোমার বুদ্ধির এক-রসতা উৎপন্ন হইবে না ; সেই জন্যই ওঙ্কার বুঝা হইবে না। কিন্তু যদি তুমি এই 'ত্রয়' বা বিশ্ব-তৈজস-প্রাজ্ঞকে এমন ভাবে এক করিতে পার, যে পূর্ব্ব

পাদগুলি পর পর পাদে নিঃশেষে প্রকৃষ্টরূপে মিশিয়া যাইতে পারে। যেমন বরফ-রূপ স্থূল ভাব—জলরূপ তরল ভাবে ও জলরূপ তরল ভাব—বাষ্পরূপ ভাবে নিঃশেষে মিশিয়া যায়, তখনই তুমি 'অ'—'উ'—'ম' এই পাদত্রয়ের গতি বুঝিতে পারিবে। সেই জন্য মাণ্ডুক্য ভাষ্যে আচার্য্য বলিলেন'—"ত্রয়ানাং বিশ্বাদীনাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবিলাপানেন তুরীয়স্য প্রতিপত্তিরিতি করণসাধনঃ," বিশ্ব প্রভৃতি পাদত্রয়ের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাদের বিলাপন সাধন দ্বারা তুরীয় ব্রহ্মের উপলব্ধি হইয়া থাকে। প্রণব বুঝিবার অগ্রে বুদ্ধির অনন্তভাবে স্থির হইবার প্রবৃত্তিটী অন্ততঃ বিশ্ব তৈজসাদি ঘন মহান্ ভাবের সাহায্যে এক করিতে হইবে। আর স্থূল জগতে বস্তুর নির্দ্দেশ করিয়া তৃপ্ত থাকিলে চলিবে না। স্থূল বস্তু বা বৃত্তিগুলিতে 'অ' অর্থাৎ অধিভূত জাগ্রত-চৈতন্য মাত্রায় এক করিয়া মিশাইতে হইবে। সূক্ষ্মভাবে সূক্ষ্মতর লোক ও শক্তি নিচয়ের খেলা দেখিয়া নাচিলে চলিবে না। তথায় তৈজস বা অধিদৈব-তত্ত্ব ভাবের একত্বে বহুকে এক করিতে হইবে; কারণেও তদ্রূপ।

এই ত, গেল প্রথম কথা। মানব জাতির,—আমাদের নিজেদের সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্যের যাঁহারা পারিপার্শ্বিক জীবনের শক্তি, (Effects of environments) বংশগত সংস্কার, (Heridity) বিশিষ্ট জীবের কর্ম্ম প্রভৃতি দেখেন,—যাঁহারা বাসনা-ক্ষেত্রে কেবল বিশিষ্ট আনন্দপ্রদ নিয়ম বা প্রথা দর্শন করেন, বা যোগীভাবে তত্তৎ বাসনা ও মননের মধ্যে দেবতা গন্ধর্ব্বাদি শক্তি ও সত্ত্বা দেখিয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ জ্ঞান করেন, যাঁহারা পরাবিদ্যার খোলস লইয়া খেলা করিয়া, কারণ শরীরে বিশিষ্ট ভেদাত্মক বীজ-চৈতন্যের খেলা মাত্র দেখিতে পান, তাঁহাদের চিত্তে এই পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাদের প্রবিলাপন রূপ কার্য্য এখনও আরম্ভ হয় নাই। কারণ তাঁহারা যদিও বিভিন্ন ভাবরাশি এক করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তত্রাচ ঐ একীকরণ চেষ্টা বিভিন্ন ভাবে ও বিভিন্ন শক্তি-মাত্রার সাহায্যে সাধিত হইতেছে বলিয়া, উহা ঐকদেশিক ও অলীক। তাঁহাদের বুদ্ধি এখনও 'অনন্ত' না হইলেও 'বহু শাখা'। তাঁহাদের চেষ্টার ফলে বিজ্ঞান শাস্ত্র (Science) পরিপুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু উহা অধ্যাত্ম-শাস্ত্র নহে। প্রণবের উচ্চারণেও 'অ'—'উ'—'ম' এই তিনটী মাত্রা ছিন্ন বা বিশিষ্ট হইয়া উচ্চারিত হয় না। 'অ'টী—'উ'এ, 'উ'টী—'ম'এ একেবারে মিশিয়া যায়। সত্য

বটে তাঁহারা বিভিন্ন পদার্থ লইয়া তাহার ভিতর স্থূল ভাব বা 'অ' হইতে সূক্ষ্ম ভাবে বা 'উ'তে যাইবার চেষ্টা করিতেছেন ; কিন্তু তাঁহাদের চিন্তায় 'ম' বা ব্যক্ত ভাবের পরিসমাপ্তির প্রবৃত্তি নাই। "রাম আজ ঋষি-গুরু লাভ করিল, তাহার কারণ তাহার সূক্ষ্ম ভাব অতি পরিষ্কৃত।" এইরূপ চিন্তায় তাঁহারা অন্ত বা লয় স্থান দেখিতে পাইতেছেন না। সুতরাং বিদ্যাভিলাষী হইয়া শ্রীভগবানের দিকে চাহিয়াও, তাঁহারা চৈতন্যস্রোতের ক্ষুদ্রাবর্ত্তে পড়িয়া যাইতেছেন। তারপর তাঁহাদের সূক্ষ্ম ভাবগুলিও বিভিন্ন। একটী স্থূল ভাব যেরূপ ভাবে তাহার সূক্ষ্ম কারণে পরিণত হয়, অপর একটী স্থূলভাব তাহার ভিন্ন কারণে বিভিন্ন ভাবে মিশিয়া যায়। দারিদ্র্যরূপ স্থূলাবস্থার কারণ পূর্ব্ব জন্মের অপরিগ্রহ শূণ্যতা। পূর্ব্বজন্মে সর্ব্বাত্মিকা-ভাবে অর্থের ব্যবহার হয় নাই বলিয়া, এজন্মে দারিদ্র্য।" Aura বা জ্যোতিচ্ছটায় হরিদ্রা বর্ণ থাকিলে, সেই ব্যক্তির ভিতরে জ্ঞানের প্রাবল্য বা স্থিতি বুঝা যায়।" এইরূপ নানা প্রকার সূক্ষ্ম ও বিশিষ্ট কারণের নির্ণয় করিয়া আমাদের আধুনিক থিয়সফিষ্ট ভ্রাতারা ভাবেন, বুঝি প্রকৃত বিদ্যার চর্চ্চা করা হইতেছে। ইহা এক জাতীয় যোগ বটে ; কিন্তু অধ্যাত্ম-যোগ নহে। কারণ ইহার দ্বারা বুদ্ধির বিভিন্নতা-স্রোত এক হয় না। সেই জন্য আচার্য্য বলিয়াছেন,—প্রণবের পরাগতি বুঝিতে গেলে, "একেনৈব প্রযত্নেন যুগপৎ প্রবিলাপয়ন্ তদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতেতি," অর্থাৎ একই প্রযত্নের দ্বারা জাগ্রত, স্বপ্ন বা বিশ্ব তৈজসাদি পাদ ও মাত্রাগুলিকে লয় করিতে হইবে। বুদ্ধির স্রোত একই ভাবে যাওয়া চাই এবং সেই একত্ব ভাব যেন কোথাও ছিন্ন হয় না।

কথাটা আমাদের আর একটু বুঝা আবশ্যক : সেই জন্য দুইটী পৌরাণিক কাহিনীর অবতারণা করিতেছি। পুরাণ যে বেদ ও উপনিষদ প্রভৃতির পরিপূরক, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিবেন ; আর বোধ হয় প্রক্ষিপ্তবাদের চসমা পরিয়া স্বকল্পিত রঙে শাস্ত্রকে রঞ্জিত করিবেন না। আধুনিক থিয়সফিষ্টেরা বহু গবেষণা ও অন্বেষণের পর বুঝিয়াছেন যে, আমাদের 'আমি' জ্ঞানের তিনটী বিশেষ মাত্রা আছে। জাগ্রত ভাবগুলি জাগ্রত 'আমি' মাত্রায় (Permanent atom) সূক্ষ্ম ভাবগুলি সূক্ষ্ম মাত্রায় ও কারণ ভাবগুলি কারণ মাত্রায় অধিগত হয়। তাঁহাদের এই আবিষ্কারে মানব জীবনের অনেক ব্যাপার স্পষ্টরূপে বোধগম্য

হইয়াছে। এই তিনটীকে 'ত্রিতয়' বলে। একটীর অভাবে আমরা অন্যটিকে দেখিতে পাইনা। ভাগবতে এই তিনটীর নাম আধিভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক পুরুষ। এই তিনটীকে যিনি এক করিয়া দেখেন, তিনিই আত্মা ও আশ্রয়; কিন্তু একটী ভিন্ন অপরটীকে দেখা যায়না বলিয়া তিনটীই মায়াময়।

"যোঽধ্যাত্মিকোঽয়ং পুরুষঃ সোঽসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদ পুরুষোহ্যাধিভৌতিকঃ॥
একমেকতরাভাবে যদা নোপলভামহে।
ত্রিতয়ং যত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়॥" ২।১০।৮।৯॥

এই তিনের দ্বারা এককে দর্শনই প্রকৃত দর্শন। কিন্তু পুরাকালে "ময়" দানব এই তিনটীর চতুর্দ্দিকে লৌহ, রজত ও স্বর্ণময় তিনটী পুর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমাদের সকলের ভিতরেও সেইরূপ বিভিন্ন পুর এখনও রহিয়াছে। ফলে, একের ফল অন্যটীতে পৌছায় না; সুতবাং মানব ও দেবতা পরস্পরের মধ্যে যজ্ঞের স্রোত বন্ধ হইয়া গেল। এই দুর্দ্দিনে দেবতারা ভগবান বিষ্ণু ও মহাদেবের শরণাপন্ন হইলে, মহাদেব সেই ত্রিপুর দাহ করিবার জন্য সমস্ত দেবতাদিগকে মিশাইয়া ধনু প্রস্তুত করিয়া, তাহাতে সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির আশ্রয়রূপ ভগবান বিষ্ণুকে শররূপে প্রয়োগ করতঃ, "সোঽহম্" এই বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের সাহায্যে সেই শরত্যাগ করিলে, যুগপৎ তিন পুর ধ্বংস হইয়া গেল। কারণ 'ময়' দানব এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, ঐ তিনপুর একেবারে ধ্বংস না করিলে, কেহ উহা ধ্বংস করিতে পারিবেনা। ইহাই শঙ্করের "একেনৈব প্রযত্নেন"।

দ্বিতীয় আখ্যানটী অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ। তাহাতে আমরা বুঝিতে পারি, যে শুধু ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া শরত্যাগ করিলে, একমাত্র রন্ধ্রযুক্ত ভগবানের সুদর্শন রূপ কাল চক্রের দ্বারা আবৃত 'মৎস্যকে' বিদ্ধ করা যায় না। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত লোকের মধ্যে ঐরূপ একটী কালচক্র আছে; তাহাতে একটী মাত্র ছিদ্র। তাহাতে যিনি নিম্ন তত্ত্বের অর্থাৎ বুদ্ধি ও চিত্তের মধ্যে সেই 'পর'লোকের আভাস দেখিতে পান অর্থাৎ বুদ্ধি ও চিত্তের ভিতর প্রকৃত পরাভিমুখী গতি দর্শন করিয়া সেই গতিকে নিষ্কল ভাবের প্রতিবিম্ব বলিয়া বুঝিয়া, সমাহিত চিত্ত ও বুদ্ধির

সাহায্যে ঐ গতির ভাষায় অভ্যস্থ হইয়া শরত্যাগ করিলেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিতে পারেন। বাহিরের 'সর্ব্ব' ও ভিতরের 'আমি'র ভিতর যিনি এক সর্ব্বাত্মিকা ওংরূপী পরাগতি বা প্রবণতা দেখিতে পান, যিনি সর্ব্বাবস্থায় লয়াভিমুখী একত্ব দেখিতে পান, তিনিই সেই মহান্ গতিকে ধনুরূপে প্রয়োগ করিতে পারেন। এই প্রণবরূপ পরাগতি হৃদয় আকাশ হইতে উৎপন্ন হইতেছে। উহা বিশিষ্ট বৃত্তি বা বাহ্য বস্তু প্রভৃতির বোধ রোধ করিলে ভাবিত বা পরিপুষ্ট হয়। ঐ পরাভাবের উপাসনার দ্বারা আমাদের ক্ষুদ্র আত্মজ্ঞানের ভেদ বিভিন্নতার মলা দূর হয়। ঐ পরাস্রোতে দ্রব্য, ক্রিয়া ও কারকাদি ত্রিতয় বুদ্ধি ভাঙ্গিয়া যায়। এই স্রোতের পরিজ্ঞানই প্রণবের নাদরূপ মূর্ত্তি। তারপর বুঝা যায় যে এই প্রণব-গতি 'সোঽহম্' অর্থাৎ অহংএর স-ত্বের অভিমুখে খেলে। সর্ব্ব বস্তুতেই এই প্রণবের স্রোত আছে; কিন্তু যাঁহারা তাহাতে "সোঽহং" রূপ পরাভাব দেখিতে না পান, তাঁহারা তৎসাহায্যে শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হ'ন না! এই জন্য মাণ্ডুক্য-ভাষ্যে আচার্য্য বলিয়াছেন,—"সোঽহমিতি স্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাচ্চ স্থানত্রয় ব্যতিরিক্তত্বমেকত্বং শুদ্ধত্বমসঙ্গত্বঞ্চ সিদ্ধমিত্যভিপ্রায়ঃ মহামৎস্যাদি দৃষ্টান্ত শ্রুতে।" 'সোঽহম্' এই স্মৃতির সাহায্যে স্থানত্রয় হইতে অতিরিক্ত (Transcedent) এক শুদ্ধ বা নিষ্কল অসঙ্গ অর্থাৎ বিশিষ্ট অবস্থা দ্বারা অসংস্পৃষ্ট মহাজ্ঞানে, মহামৎস্য যেরূপ নদীতে উচ্চ নিম্ন সর্ব্বস্থানেই যাইতে পারে, তদ্রূপ জাগ্রত, স্বপ্নাদি অবস্থাগুলির মধ্যেও প্রণবরূপ পরাগতি এক শ্রীভগবানেই পরিসমাপ্ত হয়। ইহাই মহাদেবের শরত্যাগ। মহাদেবের 'সোঽহং' না বুঝিলে, সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধিও ভগবানে পৌছিতে পারেনা। সেই জন্যই প্রণবকে ধনু অর্থাৎ পরাপ্রবণতারূপে বুঝিয়া সেই পরাভাবে বাহ্য 'সর্ব্ব'ভাব লয় করতঃ হৃদয়ের বিশিষ্ট 'অহং'এর ত্রিতয়গ্রন্থি ছেদ করিতে পারা যায়। তা'ই শ্রুতি বলেন,—"যদা সর্ব্বে প্রভিদ্যন্তে হৃদয়স্যেহ গ্রন্থয়ঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবতি কঠ ৩।১২৪।১৫। সর্ব্বভাবের গ্রন্থি ছিন্ন হইলে তবে বিশিষ্ট মর্ত্ত্য অহম্,—"তদ্বিপরীতাৎ ব্রহ্মাত্ম প্রত্যয়োপজননাৎ, ব্রহ্মৈবাহমস্ম্যসংসারী ইতি" তদ্বিপরীত ব্রহ্মাত্মপ্রত্যয় বা সোঽহং জ্ঞান উদয়ে 'আমিটী' অসংসারী ব্রহ্মস্বরূপে স্থিত হয়। একথা পরে বিশেষরূপে বুঝা যাইবে। এক্ষণে মুণ্ডকোপনিষদ এ বিষয়ে কি বলেন, তাহা শ্রবণ করুন;—

"প্রণবো ধনুঃশরোহ্যাত্মা ব্রহ্মতল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বোদ্ধব্যং শরবত্তন্ময়ো ভবেৎ ॥"

প্রণবঃ ওঙ্কারো ধনুঃ। যথা ইষ্বাসনং লক্ষ্যে শরস্য প্রবেশকারণং তথা আত্মশরস্যাক্ষরে লক্ষ্যে প্রবেশকারণমোঙ্কারঃ। প্রণবেন অভ্যস্যমানেন সংস্ক্রিয়মানস্তদালম্বনোঽপ্রতিবন্ধেনাক্ষরেঽবতিষ্ঠতে যথা ধনুষা অস্ত ইষুর্লক্ষ্যে। অতঃ প্রণবো ধনুরিব ধনুঃ। শরোহ্যাত্মা উপাধিলক্ষণঃ পর এব জলে সূর্য্যাদিবৎ প্রবিষ্টো দেহে সর্ব্ব বৌদ্ধপ্রত্যয়সাক্ষিতয়া; স শর ইব স্বাত্মন্যেব অর্পিতোঽক্ষরে ব্রহ্মণি; অতঃ ব্রহ্ম তৎ লক্ষ্যমুচ্যতে, লক্ষ্য ইব মনঃ সমাধীৎসুভিঃ আত্মভাবেন লক্ষ্যমানত্বাৎ। তত্রৈবং সতি অপ্রমত্তেন বাহ্যবিষয়োপলব্ধিতৃষ্ণাপ্রমাদবর্জ্জিতেন সর্ব্বতো বিরক্তেন জিতেন্দ্রিয়েণ একাগ্রচিত্তেন বেদ্ধব্যং ব্রহ্মলক্ষ্যম্। ততস্তদ্বেধনাৎ ঊর্দ্ধং শরবৎ তন্ময়ো ভবেৎ। যথা শরস্য লক্ষ্যৈকাত্মত্বং ফলং ভবতি; তথা দেহাদ্যনাত্ম-প্রত্যয়-তিরস্করণেন অক্ষরৈকাত্মত্বং ফলমাপদয়েদিত্যর্থঃ। শাঙ্করভাষ্য।

প্রণব ওঙ্কার ধনু স্বরূপ বা ইষ্বাসন,—যাহা ইষু বাণের আসন, যেমন ধনুর শক্তিতে আসিত হইয়া শর লক্ষ্যে প্রবেশ করে, তেমনই আত্মা বা 'আমি'-বোধরূপ শর অক্ষররূপ লক্ষ্যে প্রবেশের কারণই ওঙ্কার। যখন প্রণবের গতি অভ্যাসের দ্বারা সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির পরাভাবের গতি বুঝিতে পারিয়া, আত্মা বা 'আমি'র সংস্কার বা ভেদ-বিশিষ্টতার দোষের অপনয়ন হয়, তখন ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত শর যেরূপ লক্ষ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ প্রণবের পরাভাবে অভ্যস্থ অহং বিনা বাধায় অক্ষর শ্রীভগবানে অবস্থিত হয়, সেই জন্যই প্রণব ধনুঃ—আত্মা শর। জলে যেরূপ সূর্য্য প্রবিষ্ট হ'ন, দেহে সেইরূপ 'সর্ব্ব' বুদ্ধি বৃত্তির প্রত্যয় (Return current) বা অবসান ভাবের সাক্ষীরূপে আত্মা উপাধির মধ্যেও পরাভাবে লক্ষিত হন। সেই শর, স্বরূপের একত্ব বশতঃ নিজেই আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে অর্পিত হয়। এইজন্য ব্রহ্মকে তৎলক্ষ্য বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। লক্ষ্যের ন্যায় যাহারা সমাধি প্রভৃতিতে সমাধান করেন, তাঁহারা তাহাকেই আত্মভাবে উপলব্ধি করেন। তাঁহারা দেখেন যে, ব্রহ্ম সেই পরাভাবের 'আমি' 'স্ব-ভাব'। এইরূপে অপ্রমত্ত অর্থাৎ বাহ্য ও বিষয়রূপে উপলব্ধির জন্য তৃষ্ণা এবং প্রমাদ বর্জ্জিত হইয়া সর্ব্বতে বিরক্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয় ও একাগ্রচিত্তে ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিতে হইবে। এই লক্ষ্যভেদের পূর্ব্বে শররূপ পরাভাবে তন্ময় হওয়া চাই।

যেমন শর এবং লক্ষ্যের একাত্ম ভাব হইলে ফল পাওয়া যায়, তদ্রূপ পরা ভাবেরও তন্ময়তা আবশ্যক। তখন দেহাদি অনাত্মবোধ বা বুদ্ধির অবসানগুলিকে পরিত্যাগপূর্ব্বক, তাহাদিগকে তিরস্করণী বা আবরক বলিয়া বুঝিয়া অক্ষরকে একাত্ম ভাবে বিদ্ধ করিয়া সেই ফল প্রাপ্ত হইবে।

আজ মহা-পূজার দিনে সর্ব্বাত্মিকা মহামায়ার শিব স্বরূপত্ব বুঝিতে পারিয়া জীবে দয়া ও শাস্ত্রমার্জ্জিত বুদ্ধির সাহায্যে উৎপন্ন সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি বা প্রেমে অধিষ্ঠিত হইয়া, এস একবার 'আমিটাকে,'—এত সাধের 'আমি' বোধটাকে পরাভাবে শররূপে বুঝিতে চেষ্টা করি। তাহা হইলে হয়ত' জন্ম স্থিতি-ভঙ্গরূপে প্রকাশিত বিশ্বব্যাপী প্রণব-স্রোতে প্রণব ধনুর সাহায্যে, সেই পরম লক্ষ্যের আভাস পাইলেও পাইতে পারি। সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির পর-প্রবণতাকে চৈতন্যের এক অনবচ্ছিন্ন পরিপূর্ণতার স্রোতকে প্রণব বলিয়া বুঝিয়া, সেই স্রোতে পরাভাবের 'আমি' জ্ঞান স্থাপন করি। তাহা হইলে হয়ত 'হ' মাত্রাটী খসিয়া যাইতে পারে। (ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলব্ধ-বেদান্ত।

ধর্ম্ম]

মাস্তার দুর্গাপূজা।

(সত্য ঘটনামূলক।)

(১)

যোগেশ কখন বা কতক্ষণ নিদ্রিত বা তন্দ্রাতুর হইয়াছিল, তাহা ঠিক স্মরণ ছিল না; হঠাৎ একটা ডাক বা আহ্বান যেন তা'র মনের উপর সজোরে ধাক্কা দিয়া চটকা ভাঙ্গাইয়া দিল। তাহার নিজেরই বুকের ভিতর হইতে হৃদয় বা অন্তঃকরণ যে ভাষাতেই অভিহিত করুন না কেন, ওই রকম একটা স্থান হইতে অপরিচিত স্পষ্ট কণ্ঠে বলিল—'রোগী যে যায়!'

হঠাৎ বিপদ্‌গ্রস্ত বা ভয়-চকিত হরিণীর মত ব্যস্ত ও বিহ্বলভাবে এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া দেখিল কোন কিছুই বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; সমস্তই পূর্ব্ববৎ. টেবিলের উপর বাতিদানের বাতিটী পূর্ব্ববৎ জ্বলিতেছে, রোগী বেশ শান্তভাবে সুনিদ্রিত; কেবল দেওয়ালস্থিত 'ক্যারেজ' ক্লকটী টিক্ টিক্ টিক্ টঙ করিয়

জানাইল রাত্রি একটা। তবে এ বিপদের ডাক কেন—বুঝিতে পারিল না। রোগীর দেহে করস্পর্শ করিয়া,—চক্ষুস্থির, সর্ব্বাঙ্গ হিম শীতল, নাড়ী নাই! বহু ডাকাডাকিতে একটা অস্ফুট শব্দ করিল। ভীত ও কাতর যোগেশ বুঝিল, প্রাণ-শক্তি গভীরভাবে অন্তর্হিত। তৎক্ষণাৎ বহির্ব্বাটী হইতে ডাক্তার বাবু চক্ষু রগ্‌ড়াইতে রগ্‌ড়াইতে আসিয়া পড়িলেন; প্রায় এক ঘণ্টার উদ্বেগ ও আশঙ্কার পর শরীরে উত্তাপ বৃদ্ধি পাইল। বুঝা গেল টাল কাটিয়াছে। কৃতজ্ঞতাভরে যোগেশকে বলিলেন, "ঠিক সময়েই ডাকিয়াছিলেন আর কিছু বিলম্ব করিলেই রক্ষা করা দুষ্কর হইত।" ছল ছল নেত্রে যোগেশ ভাবিল "নারায়ণের দয়া;—তাহার সৌভাগ্য যে সে উপলক্ষ হইতে পারিয়াছে।" হীরালালের প্রাণ-শক্তি বিকাশ পাইল বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রোগের উপদ্রব ও শারীরিক যাতনা বাড়িয়া উঠিল। ক্রমাগত রাত্রির পর রাত্রি এইরূপ যন্ত্রণা চক্ষে দেখিয়া নীরবে থাকা যোগেশের পক্ষে অত্যন্ত অসহনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। সে মনে মনে ভাবিল "কোন কি উপায় নাই, রক্ষা কি হয় না—রোগের যাতনা কি দূর করিবার শক্তি সামান্য মানুষের নাই।" বুকের ভিতর হইতে সেই অপরিচিত কণ্ঠ বলিল "আছে"। স্তম্ভিত যোগেশ বার বার চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—কেবল দেখিতে পারিল না ভিতরটা। বুঝি বা বহুত্ববিলাসী বহির্মুখী ইন্দ্রিয়ের সে অন্তর্দৃষ্টি নাই। সন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞাসা করিল "আছে ত, পারি না কি?"

"কেন পারিবে না"।

"কি করিলে হয়"?

"তোমার প্রেম ও যোগ শক্তির বলে, আর খানিকটা ত্যাগ স্বীকার করিলে। প্রস্তুত আছ?"

"আছি,—কিরূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে হইবে?"

"উহার পরিবর্ত্তে তোমাকে ঐরূপ রোগ ভোগ এবং যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে; কিন্তু মৃত্যু হইবে না, ভয় নাই। আর ইহার প্রাণের বিনিময়ে কোন একটী প্রিয়তমের মায়া বিসর্জ্জন দিতে হইবে,—পারিবে? কতকটা আবেগে ও কতকটা যোগজ অহঙ্কারে যোগেশ বলিয়া উঠিল—"পারিব"।

"আর হাসিমুখে সমস্ত সহ্য করিতে হইবে; যদি না পার তাহা হইলে যন্ত্রণা

ভীষণ হইবে; কিন্তু পরিণাম মঙ্গলময়।" যোগেশ শপথ করিল—হাসি মুখেই সহ্য করিব।

যোগেশের এই প্রকার আপনা আপনি কথাবার্ত্তায় বড় হাসি আসিল, ভাবিল "এত বড় মজা, একি? সত্যই কি কাহারও সহিত বাক্যালাপ হইল' না,—সমস্তটাই খেয়াল বা আবেগপ্রসূত কল্পনা,—বুঝিতে পারিল না। 'যদি সত্যই কথোপকথন হয়, তবে কাহার সঙ্গে? উহা কি অন্তর্য্যামী দেব ভিতর হইতে প্রত্যাদেশ করিলেন, না আমারি সুপ্ত জীবাত্মার অনাহত বাক্! তবে কি আমার ক্ষুদ্র ও বদ্ধ আমিকে ছাপাইয়া বিশিষ্ট আমিত্ব ফুটিয়া, ইহা সাধিত হইল। যাহা হউক ইহার পর মুহূর্ত্ত হইতে রোগীর আশ্চর্য্যরূপ উন্নতি হইতে লাগিল। তখন যোগেশ ভাবিল যে হয়ত ইহা তাহারই ত্যাগ স্বীকারের ফল, একটা ফাঁকা স্বপ্নবৎ খেয়াল নহে। মুহূর্ত্তের আবেগে যোগেশ যে যোগজ দম্ভ ও অহঙ্কারে বলীয়ান্ হইয়া শপথ করিল, তাহাকে সেই অহঙ্কার ও ত্যাগের বিষময় ও সুধাময় ফল উভয়ই ভুগিতে হইল,—সেই কথাই পরে বলিতেছি।

(২)

যোগেশ উন্মাদ, চঞ্চল ও অপ্রকৃতিস্থ;—কেমন করিয়া এই চিত্তবিপর্য্যয় ঘটিল তাহা ঠিক্ বলিতে পারে না—তবে যতটুকু স্মরণ হয়, সেই একদিন যে অন্তরঙ্গ বিশিষ্ট 'আমি' বা কূটস্থ ভগবৎশক্তি জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা আর নিভিল না। প্রথম প্রথম বড় আনন্দ ও কৌতুক বোধ, কিন্তু ক্রমশঃ যন্ত্রণাদায়ক হইয়া উঠিতে লাগিল; প্রাণপণ ইচ্ছা ও চেষ্টা সত্ত্বেও উভয় আমিত্বের বন্ধনী আর আঁটিতে পারিল না। বোধ হইল যেন সে দুই জন। একটা বেশ শান্ত, মৌন, বিরাট্ বিশ্বব্যাপী ভাব—বড় তৃপ্তিময়; আর একটা সুখ দুঃখময় সাংসারিক 'যোগেশ'। সে 'বিষম' অবস্থা বড়ই ভীষণ। তখন চক্ষুর্দ্বয় রক্তাভ, মস্তিষ্কে প্রবল প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের প্রবল স্পন্দন—বুকের ভিতর এক অব্যক্ত যাতনা। সেই অসহ্য যাতনার তাড়নায় আত্মহত্যার সংকল্প ও চেষ্টা। বন্ধুবান্ধব ও পরিবারবর্গ চিন্তিত হইয়া উঠিলেন,—কখন কোন্ মুহূর্ত্তে উন্মাদ আত্মহত্যা করিয়া বসে, তাহার স্থিরতা নাই। ভগবানের কৃপায় অর্থের তাদৃশ অসচ্ছলতা ছিল না;—কাজেই ধূম ধাম করিয়া চিকিৎসা আরম্ভ হইল। সাহেব ডাক্তার, বাঙ্গাল কবিরাজ, ভূতের রোজা, Hypnotist, দৈব ও

মুষ্টিযোগ ব্যবস্থা দাতা, হোমিওপ্যাথ, গ্রহাচার্য্য, মাদুলী কবজ স্বস্ত্যয়ন, পাড়া প্রতিবেশীর বিনামূল্যে বিতরিত, অজস্র ও অব্যর্থ 'টোট্‌কা' পূরদমেই চলিল।

কবিরাজ বলিলেন,—"বিষম বায়ুরোগ, উন্মাদের পূর্ব্ব লক্ষণ; উপায়—তৈল অরিষ্ট মোদক ঘৃত চূর্ণ বটিকা অবলেহ প্রভৃতি। ডাক্তার ঘড়ি দেখিয়া নাড়ী টিপিয়া ও বক্ষঃস্থল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন,—Hysteric, respiration বড় বেশী; ব্যবস্থা—ব্রোমাইড্ নারভাইন টনিক, ডিজিটেলিস্ ষ্ট্রপেনথাস্ ইত্যাদি। হোমিওপ্যাথ চৌদ্দপুরুষের খবর লইয়া বলিলেন,—Softening of the brain matter, একমাত্র উপায় Phosphorus, Acid phos ও sulphur. হিপনটিষ্ট বলিলেন,—"যদি একবার সম্মোহিত করিয়া গভীর নিদ্রিত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই আরোগ্য।" ভৌতিক মত দিলেন,—"অপদেবতা-গ্রস্ত; অপদেবতাকে না তাড়াইতে পারিলে রক্ষা নাই।" গ্রহাচার্য্যের বিশ্বাস—একশত আটবার চণ্ডীপাঠ করিয়া নৃসিংহ-কবচ প্রস্তুত করিয়া দিলেই মুক্তি; তবে একশত এক টাকার কম খরচে প্রকৃত কবচ প্রস্তুত হইবে না।" প্রতিবেশী চাটুয্যে মশায় বলিলেন,—"যে নিশ্চিন্তপুরের মক্‌দুম্ সাহেবের দরগায় সওয়া পাঁচ আনার সিন্নি মানত করা ভিন্ন উপায় নাই; এইরূপ সিন্নি মানিয়াই গোবর্দ্ধনপুরের রামকালী ঘোষের শ্যালক-পুত্রের সান্নিপাতিক বিকার সারিয়াছিল। দত্তজা মহাশয় বলিলেন,—' ঘৃতকুমারীর পাতার রসই প্রকৃত ঔষধ; কিন্তু সেনজা প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,—যে শিয়ালের শিং গলায় না ঝুলাইলে পরিত্রাণ নাই।"

ফল সমানই—কখন সেই স্নিগ্ধ মৌন বিরাট্-'আমি'ভাব। কখন বা দারুণ যন্ত্রণায় আত্মহত্যার চেষ্টা! যখন মৌন ও স্থির তখন সে বলিত "বড় আনন্দ—বড় আনন্দ ও তৃপ্তি; কি মহান্ ও সুন্দর; এই কি মা দুর্গে!"

প্রাচীনেরা বলিতেন, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা দুরারোগ্য লক্ষণ—এরূপ উন্মাদ প্রায় সারে না।

সাধক-প্রবর ঘোষাল মহাশয় শুনিয়া বলিলেন,—"যোগজ ব্যাধি; যোগজ প্রতিক্রিয়া ভিন্ন আরোগ্য হইবে না।"

এমনি আশঙ্কা উদ্বেগ, এমনি ক্লেশ ও যাতনা, অনির্দ্দিষ্ট কাল ধরিয়া চলিতে লাগিল। শান্তি নাই, সুপ্তি নাই; মস্তিষ্কের দারুণ প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের হৃদয়-

বিদারক যন্ত্রণা। একদিন বৃদ্ধ বৈরাগী কালাচাঁদ ভিক্ষার্থ আসিয়া যোগেশকে বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—"ভয় নাই, সারিয়া যাবে। গুরু ভাল ; পাকা মাঝির হাতে হাল আছে, তুফান্ লাগিবে, কিন্তু ডুবিবে না।"

পরিবারস্থ সকলে বৃদ্ধ ভিখারীকে ধরিয়া বসিল ; অনেক পীড়াপীড়িতে কালচাঁদ বলিল, 'হঠাৎ বেশী দৌড় দিয়াছে, তা'ই হাঁফাইয়া পড়িয়াছে। যুবক মাত্রা রক্ষা করিতে পারে নাই। অশুচি দেহে অতিরিক্ত উঠিয়াছে ; তা'ই দৈহিক যাতনা ; ভয় নাই সারিয়া যাইবে। কাল্ বৈশাখীর মেঘ হঠাৎ জল ঝড় আসিয়া যেমন উত্তপ্ত পৃথিবীকে শান্ত করিয়া দেয়, তেমনি অভাবনীয়রূপে দৈব কৃপায় অকস্মাৎ আশ্চর্য্যরূপে সারিয়া যাইবে।"

সকলে পুনরায় ধরিল,—"বাবাজী ইহার কি কোন প্রশমন নাই, কাজ কর্ম্ম সমস্ত বন্ধ ; বাঁচিয়াও জীবন্মৃতবৎ ; দিবারাত্র যন্ত্রণায় হঠাৎ না আত্মহত্যা করিয়া ফেলে।"

বাবাজী। "সে ভয় নাই ;—গুরু সহায় ; কাহার সাধ্য ইহাকে বিনাশ করে ? তবে যদি কেহ স্বেচ্ছায় বা সানন্দে এই রোগ-যাতনা সহিতে স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে কতকটা উপশম হইতে পারে।" বাবাজীর শেষ কথাটা যে কার্য্যকরী হইবে, ইহা কাহারো বিশ্বাস হইল না।

হীরালাল নীরবে সমস্ত শুনিতেছিল ;—তাহার পূর্ব্বাপরই বিশ্বাস ছিল যে তাহারই জন্য যোগেশের এই রোগ-ভোগ ; তা'রপর ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া কায়মনোবাক্যে ইষ্টদেবতাকে জানাইল যে 'দেবতা ! যদি আমার ন্যায় দীনাতিদীনের ত্যাগে কোন ফল থাকে, ত' এই ত্যাগী সাধককে মুক্তি দিন, আমি সানন্দে সহ্য করিব।"

মধ্যাহ্নে হীরালাল হঠাৎ উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিল ; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় যোগেশও সেই সময় অত্যন্ত সুস্থ বোধ করিল ; উন্মত্ততার কোন চিহ্ন নাই। প্রতিদিনই এইরূপ ভাবে চলিল। যোগেশ নিশ্চিন্ত ভাবে কাছারী হইতে বাটী ফিরিলেই, আবার উন্মত্ততা। লোকে বলিল "বজ্জাতি : পয়সা উপায়ের বেলা ত' কোন রোগ থাকে না।"

সমস্ত মধ্যাহ্ন নীরবে, নির্জ্জনে ও গোপনে হীরালাল অমানুষিক যন্ত্রণা সহ্য করিয়া, অপরাহ্ণে পুনরায় সুস্থ হইত। এমনি গোপনে ধূপের ন্যায় নিজে জ্বলিয়া গুরু-প্রতিম প্রাণরক্ষক ব্রাহ্মণের যন্ত্রণার অংশভাগী হইত।

বাঙ্গালার আকাশ জুড়িয়া প্রকৃতির মেঘ-মল্লার রাগ বাজিয়া উঠিল ;—অলস মন্থর আষাঢ়ের দীর্ঘ দিবস-ঝিল্লি শ্রাবণের আঁধার-ঘেরা দিন-যামিনী, ভরা ভাদ্রের রিমি-রিমি ঝিমি-ঝিমি অবিশ্রান্ত বারিপাতে নদ নদী দুকূল ছাপাইয়া, হানা পড়াইয়া, বাঙ্গালায় বর্ষা-প্লাবন শেষ হইয়া গেল। আবার আশ্বিনের সুন্দর শরতের স্নিগ্ধ হৈমকরোজ্জ্বল প্রভাতে ধরণী নব কলেবরে ভূষিত—হেমশীর্ষ শ্যামল ধান্যক্ষেত্র মাঠের হাওয়ায় সবুজ তরঙ্গ তুলিয়া নাচিয়া উঠিল। নদী-প্লাবনে দুঃস্থ কৃষক আবার আশায় উৎফুল্ল হইয়া শ্রীদশভুজা শারদার আগমনী গাহিয়া উঠিল। এমন সময়ে কাশীধাম হইতে যোগেশের আহ্বান আসিল। প্রথমটী তা'র গুরুদেবের নিকট হইতে।

গুরুদেব লিখিয়াছেন,—"যে পূজার ছুটীতে তুমি কাশীধামে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান কর ; হয়ত, বাবা বিশ্বনাথের কৃপায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হইতে পার।" দ্বিতীয়টী তা'র বৈবাহিক উমেশ বাবুর নিকট হইতে। উমেশ বাবুর সহিত পূর্ব্বাবধিই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল ; সেই সম্পর্কে তিনি যোগেশকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার মত স্নেহচক্ষে দেখিতেন। পরে তাঁহার পুত্র হেমন্তের বিবাহ দিয়া লক্ষ্মীস্বরূপিণী মান্তাকে গৃহে আনিয়া সম্পর্কটা আরো নিকট করিয়া তুলিয়াছিলেন। কিন্তু শেষের বৈবাহিক সম্পর্কের অপেক্ষা, পূর্ব্বের ভাবে যোগেশকে ছোট ভায়েরই মত দেখিতেন। কিন্তু অন্যদিকে বাধা আসিল ; কেহই উন্মাদকে একাকী পাঠাইতে সাহস করিলেন না। শেষে গুরুদেব যখন একাকী আসিতেই অনুজ্ঞা করিলেন, তখন তাঁ'র আশীর্ব্বাদ ও আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সেই এক অব্যক্ত শাশ্বতের উপর বিশ্বাস করিয়া, যোগেশ ৺কাশী যাত্রা করিল।

রাজঘাট ষ্টেশনে গুরুদেব ও উমেশ বাবুকে প্রণাম করিয়া যখন সে দাঁড়াইল, তখন অনেকটা সুস্থ। প্রাণের আবেগে গুরুদেবের বিশাল-বক্ষে কিয়ৎক্ষণ মুখ লুকাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল। গুরুদেব ও উমেশ বাবু উভয়ে পরামর্শ করিয়া নাদেশ্বরের নিকটবর্ত্তী একটী নির্জ্জন উন্মাদ-বাটিকায় উন্মাদের বাসস্থান স্থির করিয়াছিলেন। পরে একটু সুস্থ হইলেই উমেশ বাবু তাঁহার নিজ বাটীতে লইয়া যাইবেন।

পিতার অসুখ এবং স্বয়ং আসিয়াছেন শুনিয়া, বালিকা মান্তা পিতাকে দেখিবার জন্য শ্বশুর মহাশয় উমেশ বাবুকে ধরিয়া বসিল ; বিচক্ষণ উমেশ বাবু

অনেক করিয়া বধূমাতাকে বুঝাইলেন যে 'একটু সুস্থ হইলেই যোগেশকে বাটীতে আনিবেন।' কিন্তু কাহাকে আনিবেন;—উন্মাদের স্থিতি, বাস ও ভ্রমণের কোনই স্থিরতা ছিল না। অগত্যা উমেশ বাবুকে শ্রীদুর্গাপূজার সমস্ত আয়োজনের মধ্যেও প্রত্যহ অন্ততঃ তিনবার করিয়া যোগেশকে দেখিয়া আসিতে হইত।

মহাপূজার দিন সমাগত; মান্তাও অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। অবশেষে উন্মাদকে অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্য আনিবার কৌশল করিয়া, উমেশ বাবু যোগেশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন,—যোগেশ, ভাই! বাড়ীতে মা আসিয়াছেন, তুমি এ কয়দিন ওখানে গিয়া থাকিও; কাজকর্ম্মে, জানত' আমার লোকবল নাই, গোলমালের মধ্যে তুমি থাকিলেও তবু কতকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিব। তা ছাড়া বৌমাও তোমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে; তা'কে ত আর বুঝাইয়া রাখিতে পারি না।"

পাগল নিরুত্তর, উদাস দৃষ্টিতে শূন্যে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল।

পরদিন হইতে উমেশ বাবু আর বাগানে যাইতে পারিলেন না; কিন্তু অত গোলযোগেও তাঁ'র স্নেহার্দ্র চিত্ত বারম্বার যোগেশের প্রতি ছুটিতেছিল।

অন্তরের ব্যাকুলতা ও আকর্ষণ প্রায়ই একেবারে নিরর্থক হয় না।

(৩)

সপ্তমীর দিন রাত্রে হঠাৎ অজানা আকর্ষণে বাধ্য হইয়া যোগেশ দুলিতে দুলিতে উপস্থিত হইল।

মান্তা এই দুই দিন ক্রমাগত দেবীর নিকট পিতার জন্য কায়মনোবাক্যে জানাইতেছিল এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁর আগমন প্রতিক্ষায় দ্বারপ্রান্তে ব্যাকুল ভাবে চাহিয়া ছিল।

শীর্ণ দেহ, রুক্ষ কেশ ও মলিন বস্ত্রান্বিত পিতাকে দেখিয়াই মান্তার চক্ষু দুটী জলে ভরিয়া গেল। ইচ্ছা হইল কাঁদিয়া ফেলে বা ছুটিয়া আসে, আবার লোকলজ্জার ভয়ে বহুকষ্টে সে চেষ্টা সম্বরণ করিল। যোগেশ দেবীপ্রতিমার সম্মুখীন হইয়া একবার প্রণাম করিয়াই ৫৲ টাকা প্রণামী ধরিল।

উমেশ বাবু ব্যস্ত হইয়া তার হাত ধরিয়া বলিলেন,—যোগেশ ছি, কর কি? তুমি কি আমারো সঙ্গে লৌকিকতা করিবে।

উন্মাদ শুনিল না।

সবে মাত্র আরতি শেষ হইয়াছে; আরতির বাদ্য ও জনকোলাহল সমাপনে পূজার দালানটী কেমন এক স্নিগ্ধ নির্জ্জনতা ও শান্তিতে ভরিয়া গিয়াছে। সম্মুখে সুসজ্জিতা ভগবতী প্রতিমা; মৃন্ময় ঘৃত প্রদীপ হইতে আলোক-রশ্মি এবং সচন্দন পুষ্প ও ধূপ-ধূনার সৌগন্ধ মিশিয়া পূজাস্থান আরো মনোরম করিয়া তুলিয়াছিল। প্রায় দশ বার জন বন্ধুবান্ধব চুপ করিয়া; পুরোহিতের ঈষৎ তফাতে কুশাসনে বসিয়া, একটা বাঁধা হুঁকায় তামাক খাইতে খাইতে সাত্বিকা পূজা, সন্ধিক্ষণের মাহাত্ম্য, কুণ্ডলিনী জাগরণ, তান্ত্রিকী ব্যাপার প্রভৃতি গুছাইয়া বলিতেছিলেন। সকলে স্থিরকর্ণে তাঁহার ব্যাখ্যা ও গুহ্য কথা শুনিতেছিল।

* * * *

উন্মাদ হঠাৎ কাঁপিয়া দুলিয়া উঠিল, চক্ষুদ্বয় আরো রক্তবর্ণ, মুখমণ্ডলে উত্তেজনা ও কি একটা ব্যাকুলতা ফুটিয়া উঠিল। দুলিতে দুলিতে বলিতে লাগিল "বলে কি!—বেটা বলে কি! সমস্ত ভণ্ডামী, কেবল মাটী ও খড়, প্রাণ প্রতিষ্ঠাও করতে পারেনি, পাঁচ টাকা জলে ফেললুম; আর বক্তৃতাত খুব দিচ্ছে!"

সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ ভীত, সন্ত্রস্ত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। পুরোহিত-ঠাকুর আসন গুটাইয়া, সরিয়া বসিলেন; দুশ্চিন্তা,—পাগল বুঝিবা কি একটা অনর্থ ঘটায়। উমেশ বাবু আশ্বাস দিয়া বলিলেন "কোন ভয় নাই ও যাই করুক্, আমার অবাধ্য কখন হবে না।"

* * * *

দেবীর দিকে কটমট দৃষ্টিতে চাহিয়া পাগল বলিল "আয়, আয়, আস্‌বিনি, আস্‌তেই হবে, নিশ্চয়ই আস্‌তে হবে। কাশীতে এসে—তোকে পূজা কর্ত্তে কি খড় মাটী পুতুল এনেছে? কখনই নয়! আয় আয়, আসতেই হবে?" দুলিতে দুলিতে, বলিতে বলিতে, লাফাইয়া উঠিতে লাগিল; পুরোহিত ঠাকুর ও অন্যান্য দুই একজন প্রমাদ গণিয়া সরিয়া পড়িবার উদ্যোগ করিলেন; বুঝিবা প্রতিমাই ভাঙ্গিয়া ফেলে।

"আয়, আয়, এখনো এলিনি! এত করে ডাকছি তবু আস্‌বিনি, আয়, আস্‌তেই হবে; তো'র বাবাকে আস্‌তে হবে, আয়—"

হঠাৎ সকলের চক্ষুর সমীপে সেই মৃন্ময়ী মূর্ত্তি চিন্ময়ী ভাবে অমানবীয়

রূপে জল্ জল্ করিয়া আলোক ভাতিতে কাঁপিয়া উঠিল। ভাবের ঘোরে বিহ্বল উন্মাদ অমনি ভূলুণ্ঠিত হইয়া আবেগে বলিল,—

"নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে, সর্ব্বস্যার্ত্তিহরে দেবী নারায়ণি নমস্তুতে।"

* * * *

একি! সঙ্গে সঙ্গে সকলেরি মস্তক ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল! উন্মাদ উঠিয়া সে দৃশ্য দেখিয়া হাসিয়া খুন; কেহ বা প্রণত; কেহ বা বলিদানের ছাগের মত হেটমুণ্ড ও হস্তদ্বয় পৃষ্ঠোপরি ন্যস্ত। মান্তা দ্বারপার্শ্ব হইতে নির্ব্বাক্ ও ভীতিবিহ্বল চক্ষে এ দৃশ্য দেখিতেছিল।

যোগেশ ডাকিল, "আয়, মান্তা আয়! মাকে দেখে পূজা ক'রে জীবন সার্থক করে যা।"

মান্তা অস্ফুট স্বরে বলিল,— "ওখানে অত লোক, কেমন করে যাব, বাবা।"

পাগল হাসিয়া বলিল, "কেউ নাই, সবাই সম্মোহিত—লুপ্ত-চৈতন্য।"

মান্তা দেবীমূর্ত্তির দিকে চাহিয়াও চাহিতে পারিল না; বড় বড় চক্ষুদ্বয় বিস্তার করিয়া কম্পিত কণ্ঠে বলিল "বাবা, একি! এ যে জ্যান্ত ঠাকুর।"

যো। 'দূর পাগলী, ঠাকুর কি কখন মরা হয়।' আতঙ্কাবিষ্টা বালিকা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল, 'এ কি! এ যে নড়ছে, কাঁপছে, যেন কথা কইছে!'

যো। সত্যিকারের ঠাকুর এই রকমই হয়;—আয় পূজা কর্।

মা। কি দিয়ে পূজো করব বাবা, ফুল বিল্বপত্র সব যে নিবেদন হয়ে গেছে?

যো। এ পূজার কোন বাধা-বিঘ্ন বা আড়ম্বর নেই।"

সেই অর্পিত পুষ্পদল লইয়া প্রাণের আবেগে যোগেশ কখন চণ্ডীস্তোত্র, শিবপূজার মন্ত্র, কখন গোপালস্তুতি, কখন হিন্দি বাঙ্গলা ও সংস্কৃত জড়াইয়া, কখনো শাস্ত্রোক্ত, কখন বা প্রাণের আবেগে মনগড়া মন্ত্রে দেবীর পায়ে ঢালিয়া দিল। বালিকাও দেখাদেখি অনুরূপ ভাবেই পূজা করিল।

যোগেশ বলিল 'মা যদি তুই এলি, তবে এই শিশুকে আশীর্ব্বাদ কর্।'

হঠাৎ চক্ষুর নিমেষে সেই মৃণ্ময় হস্ত প্রসারিত হইল ও বালিকার হস্তে হস্তস্থিত ফুলদল দিয়া গেল। বালিকার পক্ষে ইহা অসম্ভব, অভাবনীয়, বুদ্ধির অগম্য ও স্বপ্নের অগোচর; ভয়ে সে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল।

চরণামৃত-সেবনে জ্ঞান-সঞ্চার হইলে তাহাকে বাটীর ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া,

যোগেশ বিস্ময়ে দেখিল যে সে পূর্ব্ববৎ সুস্থ ও নিরাময়। হৃদ্‌পিণ্ড ও মস্তিষ্কের যাতনা কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একে একে অপর সকলে উঠিয়া পড়িলেন; এবং যোগেশকে সুস্থ, স্থির, প্রফুল্ল ও শান্ত দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। কেবল হঠাৎ ঘড়ির দিকে চাহিয়া হেমন্ত বিস্ময়ে বলিয়া উঠিল 'এ কি? এই যে ঘড়িতে আটটা দেখিলাম্, "ইহারই মধ্যে প্রায় নয়টা! প্রণাম করিতে কি আধ ঘণ্টার উপর লাগিয়া গেল?" সকলে হাসিয়া বলিলেন, না, না আমরা ত' প্রণাম করিয়াই উঠিলাম, তোমার ঘড়ি দেখিতে ভুল হইয়াছে।

যোগেশকে ধরিয়া রাখা আর উমেশ বাবুর পক্ষে অসম্ভব হইল না। গভীর রাত্রে উমেশ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, যোগেশ! বল দেখি ব্যাপারটা কি? হেমন্ত যে বলিল প্রণাম করিতে আধঘণ্টা লাগিয়াছে, সকলে সে কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু আমারও মনে হেমন্তের মত একটা সন্দেহ হইয়াছে। তা' ছাড়া প্রাণের ভিতর কি যে একটা আনন্দের লহরী ছুটিতেছে, তাহা বলিতে পারিতেছি না। এতদিন মা আসিতেছেন, কিন্তু কই এরূপ আনন্দ ত' কখন হয় না?"

যো। দাদা, তুমি পুণ্যবান ও সৌভাগ্যবান! বেশী কথা বলিব না, তবে একটু বলিয়া রাখি যে, যথার্থ ভক্তিভাবে এতদিন যে পূজা করিতেছ তাহা আজ সফল হইয়াছে।

যোগেশ এখন পূর্ব্ববৎ সুস্থ শান্ত, যথা নিয়মে কাজকর্ম্ম করিতেছে। তবে কখন কখন পূর্ব্বের সেই উন্মাদ অবস্থা পাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু চেষ্টা ও ইচ্ছা সত্ত্বেও সে ভাবের আবেশ পূর্ণভাবে পায় না—বড়ই দুঃখিত।

আবার জননী দশভূজা সোণার বাঙ্গালায় আসিলেন, আবার পুণ্য মহাষ্টমী আসিল। গত বৎসরের সেই শুভ মুহূর্ত্তের কথা স্মরণ করিয়া যোগেশ শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু কোথা হইতে একটা গুপ্ত বেদনার রুদ্ধ-স্রোত তাহার চক্ষুদ্বয় আর্দ্র করিয়া তুলিল। দেবী-দর্শনের অল্পদিবস পরেই লক্ষ্মীস্বরূপিনী সোণার পুতুলি মান্তা নশ্বরদেহ ও পাপ পৃথিবী ছাড়িয়া অক্ষয় ধামে চলিয়া গিয়াছে;—আবার ফিরিবে কি না—কে বলিতে পারে?

চিন্তা—

ধর্ম্ম]

আগমনী

কৌমুদী আলোকে জগৎ হাসিছে,—
মধুর শরতে শারদা এসেছে।
নাহি সে ভীষণ, ভীম দরশন,
অশনি পতন, ঘন-গরজন,
ফুটিছে মল্লিকা, ফুল্ল শেফালিকা,
প্রফুল্ল নলিনী, স্থল কমলিনী।
কৌমুদী আলোকে জগৎ হাসিছে,—
মধুর শরতে শারদা এসেছে।
হিমাদ্রি অবধি – দক্ষিণ জলধি,
করি মুখরিত, হ'তেছে ধ্বনিত,—
মৃদঙ্গ, বাঁশরী, নাগরা, কাঁসরী,
তুরী, ভেরী কত বাদ্য শত শত।
কৌমুদী আলোকে জগৎ হাসিছে,—
মধুর শরতে শারদা এসেছে।

মাতৃ আগমনে, পুলকিত মনে,
নব বস্ত্র পরি—হিন্দু নর-নারী,
জবা বিল্বদলে, নীহার সলিলে,
করিছে পূজন মায়ের চরণ—
কৌমুদী আলোকে জগৎ হাসিছে,
মধুর শরতে শারদা এসেছে।
আমি মূঢ়জন, জানিনে পূজন,
সাধন ভজন,—মা! তোর চরণ;
অয়ি! মা তারিণি! ত্রিগুণ ধারিণি!
আপনার গুণে,—দয়া কর দীনে।
কৌমুদী আলোকে জগৎ হাসিছে,—
মধুর শরতে শারদা এসেছে।

শ্রী বিনোদবন্ধু গুপ্ত।

কাম]

সহজ-যোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চিত্ত-নদী।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যগণের চিন্তা ও প্রবৃত্তির গতি অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শন এক সর্ব্বাত্মিকা ভাবের সংস্থাপনের জন্য ব্যাপৃত। তাঁহারা কি প্রাকৃতিক, কি মানসিক ক্ষেত্রে, এই সার্ব্বজনীন ভাব সংসিদ্ধ করিবার জন্য অনন্ত ভেদ-বিশেষকে অদ্ভুত কৌশলে সমাহৃত করিয়া, তাহা হইতে সার্ব্বজনীন সার্ব্বাত্মিক নিয়ম বা বিধিগুলি অতি যত্নে স্থাপিত করিতেছেন। কিন্তু এই সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির মধ্যে মানবের স্থান নাই। অনেকে মানবের 'আমির'

পান্থা।—

চিত্র-নদী।

কথা বলেন বটে; কিন্তু তাহা অবান্তর। এই সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তির মধ্যে একটুও 'পর' ও অদ্বিতীয় 'আমি'র বোধ বা পরামর্শ নাই। পাশ্চাত্য জড়বাদী জড়কে সত্য বলিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তাহার গতি অনুশীলন করতঃ, তাহার সর্ব্বাত্মিকা ভাব সিদ্ধ করিয়াই সন্তুষ্ট। প্রাচ্যদিগের ন্যায় তাঁহারা এই সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির মধ্যে অদ্বিতীয় ও 'পর' চৈতন্য-ভাব দেখিতে পান না। আমাদের জড়বাদী চার্ব্বাকও জড়-সঙ্ঘাত লইয়া থাকেন না। তিনিও জড় হইতে 'পর' সুখ-রূপ বোধের জন্য দর্শন সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহার মতে সুখই সত্য। পাশ্চাত্য সুখবাদী (Hedonist) সুখ-দুঃখের ভাষায় কথা বলেন বটে; কিন্তু সে সুখ শারীরিক ও মানসিক পুষ্টির জন্যই শ্রেয়। হিন্দু চার্ব্বাকের সুখই সর্ব্বস্ব; শরীর ধ্বংস হউক না কেন, সুখটী চাই। আধুনিক থিয়সফি বা ব্রহ্মবিদ্যা, পাশ্চাত্য ভাবে স্থাপিত বলিয়া, উহাতেও জড়ের ভাষা ও জড়ধর্ম্মের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। তাঁহাদের গুরু লেডবিটার সাহেব ভুবঃ স্বঃ প্রভৃতি লোকের বর্ণনা করিয়াছেন। বর্ণনা সত্য হউক বা নাই হউক, তাহাতে—আমরা ঐ সকল লোকের জীব-শক্তির খেলাই দেখিতে পাই। তাহাতে বিশুদ্ধ অহংতত্ত্বের স্বরূপ বুঝা যায় না; উপরন্তু উচ্চতর লোকের বর্ণনায় পার্থিব বস্তুর ও ভাবেরই প্রতিচ্ছায়া দেখা যায়। ভুবঃ ও স্বর্লোকে পৃথিবীর গাছ-পালা ও জীবজন্তুর সূক্ষ্মভাব প্রভূত পরিমাণে দৃষ্ট হয়। উহাতে তত্ত্বের অবরোধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উপরন্তু মানব বা অহং যে বাহ্য জড়শক্তির প্রসূত,—এই পাশ্চাত্য ভাবটী ঐ বর্ণনায় প্রধানতঃ দৃষ্ট হয়। আর্য্য শাস্ত্রের গতি অন্যরূপ; আর্য্য প্রকৃতির বর্ণনা করিলেও উহা পুরুষ-তত্ত্বের মহিমা সংস্থাপনের জন্য। 'প্রকৃতির বিবেক' অর্থে কেবল প্রকৃতির নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা না করিয়া, তিনি তাহা হইতে আত্মা বা 'আমির' বিবিক্ততা বা 'পরাভাব' সিদ্ধ করিতে চান। সাংখ্য,—প্রকৃতির সম্বন্ধে এত কথা বলিয়াও পুরুষের প্রকৃত শুদ্ধ ভাব দেখিতে চাহেন। হিন্দু জানেন, যে যতদিন ভেদ ভাব বা ছিন্ন বুদ্ধি থাকিবে, ততদিন তাঁহার পুরুষ জ্ঞানটীও ছিন্ন হইবে। তা'ই তিনি সর্ব্বাত্মিক ভাব স্থাপন করিয়া, সেই 'সর্ব্ব'ভাবের উপরে অদ্বয় অখণ্ড পুরুষের সিদ্ধি করেন। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরাও এই প্রবৃত্তির বশে কার্য্য করেন বটে, কিন্তু পুরুষের 'পরাভাব' না থাকাতে ঐ সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি জড়ে ও জড়-শক্তিতে নিঃশেষিত হইয়া যায়।

হিন্দুদিগের এই দৃষ্টি-কৌশল আমাদের সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক। ইহাকে লক্ষণা-দর্শন বলে। ইহাই সেই বঙ্কিমঠাম পরম সুন্দর শ্যাম-সুন্দরের আড় নয়ন। যদি আড়-নয়নের ভাষা ও রহস্য বুঝিতে পারিয়া শাস্ত্র চর্চ্চা কর, তবেই জড়াধীনত্ব মোহ অতিক্রম করিতে পারিবে। শ্যামসুন্দর যেন এক নয়নে প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক জীবনের দিকে চাহিয়া আছেন বলিয়া বোধ হয়; যেন অংশভূত জীবকে সৃষ্টি করিয়া ভোগের জন্য প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে পাঠাইয়া, তাঁহার কার্য্য শেষ হইয়াছে। এ ভ্রান্তি যতক্ষণ তুমি তাঁহার দৃষ্টির 'বিশেষ'ভাবে নিমগ্ন থাক। কিন্তু যে সেই দর্শনের ভঙ্গিমার রস গ্রহণ করিয়াছে, সেই জানে যে ঐ চাহনি আর এক ভাবে প্রকৃতির 'পর' শুদ্ধ নিষ্কল বোধের জন্যই জীবের প্রাণ মন হরণ করিয়া, প্রকৃতির অতিগ-ভাবে কোথায় আকর্ষণ করিতেছে। অনুভব-রূপ আনন্দের স্বরূপ ফুটাইবার জন্যই হিন্দুশাস্ত্র দুঃখবাদের অবতারণা করিয়াছেন: কেবল দুঃখ-চিন্তায় জীবকে ব্যাপৃত করিবার জন্য নহে। প্রকৃতির পরিণামের দ্বারা, সেই আড়-নয়নের কৌশলে এক অপরিণামী সত্তার নির্দ্দেশ করা হয়। এমন কি শ্রুতিগণও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভগবানকে দেখাইতে পারেন না। ইহাই ভাগবতের উপদেশ *। তা'ই বলি ভাই, প্রকৃতির হাতী ঘোড়া বুঝিবার জন্য সাংখ্য পড়িও না; মনস্তত্ত্ব বুঝিবার জন্য যোগ করিও না। শ্রীভগবানই এক তত্ত্ব। 'সকল' ভাবে আকৃষ্ট গোপীগণ, পৃথিবীতে শ্রীভগবানের পদ-চিহ্ন দর্শন করিয়া যদি গুপ্তচরের (Scout) ন্যায় তাহার অনুশীলন করিতেন, যদি বৈজ্ঞানিক ভাবে জমীর গুণ ও অন্যান্য তত্ত্ব নির্ণয় করিয়া বসিতেন, তাহা হইলে সেই চিত্তে অপ্রাকৃত মদন-মোহনের গতি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিতেন না। অর্থ বিদ্যা (Economics) পড়িয়া যখন দারিদ্র্য ঘুচেনা, আদ্যোপান্ত সাংখ্যশাস্ত্রের অনুশীলনে তখন কি হইবে? যখন এই স্থূল জীবনের মধ্যেও সেই পরপুরুষের ভাব দেখিতে পাইতেছ না, তখন 'হিরণ্ময় কোষের' বৈজ্ঞানিক অনুশীলন শ্রম মাত্র।

* ভাগবত—১০।৮৭।৪।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাষু যঃ।

নোৎপাদয়েদ্‌ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্‌॥ ভাঃ—১।২।৮।

ধর্ম্মও যদি সু-অনুষ্ঠিত হইয়া শ্রীভগবানে রতি জন্মাইতে না পারে, তাহা হইলে উহা কেবল 'কুস্তি' করা মাত্র। 'তৎ'কে লইয়াই তত্ত্ব। আমরা যোগ-শাস্ত্রে সেই 'আড়নয়নের কৌশল' বুঝিবার চেষ্টা করিব।

চিত্ত কি? প্রথমে চিতি-শক্তি ও চিত্তের প্রভেদ বুঝা আবশ্যক। চিতি-শক্তিকে পুরুষ বলে। "চিতেরপ্রতিসংক্রামায়াস্তদাকারাপত্তৌ স্ববুদ্ধিসংবেদনম্‌।" (পাঃ ৪।২২।) ব্যাস-ভাষ্যে চিতি-শক্তিকে অপরিণামী ও অপ্রতিসংক্রমা বলা হইয়াছে।" "যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধঃ" সূত্রের ভাষ্যে বলা হইল "চিতি-শক্তিরপরিণামিন্যপ্রতিসংক্রমা দর্শিতবিষয়া শুদ্ধাচানন্তা চ সত্ত্বগুণাত্মিকা চেয়ং।" চিত্ত তাহার বিপরীত বা গ্রাহ্যগ্রহণাত্মক। দু'য়ের পার্থক্যটী বুঝা যাউক। পুরুষের পরিণাম নাই; "সোঽহমিতিস্মৃত্যা প্রতিসন্ধানাচ্চ"। (মাণ্ডুক্য ভাষ্য) 'সেই আমি' এই স্মৃতির সাহায্যে সর্ব্ববস্তু হইতে বিপরীত ভাবে এক 'আমি' বোধ স্থির থাকে। উহাতে প্রতিসংক্রম নাই। এই 'প্রতিসংক্রম' কথাটীর অর্থ 'উপসর্জ্জন'। সাধারণ ভাবে বাহ্য বস্তুর প্রতিসংক্রমণ বা সঞ্চার, কিম্বা তাহার গ্রহণ-শীলতা এই অর্থেই 'প্রতিসংক্রমণ' শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহা হইলে 'প্রতি' শব্দের অর্থ থাকে না। বাহ্য ভাবে যে উপরাগ আছে, তাহাই চিত্তের সংক্রমণ ভাব (Receptivity of consciousness)। চিত্তের যে শুধু সংক্রমণ ভাব আছে তাহা নহে: সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত ভাবে, বস্তুর অতীত ভাবে উহা খেলে। আমাদের চিত্ত কোন বস্তুর দিকে উপরক্ত হইয়া বস্তুর ভাব গ্রহণ করে। এই গ্রহণটীর সময়ে 'আমি' বুদ্ধি থাকে না। কিন্তু ঐ গ্রহণের সহিত অজ্ঞাতভাবে একটী অন্তর্মুখী গতি বা প্রত্যয় উৎপন্ন হয়। ঐ প্রত্যয় মন, বুদ্ধি প্রভৃতি অতিক্রম পূর্ব্বক 'আমি' বা 'পুরুষ' ভাবে গিয়া স্থির হয়। এই প্রত্যয়কে 'প্রতি+অভিজ্ঞতা' বা 'প্রত্যভিজ্ঞতা' বলে। বস্তুর অভিজ্ঞতাতে বস্তু জ্ঞান হয়; কিন্তু তৎসঙ্গে অজ্ঞাতভাবে 'আমির' স্বরূপ নির্দ্ধারিত হইয়া যায়। ইহাকে প্রতিসংক্রম বা (Polarisation of consciousness) বলে। তারপর "দর্শিত বিষয়া" শব্দে "দর্শিত হইয়াছে বিষয় যাহার জন্য" এই অর্থ করা হয়। তাহা হইলে বিষয় দর্শনে

কোন এক অপরিজ্ঞাত ভাবে 'পুরুষের' ভাব ফুটিয়া উঠে, ইহা বলিতে হইবে। ঐ কথার আর একটী অর্থ করা যাইতে পারে, যথা—"পুরুষ" শুদ্ধ হইলেও বিষয়রূপ বৃত্তির দ্বারা বিপরীতভাবে ইঙ্গিত হ'ন। বাহ্য-বস্তু-বিবেকে আমরা কেবল বস্তু মাত্র দেখি বলিয়াই, চিত্ত ঐ বাহ্য-বিবেক পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংস্কার-রূপে 'পুরুষের' অভিমুখী হয়। ইহা ব্যাস-ভাষ্যে উক্ত আছে।

কথাটী আর একটু বুঝা যাউক। কারণ এই তত্ত্বের উপর সমস্ত যোগশাস্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে। স্থূলভাবে বস্তু দর্শন করিলে, আমাদের চৈতন্যের এক অংশে (Pole) স্থূলবস্তু বোধ উৎপন্ন হয়, কিন্তু অপরাংশে আমাদের 'আমিকেও' স্থূল বিশিষ্টভাবে দেখি, বা 'আমিটী' স্থূল হইয়া যায়। সূক্ষ্মলোকে গিয়া বস্তু দর্শন করিলে, চিত্তের এই প্রতিসংক্রম ধর্ম্মের জন্য 'আমি সূক্ষ্ম' এই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। 'আমি' স্থূল কি সূক্ষ্ম, এই বুদ্ধি 'পুরুষ' নহে, উহাকে 'খ্যাতি' বলে। এইরূপে স্থূলের সমক্ষে স্থূল 'অহং' 'খ্যাতি' ও সূক্ষ্মের সমক্ষে সূক্ষ্ম 'অহং' 'খ্যাতি' উৎপন্ন হয়; এবং তাহার সহিত অনুরূপ শক্তি নির্ভিন্ন হয়। কারণ স্থূলবস্তু স্থূল ভাবেই গ্রহণ করা যায়; সূক্ষ্মবস্তু সূক্ষ্ম ভাবেই গ্রহণ করা যায়। এই তিনটী ভাবকে চিত্তের ত্রিগুণাত্মক ভাব বলা যায়। একই চিত্ত গ্রাহ্যরূপে বস্তু বুদ্ধি, গ্রহণরূপে ইন্দ্রিয় বা শক্তি বুদ্ধি, গ্রহীতারূপে 'আমি' এই প্রকার বিশিষ্ট 'খ্যাতি' উৎপন্ন করে। ইহাই পুরুষের বৃত্তি-স্বারূপ্য অর্থাৎ বৃত্তির অনুরূপ ভাবে 'আমির' প্রকাশ। সাধারণ যোগী এই আশ্চর্য্য কৌশল লইয়াই যোগাভ্যাস করেন। 'আমি সূক্ষ্ম' এই বিশেষ প্রখ্যা অবলম্বন করিয়া, তাহাতে চিত্ত স্থির করিলে, তৎক্ষণাৎ সূক্ষ্মলোক ও সূক্ষ্ম দর্শনশক্তি (Finer perceptive powers) নির্ভিন্ন হয়। সেইরূপ কোন সূক্ষ্ম তত্ত্ব বা শক্তির প্রতি চিত্ত রোধ করিলে, তজ্জাতীয় 'খ্যাতি' ও বস্তু-বুদ্ধি উৎপন্ন হয়; ইহাই যোগ শাস্ত্রের বিবেক খ্যাতির স্তর। এইরূপে শুদ্ধ কৈবল্য ভাব বা পুরুষের স্বরূপ জানা যায় না। আমাদের 'পুরুষ' বুদ্ধিতে একটী আত্মভাব ভাবনা আছে অর্থাৎ 'আমি কি' ইহা সিদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি আছে। এই প্রবৃত্তিকে ভাগবত 'কৈতব' শব্দে অভিহিত করেন। "বিশেষদর্শিনঃ আত্মভাব-ভাবনা-বিনিবৃত্তিঃ।" (পাঃ-৪।২৫॥) যাঁহারা পুরুষকে বিগত-শেষ অর্থাৎ শেষশূন্য বা বিশেষ ভাবে দর্শন করেন; যাঁহারা 'আমি কে' 'আমি গত জন্মে

কি ছিলাম "ভবিষ্যতে কি হইব" "কিরূপ সাধনার দ্বারাই বা হইব," এইরূপ ভাবে দেখেন, তাঁহাদের সেই বুদ্ধিকে আত্মভাব-ভাবনা অর্থাৎ 'আমির' বিশিষ্ট-ভাব সংস্থাপন বলে। চিত্ত—সর্ব্বাত্মক; "দ্রষ্টৃদৃশ্যোপরক্তং চিত্তং সর্ব্বার্থম্।" (পাঃ ৪।২৩॥) অর্থাৎ চিত্ত, দ্রষ্টা পুরুষ ও দৃশ্য বিষয়ের সহিত উপরোক্ত অর্থাৎ দুইভাবে বিভক্ত(polarised) এবং 'সর্ব্বার্থতা' ভাবে খেলে। "এবং গৃহীতৃগ্রহণগ্রাহ্যস্বরূপচিত্তভেদাৎ ত্রয়মপ্যেতৎ জাতিতঃ প্রবিভজন্তে তে সম্যগ্দর্শিনঃ, তৈবধিগতঃ পুরুষ ইতি" (ব্যাস-ভাষ্য) অর্থাৎ গ্রহীতা, গ্রহণ ও গ্রাহ্য স্বরূপে চিত্তের ভেদ হইতে তিন জাতীয় বোধ উৎপন্ন হয়। ঐ জাতিবোধ সর্ব্বাত্মক; যেমন স্থূল বলিলে, সর্ব্বপ্রকার স্থূলবস্তু সিদ্ধ হয়, ঐরূপ চিত্তের জাতি-গত বোধ হইতে অহংভাবে,—"আমার এ জন্ম ও পরজন্ম, আমি কিরূপে পশুপক্ষী প্রভৃতি ছিলাম," এইরূপ সর্ব্ববুদ্ধি প্রসূত হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃত পুরুষ নহে বলিয়া, বেদান্ত পুরুষকে 'অজাতি' বলিয়াছেন। এইরূপে গ্রহণাত্মক বা শুদ্ধ অবি-শেষ-গ্রহণশীলতা-ভাব হইতে অসংখ্য ইন্দ্রিয়াদি রূপ পরিমাণ হয়; ও শুদ্ধ গ্রাহ্যশীল ভাব হইতে অসংখ্য বিশিষ্ট জগৎ বস্তুর বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। 'আমি কি ছিলাম' এইরূপ জ্ঞানে আমাদের দৃষ্টি 'আমির' স্বরূপে থাকে না; আমার বাহ্যভাব অর্থাৎ আমার স্ব ভাব, -ধর্ম্ম, শক্তি, আকৃতি প্রভৃতির দিকে থাকে। এইজন্য ঐ সকল ভাবনা মোক্ষের দিকে আমাদিগকে অগ্রসর করে বটে, কিন্তু উহা সম্যক্ আত্মতত্ত্ব দর্শন নহে। যিনি বিশেষ বা পরম অদ্বৈতরূপে এক 'আমিকে' চিনিতে পারিয়া-ছেন, তিনি আর বাহ্য 'সর্ব্ব'ভাবের দ্বারা 'আমিকে' লক্ষিত করেন না।

চিত্ত কিরূপে এইভাবে লইয়া যায়, এক্ষণে তাহাই বিবেচ্য। 'চিত্ত' শব্দে আমরা শুদ্ধ (Pure) গ্রহণাত্মক (receptive) চৈতন্য (consciousness) বুঝিব। Professor Myers, ভাবিতে ভাবিতে সকল ইন্দ্রিয়ের মূলে এক (primitive) শুদ্ধ (undifferentiated) স্বরূপভাবে অবস্থিত ও ইন্দ্রিয়াদিরূপে বিবর্ত্তিত হইলেও, তাহার ভিতরে অবিশেষ গ্রহণশক্তি-রূপে অবস্থিত শক্তি Irritability of consciousness দেখিতে পাইয়াছেন। ইন্দ্রিয়ে এই গ্রহণশীলতা আছে। কিন্তু উহা বিশিষ্টভাবে রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ বুদ্ধির দ্বারা আবদ্ধ। চক্ষু 'রূপ'-ভাবেই গ্রহণ করিতে পারে বলিয়া, তাহার গ্রহণশীলতা-রূপভাবে নিবদ্ধ। ঐরূপ ভাব সামান্য; মনুষ্য ও

পশুতে সমান বলিয়া, ঐ গ্রহণশীলতার মধ্যে যে 'আমির' প্রখ্যারূপ আভাস আছে, তাহাকে হিন্দুশাস্ত্রে চক্ষুর 'দেবতা' বলে। ইন্দ্রিয়ের জ্ঞান ছিন্ন ও 'সর্ব্ব'গ্রহণশীল বা চঞ্চল; সুতরাং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃত 'আমির' সিদ্ধি হয় না। ইন্দ্রিয়ের ছিন্নভাব গুলিকে কামনারূপ বৃত্তি ধারণ করিয়া থাকে। বস্তুর গুণ বা রূপাদি, ভাবগুলি, 'বস্তু'রূপে ধৃত হয় বটে; কিন্তু বাহ্য বস্তুতে আমার 'আমির' তৃপ্তি হয়না বলিয়া বাসনা বাহ্য বস্তু-ভাবের স্থিতিকে ত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানগুলিকে 'আমার' করিবার জন্য চেষ্টা করে। এইজন্য ইন্দ্রিয় হইতে বাসনা 'পর' বা অতিগ (Transcendent)। শুধু 'বস্তু' দেখিলে 'আমি' সিদ্ধ হইবে না বলিয়া, বাসনা 'আমার' ভাবে বস্তুকে সংগ্রহ করিয়া উর্দ্ধাভিমুখী করে। অসংখ্য ইন্দ্রিয়বৃত্তি 'আমির' দিকে সুখ-অনুযায়ী রাগ ও দুঃখ-অনুযায়ী দ্বেষরূপে আমাতে বিধৃত হইতেছে। ঐ দেখ চিত্তের গ্রহণশীলতা আর একটু পরাভাবে খেলিল। কিন্তু বাসনাও চঞ্চল। এখনও আমাদের কামনা সেই একের দিকে যাইতেছে না; এখনও অনন্ত ভাবে বাহিরের দিকে ছুটিতেছে। সেইজন্য বাসনাগুলিকে পরা-ভাবে বোধ বা জ্ঞানরূপে পরিণত করিবার জন্য মনস্তত্ত্বের আবশ্যকতা। এক একটি বাসনার ভিতরে যে 'আমির' আভাস পড়ে, তাহাই প্রেতলোকের সাময়িক 'আমি'। ঐ বাসনার ভোগ কালই, ঐ 'আমির' আয়ুঃ। যখন বাসনার ভোগ হইতে মানসিক ভাব উৎপন্ন হয়, তখন চিত্ত কেবল আমার সুখ, আমার দুঃখ এইরূপে গ্রহণ করে না। বাসনাবদ্ধ-জীব বসন্ত রোগ দেখিলে তাহার 'আমির' অধিষ্ঠান শরীরের বিপদ্ দেখিয়া ভীত হয়; কিন্তু বৈজ্ঞানিক সংকল্প-বিকল্পের দ্বারা বসন্ত রোগের জীবাণু কৌশলপূর্ব্বক পরিবর্ত্তিত করিয়া মানবের উপকার সাধন করিতেছেন। মন দ্বারা আমরা বাসনার উর্দ্ধভাবে বস্তুর স্বরূপ দেখিতে পাই। আবার 'অর্থ সুখকর' এই বোধটী হইতে অর্থসম্বন্ধীয় অনন্ত প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া জন্ম জন্মান্তরেও নিবৃত্তি হয় না। মানসিক বোধের অস্তিত্ব বহুকালব্যাপী বলিয়া মানস ক্ষেত্রের 'আমিটি' অপেক্ষাকৃত স্থায়ী। কিন্তু সেই জন্যই মানসিক ভ্রান্তি দূর করা বড় কঠিন। এই মানসিক ভাবে স্থাপিত হইয়া, এক ধর্ম্মাবলম্বী অন্য ধর্ম্মাবলম্বীকে দ্বেষ করেন। বুদ্ধি অধিকরণ বা আধারে মানসিক বৃত্তিগুলিকে সর্ব্বভাবে সংগৃহীত করিয়া তাহাতে অবসান করে। বুদ্ধির এই অবসান ভাব, কখন বাহিরের দিকে বস্তুরূপে, কখন বা ভিতরে পরাভাবে 'আমির' দিকে খেলে। এই দুইটী খেলার ভিতরের

তত্ত্ব এক। যে আপনাকে ভেদ-ভাবে নির্দ্দেশ করে, ভেদ ভাব-প্রযুক্ত তাহার বাহ্যজ্ঞান থাকে। সেই জন্য যাহার 'আমি' স্থূল বলিয়া মনে হয়, তাহার বুদ্ধি বাহ্য স্থূলের দিকে ব্যবস্থিত হয়। যে আপনাকে সূক্ষ্মভাবে দেখে, তাহার বুদ্ধি সূক্ষ্ম বস্তু স্থাপিত করিয়া, তাহার সাহায্যে বিশিষ্ট আমির সূক্ষ্মতা ফুটাইবার চেষ্টা করে। যে আপনাকে অবিশেষ ভাবে একটুও চিনিতে পারিয়াছে, সে বিভিন্ন জন্মের ঘটনাবলী দেখিলেও, তাহা হইতে শুদ্ধ অবিশেষ আমি ভাবটীই দেখিতে পায়। সুতরাং বুদ্ধির অন্তরালে তাহার নিয়ামক অহংকার আছে। বুদ্ধিতে চিত্তের গ্রহণশীলতা এক অধিকরণে স্থির হইতে চেষ্টা করে। অহংকার তত্ত্ব দেখায় যে এই অধিকরণটী 'আমি' জাতীয়, উহা বাহ্য বস্তু নহে। বুদ্ধির খেলা যে আমির জন্য, ইহাই দেখান অহং-কারের ভাষা। কিন্তু এ 'অহং' বিশিষ্ট ও বাহ্য কার্য্য কারণ ভাবের দ্বারা সিদ্ধ হয়। সেই জন্য বিশিষ্ট বুদ্ধি-বৃত্তি ও বস্তু না থাকিলে এবং চৈতন্য তদ্দ্বারা প্রতিঘাত হইয়া 'আমির' দিকে না ফিরিলে আমিত্ব বোধ হয় না। 'আমি ইন্দ্র' এই বোধে স্বর্গাদি অধিকার থাকা আবশ্যক। বোধ হয় অহংকারের এই ফল বুঝাই-বার জন্য, পুরাণে মধ্যে মধ্যে দৈত্যাদিগের স্বর্গাধিকার ও ইন্দ্রের নিজ অধিকার সংরক্ষণের জন্য মহা প্রয়াসের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। এক জাতীয় বুদ্ধির খেলায় ও প্রতিঘাতে সেই জাতীয় বিশিষ্ট অহংকার উৎপন্ন হয়। সুতরাং সাধারণতঃ চিত্তের গ্রহণশীলতা, অহংকার-তত্ত্বে বুদ্ধির সর্ব্বাত্মিকা ভাবকে বিপরীত ভাবে গ্রহণ করে। সেই জন্য ছিন্ন 'সর্ব্ব' বোধের সাহায্যে স্থির 'আমি'র বোধ হয়। বিপরীত ভাবে গ্রহণ করাই দৈত্যগণের অহংকার; 'আমি সর্ব্ব' এই বোধ দেবতাদের অহংকার। মনে করুন আপনি যোগে দেখিলেন যে রাম, শ্যাম প্রভৃতি সকল ব্যক্তিই আপনি। অনেকে ইহাকে আত্মজ্ঞান বলেন; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। কেননা বাহিরের 'সর্ব্ব'-জ্ঞান না থাকিলে, 'আমি সর্ব্ব' এই জ্ঞান হয় না। উহাতে আমির স্বরূপ নির্ণয় হয় না, কেবল 'সর্ব্ব' ভাবের মধ্যে 'আমি' মিলাইয়া যায়। উহাতে আমির সর্ব্বাত্মিকা ভাবটী সিদ্ধ হয় বটে; কিন্তু পরা-ভাব অসিদ্ধ থাকিয়া যায়। চিত্তে, আমি যে সর্ব্বভাবের সার বা অর্থ এই ভাবে বুঝা যায়। উহা স্বচ্ছ ও অবিকারী বলিয়া 'সর্ব্ব'ভাব এক থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দিব। চিত্ত বাহ্যভাবে অনুরক্ত হইয়া খেলিলে ও জগতের বিশিষ্ট বস্তু দেখিলে, আর 'বস্তু'রূপ

জাগ্রত হয় না; তখন ঐ দর্শনে কেবল 'আমি' এই ভাব জাগিয়া উঠে। শ্রীভগবানকে বিশিষ্ট রূপে দেখিয়া, গোপীগণের চিত্ত সর্ব্ব বস্তুতেই তাহার মূর্ত্তি দেখিতে পাইল। কিন্তু জগদ্বস্তুর অতীত জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ পরাভাবে বোধ হয় না। সুতরাং চিত্তের গ্রহণশীলতা স্বভাবতঃ 'সর্ব্ব' বস্তুতে ব্যক্ত আমির শুদ্ধ-ভাব সংগ্রহ করে।

এই পর্য্যন্ত ত্রিগুণের খেলা। চিত্তের গুহা কোন বাহ্য বস্তু নহে। উহা অবিশেষ ও অদ্বয় বোধ-গ্রহণ শক্তি। পুরুষকে বিশেষ বলিয়া জানিলে, চিত্তের সর্ব্বার্থতা,—বিষয়ে ব্যক্ত পুরুষের অর্থ বা প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য খেলে। ইহা সাংখ্যের চিত্ত, ইহাতে ব্রহ্ম-ভাব নাই।

ন পাতালং ন চ বিবরং গিরীণাং নৈবান্ধকারং কুক্ষয়ো নোদধীনাম্।
গুহা যস্যাং নিহিতং ব্রহ্ম শাশ্বতং বুদ্ধিবৃত্তিম্ বিশিষ্টাং কবয়ো বেদয়ন্তে॥
(ব্যাসভাষ্য; পা ৪।২২।)

"যে গুহাতে শাশ্বত ব্রহ্ম নিহিত আছেন,—তাহা পাতাল, গিরিবিবর, অন্ধকার বা সমুদ্রগহ্বর নহে। কবি বা জ্ঞানীরা তাহাকে অবিশিষ্টা বুদ্ধিবৃত্তি বলিয়া জানেন। চিত্ত অসংখ্য বাসনাদি দ্বারা পর বা পুরুষের চিত্র অঙ্কন করিতেছে। ঐ অঙ্কনটা সংহতি (synthesis) রূপাত্মক, অর্থাৎ ব্যক্ত বহুকে অবিশেষ ভাবে এক করিয়া, তাহা হইতে পুরুষরূপ পরাগতির সঙ্কেত বুঝাইবার জন্য খেলিতেছে। "তদসংখ্যেয় বাসনাভিশ্চিত্রমপি পরার্থং সংহত্যকারিত্বাৎ॥" (পা, ৪।২৪) পুরুষ—স্বার্থ, চিত্ত—পরার্থ। পুরুষ এক; চিত্ত অনেককে একভাবে সংহনন করে। উভয়ের গতির প্রভেদ বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। ইহার রহস্য বুঝিতে না পারিয়া আজকাল অনেকে হিন্দু-দর্শনকে বিজ্ঞানবাদ (Idealism) বলিয়া মনে করেন। পুরুষের সন্নিধানে, চিত্ত তাহার সর্ব্ব গ্রহণশীলতার সাহায্যে সেই পুরুষকে লক্ষিত বা অঙ্কিত করিতে চেষ্টা করে। পুরুষ অর্থে সাংখ্যের পুরুষ হইলে, চিত্ত প্রত্যেক পুরুষে অনুযায়ী ভাবে থাকে। তবে পুরুষ আপন ভাবে থাকে; চিত্তও আপন ভাবে থাকে, দুইয়ের কোন সংযোগ নাই, ইহা সাংখ্য মত বলিয়া আজকাল অনেকে ভাবেন। পাতঞ্জল সূত্রের ২।১৭ সূত্রের ভাষ্যে ব্যাসদেব বলেন "দৃশ্যাঃ বুদ্ধিসত্ত্বোপারূঢাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ, তদেতৎ দৃশ্যময়স্কান্তমণিকল্পং সন্নিধি-মাত্রোপকারি দৃশ্যত্বেন ভবতি পুরুষস্য স্বং দৃশিরূপস্য স্বামিনঃ, অনুভবকর্ম্ম-

বিষয়তামাপন্নম্ অন্যস্থ রূপেণ প্রতিলব্ধাত্মকং, স্বতন্ত্রমপি পরার্থত্বাৎ পরতন্ত্রং।" অর্থাৎ দৃশ্য শক্তি বুদ্ধির একরূপে অবসান-স্রোতে উপরূঢ় হইয়া, একের অভিমুখী হয়। উহা 'সর্ব্ব' ধর্ম্মাত্মক, (universal)। অয়স্কান্ত মণির (magnet) ন্যায়, চিত্ত কেবল সন্নিধিমাত্রে পুরুষের উপকারী বা উপকরণভূত ক্ষেত্ররূপে 'দৃশ্য' ভাবে অবস্থিত হয়। দ্রষ্টা স্বামী পুরুষের অনুভব কর্ম্মরূপ ভাবের বিষয় বা বিশিষ্ট রূপে অবসান প্রাপ্ত হইয়া, পুরুষের স্বরূপের দ্বারা প্রতিলব্ধাত্মক হয়। এইরূপে চিত্ত স্বতন্ত্র হইলেও, পরার্থের জন্য পরতন্ত্র। অতএব উদ্ধৃত ভাষ্য কয়েকটি তত্ত্ব বুঝা গেল। (১) চিত্ত এক অবিশেষ সর্ব্বাত্মক ভাবে খেলে। ঐ সর্ব্বাত্মিকতাই তাহার স্বতন্ত্রতা বা স্ব-ভাব। (২) পুরুষ যে ভাবে থাকে, ঐ সর্ব্ব গ্রহণশীলতা সেইভাবে পর পুরুষের অভিমুখে খেলে বলিয়া উহা পরতন্ত্র। (৩) বুদ্ধির একত্বে-অবসান ক্রিয়ার দ্বারা চিত্তের সর্ব্বাত্মিক ভাব এক পুরুষের দিকে প্রধাবিত হয়। (৪) চিত্ত ও পুরুষ একখণ্ড চুম্বকের দ্বিভাবের (pole) ন্যায়। চুম্বকের এক ভাবে (pole) শক্তির বৃদ্ধি করিলে, অপর ভাবেও শক্তির বৃদ্ধি হয়। কিন্তু পুরুষের ভাবেই চিত্ত প্রতিলব্ধাত্মক হয়। 'প্রতিলব্ধাত্মক' শব্দে 'রূপ লাভ' বলিয়া অনেকে অর্থ করেন; কিন্তু তাহা সঙ্গত নহে। কারণ পুরুষে রূপের লেশ নাই। পুরুষ কেবল অনুভব-স্বরূপ। সর্ব্ববিষয়ে অনুরূপে তাহার বোধ ফুটিয়া উঠে বলিয়া পুরুষের 'অনুভব কর্ম্ম' বলা হইল। বেদান্ত ভাবে অনুভবই পুরুষের স্বরূপ। এই অনুভব-কর্ম্মের সহায়তা করে বলিয়া, সেই ভাবেই চিত্ত লব্ধাত্মক হয়। সুতরাং পুরুষ ও চিত্তের মধ্যে, শুদ্ধ বোধরূপ এক সংযোগিনী ভাবের স্বীকার করিতেই হইবে। যদি চিত্ত স্বতন্ত্রই থাকিবে তাহা হইলে কিরূপে লব্ধাত্মক হইয়া, অনুভবে তাহার শেষ হইবে। 'পরতন্ত্র' শব্দেও বুঝা যায় যে সর্ব্বভাবের অতিগ বা পর ভাবেই চিত্তের খেলা পুরুষে যাইতে পারে, তদ্ভিন্ন নহে। বাচস্পতি মিশ্রের মতে, পুরুষের ভাবেই চিত্ত পুরুষাভিমুখী হইয়া স্থির হয়। পাতঞ্জল দর্শনে পর সূত্রের ভাষ্যে 'পুরুষার্থকর্ত্তব্যতয়া প্রযুক্ত সামর্থ্যাঃ' শব্দের প্রয়োগ আছে; অর্থাৎ চিত্ত তাহার সর্ব্বাত্মিকা ভাব পুরুষের সন্নিধানে, পুরুষের অর্থ বা স্বরূপ প্রকট করিবার জন্য প্রযুক্ত করে এবং সাধারণ বা সামান্য ভাব ত্যাগ করিয়া তখন প্রকৃষ্ট বা পুরুষরূপে সক্ত হয়। অতএব বুঝা গেল যে চিত্ত ত্রিগুণ হইলেও, পুরুষ স্বরূপ স্থাপনের জন্য খেলে। পঞ্চশিখাচার্য্য

বলিয়াছেন "অয়ন্তু খলু ত্রিষু গুণেষু কর্ত্তৃষু অকর্ত্তরি চ পুরুষে তুল্যাতুল্যজাতীয়ে চতুর্থে তৎক্রিয়াসাক্ষিণি উপনীয়মানান্ সর্ব্বভাবানুপপন্নাননুপশ্যন্নদর্শনমন্যচ্ছঙ্কতে।" চিত্ত ত্রিগুণ ও কর্ত্তা; পুরুষ অকর্ত্তা; এইরূপ হইলেও উহারা তুল্যাতুল্য জাতীয়, অর্থাৎ একভাবে চিত্ত ও পুরুষ তুল্য ও অপর ভাবে অতুল্য। চিত্ত সর্ব্বরূপে খেলে বলিয়া অতুল্য এবং পুরুষরূপে খেলে বলিয়া তুল্য। পুরুষ চতুর্থ অর্থাৎ তিন গুণের সাক্ষী ও পর। পুরুষে সর্ব্বভাব উৎপন্ন হয় বা উপস্থাপিত হয় বলিয়া পুরুষকে ত্রিগুণাত্মক বলিয়া ভ্রম হয়। পুরুষ যে অন্য বা পরাভাবে থাকে তাহা বুঝিতে পারা যায় না। চিত্তে পুরুষের আত্মভাব আছে; অথচ তাহার 'সর্ব্ব'ভাব কিরূপে পুরুষে পৌছিতে পারে, ইহাই বিবেচ্য। যদি সাংখ্য পুরুষের অতীত পুরুষোত্তম না থাকিতেন, তাহা হইলে চিত্ত ও তাহার সর্ব্বভাব কখনও নিবৃত্ত হইত না। পুরুষ সর্ব্বদাই 'সর্ব্বে'র জ্ঞ হইয়া সর্ব্বভাবেই সংযুক্ত থাকিত। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ শব্দে 'সবজান্তা' অর্থ ব্যতীত আর এক অর্থ আছে। শঙ্কর বলেন, "সর্ব্বশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি" যিনি সর্ব্ব ও জ্ঞ, সেই ভগবানই সর্ব্বজ্ঞ। পূর্ব্বোক্ত পাতঞ্জল ভাষ্যে এই তত্ত্বের আভাষ পাওয়া যায়। ভাষ্যকার বলিলেন, "বুদ্ধেরেব পুরুষার্থপরিসমাপ্তিবন্ধঃ, তদর্থাবসায়ো মোক্ষঃ" অর্থাৎ যতক্ষণ বুদ্ধি ও চিত্ত পুরুষার্থে অপরিসমাপ্ত বা শেষ না হয়, ততক্ষণ বদ্ধভাব; আর যখন তাহাদের অশেষ বৃত্তি পুরুষে শেষ হইয়া যায়, তখনই মোক্ষ। তখন আর 'সর্ব্ব'ভাব থাকে না। তখন আর অন্য বস্তু-বুদ্ধি থাকে না। তখন চিত্ত সর্ব্বতোভাবে সর্ব্ব-স্বভাবে পরম 'আমি'রূপে মিশিয়া যায়। বস্তুতত্ত্ব প্রবন্ধান্তরে আলোচিত হইবে। এখন এইটুকু বুঝা গেল যে, যতক্ষণ ভিন্ন পুরুষভাব থাকিবে, ততক্ষণ চিত্ত পুরুষে মিশিবে না, এই দুয়ের নিয়ামক পুরুষোত্তমরূপ পরম ভাবে থাকা আবশ্যক। সেইজন্য ভাগবতে ত্রিগুণের অতিগ সর্ব্বতত্ত্বের অধিষ্ঠাতা রূপ ভগবৎ-ভাব স্বীকার করা হয়। ভাগবত, চিত্তের সর্ব্বাত্মিকা ভাব দেখিয়া ক্ষান্ত নহেন। 'সর্ব্ব'ভাব-গ্রহণশীলতা এখন স্বচ্ছতা বা শান্তভাবে ভগবৎ-প্রতিবিম্ব গ্রহণশক্তি-রূপে খেলে; এবং চিত্তের খেলা হইতে কেবল সাংখ্য পুরুষ না দেখিয়া ভগবানের বাসুদেবরূপ পরম ভাব বা পদ দেখা যায়।

> যত্তৎ সত্ত্বগুণং স্বচ্ছং শান্তং ভগবতঃ পদম্।
> যদাহুর্বাসুদেবাখ্যং চিত্তং তন্মহদাত্মকম্॥ ভাঃ—৩।২৬।২১।

চিত্তের এই ভাবের খেলা দেখানই প্রকৃত শাস্ত্রের ভাব। এই ভাব ফুটিতে গেলে, চিত্ত যে যে স্তরের মধ্যে দিয়া যায়, তাহা ভাগবতে ব্রহ্মার মোহনাশ নামক অধ্যায়ে উক্ত আছে। ভগবানই যে চিত্ত ও পুরুষরূপে খেলেন, তাহা বুঝাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এক সঙ্গে গোপ ও গোপবৎস প্রভৃতির প্রকাশের কথা বলা হইল। 'উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ॥" ভাঃ—১০।১৩।১৮। অর্থাৎ ভগবান্ উভয় ভাবে আপনাকে যেন বিভক্ত করিয়া একভাবে গো এবং গোপাদিরূপে ও অপর ভাবে নিজের স্বরূপে রহিলেন। ইহা তাঁহার চৈত্তিক বিকাশ। এতদ্দ্বারা 'তিনি সর্ব্ব' অর্থে যে বাহ্য কিছু নহে; সর্ব্ব অর্থে যে বিষ্ণুই বুঝায় তাহা বুঝাইবার জন্য সর্ব্ব-স্বরূপে গো প্রভৃতি রূপে ব্যক্ত হইলেন।

"সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঙ্গবদজঃ সর্ব্বস্বরূপোবভৌ।" ভাঃ—১০।১৩।১৯।

তারপর অহংকার-তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা শ্রীবলরাম দেব ভাবিলেন, 'যে আগে ত' জানিতাম" যে এই গোপগুলি দেবতা ও গো সকল ঋষিগণের অভিব্যক্তি। এখন দেখিতেছি যে সকলের ভিতর দিয়া সমভাবে একই শ্রীভগবান্ প্রতিভাত হইতেছেন।" বাস্তবিক অহংকার-তত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইলে, ভগবানের অবতারেও আমরা বিশিষ্ট মৈত্রেয়াদি ঋষির খেলা দেখিতে পাই। কিন্তু অভেদ জ্ঞান উৎপন্ন হইলে জানা যায় যে, বস্তু সকল ভেদের আশ্রয় বটে, কিন্তু তাহা হইলেও সকলেই শ্রীভগবান্ সমভাবে প্রকাশিত হন।

নৈতে সুরেশা ঋষয়ো নচৈতে, ত্বমেব ভাসীশ ভিদাশ্রয়েঽপি।
সর্ব্বং পৃথক্ ত্বং নিগমাৎ কথং বদেত্যুক্তেন বৃত্তং প্রভুনা বলোঽবৈৎ॥ ভাঃ ১০।১৪।৩৯।

এই অবস্থায় বস্তুর বিভিন্নতাও দেখা যায়; অথচ তাহার মধ্যে এক একত্বের বিকাশও দেখা যায়। তাহার পর ব্রহ্মা বিশেষ ভাবে কোন্ গোপগুলি সত্য, আর কোন্গুলি মায়াবী, ইহা নির্ণয় করিতে পারিলেন না। তখন কাতর হওয়াতে চিত্তের প্রকৃত খেলা আরম্ভ হইল। তখন তিনি দেখিলেন, যে বাহ্য গোপ, বৎস, যষ্টি শৃঙ্গ প্রভৃতি আর সেরূপে নাই; সকলেই কিরীটি-কুণ্ডল-বনমালা শোভিত শ্রীনন্দনন্দন।

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ-মাত্রৈকরসমূর্ত্তয়ঃ।
অদৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্॥ ভাঃ ১০।১৪।৫৪।

দেখিলেন যে সকলেই সত্যজ্ঞান আনন্দস্বরূপ; সকলেই স্বজাতীয় বিজাতীয়

ভেদশূন্য ঘন-রস-মূর্ত্তি ভগবান্। কিন্তু তখনও একটু 'স'কল বুদ্ধি বা সর্ব্বভাব আছে। তারপর ব্রহ্মার বহির্দৃষ্টির লোপ হইল। তাঁহার 'অহং-স' হংস ভাব লয় হইল; এবং তিনি এক ঘন ব্রহ্মস্বরূপে শ্রীভগবানকে দেখিতে পাইলেন; ইহাই চিত্তের প্রকৃত গতি। এই গতি লাভ করিতে হইলে, চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী চিত্ত-জননী চৈতন্যের পরাগতিরূপা ব্রহ্মময়ী দেবী কাত্যায়নীর কৃপা আবশ্যক। তিনি গায়ত্রীরূপে খেলিলে ভূঃ প্রভৃতি সকল লোকে এক ঘন শ্রীভগবান্ বোধ ফুটিয়া উঠে। এই চিত্ত-জননী শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে, কেবল শ্রীভগবানের পরম পদ দেখাইবার জন্য অহংকার-পরিশুদ্ধ জীবে খেলেন। তুমি যে কোন ভাবে থাক না কেন, যে কোন তত্ত্বে অবস্থিতি হউক না কেন, সকল তত্ত্বেই সেই শ্রীভগবানকেই দেখিতে পাইবে। তখন আর চিত্ত-নদী সংসাররূপে প্রবাহিত হইবে না, কেবল কৈবল্যাভিমুখে ধাবিত হইবে। তখন ঐ চিত্ত-নদী অহংকার-তত্ত্বে ত্রিধা বিভক্ত হয় ও সত্ত্বে অলকানন্দা, রজে গঙ্গা ও তমে ভোগবতীরূপে প্রবাহিতা হইয়া, জীবের কার্য্যকারণকর্তৃত্বভাব সিদ্ধ করেন না। তখন ঐ স্রোতের —ঐ অহংকারের জল-প্রপাতের মধ্যে এক সূক্ষ্ম পরাগতি দেখিতে পাওয়া যায়। যাঁহারা মহামায়ার প্রকৃত খেলা বুঝিয়াছেন, মাণ্ডূক্যভাষ্যে আচার্য্য দেব শঙ্কর তাঁহাদিগকে 'মহা-মৎস্য' বলিয়াছেন। সেই মহাপুরুষেরা জাগ্রতাদি সন্ধিস্থল ও সৃষ্টিকালে ভগবানের বিশ্বাভিমুখী চিত্ত প্রবৃত্তি, অনায়াসে ভেদ করিয়া, চিত্ত-নদীর উৎপত্তি স্থান সেই শ্রীভগবানে উপস্থিত হইতে পারেন। তাঁহারা "হৃষীকেশে" সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাষম্ ভগবানকে দেখিতে পাইয়া, সর্ব্বকামে সেই কামনার এই পরিসমাপ্তি চিনিতে পারিয়া 'মায়াপুরী ক্ষেত্রে' সুসিদ্ধ হইয়া, দেবগঙ্গার সহিত জগদ্-গুরু অহংকারের অধিষ্ঠাতা মহাদেবের কেদার-মূর্ত্তি দর্শনে, সর্ব্ব অহং-বৃত্তিতে এক পর শুদ্ধ নিষ্কল অহং দেখিতে পাইয়া, তাহাকে শিবময় রূপে জানিয়া, পরে সেই দেবাদিদেবের প্রসাদে শ্রীবদরীনারায়ণে সর্ব্বভাবে তপস্যান্বিত ও তপস্যার দ্বারা জগতের সংরক্ষণকারী নারায়ণের জ্যোতির্ম্ময় হিরণ্ময় কোষাধিস্থিত প্রকট মূর্ত্তি সন্দর্শনপূর্ব্বক, পরে সেই শুদ্ধ কাল ঘন নিষ্কল তত্ত্বে পর্য্যবসিত হন। মহাপুরুষগণের এই পথ অতি দুর্গম; কারণ ইহাতে বোধ প্রথম হইতেই ত্রিগুণাতীত পরম ভাবে সংলগ্ন হওয়া চাই। সেই অদ্বয় তত্ত্বে আমাদের ভয় হয়, যে পাছে সাধের 'আমিটা' হারাইয়া যায়।

আমরা যে অতি ক্ষুদ্র, সফরীতুল্য। আমরা বুদ্ধির ঐকান্তিকতা ও পরনিষ্ঠা, চিত্তের সর্ব্বার্থতা, ও অহংকারের শুদ্ধ অহংপ্রকাশিকা ভাব বুঝিতে পারি না। আমাদের কামে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি নাই। আমরা যে 'পর' বলিলেই বাহিরের বস্তু বলিয়া বুঝি। আমরা ভাগবত পাঠে ভগবানের অবতারে নারায়ণ ও মৈত্রেয় নামক বিশিষ্ট ঋষির খেলা দেখিতে পাই; কেন না এখনও আমরা ভেদ-বিশিষ্টতার প্রিয়। আমরা শ্রীভগবানের রাসলীলার কথা পড়িয়া অনেক জন্মের সংস্কারমূলক মদনরাজের অভিব্যক্তি দেখিয়া ফেলি। আমাদের ভয় হয় পাছে শ্রীভগবানের সহিত গোপীদের স্থূলভাবে মিলন হইয়াছিল, এ কথা বলিলে সেই নিষ্কলতত্ত্বে ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্যের দোষ পড়ে। তা'ই সেই নিত্য জীব-শিবের মিলনস্থান 'আপ-জ্যোতির' অতীত পরম ঘন এক রসের বিকাশ স্থান,—সেই শ্রীভগবানের স্বপ্রকাশ মায়ালেশ শূন্য রাস লীলাতে একটা সূক্ষ্ম শরীরের খেলা বলিয়া অর্থ করিতে বাধ্য হই। তবে আমাদের উপায় কি? আমাদের উপায় ভগবানের অবতার, সেই পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণাবতার পরমাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ। যিনি অবতীর্ণ হইলে অগ্নির ন্যায় নিজগুণে অসুরদিগের দ্বেষ্যবুদ্ধি, রমণীগণের বালকবুদ্ধি, ও গোপীদিগের জারবুদ্ধি, লইয়া পরিষ্কৃত করিয়া তাহাতেই আপনাকে দেখাইয়া দেন, - যাঁহার আগমনে আর সাধনার অবসর থাকে না, সেই আকাশ অধিষ্ঠিত স্বীয় বায়ু বা মাতরিশ্বা শক্তির বিঘূর্ণনে প্রকটরূপ হইয়া আকাশীয় অপ্রাকৃত শুদ্ধ-চিত্ত স্তম্ভের মত ঘনীভূত করিয়া, যখন অবতীর্ণ হইয়া থাকেন, তখন সেই পরম শ্যাম-চন্দ্রের আকর্ষণে প্রকৃতির তরঙ্গমালা বিভূষিত জলরাশি—এই অনন্ত সর্ব্বভাবের খেলার প্রবৃত্তি, সেই মহান্ আকর্ষণে আকার্ষিত হইয়া স্বতঃই উত্থিত হইয়া স্তম্ভের সহিত মিশিয়া যায়। তখন সেই চিত্ত-জলস্তম্ভের স্রোতে পড়িয়া বড় বড় তিমি মৎস্য হইতে ক্ষুদ্র সফরী পর্য্যন্ত উত্থিত হইয়া, চিত্ত হইতে চিতি শক্তিতে স্থাপিত হয়। দেখ না ভাই, কি ব্রজগোপী, কি যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নী, কি অঘাসুর—যাহার ভয়ে নিত্য 'অঘমর্ষণ' করিতে হয়,—কি সর্ব্বনাশী পুতনা, সকলেই তাঁহার গতি প্রাপ্ত হয়। বালকেরা তাঁহাকে বিশিষ্ট ঋষির অংশসম্ভূত বলিয়া মনে করে। অজ্ঞেরা তাঁহার নিত্যভাব ভুলিয়া, স্বকপোলকল্পিত নূতন নূতন অবতারের প্রতীক্ষা করে।

যথা নভসি মেঘৌঘা রেণুর্বা পার্থিবোঽনিলে।
এবং দ্রষ্টরি দৃশ্যত্বমারোপিতমবুদ্ধিভিঃ ॥ ভাঃ—১।৩।৩১।

যেমন জলের রংএ, নির্লেপ আকাশকে রঞ্জিল বলিয়া মনে হয়, সেইরূপ শুদ্ধ শ্রীভগবানে, দৃশ্য ব্যক্ত ঋষিজ্ঞান, অবুদ্ধিপূর্ব্বক আরোপিত হয়। স্বামী হ্যাট্ কোট পরিয়া বাড়ী ফিরিলে, যে স্ত্রী তাহার সাহেবরূপ দেখেন, তিনি স্বামীকে ভাল বাসেন না,—রূপকে ভাল বাসেন; সুতরাং ভগবানের মায়া পরিচ্ছদের দিকে যে ভক্তের দৃষ্টি আকৃষ্ট, তাহাকে আমরা আগামী জন্মে হিন্দু স্ত্রী হইতে উপদেশ দিই। স্ত্রীরূপে স্বামি নিষ্ঠা সিদ্ধ হইলে, তাহাদের এ ভ্রান্তি দূর হইবে। যখন মহাপুরুষগণের হস্ত পদাদি বা চিত্র আলেখ্যাদির স্পর্শ হইতে শিষ্য-হৃদয়ে গুরু চিত্তের পরাগতি প্রকট হয়, তখন জার-বুদ্ধিতে আগত গোপীগণ পূর্ণ প্রকট ব্রহ্মের শরীরের যে কোন অঙ্গ স্পর্শ করিলে, তাহাদের কি আর অন্য বুদ্ধি থাকিতে পারে? আমরা এখনও গণিকাবৃত্তি ত্যাগ করিতে পারি নাই বলিয়া, শ্রীভগবানের খেলায়ও কামাতঙ্ক দেখি। আমরা ভুলিয়া যাই যে কাত্যায়নী দেবীর প্রসাদে চিত্তের পরভাব সিদ্ধ হওয়ার পর—রাসলীলা। ভাগিনেয় পুত্র রাজা পরীক্ষিৎ ভগবদ্ভক্ত ক্ষত্রিয়, ভগবানের পরদারাভিমর্ষণের কথা তুলিয়াছিলেন। যদি রাসলীলা সূক্ষ্ম শরীরের খেলা হইত, তাহা হইলে এই প্রশ্ন উঠিতে পারে না। কামাতঙ্কের ঔষধ, সর্ব্বকামের পরিসমাপ্তি শ্রীভগবানে।

সেই সদানন্দের আনন্দরূপা কাত্যায়নী দেবী আবার আগমন করিয়াছেন। এই সময়ে একবার সর্ব্বভাব ত্যাগ পূর্ব্বক বুদ্ধি ও অহংকার অতিক্রম করিয়া, সেই চিদানন্দ-ঘন আনন্দ স্বরূপ,—সেই আনন্দের আনন্দ বা শ্রীনন্দনন্দনের অভিমুখে, এস, কৈতব শূন্য হইয়া চিত্তকে প্রযুক্ত করি। মহামায়ার কৃপায় নিশ্চয়ই বিগতচিত্ত হইয়া প্রেমের বৈচিত্র্য ও প্রেমময়ের শুদ্ধভাব হয়ত' হৃদয়ে ফুটিতে পারে। মা সর্ব্বমঙ্গল্যে 'সর্ব্বে'র প্রকৃত অর্থ সর্ব্বস্বরূপ অথচ শুদ্ধ নিষ্কল বিশিষ্ট জ্ঞানের অতীত বলিয়া, সেই ঘোর কাল, শ্রীনন্দনন্দনের প্রতি আমাদের চিত্ত একবার প্রেরণা কর।

তন্নোধীয়ঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ হরিঃ॥ (ক্রমশঃ)

যোগানন্দ ভারতী।

তোমায় আমায়।

১

তোমায় আমায় বাঁধি এস, কোমল মনের বাঁধনে।
মোহন মধুর রশি দিয়া, মায়ার মধুর আঁটনে॥
সোহাগ রেশম দিয়া তাহে, হাল্‌কি গুণের শিকলে।
প্রেমের জরি মিশিয়ে দেব, সাধের নূতন কৌশলে॥
তোমার হিয়া আমার হ'বে, আমার হৃদয় তোমার।
আমি তুমি থাক্‌বে না আর, দু'জন হ'ব একাকার॥

২

জগত ভরা রূপের ডালি, তুলে দেবে আমার করে।
তোমায় দেব' গুণের মালা, পর্‌বে গলায় আদরে॥
চিনে আমি সোনার কিরণ, চিনিয়ে দেব তা' তোমায়।
চাঁদের রজত করে তুমি, চিনে ফেল্‌বে আমার গায়॥
সবুজ বরণ লতা পাতা, ভরা ধরা চিন্‌বো মোরা।
চিন্‌তে চিন্‌তে চিনি' নিজে, আমোদ ভরে হ'ব ভোরা॥

৩

এমন মনের চেনাচিনি, অলস অবশ ভবেতে।
খেল্‌বে কত সুখের খেলা, নূতন নূতন রবেতে॥
ভরা চিতের ঝলসটুকু, মিশে যাবে আমার তায়।
আমার বিষম সাহসটুকু, হারাব' তোমার কৃপায়॥
তোমার মোহন উচ্চ আশা, কোমল ভাব বিনিময়ে।
পা'বে মধুর দৃঢ়তা বল, বিমল তরল হৃদয়ে॥
মনের দুঃখ মিশ্‌বে মনে, সাধে ভর্‌বে এ আগার।
তোমার আমার থাক্‌বে নাকো, দু'জন হ'ব একাকার।

শ্রীশিবপ্রসাদ কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য

কাম]

পাগলের হাসি।

আমাদের গ্রামের বহিঃপ্রান্তে অনেক লোক জড় হইয়াছে। শুন্‌লাম্ নাকি একটি দিগম্বর উন্মাদ্, কি নিজে নিজে বল্‌চে আর উচ্চ হাস্য করে উঠ্‌চে; অথচ জিজ্ঞাসা কর্‌লে কথা কয় না,—কেবল হাঁসে। যদি বা কখন কিছু বলে, তার অর্থ বেশ বোধগম্য হয় না। তা'কে দেখ্‌বার জন্য সেখানে লোকের ভীড় জমে গিয়েচে। পাগলের কথা শুনেই আমার সেই পূর্ব্ব পরিচিত পাগলটির কথা মনে পড়ে গেল; কি কারণে জানিনা, নীরবে দুই এক বিন্দু অশ্রু আসিয়া নয়নদ্বয়কে আর্দ্র করিয়া দিল। পাগলের সহিত এই অশ্রুবিন্দুর যে কি সম্বন্ধ, তা' ঠিক্ বুঝিতে পারিলাম না। তাহার দুরবস্থার কথা ভাবিয়াই হয়তো এই অশ্রুপাত হইল! অথবা তাহার মধ্যে যে একটি অপূর্ব্ব ব্যাকুলতা এবং "আপনা-ভোলা' ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম, হয়তো মন তাহাই স্মরণ করিয়া, কাহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকিবে;—কি জানি ঠিক্ বুঝিতে পারিলাম না। যাই হ'ক একবার সেই পাগলটিকে দেখিবার জন্য চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল! তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সারিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম! গিয়া ঠাহরিয়া দেখিলাম—ওঃ হরি! এতো আমাদের সেই পরিচিত পাগলই বটে! তা'কে দেখে যেন প্রাণে কেমন একটা আনন্দ হ'তে লাগ্‌ল! আমি তাকে নিকটে গিয়া বল্‌লাম "কিগো কোথা থেকে, অনেক দিন পরে দেখ্‌ছি যে, আজকাল আছ কেমন?" সে আমার কথা শুনিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল,—আকাশের প্রত্যেক পরদায় যেন সে হাঁসি প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এমন প্রাণ খোলা হাঁসির সৃষ্টি তো কখন দেখিনি। আমি আবার তাকে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম,—"কিগো আজকাল থাক কোথায়? ভাল আছ তো?" পাগল বলিল, "ভাল থাকিতে আমার তো ইচ্ছা, কিন্তু ভাল থাকিতে দেয় কৈ, একটু ভাল থাকবার চেষ্টা কর্‌লেই সে সব গুলিয়ে দেয়"—এই বলিয়া আবার সে হাঁসিয়া উঠিল। আমি দেখ্‌লাম পাগলামি কিছুই সারেনি! তবু তাকে দেখে যেন একটু খুসী হ'লাম!

পাগল থেকে থেকে কর্‌চে কি জান? ছেলে বুড়ো, স্ত্রী পুরুষ, পশু পক্ষী,

কীট পতঙ্গ, যাকে দেখ্চে, তা'রই কাছে দু'খানি হাত প্রসারিত করে. সম্মুখে পত্র, পুষ্প, পল্লব যা পাচ্চে, তা'ই দিয়ে মুখের কাছে আরতি করার মত ঘুরুচ্চে আর হাঁস্তে হাঁস্তে বল্‌চে,—"বাঃ বাঃ বেস সেজেছ, খাসা দেখাচ্চে—ওগো বহুরূপী কত সাজেই সেজে বেড়াচ্চ—ওগো বন্ধু, ওগো সখা,—ওগো আমার রঙ্গলাল! কত রঙ্গই দেখাচ্চ,—যা' সাজ্‌চ তা'ই সাজ্‌চে, তা'ই শোভা পাচ্চে, কোন সাজ্‌টাই তোমার অসাজন্ত হ'লনা—বাহবা কি বাহবা!" এই বলিয়া পাগল নৃত্য করিতে করিতে গান জুড়িয়া দিল,—

"এস এস হৃদয়ে ব'স, হেরি তোমারে আমি,
আমার হৃদি স্নিগ্ধ কর, এস মনোচোর এস,
আমার নয়ন ভুলানো এস, আমার পরাণ জুড়ানো এস,
নয়ন উজ্জ্বল ঘন চঞ্চল এস, হৃদি-অঞ্চল পেতেছি আমি।"

পাগল গান করে আর হাততালি দিয়া নৃত্য করে, আর সকলের সম্মুখেই গান গাহিয়া গাহিয়া এই কথা বলে "এস এস হৃদয়ে বস হেরি তোমারে আমি।" গ্রামের বালক বালিকা, যুবক যুবতী, এমন কি বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত পাগলের রঙ্গ দেখিয়া হাঁসিয়া আকুল! ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো। পাগলের সঙ্গে লোক আর কতক্ষণ পাগ্‌লামি কর্‌তে পারে! ক্রমশঃই জনতা কমে আস্‌তে লাগ্‌লো। পাগলের সম্বন্ধে নানা লোকে নানারূপ আলোচনা করিতে লাগিল এবং এ লোকটা সাংসারিক কোন বিপৎপাতে এইরূপ পাগল হইয়াছে, তাহা একবাক্যে সকলে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, কোথায় তাহারা কত রকমের পাগল দেখিয়াছে, সেই সব গল্প করিতে করিতে সকলেই গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিতে লাগিল। কদাচিৎ দুই একটি কোমলহৃদয়া স্নেহময়ী প্রৌঢ়া "ইহার মাতা, পত্নী প্রভৃতি আত্মীয় স্বজনের কি দুরদৃষ্ট"—এই ভাবিতে ভাবিতে সমবেদনার অশ্রু—আকুল নয়ন মুছিতে মুছিতে স্ব-স্ব ভবনাভিমুখে চলিয়া গেল।

ক্রমে ঘোর অন্ধকারে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, সব দিক্ মগ্ন হইয়া গেল। দিবা-লোকের চটুল চপলতা যেন কাহার ইঙ্গিতে থামিয়া গেল! মুখর অবনী শুব্ধ মৌন, গম্ভীর হইয়া উঠিল! সমস্ত জীব-নিবহের কলকোলাহলের সুরটি, ঝিঁঝিরা যেন সুরভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় আপনাদের কণ্ঠ মধ্যে পুরিয়া রাখিল। আকাশের গায়ে একটী একটী করিয়া বহু নক্ষত্র ঝিক্‌মিক্ করিয়া

জলিয়া উঠিল! দূরে—গ্রামের অভ্যন্তরে দেবমন্দিরে সন্ধ্যা আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিল! কাঁসর ঘণ্টা ও শঙ্খ নির্ঘোষে আকাশ নিনাদিত হইতে লাগিল। অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া এই শব্দ আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব রাগিণীর সৃষ্টি করিল!

কেন যে অন্ধকার রাত্রে নির্জ্জন প্রান্তরের মাঝখানে এই পাগলের কাছে বসিয়া রহিলাম, তা' আমি বলিতে পারি না। কিন্তু যে কারণেই হ'ক, সে স্থান হইতে উঠিয়া যাইতে মন সরিল না। যখন মনে মনে কত কি জল্পনা কল্পনা করিতেছি, এমন সময়ে সমস্ত অন্ধকার মথিত করিয়া;—আকাশ বিদীর্ণ করিয়া পাগল উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। এইবার আমি কথা কহিলাম। তাহাকে বলিলাম "তুমি হাঁস্‌লে কেন?" "যেহেতু কান্না পাচ্চে না, হাঁসিই পাচ্চে;—তা'র রকম দেখ্‌লে হাঁসিই পায়—তা'ই হাঁসচি"—এই বলিয়াই পাগল আবার হো হো করিয়া হাঁসিয়া উঠিল! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম,—"এখানে বসে বসে কা'র কি রকম দেখ্‌লে?" সে বলিল কেন, "তুমি দেখ্‌তে পাচ্চ না? এই দেখনা, এইখানে বসে বসে সে কেমন হাঁস্‌ছিল—এর মধ্যেই মুখটি কেমন গম্ভীর করে তুল্‌লে—বেশ লাফালাফি মাতামাতি চল্‌ছিলো—ঠিক্ যেন একটি ছোট্ট ছেলের মত;—ইহার মধ্যেই বেশ বদ্‌লে ফেলে দিয়ে, কেমন ঘোমটা টেনে মুখটি ঢেকে, জুজুবুড়ি সেজে, ধীরে ধীরে বেড়িয়ে বেড়ান হচ্চে। ছিল ছেলে মানুষটির মতন—কেমন চঞ্চল, কেমন সুন্দর,—হ'য়ে এল সেকেলে বুড়ি ঠাক্‌রুণের মত।"

আমি ইহার কোন অর্থই গ্রহণ করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া বলিলাম, "আমাকে তোমার মনে পড়্‌চে, না—ভুলে গিয়েছ?" পাগল গম্ভীর হইয়া বিজ্ঞের মত বলিয়া বসিল, "ভুলিতে পারিলে ভাল হইত বটে, কিন্তু আজও কিছুই ভুলিতে পারি নাই! পঞ্চাশ বর্ষ আগে যেমনটি ছিল, আজও তেমনি সমস্ত স্মৃতির মধ্যে ঝুটপুট্ করচে! সব কথাগুলো, সব ঘটনাগুলোই যেন জেগে বসে আছে। ভুলিতে তো চাই ভুলিতে পারি কৈ"?—এই বলিয়া পাগল শিশুর মত ডাক ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিল। আমি বল্লাম "তুমি কাঁদ্‌চ কেন"? পাগল বলিল "আমার এক বন্ধু আছে জান? সে কিন্তু সকলেরই বন্ধু, লোকে চেনেনা তাই; এই বন্ধুর জন্যই আমার সব নষ্ট হয়ে গেল। সে আমার এমন পিছনে লেগে

আছে, যে আমাকে কিছুতেই শান্ত থাক্‌তে দিবে না, আমাকে পাগল করে ছাড়্‌বে।” আমি মনে মনে হাঁস্‌তে লাগ্‌লাম এবং ভাব্‌লাম পাগল হতে আর বাকী আছে কি! পাগল বলিতে লাগিল, “সে বন্ধুর মত এমন দুষ্টু ছেলে আর কখন দেখনি,—তার জন্যই আমার সব নষ্ট হয়ে গেল! তা’কে ছাড়্‌তেও প্রাণ কেমন করে, আবার ঠিক করে যে জোর করে ধরে থাক্‌বো—তা’রও জো নেই! কি দুরন্ত ছেলে বাবা! সে কি কারও ঘ্যাঁস সইতে পারে? অনেক বার রাগ করেছি, কতবার ঝগ্‌ড়া করে তার কাছ থেকে চলে গেছি, মনে করেছি আর কথনো তার কাছে আস্‌বো না। কিন্তু তার কাছে কোন প্রতিজ্ঞাই টেঁকে না! যতই রাগ করি—যতই অভিমান করি, সে “কুক্ করে একটি সাড়া দেয় আর সব—ভুলে যাই; বড় তার দেমাক—তাকে একদিন ছেড়ে তাই পালিয়ে এলাম! নানা চিন্তায় বসে বসে বেশ দিন কাটিয়ে যাচ্চি! ওমা কোথা থেকে দেখি একটা হরিণ-শিশু এসে আমার গা চাট্‌তে লাগল; শিঙ্ দিয়ে আমাকে ঠেল্‌তে লাগল! আমি ভাবলাম্ ‘এ আবার কি—ইনি আবার কে এলেন?’ দেখি না—সেই দুষ্ট—সেই বন্ধু, হরিণ হয়ে এসে আমাকে খেল্‌বার জন্য ঠেল্‌চে। আমি বল্লাম “না তোমার সঙ্গে আর খেল্‌ব না, তোমার সঙ্গে জন্মের মত আড়ি করেচি”। অমনি তার চোখ জলে পূরে গেল। আমার মুখের কাছে মুখটি নিয়ে এলো, আর থাক্‌তে পার্‌লাম না—প্রাণ কেমন করে উঠ্‌ল। অমনি তার গলাটি জড়িয়ে তার মুখচুম্বন করলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ সে কারও কাছে থাকবার ছেলে নয়, একটু বাদেই চোঁ করে দৌড়ে চলে গেল। কত দাঁড়াতে বল্লাম—কত কাকুতি মিনতি কর্‌লাম—কার কথা কে শোনে? পেছুনে পেছুনে কত ছুট্‌লাম, কোথাও তা’র চুলের টিকি দেখ্‌তে পেলাম না। এবার বড় রাগ হ’লো। রাগ করে এক বনের মধ্যে গাছের তলায় বসে রইলাম। মনে ঠিক করে ফেল্‌লাম “আর নাম পর্য্যন্ত তার লওয়া হবে না। কতদিন এই রকম করে গাছের তলায় বনে বনে দিন কাট্‌তে লাগলো আর তার নামটিও করি না!!

“একদিন এক গাছের তলায় বসে আছি, দেখি কি একটি অপূর্ব্ব সুন্দর পাখী শিস্ দিয়ে গান ধরেচে। ঐ গান শুনে প্রাণ ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌লো। কত হারাণো কথা মনে পড়ে গেল। হঠাৎ বন ফুলগুলি ফুটে উঠ্‌লো, গন্ধে বন ভরে

গেল! বায়ু যেন কা'র হৃদয়-মাধুর্য্য ফুলের গন্ধের সঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে গেল;—আমার প্রাণ কেড়ে নিয়ে গেল!! আমরি-মরি! কি সুন্দর রং—কি সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর! এই পাখী—এর ভিতর এত সৌন্দর্য্য কোথা থেকে এল! কে এমন করে এর ভিতরে বসে এই সুর ভাঁজ্‌চে? গান শুনে বুকের সন্ধি, হৃদয়-গ্রন্থি যেন খসে গেল!! যখন আমি এই সব ভাব্‌চি, তখন গাছের উপর থেকে কে আমাকে ভেঙ্গিয়ে উঠ্‌লো "ককে ডুগ্‌লি ডু"—হরি হরি! এ সেই দুষ্টু; কোথা থেকে এখানে এল! নিবিড় অরণ্যে এসেও তার কাছে নিস্তার নেই! তবে পাখী টাখি ও সব কিছুই নয়;—এ সবই তা'র সাজা—সবই তা'র খেলা!! ধূর্ত্ত কপট! বেশ তো পাখী সেজে বসে আছ! মিট্‌ মিট্‌ করে তাকাচ্চ,—যেন কিছুই জান না। আমি কি আর চিন্তে পারিনি? গায়ের রং দেখেই যে সন্দেহ হয়েছিল, কণ্ঠস্বর শুনেই সব সন্দেহ মিটে গেল!! এইরূপে তা'র রঙ্গ দেখে দেখে বেড়াই;—কিন্তু তা'র কাছে বড় ঘেঁসি না। এইরূপ বনের মধ্যে ঘুরে ঘুরে কতদিন কেটে গেল। মনে দৃঢ় সঙ্কল্প আর তার কাছে যাওয়া হবে না। একদিন দেখি একটি ছোট মেয়ে আমার কাছে এসে বস্‌ল। একটি খেলাঘর পেতে—তখনি তখনি খেলাঘরের রান্না চড়িয়ে দিলে। রান্না-বান্না শেষ করে আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌চে "খাবে"? "তুই কে রে"? "সে বল্লে আমি যে তোমার মেয়ে।" আমি ভাব্‌লাম আমার আবার মেয়ে কবে হলো? কিন্তু তা'কে দেখেই প্রাণ আমার ছটফট্‌ কর্‌তে লাগ্‌লো!' কই দেখি দেখি—বলেই তা'র মুখ্‌টি তুলে ধর্‌লাম! কেমন সুন্দর পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত তা'র রাঙা রাঙা ঠোঁট দু'টী! কেমন হরিণশিশুর মত কাল কাল বড় বড় চঞ্চল চোখ দু'টী। এমন মানানসই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—যেন মা অন্নপূর্ণা! বরষা কালের নিবিড় ঘন মেঘের মত এমন চাঁচর-চিকুর-গুচ্ছ; পা দু'টী টুক্‌টুক্‌ কর্‌চে;—ঠিক যেন পূজান্তে পূজার থালের উপর পদ্ম-করবীকে সাজিয়ে রেখেছে! ভুর্‌ ভুর্‌ করে গাত্র দিয়ে গন্ধ বেরিয়ে, মন প্রাণ আমোদিত করে তুল্‌চে। এমন মধুমাখা বুলি!—এমন প্রেমপূর্ণ হৃদয়!! আমার চমক ভেঙে গেল! ওঃ হরি! আমি কা'র সঙ্গে কথা কচ্চি! এ বালিকা আর কেউ নয়;—হাড় মাস্‌ ঢেকে সেই—এ!! তা না হ'লে মাংসপিণ্ড চক্ষের ভিতর থেকে, এমন চাহনি কা'র? অস্থি মাংস ভেদ করে, এ কা'র রূপ ফুটে বেরুচ্ছে? এ তা'রই—এ

তা'রই !! এর ভেতর থেকে কে কথা কচ্ছে? ক্রমে ক্রমেই এই জড়পিণ্ড শরীরে কা'র স্পর্শ পাচ্চি,—সমস্ত শরীর পুলকিত হয়ে উঠ্‌চে—রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌চে !! এ তা'রই পরশ—নিশ্চয় এ তা'রই পরশ !!

না—না! হলোনা! এর কাছ ছাড়া হবার যো নেই! এ মায়াবীর কাছ থেকে কারও নিস্তার নাই। যেখানে পালাবো সেখানেই এই ধূর্ত্তটী আমার সঙ্গ নেবে!!—একি অদ্ভুত তা'র খেলা! দেখ না কত অদ্ভুত সাজ পড়ে বেড়াচ্চে—যেন সং একটি !! একে দেখে কা'র না হাসি পায়? একদিন এ'কে বাঘ মনে করে সবাই পালাচ্চে,—আমি ভাব্‌লাম এ বাঘটি আবার কোথা থেকে এসে জুট্‌লো?

আমি বল্লাম "বাঘ দেখে তোমার ভয় হলো না?" পাগল বলিল "সে বাঘ কেন হতে যাবে? এ সেই গো সেই—অমনি করে লোককে ভয় দেখায়! ও সবই ওর খেলা!"

আমি বল্লাম "তুমি সেই বলে কি করে বুঝ্‌লে?" পাগল বলিল "কেন? তা'কে আমি চিনিনা না কি?—ওগো এর এই চমৎকার সাজ পরা দেখে কেউ বুঝ্‌তে পারে না। কখন ভয় দেখিয়ে লোককে কাঁদান হচ্চে,—কখন সোহাগ করে—গান করে, শিস্ দিয়া হাসান হচ্চে। কখন কারও কাছে কত রাজ্যের ছাই ভস্ম কুড়িয়ে এনে জমা করে রাখা হচ্চে,—কখন আবার ত'ার কাছ থেকে সেইগুলো কেড়ে নেওয়া হচ্চে। লোকগুলো সব এমন ভূত—এমন বোকা, তারা এই সব তার সত্যি মনে করে হাস্‌চে, কাঁদ্‌চে। তাদের ধরণ দেখে আমার খিল্ খিল্ করে হাসি পায়! তাই হাস্‌চি—বুঝ্‌লে?"

পাগল কি যে ছাই ভস্ম, সাপের মন্ত্র আওড়াতে লাগ্‌ল—আমি তার কিছুই ছন্দাংশ বুঝ্‌লাম না। তবে এইটুকু বুঝ্‌লাম যে পাগলের মাথা আরও বিগ্‌ড়েচে। আমি হাঁ করে তা'র দিকে তাকিয়ে রইলাম। সে আমার রকম দেখে হেসেই অস্থির! হাত তালি দিয়া ক্রমাগত নাচে আর গান করে "এই ত পরাণ নাথ মোর পাইনু, যার লাগি সারারাতি মদন-দহনে মুই ঝুরিনু"—ক্রমে উদ্দাম নৃত্য। অবশেষে আমার মুখের দিকে একটি ফুল ঘুরাইতে ঘুরাইতে গাহিয়া উঠিল,"—

তুমি নির্ম্মল মম সুন্দর তুমি,
হৃদয় জুড়ানো সখা।
বসে আছি তব আশে,
কত যুগ ধরি একা একা।

জনম মরণ আসে ছুটিয়া, ফুল পল্লব তরু শাখে,
(তব) চরণে পড়ে লুটিয়া ; কত বিহগ বিহগী ডাকে ;
(এ কি) আনন্দ গগনে চন্দ্র কিরণে ; তারা যাচে তারা নাচে,
হাসিছে দিবা রাকা হেরিতে তব ওই নয়ন বাঁকা।

এখানেও আসা হয়েছে ! বেশ ! বহুরূপী বেশ ! সর্ব্বত্রেই—সকলের মধ্যেই সব হয়ে তুমি বসে আছ—বাহবা কি বাহবা !!" এই বলিয়া পাগল হো হো করিয়া হাসিতে হাসিতে বন বিথীকার ঘনান্ধকারের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল !

খাম]

নিভৃত মিলন

নূতন প্রণয় সম, নিভৃত জীবনে মম ;
(কবে) তোমার প্রেমে প্রভু, হৃদয় ভরিবে হে।
তোমার মিলনে ক্ষণে, দোঁহা চাহি দোঁহা পানে ;
সে বিজনে সেইখানে (তা) কেহ না দেখিবে হে
সকলে ঘুমায়ে রবে, কেহ না দেখিতে পাবে ;
নীরবে নিশীথে দোঁহে দোঁহারে হেরিব হে।
তব রূপে হয়ে ভোর অনিমেষ আঁখি মোর ;
তোমার মাধুরী মাঝে ডুবিয়া রহিবে হে ॥
রাজ অধিরাজ সাজে, সকল ভুবন মাঝে ;
আমি যাব হে রাজেন্দ্র ! মহিমা প্রকাশি হে।
আঁখি ঝলসিয়া যায়, হৃদি মোর নাহি পায় ;
অমিয় পরশ তব ঐশ্বর্য্য মাঝারে হে ॥
যদি কোন দিন সখা, আঁধার কুটীরে দেখা ;
পাই যদি, এস তবে দীন সমাবেশে হে।
জীর্ণ কুটীর মাঝে, দীন আয়োজন লয়ে ;
দীনশয্যা বিছাইয়ে আছি তব আশে হে ॥

রাজ বেশে আস যদি, হবে না বলা ত' মোর ;—
হৃদয়ের সব কথা তোমার চরণে হে।
আকুল নয়ন মম, ব্যাকুল হইয়া চায় ;
তোমার পরশ লাগি' উধাও হৃদয় ধায়।
শুভ্র শতদল সম, তোমার সে রূপরাশি ;
আলোকি আঁধার নিশি ফুটিয়া উঠিছে হে।
তুমিও যে মোর তরে, আকুল হইয়া ফির ;
বাঁশরী সুরে সদা আমারে আহ্বান কর।
(এ যে) গভীর গোপন কথা, বলিব কাহারে বল ;
হৃদয়ের মাঝে তাই লুকায়ে রেখেছি হে॥
তুমি চাহ এত মোরে, আমি কাঁদি তব তরে ;
তবু একি ব্যবধান তোমা আমা মাঝে হে।
"সখা" বলে ডাক তুমি, শুনিয়া চৌদিকে ভ্রমি ;
তবু দরশন তব পাই না কোথাও হে।
ইচ্ছা যদি নাহি হয়, দেখা দিয়ে কাজ নাই ;
রহিব নিশ্চিন্ত আমি তব আশা বহিয়া,—
শুধু তুমি এই ক'রো, থেকে থেকে সাড়া দিও ;
আমি তব তরে ভবকূলে রহিব বসিয়া হে॥

অর্থ]

আধ্যাত্মিক ঘটনা।

শিক্ষা।

শুনা যায় যুবক পাদ্রী জ্যাম্পার ভারতবর্ষে আসিয়া হিন্দি ভাষা যত সহজে আয়ত্ত করিতে পারিয়াছিলেন, বাঙ্গালা ভাষা তত শীঘ্র আয়ত্ত করিতে পারেন নাই ; তথাপি সাহেব মহলে প্রচার যে জ্যাম্পারের ন্যায় প্রাচ্য ভাষায় পণ্ডিত, ইউরোপীয়গণের মধ্যে অতি অল্পই আছে।

* শ্রীযুক্ত ফিনিক্স নোয়েল লিখিত ইংরাজি গল্প হইতে অনুদিত।

জ্যাস্পার যখন মিশন স্কুলে তাহার বহুপরিচিত চেয়ারে বসিয়া বাঙ্গালী বালকদিগকে পাঠ শিক্ষা দিতেছিল, তখন বেলা প্রায় আটটা। সুন্দর বাসন্তী প্রভাতের মধুর হাওয়া ও উজ্জ্বল সৌরকিরণ বড় বড় দরজা জানালাবিশিষ্ট উলুখড়ের ছাউনিযুক্ত স্কুলগৃহের মধ্য পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া যেরূপ খেলা করিতেছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চড়ুই পক্ষীগুলিও সেইরূপ অবাধে গৃহ মধ্যে সর্ব্বত্র সঞ্চরণপূর্ব্বক নানা কলরবে আপনাদের আনন্দ বিলাইতেছিল। বিচিত্র পরিচ্ছদযুক্ত বিচিত্র বর্ণের শিশুগুলি এক একবার বাহিরের সূর্য্যালোক-পুলকিত শ্যামল তরুদলের প্রতি—আর এক একবার শ্বেতবর্ণ যুবক মাষ্টার সাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া, চঞ্চলভাবে ছুটীর প্রতীক্ষায় কোনরূপে পাঠ শুনিতেছিল। সেদিনকার পাঠ্যপুস্তক ছিল,—প্রাচ্যপ্রদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত ও সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত 'বোধোদয়'।

শিক্ষক পুস্তক খুলিয়া গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"পডার্থ কয় প্রকাড় আছে, তোমরা জানে? পডার্থ টিন প্রকাড় আছে। সে কেমোন্? যেমোন্ চেটন, অচেটন আর উড্‌ভিট্‌। টোমরা বল্‌টে পারো।—পডার্থ কয় প্রকাড়?"

শিশুগণ কোলাহলপূর্ব্বক পা দুলাইতে দুলাইতে সমস্বরে তাহাদের নবীন শিক্ষকের ভাষা ও স্বর যথাসম্ভব অনুকরণ করিয়া বলিল, "হাঁ মাষ্টার সাব্‌, হাম্‌রা বল্‌তে পারে, পডার্থ কয় প্রকাড়। চেটন্, অচেটন্ আর উড্‌ভিট্‌।"

শি। "হাঁ; চেটন পডার্থ কাহাকে বোলে?" যে সকল বস্‌টু বা পডার্থ ইটস্‌টট বিচড়ণ কড়িতে পাড়ে, টাহাডের চেটন পডার্থ কহে। সে কেমোন্ আছে টোমড়া জানে?"

বা। না।

শি। "যেমোন কলের গাড়ী বা এক্কা আছে। আর অচেটন।—অচেটন পডার্থ কাহাকে বলে টোমরা জানে? যে সকল বস্‌টু বা পডার্থ ইটস্‌টট বিচড়ণ কোড়িতে পাড়ে না; সে অচেটন পডার্থ আছে। সে কেমোন্? যেমোন্ খঞ্জ মনুষ্য—lame man। হাঁ আর উড্‌ভিট্‌; উড্‌ভিট্‌ কাহাকে বলে টোমরা জানে?"

বা। না; মাষ্টার সাব্‌।

শি। "যে সকল পডার্থ মৃট্টিকা ভেড্ করিয়া উট্টিট হয়, টাহাকে উড্‌ভিট্‌ বলে; সে কেমোন্ আছে—যেমোন কেঁচো আছে।"

"আর ডেখো বালকবালিকা—এই সকল পডার্থ একমাট্র পড়ম পিটা পড়মেশ্বরের কৃপায় সৃষ্টি হইয়াছে; অতএব একমাট্র পড়ম পিটার প্রিয় পুট্র যীশুই মনুষ্যগণকে ট্রাণ কড়িতে পাড়ে। অতএব টোমরা একমাট্র যীশুকে উপাসনা কোড়িবে। আর কালী;—টোমাদের ওই কালী,—মাটীর প্রস্টুট্ পুট্টলিকা, কখনো কাহাকেও ট্রাণ কোড়িতে পারে না।"

যুবক জ্যাম্পার অন্যান্য অনেক পাদ্রী সাহেবের মত পূর্ব্ব হইতেই ধারণা করিয়া আসিয়াছে যে, সমস্ত হিন্দুসন্তানই ঘোরতর কুসংস্কার ও অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন, এবং একমাত্র খৃষ্টীয় ধর্ম্মের আলোক ভিন্ন এই সমস্ত জীবের উদ্ধারের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই। জাতিভেদ, অধিকারী ভেদ, শ্রাদ্ধ-তর্পণ, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বৈধব্য, দেবদেবী পূজা সমস্তই কুসংস্কার ও পৌত্তলিকতা। কিন্তু সে প্রকৃত ধর্ম্ম-যাজকের ন্যায় নির্ভীক, সরল, ধর্ম্মভীরু, উদার, আতিথেয়, পরদুঃখকাতর ও অনুকম্পা-পরায়ণ। কিন্তু তাহার মস্তিষ্কে ও ধমনীতে 'জন্‌বুলের' ধারা ও দৃঢ়তা পূর্ণরূপে বিদ্যমান। যাহা নিজে উচিত বলিয়া বুঝিবে, অবিচলিত চিত্তে তাহাই করিবে। কিন্তু অপরাপর ধর্ম্ম বা সম্প্রদায়ে যে কিছু মাত্র সত্যের আভাষ আছে, বা অন্যান্য আচার-অনুষ্ঠানে যে জীবের প্রকৃত ভগবদ্ভাবের বিকাশ হইতে পারে, ইহা সে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না; এবং তজ্জন্য যেরূপ সহিষ্ণুতার প্রয়োজন ততটা সহিষ্ণুতাও বোধ হয় ছিল না।

দেবদেবী পূজা তাহার চক্ষে নিতান্তই পুতুল পূজা,—বিশেষতঃ কালীমূর্ত্তি! ওই লোল-রসনা, বিকট-দশনা, অস্থি-মুণ্ডমালা-সমন্বিতা, অথচ বরাভয়প্রদায়িনী দেবীমূর্ত্তি তাহার নিকট অতিশয় রহস্যময় ও প্রহেলিকাবৎ; সে যেন কতকটা ভীতি ও বিস্ময়ের চক্ষে দেখিত। এইরূপ ঘোর কৃষ্ণ অদ্ভুত পুত্তলিকা যে কোনকালে মনুষ্যকে ত্রাণ করিতে পারে, ইহা তাহার পক্ষে স্বপ্নের অগোচর।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"ওঃ বেজায় রকম কেটে গেছে দেখ্‌ছি! কি করে এতটা কাট্‌ল?"

ডাক্তার জলভরা একটা এনামেলের গাম্‌লা, তুলা ও অন্যান্য ব্যাণ্ডেজের দ্রব্যগুলি যথাস্থানে গুছাইয়া ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন। জ্যাম্পার ত'ার রক্তাক্ত ক্ষত-স্থানের দিকে চাহিয়া বিরক্তভাবে বলিলেন,—"ওই পাজী, নেমক-

হারায় দুর্গাদাসের জন্য। মশাই সে আজ প্রায় ছয় মাস ধরিয়া নিয়মিত বাইবেল পাঠ, রবি-বাসরিক উপাসনা প্রভৃতিতে যোগদান দ্বারা পবিত্র সত্যধর্ম্মে শীঘ্রই দীক্ষিত হইবার সমস্ত বন্দোবস্ত একরূপ ঠিক করিয়াছিল; আজ কিনা দেখি আমারই বাঙ্গালার হাতার এক কোণে, চুপি চুপি পুতুল খাড়া করিয়া, একটা ছাগ বলি দিবার আয়োজন করিতেছে!"

ডাক্তার হাসিয়া বলিলেন,—"যা'রা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করে, অন্য ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য সহজে প্রস্তুত হয়, তা'দের উপর বড় বেশী আস্থা করা উচিত হয় নাই। সে যাহাই হউক, কিন্তু দুর্গাদাসের পুতুল পূজার সঙ্গে তোমার পা কাটার যে কি সম্পর্ক আছে তা' ত' বুঝা গেল না।"

জ্যা। আমি যা 'কিছু—বেদী, গামলা, জলপাত্র প্রভৃতি লাথি মেরে ভেঙ্গে দিয়াছিলাম; ফলে একটা পাত্রের কাণায় পা লাগিয়া কাটিয়া গেছে।

ডাঃ। সে কিসের পূজা কর্‌ছিল?

জ্যা। সেই ভীষণ কালীমূর্ত্তি!

ক্ষত-স্থানের বেদনা বাড়িয়া উঠিতেছিল; তথাপি সেইরূপ কাতর ভাবেই বলিল, 'সে লোকটা ওইরূপে অবাধে পুতুল পূজা করিবে, ইহা কাহার সহ্য হয় বলুন্ দেখি!"

ডাক্তার পাদ্রীর স্ত্রীর সম্পর্কে খুড়া হয়; সেজন্য বিশেষ আদব-কায়দা রক্ষা করার ততটা প্রয়োজন ছিল না। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ হইলে ডাক্তার বলিলেন, "চল দুজনে একটু বেড়াইয়া আসি, দু'চার বার 'লোসন্' বেশী করিয়া দিলেই ব্যথা কমিয়া যাইবে।"

সূর্য্যকিরণে হিন্দুর সনাতন ধর্ম্ম-ধানী প্রাচীন কাশী নগরী উজ্জ্বল। স্নানার্থী ও যাত্রীর জনস্রোতে উৎসব-মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। দুই জনে যখন গঙ্গাতীর দিয়া ধীরে ধীরে বেড়াইতেছিলেন, তখন পূজানিরত স্নানার্থিগণোচ্চারিত বেদ মন্ত্রের গুঞ্জন ধ্বনিতে নদীতীর পুলকিত হইয়া উঠিতেছিল।

এতগুলি লোক এক সঙ্গে তন্ময়ভাবে কুসংস্কারের চর্চ্চা করিতেছে, দেখিয়া জ্যাস্পারের ধৈর্য্য ধারণ করা দুরূহ হইয়া উঠিল;—শেষে কতকটা উত্তেজিত হইয়া বলিল,—"দেখুন এরূপ ঘটনায় খুব দৃঢ়চিত্ত লোককেও হতাশ হইয়া পড়িতে হয়? আমি আজ ছয় মাস ধরিয়া এদেশবাসীকে অন্ধকার হইতে

আলোকে লইয়া আসিবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু দেখ্‌ছি কোন ফলই হয় নাই।

ডাক্তার সস্নেহে বলিলেন—"ছেলে মানুষ, তা'ই তুমি এতটা ব্যস্ত ও অধৈর্য্য হয়ে পড়্‌ছ। আমি এদেশে প্রায় ৩০ বৎসর আছি, সেজন্য স্পর্দ্ধা করে বল্‌তে পারি, যে তুমি ছ' মাস কেন, ছ' বৎসর বা ছয় শত বৎসর চেষ্টা করে দেখ্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌বে,—তুর্গাদাসের স্বধর্ম্মীরা ধর্ম্মে, আচারে ও অধ্যাত্ম-জগতে তোমাদের অপেক্ষা কিছুতেই হীন নহে, বরং অনেক উর্দ্ধে।"

জ্যা। "হাঁ, তা' কতকটা ঠিক বলেই বোধ হয়, কেননা তুর্গাদাস দর্শনের জটিল তত্ত্ব যেরূপ সুন্দরভাবে আয়ত্ত ও ব্যাখ্যা করিতে পারে, তাহাতে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

ডাঃ। ভাল, সে পূজার স্থানটা কোথায় ?

জ্যা। চলুন, সেই দিকেই যাচ্ছি।

ঘন-পল্লবিত তরুরাজি, অযত্ন-বর্দ্ধিত উলু ঘাস ও মেহেদী গাছের মধ্য দিয়া উভয়ে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত উচ্চ চত্বরের নিকট উপস্থিত হইল। পাথরের ভাঙ্গা-চোরা সিঁড়ি; তাহার উপর নানা গুল্ম ও লতাদি গজাইয়া উঠিয়াছে;—উপরে তুইটী ভগ্নপ্রায় থাম্‌ ও তাহার উপর একটী পতনোন্মুখ খিলান এবং পশ্চাতে একটী দেওয়ালের ভগ্নাবশেষ।

ডাক্তার চত্বরটী দেখিয়া বলিলেন, এ যে একটী পুরাতন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ; বোধ হয় তুর্গাদাস তোমার নিকট দিবসে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করা রূপ পাপের প্রায়শ্চিত্ত এইখানে রাত্রে নির্জ্জনে উপাস্য দেবীর সম্মুখে বসিয়া করিয়া থাকে।" জ্যাস্পার বিরক্ত হইয়া বলিল—"দেখুন আপনি এরূপ গুরুতর বিষয় লইয়া রহস্য করিবেন না।"

ডাঃ। "বৎস, তুমি ছেলে মানুষ; তা'ই অত রেগে উঠ্‌ছ। তুমি কি মনে কর যে এই প্রাচীন জাতির মধ্যে আজ হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া যে উপাসনা পদ্ধতি চলিয়া আসিতেছে, তাহা কি একেবারেই ভ্রান্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন? হইতে পারে, কালবশে এই সনাতনধর্ম্মে নানারূপ অসত্য, পরগাছার ন্যায় আশ্রয় করিয়া বসিয়াছে। কিন্তু তুমি কি বলিতে চাও যে তোমার মত এক ক্ষুদ্র মানবের চেষ্টায় তুই দিনেই সে সকল উল্‌টাইয়া যাইবে? তা' যদি মনে কর তা'হলে তুর্গাদাস

অপেক্ষা তুমিই অধিকতর ভ্রান্তি ও অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ করেছ।" যাক্, কই দুর্গাদাসের বেদী কোথায় ?'

জ্যা। খিলানের সম্মুখে।

ডাক্তার বেশ করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন, চত্বরের উপরাংশ হইতে গাছপালা উপড়াইয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে, স্থানে স্থানে শুষ্ক ফুল, বিল্বপত্র, কোশাকুশি, মাটীর কলসী প্রভৃতি ভগ্নাবস্থায় ইতস্ততঃ ছড়ান ; সম্মুখে মুণ্ডমালা বিভূষিতা মৃন্ময়ী কালীমূর্ত্তি। ডাক্তার সসম্ভ্রমে মস্তকের টুপী খুলিয়া, সেইখানে বসিয়া পড়িলেন।

জ্যা। 'এখন ত' দেখিলেন ; এই ভীষণ মাটীর পুতুল কখনো কি কাহারো উপাসনার সামগ্রী হইতে পারে ? কাল যদি না হঠাৎ আমার পা দিয়া প্রচুর রক্তস্রাব হইত, তাহা হইলে সবুট পদাঘাতে দুর্গাদাসের ভগবানটীকেও ধূলিশায়ী করিয়া দিতাম।

ডাঃ। "অসম্মানের কথা বলিও না ;—ইহা পুতুল পূজা নহে, সাকার উপাসনা। এরূপ উপাসনায় পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে ভগবানেরই উপাসনা করা হয়। জীবের সুবিধার জন্য প্রাচীনযুগের মুনি ঋষিরা এইরূপ নানাবিধ মূর্ত্তির ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।" তা'রপর জ্যাম্পারের ক্ষত-স্থানের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "অত্যন্ত ফুলিয়াছে দেখ্‌ছি ; তুমি এই সিঁড়িতে বসিয়া বিশ্রাম কর।"

জ্যাম্পার ডাক্তারের কথামত সিঁড়িতে বসিয়া বলিল, "আপনি কি মনে করেন, আমি ইহাদের এই সব রূপক ব্যাখ্যা ও কাল্পনিক দেব-দেবী-তত্ত্ব লইয়া মাথা ঘামাইব ? আমার এ দেশে প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য,— যাহাতে এই সব অজ্ঞানান্ধ লোকগুলি ত্রাণ পায়।"

ডাঃ। সেরূপ চেষ্টার পূর্ব্বে তোমার বুঝা উচিত যে তুমি কিসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে ? যাহার উচ্ছেদ করিতে ব্যস্ত, তোমার বুঝা উচিত তাহা যুক্তি ও ভিত্তিহীন কি না, কিম্বা সুদৃঢ় যুক্তি-ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। আর তুমি যদি না রাগ কর, তা'হলে বলি যে, এরূপে পদাঘাতে পূজার উপকরণ ফেলিয়া দিয়া অন্যের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের উপর লাথি মারিয়া, তুমি কি তোমার উপর ইহাদের ভক্তি জন্মাইবে ?

জ্যাম্পার ঈষৎ লজ্জিত হইল। পরে বলিল "এই দেখুন লিলিয়ান ও আমার নবজাত পুত্রের ফ'টো।"

ডাক্তার ফটো দেখিয়া বলিলেন, "খাসা ছেলেটী দেখ্‌ছি; বেশ হৃষ্টপুষ্ট, সুন্দর ও স্বাস্থ্য-সম্পন্ন; ভাল লিলিয়ান কবে আসিবে ?"

জ্যা। এখন কিছুদিন নয়; কেন না এদেশের জলবায়ুতে ছেলেটীর স্বাস্থ্য-হানি হওয়ার সম্ভাবনা। যদিও আমাকে ছাড়িয়া থাকা লিলিয়ানের পক্ষে কষ্টকর, কিন্তু ছেলেটীর শরীরের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে, তাহাকে এখনো কিছুদিন দেশেই থাকিতে হইবে।

অবিবাহিত ডাক্তার মনে মনে ভাবিলেন,—ভাল কথা; ধর্ম্ম-যাজকের স্ত্রীসঙ্গ যত কম হয়, ততই ভাল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বেলা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রৌদ্র ও উত্তাপ বাড়িয়া উঠিল। প্রস্তর-মণ্ডিত বারাণসী নগরীর অসহ্য উত্তাপে ও ক্ষত-স্থানের যন্ত্রণাধিক্যে জ্যাস্পারের সময় কাটান দুরূহ হইয়া উঠিল; অগত্যা বেচারা দুর্গাদাসকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। বধ্য-ভূমির ছাগের মত সম্মুখে দণ্ডায়মান দুর্গাদাসকে মনিবের মত ধমক ও হুকুম দিয়া বলিলেন,—"দেখ আজই সেই ভাঙ্গা জায়গাটা থেকে তোমার সমস্ত 'রাবিশ' দূর করে দিতে চাও—বুঝ্‌লে ? আর সেই পুতুলটাকে ভাঙ্গিয়া পুড়াইয়া দাও !"

দুর্গাদাস নীরবে অসম্মতি জানাইল, বলিল—"ইহা প্রাচীন মন্দির, বহুকালের পূজার স্থান"; শেষে আন্তরিক ঘৃণা ও বিদ্রূপের স্বরে বলিল,—"সাহেব, আপনাদের বহু পূর্ব্বে—মোগল পাঠানের আসিবার পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত দেবতার স্থান।"

জ্যা। সেই জন্যই,—বহুকালের কুসংস্কার বলিয়াই, আমি ইহাকে এখনি দূর করিয়া দিতে চাই। "আমি বুঝে উঠ্‌তে পারি না, যে তোমার মত অন্য বিষয়ে বুদ্ধিমান্ ও বয়স্ক ব্যক্তি কিরূপে এই সকল বাঁদ্‌রামির প্রশ্রয় দিতে পারে। আমাদের দেশে শ্রমজীবী ও বিদ্যালয়ের শিশুরা পর্য্যন্ত এরূপ কার্য্য গর্হিত বলিয়া বুঝে। আমি তোমার কোন চালাকী বা বাঁদ্‌রামী শুন্‌তে চাই না; আমি দেখ্‌তে চাই, আজই যেন আমার হুকুম অক্ষরে অক্ষরে তামিল হয়।" দুর্গাদাসকে সরাসরি হুকুম দিয়া জ্যাস্পারের বুক অনেকটা হালকা হইল;

তার পর দ্বিপ্রহরের প্রখর উত্তাপে, বাঙ্গলার দরজা জানালা বন্ধ করিয়া, লিলিয়ান ও নবজাত পুত্রের ফটোটী বুকে ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কে জানে নিদ্রিত অবস্থায় তাহার মন ভারতবর্ষে, কিম্বা সুদূর বিলাতে—তুষার মণ্ডিত স্কটলণ্ডের আইভি-লতায় ঘেরা একটা ক্ষুদ্র কুটীর দুয়ারে চলিয়া গিয়াছিল কিনা।

বৈকালে যখন ডাক্তার আসিলেন, তখন জ্যাম্পারের ভাব অনেকটা যুদ্ধ-বিজয়ী সেনাপতির মত। দুর্গাদাসকে বলপূর্ব্বক পুতুল পূজা হইতে নিরস্ত করিয়া সে অনেকটা প্রফুল্ল হইয়াছিল। জ্যাম্পার বলিল, "দেখুন আমি একেবারে স্পষ্ট হুকুম দিয়াছি যে, আমার কাছে পৌত্তলিকতা চলিবে না। আমার পলিসি হচ্ছে যে, যেখানে সত্য ও মিথ্যার দ্বন্দ্ব, সেখানে যেরূপেই হউক সত্যের প্রতিষ্ঠা করাইতে হইবে; কোনরূপ আপোষ করিলে চলিবে না। আমার মতে আলোক আসিবার পূর্ব্বে চক্ষু যদি অন্ধ হইয়া যায়, সেও ভাল; কেন না একদিন না একদিন বুঝিবে যে এরূপ ব্যবস্থার ফল ভবিষ্যতে মঙ্গলপ্রদ। ডাক্তার উত্তর করিলেন—বেশ! দৃষ্টিশক্তির উন্নতির জন্য অন্ধ করিবার ব্যবস্থা,—এ এক রকম সুন্দর চিকিৎসা বটে, অন্ততঃ ইহা প্রথম শুনিলাম।

জ্যাম্পার উত্তেজিত ভাবে বলিল,—"আপনি যাই বলুন, আপনার ওসব মাথামুণ্ডু শুনিবার আমার কোন প্রয়োজন নাই; আমি দেখিতে চাই, যে আমার আবাস গৃহের কোথাও কোনও পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় না হয়।

ডাক্তার পুনরায় কৌতুক করিয়া বলিলেন, "সে ত' তোমার আবাস গৃহ হ'তে বহু দূরে—নিভৃতে—জঙ্গল মধ্যে?

জ্যা। যাক্ সে কথা, আপনি কি মনে করেন, যে ওই সব পুতুলের কোন শক্তি আছে? তা যদি না থাকে, তা হলে আমি কিছুতেই প্রশ্রয় দিব না।

ডাক্তার আর যুক্তি তর্ক করা উচিত নয় ভাবিয়া, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন। পরে বাগানের মধ্য দিয়া পুনরায় ভগ্ন মন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া নিবিষ্ট চিত্তে অনেকক্ষণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অবলোকন করিয়া বাটী ফিরিয়া গেলেন। মধ্যাহ্নে নিদ্রা—সমস্ত দিবস বিশ্রামের পর পায়ের ব্যথা অনেকটা দূর হওয়াতে, সন্ধ্যায় পর বেশ সুস্থ বোধ হওয়ায় জ্যাম্পারের একটু বেড়াইতে ইচ্ছা হইল।

পূর্ণিমা রজনী—সুন্দর জ্যোৎস্নায় যেন সমস্ত উদ্যান হাসির রাশিতে

ডুবিয়া গিয়াছে; ঘন পল্লবিত তরুরাজির হরিৎ পত্রাবলীর আশে পাশে হিরণের খেলা, ঝোপে ঝোপে নিবিড় অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে কৌমুদীর গোপন প্রবেশে নির্জ্জন উদ্যানটী যেন স্বপ্ন রাজ্যের মত দেখাইতেছিল। অনেকক্ষণ তন্ময়ভাবে বেড়াইতে বেড়াইতে, জ্যাম্পারের একবার তাহার হুকুম কিরূপ তামিল হইয়াছে, তাহা দেখিবার ইচ্ছা হইল; কিন্তু কল্যকার ঘটনার পূর্ব্বে সে আর একবার মাত্র মন্দির সম্মুখে গিয়াছিল, তাই রাত্রিতে পথভ্রান্ত হইয়া ঘুরিতে লাগিল। মন্দিরের নিকট অযত্ন-পুষ্ট তরু-লতার স্বভাবের খেলা আরো মধুর; সেখানে যেন ভূর্লোক ও ভুবর্লোক পাশাপাশি মিশিয়া গিয়াছে—গ্রীষ্মকালের সুমধুর গন্ধভারে আকুলিত সান্ধ্যসমীরণ প্রথম প্রণয়ের রোমাঞ্চকর যুবতী-করপল্লব-স্পর্শের ন্যায় সোহাগভরে তাহার কপোলদেশে ঢলিয়া পড়িয়া চলিতেছিল। যখন সে মন্দির সম্মুখে পৌছিল, তখন যেন পূর্ণরূপে তন্ময় অথবা স্বপ্নাবিষ্ট, তথাপি সে জাগ্রত। সমস্ত জ্ঞান ও ইন্দ্রিয় স্পষ্ট ও পূর্ণ, উন্মীলিত চক্ষু,—সমস্তই ভাল করিয়া দেখিতে বা বুঝিতে পারিতেছিল। কিন্তু সে যাহা দেখিল তাহাতে তাহার বিস্ময়, বিরক্তি ও ক্রোধের সীমা রহিল না। প্রতিমা ফেলিয়া দেওয়া দূরে থাকুক, দুর্গাদাস তাহাকে নূতন ফুলের মালা দ্বারা আরো ভালরূপে সাজাইয়াছে। চারিদিকে নূতন পূজার পাত্র, চন্দন-চর্চ্চিত বহুবিধ পুষ্পরাজি, তদুপরি ধূপ ও ধূনার সদ্গন্ধে বহুদূর পর্য্যন্ত আমোদিত করিয়া তুলিতেছিল। আরো আশ্চর্য্য, যে লতা গুল্ম বেষ্টিত ভগ্ন মন্দিরের অন্ধকারময় অভ্যন্তর সুস্পষ্টরূপে আলোকিত; কিন্তু সে আলোক স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক, অথবা কোথা হইতে আসিতেছে তাহা বহু চেষ্টাতেও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ জড়বাদীর ধারণায় আসিল না।

সেই মুহূর্ত্তেই দুর্গাদাসকে বরখাস্ত ও বিতাড়িত করিবার সঙ্কল্প স্থির করিয়া সোপানের উপর উঠিল, কিন্তু বোধ হইল যেন প্রাচীরের উপর জীবন্ত একটা কিছু রহিয়াছে। ভাল করিয়া দেখিতে, বোধ হইল যেন এক নারীমূর্ত্তি দণ্ডায়মানা। নারী প্রাচীরের উপর বসিল,—অপরূপ লাবণ্যবতী সুললিত গঠনা, নিটোল দেহ, আয়ত চক্ষু, পূর্ণাঙ্গী ও পূর্ণ যৌবনা;—ঠিক অনির্ব্বচনীয় সুষমা-রাশিতে উদ্ভাসিত। বেনারসী জরির কাজ করা শ্বেতবর্ণের সূক্ষ্ম ওড়না পায়ের উপর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িয়াছে।

জ্যাম্পার চরিত্রবান্; কোনরূপ ভূমিকা না করিয়াই, দৃঢ়তার সহিত জিজ্ঞাসা করিল, "কে তুমি? কার হুকুমে তুমি আমার প্রাঙ্গণে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছ?"

রমণী হাসিল; মৃদু সুমিষ্ট হাসির রাশি চন্দ্রকিরণবিধৌত নদী-তরঙ্গের উচ্ছ্বাসের ন্যায়—তুষার-বিগলিত-গিরি-নির্ঝরিণীর কল্লোল ধ্বনির ন্যায়—মধুর সে অপার্থিব হাসি! ঘন কৃষ্ণ কুন্তলদামের পশ্চাতে সূক্ষ্ম ওড়নার জাল ঘেরা; সম্মুখে মণিমাণিক্য বিভূষিত সুবর্ণখচিত কুণ্ডল ও আভরণ; সর্ব্বাঙ্গে একটী স্নিগ্ধ স্বর্গীয় জ্যোতির বিকাশ; ওড়না ও আস্তরণের ভিতর দিয়া সে জ্যোতি চতুর্দ্দিকে ফুটিয়া উঠিতেছিল। ওড়নার এক প্রান্ত অলক্ত রঞ্জিত, পাকা পীচ ফলের ন্যায় রাঙ্গা রাঙ্গা পা দু'খানির উপরে আসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল। ওই তরল উচ্ছ্বসিত হাসির রাশিতে কি একটা স্নিগ্ধ শক্তি ও মাদকতা মিশ্রিত ছিল; যাহাতে জ্যাম্পারের সমস্ত স্নায়ু যেন এক সঙ্গে অবশ ও নবভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পড়িল। রমণী ধীর মৃদুমন্দ স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "বৈদেশিক্! তুমি এ দেবীর মন্দিরে কেন?" প্রশ্নের প্রত্যেক শব্দ সুস্পষ্ট ও কলকণ্ঠ নিনাদিত, অথচ যেন নিজের বাটীতে নিজের কর্ত্তৃত্ব জানাইয়া, তেজের উপর প্রশ্ন করিল।

জ্যাম্পার এ যাবৎ কোন "নেটিভের" কাছে এরূপ অসঙ্কোচ বা নির্ভীক আদেশ-ব্যঞ্জক কথা শুনে নাই, তাই আরো বিস্মিত হইল। কোথায় সে অনধিকারের অভিযোগ করিবে, না তাহাকেই অনধিকার প্রবেশে অভিযুক্ত করিতেছে। জ্যাম্পার কতকটা অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "তুমি—তুমি—তুমি কি—আমার চাকর দুর্গাদাসের কোন আত্মীয়া—"

আর বলিবার অবসর না দিয়াই রমণী উত্তর করিল—"ভুল বুঝিয়াছ বিদেশী, দুর্গাদাস আমার দাস—দাসানুদাস। কি জন্য তুমি দেবীর বেদী ভগ্ন ও অপবিত্র করিয়াছ, কেন ফুলমালা ছিন্ন করিয়া পূজার উপকরণে লাথি মারিয়াছ?"

প্রহেলিকা-বিঘূর্ণিত-মস্তিষ্ক জ্যাম্পার এতক্ষণে একটা তর্ক বা বক্তৃতার অবসর পাইয়া হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বক্তৃতা বিষয়ে তাহার অসাধারণ উৎসাহ ও অধ্যবসায়। শ্রোতারূপে পাইলে সে পশুপক্ষীদিগকেও বক্তৃতা দিতে প্রস্তুত। এমন কতদিন গিয়াছে যে, রাস্তার ধারে বা নদীতীরে হয় ত' একজনও শ্রোতা নাই

কিম্বা শ্রোতারা নানারূপ বিদ্রূপ ও কৌতুক করিতেছে, অথবা দূরে থাকিয়া বালকেরা বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক আনন্দে নৃত্য করিতেছে, কিন্তু কিছুতেই তার ভ্রূক্ষেপ নাই, অনর্গল বক্তৃতা দিতেছে। কিন্তু আজিকার অবস্থা কিছু বিসদৃশ; উচ্চে দেওয়ালের উপর উপবিষ্ট এক জনকে বক্তৃতা দেওয়া কতকটা কষ্ট সাধ্য বোধ হইল। যাহা হউক বুদ্ধিমানের মত সুযোগ উপেক্ষা না করিয়াই উত্তর করিল, "তুমি যদি যথার্থই উপদেশ পাইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে প্রাতঃকালে আমার বাঙ্গলায় যাইও, সেখানে প্রাতে ৮টা হইতে ৯য়টা পর্য্যন্ত ধর্ম্ম চর্চ্চার ক্লাস খোলা হইয়াছে; সেখানে আমি তোমাকে বুঝাইয়া দিব—কেন পুতুল পূজা নিন্দনীয়; এবং কেনই বা আমি পুতুল ভাঙ্গিয়া দিতে চাই। দুর্গাদাস আমার ইচ্ছা ও মতের বিরুদ্ধে কালী পূজার আয়োজন করিয়াছিল, সেইজন্য কালই তাহাকে বরখাস্ত করিয়া দিব। যদিও তোমার ব্যবহার ভদ্রোচিত নয়, তথাপি তোমাকে বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ হইতেছে; তুমিই বল দেখি, এই সকল দেবতার সত্যই কোন শক্তি আছে কি না?——"

সেই মুহূর্ত্তেই বিস্মিত হইয়া দেখিল রমণী তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মানা। চক্ষের পলকে, নিঃশব্দে—ইন্দ্রজালের মত রমণী কিরূপে তাহার পার্শ্বে আসিল, তাহা যদি ভোজবাজী না হয়, তবে যে কি, তাহা জ্যাস্পারের বুদ্ধিতে কুলাইল না।

রমণী বলিল, "তুমি দেখিতেছি নিতান্ত মূর্খ! এত মূর্খতা লইয়া তুমি কি করিয়া পাণ্ডিত্যের অহঙ্কারে ডুবিয়া রহিয়াছ? তুমি শুধু খড় মাটীর আবরণটী দেখিতেছ! তা নয়, এই খড় মাটীর মধ্যে যে চৈতন্যের সত্তা প্রতিষ্ঠিত, তিনি স্বয়ং কালীমাতা,—দেবাদিদেব মহেশ্বরের শক্তি ও আনন্দরূপিণী; এজন্য উঁহার অপর নাম মহেশ্বরী। ইনি পাপীর চক্ষে ভীষণা ও সংহার-রূপিণী, শিশু ও পুণ্যবানের নিকট বরাভয়-প্রদায়িনী। যে হস্তের দ্বারা পাপ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, যে মস্তকে পাপ-চিন্তার লহরী ছুটে, সেই হস্ত ও মস্তক লইয়া এই কঙ্কাল-গ্রথিত মুণ্ডমালা গঠিত হইয়াছে। ইংরাজ! তোমাদের ধর্ম্মেও কি এরূপ ভাব নাই?" জ্যাস্পারের উত্তর যোগাইল, ভাবিল এইবার এক কথায় ও উত্তরে নিরস্ত করিয়া দিবে; ঠিক সেই সময়েই পরিচিত চুরুটের গন্ধে ও পদশব্দে চমকিত হইল, বুঝিল নিশ্চয়ই ডাক্তার আসিতেছে। সে একজন নাস্তিককে লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে তাহার উপর আর একজন নাস্তিকের শুভাগমন, বড় একটা প্রিয় বলিয়া মনে

করিল না। "যদি তাহাই হয়—" বলিতে বলিতে সে একবার—এই প্রথমবার স্ত্রীলোকটাকে ভাল করিয়া নিরীক্ষণ করিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই যেন তার চক্ষুদ্বয় ঝল্‌সাইয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাক্‌রোধ হইয়া গেল।

রহস্যময়ী রমণীমূর্ত্তি তখনো পার্শ্বে দাঁড়াইয়া; 'অহং-জ্যোতি' ও ওড়নায় মিশিয়া যেন একটা রজত-কুয়াসার বা জ্যোতিশ্ছটার সৃষ্টি করিয়াছে; কণ্ঠ ও মস্তক ব্যাপিয়া একটা হিরণ্ময় রশ্মি চতুর্দ্দিকে ছুটিয়া যাইতেছে; চক্ষুদ্বয়—আশ্চর্য্য সে দৃষ্টি, বড় বড়—ভাসা ভাসা—টানা টানা চক্ষুদ্বয় হইতে কি একটা স্নিগ্ধ জ্যোতি যেন তাহার মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত বিদ্ধ ও আলোড়িত করিয়া তুলিতেছিল। উত্তর প্রদেশের গভীর রজনীর নক্ষত্রালোক-বিম্বিত স্থির হ্রদের ঘন কালো জলরাশির মত স্থির দৃষ্টি। মৌন, মূঢ়, মন্ত্রাকৃষ্ট বা বজ্রাহত, আড়ষ্ট ভাবে সেই অপার্থিব সৌন্দর্য্যের সম্মুখে বিহ্বল চিত্তে উদাস চাহনিতে প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল দাঁড়াইয়া। মূকের কষ্টকর ও নিষ্ফল চেষ্টার মত জ্যাম্পারের কণ্ঠ হইতে অস্পষ্ট শব্দ উচ্চারিত হইল, কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

পশ্চাৎ হইতে ডাক্তার বলিলেন,—"আরে এই যে তুমি এখানে? অনেকটা ভাল আছ দেখ্‌ছি?" ডাক্তারের প্রশ্ন কাণে আসিতে তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল।

"হাঁ। দুর্গাদাস আমার হুকুম তামিল করেছে কি না' তাই দেখ্‌তে এসেছি।"

ডাক্তার কর্কশ কণ্ঠে বলিলেন, "তা বেশ। কিন্তু দেখ তোমায় একটা কথা বলিব। অপ্রিয় সত্য—দেখ যদি এই শ্বেতশ্মশ্রু বৃদ্ধের—তোমার পরিণীতা ধর্ম্মপত্নীর সম্পর্কে পিতৃতুল্য প্রাচীন ব্যক্তির কথার কোন মূল্য থাকে, তাহ'লে বলিতেছি, তুমি যাহাই কর না কেন, এদেশীয় লোকেদের সঙ্গ যেন কেবল দিবাভাগেই নিষ্পন্ন হয়।" জ্যাম্পারের ক্রোধের সীমা চরমে উঠিল।

ডাক্তার যেভাবে কথাগুলি বলিলেন, তাহাতে স্পষ্ট অবিশ্বাস, সন্দেহ, ক্রোধ ও বিরক্তি মাখান। পরিণীতা ধর্ম্মপত্নীর কথাটা যে ভাবে উচ্চারণ করিলেন, তাহা তীব্র বিষাক্ত ছুরিকার মত জ্যাম্পারের অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিদ্ধ করিয়া দিল।

"আপনি কি এই স্ত্রীলোকটার—" বিস্ময়ে দেখিল ইন্দ্রজালের ন্যায় সেই স্ত্রীলোকের অস্তিত্ব মুছিয়া গিয়াছে, ভগ্নমন্দিরে গাঢ় অন্ধকার; অপার্থিব আলোকরশ্মির চিহ্নমাত্র নাই।

ডাক্তার মনে মনে বলিলেন,—"এই পাষণ্ডেরা সমাজের অভিসম্পাত

স্বরূপ। ইহারা দিনের বেলায় ধর্ম্মপুস্তক লইয়া প্রচারক সাজে; আর রাত্রে এইরূপে নিজ কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করে। হতভাগিনি লিলিয়ান! তুমি কি কুক্ষণেই এই পশুকে স্বামিত্বে বরণ করিয়াছিলে?" ডাক্তার আর অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া আসিলেন।

জ্যাম্পারের তখনকার মানসিক অবস্থা বর্ণনাতীত—সর্ব্বপ্রকারে বিপর্য্যস্ত। প্রথম দুর্গাদাসের নিকট প্রতারিত, দ্বিতীয় এই রমণীর নিকট পরাজিত, শেষে ডাক্তারের কাছে তিরস্কৃত! ক্রোধে উন্মত্তপ্রায় পাদ্রী হুঙ্কার করিয়া দুর্গাদাসকে তলব করিলেন। দুর্গাদাস আসিলে বলিলেন,—"যদি ভাল চাও, এই মুহূর্ত্তে এই সকল বুজরুকির চিহ্ন পর্য্যন্ত দূর করিয়া দাও?" দুর্গাদাস দৃঢ়কণ্ঠে অসম্মতি জানাইল,—"বলিল আপনার পূর্ব্বে তিন জন সাহেব এই কুঠিতে বাস করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কেহই ত' আমাদের ধর্ম্মাচরণে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করেন নাই।"

"হইতে পারে তাহারা অন্য প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু আমার আমলে এ সব চলিবে না, এখনি ভাঙ্গিয়া ফেল?"

দুর্গাদাস বলিল "কিছুতেই না।" ক্রুদ্ধ ও কম্পমান জ্যাম্পার, 'দূর হইয়া যাও পাজী হারামজাদ' বলিয়া গলাধাক্কা দিয়া দুর্গাদাসকে বিতাড়িত করিয়া, একলম্ফে প্রতিমা ভাঙ্গিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করত ফুলদল বিল্বপত্র পূজার পাত্র সকলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া দিলেন। তাড়াতাড়িতে কাঠামোর একটা পেরেক লাগিয়া আঙ্গুল কাটিয়া রক্তস্রাব হইতে লাগিল।

ডাক্তার কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন, অতটা কর্কশ ভর্ৎসনা উচিৎ হয় নাই ভাবিয়া, কতকটা।—হয়ত' ঔদ্ধত্য বশতঃ ক্ষত-স্থানের প্রদাহ বাড়িয়া যাইতে পারে সন্দেহে, ফিরিয়া আসিলেন; আসিবার সময় চাকর ও লোকজনদের গণ্ডগোল শুনিলেন।

জ্যাম্পার তখন নিজ কৃত কার্য্যের সফলতার জন্য প্রফুল্ল। তাড়াতাড়ি লাফাইয়া উঠিয়া বলিল, 'আপনি যাহাই বলুন না কেন, আমি আমার কর্ত্তব্য যথাযথ সম্পন্ন করিয়াছি।' ডাক্তার একবার উত্তর না দিয়া, একবার চকিতে ক্ষত স্থানের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার লোকজন সব কাজ কর্‌ছে ত'? "সব ওই পাজী দুর্গাদাসের চক্রান্ত। এই মাত্র তাহারা সদলবলে

জবাব দিল।" ডাক্তার বিরক্তি ও সন্দিগ্ধ-মনোভাব চাপিয়া বলিলেন, "আচ্ছা কাল সকালে আমার বাসার চাকর পাঠাইয়া দিবু; আশা করি তাহাতে তোমার বিশেষ অসুবিধা ঘটিবে না।"

আর বাক্যব্যয় না করিয়া বা কোনরূপ শিষ্টাচার না দেখাইয়াই ডাক্তার উঠিয়া গেলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষেই ডাক্তার আবার আসিলেন ; কিন্তু শান্ত ও সলজ্জ ভাব। আসিয়াই সস্নেহে জ্যাস্পারের হাত দু'টী ধরিয়া বলিলেন,—"ক্ষমা করিও বাবা! আমি ভুল বুঝিয়া কাল তোমাকে ভৎর্সনা করিয়াছিলাম। সেটা আমারই অন্যায়, তুমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ও চরিত্রবান্ জানিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি।" জ্যাস্পার ডাক্তারের এই আকস্মিক ও অভাবনীয় পরিবর্ত্তনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আপনি কেমন করিয়া বুঝিলেন?" ডাক্তার বাধা দিয়া বলিলেন,—"যেরূপেই হউক বুঝিয়াছি ;—ভালরূপেই বুঝিয়াছি যে তুমি শুধু চরিত্রবান্ নহ, পরম সৌভাগ্যবান্! কাল রাত্রে যে রমণীমূর্ত্তি দেখিয়াছ, তিনি সামান্যা মানবী নহেন ;—দেবী কালিকার সহচরী যোগিনী মূর্ত্তি! ইহার ফলে শীঘ্রই তোমার পরম মঙ্গল হইবে। আমি দুর্ভাগ্য, তা'ই সামান্য কুলটা মনে করিয়া ক্রোধে ও সন্দেহে ফিরিয়া গিয়াছি।" জ্যাস্পার হাসিয়া বলিল, "বলেন কি? রাত্রের সেই স্ত্রীলোক? আমি বেশ করিয়া দেখিয়া ও কথাবার্ত্তা কহিয়া বুঝিয়াছি, সে একজন দেশীয় স্ত্রীলোক? আপনি এ গাঁজাখুরি কল্পনা কোথা হইতে সংগ্রহ করিলেন?"

ডাঃ। "বাবা, আমি খুব ভালরূপে বুঝিয়াছি, যে সে নারী পার্থিব রমণী নহে। ইহার ফলে তোমার প্রকৃত বিবেক ও বৈরাগ্যের উদয় হইবে, এবং——

জ্যা। অসম্ভব!

ডাঃ। কিছুই অসম্ভব নহে ; আজি এই বৃদ্ধ বয়সে বেশ বুঝিয়াছি, যে ভগবানের রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নয়?

জ্যা। আচ্ছা, আপনার এরূপ কল্পনার ভিত্তিটি কি শুনিতে পাই না?

ডাঃ। আমি আমার গুরুতুল্য একটী সাধুর নিকট শুনিয়াছি। জ্যাস্পার

হাসিয়া আকুল। বলিল,—"ওই নিরক্ষর, ন্যাংটা, অসভ্য ও বুজরুক্ ফকিরের দল! বিংশ শতাব্দীতে কি এখনো এমন লোক আছে যে উহাদের কথায় তিল মাত্র বিশ্বাস করে?"

ডাঃ। শুধু বিশ্বাস করি কেন, আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত দেখিয়া থাকি।

জ্যা। আপনাদের থিয়সফিক্যাল সমিতির সদস্যগণের ওই একটা মস্ত দোষ। শুধু যে সমস্ত অসম্ভব বিশ্বাস করেন তাহাই নয়, তদুপরি ন্যাংটা ফকিরদের কিরূপে ভগবানের তুল্য শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস করেন, তাহা ত' বুঝিতে পারি না।

ডাঃ। আমার জীবনের ঘটনাবলী হইতে বিশ্বাস করি। তবে শুন, সংক্ষেপে বলিতেছি,—"আমি তখন আজমীরে, নবীন যুবা—ভারতবর্ষে অল্পদিনই আসিয়াছি। ক্যাণ্টনমেণ্টে লেফ্‌টেন্যাণ্ট পাওয়ার নামক আর একটী যুবা অফিসার তাহার ভগ্নী লুইসার সহিত বাস করিত। ইহারা দরিদ্র, কিন্তু বংশ-সম্পদে হীন নহেন। পাওয়ারদের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়; ফলে লুইসা ও আমি পরস্পর অত্যন্ত অনুরক্ত হই। পরে লুইসার সহিত আমার বিবাহ সম্ভাবনা দেখিয়া পাওয়ার খুব আনন্দিত। জ্যাম্পার! তুমি এখনো যুবক, তাই আমার যৌবনের সেই পরিপূর্ণ আবেগ ও প্রণয়োচ্ছ্বাসের সুখ তুমি ভালরূপেই বুঝিবে। এখনো সেই অস্ফুট সুখস্মৃতি আমার এই বৃদ্ধ বয়সের ভগ্ন হৃদয়ে মধ্যে মধ্যে কতই না তৃপ্তি দিয়া থাকে। ইহারা দরিদ্র বলিয়া বিলাসের আড়ম্বর বড় একটা ছিল না, সরল সাদাসিদা ব্যবহার। লুইসা প্রস্ফুটিত কুসুমের মত কোমল শুভ্র গোলাপের মত হাস্যবদনা সুন্দরী; স্বচ্ছ যুবতী—তাহার সরল, সলজ্জ অথচ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার, প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি, হৃদয়ের গুপ্ত প্রণয়ের প্রচ্ছন্ন বিকাশ—তাহার কথা—তাহার স্মৃতি আমাকে প্রথম বন্ধুত্ব বা ফরাসী মদিরার মত বিহ্বল করিয়া দিত। দুইজনে দুইজনকে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতাম না;—সে বড় সুখের দিন গিয়াছে।

"এই সময় গার্ড্রেল নামক আর একটী ভদ্রলোক সেখানে ব্যাঙ্কের ম্যানেজার হইয়া আসেন। লোকটী অবস্থাপন্ন; অল্পদিনের পরিচয়ে শীঘ্রই আমাদের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু-শ্রেণীভুক্ত হইয়া পড়িলেন।" এই সময়ে একজন সাধু আজমীরে আসেন; তিনি আমাদের কমিসিয়রেটের বাবু নীলকমল চ্যাটার্জ্জির গুরু। নীলকমলের মুখে প্রত্যহ এই সাধুর সম্বন্ধে নানারূপ আজগুবি গল্প

শুনিয়া, আমাদের একবার তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইল। সাধু শুনিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "যে সাহেবদের কষ্ট করিয়া আসিতে হইবে না; তিনি নিজেই একদিন আসিবেন।"

একদিন অপরাহ্ণে আমরা গার্ডেলের বাটীর সম্মুখের উদ্যানে বসিয়া গল্প গুজব ও আমোদ আহ্লাদ করিতেছি, এমন সময় নীলকমল সাধুকে লইয়া আসিল। সাধুর আকার ও পরিচ্ছদাদি নিতান্ত অসভ্যোচিত, তাঁহাকে দেখিয়াই আমাদের যৎপরোনাস্তি অশ্রদ্ধার উদয় হইল। তবে কতকটা শিষ্টাচার রক্ষার জন্য এবং কতটা নীলকমলের মনঃকষ্ট না হয়, এইজন্য আমরা সাধুকে যথাসম্ভব সাদর অভ্যর্থনা করিয়া চেয়ার দিলাম। সাধু কিন্তু চেয়ার না লইয়াই ভূমিখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িল। অগত্যা আমরাও শষ্পাস্তরণের আশ্রয় গ্রহণ করিলাম। আমি বলিলাম,—"শুনিতে পাই, আপনি নাকি ভূত ভবিষ্যৎ বলিতে পারেন?"

সাধু গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"আমি ত' জ্যোতিষী নই।"

আ। শুনিলাম আপনি ত' অনেকের গণনা করিয়া বলিয়াছেন।

সা। গণনা আমার পেশা নয়!

আ। তবে আপনাকে কি করিয়া বিশ্বাস করিব?

সা। আমাকে তোমরা বিশ্বাস কর বা নাই কর, তাহাতে আমাদের ও জগতের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। তবে তোমাদেরই মঙ্গলের জন্য—সাধু সন্ন্যাসীর প্রতিবিশ্বাসের জন্য কিছু উপদেশ দিব।

পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, "শীঘ্রই—তিন মাসের মধ্যেই তোমার সমস্ত আশা কল্পনা বিনষ্ট হইয়া, জীবন শুষ্ক—মরুময় হইয়া যাইবে।" পাওয়ারকে বলিলেন, "ছয় মাসের মধ্যে আত্মহত্যা করিয়া মৃত্যুমুখে পড়িবে।" শেষে সম্মুখের একটা প্রকাণ্ড নিমগাছ দেখাইয়া গার্ডেলকে বলিলেন,—"এই নিম গাছই তোমার মৃত্যুর কারণ হইবে।"

আমরা তাহার এই সমস্ত অযাচিত উপদেশ হাসিয়া উড়াইয়া দিলাম। নীলকমলের কিন্তু মুখ শুকাইয়া গেল; তাহার দৃঢ় বিশ্বাস যে সাধু সন্ন্যাসীর কথা কখন ব্যর্থ হয় না। পারিশ্রমিকের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া সাধু চলিয়া গেলেন, আমরাও এ ঘটনা শীঘ্রই ভুলিয়া গেলাম।

"লুইসার ভাবান্তর দেখিয়া বড়ই ক্ষোভ ও ক্লেশ হইল। যে লুইসা আমাকে দেখিবার জন্য পূর্ব্ব হইতে উদ্যানে আসিয়া দাঁড়াইত; এখন সেই লুইসা আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার সময় পায় না। অবশেষে একদিন অনেক কাতর ও মিনতি করিয়া বিবাহ সম্বন্ধে স্পষ্ট অসম্মতি জানাইল।

"আমার তখনকার অবস্থা বর্ণনাতীত। ইচ্ছা হইল আত্মহত্যা করিয়া নিষ্ফল জীবনের সব শেষ করিয়া দিই;—বহুকষ্টে সে প্রবৃত্তি দমন করিলাম।" অনুসন্ধানে জানিলাম, আমার হৃদয়ের সর্ব্বস্ব লুইসা, গার্ডেলকে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। গার্ডেলের উপর আমার বিজাতীয় ক্রোধ হইল! শেষে নিজেই মনকে প্রবোধ দিয়া পাওয়ারকে বুঝাইলাম, যে গার্ডেল সঙ্গতিপন্ন ব্যক্তি, সুতরাং লুইসা যদি সুখী হয়, তাহাতে আমাদেরও সুখী হওয়া উচিত। এই বিচ্ছেদে পাওয়ারও আন্তরিক দুঃখিত হইয়াছিল।

"আজমীরে বাস করা আমার পক্ষে বিষময় হইল। শীঘ্রই ছুটী লইয়া ভগ্নহৃদয়ে বিলাতে আসিলাম। পাওয়ার আহমেদাবাদ পর্য্যন্ত সঙ্গে আসিয়া ছলছল নেত্রে বিদায় নিল। এই আমাদের শেষ দেখা; জীবনে আর কখনও পাওয়ার বা লুইসার সহিত সাক্ষাৎ হইল না।" বিবাহিত কপট গার্ডেল প্রতারণা করিয়া লুইসাকে জানাইয়াছিল, যে সে অবিবাহিত; কিন্তু সে কথা চাপা থাকে নাই। প্রতারিতা লুইসা কলঙ্ক ও গঞ্জনার ভয়ে বিষপান করিয়া আত্মহত্যা করিল। উদ্যানের গোলাপ মধ্যাহ্নেই শুকাইয়া—ঝরিয়া গেল। ভগ্নীকে কবরস্থ করিয়া, ক্রোধোন্মত্ত পাওয়ার দিগ্বিদিক্ জ্ঞানশূন্য; যুবক গার্ডেলের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া পাষণ্ডের মস্তক লক্ষ্য করত অব্যর্থ সন্ধানে বন্দুক ছুঁড়িল এবং নিজেও সেইখানে নিজেরই গুলিতে যৌবনের সমস্ত আশা ভরসা কল্পনার বিদায় দিল। এই ঘটনা আমি বিলাতে শুনিলাম, শুনিয়াই সাধুর সেই বিস্মৃতপ্রায় উক্তি মনে পড়িল এবং ইচ্ছা হইল এবার ভারতবর্ষে গিয়া সাধুর সহিত সাক্ষাৎ করিব।

"পাওয়ার ভুল বুঝিয়াছিল। বিধির বিপাকে গুলি গার্ডেলের মস্তকের উপর দিয়া সম্মুখের সেই পূর্ব্ব কথিত নিম গাছে প্রোথিত হইল।" শুনিয়াছি গার্ডেল বলিত "যে সাধুর কথা ভুল, নিমগাছ তাহার মৃত্যুর কারণ না হইয়া বরং জীবনরক্ষার কারণ হইয়াছে।"

"আজ চারি বৎসর হইল, গার্ডেল কর্ম্ম হইতে বিদায় লইয়া দেশে ফিরিবার সময়

কি জানি কেন, সাধুর কথায় কতকটা বিশ্বাস হইয়াছিল। ভাবিল যে নিম গাছটী থাকিতে হয় ত' অভাবনীয়রূপে তাহার জীবিত অবস্থায় স্বদেশ প্রত্যাগমন সম্ভব হইবে না। এই ভাবিয়া সে নিজে দাঁড়াইয়া গাছটী কাটিবার হুকুম দিল। কিন্তু গার্ডেলের অত সাবধানতা সত্ত্বেও কোন ফল ফলিল না; হঠাৎ কুঠারের প্রবল আঘাতে সেই বহুদিনের প্রোথিত গুলি সবেগে ছিটকাইয়া গার্ডেলের কপালে বিদ্ধ হইল। সাধুর প্রত্যেক কথা বর্ণে বর্ণে ফলিয়া গেল। জ্যাস্পার যেন কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিল, "হঁা হাঁ কয়েক বৎসর পূর্ব্বে সংবাদপত্রে ইহা পড়িয়াছিলাম বটে, ইহা কি আপনারই সংশ্লিষ্ট ঘটনা?"

ডাঃ। "হঁা আমারই তুচ্ছ জীবননাটিকার এক অঙ্ক।" জ্যাস্পারের এ সকল কিছুতেই বিশ্বাস হইতেছিল না, কিন্তু শ্বেত-শ্মশ্রু বৃদ্ধ যখন নিজের জীবনের ঘটনা বলিয়া বিবৃত করিতেছেন, তখন একেবারে মিথ্যা বলাও সম্ভব ছিল না। উভয়ে কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। ডাক্তার নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিলেন, "সেই সাধু এখন কাশীতে বরুণাতীরে এক গুহায় বাস করেন। আমি মধ্যে মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। কাল রাত্রে মনটা অত্যন্ত খারাপ হওয়ায়, তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম এবং তাহাতেই তোমার সম্বন্ধে এই সকল বিষয় জানিতে পারি। তোমার ভবিষ্যৎ মঙ্গলময়, কল্যকার ঘটনার ফলে তোমার ক্ষুদ্র 'অহঙ্কার' ডুবিয়া 'বিশিষ্ট আমিত্ব' ও 'সর্ব্বাত্মিক।' বুদ্ধির বিকাশ পাইবে।" জ্যাস্পার হাসিয়া বলিল, "ভাল আমার উপর হিন্দুর দেবতার এত দয়া কেন?"

ডাঃ। "শুন তুমি চরিত্রবান্, সরল, নির্ভীক, সত্যবাদী, দৃঢ়চেতা ও অধ্যবসায়-সম্পন্ন। সাধন-পথের অনুকূল বহু সদ্‌গুণ তোমাতে আছে; তবে ইহার অন্তরায়ও আছে; কেননা তুমি ক্ষুদ্র 'অহং'-ভাবে মজিয়া আছ। সর্ব্ব ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা নাই এবং নিজ ধর্ম্মের বিস্তারের জন্যও কতকটা স্বার্থপর। তাই তোমার এই ক্ষুদ্র ও হীন বুদ্ধির বিনাশ হইয়া, সর্ব্বভাবে—সর্ব্বকালে,—সর্ব্ব অবস্থায়—সর্ব্বধর্ম্মে ও সর্ব্বজীবে, যে ভগবানের সত্তার বিকাশ হইতেছে, এই বিরাট্ সত্য ও মহান্ সর্ব্বভাব তোমায় উপলব্ধি হইবে; ফলে তোমার ক্ষুদ্র অহঙ্কার ভাঙ্গিবার জন্য দারুণ বিপদ্ আসিবে—বিষম শোক পাইবে ও অঙ্গহানি ঘটিবে।" জ্যাস্পার হাসিয়া বলিল,—"হিন্দুর দেবতারাও কি প্রতিহিংসা-পরায়ণ?"

ডাঃ। "প্রতিহিংসা নহে; জীবের ও জগতের সুখ-শান্তির জন্য মঙ্গলময়ের মঙ্গল বিধান। ভগবানের সামান্য একটু দয়ায় জীবের বহু কার্য্য ও উদ্দেশ্য সাধিত হয়। তোমার পরমাত্মীয়ের মৃত্যু ও তজ্জন্য তোমার শোক, ইহা উভয়েরই বিধিলিপি ও পূর্ব্ব কর্ম্মের ফল। কিন্তু ইহাতে তোমার বৈরাগ্যের উদয় হইবে; আর যে অঙ্গের দ্বারা সমধর্ম্মী এক জনের ধর্ম্মে ও মনে আঘাত দিয়াছ, তাহারই প্রতিক্রিয়ায় ঐরূপ কার্য্য গর্হিত,—এইভাবে চিত্তগত সংস্কার জন্মিবে বলিয়াই অঙ্গহানি ঘটিবে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পূতসলিলা নদীমূল হইতে বহু উর্দ্ধে অবস্থিত ধনুকাকৃতি কাশীধাম,—রজনীর শান্তি ও কৌমুদীর স্নিগ্ধ সোহাগে তন্দ্রামগ্ন। এই রজনীর শান্তি সৌন্দর্য্যের ভিতর দিয়া হিন্দুর অতি প্রিয় গঙ্গাদেবী, হৃৎপিণ্ডের মৃদু কম্পনের মত ধীর উর্ম্মিমালা বিক্ষেপে প্রস্তরবদ্ধ সোপানরাজি বিধৌত করিয়া, কলকল ভাষায়—ছলছল রবে—তরতর বেগে—কলি-কলুষ বিনাশের জন্য দূর দূরান্তে ছুটিয়া যাইতেছে। দূরে ও নিকটে, রূপ ও মোহের সংহার মূর্ত্তি অথচ আনন্দ-ঘন 'সর্ব্ব' বিলোপক ও 'আত্ম'ভাবের বরণীয় মূর্ত্তি, মহাকাল মহাদেবের অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দিরমালা, তাঁহাদের স্বর্ণচূড়ের প্রতিবিম্ব বুকে লইয়া, "গাঙ্গম্ বারি মনোহারী" অজানা-আনন্দে পুলকিত হইয়া উচ্ছ্বাসে নৃত্য করিয়া উঠিতেছে। কদাচিৎ কোথাও দু'একজন সাধু ধুনি জ্বালাইয়া স্তিমিতনেত্রে বসিয়া, দূরে—অস্পষ্ট স্মৃতির মত—মণিকর্ণিকা হইতে চিতার ধূমরাশি নগরবাসীকে দেহ সুখের অনিত্যতা জানাইবার জন্য কুণ্ডলীকৃতভাবে ধুঁয়ার মত চঞ্চল অস্থির মেঘমালার দিকে ভাসিয়া যাইতেছে।

জ্যাস্পার একাকী নদীতীরে ভ্রাম্যমান ও চিন্তাযুক্ত। রজনীর স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্য স্নেহময় শান্তি ও জ্যোৎস্নার আকুল হাসির কোন কিছুই তা'র হৃদয়ের গভীর অন্ধকার দূর করিতে পারিতেছিল না; সে উন্মাদের মত ঘুরিতেছিল। তাহার চারিদিকে ক্ষোভ, পরাজয়, উৎসাহভঙ্গ, আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব,—কোন পথ ধরিবে, কিসের ভিত্তিতে দাঁড়াইবে, এই সকল চিন্তার আলোড়নে ব্যতিব্যস্ত; তাহার উপর ডাক্তারের কথাগুলি রহস্যের মত কাণে বাজিতেছিল; এমন কি, লিলিয়ান ও তাহার নবজাত পুত্রের স্মৃতিতেও তৃপ্তি পাইতেছিল না।

অবসাদ ও নিরাশায় ব্যথিত হইয়া জ্যাম্পার ভাবিল,—কেন তবে এত কষ্ট, এত চেষ্টা। নির্ম্মল জাহ্নবী সলিলের অবিরাম গতির দিকে চাহিয়া মনে মনে বলিল, কৈ আমার ধর্ম্মপ্রচারের এত চেষ্টার কিছুই ত' সফল হইতেছে না, পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কার এই নদীস্রোতের মত সমভাবে বহিয়া চলিতেছে। আমার এ চেষ্টা যেন জলে ঘুসি মারা। যাহাদের মুক্তি ও ত্রাণের জন্য—অন্ধকার হইতে আলোকে আনিবার জন্য, আমার এই প্রাণপাত চেষ্টা ও পরিশ্রম, কৈ তাহারা ত' কিছুই ব্যগ্র নয়; তবে আমি কেন খাটি, কেন এত আয়াস করিয়া, স্বদেশ, স্ত্রী পুত্র সকলি দূরে ফেলিয়া, কি জন্য এই সুদূর প্রাচ্যদেশে আসিয়া সমস্ত জীবনটাকে অলীক আয়াসে ব্যর্থ করিয়া দিই!

জ্যাম্পার সোপানমূলে দাঁড়াইয়া তন্ময়ভাবে ইতিকর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিতেছিল, হঠাৎ উপরে চাহিয়া দেখিল,—সেই গভীর রাত্রে সোপানের উপর মূল্যবান্ রেশমী ওড়নায় আবৃতা এক রমণী। রমণী একটী শিশুকে বুকে লইয়া নামিয়া আসিতেছে। প্রস্ফুট চন্দ্রকিরণে ও রেশমী বস্ত্রের ঔজ্জ্বল্যে রমণীকে দূর হইতে বড়ই সুন্দর দেখাইতেছিল। কোলের শিশুটী যেন ইংরাজ-শিশু, যেন আনন্দে বুকের উপর অঙ্গ ঢালিয়া ঘুমাইয়া পড়িতেছে; শিশুটীকে দেখিয়া যেন পরিচিত বলিয়া বোধ হইল। নিঃশব্দ পদসঞ্চারে রমণী নামিতে লাগিল,—আশ্চর্য্য দেহের বসন নড়িতেছে না ও কোন শব্দ নাই। রমণী জ্যাম্পারের নিকটে আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য দাঁড়াইল; বিস্ময়ে রোমাঞ্চ কলেবরে, পাদ্রীর মুখ হঠাৎ তুষারের ন্যায় শুভ্র হইয়া গেল। পাথরের সোপানে 'নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপমিব' দাঁড়াইয়া, উদাস দৃষ্টিতে জীবন্মৃতের মত চাহিয়া রহিল। সেই ভগ্ন মন্দিরের ঐন্দ্রজালিক রমণীর ক্রোড়স্থ শিশুটীর মুখ ওড়নায় ঢাকা পড়িয়াছে, মাথার উপর হইতে কুঞ্চিত কেশরাশি রমণীর হাতের উপর ঝুলিয়া পড়িয়াছে; যতদূর বোধ হইল শিশুটী সুন্দর—অতি সুন্দর।

রমণী আবার পূর্ব্ববৎ নিঃশব্দ পদসঞ্চারে সোপান বাহিয়া নদীবক্ষে নামিয়া গেল।

জলরাশি একবার আলোকচ্ছটার কুয়াসায় ঢাকিয়া গেল, জ্যাম্পারের চক্ষের সম্মুখে উভয়েই জাহ্নবীর অতলজলে মিশিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে যেন জ্যাম্পারের হৃদয়ের একখানি অস্থি ভাঙ্গিয়া গেল। সে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।
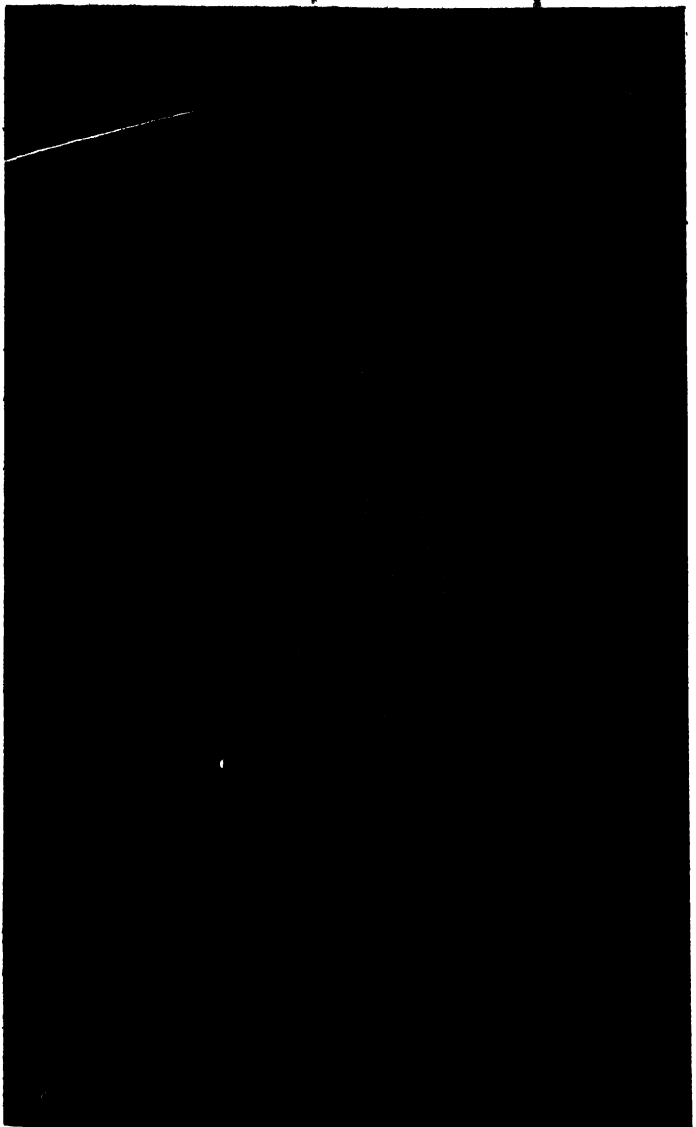
রমণী নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে নদীবক্ষে নামিয়া গেল। (৪৩৮ পৃষ্ঠা)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ইহার বহুদিন পরে তাঁহার পুরাতন বন্ধু ফাদার ওসানির নিকট এই বিষয়ের গল্প বলিতে বলিতে ডাক্তার বলিলেন,—"ঠিক সেইদিনে ও সেই সময়ে বিলাতে জ্যাম্পারের শিশু পুত্রটী হঠাৎ জ্বর ও তড়্কায় মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। আর কালীমূর্ত্তি ভাঙ্গিবার সময় যে আঙ্গুলে পেরেক বিঁধিয়া গিয়াছিল, সেই আঙ্গুলটাকে অস্ত্রচ্ছেদ করিয়া বাদ দিতে হয়।"

"জানিনা, এতদিনে তাহার মতের পরিবর্ত্তন হইয়াছে কিনা! তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে—হইয়াছে, কিন্তু তখনো সে বলিত যে সাধারণ ঘটনাচক্র ব্যতীত আর কিছুই নয়। ফাদার ওসানি! এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?"

ফা। আমারো ওই মত।

ডাঃ। বলেন কি! ফাদার ওসানি, সমস্ত জীবন প্রচার ও ধর্ম্মকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া—আপনিও কি বলেন, যে যথার্থই এ সকল সাধারণ ঘটনাবলী ব্যতীত অন্য কিছুই নহে?

ফাদার ওসানি একগাল হাসিয়া বলিলেন, "তা' বৈকি? অন্ততঃ যতদিন না বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হয়!"

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

অর্ঘ]

বিদ্যাপতি।

"কবিপতি বিদ্যাপতি মতিমানে, যাক গীতে জগচিতে চোরায়ল,—
গোবিন্দ গৌরী সরস রসগানে।" গোবিন্দদাস।

শিখিলে কোথায় কবি অই প্রেমগান?
ভুলিয়ে আপনা, জগতে সন্ধানে,—
কামগন্ধ ভুলি, তুলিলে ও তান;
ললিত, আতুর, ভরিয়ে ধরা।
মধু গন্ধে অন্ধ মধুপের প্রায়,—
প্রেম অন্ধ হ'য়ে জীবন কারায়,
পাগল ভ্রমিলে, ভ্রমেতে ভরা॥

নিগূঢ় রহস্যে মাখা তব প্রেমগীতি;
পঞ্চমে উঠিয়া মধুময়ী, নিতি,—
মিথিলা ভাসাল,' ভাসাল' জগতী;
কাঁদিল আবেগে জগত-জন।
জটিল জীবন ভেদিয়া মন্তরে,—
মধুর, সহজে পশিল অন্তরে,
মজিল ভাবুক-সাধক মন॥

শ্রীকৃষ্ণসাধক! তব আকুল সাধনা;
কৃষ্ণপ্রেমামৃত মধুর বাজনা —
পদাবলী-বেণু, বঙ্গভক্ত জনা';
অলস করিত সংসার সারা।
গৌরবরণ ভকত সে প্রভু,—
গাহিতে গাহিতে পদাবলী কভু
নাচিত আবেগে আপনাহারা॥

ভক্তবৃন্দে ভরা, গোরা গাহিত গরবে
' তুয়া বিনা গতি নাহি আরা,—
ভবতারণ ভার তোহারা।"
উছলি বঙ্গ করতালি-রবে;
প্রেমের উতস ছুটিত তখন,—
শ্রীকৃষ্ণ-মুরলী সম রে মোহন;
ডাকিত আকুল প্রেমিক সবে॥

ছুটিত গো! কোথা হ'তে সেই প্রস্রবণ?
'সোঙরি সোঙরি পিয়া-বর কান,—
আবেশে অবশ রাধিকা নয়ান;
হেরিত ভকতি-মূরতি; তব
তেমনি কি কবি! লছিমার ধ্যানে;
(ধন্য সে লছিমা বাঁধা প্রেমতানে)
আপনা হারায়ে কবিতা পরাণে,—
আপনা ভকতি ঢালিতে সব?

অথবা সাধিকা বিদ্যা কণ্ঠেতে বসতি
করিত তোমার সাথে; বিদ্যাপতি!
ভকতিতে ভরা হেরি তোমা, পতি—
বরি মনে মনে তুলিত গান।

ফুটিল অমল তব মনধামে
(হরিণী বিহীন যেন হিমধামে)
সে গান, ফুটায়ে প্রেম ভক্তি কামে;
যথা বৃন্দাবন বিমোহন ধামে,—
আকুল কেশব-মুরলী তান॥

সঙ্গীত তরঙ্গে তব, উদাসীন রঙ্গে,
আকুল গোকুল, আজি দীন বঙ্গে;
খেলিছে মধুর প্রেমের তরঙ্গে,—
বৈষ্ণব শত সাধের খেলা।
মায়ার বাঁধনে বাঁধিতে সাধনা,
বিশ্ব-প্রেম সুধা তব অতুলনা;
ঢালিছে উথলি হৃদয়-বেলা॥

আঁকিছে উল্লাসে হৃদে তব বাক্যছবি,
রচনা নহে ত'. সে যে সুধা-ছবি;
অলস হেরনে,—আলসেতে কবি,—
আঁকিলা আবেগে আদরে শুধু।
কভু রাধা, তব শ্যাম বিনোদিনী,
শৈশব-যৌবন-দ্বন্দ্বের কামিনী;
কভু শ্যামরায় অলস চাহনি,
কভু কৃষ্ণ-প্রিয়া বসন্ত-হাসিনী,—
মালিনী. মোহিনী কভু রাধা বঁধু।
কখন মিলনে সুধার বিজলী,
আবার বিরহে প্রেমের পুত্তলি;
ভক্তি-অশ্রুজলে জীবন উথলি,—
বৃন্দাবন প্রাণে অবশ-মধু॥

ঝরিছে উদাস প্রাণ তব রূপ-কলা,
উপমা তোমার রূপভরা ডালা;
প্রকৃতি সুন্দরী,—তব শিল্পশালা,—
ঠাঁয়ে ঠাঁয়ে তা'হে ফুলের বাস।
ললিতে গম্ভীরে মধুর মিলন,
ভাবের বসনে ভবের ভূষণ;
কেন ভাষা ধনী, ভাববঁধু মন—
বেঁধেছে অলসে বিবাহ-ফাঁস॥

পূজিবে বাঙ্গালা তোমা হে মিথিলা কবি!
বৈষ্ণব ভক্তি-কমলিনী রবি;
হৃদয়ে পূজিয়ে তব পদ-ছবি,—
গেয়েছে আদরে আপন গান।
ভারত তোমারে তুষিবে, মিথিলা!
তোমা কাছে ঋণী ধরণী অখিলা;
গৌতম, জনক, গার্গী মহিলা;
রঘুমণি আদি যে জন উদিলা,—
ভারতে, সকলি তোমার প্রাণ॥

গাহিবে আদরে তোমার গান।
বিদ্যাপতি পদ তোমার দান॥

শ্রীশিবপ্রসাদ কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য।

অর্থ]

হরিদ্বার।

শ্রীহরিপাদপদ্ম-সম্ভূতা, মহাদেব-জটাবিহারিণী, কলি-কলুষনাশিনী, মোক্ষদায়িনী, সর্ব্বতীর্থময়ী গঙ্গা,—যিনি দ্রবরূপ পরব্রহ্ম, * যাঁহার জলধারা দর্শনে পরমাত্মা দর্শনের ফল হয়, † যাঁহার তটস্থিত ভূমি মাত্রই তপোবন ও সিদ্ধক্ষেত্র স্বরূপ, —যাঁহার "জল মহিমা নিগমে খ্যাত" এবং সাধকগণের প্রত্যক্ষ, সেই পতিতোদ্ধারিণী, ত্রিভুবনতারিণী, ত্রিপথগা সুরধনী, জীব-কল্যাণ সাধনার্থ যে পবিত্র ক্ষেত্রে, স্বর্গ সদৃশ হিমালয় পর্ব্বত হইতে ভূতলে অবতীর্ণা হইতেছেন, সেই পরম পবিত্র ভূমিই—হিন্দুর মোক্ষদায়িকা পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার,—গঙ্গাদ্বার বা মায়াপুরী।

---

* তদেতৎ পরমং ব্রহ্ম দ্রবরূপং মহেশ্বরি।
গঙ্গাখ্যং যৎ পুণ্যতমং পৃথিব্যামাগতং॥ স্কন্দ পুরাণ, কেদার—খণ্ড। (বোম্বাই মুদ্রিত)

† যৎফলং জায়তে পুংসাং দর্শনাৎ পরমাত্মনঃ।
তৎফলং দেব গঙ্গায়া দর্শনে ভক্তিভাবতঃ॥ শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত পুরাণ বচন।

অযোধ্যা-মথুরা-মায়া-কাশী-কাঞ্চী-অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীশ্চৈব সপ্তৈতে মোক্ষদায়িকা॥

অযোধ্যা, মথুরা, মায়াপুরী, কাশী, কাঞ্চী, অবন্তিকা বা উজ্জয়িনী ও দ্বারকা, এই সপ্তপুরী মোক্ষদায়িকা তীর্থভূমি। কি প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য্যে, কি আধ্যাত্মিক ও ঐশী-শক্তির বিশেষ প্রকাশে. কি প্রাচীনত্বে, কি পবিত্রতায় হরিদ্বার অতুলনীয় তীর্থ। হরিদ্বারেই প্রজাপতি দক্ষের যজ্ঞ হইয়াছিল। পতি-নিন্দা শ্রবণে মহামায়া সতী যে কুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, কণ্খলে অদ্যাপি তাহা বর্ত্তমান। যে মহামায়ার এক একটী অঙ্গ বিষ্ণুচক্র কর্ত্তৃক ছেদিত হইয়া, এক এক স্থানে পতিত হওয়ায় ভারতে একান্নটী মহাপীটের উদ্ভব হইয়াছে, এই পবিত্র যজ্ঞকুণ্ডে,—সেই মহামায়া তাঁহার দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। যেস্থানে দেবগণের পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া আশুতোষ দক্ষকে পুনর্জ্জীবিত করিয়াছিলেন, সেই স্থানে দক্ষেশ্বর মহাদেব লিঙ্গরূপে বিরাজিত হইয়া অদ্যাপি ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতেছেন। হরিদ্বারের যে পবিত্র ঘাটে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, অদ্যাপি তাহা ব্রহ্মকুণ্ড-ঘাট নামে খ্যাত। যে স্থানে দত্তাত্রেয় ঋষির তপঃ-প্রভাবে গঙ্গা-প্রবাহ আবর্ত্তিত করিয়া, তাঁহার কুশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দিয়াছিলেন,—তাহাই কুশাবর্ত্ত ঘাট। পর্ব্বতোপরি যে স্থানে সূর্য্যদেব তপস্যা করিতেন, তথায় সূর্য্যকুণ্ড। শিবালিক পর্ব্বতের মনোরম উপত্যকায় বিল্ব-কানন মধ্যে যেখানে ঋচিক মুনি শিবারাধনায় তৎপর থাকিতেন, তথায় মহাদেব বিল্বকেশ্বর নামে খ্যাত। এইরূপ কত প্রাচীন ও কত পবিত্র বিজড়িত—হরিদ্বার, হিন্দুর হৃদয়ে কত ভাবের বন্যা,—কত আনন্দের স্রোত প্রবাহিত করে, তাহা কেমন করিয়া বর্ণনা করিব! তাহা যে অবর্ণনীয়। তাহা যদি অনুভব করিতে চাহ, তবে হিন্দুর হৃদয় লইয়া একবার মায়াপুরী-মাহাত্ম্য পাঠ করিয়া হরিদ্বারে যাও এবং পুরাণ কথিত তীর্থসমূহ ভক্তি ও বিশ্বাসের চক্ষে শাস্ত্রবিহিত রীত্যনুসারে এবং ভগবৎ-ধ্যান-পরায়ণ হইয়া দর্শন কর। আর প্রত্যহ প্রাতেঃ ও সায়াহ্নে, পূত বারি-পরিবাহিনী, কুল-কুল-নাদিনী—উপল-প্রতিহতা তরঙ্গাঙ্গিনী—তরতরগামিনী ভাগীরথীর তীরে নিস্তব্ধ ভাবে বসিয়া থাক, এবং ভাগীরথীর কুল কুল নাদের সহিত অন্তরস্থ প্রণব-ধ্বনির সুর মিলাইয়া একবার ধ্যানস্থ হও, দেখিবে কি আনন্দ; এবং

তাহা কত সহজলভ্য। আরও দেখিতে পাইবে যে শাস্ত্র বলিয়াছেন, "ন যত্র যোগাচরণ প্রতীক্ষা" তাহা সত্য কি না,—যোগাচরণ করিয়া চিত্তের যে স্থৈর্য্য ও ভগবৎমুখী একাগ্রতা লাভ হয়, তাহা এখানে সহজ লভ্য কি না। ভাগীরথীর কলনাদী প্রবল তরঙ্গ ভগবৎ-গুণগান করিতে করিতে অবিরাম গতিতে সমুদ্ররূপী ভগবানের অভিমুখে চলিয়াছেন, তাঁহার কত শোভা কত সৌন্দর্য্য। দেখিতে দেখিতে স্বতঃই মনে এই প্রশ্ন উঠিল, "মা! তুমি কোথা হইতে আসিতেছ এবং কোথায় যাইতেছ! তোমার কোথায় আদি এবং কোথায় অন্ত?" ভাবিতে ভাবিতে বুঝিতে পারিলাম:—ভগবানের চরণ হইতে উদ্ভূতা হইয়া, মা আমার ভগবানেরই কার্য্য জীবোদ্ধার ও জীবের সর্ব্ববিধ কল্যাণ সাধন করিয়া, আবার সমুদ্ররূপী শ্রীভগবানেই মিশিতেছেন। জীবও ত' সেইরূপ, তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া, ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট নানা কার্য্য নানা জন্মে সাধন করিয়া, আবার অন্তে তাঁহারই চরণে মিলিতেছে। জীব যতদিন তাঁহা হইতে পৃথক্ ততদিন নিষ্কামভাবে দাসরূপে তাঁহারই সেবা ও তাঁহারই কার্য্য করা তাহাদের কর্ত্তব্য। হায়, নিজে কর্ত্তা সাজিয়া অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা হইয়া, আমরা ভগবৎ-বিমুখ হইয়া মায়ায় হাবুডুবু খাইয়া, কতই না যন্ত্রণা পাইয়া থাকি। নিবৃত্তিরূপিণী গঙ্গা দর্শন করিতে করিতে ইহাই মনে পড়িল। আরও মনে পড়িল শ্রীমদ্ভাগবতের দেবহুতির প্রতি কপিলের অপূর্ব্ব উপদেশ,—

মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্ত নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥

"আমার গুণ শ্রবণ মাত্র যখন মনের গতি অবিচ্ছিন্ন হইয়া, যেমন গঙ্গার জল অবিরাম গতিতে সমুদ্রাভিমুখে ধাবিত হয়, সেইরূপ আমার প্রতি ধাবিত হয়, তখনই নির্গুণ ভক্তির উদয় হয়। মন ভুলিয়াও বিষয়ের দিকে যায় না, মনোগতির কদাচ ভগবান হইতে বিচ্ছেদ হয় না। সেই অবিচ্ছিন্ন মনোগতিই যেন গঙ্গার পবিত্র ধারা।

শাস্ত্র ও মহাপুরুষের উক্তি এই যে তীর্থে শ্রীভগবানের বিশেষ প্রকাশ। এ সম্বন্ধে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সরল ভাষায় বলিতেন "ওরে যেখানে অনেক

লোক অনেক দিন ধরে ঈশ্বরকে দর্শন কর্‌বে ব'লে জপ, তপ, ধ্যান, ধারণা, প্রার্থনা, উপাসনা করেছে, সেখানে তাঁর প্রকাশ নিশ্চয় আছে জান্‌বি। তাদের ভক্তিতে সেখানে ঈশ্বরীয় ভাবের একটা জমাট বেঁধে গেছে, তাই সেখানে সহজেই ঈশ্বরীয় ভাবের উদ্দীপন ও তাঁর দর্শন হয়। যুগ যুগান্তর থেকে কত সাধু, ভক্ত, সিদ্ধ, পুরুষেরা এই সব তীর্থে ঈশ্বরকে দেখ্‌বে বলে এসেছে, অন্য সব বাসনা ছেড়ে তাঁকে প্রাণ ঢেলে ডেকেছে, সে জন্য ঈশ্বর সব জায়গায় সমান ভাবে থাক্‌লেও এই সব স্থানে তাঁর বিশেষ প্রকাশ - যেমন মাটী খুঁড়্‌লে সব জায়গাতেই জল পাওয়া যায়, কিন্তু যেখানে পাতকো, ডোবা, পুকুর বা হ্রদ আছে সেখানে আর জলের জন্য খুঁড়্‌তে হয় না,—যখনই ইচ্ছা জল পাওয়া যায়—সেই রকম।" কিন্তু যে যেমন অধিকারী, যাহার যতটুকু সাধনা বা ভক্তি ভাব, সেই তত টুকুই এই বিশেষ প্রকাশের অনুভব করিতে পারিবে। এ সম্বন্ধে ঠাকুর রামকৃষ্ণ বলিতেন,—"ওরে যা'র হেথায়ও আছে, তা'র সেথায় আছে; যা'র হেথায় নাই, তা'র সেথায়ও নাই।" যার প্রাণে ভক্তি ভাব আছে, তীর্থে উদ্দীপনা হয়ে তার সেই ভাব আরও বেড়ে যায়। আর যার প্রাণে ঐ ভাব নাই, তার বিশেষ আর কত হবে? মহামতি যীশু খ্রীষ্টও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন,—To him who hath more shall be given যাহার অধিক ভক্তি বিশ্বাস আছে তাহাকে আরও ঐ ভাব দেওয়া হইবে। শাস্ত্রেও বলিয়াছেন,—

চিত্তমন্তর্গতং দুষ্টং তীর্থস্নানান্ন শুধ্যতি।
শতশোঽপি জলৈ ধৌতং সুরভাণ্ডমিবাশুচিঃ॥ কাশীখণ্ড

সুরাভাণ্ড যেমন শতবার জলে ধৌত করিলেও তাহার অশুচিত্ব দূর হয় না, সেইরূপ যাহার অন্তরাত্মা ও চিত্ত দুষ্ট ও অসংযত, তিনি ভৌম-তীর্থস্থানে শুদ্ধ হয়েন না। যিনি এককালেই ভৌমতীর্থে এবং মানসতীর্থে স্নান করেন, অর্থাৎ সত্য, ক্ষমা, সর্ব্বভূতে দয়া, আর্জ্জব, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, দম, সন্তোষ, জ্ঞান, ধৃতি, তপ প্রভৃতি দৈবী-সম্পদ্ সঞ্চয় করিতে সচেষ্ট এবং ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ হইয়া শুদ্ধ চিত্তে ভ্রমণ করেন, তিনিই তীর্থস্নান দ্বারা পরম গতি প্রাপ্ত হ'ন। যথা—

শৃণু তীর্থানি গদতো মানসানি মমানঘে।
সত্যং তীর্থং ক্ষমাতীর্থং তীর্থমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ॥

সর্ব্বভূতদয়াতীর্থং তীর্থমার্জ্জবমে বচ।
দানং তীর্থং দমস্তীর্থং সন্তোষতীর্থমুচ্যতে॥
ব্রহ্মচর্য্যপরং তীর্থং তীর্থঞ্চ প্রিয়বাদিতা।
জ্ঞানং তীর্থং ধৃতিস্তীর্থং বিশুদ্ধি মনসঃ পরা।

* * * *

তস্মাৎ ভৌমেষু তীর্থেস্থ মানসেষু চ নিত্যশঃ
উভয়েষ্বপি যঃ স্নাতঃ স যাতি পরমাং গতিং॥

কিন্তু হরিদ্বারে এই বিশেষ ঐশ্বরিক প্রকাশ সমধিক ও সুলভ-লভ্য। পরমহংস দেবের কথায় বলা যায়, অন্য তীর্থ যদি পাত্‌কো বা ডোবা হয়, তবে ইহা হ্রদ—যখনই ইচ্ছা জল পাওয়া যায়। হরিদ্বার শান্তি, প্রীতি ও ভক্তির পুণ্য নিকেতন ও নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের আধার। তাই মায়াপুরী মাহাত্ম্যে আছে "মায়াপুরী সংসার-তাপ-তপ্তানাং ভেষজং তীর্থমুত্তমম্।" তুমি সংসার তাপে যতই তাপিত হও, একবার শোক দুঃখ মোহ প্রভৃতির জ্বালায় যতই অস্থির হও, একবার পর্ব্বত প্রাচীর-বেষ্টিত, কুলকুল-নাদিনী পতিতপাবনীর তীরবর্ত্তী সিদ্ধমুনি-সেবিত, প্রকৃতির অপূর্ব্ব লীলা-নিকেতন এই দেবস্থানে গমন করিয়া কিছুদিন গঙ্গার শীতল সলিলে অবগাহন করিয়া, ভগবানকে ডাক,—দেখিবে সকল জ্বালা জুড়াইবে,—প্রাণে শান্তি আসিবে,—হৃদয়ে ভক্তি-স্রোত বহিবে। আর ভগবানের প্রতি চিত্তের গতি ফিরিবে।

হরিদ্বারের মনোরম প্রাকৃতিক শোভা অপূর্ব্ব ও অবর্ণনীয়। এমন নয়নানন্দদায়ক পরম রমণীয় দৃশ্য আর কোথাও আছে কিনা জানি না। যেন প্রকৃতিদেবীর স্বহস্ত রচিত একটী অপূর্ব্ব চিত্র। হরিদ্বারে প্রথম পৌছিয়াই ব্রহ্মঘাটের তীরবর্ত্তী একটী ত্রিতল গৃহে আমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হওয়া মাত্র, মুক্ত বাতায়ন হইতে যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা অপূর্ব্ব। তখন প্রভাত হইয়াছে, চতুর্দ্দিক্ জল স্থল ও পর্ব্বতশৃঙ্গ, উদীয়মান তরুণ-তপনের কনক-কিরণে উদ্ভাসিত। নিম্নে ভাগীরথী কলকলরবে তরঙ্গভঙ্গে নাচিয়া নাচিয়া অবিরাম গতিতে প্রবাহিতা। প্রায় দেড় মাইল ব্যাপিয়া প্রশস্ত বাঁধান ঘাট এবং সোপানশ্রেণী। মাতা জাহ্নবীর নিত্য শীতল প্রখর প্রবাহে উক্ত সোপান-পংক্তি প্রক্ষালিত হইতেছে। শ্রেণীবদ্ধ সুন্দর সুন্দর উচ্চ চূড়াসমন্বিত অট্টালিকা

দেবমন্দির প্রভৃতির শোভাই অতীব মনোরম। আর এই পুণ্যতীর্থে নির্ম্মল প্রভাতে ভক্তি-বিহ্বল অসংখ্য নরনারী স্নান, ভজন, স্তোত্রপাঠ. পূজা-অর্চ্চনা, ধ্যান ধারণার্থ সমাগত। কেহ বা স্নান করিতে করিতে গঙ্গাস্তোত্র পাঠ করিতেছেন। পাঞ্জাবী হিন্দুস্থানী মহিলাগণ সুমধুরস্বরে হিন্দি ভজন গাহিতেছেন। কেহ বা সংকল্প মন্ত্র পাঠ, কেহ বা গো দান, কেহ বা তর্পণ, কেহ বা শ্রাদ্ধ করিতেছেন; কেহ বা সন্ধ্যা আহ্নিক ধ্যান ধারণায় নিরত। সকলেরই মুখে ভক্তির অপূর্ব্ব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিয়াছে; কাহারও মনে কোন কুভাব নাই। সকলেই বলিতেছে 'জয় গঙ্গা-মায়িকা জয়।' কি যেন অপূর্ব্ব দেব-দুর্ল্লভ রত্ন তাহারা পাইয়াছে, তাই সকলেরই মুখে অপূর্ব্ব ভক্তিপূর্ণ ভাব। গঙ্গার ধারে বহু মন্দিরে দেবমূর্ত্তি বিরাজমান; তথায় প্রভাতিক আরত্রিক আরম্ভ হইয়া শঙ্খ ঘণ্টা বাজিতেছে আর সকলে স্নানাদি করিয়া দেবদর্শন করিতেছে; এবং ভক্ত, ভিক্ষুক, অনাথ, সন্ন্যাসী প্রভৃতিকে যথাসাধ্য অন্ন বস্ত্র অর্থ দান করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ করিতেছে। যাত্রিগণের মধ্যে দেখিলাম কাশ্মীর, গুজরাট্, দাক্ষিণাত্য, বঙ্গ-বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, পঞ্জাব, রাজপুতনা প্রভৃতি ভারতের সকল প্রদেশেরই নরনারী এই স্থানে একত্র হইয়াছেন। তন্মধ্যে পাঞ্জাবী যাত্রীর সংখ্যাই অধিক। তীর্থক্ষেত্রে আসিয়া মনে হয়, কে বলে ভারত বিচ্ছিন্ন, কে বলে ভারতে একতার অভাব। চাহিয়া দেখ সকল হিন্দুই এক, সকলেরই এক দেবতা—একই তীর্থ, সকল প্রদেশের—সকল সম্প্রদায়ের নরনারী একই তীর্থে অবগাহন করিতেছেন। একই মহেশ্বরের চরণে -একত্র—একই গঙ্গায় স্নান-জন্য সমাগত।

ব্রহ্মঘাটে গঙ্গা ত্রিধারায় বিভক্ত হইয়া বহিতেছেন।* গঙ্গার ত্রিধারার

* ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের সোপানশ্রেণী প্রক্ষালিত করিয়া একটী ধারা। সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ বা চর বলিয়া প্রবাদ। ইহাই প্রসিদ্ধ "হরকি পৈরি"; মহাদেব এইখানে বসিয়া ধ্যান করিয়াছিলেন। এই চরের সহিত ব্রহ্মঘাট একটী সুন্দর ক্ষুদ্র সেতু দ্বারা সংযোজিত; এবং এই চরটির সহিত ঘাট কৃত্রিম উপায়ে সংযোজিত করিয়া, গঙ্গা প্রবাহকে খতকটা কুণ্ডাকারে পরিণত করা হইয়াছে। হরিৎ-বৃক্ষ-লতা সমাচ্ছন্ন আর একটি বিস্তৃত দ্বীপ গঙ্গার অপর দ্বিধারার মধ্যস্থানে বিরাজিত। উক্ত বৃহৎ দ্বীপের অপর পারে, তৃতীয় ধারার নাম নীলধারা। এই নীলধারা কনখলের নিকট গঙ্গার জলধারার সহিত সম্মিলিত হইতেছেন। নীলধারার উত্তর ভাগে প্রসিদ্ধ চণ্ডীর পাহাড়। সমস্তই ব্রহ্মকুণ্ড ঘাট হইতে ছবির ন্যায় পরিদৃশ্যমান।

প্রবল প্রবাহ এবং সম্মুখস্থ নগরীর পশ্চাৎ ভাগস্থ হরিৎ বৃক্ষরাজি সমন্বিত পর্ব্বতমালার অপূর্ব্ব শোভা যুগপৎ দৃষ্ট হইতেছে। সম্মুখে চাহিয়া দেখ পর্ব্বতের উপর পর্ব্বত, তাহার উপর পর্ব্বত—আকাশ চুম্বন করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। গিরিরাজ হিমালয় ধ্যানমগ্ন ঋষির ন্যায় প্রতীয়মান। পর্ব্বতের তুঙ্গ শৃঙ্গগুলি আকাশের গায়ে চিত্রার্পিতের ন্যায় শোভমান। কেমন করিয়া এই মনোরম দৃশ্যের বর্ণনা করিব জানি না। যেন ভগবৎ-বিভূতি চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতেছে। কি যেন অননুভবনীয় ভগবৎ-সত্তা জলে স্থলে ও ব্যোমে পরিব্যাপ্ত। গঙ্গাশীকর-সিক্ত শীতল সমীরণ হৃদয় মন জুড়াইয়া দিল; দেখিতে দেখিতে আপনাহারা হইয়া গেলাম। পাঠক অধিক আর কি বলিব, এই হরিদ্বারের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের এইরূপ প্রভাব, যে এখানে আসিয়া ইহার চিত্তবিমোহন নৈসর্গিক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দর্শন করিলেই, আপনার সেই বিশ্বস্রষ্টা ভগবানকে আপনিই স্মরণ হইবে এবং হৃদয়ের কলুষ-কালিমা অপনোদিত হইয়া যাইবে। পতিত-পাবনীর নিত্য শীতল পবিত্র সলিলে অবগাহন করিবা-মাত্র আপনার অনুভব হইবে যেন বাহ্য ও অভ্যন্তরের পাপ-পঙ্ক ধুইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিং।

প্রাপ্তি-স্বীকার।

সচিত্র শ্রীমদ্ভাগবত, প্রথম সংখ্যা। শ্রীমৎ নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারী সম্পাদিত; দেবকীনন্দন যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত। মূল্য প্রতি সংখ্যা ॥০ আট আনা। শ্রীভগবানের কথা লইয়াই ভাগবত। ঘোর কলির এই দুর্দ্দিনে ভাগবত-সূর্য্যের পুনরভ্যুদয়ে বড়ই আনন্দিত হইলাম। পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কথা অমৃত স্বরূপ। অতএব ব্রহ্মচারী মহাশয়ের প্রয়াস সর্ব্বতোভাবে প্রশংসনীয়। তবে শ্রীধর স্বামীর ভাষ্যটী থাকিলে আরও ভাল হইত। আর একটী বিষয়ে—ব্রহ্মচারী মহাশয় জ্ঞানের উপর একটু নিদয় বলিয়া বোধ হয়। অতএব এ সম্বন্ধে বারান্তরে বিশেষ সমালোচনার ইচ্ছা রহিল।
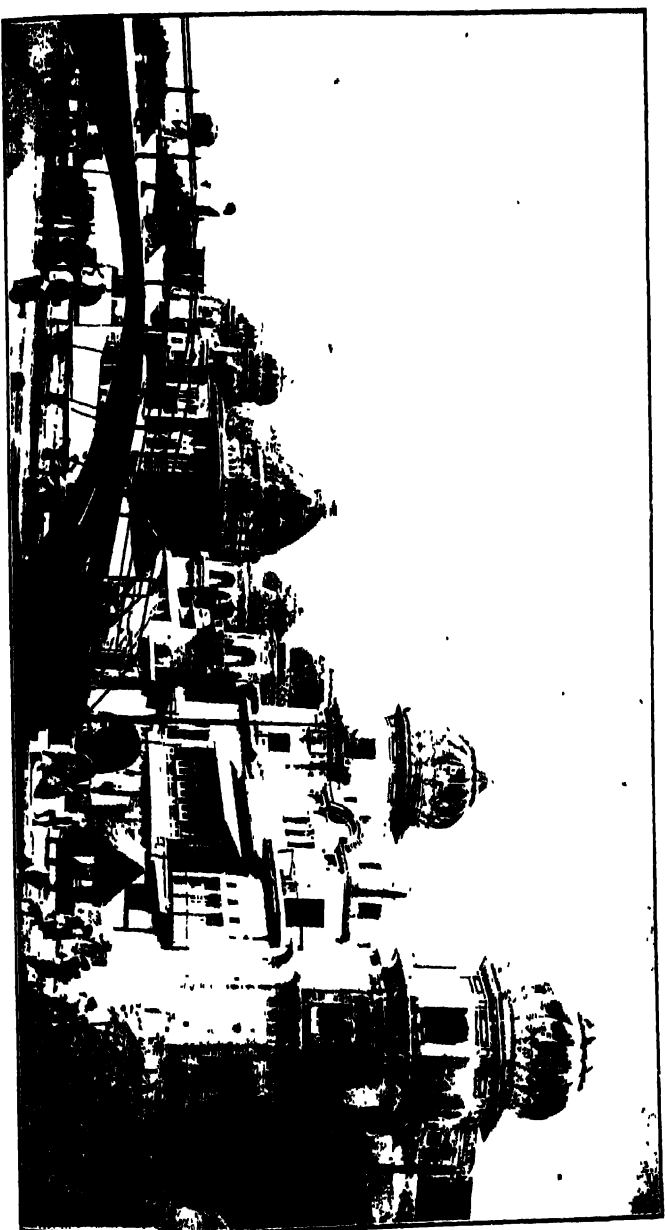
যুগল-রূপ।

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

২য় ভাগ। অগ্রহায়ণ, ১৩২০। ৮ম সংখ্যা

মোক্ষ]

মহাকালী।

(হের) মহেশ-মহাদ্রি' পরে, মহাসুখে নৃত্য করে
মহামেঘ-প্রভা-ঘোরা 'মহাকাল' প্রসবিনী।
(ও তার) রূপরাশি অতুলন, বাক্যে না হয় বর্ণন,
নয়ন হেরিতে নারে সে মহাজ্যোতিরূপিণী॥
(বলি) আঁখি দু'টী মুদি তাই, প্রাণের মাঝারে ভাই,
প্রাণভরি হের সদা সে প্রাণ-প্রতিমাখানি।
(ও তার) কুঞ্চিত কুন্তল রাশি, চরণে লুটায় আসি,
ভালে জ্বলে বহ্নি-শশী নেত্রযুগে দিনমণি॥
(ও তার) ঘন ঘন হুহুঙ্কৃতি, পদভরে কাঁপে ক্ষিতি,
অধরে হাস্যের জ্যোতি জিনি কোটী সৌদামিনী।
(ও সে) চারু চতুষ্টয় করে, নরশির অসি ধরে,
ভকত শরণাগতে বরাভয়-প্রদায়িনী॥
(ও সে) শিরোমালা বিভূষণা, দশনে চাপে রসনা,
রুধির পানে মগনা দিগ্বসনা ত্রিনয়ণী।
(ও তারে) দেবগণ জোড় করে, চারিদিকে স্তুতি করে,
হেনরূপ প্রাণভরে হের দিবস যামিনী॥ গোবিন্দলাল

তোমারি ! তোমারি !!

(১)

গুরুদেব ! হৃদয়েশ ! কিরূপে প্রকাশি,—
যে রাত্রে আকৃষ্ট হৃদে,— লগ্ন চিত্ত তব পদে,
তব প্রেম-স্রোতে পূত দেহজ্ঞান পরাভূত,—
তব পদে অভিরাম, স্তিমিত ইন্দ্রিয় কাম,
সমাপ্ত হইল বুদ্ধি তব রূপে পশি।

বল নাথ কোন মন্ত্রে, কি কৌশলে কিবা তন্ত্রে
চিরাভ্যস্ত দেহ বুদ্ধি 'সর্ব্ব' জ্ঞান নাশি,—
কিরূপে বিশিষ্ট 'মমে' প্রকাশিলে শুদ্ধ 'সমে'
ভেদবুদ্ধি দূর হ'ল মমতার রাশি ;—
স্থূল জ্ঞান অপশরি, দেখি দিব্য দেহ ধরি ;
শীতল রক্ত'আলোকে, উদ্ভাসিত ভুবলো'কে,
লয়ে গেলে বুঝাইলে তত্ত্ব অবিনাশি।

কোন্ শক্তিবশে দেব ! আমিটী পাশরি,
কা'র আকর্ষণে নাথ ! তোমারি ! তোমারি !!

(২)

মনে পড়ে প্রথমেতি সেই লোক মাঝে ;—
প্রকৃতি দেবীর রঙ্গ— ক্ষণে স্থির ক্ষণে ভঙ্গ,
যেন হিমগিরি কূলে, 'অপ্‌তত্ত্ব যথা তুলে',—
নানারূপে নানাবর্ণে, ভাসে স্বর লয় স্ববর্ণে,
কভু লাল কভু শ্যাম, কভু পীত অভিরাম ;
বাষ্পময় জীবকুল বাসনা-ঘন আকুল,—
গন্ধর্ব্ব কিন্নর আদি কত নব সাজে।

বিমুগ্ধ হইল মন, সেই চিত্রে অতুলন,—
রূপের অনন্ত খেলা যথা নিত্য রাজে ;—

হ'লে নাথ অদর্শন, করি আত্মসংগোপন,
বিহ্বল হইল প্রাণ তব অন্তর্ধ্যানে ;
মনে পড়ে ভীত মনে, ফিরি তব অন্বেষণে,
শুনিলাম বাণী তব "কেন এত অভিভব—
হও বৎস ! আছি সদা তব হৃদি মাঝে" ।

(৩)

তবে বুদ্ধি স্থির করি, দেখিনু হৃদয় ভরি,—
মধুময় প্রেমময় ভাবে কে বিরাজে ।
শুনিলাম "বহুরূপে" ভুলিনি তা ত' স্বরূপে ;
"দেখ বৎস ! কিবা তৃপ্তি রূপস্রোত মাঝে"।
"দেখ বৎস ! রূপ-খণি নিত্য শুদ্ধ দিনমণি,
পূর্ণ ঘন সর্ব্বময় পরাৎপর রাজে।"
'রূপ' মোহ পরিহরি, দেখিনু সে লোক ভরি,
'তৎসৎ' এক তত্ত্ব বাসনার মাঝে,—
মদন-মোহন শ্যাম – যাঁহাতে সমাপ্ত কাম,
অচল-প্রতিষ্ঠ কাল, স্বরূপেতে ঢল ঢল,
মহার্ণব প্রেমময়— কি আবেগে উছলয়—
জীব হৃদে বহে সে যে তৃষ্ণারূপে সেজে ।
বল দেব কি কৌশলে কামমুগ্ধে প্রকটিলে,
নিবীড় নীরদ-ঘন কাম অধিরাজে !
কামনায় গতি রাশি, প্রেমেতে নিবারি ;
বাসনায় স্রোত মাঝে রূপ ঘন-রসরাজে,
প্রকটিলে হৃদে নাথ ! সে দিব্য মাধুরী,—
বুঝিয়াছি প্রেমময়,—তোমারি ! তোমারি !!

হৃদয় সখা

হৃদি বংশীবট মূলে কে বাঁশী বাজাও গো ?
বহুদিন যেই জনে,
ভুলিয়া ছিল এ প্রাণে ;
বহুদিন যার কথা মনেতে পড়েনি গো,—
সেই স্মৃতি ভাসে আজি বাঁশরী শুনিয়া গো !
এমন মধুর ধ্বনি, আকুল করিল প্রাণী ;
বিরহ অনলে হৃদি জ্বলিয়া উঠিল গো ;—
দিবস রজনী একি মরম দহন গো !
নীল সাগর জলে,
আকুল তরঙ্গ তুলে ;
আপন মরম ব্যথা কারে সে শুনায় গো ?
আছাড়ি আছাড়ি কারে ;
যাচিতেছে বারে বারে ;
বুঝি অন্তর হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে গো !
বিরহ কাতর স্বরে,
(তাই) নিয়ত যাচিছে তারে
গভীর হৃদয়মূল আকুল করিয়া গো !
ফুল্ল কমল সম,
যে বদন নিরুপম ;
ভুলিয়া পাষাণ সম রয়েছি জগতে গো !
আকাশের নীল গায়ে,
সাগরের নীল তোয়ে ;
নীরব শ্যামল ছায়ে মনে যে পড়িল গো ;—
কাহার সজল দুটি নলিন নয়ন গো !

হৃদয় অমৃতে গড়া,
নয়নে করুণা ভরা ;
জীবনের সাথী সে যে চিরসখা মোর গো—
আমারি মিলন আশে কত সে ব্যাকুল গো !
প্রেমেতে পাগল হৃদি এমন করুণা মাখা,
হেরি নাই কোনখানে তার সমতুল সখা ;
তাই যে হৃদয় মাঝে আদর করিয়া গো,
রেখেছি যতনে আঁকি কমলচরণ গো !
লুকায়ে লুকায়ে থেকে কত ভালবাসে মোরে,
বুঝাতে সে ভালবাসা, কিছুত বলেনা কারে ;
ফুলবনে ফুল হয়ে ঘ্রাণেতে পাগল করে,
পাখী হয়ে কুঞ্জবনে কি মধুর গান করে—
লতা পাতা ফল ফুল,
অনল অনিল জলে—
সব মাঝে সব হয়ে,
বসে আছে কুতূহলে।
কাজল শ্যামল মেঘে, শুভ্র চাঁদিমা রাগে,
তারই পদ নখ হ'তে,
অরুণ কিরণ জাগে।
এমন পাগল সখা, এমন পাগল প্রাণ,
তার লাগি কত প্রাণে,
বেজে উঠে কত তান।
যত শোভা যত সুখ. সবটি সাজায়ে রেখে
সকলের চোখ হ'তে
নিজেকে লুকায়ে রাখে।

এ কেমন খেলা তার,এ কেমন ভালবাসা !
এই দেখি এই নাই,
মেঘেতে দামিনী হাঁসা !
তবু তারে মনে হলে, কত গান মনে আসে,
কত গন্ধ ছুটে ফিরে
মোর এই শ্বাসে শ্বাসে।
ইন্দিবর-কান্তি হর নীলকান্ত তনু গো,—
শত চন্দ্র পদদ্বন্দ্ব, গীতগন্ধ ভরা গো !

ক্ষণেক তরে সে মুখ হেরে,
দুঃখের জ্বালা ভুলেছি গো,—
চাহনি তার ক্ষুরের ধার,
বুকেতে আছে বিঁধিয়া গো !
কত যে ছলে কত কি বলে,
কমল করে পরশে গো,—
"জনম গেল মরণ গেল,
অমর ভেলদাস গো" !

মোক্ষ] সাড়া।

হৃদয় কমল মাঝে,
সাড়া তার পেয়েছি গো !
সাড়া পেয়ে ছুটে ছুটে,
দেখ্‌তে তারে এসেছি গো !
টুক্‌টুকে তার চরণ দু'টি,
দেখ্‌তে বুঝি পেয়েছি গো !
তার চরণ কমল পরশ পেয়ে,
মোর হৃদয় কমল ফুটেছে গো !
আজ তো আমার ভয় কিছু নেই,
অভয় পদ ছুঁয়েছি গো !

বিধি-বিষ্ণু-হরের তাহা,
বাঞ্ছিত পদ বুঝেছি গো !
জনম মরণ ফুরাল মোর,
বিধি বারণ ঘুচিল গো !
এখন ব্যাকুল প্রাণের ছুটাছুটি,
আপনা হতে টুটিল গো !
সখা এসে মোহন বেশে,
হৃদয় দেশে দাঁড়াল গো !
যা পাবার তা' পেলাম সবই,
মনের সাধ মোর মিটিল গো !

মোক্ষ] কোটী ব্রহ্মাণ্ড-সুন্দরী।

বাহ্য নয়ন, করি' নিমীলন,
অন্তরে দেখি চেয়ে ;

অনন্ত চিত নভোমণ্ডল;—
নেত্র কিরণে করি' উজ্জ্বল—
দাঁড়ায়েছে শ্যামা মেয়ে !

চুমি' রাতুল চরণ-যুগল,
স্বজন-তটিনী বহে কল কল;
অসংখ্য তারা-তরুদল,—
উঠিছে—টুটিছে তায়;
কটি বিবসন করি' আবরণ,
দুলিছে মায়ার কুন্তল ঘন,
অঙ্গে জিনিয়া ইন্দু তপন;
মাধুরী উছলি' যায়!

৩

পীযূষ-পূরিত পীন পয়োধর,
নয়ন যুগল করুণা নিঝর;
ভাল—শশধর, হসিত অধর—
ঊষার জনম-ভূমি;
রূপে আলো করি আছ সুন্দরি!
ভোলা ভুলে রয় 'পদতলে' পড়ি',
বিরিঞ্চি হরি মূর্চ্ছিত মরি!
এমনি মোহিনী তুমি!

৪

দেখিতে দেখিতে ওরূপ তোমার,
বহিরন্তর সকলি আমার;
অখণ্ড রূপে হ'ল একাকার,—
মূরতি মিশিল মনে;
মরমে মরমে মুছে গেল রূপ,
রূপ সে হইল রসের স্বরূপ;
চিত ডুবাইল আনন্দ-কূপ—
উথলি' সঙ্গোপনে!

শ্রীভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

মোক্ষ]

কৃষ্ণের বংশীধ্বনি।

বাঁশী বাজে ওই শুনরে।
দিবস রজনী বাজিছে মুরলী,
এস এস বলি ডাকিছে আদরে॥
যে বাঁশী শ্রবণে আকুল পরাণে,
গ্রহ তারাগণ যে আছে যেখানে,
ছুটে দিবানিশি রবিশশী সনে;
অনন্ত গগনে দিগ্‌দিগন্তরে॥
যে বাঁশরী স্বরে সুনীল অম্বরে,
জলধর দল ছুটোছুটি করে;
পবন পরশে ভাসি প্রেমরসে—
চপলা চমকে হাসে উচ্চৈঃস্বরে॥
যে বাঁশীর রবে জলধির জলে,
অবিরল প্রেম-তরঙ্গ উথলে;
সুধা সুললিত আনন্দ কল্লোলে—
দশদিক সুখে সতত মুখরে॥

যে বাঁশীর গানে আত্মহারা প্রাণে,
সরিৎ ধারা ধায় সর্ব্বস্থানে ;
অবিশ্রান্ত বেগে ফিরিছে সন্ধানে,—
প্রাণকান্ত সনে মিলনের তরে ॥
যে বাঁশরী স্বরে ত্যজিয়া ভূধরে,
ছুটিছে তটিনী দেশ দেশান্তরে ;
হায় উন্মাদিনী খর-তরঙ্গিনী,—
নাচিতে নাচিতে মিশিতে সাগরে ॥
যে বাঁশীর রবে নিশীথে নীরবে,
সুরভি কুসুমে পরিমল ঝরে—
মকরন্দ লোভে অন্ধ মধুকর ;
পুঞ্জে পুঞ্জে ছুটে মধুর গুঞ্জরে ॥
যে বাঁশরী ধ্বনি শুনি মহীধর,
দ্রব হ'য়ে প্রেমে যামিনী বাসর,—
ঝর ঝর অশ্রু ফেলে নিরন্তর ;
মহাভাবে মগ্ন বিভোর অন্তরে ॥

যে বাঁশরী ধ্বনি শ্রবণে পশিলে,
শিশু কেঁদে উঠে জননীর কোলে,—
যত ভোলাও তারে কিছুতে না ভোলে;
শুধু ফুলে ফুলে কাঁদিয়া শিহরে ॥
যে বাঁশরী শুনি নবীন কিশোরী,
প্রবাসী পতীর প্রেমানন স্মরি,
আঁখিবারি আর নিবারিতে নারি,—
বসন অঞ্চলে বদন আবরে ॥
যে বাঁশরী স্বরে স্মরি প্রাণেশ্বরে,
ভাবাবেশে ভক্ত সতত বিহরে,—
উন্মত্তের প্রায় কাঁদে উভরায় ;
ছুটিয়া বেড়ায় পর্ব্বতে প্রান্তরে ॥
সঘনে বাজিছে শুন সে বাঁশরী,
চল চল সবে চল ত্বরা করি ;
হেরি গিয়া সেই প্রাণ বংশীধারী,—
প্রাণের নিভৃত নিকুঞ্জ ভিতরে ।

গোবিন্দলাল—

যোগ]　　　　ছায়া।

তোমারি ছায়া, তোমারি ছায়া, তোমারি ছায়া হরি, তোমারি ছায়া !
তোমারি ভুবন মাঝে তোমারি ছায়া !
ঐ নদী ব'য়ে যায়, তুলিয়া মধুর তান ;
ওই হাসে ফুলরাশি, আকুল করিয়া প্রাণ,
সাগরের হৃদে হেরি তোমারি ছায়া !
সুকুমার শিশুবুকে— সরলতা সুখরাশি ;
জননীর স্নেহপ্রাণে প্রণয়ী মধুর হাসি ;
রাখে ধরি নিতি নিতি তোমারি ছায়া !

আকুল-গলিত প্রাণ, বিষাদে কালিমা পারা ;
সেও হাসে স্ব-যাতনা— ভুলিয়া আপন হারা,
হৃদে তার দুঃখে সুখ—তোমারি ছায়া !

সুনীল আকাশ পটে, গলিত জলদ জলে ;
সমীরণ সুধা স্বরে— তারকার ফুলদলে ;
শশধর শিতকরে তোমারি ছায়া !

যা দেখি তোমারি হরি ! সকলি তোমারি কোলে ;
তবগুণ গাই মোরা বসিয়া তোমারি কোলে,
সকলেতে আলোময়ী তোমারি ছায়া,

রসময়

ধর্ম্ম]

মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

শ্রীভগবানের সঙ্গে আমাদের এই যে নিত্য অচ্ছেদ্য একটি সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিয়া যাইতে হইবে। শুধু লোকের কথায় নহে, তিনি যথার্থই যে আমার অন্তরের অন্তরতম, তাহা অনুভব করিতে হইবে। এই উপলব্ধি শুধু কবিতার মধ্য দিয়া বুঝিলে চলিবে না, আপনার অন্তরের নির্ম্মলতার মধ্যে বুঝিতে হইবে। ঐশ্বর্য্যের বিলাসের মধ্যে নহে—দুঃখের কঠোরতার মধ্যে ; জীবনের শান্ত স্নিগ্ধ উষায় নহে—মৃত্যুর ভীষণতার মধ্যে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে যে যথার্থই তুমি আছ—তুমি আছ। তুমি আমার প্রাণের মধ্যে আছ—আমার মনের মধ্যে আছ—আমার সাধনার মধ্যে আছ - আমার সিদ্ধির মধ্যে আছ—আমার আয়োজনের মধ্যে আছ—আমার সফলতার মধ্যে আছ। শুধু বিশ্বাসে নহে—তুমি প্রত্যক্ষের গোচরে আছ।

জননী সন্তানের পক্ষে কতটা প্রয়োজনীয়, জননীর অসীম—অকৃত্রিম স্নেহ, তাঁহার পরম নিঃস্বার্থপরতা, আমরা বাল্যকালে বড় একটা বুঝিতে পারি না ; বুদ্ধি পাকিলে তারপর বুঝি। কিন্তু তবুও বাক্যহীন, চলচ্ছক্তিহীন, জ্ঞানহীন, শিশু কোন্ মন্ত্রবলে জননীকে নিতান্ত আপনার বলিয়া জানিতে পারে, কিসে

সে অটল নির্ভরের সহিত জননীর ক্রোড়েই অসীম তৃপ্তিলাভ করে? শিশুর নিকট জননী যেমন সহজ সত্য, ভগবান্‌ও ভক্তের নিকট সেইরূপ সহজ সত্য। ভক্ত না বুঝিয়াও ভগবানকে আপনার বলিয়া জানিতে পারে, তাঁহাকে ভিন্ন আর কিছুতেই তাহার আকাঙ্ক্ষা নাই—তিনিই তাহার পরম আশ্রয়। প্রতি-দিনের পান ভোজনের ন্যায় ভক্তের নিকট ভগবান্ নিত্য সত্য ও প্রয়োজনীয়॥

মানুষ সাধারণতঃ চায় কি? ঐশ্বর্য্য, রূপ, সুখ, সম্মান, যশ; কিন্তু এ সমস্তই পূর্ণমাত্রায় শ্রীভগবানে অবস্থিত। তা ছাড়া যে ঐশ্বর্য্য, সুখ, সম্মানের জন্য আমরা সমস্ত জীবনে হানাহানি করি, তাহাই বা পাই কই? সমস্ত জীবনটা কেবল সুখ সম্পদের মরীচিকার পিছনে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াই। সত্য ও নিত্য সুখকে কোন দিনই দেখিতে পাই না। জগতে যে যৎকিঞ্চিৎ সুখ-সৌন্দর্য্য আছে, তাহা সেই নিত্য সুখ-সৌন্দর্য্যের আভাস মাত্র। ছায়ার জন্য যদি লোকে এত পাগল হয়, না জানি সত্য পদার্থকে দেখিলে লোকের কি দশা হয়? এই জন্যই জগতের সমস্ত ভক্তরাই সাধ করিয়া দুঃখ, দৈন্য, পীড়ন, লাঞ্ছনার পশরা শিরে বহন করিয়া বৈকুণ্ঠ-পথের যাত্রী হয়; এবং এই জন্যই কুল, মান, লজ্জা ত্যাগ করিয়া গোপাঙ্গনারা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার মিলনের অভিসারিণী হইয়াছিলেন। কত ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ, কত সদ্‌বিদ্বান্ পুরুষ, একবার তাঁহার 'সাড়া' পাইয়া ঐশ্বর্য্যমানকে নিষ্ঠীবনের মত ত্যাগ করিয়া বিরহ-ব্যাকুল প্রাণে আপনার অভীষ্ট দেবতার অনুসন্ধানে ধাবিত হইয়াছেন। ইহা পাগলামী নয়, সত্যই তাঁহাতে এই মিষ্টতা আছে। এতই সৌন্দর্য্য ভরা—এতই মাধুর্য্য মাখানো—তিনি, যে তাঁর সঙ্গে জগতের কোন বস্তুরই আংশিক তুলনা হয় না। পৃথিবীর ভোগ সুখ দুদিনে ফুরাইয়া যায়, ক্ষণেকের মধ্যেই ভোগের মিষ্টতা দারুণ দুঃখরূপে দেখা দেয়; কিন্তু ভগবৎ-মাধুর্য্য সম্ভোগে কোন অবসাদ আসে না, কোনদিন অনিচ্ছাও আসে না। যত ভোগ করা যায়—ভোগলালসা আরও বাড়িয়া যায়; ভক্তও পক্ষান্তরে ভগবানকে ভোগ করিয়া শেষ করিতে পারেন না। তিনি যতই ভোগ করেন, ততই নবীনতর শোভায় ভগবান্ ভক্তকে মুগ্ধ করেন। ভক্ত তখন ভগবানের রূপরাশি ও হৃদয়-মাধুর্য্যের কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলেন,—"জনম অবধি হাম্ রূপ নেহারিনু, নয়ন না তিরপিত ভেল। লাখ লাখ যুগ হিয়া মাঝে রাখনু, তবু হিয়া জুড়ন না গেল॥" গোপাঙ্গনারা ভগবানকে বলিয়াছিলেন,—

"চিন্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু যন্নির্বিশত্যুতকরাবপি গৃহ্যকৃত্যে।
পাদেঽপদং ন চলতস্তব পাদমূল্যাদ্, যামং কথং ব্রজমথো করবাম কিংবা॥"

তাই বলিতেছি পৃথিবীর কোন্ সুখটি ভগবানের সমান! ভগবান্ এই লোকে এবং লোকান্তরে বিরাজমান। এই সংসার কতবার গড়িবে ও ভাঙ্গিবে। আমি কতবার যাইব আসিব—কতবার এই সূর্য্য চন্দ্র নূতন হইয়া আসিবে; তবু তিনি সেই চির সুকুমার, চির সুকোমল, আনন্দের মাধুর্য্যের নিত্য নব উৎস। চির নবীনতায় তিনি চিরদিন বর্ত্তমান!

সমস্ত বিশ্বের সুর প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বাজিয়া যাঁহার চরণতলে মূর্চ্ছিত হইতেছে, তোমার আমার হৃদয়ও একদিন সেই অমল ধবল জ্যোতিতে বিলীন হইবেই হইবে। ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর সমুদ্রবক্ষ ছাড়া আর গতি কোথায়? তাই বলিতেছি, এস ভাই বন্ধু যে যেখানে আছ, এস সকলে মিলিয়া তাঁহার শমন ভয়-বারণ অভয় চরণাম্বুজে শরণ গ্রহণ করি। মৃত্যু অনিবার্য্য, যদি মরিতেই হয়, তাঁহারই চরণে এস ভাই আমাদের মরণ যাচিয়া লইয়া এই বহু ভার-পীড়িত—জন্ম-মৃত্যু-ত্রাসিত—শোক দুঃখে ক্ষত বিক্ষত—তাপিত প্রাণকে শীতল করি!

আমরা কেহ কেহ ভগবানকে পর্য্যন্ত ঠকাইতে চাই; তাই নিজের দুর্ব্বলতা গোপন করিয়া লোকের কাছে সাধু সাজিতে চাই! ইহাতে কোন লাভই হয় না, মাঝে হইতে আমাদের উন্নতির পথ আরও কণ্টকাকীর্ণ হইয়া উঠে: যাহারা লোকের চক্ষে ধূলা দেয়, তাহাদের বিশ্বাস তাহারা ভগবানকেও ফাঁকি দিতে পারে! কিন্তু কেন এ বাতুলতা! বরং একথা বলা কি সহজ নয় "প্রভো! আমরা দুর্ব্বল, আমরা অক্ষম, আমরা দীন, আমরা অশরণ—তোমার শরণ লইতেছি, আমাদের রক্ষা কর"। আমরা যে কত ছোট, আমরা যে কত দুর্ব্বল, তা' কি তিনি জানেন না? তিনি কি নির্ম্মম মনে কেবল "মাপ-কাটীতে" ওজন করিয়া করিয়া আমাদিগকে ফল বিধান করেন? ইহা কখনই সম্ভব নয়। তা' হ'লে কি কোনদিন লোকে পাপমুক্ত হইতে পারিত?

এ সংসারে হয়ত একটু সুখ আছে, কিন্তু দুঃখেরও সীমা নাই। আশা আছে, কিন্তু নিরাশারও অগাধ জলধি। তাই এই ভালমন্দ, সুখ দুঃখ, শান্তি অশান্তির রৌদ্র ও ছায়ার হাত হইতে কিসে ত্রাণ পাওয়া যাইতে পারে, ইহাই

জীবের চিরন্তন লক্ষ্য। তাহার জীবন জগতের ঐশ্বর্য্য, সৌন্দর্য্য, দুঃখ, দৈন্যের বৈদ্যুতিক অভিনয়ে তৃপ্ত নয়। সে চায়—চির স্থির, চির সুকোমল স্থান, যেখানে গিয়া সে একটু জুড়াইতে পারে—তাই সে সংসারের ঘাত প্রতিঘাতে বলিয়া উঠে—"এসব কিছু নয়. তুমিই সব, তুমিই আমাদের সর্ব্বস্ব।"

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং
পতিং পতীনাং পরমম্ পরস্তাদ্।
*   *   *   *
"ত্বমেব মাতা পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুঃ সখা ত্বমেব।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্ব্বং মম দেব দেব"॥

ভক্তের এতাদৃশ অবস্থায় সংসারের সুখ দুঃখ আর গায়ে লাগে না; ভক্ত শুধু প্রাণের দেবতাকেই চায়: তাঁহাকেই আত্মসমর্পণ করিয়া সে নিশ্চিন্ত। ভক্ত তখন বলেন,—

"সুখ সম্পদে করিহে পান তব প্রসাদ-বারি
দুখ-সঙ্কটে পরশ পাই তব মঙ্গল হাত॥
জীবনে জ্বাল অমর দীপ তব অনন্ত আশা,
মরণ অন্তে হোক তোমারি চরণে সুপ্রভাত॥
লহ লহ মম সব আনন্দ, সকল প্রীতি গীতি,
হৃদয়ে বাহিবে একমাত্র তুমি আমার নাথ"!

সময়ে সময়ে ভক্তকে তিনি পরীক্ষা করেন; কিন্তু সে পরীক্ষা এই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার মত নহে। একজন গুণজ্ঞ স্বর্ণকার যেমন স্বর্ণকে প্রদীপ্ত অনলে জ্বালাইয়া আরও স্বর্ণের ঔজ্জ্বল্য বর্দ্ধন করেন, তদ্রূপ শ্রীভগবান্ ভক্তকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলিয়া তাহার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কালিমাটুকু মুছাইয়া তাহার উজ্জ্বল দীপ্তি জগতের সমক্ষে ধরেন; নচেৎ ইন্দ্রত্ব যাইবার ভয়ে ভক্তকে কঠোর পীড়নে ক্ষত বিক্ষত করিয়া তাহার আশা-বীজকে অঙ্কুরে ধ্বংস করেন না।

অনেকে বলেন, ডাকিয়া তাঁহার 'সাড়া' পাওয়া যায় না. কিন্তু এর চেয়ে

মিথ্যা কথা আর হইতে পারে না। যে তাঁহাকে ডাকিয়াছে, সেই তাঁহার সাড়া পাইয়াছে; যে আশ্রয় মাগিয়াছে, সেই তাঁহার অসীম করুণা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে। ভাবিয়া দেখুন কয়জনে আমরা যথার্থ প্রীতির সহিত, যথার্থ প্রাণের সহিত তাঁহাকে ডাকিয়া থাকি? কোন কাজ করিতেই আমাদের অবসরের অভাব নাই, সকল বিষয়েই আমাদের বেশ হিসাব আছে; কিন্তু ভগবানের দিকে সমস্তই শূন্য। আমরা পার্থিব ধন সম্পদের জন্য যে চেষ্টা করি, ফলে ধন সম্পদ্ লাভও করি। কিন্তু কয়দিন তাঁহার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমে, কয়দিন ক্ষুধার্ত্তের উদ্বেগের, পিপাসাতুরের জল চাহার মত, তাঁহাকে চাহিয়াছি? না, তাঁহাকে একদিনও সেরূপ ভাবে চাহিলে, তিনি 'সাড়া' দিতেনই। আমরা চাহিয়াছি ধন, জন, সুখ,—তিনি তাহা ত' অনবরত ঢালিয়া দিতেছেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"—তাঁ'র একথা তিনি রক্ষা করিয়াছেন। আমরা সর্ব্ব ধর্ম্ম, সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, তাঁহার শরণাগত হইতে পারিলাম কই? সুতরাং জলরাশির মধ্যে বাস করিয়াও আকুল তৃষ্ণায় ছট্‌ফট্ করিয়া মরিব না ত' কি হইবে? কোন দিনই ত' তাঁহার চরণাশ্রয় করিলাম না, তবে কোথা হইতে শুনিতে পাইব যে তিনি বলিতেছেন "ভয় নাই, ভয় নাই"—"অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।" হা হতভাগ্য জীব! তুমি আর কোন্ মুখে কথা বলিবে? তোমার জন্য তিনি সবই করিয়াছেন; তাঁহার জন্য তুমি কিছুই'কর নাই!!

তবুও তিনি ত' 'সাড়া' দিতেছেন, কতবার 'উঁকি ঝুকি' দিতেছেন; আমরা তাকাইয়া দেখি কই? এই যে পিতামাতা, বন্ধু, ভ্রাতা, ভগ্নী, তনয়, দুহিতা, পতিপত্নী, দাস দাসীর মধ্যেও তাঁহার হৃদয়ের নিদর্শন পাইতেছি। আবার এই গ্রহ, নক্ষত্র, চন্দ্র, সূর্য্য, আকাশের মধ্যে,—নদনদী, সাগর, সলিল, অনল, অনিলের মধ্যে তাঁহার প্রদীপ্ত সুন্দর মুখখানি ফুটিয়া উঠিতেছে, আমরা কি তাহা দেখিতে চেষ্টা করিয়াছি? তিনি ত' আমাদের প্রত্যক্ষের মধ্যেই, কিন্তু আমরা কি জঘন্য লোভে, কি উৎকট দুরাকাঙ্ক্ষায় তাঁহার অসীম মর্য্যাদাকে পদে পদে লাঞ্ছিত করিতেছি! বাস্তবিক তিনি 'দূরাৎ দূরতর' নহেন, তিনি নিতান্ত নিকটেই রহিয়াছেন!

সমস্ত বাসনার মোহ ছাড়াইয়া যখন একমাত্র শ্রীভগবানকে লাভ করাই অদ্বিতীয় লক্ষ্য হইয়া পড়ে, তখন তিনি আপনি আসিয়া অঙ্কে তুলিয়া ল'ন।

সুতরাং আমাদের সকলকেই ক্ষুদ্র বাসনা বিবর্জ্জিত হইতে হইবে। নিজ নিজ কাম-সঙ্কল্প সম্ভূত স্বার্থরাশিকে বিসর্জ্জন দিতে হইবে, হৃদয়ে প্রীতিবৃত্তির অনুশীলন করিতে হইবে। কণামাত্র স্বার্থ থাকিতে 'তিনি' ধরা দিবেন না। তবে চেষ্টাশীল ভক্ত হইলে তিনি পিছনে পিছনে থাকিবেন, দুই এক বার 'উঁকি' দিবেন, চোখের সাম্‌নে দৌড় দিবেন—কিন্তু স্পষ্ট ধরা দিবেন না।

তাই খুঁটিয়া খুঁটিয়া হৃদয়ের দুর্ব্বলতাগুলি বাছিয়া ফেলিতে হইবে, সাধনে দৃঢ়প্রযত্নশীল হইতে হইবে, উৎসাহের সহিত সদভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতে হইবে, তবে যেমন ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মহারণ্যের মধ্যে সিংহকে দেখা যায়, তদ্রূপ এই হৃদয়ের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পাইবে।

স্বার্থপরতার অভিনয় আমাদের চারিদিকে ; স্বার্থত্যাগ আমাদের পক্ষে বড় কঠিন, আমরা এক পা অগ্রসর হই ত' দশ পা হটিয়া আসি, এইখানে আমাদের সতৃষ্ণ অন্বেষমান দৃষ্টিকে নিরন্তর জাগ্রত রাখিতে হইবে। কখনও ঘুমাইব না, অতন্দ্রিত ভাবে নিরন্তর তাঁহাকে অন্বেষণ করিতে থাকিব। তাঁহার 'সাড়া' পাইবই পাইব।

জননী প্রথমতঃ ছেলেকে ভুলাইয়া তাহার হাতে একটা খেলনা দিয়া অন্যান্য সংসারের কাজ সারিয়া ল'ন। যতক্ষণ ছেলে না কাঁদে, ততক্ষণ জননী তাহাকে ফেলিয়া অন্য কাজে মনোযোগ দিতে পারেন। কিন্তু এমন বেয়াড়া ছেলেও আছে, যাহারা কিছুতেই ঘুমাইতে চাহে না। যতক্ষণ জননীর ক্রোড়ে আছে, ততক্ষণ বেশ চুপ করিয়া থাকে, যেমনি ক্রোড় হইতে নামাইয়া দেওয়া অমনি চীৎকার করিয়া উঠা। এই সকল শিশুদের নিকট জননীদের ফাঁকি একেবারেই চলে না। আমরা কি জগজ্জনীর সেইরূপ কাঁদুনে ছেলে হইতে পারিব না ? যেমনি তিনি ঘুম পাড়াইয়া ফেলিয়া যাইবেন অমনি কাঁদিয়া উঠিব তাহা হইলে বিশ্বজননীও আমাদের কোল হ'তে ফেলিয়া যাইতে পারিবেন না—আমরা তখন নির্ব্বিবাদে জননীর ক্রোড়ে শান্তি মগ্ন হইয়া অমৃত স্তন্য পান করিয়া অমর হইতে পারিব।

মা ত' সকাল হইতে না হইতে ক্রোড় হইতে নামাইয়া দিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়াছেন ; আমরা এ কি সংসার খেলনায় মুগ্ধ হইয়াছি, এ কি বিড়ম্বিত হইয়াছি। এদিকে যে সন্ধ্যা হইয়া আসিল, ধীরে ধীরে রাত্রির অন্ধকারে চারিদিক অস্পষ্ট হইয়া উঠিল—এখনও কি ভাই তোমাদের খেলা ভাঙ্গিবে না ? অন্ধকার

ক্রমেই ঘন হইয়া আসিতেছে,—যাইবার পথ ক্রমেই অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিতেছে—খেলীদের সাড়া শব্দ নাই। চারিদিকে বন্য পশুদের চীৎকারে কর্ণ বধির হইয়া উঠিতেছে। দিগন্ত তিমিরাবৃত, কণ্টকক্ষত রক্ত বিগলিত, ওরে পথ-হারা! ওরে জ্ঞানহীন! এখনও তোর চৈতন্য হইল না? এখনও শোন ঐ অদূরে মার মন্দিরে দামামা বাজিতেছে, শঙ্খ ঘণ্টার নিনাদে মার আরতির দীপ আজ কি শোভন ভাবে জ্বলিয়া জ্বলিয়া উঠিতেছে। একবার ঐ শব্দ শুনিয়া বল "মা আমার খেলা সাঙ্গ হইয়াছে, আর খেলিব না; এখন এই রাত্রি বেলায় আঁধার ছায়ায় আর খেলিতে মন উঠেনা,—এখন তোমার নিখিলশরণ চরণতলে ডাকিয়া লও।"

মাগো! অনেক খেলিয়াছি, খেলিয়া খেলিয়া বড় শ্রান্ত হইয়াছি,—একবার তোমার শান্তিভরা সুপ্তিমাখা মুখখানি লইয়া আমার কাছে দাঁড়াও—মাগো খেলিতে খেলিতে সব ভুলিয়া গিয়াছি, আর ভুলাইও না। একবার অন্ধকার মথিত করিয়া, দিব্য সাজে সাজিয়া তোমার হাসির বিকাশে আমার হৃদয়ের আনন্দ-উৎস ছুটাইয়া দাও। দিগ্‌দিগন্ত তোমার অসীম সৌন্দর্য্যে ভরিয়া উঠুক, নয়নের ধাঁধা মিটিয়া যাউক। বিশ্ব ব্যাপিয়া জগৎমোহিনী সাজে জগজ্জননী একবার ক্লান্ত ভক্তের হৃদয়-দেশে দাঁড়াও মা! আমার সমস্ত চিত্ত আজ গাহিয়া উঠুক;—

"অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য,
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ।
ত্বমেকা গতির্দ্দেবি নিস্তারদাত্রি,
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
লীলাবচাংসি তব দেবি ঋগাদি বেদাঃ,
সৃষ্ট্যাদি কর্ম্মরচনা ভবদীয় চেষ্টা।
তত্তেজসা জগদিদং প্রতিভাতি নিত্যং,
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে ক্ষুধিতায় মহ্যম্॥"
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং,
ন জানামি তন্ত্রং ন চ স্তোত্র-মন্ত্রম্।
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসযোগং,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং ত্বমেকা ভবানি॥

বিজয়া।

"ওই যে মিলায়ে গেল ব্যোম সিন্ধু বারি মাঝে,
আমার হৃদয়-ইন্দু, মৃগেন্দ্র-বাহিনী-সাজে ;
তিন দিন দিবারাতি—
সে চারু চন্দ্রিকা-ভাতি,
উজলিল আমার এ ম্লান শৈল-নিকেতন ;
মুখরিল আমার এ বিজন হৃদয়-বন।
তিন দিন দিবারাতি—
কি কাজে ছিলাম মাতি,
চির অবসরে মোর না মিলিত অবসর ;
রন্ধ্রে রন্ধ্রে নিনাদিত উৎসবের সমস্বর।
সম্বৎসর ডাকে না ব'লে—
মা যে কত মা ! মা ! বলে,
কাজেতে অকাজে আমি কত ছুটে ছুটে যাই ;
আনন্দে আনন্দ হেরে কত না আনন্দ পাই।
বীণাপাণি বীণাকরে—
কতই সে ব্যস্ত ক'রে,
শুনাইত গীতবাদ্য. দিবারাত্র নাহি মানি ;
আলয় করিত আলো সকল শোভার রাণী।
গজাননে ষড়াননে—
মাতিত বিচিত্র রণে,
আমার এ কোল ল'য়ে করিত কি কাড়াকাড়ি ;
সাথে সাথে বেড়াইত করিয়া কি আড়াআড়ি।
লম্বোদর করি-করে—
বিলম্বিত বাহু ধ'রে,
ছুটে ওঠে, করিবারে গলদেশ অধিকার ;
এসে জুড়ে বসে প্রখর অনুজ তার।

তিন দিন গেল হায়—
তিনটি নিমেষ প্রায়,
আজি শূন্য নিকেতনে ব'সে আছি শূন্যমনে ;
বিষণ্ণ বিজন বায়ু কাঁদিছে মরম সনে।
মৈনাক-বিহীন গেহ—
স্পন্দহীন জড়দেহ,
আবার হৃদয় মাঝে আনিছে শ্মশান ছায়া ;
ব্রহ্মাণ্ড জুড়িয়া বুলে ব্যাকুল মায়ের মায়া।
এই যে তাম্বুল রাগে—
রঞ্জিলাম অনুরাগে,
তার সেই ওষ্ঠাধর,—উষাস্পৃষ্ট বিম্বফল ;—
অঞ্চলে মুছায়ে নিনু হিঙ্গুল চরণতল।
এই কানে কানে তারে—
বলিলাম আসিবারে,
এই সে বলিয়া গেল 'আসিব,—কেঁদ না আর' ;
চরণের ধূলা আছে,—কোথায় চরণ তার ?
কেমনে, হে গিরিরাজ !
থাকিব এ গৃহমাঝ,
দীর্ঘ দীর্ঘ দিন ধরি, আবার বরষ ব্যাপি ;
জীবন-জীবনী বিনা কেমনে জীবন যাপি।"
বাড়িছে দশমী নিশি—
রাণী চাহে দিশি দিশি,
প্রাণের করুণ বাণী উঠে দিশি দিশি ব'য়ে ;
ঈশান পাষাণ হ'য়ে ঈশানীরে গেছে ল'য়ে।
আজি ঈশানের বাস—
আনন্দেতে স্বপ্রকাশ,
আনন্দের খনি মাঝে শুধু ছায়া পড়িয়াছে ;
হৃদয়ের আকুলতা উছলিছে পতি কাছে।

"আমি আশুতোষ বামে—
আজি এ আনন্দধামে,
আমার জননী কেন আনন্দ নাহিক জানে?
কে করিবে শান্ত তারে সে আনন্দ অবসানে?
সে যে শূন্যে চেয়ে আছে—
যাব দুঃখিনীর কাছে,
আমারে বিদায় দাও এ আনন্দপুরী হ'তে;
কিসের আনন্দ, যদি নিরানন্দ ও জগতে?
ছেড়ে দাও বিশ্বনাথ—
সেথা মলিনের সাথ,
আমি ম্লান হ'য়ে রব, তা'রে বুকে জড়াইয়া;
অন্তরে ক্রন্দন যদি, কি হবে আলোক নিয়া?
আমারে ক'রেছে যারা—
দু'টী নয়নের তারা,
আমার জীবন কিগো তাহাদের কাঁদাবারে?
ভগ্ন হৃদয়ের সনে, ছেড়ে দেও কাঁদিবারে।
ওই সে বিজন গেহে—
জননীর ব্যর্থ স্নেহে,
উঠিছে মৈনাকহীন হৃদয়ের হাহাকার;
কে করিবে স্তব্ধ ওই চিরক্ষুব্ধ পারাবার?"
শুনি' আশুতোষ কয়—
"তুমি শান্তি বিশ্বময়,
তোমার(ই) পরশে আমি চিরতৃপ্তি-শান্তিময়,
তোমার(ই) প্রসাদে হয় সকল অশান্তি ক্ষয়।
তুমি হৃদয়ের মাঝে—
আছ আনন্দের সাজে,
শান্তিরূপা সুরধুনী বিরাজিছ শির'পরে;
তোমার(ই) শীতল ধারা তাপিতে শীতল করে।

ঝর-মুক্ত করুণায়—
প্লাবি' ব্যোম বসুধায়,
অশান্তকে শান্ত কর, তৃপ্ত কর তৃপ্তিহীনে ;
মহাধনে ধনী কর, মহাবিত্ত-হীন দীনে।
অমৃতের এ সিঞ্চন—
পুরাইবে আকিঞ্চন,
সে বাঞ্ছিত পরিবারে, এখনি বসিবে ঘিরে ;
চিরশূন্য পূর্ণ করি' মৈনাক আসিবে ফিরে।"
শিবহৃদি উথলিল—
জটাজালে আলোড়িল,
সন্তাপ-হারিণীরূপে বরষিল হিমধারা ;—
চন্দ্রিকা প্রদীপ্ত নীরে তারকা-প্রপাত পারা।
হাসিছে দশমী নিশি—
হরগৌরী বহে মিশি,
প্রতি জলবিম্বে তার,—পূর্ণ প্রীতি পারাবার ;
বিশ্বপ্রেমে বিগলিত বিশ্ব-ক্ষেম-মূলাধার ;
সে মিলের অন্ত নাই—
সে প্রেমের সীমা নাই,
সে স্রোতের বাধা নাই, অচল ভাসায়ে' চলে ;
একটী মৃণাল'পরে ফুটায় অনন্ত দলে।
ধর বিশ্ব ! এই সুধা—
মিটাও সকল ক্ষুধা,
আশ্রয় আনন্দ তিনি, অভয় কল্যাণ তিনি,
শান্তি তিনি, তৃপ্তি তিনি, সকল কল্যাণ জিনি।
শান্ত কর সব রোল—
আজি বিশ্বে দাও কোল,
আনন্দ-দিবার শেষে,পড়েছে ভক্তির ছায়া ;—
শান্তিবারি-নির্ঝরিণী বিজয়ার মহামায়া।

অম্বরে তারকা মেলা—
সাগরে তরঙ্গ-খেলা,
অঙ্গে অঙ্গে বাঁধা সব এক মহামন্ত্র-বলে ;
স্পন্দিছে একই প্রাণ এক মহাবক্ষঃস্থলে।
খোল' হৃদয়ের দ্বার—
ডাক বিশ্ব পরিবার,
এ মহা-মণ্ডপে সবে বস একে একাকার ;
মহা পুরোহিত শিরে ঢালুক ত্রিদিব ধার।
দূর কর রাগ দ্বেষ—
ভেদ-দ্বন্দ্ব কর শেষ,
এক জননীর এ যে অবিভক্ত পরিবার ;
এক রস-গন্ধ-স্নিগ্ধ অনন্তের পুষ্পহার।
আকাশে আশার ভাস—
যাক শঙ্কা, যাক ত্রাস,
পবন আসুক ব'য়ে চিরন্তন অনাময়,
অরোগ-অশোক-শুদ্ধ-প্রবুদ্ধ জীবনময়।
হর, দেবি ! সর্ব্ব শাপ—
আধি, ব্যাধি, পাপতাপ,
হর এই জীবনের জটিল জঞ্জাল যত ;
সরল অমল তৃপ্ত ক'রে রাখ অবিরত।
সিঞ্চ সুধা ঘরে ঘরে—
প্রাসাদ কুটীর'পরে,
রুগ্ন-শয্যা স্নিগ্ধ ক'রে, ভগ্নহৃদি যুক্ত ক'রে ;
সর্ব্ব দৈন্য পূর্ণ ক'রে, সর্ব্ব ক্লৈব্য মুক্ত ক'রে।
এস শান্তি ! হৃদিমর্ম্মে—
এস শান্তি ! সর্ব্বকর্ম্মে,
সফল নিষ্ফল ব্রতে রাখ চিত্ত-সমতায় ;
অপ্রমত্ত প্রসাদের চিরস্থায়ী স্থিরতায়।

আজিকার অনুভূতি—
অতীতের স্মৃতি স্তুতি,
ভবিষ্য-আশার দ্যুতি—কর সব শান্তিময়;
এস কাল জয় করি ত্রিকালের সমন্বয়।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র মিত্র

—*—

সমস্যা।

দশ মাস দশদিন জননী জঠরে,
সুকোমল চর্ম্মাবাসে, অম্বুরাশি মাঝে,—
দোদুল্য আছিনু যবে, অন্ধকার—
লেগেছিল ভাল।
বসুধার অঙ্গস্পর্শে,
মেলিনু নয়ন যবে, হেরিনু আলোকে;
ফুকারিয়া কাঁদিলাম হৃদয় আবেগে :—
"দয়াময় নিয়ে চল আঁধারে আমায়,
সহিতে নারিব এই করুণা উত্তপ্ত তব"—
নীরব—নীথর সব স্তব্ধ যেন,—
দূর অতীতের কথা!
নিশি, দিন, বর্ষ, মাস, ক্রমে কেটে গেল,
সেই আলো অত তীব্র—অত ঝলসিত,
কি এক অমিয়া মাখা কর প্রসারিয়া;
ঘন হ'য়ে ঘনতর দৃঢ় আলিঙ্গনে—
বাঁধিল অন্তরে তার।
শিথিল হইল অঙ্গ,
যেন কোন্ বিদ্যুতের রেখা প্রবেশি';
হৃদয়ে মোর, ভাসাইল শীর্ণ দেহখানি—
আনন্দে বিভোর—আনন্দ উৎসে।

সন্তরিনু চারিদিকে, ঘাত প্রতিঘাতে—
কভু ভাবি, এইখানে মরি যদি ভাল ;
কখন বা রক্তাক্ত কপোলে, স্ফীত বক্ষে—
কহি উচ্চৈঃস্বরে—'কে কোথায় ধাতা বিধাতা' !
কে করে সন্ধান ? সব মিথ্যা—
পিও সুধা প্রাণ ভরে, ভেসে যাই এসো,—
প্রাণে প্রাণে মিশি, এই আলো—এই স্রোত মাঝে ?
স্রোত যেন মন্দ হ'য়ে এলো,—
কম্পিত হৃদয় ল'য়ে স্তিমিত নয়নে,
ক্লান্ত দেহে,—স্খলিত চরণ বাহি -
চলিনু আকুল প্রাণে যেন কারে চাহি ;
কাঁদিলাম পুনঃ—
কে আমায় ব'লে দিবে,—
কোন্ দিকে পথ ? কোথা সেই অন্ধকার,
শান্তি যথা অবিচ্ছিন্ন, শরীর অটুট—
মন প্রাণ বিভোর যথায় ? প্রাণ ফেটে
যায়, কেগো তুমি অন্তরালে হেরি মোরে,
জীবন সংগ্রামে, নিশ্চিন্ত নিশ্চল হ'য়ে
কঠোর নিয়তি চক্র হেরিতেছ স্থির ?
দৈববাণী হ'ল কোথা থেকে !
শিহরিল হৃদয় আমার, কর্ণ দুটী
হ'ল স্থির, কম্পন থামিয়া গেল, স্থির
চক্ষে রহিনু চাহিয়া—
"শান্ত, বৎস হ'য়োনা অধীর—
কর্ম্মস্রোতে মুগ্ধ হ'য়ে, হারাইয়া
বিবেক তোমার,—উন্মাদ হ'য়েছ তুমি !

স্থিরচিত্তে রহ কিছুদিন, গুরু তব,
মিলিবে সত্বর, সমস্যার মাঝে—
পাইবে বিবেক ফিরে; কিন্তু ঘোর
অন্ধকার মাঝে সাধনা করিতে হবে;
পুনঃ সেই অন্ধকার মাঝে হেরিবে—
আলোক বিন্দু—জ্যোতি মম বিকশিত যথা।
সে আলোকে ছায়া নাহি খর্ব্ব করে
শোভা। দিন দিন প্রতিদিন, যুগ
যুগান্তর আলোক আনন্দ ময়—
নির্ব্বাপিত হয় নাক' কভু।

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

কাম

প্রবৃত্তি

"প্রবৃত্তি বশগা বিধাতুঃ সৃষ্টিঃ"।

প্রবৃত্তি কারণে সৃষ্টি, প্রবৃত্তি হেতু রক্ষা, প্রবৃত্তি অভাবেই লয়। সৃষ্টি-স্থিতির মূলই প্রবৃত্তি। শ্রীভগবান প্রবৃত্তি বশে জগৎ সৃষ্টি করিয়া প্রজাপতিকে প্রথমেই প্রবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম উপদেশ করেন। তাহাতেই প্রজাপতির প্রজা সৃষ্টি। মানব, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গের জন্মের মূল যে প্রজাপতির প্রবৃত্তি, ইহা ত' প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।

প্রবৃত্তি মনোবৃত্তি। এই কার্য্য করিতে আমার ইচ্ছা হইল—এই ইষ্ট সাধনতা জ্ঞানের নাম প্রবৃত্তি। তন্ত্রমতে প্রবৃত্তি প্রযত্ন বিশেষ; যথা :—

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ তথা জীবন কারণং।
এবং প্রযত্ন ত্রৈবিধ্যং তান্ত্রিকৈ রূপদর্শিতং॥

প্রবৃত্তি স্বভাবাধীন। স্বভাব বলিতে আকস্মিক, কারণ নিরপেক্ষ নাস্তিক মতসিদ্ধ "স্বভাব" নহে। এ স্বভাব প্রকৃতি। মানব কর্ম্মফল লইয়া যদনুরূপ জন্মগ্রহণ করিবে, প্রবৃত্তিও তদনুরূপ হইবে। এই প্রকৃতি অনুযায়ী সেই প্রবৃত্তি। পিতা মাতা ও পূর্ব্ব পুরুষ হইতে জীবের প্রবৃত্তি ধারা চলিয়া আইসে।

আবার শিক্ষা সংযম ও ধর্ম্ম-কার্য্যের যথাযথ অনুশীলনে প্রবৃত্তির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ সাধিত হয়। এই পূর্ব্ব জন্মোচিত পাপ পুণ্য সংস্কাররূপে মানবচিত্তে অবস্থিত রহে,—তদনুরূপই প্রকৃতি—প্রবৃত্তিও তদনুরূপ হইয়া থাকে।

প্রবৃত্তি দ্বিবিধ,—সহজ ও আগন্তুক পুণ্যবান্ ব্যক্তির উৎকৃষ্ট কুলে জন্ম গ্রহণ ফলে সহজ প্রবৃত্তি। শিক্ষা সংযম ও সংযমগুণে আগন্তুক প্রবৃত্তি। সহজ প্রবৃত্তির প্রাবল্য, কি আগন্তুক প্রবৃত্তির প্রাবল্য, তাহা অনেক সময়ে বুঝা যায় না। যখন আগন্তুক প্রবৃত্তি সহজ প্রবৃত্তিকে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত ও লুপ্ত করিয়া রাখে, তখন প্রবৃত্তিকে প্রকৃত অনুযায়িক বলিয়া বোধ হয় না। 'আমরা নিয়তই প্রত্যক্ষ করিতেছি,—আজ যাঁহার প্রবৃত্তি উৎকৃষ্ট, কালই হয়ত' তাঁহার প্রবৃত্তি জঘন্যতম। আজ যাঁহার চরিত্র বরেণ্য, কাল তিনি ঘৃণিত!

প্রবৃত্তি আমাদের কর্ম্মের প্রযোজক। প্রবৃত্তি আছে, তাই কার্য্যে আসক্ত হই। জ্ঞানী লোক-শিক্ষার্থ কার্য্য করিলেও প্রবৃত্তি থাকে না বলিয়া, তাঁহার কার্য্যের শক্তিও থাকে না;—তাই "ন কর্ম্মণা লিপ্যতে জ্ঞানী"। বীজ দগ্ধ হইলে আর অঙ্কুরোৎপাদিতা শক্তি দেখা যায় না। প্রবৃত্তি কর্ম্মের প্রযোজক বলিয়া সংসারের কারণ। তবে আশঙ্কার কথা এই, প্রবৃত্তি আছে তাই কর্ম্ম, আবার কর্ম্ম অনুযায়িক প্রবৃত্তি অনোন্যাশ্রয় দোষ হইয়া যাইতেছে।

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবন্তি ভূতানি যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবং।

পরমেশ্বর-বাক্যভূত বেদাখ্য ব্রহ্ম হইতে কার্য্যের প্রবৃত্তি, তাহাতে কর্ম্ম-নিষ্পত্তি, তাহা হইতে পর্জ্জন্য, তাহা হইতে ভূত প্রাণীদিগের পুনরায় কর্ম্ম-প্রবৃত্তি।

প্রবৃত্তি সংসার বন্ধনের কারণ, অতএব প্রবৃত্তি হেয় নহে। কারণ প্রবৃত্তি চিকীর্ষা মাত্র। যাহা জগৎ সৃষ্টি ও রক্ষার কারণ—যাহা বৈদিক ধর্ম্ম, সে প্রবৃত্তি হেয় হইতে পারে না। ভগবানের মঙ্গলময় দান বলিয়া, যতটা সম্ভব আসক্ত না হইয়া প্রবৃত্তির সেবা করাই জীবের ধর্ম্ম। প্রবৃত্তি ধ্বংস কখনই বিধাতার অভিপ্রেত নহে। প্রবৃত্তি জীবের স্বভাব। যাহা স্বভাব; তাহা অপকারক নহে। তবে যে প্রবৃত্তি মানবকে গ্রন্থির উপর গ্রন্থি দিয়া আবদ্ধ করে, তাহার কারণ মানব ঐ যে প্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়ে; সে প্রবৃত্তিকে

ইচ্ছামত চালাইতে না পারিয়া প্রবৃত্তি দ্বারাই চালিত হয়। প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেয়, ছলনাময়ী মরুভূমিকে অমরাবতী ভাবে; সুখ স্বচ্ছন্দতায় শান্তির দিকে দৃষ্টি করে না। প্রবৃত্তি সেবায় অভ্যস্ত মানব ক্রমেই নেশাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে, কার্য্যেই সেই প্রবৃত্তি তখন অপূরণীয় অগ্নির আকার ধারণ করে; আশা ভরসা তাহার সমস্তই ইন্ধন স্বরূপ হয়; প্রবৃত্তিও দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হয়। এই প্রবৃত্তিই অনিষ্টকর। ইহা প্রবৃত্তির দোষ নহে, মানবের দোষ। চিত্ত অসংযত, ইন্দ্রিয় অবশীভূত হইলে এই দোষ ঘটে। অত্যধিক ব্যসনী হইলেই মানব আপনার স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দেয়, আপনার সত্ত্বা হারাইয়া ফেলে; তাই মানব ক্রমেই সুপথ, কুপথ চিনিতে পারে না। বহুদিন প্রবৃত্তি সেবার ফলে কামনার উদ্ভব। কামনার পূরণেও অবসাদ, অভাবেও অতৃপ্তি। এই প্রকারে প্রবৃত্তির অনুশীলনের ফলে মানবেরা যখন আপনার দোষে অধস্তন ভোগের দিকে চলিয়া যায়, তখনই অধর্ম্মের বিস্তার, ধর্ম্মের সঙ্কোচ, সদ্বৃত্তির লোপ হয়। প্রবৃত্তির সেই অধঃপতনের সময়ে নিবৃত্তির আবশ্যকতা। সেইরূপ সময়েই শঙ্করাচার্য্যের মত ব্রহ্মবাদীর প্রয়োজন; উপনিষদ্ প্রচার আবশ্যক।

তৎপরে নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম উপদেশ দিবার প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায়, ভগবান্ "সনক" "সনন্দ" প্রভৃতিকে সৃজন করিয়া, তাঁহাদিগকে নিবৃত্তি লক্ষণ ধর্ম্ম উপদেশ দেন। অন্তঃকরণ যাহাদের অজিত, ইন্দ্রিয় যাহাদের অসমাহিত, প্রাণ যাহাদের ভোগলোলুপ, সংযম, শম, দম, তিতিক্ষায় যাহাদের মন নাই, নিবৃত্তির সেবায় তাঁহাদের কোন সুফলই ফলে না।

প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি অবস্থাভেদে কখনও ভাল মন্দ হয়। প্রবৃত্তি মাত্রেই যে নিন্দনীয়, নিবৃত্তি মাত্রেই যে মহা ফলদ, তাহা নহে। ভগবানের ইচ্ছা এমত নহে যে মানব নিবৃত্তির সেবা করিয়া জগৎ ধ্বংশ করে। প্রবৃত্তি না থাকিলে জগৎ নিমেষেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। অবিদ্যা বা মায়া বশতঃ স্রষ্টার সৃষ্টি-জনিকা প্রবৃত্তি। নতুবা আমাদের মত ইচ্ছাবৃত্তি চঞ্চলা প্রবৃত্তি তাঁহাতে সম্ভব নহে।

মানবীয় চিত্তবৃত্তি ভেদে প্রবৃত্তি দুই প্রকার। এক শুদ্ধা প্রবৃত্তি, অপর মলিনা প্রবৃত্তি। একটী মায়ার কার্য্য, অপরটী অবিদ্যার কার্য্য। শুদ্ধা

প্রবৃত্তি সত্ত্ব গুণজ, মলিনা-প্রবৃত্তি রজ তমো গুণজ। শুদ্ধা প্রবৃত্তির সেবায় শ্রেয়ের আকাঙ্ক্ষা হয়। মলিনা প্রবৃত্তির সেবায় প্রেমের অনুরাগ জন্মে। এই মলিনা প্রবৃত্তির অপূরণীয় কামনাই কাম। এই প্রকার কামনার নিবৃত্তি হইলে প্রথম আবশ্যক সংযম। পুরাকালে ছাত্র গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালনার্থ প্রেরিত হইত। সংযম ত্রিবিধ; কায়িক, বাচনিক ও মানসিক। কায়িক সংযমের জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে উত্থান, গুরু সেবা, গো পালন, যোগাভ্যাস। বাচনিক সংযমের জন্য মৌনাভ্যাস, বেদপাঠ, সত্যকথন। মানসিক সংযমের জন্য পূজা, ধ্যান, ধারণা ও সমাধি।

সমূলে এই কামনা নাশ তত্ত্বজ্ঞান-সাধ্য। তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কামনা সমূলে নাশ প্রাপ্ত হয় না।

যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্য হৃদিস্থিতাঃ।
অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে॥ বৃহদারণ্যক

তত্ত্বজ্ঞান—আত্ম স্বরূপ জ্ঞান। আত্ম স্বরূপ জ্ঞান যাঁহারা দুঃসাধ্য মনে করেন, তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিপথই অবলম্বনীয়। ভগবানের উপর সমস্ত নির্ভর করিয়া অনাসক্ত ভাবে কর্ত্তব্য পালন করা, আপনার অসংযত চিত্তের মালিন্য দূরীকরণার্থ শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করা, পাপ পুণ্য—কর্ম্মফল সমস্তই কায়মনোবাক্যে শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু করাই উচিত।

ইত্যাদি শ্রুতিমানেন কায়েন মনসা গিরা।
সর্ব্বাবস্থাসু ভগবদ্ভক্তিরত্রোপযুজ্যতে॥

আমরা তপ জপ করিতে জানিনা, জ্ঞান কর্ম্ম বুঝি না। কেবল হে ভগবান্! তোমাকেই জানি। তুমি ব্যতীত আমাদের অন্য উপায় নাই, ইহাই জানি! এইরূপ ভক্তির অনুশীলন করিলেই মানব সিদ্ধকাম হইবে। ইহা বড় সহজ কথা নহে। ভোগ-লোলুপ মানবের পক্ষে যেমন নিষ্কাম কর্ম্ম করা দুঃসাধ্য, এই ভক্তির অনুশীলন করা ততোধিক দুঃসাধ্য। এই অনুশীলনের জন্য উপনিষদ্, গীতা, পুরাণ, ভাগবত পাঠই বিধি। বেদপাঠ, পূজা, স্তুতিগান, জপ তপের উদ্দেশ্য তাহাই। কেহ কেহ মনে করেন, প্রবৃত্তির নাশ করা আবশ্যক। বস্তুতঃ প্রবৃত্তির নাশ সম্ভব নহে, তবে প্রবৃত্তির অযথা বিস্তার রোধ করা আবশ্যক। মলিনা প্রবৃত্তি শুদ্ধা করার প্রয়োজন। যদি প্রবৃত্তি নাশ পাইল, তবে মানবত্ব

কি রহিল ? মুক্তির জন্য আকুলতা হইবে কেন ? শ্রীভগবানের উপর প্রকৃত নির্ভরতা আসিবে কোথা হইতে ?

প্রবৃত্তি থাকিলেই কামনা - অতএব যদি প্রবৃত্তি থাকিল, তবে ত' কামনাই রহিল - ইহা সত্য। কামনা মাত্রেই নিন্দনীয় নহে। মুক্তির ইচ্ছাও ত' কামনা ? মোট কথা, সাংসারিক সুখ কামনাই কামনা, তাহা হেয়, তাহাই গ্রন্থির শত বন্ধনরূপা। মুক্তির ইচ্ছা বা ভগবৎ পদ প্রাপ্তির ইচ্ছারূপ যে কামনা, তাহা মানবের পারমার্থিক কামনা। কামনা যেখানে নিন্দিত, সেইখানে মলিন সংসার কামনাই বুঝিতে হইবে। প্রবৃত্তি নাশ সে স্থলেই বিহিত। শুদ্ধা-প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরই জনয়িত্রী। বহুদিন প্রবৃত্তি সেবার ফলে প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মে, সেই বৈরাগ্য আর ভোগে কলঙ্কিত হয় না। যে কর্ম্ম দ্বারা চিত্ত-শুদ্ধি ও জ্ঞানলাভের অধিকারিতা, তাহাও প্রবৃত্তি জন্য। কারণ প্রবৃত্তি কর্ম্মের মূল। প্রবৃত্তিমূলক কর্ম্মই কার্য্য ; "ইহ বাহমুত্র বা কাম্যং প্রবৃত্তং কর্ম্ম কীর্ত্ত্যতে।" আর নিবৃত্তিমূলক কর্ম্ম নিবৃত্ত ; "নিষ্কামং জ্ঞান-পূর্ব্বন্তু নিবৃত্তং অভিধীয়তে।"

অতএব দেখা গেল যে, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি পরস্পরই অধিকারী অনুসারে ব্যবস্থিত। মানব যদি আপনাতে আপনি ঠিক থাকিয়া প্রবৃত্তি সেবা করিয়া যায়, তাহাতেও পরমার্থ লাভে অধিকারী হইতে পারে। নিবৃত্তিমার্গের গুণকীর্ত্তন করিবার সময় সাবধান হওয়া উচিত। যেন প্রবৃত্তি-মার্গ নিন্দনীয়রূপে দাঁড় করান না হয়। মানুষ সন্ন্যাসী নহে ; স্ত্রী পুত্র প্রতিপালন, জীবিকানির্ব্বাহ, পিতৃমাতৃ সেবা, আপনার উন্নতি করিবার জন্যই মানব সংসারী। যাহাতে প্রবৃত্তির ভিতর দিয়া আপনার কর্ত্তব্য করিয়া, পরিশেষে নিবৃত্তি-পথে আসিতে পারে, তাহারই ব্যবস্থা করা উচিত। আশা করি এই বিষয়টির উপর লক্ষ্য রাখিয়া প্রত্যেক ধর্ম্মপ্রবন্ধ-লেখক উপদেশ দিবেন। ইহা যেন ভুলিয়া না যান্—তাঁহার এই উপদেশের পাত্র কে ? মাসিক পত্রে সর্ব্বসাধারণকে সন্ন্যাস উপদেশ দিলে কি হইবে ? বরং কুফলই ফলিবে।

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ ভট্টাচার্য্য।

আশা

কতদিন "মোহ-ঘুমে", ঘুমাবিরে মন ?

দিন যে আগত প্রায়, একবার দেখ হায় ;
কাঁচেতে মজিয়ে র'লি, ত্যজিয়ে কাঞ্চন !

'পঞ্চভূত' সহ মিশে, হারায়ে ফেলিলে দিশে ;
শেষের সে দিনে কেহ হবে না আপন।

ভব সাগরেতে পড়ে, কি খেলা খেলিছ ওরে ;
পমেও না ভাবিলে মন বিভুর চরণ ?

উঠিছে তরঙ্গ তার, নাহি তার পারাপার ;
কুমতি-কুম্ভীর তায় করে সন্তরণ।

ক্ষণে ক্ষণে মোহবাণ, হৃদি করে খান্ খান্ ;
হায় ! তবু তোর অজ্ঞানান্ধ হ'ল না মোচন ?

এ সংসার-রঙ্গভূমে, জাগরে, থেক'না ঘুমে ;
বিকার গ্রস্থের মত হারাওনা জ্ঞান।

'হরিনাম' মহৌষধি, পান কর নিরবধি,
এ ভব-বারিধি হ'তে, হবে যদি ত্রাণ।

ডুবোনা সংসার-হ্রদে, স'প মন হরিপদে ;
এখনো ত' সময় আছে, হও সাবধান।

'বৈরাগ্য-অনল' জ্বালি, জ্বালাও বাসনাগুলি ;
ঘুচিবে তখন তোর মোহ-আবরণ।

ভাব শ্রীহরির পদ ঘুচিবে সব বিপদ ;
দূরে যাবে ভব-ভয় ছোঁবেনা শমন।

ভাবনা অনলরাশি, হরিনামে যাবে ভাসি ;
চির সুখ-শান্তি-নীরে হ'বি রে মগন।

হবে কিসে হরি লাভ, কেন মন সদা ভাব ?
সহজেতে ধরা যায় সহজের ধন।
প্রেম-অশ্রু দাও পদে, শরণ লহ শ্রীপদে ;
হেরিবে অন্তরে তবে, অন্তরের ধন।
তিনি, হরি প্রেমময়, প্রেম দিলে বাঁধা রয় ;
প্রেমেতে দেন যে ধরা প্রেমিক সুজন।
জীবন যৌবন মন, হরিপদে সঁপ মন ;
অচিরে হেরিবে তুমি শ্রীহরি-চরণ।
ছেড়োনা সুখের হাল, ধর তারে করে ভাল ;
মৃতপ্রায় আছ কেন, থাকিতে জীবন।
সংসার-বিকার ঘোরে, হরিনাম পান ক'রে ;
লহ ত্বরা ওরে মন, হবে দিব্যজ্ঞান
উঠ, আর ঘুমাওনা, ওরে মন করি মানা ;
অন্তিমেতে চাহ যদি হইবারে ত্রাণ।

শ্রীমতী মানময়ী দেবী

অ॰

ঋগ্বেদে জন্মান্তরবাদ।

হিন্দুগণ কর্ম্মবাদ ও পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন। অনেকের ধারণা, এই বিশ্বাসের উৎপত্তি বৌদ্ধযুগ হইতে। বুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্যেরা জনসাধারণকে উপদেশ দিবার কালে মানুষের কর্ম্মফল এবং কর্ম্মফলানুসারে বিভিন্ন যোনিতে জন্মগ্রহণ ও সুখ দুঃখ ভোগের বহু উল্লেখ করিয়াছেন সত্য ; কিন্তু তাঁহারাই কি সর্ব্ব প্রথমে কর্ম্মবাদ ও পুনর্জন্ম তত্ত্বের আবিষ্কার করেন ? অথবা এই তত্ত্বসমূহের তৎকালীন প্রচলিত বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়াই, তাঁহারা জনসাধারণকে ধর্ম্ম ও নীতি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন ? আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে একদলের মত এই যে, বৌদ্ধরাই কর্ম্মবাদ ও পুনর্জন্মের

আদি প্রচারক। পরে হিন্দুগণ সেই তত্ত্ব গ্রহণ করিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণাদিতে তাহার বিকাশ করেন মাত্র। এই দলের মত এই যে, মহাভারত, রামায়ণ ও পুরাণাদি গ্রন্থ বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পরে রচিত বা সঙ্কলিত হইয়াছিল। সুতরাং এই সমস্ত গ্রন্থে যদি কর্ম্মবাদ ও পুনর্জ্জন্মের উল্লেখ থাকে, তাহাতে বিস্ময়ের কোনও কারণ নাই।

এই প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে যাথার্থ্য সম্বন্ধে অন্য কোনও আলোচনা করিব না। কিন্তু তর্কচ্ছলে যদি ধরিয়া লওয়া যায়, যে তাঁহাদের মত সত্য, তাহা হইলে একটী বিষয় বিবেচ্য আছে। জনসাধারণ যাহা বিশ্বাস করেন না, তৎসম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিলে, সেই উপদেশে কোনও আশু ফলোদয় হয় না। বুদ্ধদেবের সময়ে লোকে যদি কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস না করিত, তাহা হইলে এই তত্ত্বগুলি অবলম্বন করিয়া, বুদ্ধদেব ও তাঁহার শিষ্যগণ কদাপি তাহাদিগকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিবার চিন্তাও করিতেন না এবং জনসমাজেও ঐ তথ্য বিনা তর্কে গ্রহণ করিত না। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা দেখিতে পাই যে, বুদ্ধদেবের সময়ে এবং তাঁহার আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দু জনসাধারণ কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করিত।

ঋগ্বেদ যে প্রাচীনতম আর্য্য-শাস্ত্রগ্রন্থ, তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ঋগ্বেদের ঋক্‌সমূহ যে সংকলিত হইয়াছিল, তাদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ মাত্র নাই। ঋগ্বেদে যদি কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে আর্য্য জাতির অভ্যুদয় ও প্রতিভা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদেরও উৎপত্তি হইয়াছিল; এবং এই দুইটী তত্ত্ব আধুনিক নহে ও বৌদ্ধমত হইতেও উদ্ভব হয় নাই। মনোবিজ্ঞান সাহায্যেও এই তথ্য সপ্রমাণিত করা যাইতে পারে।

বড়ই দুঃখের বিষয় যে, বর্ত্তমানকালে অনেক বাঙ্গালী লেখক বিশেষ কিছু গবেষণা না করিয়াই একটা মত প্রকাশ করিয়া ফেলেন। পাঠক সাধারণ স্বভাবতঃই তাঁহাদের বাক্যে শ্রদ্ধাবান্। সুতরাং তাঁহারা তাঁহাদের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিয়া বিষম গোলযোগের মধ্যে নিপতিত হ'ন। প্রথমতঃ তাঁহাদের চিরন্তন বিশ্বাসটি নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ সেই নষ্ট বিশ্বাসের পরিবর্ত্তে তাঁহারা

এমন কিছুই পান না, যদ্দ্বারা তাঁহারা আশ্বস্ত হইয়া জীবনপথে সোৎসাহে অগ্রসর হইতে পারেন। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল—আধ্যাত্মিক নির্জ্জীবতা। এই কারণে কোনও নূতন মত প্রচার করিবার পূর্ব্বে লেখকমাত্রেরই বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য।

নিষ্ঠাবান্ হিন্দুমাত্রেই বেদে বিশ্বাসী। হিন্দুধর্ম্ম বেদের সুদৃঢ় ভিত্তির উপরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। বেদে যাহা নাই, হিন্দু তাহা গ্রহণ করিতে বা বিশ্বাস করিতে কুণ্ঠিত। আজকাল এক শ্রেণীর প্রত্নতত্ত্ববিৎ হিন্দুধর্ম্মের উপর জনসাধারণের আস্থা নষ্ট করিবার জন্য নানা প্রকার প্রলাপ বকিতেছেন। একজন লেখক কিছুদিন পূর্ব্বে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে, ভগবান শিব অনার্য্যদেবতা এবং বেদে কোথাও তাঁহার উল্লেখ নাই। যদি লেখক মহাশয়ের উক্তিই সত্য হয়, তাহা হইলে শৈবগণ বেদাবিহিত ধর্ম্মের সেবক নহেন; অধিকন্তু তাঁহারা অনার্য্যগণের উপাসিত একটী দেবতায় ভক্তি ও বিশ্বাস করিয়া ভ্রমে নিপতিত রহিয়াছেন এবং মোক্ষপথ হইতে দূরে—বহুদূরে অবস্থিতি করিতেছেন! আমি লেখকের পূর্ব্বোক্ত অদ্ভুত মত পাঠ করিয়া, আমার সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি অনুসারে তত্ত্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হই, এবং দেখিতে পাই যে আর্য্যগণের প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ ঋগ্বেদে শিব ও রুদ্রের উল্লেখ ও অস্তিত্ব রহিয়াছে।* কিছুদিন পূর্ব্বে "অমৃতবাজার পত্রিকার" ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ও খ্যাতনামা লেখক ৺ শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় কোনও মাসিক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন যে, বেদে কর্ম্মবাদ বা জন্মান্তরবাদ নাই এবং পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধেরাই এই মতের প্রচার করিয়াছিলেন। ঋগ্বেদে কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ আছে কি না, তৎসম্বন্ধে আমি অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইয়া যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহার একাংশ নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতেছি। পাঠকবর্গ তাহা পাঠ করিয়া তৎসম্বন্ধে একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে সমর্থ হইবেন।

দেহ নাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের যে সমস্তই নষ্ট হয় না, আর্য্যগণের এই বিশ্বাস স্বতঃসিদ্ধ। জীব ইহলোক ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করে, এবং

* অগ্রহায়ণ সংখ্যার "প্রবাসীতে" মল্লিখিত "বৈদিক দেবতার পূজা" প্রবন্ধ পাঠ করুন। "সুপ্রভাত" নামক মাসিক পত্রে প্রকাশের জন্য "বৈদিক দেবতা. রুদ্র" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছি। লেখক।

নিজ কর্ম্মানুসারে সেখানে সুখাদি ভোগ করে, ঋগ্বেদে এ সম্বন্ধে বহু প্রমাণ আছে। সেই প্রমানসমূহ উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে, পরলোক সম্বন্ধে আর্য্যগণের কিরূপ ধারণা ছিল তাহা উল্লেখ করা যাউক।

পরলোকের মধ্যে স্বর্গের বর্ণনা ঋগ্বেদে এইরূপ আছে। যথা :—যে ভুবনে সর্ব্বদা আলোক, যে স্থানে স্বর্গলোক সংস্থাপিত আছে, হে ক্ষরণশীল (সোম) সেই অমৃত ও অক্ষয় ধামে আমাকে লইয়া চল। * ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

"যে স্থানে বৈবশ্বত † রাজা আছেন, যে স্থানে স্বর্গের দ্বার আছে, যে স্থানে এই সমস্ত প্রকাণ্ড নদী আছে, তথায় আমাকে লইয়া গিয়া অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

"সেই যে তৃতীয় নাগলোক, তৃতীয় দিবালোক, যাহা নভোমণ্ডলের উর্দ্ধে আছে, যথায় ইচ্ছানুসারে বিচরণ করা যায় ‡ যে স্থান সর্ব্বদা আলোকময়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

"যথায় সকল কামনা নিঃশেষে পূর্ণ হয়, যথায় 'প্রধ' নামক দেবতার ধাম আছে, যথায় যথেষ্ট আহার ও তৃপ্তিলাভ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।"

"যথায় বিবিধ প্রকার আমোদ, আহ্লাদ, আনন্দ, বিরাজ করিতেছে যথায় অভিলাষী ব্যক্তির তাবৎ কামনা পূর্ণ হয়, তথায় আমাকে অমর কর। ইন্দ্রের জন্য ক্ষরিত হও।" (৺ রমেশচন্দ্র দত্তের বঙ্গানুবাদ, ঋগ্বেদ ৯ম মণ্ডল, ১১৩ সূক্ত, ৭—১১ ঋক্।)

যজ্ঞকর্ত্তা ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া যে যে ঋক্ আছে, তৎসমুদায় এইরূপ :—"আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা যে পথ দিয়া যে স্থানে গিয়াছেন, তুমিও সেই পথ দিয়া সেই স্থানে যাও। সেই যে দুই রাজা—যম আর বরুণ, যাঁহারা 'স্বধা' প্রাপ্ত হইয়া আমোদ করিতেছেন, তাঁহাদিগকে যাইয়া দর্শন

* Cosmic mind in manifestation ব্রহ্মার মনস্তত্ব। "সর্ব্বদা আলোক" কথাটী দেখিবা মাত্র যোগিগণ উক্তির সত্যতা উপলব্ধি করিবেন। সেই জন্য দেবতাদের ছায়া নাই বলিয়া উক্তি চলিয়া আসিতেছে। পং সং—

† বিবস্বান্ বা সূর্য্যের পুত্র যম। লেখক—

‡ এই কথাটী পাঠকগণ ভাবিয়া দেখিবেন। পং সং—

কর। সেই চমৎকার স্বর্গধামে পিতৃলোকদিগের সঙ্গে মিলিত হও, যমের সহিত ও তোমার ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলের সহিত মিলিত হও। পাপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অস্ত নামক গৃহে প্রবেশ কর এবং উজ্জ্বল দেহ গ্রহণ কর।"

"(শ্মশানে দাহকালে উক্তি)—হে ভূত প্রেতগণ, দূর হও—চলিয়া যাও—সরিয়া যাও, পিতৃলোকেরা তাঁহার জন্য এই স্থান প্রস্তুত করিয়াছেন। এই স্থান দিবা দ্বারা, জল দ্বারা ও আলোক দ্বারা শোভিত; যম এই স্থান মৃত ব্যক্তিকে দিয়া থাকেন।" (ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডল, ১৪সূক্ত ৭—৯ ঋক্।

ঋগ্বেদে, যমালয় ভয়ের আলয় নহে; বরং তাহা আনন্দ ও সুখেরই স্থান। কিন্তু তাহা হইলেও, তাহা একেবারে ভয়শূন্য নহে। যমালয়ের দ্বারে দুইটি কুক্কুর আছে, তাহাদের বর্ণনা এইরূপঃ—"হে মৃত! এই যে দুই কুক্কুর * যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু ও বর্ণ বিচিত্র; ইহাদিগের নিকট দিয়া শীঘ্র চলিয়া যাও। তৎপরে যে সকল সুবিজ্ঞ পিতৃলোক যমের সহিত সর্ব্বদা আমোদ আহ্লাদে কালক্ষেপ করেন, তুমি উত্তম পথ দিয়া তাঁহাদিগের নিকট গমন কর।"

"হে যম। তোমার প্রহরিস্বরূপ যে দুই কুক্কুর আছে, যাহাদিগের চারি চারি চক্ষু, যাহারা পথ রক্ষা করে, যাহাদিগের দৃষ্টিপথে সকল মনুষ্যকেই পতিত হইতে হয়, তাহাদিগের কোপ হইতে এই মৃত ব্যক্তিকে রক্ষা কর। হে রাজন্, ইহাকে কল্যাণভাগী ও নীরোগী কর। সেই যে যমদূত, যাহাদিগের বৃহৎ বৃহৎ নাসিকা † যাহারা শীঘ্র তৃপ্ত হয় না এবং সকল ব্যক্তির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া থাকে, তাহারা যেন আমাদিগকে অদ্য এই স্থানে বল ও মঙ্গল প্রদান করে, যেন আমরা সূর্য্যের দর্শন পাই।" ১০ম মণ্ডল, ১৪সূক্ত, ১১—১২ ঋক্।)

মৃত ব্যক্তির দেহ অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবার সময় যে যে ঋক্ আছে তৎসমুদায় এইরূপঃ "হে অগ্নি! যখন ইঁহার শরীর উত্তমরূপে পক্ক করিবে, তখনই পিতৃলোকদিগের নিকট ইহাকে দিবে। যখন ইনি পুনর্ব্বার সজীবত্ব প্রাপ্ত হইবেন, তখন দেবতাদিগের বশতাপন্ন হইবেন। ‡

* ইহা কি Greek Cerebus ?

† বর্ণনাটী কল্পিত বলিয়া বোধ হয় না। Astral planeএ যাঁহারা গিয়াছেন, তাঁহারা এইরূপ জীবের দর্শন পাইয়াছেন। পং সং—

‡ এই বর্ণনায় Astral body বা কামনাময় দেহের পরিপুষ্টি ও তৎ সাধনের পর মনোময়

"হে মৃত! তোমার চক্ষু সূর্য্যে গমন করুক, তোমার শ্বাস বায়ুতে যাউক। তুমি তোমার পুণ্য ফলে আকাশে ও পৃথিবীতে যাও। অথবা যদি জলে যাইলে তোমার হিত হয়, তবে জলে যাও। তোমার শরীরের অবয়বগুলি উদ্ভিজ্জ-বর্গের মধ্যে যাইয়া অবস্থিতি করুক।

"চিরকাল এই মৃত ব্যক্তির যে অংশ 'অজ' অর্থাৎ জন্মরহিত আছে, হে অগ্নি! তুমি সেই অংশকে তোমার তাপদ্বারা উত্তপ্ত কর, তোমার ঔজ্জ্বল্য, তোমার শিখা সেই অংশকে উত্তপ্ত করুক।* হে জাতবেদা বহ্নি! তোমার যে সকল মঙ্গলময়ী মূর্ত্তি আছে, তাহাদিগের দ্বারা এই মৃত ব্যক্তিকে পুণ্যবান্ লোক-দিগের ভুবনে বহন করিয়া লইয়া যাও।

"হে অগ্নি! যে তোমার আহুতিস্বরূপ হইয়া যজ্ঞের দ্রব্য ভোজন করিয়া আসিতেছে, সেই মৃতকে পিতৃলোকদিগের নিকট প্রেরণ কর। ইহার যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা জীবন প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হউক। হে জাতবেদা! সে পুনর্ব্বার শরীর লাভ করুক। (১০ম মণ্ডল, ১৭ সূক্ত, ২—৫ ঋক্)

উদ্ধৃত ঋক্‌সমূহের অনুবাদ পাঠ করিয়া বুঝা যাইতেছে যে মানুষের স্থূল দেহ নষ্ট হইয়া গেলেও দেহের মধ্যে যে অংশ অজ, তাহা নষ্ট হয় না; তাহা জীবন প্রাপ্ত হইয়া উত্থিত হয় এবং পুনর্ব্বার শরীর ধারণ করে।

বন্ধু প্রভৃতি ঋষি মৃত সুবন্ধুর মন প্রাণ প্রভৃতির উদ্দেশে এইরূপ ঋক্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। যথা :—"তোমার যে মন অতি দূরে বিবস্বানের পুত্র যমের নিকট গিয়াছে, তাহাকে আমরা ফিরাইয়া আনিতেছি, তুমি জীবিত হইয়া ইহলোকে আসিয়া বাস কর।" (১০।৫৮।১) অর্থাৎ মৃত্যুর পরও মানুষ যে পুনর্ব্বার শরীর গ্রহণ করিয়া পৃথিবীতে আসে, তাহা এতদ্দ্বারা সূচিত হইতেছে। নিম্নলিখিত ঋচের অনুবাদেও সেই ভাব ব্যক্ত হইতেছে। যথা :—"পৃথিবী পুনর্ব্বার আমাদিগকে প্রাণদান দিন। পুনর্ব্বার দ্যুলোকদেবী

দেহে স্বর্গে গমন উক্ত হইতেছে। এই পরিপুষ্টি হইতে গেলে পিতৃগণের পিতৃদেহে জীবের বিশিষ্ট দেহ মিলাইয়া দেওয়ার আবশ্যক। তদ্দ্বারা জীবের কৃতকর্ম্মের ফল অন্য জীবের কামান দেহ নির্ম্মাণার্থ প্রযোজিত হয়। এরূপ কর্ম্মফল সম্ভাবিত না হইলে প্রত্যেক মানবকে নূতন করিয়া দেহ গঠন করিতে হইত। ইহা বাসনা ও মনের heredity? পং সং—

* vitalize সঞ্জীবিত।

ও অন্তরীক্ষ আমাদিগকে প্রাণদান দিন। সোম আমাদিগকে পুনর্ব্বার শরীর দান করুন।" ইত্যাদি (১০।৫৯।৭)

ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলের ৫৬ সূক্তে বৃহদুক্থ ঋষি তাঁহার মৃত পুত্র বাজীর উদ্দেশে নিম্নলিখিত ঋক্ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। যথা :—"এই অগ্নি তোমার এক অংশ, আর এই বায়ু তোমার এক অংশ, তোমার তৃতীয় জ্যোতির্ম্ময় আত্মা স্বরূপ অংশ। এই তিন অংশ দ্বারা তুমি অগ্নি, * বায়ু ও সূর্য্য মধ্যে প্রবেশ কর। তোমার শরীরের প্রবেশকালে তুমি কল্যাণ মূর্ত্তি ধারণ কর এবং দেবতাদিগের সেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পিতাস্বরূপ সূর্য্যের ভুবনে তুমি প্রিয় হও।"

"হে বাজিন্! পৃথিবী তোমার শরীর গ্রহণ করিতেছেন। তিনি আমাদিগের প্রীতিজনক হউন, তোমারও কল্যাণ করুন। তুমি স্থান ভ্রষ্ট না হইয়া জ্যোতিঃ ধারণ করিবার জন্য দেবতাদিগের সহিত এবং আকাশের সূর্য্যের সহিত তোমার আত্মাকে মিলাইয়া দাও।"

"হে পুত্র! তুমি বিলক্ষণ বলে বলী ও সুশ্রী ছিলে। যেরূপ উত্তম স্তব করিয়াছিলে, তদ্রূপ উত্তম স্বর্গে যাও। উত্তম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, তাহার উত্তম ফল প্রাপ্ত হও। উত্তম দেবতা ও উত্তম সূর্য্যের সহিত একীভূত হও।"

"আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ দেবতার মত মহিমার অধিকারী হইয়াছেন। তাঁহারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়া দেবতাদিগের সহিত ক্রিয়াকলাপ করিয়াছেন। যে সকল জ্যোতির্ম্ময় পদার্থ দীপ্তি পাইয়া থাকে, তাঁহারা উহাদিগের সহিত একীভূত হইয়াছেন, তাঁহারা দেবতাদিগের শরীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন।"

উদ্ধৃত ঋক্ সমূহের অনুবাদ পাঠ করিয়া স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, পুণ্যকর্ম্মের ফলে উত্তম স্বর্গ লাভ করা যায় এবং পুণ্যাত্মা পূর্ব্বপুরুষগণও পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই কর্ম্মবাদ ঋগ্বেদের অন্যত্রও দেখা যায়। যথা :—"হে অগ্নি! তুমি মনুকে স্বর্গলোকের কথা বলিয়াছিলে। পুরুরবা রাজা সুকৃতি করিলে তুমি তাঁহার প্রতি অধিকতর ফলদান করিয়াছিলে।" (১।৩১।৪)

সায়নাচার্য্য ইহার টীকায় বলিয়াছেন, পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা স্বর্গ পাওয়া যায়, একথা অগ্নি মনুকে বলিয়াছিলেন।

* প্রকাশাত্মিকা শক্তিই অগ্নি। সঙ্কলনকারী বুদ্ধি-শক্তি বায়ু ও সূর্য্যাংশই জীবের আত্মা। Theosophyর আত্মা বুদ্ধি মনস্। পং সং—

কর্ম্মবাদ অন্যত্রও সূচিত হইয়াছে। যথা:—"যে পথে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা গিয়াছেন, সকল জীবই নিজ নিজ কর্ম্ম অনুসারে সেই পথে যাইবেন।" (১০।১৪।২)

পূর্ব্বজন্মে অনুষ্ঠিত পাপ যে ইহজন্মেও আমাদিগকে কষ্ট দেয়, তাহারও উল্লেখ আছে। যথা:—"হে দেব অগ্নি! দেবগণের নিকট আমাদিগের স্তোত্র প্রচার কর। স্তোত্রকারিগণকে সাংসারিক সুখে লইয়া যাও। আমরা যেন শত্রু, পাপ ও কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাই। আমরা যেন সেই সকল পূর্ব্বজন্মের পাপ হইতে মুক্ত হই। আমরা যেন ত্বদীয় রক্ষাবলে তৎসমুদয় হইতে উদ্ধার পাই।" (৬।২।১১)

পাপী ব্যক্তি নিজ কর্ম্মদ্বারা যে কষ্টময় নরকের উৎপাদন করে, ঋগ্বেদে তাহারও উল্লেখ আছে। যথা:—"ভ্রাতৃরহিতা বিপথগামিনী যোষিতের ন্যায়, পতি-বিদ্বেষিণী দুষ্টাচারিণী ভার্য্যার ন্যায়, পাপী অনৃত অসত্য লোকে এই গভীর পদ উৎপাদন করিয়াছে।" (৪।৫।৫)।

সায়ণাচার্য্য গভীর পদের অর্থ "নরক স্থান" করিয়াছেন।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে উৎপ্রেক্ষা দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা:—"দুইটী পক্ষী বন্ধুভাবে এক বৃক্ষে বাস করে। তাহাদিগের মধ্যে একটী স্বাদু পিপ্পল ভক্ষণ করে; অন্যটি ভক্ষণ করে না, কেবল মাত্র অবলোকন করে।" (১।১৬৪।২০)

সায়ণাচার্য্য এই ঋকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন: পক্ষী দুইটী জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা কেবল মাত্র অবলোকন করেন।

আত্মা নিত্য; তাহা অনিত্য দেহের সহিত সংসৃষ্ট হইয়া কখনও ইহলোকে এবং কখনও পরলোকে যাইতেছে। কিন্তু লোকে অনিত্য দেহকেই চিনে, নিত্য আত্মাকে চিনিতে পারে না। প্রথম মণ্ডলের ১৬৪ সূক্তের ৩৮ ঋচের অনুবাদ এইরূপ:—"নিত্য অনিত্যের সহিত একস্থানে অবস্থিতি করে; অন্নময় শরীর প্রাপ্ত হইয়া উহা কখনও অধোদেশে, কখনও ঊর্দ্ধদেশে গমন করে। উহারা সর্ব্বদাই একত্র অবস্থিতি করে, ইহলোকে সর্ব্বত্র একত্র গমন করে, পরলোকেও সর্ব্বত্র একত্র গমন করে। লোকে ইহাদিগের একটীকে চিনিতে পারে, অপরটিকে পারে না।"

আত্মা ইহলোকে অন্নময় অর্থাৎ স্থূল শরীরে এবং পরলোকে সূক্ষ্ম শরীরে বিচরণ করে। কিন্তু এই উভয়বিধ শরীরই অনিত্য ও বিনশ্বর।

জীবাত্মা সম্বন্ধে দশম মণ্ডলের ১৭৭ সূক্তটি সকলের প্রণিধান যোগ্য। এস্থলে উক্ত সূক্তের তিনটি ঋকেরই অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথম ঋকের অনুবাদ এইরূপ :—"বিদ্বান্‌গণ মনে মনে আলোচনা পূর্ব্বক মানস-চক্ষে একটী পতঙ্গের দর্শন পান, দেখেন যে অসুরের মায়া উঁহাকে আক্রমণ করিয়াছে। পণ্ডিতগণ কহেন যে, উহা সমুদ্রের মধ্যে ঘটিতেছে। তাঁহারা বিধাতার কিরণ সমূহের ধামে যাইতে ইচ্ছা করেন।"

সায়ণাচার্য্য এই ঋকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—জীবাত্মা মায়াতে আচ্ছন্ন, ইহা চিন্তা দ্বারা জানা যায়। সমুদ্রবৎ পরব্রহ্মের মধ্যেই এই জীবাত্মা বিদ্যমান আছেন। পরমাত্মার ধাম আলোকময়, তথায় গেলেই মায়া হইতে মুক্তি হয়।

দ্বিতীয় ঋকের অনুবাদ এইরূপ :—"পতঙ্গ মনে মনে বাক্যকে ধারণ করেন। গর্ভের মধ্যে গন্ধর্ব্ব তাঁহাকে সেই বাক্য শিখাইয়াছে। সেই বাণী দিব্যরূপিণী, স্বর্গের প্রদানকর্ত্রী, বুদ্ধির অধীশ্বরী। বিদ্বান্‌গণ সেই বাণীকে সত্যের পথে রক্ষা করেন।"

সায়ণাচার্য্য এই ঋকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—জীবাত্মার মনে বীজরূপে সকল শব্দ বিদ্যমান থাকে। গন্ধর্ব্ব অর্থাৎ দেবতা তাঁহার মনে গর্ভাবস্থায় সেই বীজ আধান করিয়া রাখেন। বাক্যের শক্তি অসীম ; বুদ্ধিমান্‌গণ বাক্যকে কখনও মিথ্যার দিকে লইয়া যান না। *

তৃতীয় ঋকের বঙ্গানুবাদ এইরূপ :—"দেখিলাম এক গোপাল, তাহার কখন পতন নাই, কখন নিকটে, কখন দূরে, নানা পথে ভ্রমণ করিতেছে। সে কখন অনেক বস্ত্র একত্রে পরিধান করিতেছে, কখন পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্র পরিধান করিতেছে। এইরূপে সে বিশ্ব-সংসার মধ্যে পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতেছে।"

সায়ণাচার্য্য এই ঋকের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন :—জীবাত্মার ধ্বংস নাই ;

---

* এই কথাটী কি আধুনিক লেখকগণ স্মরণ করিবেন। তাহা হইলে বোধ হয় অপরকে বাক্য দ্বারা ভ্রষ্ট করিবেন না। পং সং—

তিনি নানা যোনি ভ্রমণ করেন; কোন জন্মে নানা গুণ ধরেন, কোন জন্মে দুই একটী গুণ ধরেন। নিকৃষ্ট যোনিতে অল্পই গুণ থাকে, উৎকৃষ্ট যোনিতে অনেক গুণ প্রদর্শণ করা হয়। *

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

অর্থ]

প্রস্থান-ভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ষড়ঙ্গের মধ্যে পঞ্চম-বেদাঙ্গ ‘ছন্দঃ’ অতি প্রাচীন-বৈদিক শব্দ। ছন্দঃ সামের অপর একটী সংজ্ঞা। † প্রাচীন বৈদিক-গ্রন্থেও ‘গায়ত্রী’ প্রভৃতি সাতটী ছন্দের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ছন্দ গ্রন্থের রচয়িতা মহর্ষি-পিঙ্গল, এই পিঙ্গল সূত্রের হলায়ুধ প্রভৃতি বৃত্তি ও ভাষ্যকার অনেক আছেন। তদ্ভিন্ন আধুনিক ও ছন্দের কতিপয় সন্দর্ভ আছে। “ছন্দোমঞ্জরী” প্রভৃতি কাব্য শাস্ত্রের ছন্দঃ জ্ঞানের বিশেষ প্রয়োজনীয়। ছন্দ-সম্বন্ধ বাক্যকে ‘পদ্য’ বা ‘শ্লোক’ বলা যায়। দণ্ডাচার্য্যের প্রণীত “ছন্দোবিচিতি” নামক এক সন্দর্ভ ছিল। কবিপ্রবর—সুবন্ধুর বিরচিত “বাসবদত্তা” নামক গদ্য কাব্যে উক্ত গ্রন্থের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত প্রচীন সাতটী ছন্দ এই,—(১) গায়ত্রী ছন্দ ‡ সুপ্রসিদ্ধ—ইহা ২৪ টী অক্ষরে সম্পন্ন ও গ্রথিত, পরমাত্ম-তত্ত্ব প্রকাশক, (২) উষ্ণিক, (৩) বৃহতী, (৪) পঙ্‌ক্তি, (৫) ত্রিষ্টুব, (৬) জগতী,

* এই গোপাল কি আমাদের চিরন্তন প্রাণের সুহৃদ্ ব্রজগোপাল নহেন? বস্ত্র সংগ্রহ কি বস্ত্র হরণ নহে? ইনি কি সেই “ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরং” নহেন? পং সং—

† “ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি”। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।
“শ্রোত্রিয়শ্ছন্দোঽধীতে”। ব্যাকরণে।
গায়ত্র্যুষ্ণিক্ অনুষ্টুব্ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ।

‡ “ত্রিষ্টুব্ জগতীচেতি ছন্দাংস্যাহুরণুক্রমাৎ”। সন্ধ্যাভাষ্য
“চতুর্ব্বিংশত্যক্ষরা গায়ত্রী”। (পিঙ্গলমুনিঃ)

(৭) অনুষ্টুভ। এতদ্ভিন্ন "শর্করী" প্রভৃতি বহু বৈদিক ছন্দও আছে। এই ছন্দগুলি মন্ত্রের ঋষি, ছন্দ ও দেবতার সহযোগে প্রয়োগকালে প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রত্যেক ছন্দের অক্ষর সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট আছে।

ষষ্ঠ-বেদাঙ্গ জ্যোতিষ, যে শাস্ত্র দ্বারা সৌর-জগতের জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলের (গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি) গতি ও সংস্থান সমূহ নিরূপিত হয় এবং বৈদিক ও পৌরাণিক ক্রিয়াসমূহের কাল, লৌকিক শুভাশুভ অবগত হওয়া যায়, অর্থাৎ মানবের জন্মলগ্ন ও কর-চরণাদির রেখাদ্বারা ইষ্টানিষ্ট অবধারিত হয়, * তাহাকে জ্যোতিষ শাস্ত্র বলে। ইহা গণিত ও ফলিত—এই দুই ভাগে বিভক্ত। বহু পণ্ডিতের অভিমত, ভারতবর্ষীয় মহর্ষিগণ দ্বারা জ্যোতিষশাস্ত্র প্রথমে সমাবিষ্কৃত হয়। যেরূপ স্বাধ্যায়, অনধ্যায় কালে বা যজ্ঞ-সংস্কারাদি-শ্রৌত স্মার্ত্ত কর্ম্মসমূহের সময় নিশ্চিত হয়; সেইরূপ জ্যোতিষ দ্বারা দিব্য ও নাভসিক উপপ্লব, (উৎপাত) গ্রহণ গড়ুরচয়ন প্রভৃতিতে গণিতজ্ঞান এবং শাকুন (omens) প্রশ্নাদি হইতে বিষয় নিরূপণ হইয়া থাকে। গণিত দুই প্রকার, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, † গাণিতিকগণ গ্রহণাদিতে গণিতাগত ফল পাইতেছেন। ফলিতাংশের সম্প্রতি খুবই অবনতি ঘটিয়াছে। জ্যোতিষ ঋগ্বেদের অঙ্গীভূত "যত্বাসূর্য্যঃ স্বর্ভানুঃ" এই ঋগ্‌মন্ত্রে গ্রহণের উল্লেখ দেখা যায়।

ঋগ্বেদাঙ্গ জ্যোতিষের গ্রন্থ ষট্‌ত্রিংশৎ,—সোমাকরাচার্য্য এই ছত্রিশখানি গ্রন্থের টীকা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত টীকায় শেষভাগে "যজুর্ব্বেদাঙ্গ জ্যোতিষ"—এইরূপ উল্লেখ থাকাতে বেদ-ভেদে বেদাঙ্গ জ্যোতিষশাস্ত্রও বিভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। ঋগ্‌ ও যজুর্ব্বেদাঙ্গ জ্যোতিষের নামও প্রভেদ, যেহেতু বিষয়গত কোন পার্থক্য নাই। যজুর্ব্বেদাঙ্গ জ্যোতিষ-গ্রন্থের সংখ্যা ত্রিশখানি। কিন্তু গ্রন্থান্তরে উভয় বেদাঙ্গ জ্যোতিষের সংখ্যা ৪৯ খানি, এই মতে ১৩ খানি অতিরিক্ত হয়। অথর্ব্ব বেদাঙ্গ জ্যোতিষগ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ হইতে কিছু ভিন্ন প্রণালীর। এই গ্রন্থ প্রণেতা শ্রীলগধা(ড়া)চার্য্য। লগধাচার্য্য সম্বন্ধে অপর জ্যোতিষ গ্রন্থের প্রারম্ভে এইরূপ দেখা যায়। যথা,—"দিন, মাস, ঋতু, অয়ন

---

* "কর-চরণ রেখা বিপাক গ্রহণত্যাদি সূচিত প্রাচীন কর্ম্মকলং দৈবং তত্ জ্যোতিষ-শাস্ত্রাৎ বোদ্ধব্যং" ব্যাকরণ টীকা।

† "দ্বিবিধগণিত মুক্তং ব্যক্তমব্যক্তসংজ্ঞং"। বীজগণিতে ভাস্করাচার্য্য।

প্রভৃতির অঙ্গস্বরূপ পঞ্চবৎসরাত্মক যুগাধিপতি প্রজাপতিকে পবিত্রভাবে নমস্কার করিয়া এবং কাল ও ভারতীদেবীকে অভিবাদন করিয়া, মহাত্মা লগধাচার্য্যের কালজ্ঞান বলিব"। দেশের প্রভেদে বর্ণোচ্চারণের প্রভেদ থাকায় দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি দেশে ইহাকে লগড়াচার্য্য বলে।

প্রাচীন সূর্য্য সিদ্ধান্ত প্রভৃতি লুপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনুমান করা যায়। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্ম-সিদ্ধ, সূর্য্য-সিদ্ধান্ত, বশিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত, গর্গ-সিদ্ধান্ত, নল্ল সিদ্ধান্ত প্রভৃতি বহু সিদ্ধান্ত-সন্দর্ভ সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ পাওয়া যায়। জ্যোতিষশাস্ত্রের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় ৺সুধাকর দ্বিবেদীকৃত "গণক-তরঙ্গিণী"তে লিখিত আছে। ফলিত-বিষয়ে "বৃহৎ পরাশর সংহিতা" ও "বৃহৎ ভৃগু-সংহিতা" প্রভৃতি ফলবিচারে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। স্থরিসিংহ দুর্গসিংহ কালের লক্ষণ করিতে গিয়া, সূর্য্য ও চন্দ্রমাকে গ্রহ এবং নক্ষত্র হইতে পৃথক্ বলিয়া নির্দ্ধাপিত করিয়াছেন * সমাস্ততঃ দুইভাগে বিভক্ত হইলেও বিশেষরূপে তিনভাগে বিভক্ত বলিয়া বোধ হয়। যথা।—সিদ্ধান্ত, হোরা, সংহিতা, এই তিন স্কন্দ বা তিন প্রস্থান-স্বরূপ জ্যোতিষশাস্ত্র অষ্টাদশ সংখ্যক মহর্ষি-বিরচিত †। যথা মহর্ষি কশ্যপোক্ত,—(১)ব্রহ্মা, (২) সূর্য্য, (৩) ব্যাস, (৪) বশিষ্ট, (৫) অত্রি, (৬) পরাশর, (৭) কাশ্যপ, (৮) নারদ, (৯) গর্গ (১০) মরীচি, (১১) মনু, (১২) অঙ্গিরা, (১৩) লোমশ, (১৪) পৌলশ, (১৫) চ্যবন, (১৬) ভৃগু, (১৭) যবন, (১৮) শৌনক। মহর্ষি পরাশরোক্ত জ্যোতিষ প্রণেতৃগণ যথা, (১) বিশ্বসৃক্, (২) নারদ, (৩) ব্যাস, (৪) বশিষ্ট, (৫) অত্রি, (৬) পরাশর, (৭) লোমশ, (৮) যবন, (৯) সূর্য্য, (১০) চ্যবন, (১১) কশ্যপ, (১২) কাশ্যপ, (১৩) ভৃগু, (১৪) পুলস্ত্য, (১৫) মনু, (১৬) পৌলশ, (১৭) শৌনক, (১৮) অঙ্গিরা, (১৯) গর্গ, (২০) মরীচি (২১) যবন। ‡

বলা বাহুল্য যে এই সকল ঋষিগণ পূর্ব্বোক্ত লগড়াচার্য্যের মত গ্রহণ করেন নাই;—যেহেতু তিনি বেদাঙ্গ মূল-জ্যোতিষ-শাস্ত্রে পাঁচ বৎসরে যুগ-গণনা করিয়া বিলক্ষণ মত স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

---

*"সূর্য্য চন্দ্রমসো গ্রহনক্ষত্রাণাঞ্চ পরিস্পন্দোপচরিতঃ কাল ইহ গৃহ্যতে"। নামপ্রকরণ টীকা।

† "ত্রিস্কন্দং জ্যোতিষং শাস্ত্রং হোরা-সিদ্ধান্ত সংহিতাঃ"। পরাশরঃ।

‡ "ব্রহ্মাচার্য্যোবশিষ্ঠোঽত্রিঃ" ইত্যাদি। পরাশরঃ।

জ্যোতিষের গুরুশিষ্য পরম্পরাক্রমে উপদেশ যথা :— সূর্য্যদেব—ময়াকুণকে উপদেশ দিয়াছেন, ব্রহ্মা—নারদর্ষিকে, ব্যাসদেব—স্বীয় শিষ্যকে ; বশিষ্ট—মাণ্ডব্য ও বামদেবকে, পরাশর—মৈত্রেয়কে, পুলস্ত্যাচার্য্য—গর্গকে, ইত্যাদিক্রমে উপদেশ দেওয়াতে জ্যোতিষ-সন্দর্ভ অতি বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। যদিও প্রাচীন জ্যোতিষের গ্রন্থাবলী লুপ্তপ্রায়, তথাপি সমস্ত জ্যোতিষ-গ্রন্থের বিবরণ লেখা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। সময়ে সময়ে বিভিন্ন গ্রন্থকারগণ নানামত ও বহুবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। সংপ্রতি দুইশত সাত জন জ্যোতিষ গ্রন্থকারের নাম জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় সন্দর্ভে দেখা যায়। উক্ত রচয়িতৃগণের বিরচিত গ্রন্থ মোট একশত আশীখানি। গ্রন্থকার হইতে গ্রন্থসংখ্যা ন্যূন হওয়ার কারণ এই যে, বহু গ্রন্থকর্ত্তার নাম ভিন্ন এখন আর তাঁহাদের প্রণীত সন্দর্ভ পাওয়া যায় না। সংপ্রতি সিদ্ধান্ত বা গণিত গ্রন্থের সমাদর খুব অধিক। সিদ্ধান্ত প্রণেতৃগণের মধ্যে অনেকেই আর্য্যভট্টকেই প্রথম বলিয়া মনে করেন। আর্য্যভট্ট,—জ্যোতিষ সিদ্ধান্তাবলীর মূলীভূত আর্য্য-সিদ্ধান্ত, ইনি ৩৯৫ শকাব্দায় জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। ৪২১ শকে (২৩ বৎসর বয়সের সময়) জ্যোতিষ-শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তাবলীর নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ "আর্য্যভট্টিয়-তন্ত্র" নামক সুপ্রথিত সন্দর্ভ রচনা করেন। স্বীয় গ্রন্থস্থ শ্লোকের ছন্দ রক্ষার নিমিত্ত কোথাও "ভট্ট" কোথাও বা "ভট্" - এইরূপ স্বনামের ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। * এতদ্বিষয়ে ভাউদাজি সাহেব বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন ; ইহার গ্রন্থে কলিযুগের সংখ্যা গণনানুসারে বর্ষ-নিরূপণ প্রাচীন মতে করিয়াছেন। তিনি শকাব্দাদির কোন উল্লেখ করেন নাই। যথা :—

"ষষ্ঠ্যব্দানাং ষষ্টির্যদাব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মমজন্মনোঽতীতাঃ" ॥

আর্য্যভটীর টীকাকার পরমেশ্বর, টীকার নাম 'দীপিকা।" ইহাঁর সিদ্ধান্ত সমূহ সম্প্রতি সুধী সমাজে (প্রাচ্য প্রতীচ্য) সমাদৃত। ইনি যুক্তি প্রদর্শনে সুদক্ষ ও সিদ্ধান্তে নিপুণ, ব্রহ্মগুপ্ত সিদ্ধান্তের ১১শ অধ্যায়ের ৮ম শ্লোকে "আর্য্যাষ্টশতে শশিনো ভ্রমন্তি দশগীতিকে"—ইহার দ্বারা বুঝা যায় অষ্টোত্তরশত বা আটশত আর্য্যাপূর্ণ গ্রন্থ সে সময় বর্ত্তমান ছিল।

* কালক্রিয়া পাদ ১০ম প্রকরণ, আর্য্যভটী।

ডাক্তার কর্ণেল্ সাহেবও স্বপ্রকাশিত পুস্তকে "তন্ত্রং অষ্টাধিক শত-মিত্যার্য্যারূপং"—এইরূপ লিখিয়াছেন। *

অনেক পণ্ডিত মনে করেন, প্রথমতঃ আর্য্যভট্ট সিদ্ধান্ত প্রভৃতি জ্যোতিষ গ্রন্থের সংস্কর্ত্তা, দ্বিতীয় ভাস্করাচার্য্য, তৃতীয় (বর্ত্তমান) সিদ্ধান্ত-দর্পণ রচয়িতা ৺চন্দ্রশেখর সামন্তসিংহ ও ম, ম, বাসুদেব শাস্ত্রী। সামুদ্রিক শাস্ত্র ও শকুন শাস্ত্রকে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অংশ বলিতে পারা যায়। সামুদ্রিক শাস্ত্রের উল্লেখ অগ্নিপুরাণ এবং স্মৃতিশাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শকুনশাস্ত্র "পঞ্চ পক্ষী" প্রভৃতি। এই গ্রন্থদ্বারা মানবের ভবিষ্যৎ, যাত্রাদির শুভাশুভ, দূরস্থ বিষয়, চোর কর্ত্তৃক অপহৃত ধন, নানা বিষয়ের প্রশ্ন প্রভৃতির অনায়াসে গণনা করা যায়। মূল সামুদ্রিক শাস্ত্র লুপ্ত হইয়াছে। আধুনিক দুই একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ পাওয়া যায়। এই শাস্ত্রকে গোপনে রাখিবার বিশেষ চেষ্টা করাতে এবং সুনিপুণ সরল প্রকৃতি উপদেষ্টার অভাবেই ইহা লোপ পাইয়াছে।

উক্ত জ্যোতিষ শাস্ত্রের অঙ্গদ্বয়কে (সামুদ্রিক ও শাকুনকে) মহর্ষিগণের গভীর সুচিন্তাপ্রসূত "অমূল্য জ্যোতির্বিজ্ঞান" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। অধুনা ভারত-বাসীর দুর্নিয়তিতে সামুদ্রিক শাস্ত্র কালাম্বুধিতে বিলীন। শকুনশাস্ত্র অতীত সমায়াকাশে উড্ডীন।

কল্প সিদ্ধান্ত,—ইনি সূর্য্যের পৌত্র, ভট্ট ত্রিবিক্রমের পুত্র, আর্য্যভটীয় টীকা, ভট্টদীপিকাকার-মহেশ্বরের মতে আর্য্যভট্টের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। স্বনামে সিদ্ধান্তগ্রন্থ, লগ্নসিদ্ধান্ত, অধ্যয়ন-অধ্যাপনা, সৌকর্য্য-পূর্ণ; এবং প্রত্যেক অধ্যায়ই শৃঙ্খলাযুক্ত, ত্রিস্কন্দ-তত্ত্বপূর্ণ অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। ইহার সকল পুস্তকের মধ্যে "শিষ্যধীবৃদ্ধিদ" গ্রন্থই শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের গণিতাধ্যায়ে মধ্যমাধিকার প্রভৃতি ৩টী অতি প্রয়োজনীয় বিষয় আছে। অপর একটি অধ্যায়ে চন্দ্র-শৃঙ্গোন্নতি † প্রকরণ অতি বিশদভাবে রহিয়াছে। ভাস্করাচার্য্য ও চন্দ্রশৃঙ্গোন্নতি সেইরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। প্রকরণান্তরে অপরাপর সিদ্ধান্ত-নিচয় বর্ণিত আছে।

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন-সাংখ্যসাগর বেদান্তভূষণ।

---

* জর্ম্মানমুদ্রিত আর্য্যভটী ভূমিকা।

† "শৃঙ্গোন্নতি গ্রহযুতিগ্রহণোদয়াস্তাঃ"—ভাস্করাচার্য্যঃ।

বিবর্ত্তবাদ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

উল্লিখিত আলোচনা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে Herschel ও Laplace এবং Lamalk ও Darwin প্রকৃতির অংশ বিশেষের বিবর্ত্তন সম্বন্ধেই আবিষ্কার ও আলোচনা করিয়াছেন। কেহই সমস্ত প্রকৃতির বিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিছু বলেন না। Darwin প্রাণিজগতেরই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু প্রাণি কোথা হইতে আসিল—তাহার উৎপত্তি কি—উহাও বিবর্ত্তনের ফল কিনা, সে বিষয়ে তিনি কিছুই বলেন নাই। পরন্তু তিনি একস্থলে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর যদি সময় বিশেষে জীবনীশক্তির সৃষ্টি করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোনও আশ্চর্য্যের কারণ নাই। তিনি শুধু দেখাইয়াছেন যে, বিন্দুমাত্র জীবনীশক্তি হইতে কিরূপে এই বিরাট বিশাল প্রাণিজগতের উৎপত্তি হইতে পারে।

সমস্ত প্রকৃতি—জড় ও আধ্যাত্মিক। কিরূপে বিবর্ত্তিত হইয়াছে, ইহা পণ্ডিতপ্রবর Herbert Spencerই প্রথম প্রমাণ করেন। তাঁহার মতে প্রকৃতির সমস্ত বস্তু—কি জড়, কি জীব, কি আধ্যাত্মিক, একই সূত্রে একই নিয়মে গ্রথিত। জড় পদার্থ হইতে জীবনীশক্তি এবং জীবনীশক্তি (প্রাণ) হইতে মনের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপের কোনও প্রয়োজন নাই। জগতের সমস্ত কার্য্যই প্রাকৃতিক নিয়মে পরিচালিত হইতেছে।

Hebert Spencer এর মতে কোনও বস্তুর অবিশেষে (homogeneous) অবস্থা হইতে বিশেষ (hetrogeneous) অবস্থা প্রাপ্তির নাম বিবর্ত্তন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রথমে এত অবিশেষ (nebulous) বস্তু স্বরূপ ছিল। কিন্তু অবিশেষ কখনও অবিশেষ অবস্থায় থাকিতে পারে না (The condition of homogeneity is a condition of unstable equilibrium—First Principles) তাহা বিশেষ হইতে চেষ্টা করে। এইরূপে অবিশেষ Nebula সৌরজগৎ ও অন্যান্য গ্রহাদিরূপে বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে।

'Principles of Biology' গ্রন্থে Herbert Spencer জড় হইতে জীবের উৎপত্তির আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব জড়েরই বিশেষীকরণ। জীবনীশক্তি বা প্রাণ নামে কোনও বিভিন্ন পদার্থ নাই, উহা জড়েরই একটী ক্রিয়া বা অবস্থা বিশেষ (Function)। একটা জড়বস্তু যখন অবস্থা বিশেষ প্রাপ্ত হয় এবং তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থের সহিত একতাসূত্রে গ্রথিত হয়, (in harmony with its environments) তখনই (Spencer প্রাণকে "The continual adjustment of internal relations to external relations" বলিয়াছেন) তাহাকে জীব বলা যায়। এবং এই একতার অভাবকেই মৃত্যু নামে অভিহিত করা হয়। 'Principles of Psychology' গ্রন্থে স্নায়বিক ক্রিয়া (nervous action) হইতে কিরূপে মানসিক ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, তাহাই দেখাইয়াছেন। মানবের মন বা আত্মা স্নায়বিক ক্রিয়ারই রূপান্তর মাত্র। প্রাণ হইতেই মনের বা আত্মার বিবর্ত্তন। নিম্নতম জীবের মধ্যে চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তুর সহিত একতা সম্বন্ধ অত্যন্ত অল্প, অবিশেষ ও ক্ষণস্থায়ী। উদ্ভিদের মধ্যে Yeast plant ও জীবের মধ্যে Gregerina এইরূপ। তাহারা যে সকল বস্তুর মধ্যে উৎপন্ন হয়, কেবলমাত্র সেই সকল বস্তুর ভিতর থাকিলেই, তাহারা জীবিত থাকিতে পারে। অন্য বস্তুর সম্বন্ধে আনীত হইলেও তাহাদের মৃত্যু হয়। এই একতা সম্বন্ধ যতই গাঢ়তর ও স্থায়ী হইতে থাকে, জীবের বিবর্ত্তনও সেই পরিমাণে পূর্ণ হইতে থাকে। (The progress to life of higher and higher kind essentially consists in a continual improvement of the adoptation between organic processes, and processes which environ the organism. Principles of Psychology Vol I.) ক্রমশঃ এই একতা সম্বন্ধ যখন স্থায়ী ও বিশেষ অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখনই মনের বিবর্ত্তন হয়। সুতরাং প্রাণ ও মনের বিভিন্নতা মাত্রার বিভিন্নতা মাত্র—বস্তুর বিভিন্নতা নয় (difference of degree and not a difference of things)। প্রাণ ও মন একই নিয়মে চালিত ও একই সূত্রে গ্রথিত।

Spencer তাঁহার 'Ethics' ও 'Principles of Sociology' গ্রন্থদ্বয়ে নিম্নতম মন হইতে কিরূপে সভ্য শিক্ষিত সমাজের মানব মন উৎপন্ন হয়, তাহাই দেখাইয়াছেন। নৈতিক ও সামাজিক বিবর্ত্তনও উপরোক্ত প্রাকৃতিক নিয়মেই

পরিচালিত। আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও নৈতিকশক্তি বিবর্ত্তনপ্রসূত। আদিম অসভ্য মানবের কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও আমাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধির মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। আদিম মানবজীবন যুদ্ধে জয়ী হইবার নিমিত্তই কতকগুলি নিয়মের সৃষ্টি করে; কালক্রমে ঐ নিয়মগুলির উপকারিতার পরিমাণে তাহাদের স্থায়িত্ব নির্দ্দিষ্ট হয়। যে নিয়ম বা প্রথাগুলি সমাজের উপকারী, সেইগুলিই স্থায়ী হয় আর অন্যান্য নিয়ম সকল কালক্রমে নষ্ট হইয়া যায়। যে নিয়মগুলি উপকারী সে গুলির পালন মানবশরীরে কতকগুলি স্নায়বিক পরিবর্ত্তন উৎপন্ন করে। সেই পরিবর্ত্তনগুলি আজকাল মানবের মনে উত্তরাধিকার নিয়মে স্বতঃই কতকগুলি নৈতিক নিয়মের সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং যে সকল নৈতিক নিয়মকে ও সামাজিক প্রথাকে আমরা ঈশ্বর-সৃষ্ট বলিয়া মনে করি, সে নিয়মসকল সময় বিশেষের সৃষ্ট পদার্থ নহে, তাহারা বহুকালব্যাপী বিবর্ত্তনের ফলমাত্র। এই নৈতিক বিবর্ত্তন—আভ্যন্তরিক ও বাহ্যিক শক্তির একতা সম্বন্ধ স্থাপন, অন্যান্য বিবর্ত্তনের নিয়মানুযায়ী। সুতরাং Spencerএর মতে এ জগতে সৃষ্টপদার্থ কিছুই নাই; জগতের যাবতীয় বস্তুই বিবর্ত্তন-প্রসূত, সেই অবিশেষ অস্থায়ী Nebula হইতেই একই প্রাকৃতিক নিয়মে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জড় ও আধ্যাত্মিক পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে।

প্রাকৃতিক বিবর্ত্তবাদীদের মতের সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়াছি। এখন এই মতের সমালোচনা করিব। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি 'সাংখ্যমত ও Spencer এর মতই সম্পূর্ণভাবে প্রাকৃতিক বিবর্ত্তবাদ; কারণ এই দুইটী মতই কেবল সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও বিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা করে। সুতরাং সমালোচনার সুবিধার জন্য আমরা এই দুইটী মতের বিরুদ্ধে যে সকল আপত্তি আছে তাহারই আলোচনা করিব।

(১) সাংখ্যের মতে প্রকৃতিই জগতের আদি উপাদান এবং পুরুষের ভোগ ও মোক্ষের জন্যই ইহা পরিণামগ্রস্থ হয়। কিন্তু পুরুষ কেবলমাত্র দ্রষ্টা, ভোক্তা ও নির্গুণ, ইহার কার্য্যকরী শক্তি কিছুই নাই; সুতরাং আমাদের প্রশ্ন এই যে, অচেতনা প্রকৃতির শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করে কে? অবশ্য অন্ধ ও খঞ্জের উপাখ্যানের উপমা এস্থলে আসিতে পারে না; কারণ সে স্থলে দুইটীই শক্তিমান্ পুরুষ (active subject) বিদ্যমান। সাংখ্যেরা উত্তর করিলেন যে, প্রকৃতি

'প্রসবধর্ম্মী'—প্রকৃতির স্বভাবই এই ; কিন্তু এ উত্তর কি সন্তোষজনক ? আমি যদি কোনও বৈদ্যকে জিজ্ঞাসা করি, মহাশয় আমার রোগের কারণ কি এবং তিনি যদি উত্তর দেন যে, তোমার শরীরে রোগের উৎপত্তির কারণ আছে ; আমি কি সেই উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারি ? সুতরাং প্রকৃতিকে 'প্রসবধর্ম্মী' বলিয়াই এ জগৎ-বিবর্ত্তনের ব্যাখ্যা করা অনুচিত।

(২) সাংখ্যমতে স্ত্রী ও পুরুষের সংযোগে যেরূপ সন্তানোৎপত্তি হয়, সেইরূপ প্রকৃতি ও পুরুষের সংযোগে জগতের উৎপত্তি হয়। কিন্তু তাহা হইলে পুরুষ কেবল দ্রষ্টা বা ভোক্তা হইলেন কি প্রকারে ? আমরা দেখিয়াছি যে কেবল প্রকৃতি হইতে জগতের বিবর্ত্তন সাধিত হইতে পারে না—পুরুষের উপস্থিতি আবশ্যক। সুতরাং Millএর কথায় বলিতে হইলে, আমরা প্রকৃতিকে জগতের 'unconditional-antecedent' বলিতে পারি না ; সুতরাং পুরুষকে শুধুই দ্রষ্টা বলিলে জগতের ঠিক কারণ নির্দ্দেশ করা হয় না।

(৩) সাংখ্য ও Spencer উভয়েরই মতে আদি প্রকৃতি (Spencer যাহাকে Nebula বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন) অবিশেষ অবস্থাপন্ন (homogenous)। অবিশেষ অবস্থা বলিলে আমরা বুঝি যে, কতকগুলি বিভিন্নশক্তি একত্র সমাবিষ্ট হইয়া এরূপভাবে সামঞ্জস্য লাভ করিয়াছে যে, কোনও শক্তিই অপরের অপেক্ষা প্রবলতর হইতে পারিতেছে না। সুতরাং এরূপ অবিশেষ পদার্থের বিশেষী-করণ জন্য কোনও বাহ্যিকশক্তির আবশ্যক। অবিশেষ পদার্থ তমোগুণশালী, ইংরাজীতে ইহাকে Inertia বলা যাইতে পারে। ইহা যদিও শক্তির আধার বটে, কিন্তু ইহা হইতে উৎপত্তির সম্ভব নহে। ইহাকে potential energy বলা যাইতে পারে। কিন্তু potentialকে Kinetic or Dynamic করিতে হইলে অন্য কোন দ্বিতীয় শক্তির আবশ্যক। সুতরাং সাংখ্যমতে বা Spencerএর মতে জগতের প্রারম্ভের কোনও ব্যাখ্যা হইতে পারে না। Dr. Carpenter এই বিষয়টী তাঁহার 'Nature and Man' গ্রন্থে বেশ প্রাঞ্জলভাবে বুঝাইয়াছেন।' প্রাকৃতিক বিবর্ত্তবাদ আলোচনা করিয়া তিনি লিখিয়াছেন "Hence it is obvious that however remote that point to which we trace in thought the history of our universe, we are still confronted

with the impossibility of accounting by physical causation for its commencement." (অর্থাৎ আমরা এই জগৎ উৎপত্তির ইতিহাসে যতদূর যাই না কেন, সেই উৎপত্তির প্রারম্ভ কেবলমাত্র প্রাকৃতিক বা জড়কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে না।

(৪) Spencer বলেন যে জড় Nebula হইতে এই সমস্ত জগতের বিবর্ত্তন হইয়াছে। তিনি ইহাও স্বীকার করেন যে, কোনও নূতন বস্তুর আবির্ভাব অসম্ভব। সুতরাং তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে যে এই জড় Nebulaর মধ্যে প্রাণ ও মন বা আত্মার জীবন নিহিত আছে। যদি ইহা বলিতে হয় যে জড় হইতে চেতনের বিবর্ত্তন হইতেছে, তাহা হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, এই জড়ের মধ্যে চেতনের অস্তিত্ব রহিয়াছে। অবশ্য ঐ চেতনাশক্তি অহেতুকী (potential) অবস্থায় থাকিতে পারে। আমরা আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই দেখিতে পাইতেছি যে, মন বা চেতনাশক্তি জড়কে চালিত করিতেছে; এমন কি এই মন ব্যতীত আমরা জড়কে অনুভবই করিতে পারিতাম না। সুতরাং এস্থলে আমরা যদি বলি যে জড়ই মনের কারণ, তাহা হইলে কি আমরা মনোবিজ্ঞানের নিয়মের ব্যতিক্রম করিব না? Dr. Ward তাঁহার 'Naturalism and Agnosticism' গ্রন্থে যথার্থই বলিয়াছেন যে, যখন আমরা দেখিতে পাইতেছি উন্নত জীবে প্রাণ ও মন একত্র রহিয়াছে; তখন আমরা যদি বলি নিম্নতম জীবে মন ব্যতীত প্রাণ রহিয়াছে। তাহা হইলে আমরা প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য (uniformity of nature) নিয়মের ব্যতিক্রম করিব।

(৫) কেবল জড় প্রকৃতির দিক্ হইতে দেখিলে জড় হইতে প্রাণের উৎপত্তি এবং প্রাণ হইতে মনের উৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এ পর্য্যন্ত অনেক চেষ্টা করা হইয়াছে, কিন্তু কখনও কোনও রাসায়নিক পরীক্ষাগারে (chemical laboratory) জড়পদার্থে জীবনীশক্তির সঞ্চার করিতে পারা যায় নাই। এমন কি Spencerও ঠিক করিয়া বলিতে পারেন নাই যে কোন মুহূর্ত্তে জড় প্রাণিরূপে পরিণত হয়। দু'একজন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত স্থির করিয়াছেন, আমাদের পৃথিবীতে জীবনীশক্তি ছিল না। এ শক্তি উল্কাদ্বারা অন্য কোনও উন্নততর জগৎ হইতে আনীত হইয়াছে—কিন্তু তাহা হইলে 'প্রাণের' উৎপত্তির ব্যাখ্যা হইল কোথায়?

(৬) Spencer স্বীকার করেন যে, অনন্তশক্তির ধারণা ব্যতীত আমরা জগতের উৎপত্তির ও অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতে পারিব না। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে, যদি এই শক্তি জড় ও অন্ধশক্তি হয়, তাহা হইলে এই অনন্ত বৈচিত্র্যময় জগতের আবির্ভাব হইল কিরূপে? জগতে তাড়িৎশক্তি যথেষ্টই রহিয়াছে, কিন্তু বুদ্ধি ব্যতীত সেই শক্তি কি কোনও বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইতে পারে? সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, এই অনন্তশক্তির যদি চেতন বা উদ্দেশ্য-সাধিকা ক্ষমতা (purpose or selective force) না থাকে, তাহা হইলে অন্য দ্বিতীয় শক্তির হস্তক্ষেপ ব্যতীত জগৎ সৃষ্ট হইতে পারে না। দার্শনিক Spinoza বলিবেন যে, ইহা প্রকৃতির সংস্কার (instinct)। কিন্তু Spencer সে কথা বলিতে পারেন না, কারণ তাঁহার মতে সংস্কার বুদ্ধির চরম বিবর্ত্তন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে আমরা প্রাকৃতিক বিবর্ত্তবাদের দোষগুণ বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতে পারিব। এই মতের মূলে যে সত্য নিহিত আছে, তাহা আমরা স্বীকার করিব। নিম্নস্তর হইতে উচ্চস্তরের ক্রমিক বিকাশ আমরা মানিয়া লইব। মানবের জড়দেহও যে এই প্রাকৃতিক বিবর্ত্তনের নিয়মাধীন তাহাও আমরা স্বীকার করিব। কিন্তু এই মত জগতের দার্শনিক বা সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা করিতে অক্ষম তাহাও আমরা দেখিয়াছি। বৈজ্ঞানিকের দিক্ হইতে তর্ক করিলে, আমাদের এ মতের বিরুদ্ধে বলিবার কিছুই নাই। কিন্তু দার্শনিকের দিক্ হইতে বলিতে হইবে যে এ মত অসম্পূর্ণ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এ মত কোনও আরম্ভের ব্যাখ্যা করিতে পারে না; ইহা প্রাকৃতিক শৃঙ্খলের এক একটী গ্রন্থির ব্যাখ্যা করিতে পারে। কিন্তু শেষ গ্রন্থির কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। এই মতের আরও একটী দোষ এই যে, ইহা বাহ্যিক বা প্রাকৃতিকের (objective or external) দিক্ হইতে জগতের ব্যাখ্যা করিতেছে; কিন্তু আভ্যন্তরীকের (subjective) দিক্ ব্যতিরেকে জগতের দার্শনিক ব্যাখ্যা হইতে পারে না। এক কথায় বলিতে হইলে বস্তুর অনুভূতিই হইত না। সুতরাং যদি আমাদের এই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের দার্শনিক ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে আমাদের চেতনাশক্তি বা আত্মাতেই সে ব্যাখ্যার অনুসন্ধান করিতে হইবে। আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তবাদ এই মতের উপরই প্রতিষ্ঠিত।

আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তবাদের আলোচনা করিতে হইলে, প্রথমেই আমাদের

বেদান্ত-দর্শনের উল্লেখ করিতে হইবে। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদকেই আমরা বেদান্তমত বলিয়া নির্দ্দেশ করিব।

বৈদান্তিকের মতে ব্রহ্মই জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হন। এ বিবর্ত্তন বিকার নহে। এই বিবর্ত্তনের মধ্যে ব্রহ্মের স্বরূপ অক্ষুণ্ণ থাকে; তিনি কোনরূপে বিকৃত হন না। তাঁহার অবস্থার কোনরূপ পরিবর্ত্তন ঘটে না; অথচ তিনি জগৎরূপে বিবর্ত্তিত হন। ইহাকেই বৈদান্তিকেরা বিবর্ত্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। আদিতে শুধুই ব্রহ্ম বিদ্যমান ছিলেন। 'আত্মা বা ইদম্ এক এবাগ্র আসীৎ' (ঐতরেয়)। এই আত্মা হইতেই সমস্ত জগতের উৎপত্তি। "যথোর্ণনাভিস্তন্তুনোচ্চরেদ্, যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা, ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণাঃ সর্ব্বে লোকাঃ সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।" (বৃহদারণ্যক) যেমন মাকড়সা নিজের ভিতর হইতে তন্তু উদ্গীরণ করে, যেমন অগ্নি বিস্ফুলিঙ্গ উদ্গীরণ করে, সেইরূপ এই আত্মা সমস্ত প্রাণ, সমস্ত লোক, সমস্ত দেব ও সমস্ত ভূত উৎপন্ন করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্ম জগতের শুধু নিমিত্তকারণ নহেন। তিনি ইহার উপাদান কারণ। জগৎ ব্রহ্মের বাহিরে নহে এবং ব্রহ্মও জগতের বাহিরে নহেন। এক অনাদি অনন্ত ব্রহ্মকে লোকে মায়ার ভিতর দিয়া বহু এবং সান্ত জীবরূপে প্রত্যক্ষ করে, কিন্তু যেদিন জ্ঞানালোকে মায়ান্ধকার বিদূরিত হইবে, সেই দিনই জীব শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত হইয়া বলিবে 'সোঽহং'—সেই ব্রহ্মই আমি। 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'—জীবই ব্রহ্ম। "এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ"—একই আত্মা প্রতি ভূতে অবস্থিত, জলে চন্দ্রের ন্যায় তিনিও বহুরূপে পরিদৃষ্ট হন। এই মতের দার্শনিক নাম সর্ব্বেশ্বরবাদ (Pantheism)।

এস্থলে অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, যে ব্রহ্ম কি?—শ্রুতিতে ব্রহ্মের দুইটী লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—একটী (aspect) নির্ব্বিশেষ ও নির্গুণ, অপরটী সবিশেষ ও সগুণ। ব্রহ্মের নির্গুণভাবের কোনই পরিচয় দেওয়া যায় না। পরিচয়ের সময় কেবলমাত্র 'নেতি' 'নেতি' 'তিনি ইহা নহেন' 'তিনি ইহা নহেন' ইহাই বলিতে পারা যায়। তিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ। এক কথায় তিনি ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি উভয়েরই অতীত। "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা"। শ্রুতিতে ব্রহ্মের এই দুই গুণের উল্লেখ থাকিলেও শঙ্করাচার্য্য সগুণ

ব্রহ্মের প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। তাঁহার মধ্যে এই সগুণ ব্রহ্ম বা মহেশ্বর মায়াসৃষ্ট পদার্থ (phenomenal), ইহার চিরন্তন সত্তা (reality) নাই। যেমন ব্রহ্ম মায়া উপাধিতে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীয়মান হন, সেইরূপ তিনি অবিদ্যা উপাধিতে জীব বলিয়া পরিগণিত হন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন বৈদান্তিকেরা জগতের সত্তারই স্বীকার করেন না, তখন তাহাদের মতকে কি করিয়া বিবর্ত্তবাদ বলা যাইতে পারে। ইহার উত্তরে আমরা বলিব যে, বৈদান্তিকেরা জগতের ও জীবের অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করেন না। ইহাদের উভয়েরই ব্যবহারিক (Phenomenal) সত্তা আছে; কিন্তু চিরন্তন সত্তা (permanent or nevmenal reality) নাই। যতদিন না জীবের মায়া ও অবিদ্যা (Ne-science দূর হইবে, ততদিন তাহার নিকট ব্রহ্ম, জীব ও জগৎ বিভিন্ন বস্তু। কিন্তু যেদিন যে মুহূর্ত্তে তাহার মায়ান্ধকার বিদূরিত হইবে সেই দিনই সে দেখিবে 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ'। এখন দেখা যাইতেছে যে, সেই অদ্বিতীয় অনন্তশক্তিই মায়াবশে বিবর্ত্তিত হইয়া, এই সমস্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত হইতেছেন। এই মায়া কোনও বিভিন্ন শক্তি নয়, ইহা সেই অনাদি ব্রহ্মেরই একটী শক্তিমাত্র। যদিও শঙ্করাচার্য্য মায়ার কোনও ব্যাখ্যা দেন নাই অথচ বলিয়াছেন, সদসদ্ভ্যাম্ অনির্ব্বাচ্যা মিথ্যাভূতা সনাতনী'—মায়া সত্যও নয়, মিথ্যাও নয়, সৎও নয়, অসৎও নয়, ইহা অনির্ব্বাচ্য। কিন্তু তথাপি আমাদের মনে হয় যে, মায়া যখন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মেরই শক্তি—উহা ব্রহ্মেরই বুদ্ধি শক্তির বিকাশ মাত্র; সুতরাং সেই অনন্তের চিন্তাই আমাদের জগৎরূপে পরিণত হইয়াছে। যখন ব্রহ্ম ও তাঁহার চিন্তা একই সময় হইতে অবস্থিত (co-eternal), তখন ব্রহ্ম ও জগৎ একই সময় হইতে অবস্থিত। সময় হিসাবে কেহ কাহারও পূর্ব্বে হইতে পারে না; সুতরাং ব্রহ্ম ও জগৎ অভিন্ন। এক ভিন্ন অপরের অস্তিত্ব অসম্ভব, কারণ দু'য়েরই অস্তিত্ব এক। আবার জীবও স্তরে স্তরে উন্নীত হইতেছে। সে যদিও স্বভাবতঃ মুক্ত, তথাপি মায়াবশে সে নিজেকে বদ্ধ দেখে। সেই জন্যই তাহাকে জন্মজন্মান্তর ধরিয়া জ্ঞানলাভ করিতে হয় এবং এই জ্ঞানলাভ যেদিন সম্পূর্ণ হয়, সেই দিন ব্রহ্মের সহিত মিলিত হয়। সুতরাং ব্রহ্মের মায়িক শক্তি বা প্রক্ষিপ্ত বুদ্ধির জন্য যে জগৎ সৃষ্ট বলিয়া বোধ হয়, তাহা পুনরায় বিবর্ত্তিত ও উন্নীত হইয়া সেই অনন্ত আধ্যাত্মিক শক্তিতে লীন হয়।

এই মায়া বা প্রক্ষিপ্ত বুদ্ধির মত অনেকটা german দার্শনিক Fichteএর

জ্ঞানলাভের জন্য জ্ঞেয় বিষয় (object) সৃষ্টি করিতে নিজেকে প্রক্ষিপ্ত করে (projects itself)। অতএব দেখা যাইতেছে যে, বৈদান্তিক মত সম্পূর্ণভাবে আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তবাদ, কারণ এ মত সৃষ্টিবাদের ন্যায় ব্রহ্ম ও জগতের বিভিন্নতা স্বীকার করে না; এবং জগৎ যে সেই অনন্ত শক্তির একটা সৃজন-খেলা মাত্র (creative fiat) ইহাও স্বীকার করে না। এ জগৎ ব্রহ্মেরই একটা রূপান্তর মাত্র। এ মতে জগৎ যে শুধু প্রাকৃতিক ও জড়নিয়মে বিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহাও স্বীকার করেন না। এই বিশ্ব-বিবর্ত্তনের মধ্যে একটা অনাদি অনন্ত চিন্তাশক্তি বা আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত রহিয়াছে। (ক্রমশঃ)

শ্রীসীতারাম বন্দ্যোপাধ্যায়।

অর্ঘ]

হরিদ্বার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পৌরাণিক উৎপত্তি কাহিনী ও নামের বিচার।

"হরিদ্বার"—হরদ্বার, মায়াপুরী, গঙ্গাদ্বার, স্বর্গদ্বার, মোক্ষদ্বার, কণখল প্রভৃতি নানা নামে অতি প্রাচীন কাল হইতে বিখ্যাত। শাস্ত্রানুসারে সমস্ত ক্ষেত্রেরই এই নাম; * কিন্তু এক্ষণে মায়াপুরী কণখল প্রভৃতি ক্ষেত্রের এক একটী অংশ বা মহল্লার নাম হইয়াছে। এই পবিত্র ক্ষেত্রে তপস্যা করিলে হরিহরও মোক্ষ প্রাপ্তির আনুকূল্য হয় বলিয়া ইহার নাম হরিদ্বার, হরদ্বার বা বা মোক্ষদ্বার। কেহ কেহ বলেন ভগবান্ হর ও হরির প্রিয় ক্ষেত্র কেদার-নাথ ও বদরীকাশ্রম যাইবার দ্বারস্বরূপ বলিয়া, এই স্থান হরিদ্বার বা হরদ্বার নামে অভিহিত। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন নাম মায়াপুরী। মায়া স্বয়ং ভগবতী, তাঁহার পুরী বলিয়াই ইহা মায়াপুরী নামে খ্যাত। বিশ্ব জাগরণের ব্রাহ্ম, মুহূর্ত্তে কল্পের প্রথম ভাগে, যখন ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রজাপতিগণের আধিপত্যে অভিষিক্ত দক্ষ গর্ব্বান্বিত হইয়া শিবহীন যজ্ঞ করিয়াছিলেন, এবং পতিনিন্দা শ্রবণে ক্রোধে কম্পিত-কলেবরা সাশ্রুনেত্রা সতী সেই যজ্ঞভূমিতেই শঙ্কর-বিদ্বেষী পিতার শরীর হইতে উৎপন্ন মায়া-বপু ত্যাগ করিয়াছিলেন; সেইদিন হইতেই এই পবিত্র তীর্থ [illegible] নামে খ্যাত।

সেই পবিত্র কাহি[illegible] [illegible]ক্ষের [illegible] সুপরিচিত। মহাদেবের বীরভদ্রপ্রমুখ অনুচরবৃন্দ

*স্কং পরে অন্তঃ॥

যজ্ঞ নষ্ট, দক্ষের মুণ্ডচ্ছেদ ও যজ্ঞকুণ্ডে মুণ্ড ভস্মীভূত এবং দক্ষের পক্ষপাতী দেব ও ঋষিগণের অশেষ দুর্গতি করেন। দেবতারা স্তুতি ও পূজা দ্বারা মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিলে, আশুতোষ কহিলেন ;—

প্রসন্নোঽস্মি বরং ব্রুত সর্ব্বে দেবাঃ স বাসবাঃ।
ময়ি প্রসন্নে জগতি দুর্ল্লভং নহি বিদ্যতে॥

হে বাসবপ্রমুখ দেবতাবৃন্দ! আমি প্রসন্ন হইয়াছি, বর গ্রহণ কর। আমি প্রসন্ন হইলে জগতে কিছুই দুর্ল্লভ থাকে না। দেবগণ প্রার্থনা করিলেন যে, দক্ষ জীবিত হউন ও যজ্ঞ পূর্ণ হউক। মহাদেব বলিলেন তথাস্তু; কিন্তু দক্ষের মুণ্ড ভস্মীভূত হইয়াছে, অজ মুণ্ড সংযোগে দক্ষ জীবিত হইবেন। শিবানুগ্রহে অজমুখ দক্ষ প্রজাপতি জীবিত হইয়া মহাদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ও স্তবাদি দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিলেন। মহাদেব আশুতোষ, এমন সহজে কে অপরাধ ক্ষমা করিবেন? তিনি বলিলেন দক্ষ বর গ্রহণ কর। দক্ষ কহিলেন,—

মহাদেব প্রভো দেব প্রসন্নোঽসি যদীশ্বরঃ।
তৎপাদকমলে ভক্তির্ম্ম জন্মনি জন্মনি॥
ভূয়াৎ তথেদং তীর্থং তু মহাপাতকনাশনম্।
যস্য সন্দর্শনাদেব ব্রহ্মহত্যাদিকানি চ॥
পাপানি প্রশমং যান্তু যদি তে মযানুগ্রহঃ।
স্থিতিশ্চ ভবতো নিত্যং ক্ষেমং ভবতু সর্ব্বদা॥

হে মহাদেব! হে প্রভো! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তবে ইহাই প্রার্থনা করি, যে জন্মে জন্মে যেন আপনার চরণকমলে আমার ভক্তি হয়। আর আপনার কৃপায় এই স্থান মহাপাতকনাশক পুণ্যতীর্থে পরিণত হয় এবং এই পবিত্র তীর্থ দর্শনে ব্রহ্মহত্যাদি পাপ নাশ হয় ও আপনি এইস্থানে নিত্য অবস্থিত থাকিয়া জীবের কুশল বিধান করুন।

মহাদেব বলিলেন ;—

ভবিষ্যত্যেব হি তথা যথা যাচ্ঞা কৃতা ত্বয়া।
ইদং ক্ষেত্রং মহাপুণ্যং যাবদ্বৈ যজ্ঞভূমিকা॥
* * *
মায়া ভগবতী সাক্ষাৎ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী।
তৎক্ষেত্রং হি ময়া প্রোক্তং ভবমুক্তিপ্রদায়কং॥
* * *
যত্র মায়া নিমিত্তং হি জাতং সর্ব্বং প্রজায়তে

সকৃদ্দর্শনমাত্রেণ যস্ত তীর্থস্ত মানব।
কোটীজন্মকৃতেভ্যস্তু পাপেভ্যঃ পরিমুচ্যতে ॥ কেদারখণ্ড—
মায়াপুরী মাহাত্ম্য।

হে দক্ষ! তুমি যাহা প্রার্থনা করিলে তাহাই হইবে। তোমার যজ্ঞানুষ্ঠানের ভূমি মহা পুণ্যপ্রদ তীর্থ হইল। সৃষ্টি-স্থিতি-অনন্তকারিণী স্বয়ং ভগবতী মহামায়ার এই ক্ষেত্র মুক্তি-প্রদায়ক। যে প'বত্র ভূমিতে দেবীর মায়া-বপু (মহামায়া ত্রিগুণাতীতা তিনি সর্ব্বভূতে ব্যাপ্তা তাঁহার দেহ ধারণ মায়াজনিত) ত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা ত্রিলোকে পুণ্যতীর্থ। এই পবিত্র ভূমিতে "সর্ব্বং" জাত পদার্থ, মায়া নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছে; সেই জন্য এই ক্ষেত্র মায়াপুরী নামে অভিহিত হইবে। এই পবিত্র তীর্থ একবার দর্শন করিলে কোটীজন্মকৃত পাপ ক্ষয় হয়।

দক্ষযজ্ঞের সময় হইতেই "মায়াক্ষেত্র" উৎপন্ন হইল * এবং দক্ষ প্রজাপতির যজ্ঞ যতদূর বিস্তৃত ছিল, ততদূর মায়াক্ষেত্রের বিস্তার হইল।

দ্বাদশ যোজনায়াতং যজ্ঞস্থায়তনং দ্বিজ।
তৎপ্রমাণং মহাভাগ বভূব ক্ষেত্রমুত্তমম্ ॥

পৌরাণিক বর্ণনানুসারে মায়াপুরীর বিস্তার দ্বাদশ যোজন। হৃষীকেশ, লছমনঝোলার নিকটবর্ত্তী লক্ষ্মণতীর্থ তপোবন, দ্রোণাশ্রম (দেরাদুন), রামাশ্রম প্রভৃতি তীর্থ মায়াপুরীর অন্তর্গত। মায়াপুরী-মাহাত্ম্যে এই সকল তীর্থের বর্ণনা ও মাহাত্ম্য লিখিত আছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে আমরা আধুনিক হরিদ্বার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী তীর্থগুলিরই বর্ণনা করিব। হৃষীকেশ তপোবন প্রভৃতির বর্ণনা ভিন্ন প্রবন্ধে করিবার ইচ্ছা থাকিল।

হরিদ্বারের নামান্তর গঙ্গাদ্বার ও মোক্ষদ্বার। পরমভক্ত ভগীরথ রাজার তপস্যা প্রভাবে ব্রহ্মশাপে ভস্মীভূত সগরসন্তানগণের উদ্ধারার্থ যেদিন বিষ্ণুপাদার্ঘ্যসম্ভূতা মোক্ষদায়িকা গঙ্গা হিমালয় হইতে ভূতলে অবতীর্ণা হইয়াছেন, সেইদিন হইতে এই পবিত্র তীর্থ গঙ্গাদ্বার ও মোক্ষদ্বার নামে খ্যাত হইয়াছে।† গঙ্গাদ্বারের উত্তরের ভূমি তপোবন। তাই বুধগণ হিমালয়কে স্বর্গভূমি বলিয়া-

* ততোবধি (দক্ষযজ্ঞাবধি) মহাভাগ মায়াক্ষেত্র বভূবহ। মায়াপুরী মাহাত্ম্য।

† ইদং তীর্থং মহাপুণ্যমভূৎ গঙ্গাগমে পুনঃ।
গঙ্গাদ্বারমিতি খ্যাতং স্মরণাৎ পাপনাশনম্ ॥
যদা ভগীরথো রাজা সূর্য্যবংশধরঃ প্রভুঃ।

ছেন। দক্ষিণের ভূমি ভূতলে, তাই গঙ্গাদ্বারের এক নাম স্বর্গদ্বার*। হরিদ্বারের নামকরণ লইয়াও অদূরদর্শী শৈব এবং বৈষ্ণবেরা বিবাদ করেন। শৈবেরা বলেন ইহা শিবের পুরী হরদ্বার, বৈষ্ণবেরা বলেন ইহা হরির পুরী হরিদ্বার। যিনি হর তিনিই হরি, আবার তাঁহারই দ্রবময়ীরূপ গঙ্গা। শাস্ত্র বলেন গঙ্গা, দুর্গা, হরি ও হরে ভেদজ্ঞানকারী নিরয়গামী হইয়া থাকেন। "গঙ্গা দুর্গা হরীশানং ভেদকৃন্নারকী ভবেৎ।" (বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ) একজন রসজ্ঞ কবি বলিয়াছেন ;—

উভয়োরেকা প্রকৃতিঃ প্রত্যয়ভেদাদ্ বিভিন্নবৎ ভাতি।
কলয়তি হরিহরভেদং লোকো যৎতদ্ বিনাশাস্ত্রম্॥

অর্থাৎ হরি ও হর উভয়েরই প্রকৃতি এক। প্রত্যয়ের ভেদবশতঃ অর্থাৎ মনুষ্য ভেদে তাহাদের অন্তর্প্রত্যয় ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায়, তাঁহাদের নিকট হরি ও হর ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া বোধ হয়েন। বস্তুতঃ লোকে যে হরিহরে ভেদবুদ্ধি করে, তাহা বিনাশাস্ত্র অর্থাৎ ভেদদর্শিগণের বিনাশের অস্ত্রস্বরূপ। পক্ষান্তরে হরি ও হরের প্রকৃতি বা ধাতু অভিন্ন। এক হৃ ধাতু হইতে উভয়ের উৎপত্তি। কেবল প্রত্যয়ের ভেদ অর্থাৎ 'ই' প্রত্যয় করিলে হরি এবং অন্ প্রত্যয় করিলে 'হর' এই পদ হয়। এইরূপে প্রত্যয়ের ভেদ আছে। লোকে যে ভেদ কল্পনা করে, তাহা ব্যাকরণাদি শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবেই করিয়া থাকে।

Ancient geography of india প্রণেতা ক্যাণিংহাম সাহেব বলেন, হরিদ্বার নামটী আধুনিক। তাঁহাদের যুক্তি এই যে আবুরিহান ও রসিদউদ্দিন নামক মুসলমান ইতিহাস লেখক গঙ্গাদ্বার নামের উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীন পরিব্রাজক হিয়ঙথিসাঙ, ময়ূলো বা মায়াপুরী নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। মহাভারতেও গঙ্গাদ্বার ও কণখল নামই পাওয়া যায়। ক্যাণিংহাম সাহেবের এই মতানুবর্ত্তী হইয়া দেশী বিদেশী প্রায় সকল লেখকই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হরিদ্বার নামটী নিতান্ত আধুনিক। এমন কি মুসলমান লেখকগণের সময়ও ১৪০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে হরিদ্বার নাম প্রচলিত ছিল না।† নব প্রকাশিত "ভারতবর্ষ" পত্রের জনৈক হিন্দু লেখকও এই মতেরই

* স্বর্গাৎ নিপাতিতা গঙ্গা পৃথিব্যামাগতা যদা।
তদৈবাস্ত দ্বিজশ্রেষ্ঠ গঙ্গাদ্বারমিতি শ্রুতম্॥
গঙ্গাদ্বারোত্তরং বিপ্র স্বর্গভূমিঃ স্মৃতা বুধৈঃ।
অন্যত্র পৃথিবী প্রোক্তা গঙ্গাদ্বারোত্তরং বিনা।
ইদমেব মহাভাগ স্বর্গদ্বারং স্মৃতং বুধৈঃ। কেদারখণ্ড মায়াপুরী মাহাত্ম্য ১০৬ অধ্যায়

† The name of Hardwar in comparatively modern and probably does

প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। আমরা কিন্তু এই সিদ্ধান্তটী সমীচিন বলিয়া মনে করি না। কারণ কোন কোন পুরাণে হরিদ্বার নামের উল্লেখ পাইতেছি;—

তুলসী কাননে গোষ্ঠে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে পদে।
বৃন্দারণ্যে হরিদ্বারে তীর্থেষ্বন্যেষু বা যথা॥ ব্রহ্ম-বৈঃ পুঃ—জন্মখণ্ড ১।৪-
কেচিদূচু র্হরিদ্বারং মোক্ষদ্বারং পরে জগুঃ।
গঙ্গাদ্বারঞ্চ কেহপ্যাহুঃ কেচিন্মায়াপুরীং পুনঃ॥ স্কন্দ পুঃ—কাশীখণ্ড।

অবশ্য উইলসন প্রমুখ বিলাতী প্রত্নবিদ্‌গণ এবং ৺অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ দেশী পণ্ডিতগণ বলেন, "পুরাণগুলি নিতান্ত আধুনিক গ্রন্থ। কাশীখণ্ড গ্রন্থখানি ত' ষোড়শ শতাব্দীতেই রচিত হইয়াছে।" হিন্দুর বিশ্বাস পুরাণগুলি অতি প্রাচীন গ্রন্থ, সে বিশ্বাসের কথা উথাপন করিয়া প্রত্নবিদ্‌গণকে নিরস্ত করিবার উপায় নাই। তাঁহাদের যুক্তির অসারত্ব প্রদর্শন করিবার জন্য কেবল একটী কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল হইতে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর হস্তলিখিত স্কন্দপুরাণ সংগ্রহ করিয়াছেন; সুতরাং বিলাতী প্রত্নবিদ্‌গণের বিচারপ্রণালী অনুসারেও "কাশীখণ্ড" গ্রন্থখানিকে ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।"* যতই অনুসন্ধান হইতেছে, ক্রমশঃই পুরাণগুলির প্রাচীনত্বের নূতন নূতন প্রমাণ সংগ্রহ হইতেছে। হিন্দুগণ অবশ্য পুরাণগুলিকে অতি প্রাচীন বলিয়াই গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন। বিলাতী পণ্ডিতগণের হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে গবেষণা কিরূপ হাস্যাস্পদ তাহা দেখাইবার জন্যই এইটুকু লিখিলাম। দুঃখের বিষয় আমরাও বিনা বিচারে এই সকল মত গ্রহণ করিয়া, আমাদের শাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া থাকি; এবং যাহা প্রাচীন ও পবিত্র তাহার প্রতি শ্রদ্ধা হারাই। (ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

অর্থ]

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

*মুর্শিদাবাদের অন্তর্গত কিরীটেশ্বরী অনেকেরই নিকট পরিচিত। তন্ত্রে কিরীট-কণা বা মুকুটেশ্বরী নামে যে একটী পীঠের উল্লেখ আছে, অনেকের মতে এইটীই সেই কিরীটেশ্বরীর পীঠ। বহু প্রাচীন হইলেও বঙ্গাধিকারীদিগের উন্নতাবস্থায়

সময়ে ইঁহার মন্দিরাদি ও পূজা-সেবার সুবন্দোবস্ত ছিল। এমন কি, ইঁহার মাহাত্ম্য এমন প্রচারিত হইয়াছিল যে, মুসলমান নবাব আলিবর্দ্দীও ইঁহার চরণামৃত পান করিয়া যন্ত্রণার লাঘবতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ডাহাপাড়া এই কিরীটেশ্বরী হইতে এক মাইলের কিছু অধিক গঙ্গাতটে অবস্থিত। বর্ত্তমান সময়ে কালের আক্রমণে মন্দিরগুলি ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সামান্যাকারে পূজাদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মন্দিরে কোনও মূর্ত্তি নাই। একটী মাত্র বেদী আছে। নবকুমার এক্ষণে যাঁহার বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ব পরিচয় কিছু জানা প্রয়োজন। তিনি ধর্ম্ম-পিপাসু, জাতি ব্রাহ্মণ, বয়ঃক্রম ৪২ বৎসর ; কিন্তু দেখিতে কিছু বেশী বোধ হয়। তিনি এই স্থানে কার্য্য-নিবন্ধন বাসকালীন প্রায় প্রত্যহই কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে যাতায়াত করিতেন। একবার তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া, মায়ের নিকট আপনার দুঃখকাহিনী জানাইতেছেন, এমন সময় সেই মন্দির সন্নিকটে এই সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাৎ হয় ; তিনি যেন কৃপা-পরবশ হইয়া বলিলেন,—বাবা, অর্শের ব্যারামে ভুগিতেছ ! মায়ের চরণামৃত লইয়া ভক্তিভাবে পান কর দেখিবে রোগমুক্ত হইয়াছ।

অক্ষয়চন্দ্র অবাক্ হইয়া সন্ন্যাসীর দিকে চাহিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী আবার বলিলেন,—অবাক্ হইলে যে ! মায়ের কৃপায় অন্ধ চক্ষু পায়,—বোবা গীত গায়,—বধির শুনিতে পায় ; ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। অক্ষয়চন্দ্র ভাবিলেন যে, এ সন্ন্যাসী হয়ত' ভণ্ড ; আমি এখানে একজন সম্ভ্রান্ত লোক, আমার এই রোগের কথা সকলেই জানে। সন্ন্যাসী কাহারও নিকট অবগত হইয়া আমাকে প্রতারণা করিতে আসিয়াছে। কিন্তু সন্ন্যাসী তদ্দণ্ডেই বলিলেন, "না বাবা ! আমি প্রতারণা করিতে আসি নাই। সত্যই তুমি মায়ের চরণামৃতের বলে আরোগ্য হইবে। তোমায় একদিন স্বপ্নে বলা হইয়াছিল, কিন্তু জাগ্রত হইয়া তাহা তোমার স্মৃতিতে আসে নাই। তোমার ধর্ম্ম-পিপাসা আছে দেখিয়া, বহুদিন যাবৎ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘুরিতেছি। অক্ষয়চন্দ্র তখনও কথাগুলি ঠিক বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন,—আপনি সন্ন্যাসী, আমাদের সর্ব্বথা প্রণম্য। কিন্তু ক্ষমা করিবেন, আমি ইহার পূর্ব্বে কখন কোনও স্বপ্ন দেখি নাই ; কিম্বা দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয় না। সন্ন্যাসী বলিলেন,—তোমার স্মরণ-পথে না আসিতে পারে ; কিন্তু অক্ষয়চন্দ্র মনে পড়ে কি, যেদিন তোমার পুনরায় বিবাহের প্রস্তাবে সকলে একমত হইলেও তুমি অমত করিলে, সেই দিন রাত্রে কে

করিয়াছ? অক্ষয়চন্দ্রের মুখ দিয়া তখন বাক্য নিঃসরণ হইল না। তিনি জানেন যে, কাহারও আদেশেই তিনি বিবাহ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু আদেশকারী সন্ন্যাসী কি স্ত্রী বা পুরুষ ইহা তিনি অবগত নহেন। তাই তিনি কি বলিবেন তাহা ঠিক করিতে পারিতেছিলেন না। সন্ন্যাসী বলিলেন,—তোমায় ভাবিতে হইবে না, তোমার জ্ঞানে তখন কোন মূর্ত্তি দেখ নাই। তবে স্বপ্নের জ্ঞানকে ফেলিবার নয়; মনে পড়ে কি, একদিন কৃপা করিয়া নিত্যানন্দময়ী দেবী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিতে প্রকট হইয়া তোমায় দর্শন দিয়াছিলেন।

অক্ষয়চন্দ্র ভাবিতেছেন, একি! এ কথা ত' কেহই অবগত নহে,—সন্ন্যাসী জানিল কিরূপে! তখন ত' আর কেহই উপস্থিত ছিল না! আমি ছিলাম আর—

সন্ন্যাসী বলিলেন,—আর আমি ছিলাম।

অক্ষয়চন্দ্র—কিন্তু এখন ত' সে মূর্ত্তি দেখিতেছি না।

সন্ন্যাসী—মূর্ত্তির দ্বারা সর্ব্বথা বিচার করা যায় না। তুমি কি বলিতে পার যে, বাল্যকালে তোমার যে চেহারা ছিল, এখনও ঠিক্—তদ্রূপই আছে?

অক্ষয়চন্দ্র যেন তখন অভিভূত হইয়া পড়িয়াছেন। নির্ব্বাক্—নিস্পন্দ, মুখে বাক্য নাই, শ্বাস রুদ্ধপ্রায়, বাহ্যজ্ঞানও লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল। সেই অবস্থায় অক্ষয়চন্দ্র সন্ন্যাসীর হাত ধরিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলেন। বেদীর সম্মুখে বসিয়া সন্ন্যাসী প্রদত্ত মায়ের চরণামৃত পান করিলেন। পরে সন্ন্যাসী তাঁহাকে দীক্ষা দিয়া বলিলেন যে, একমাত্র তোমার চরিত্রের বলেই মায়ের কৃপা-লাভে সক্ষম হইয়াছ। কর্ম্ম দ্বারা উত্তরোত্তর কৃপালাভে মায়ের কোলে যাইতে পারিবে। অক্ষয়চন্দ্র সংজ্ঞাহীন, যখন সংজ্ঞা পাইলেন, দেখিলেন সন্ন্যাসীর কোলে শুইয়া আছেন। শশব্যস্তে উঠিয়া চরণস্পর্শে প্রণাম করিয়া কাতরভাবে বলিতে লাগিলেন,—"প্রভু! কি দেখিলাম; আমি যে কিছুই বুঝিতেপারিতেছি না!"

সন্ন্যাসী বেশী কথা না বলিয়া এইমাত্র বলিলেন যে, সকলই মায়ের খেলা! তুমি রোগমুক্ত হইয়াছ। অক্ষয়চন্দ্র সন্ন্যাসীকে অবিশ্বাস করিয়া অন্যায় করিয়াছেন ভাবিয়া অনুতপ্ত হইলেন ও বলিতে লাগিলেন যে, আমি আপনাকে চিনিতে না পারিয়া বড়ই অন্যায় কথা বলিয়াছি। আমার যিনি দীক্ষাদাতা—সর্ব্বদা জীবনের সহচর—সুখ দুঃখের সঙ্গী, আমি তাঁহাকে না চিনিতে পারিয়া বড়ই অপরাধ করিয়াছি। সন্ন্যাসী সহাস্য বদনে বলিলেন,—দেখ ইহাতে তোমার কোনও দোষ নাই, আজকাল সন্ন্যাসীর বেশে প্রতারকের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাই তোমার ঐরূপ ভাব হইয়াছিল। অনেক সময়ে তুমি নিজেই প্রতারিত হইয়াছ,

তাহাও আমি জানি। সেই সময় হইতে তাঁহার ব্যাধি দূরে গেল এবং সন্ন্যাসী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অক্ষয়চন্দ্র জীবনের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহার পত্নীও সহধর্ম্মিণী নামের যোগ্যা। সর্ব্বদাই স্বামীর আজ্ঞানুসারে চলিয়া থাকেন। অতিথি-অভ্যাগত প্রায়ই তাঁহার বাটীতে আসিয়া থাকে, তাঁহারা উভয়ে তাহাদের যথাসাধ্য সেবা করিয়া থাকেন। নবকুমার তাঁহাদের যত্নে ও শুশ্রূষায় শীঘ্রই পূর্ব্বশক্তি প্রাপ্ত হইয়া ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করিতে লাগিল। প্রায়ই কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে গিয়া বেদীর সম্মুখে বসিয়া মা! মা! শব্দে অনুলোম বিলোম ক্রমে জপ করিত। তাঁহারা বৈকালে ছাদের উপর বসিয়া প্রায়ই তত্ত্বালোচনা করিতেন। একদিন নবকুমার বলিল,—দাদা! কৈ ঠাকুর ত' আর একদিনও আসিলেন না। তাঁহার দেখাও ত' আর পাইলাম না। তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য চিত্ত বড়ই লালায়িত হইয়াছে।

অক্ষয়চন্দ্র। তাঁহার ইচ্ছা হইলেই দেখা পাইবে। তিনি যে কোথায় কখন কি ভাবে থাকেন, তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার আকৃতি সেও এক সমস্যার বিষয় জীবনের প্রথম দুই একটী ঘটনায় স্বপ্নে তাহার যে আকৃতি দেখিয়াছিলাম, কিরীটেশ্বরীর মন্দিরে আর সে মূর্ত্তি দেখি নাই। তিনি আমায় বলিয়াছিলেন যে, মূর্ত্তি দ্বারা আমায় চিনিতে পারিবে না। তিনি কখন যে কোন্ শক্তিবলে কোন্ কার্য্য সাধন করেন, তাহা বোঝা যায় না। যখনি বিপদে পড়িয়াছি, তখনি তিনি আসিয়া উদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহার দয়া অপরিসীম! কিন্তু কথায় আমি তঁহার কথা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

নবকুমার। তিনি যে দয়ালু, মহাপুরুষ এবং মহা শক্তিশালী, তাহা আমিও বুঝিতে পারিতেছি। এমন পাষণ্ডের উপর যাঁহার দয়া, তাঁহার দয়ার কি তুলনা আছে! কিন্তু আপনার সচ্চরিত্রতা ও ধর্ম্ম-পিপাসা আপনার মহৎ সঙ্গের মূল। আমার মধ্যে ত, কোন গুণই নাই। দয়া, স্নেহ, মমতা বহুদিন হইল আমার হৃদয় হইতে দূর হইয়াছে। আমি কামাশক্ত ও মহাপাপী! আমায় যে কৃপা করিয়াছেন, ইহাই আপনার মহত্ত্ব।

অক্ষয়চন্দ্র। গুণের বা দোষের ঠিক বিচার করা বড় কঠিন। তোমার মধ্যে যে কোন গুণই নাই, একথা আমি বিশ্বাস করি না।

নবকুমার। যাক্ দাদা, সে সব কথা! এক্ষণে কাল্‌কের বাকী কথাটা আজ উপদেশ করুন। আমি এখন বেশ সুস্থ হয়েছি। এখন বাড়ী গিয়া দেখি তথাকার অবস্থা কি?

অক্ষয়চন্দ্র। বেশ কথা, আমিও ভাবিতেছিলাম যে, এই কথাটা সেরে নিয়ে তোমার বাড়ী যাওয়ার কথাই বলব। আমাদের কথা হচ্ছিল ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি স্থায়ী সুখ নহে—অস্থায়ী। পরিণামে দুঃখজনক সুখ বলিয়া উক্ত হইতে পারে। যাঁহাদের নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা সমস্ত কল্মস ধ্বংশ হইয়াছে,—বিবেক বিচার দ্বারা সমুদায় সন্দেহ নিরাকৃত হইয়াছে,—সর্ব্বভূতের হিতে যাঁহারা রত, তাঁহাদের উপদেশে জীবনে অগ্রসর হইলে, ক্রমে আপনি সকল বিষয় বুঝিতে পারা যাইবে। ইন্দ্রিয় সংযম সাধনার মূল মন্ত্র। তাহার উপর সাধনা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ভাগ্যক্রমে তুমি মোহাবরণ বিনির্ম্মুক্ত. পরম দয়ালু মহাত্মার সঙ্গলাভ পাইয়াছ; বংশানুক্রমে ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া পথভ্রষ্ট হইয়াছ। চেষ্টা করিলে শীঘ্রই আবার সেই উন্নত আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে।

নবকুমার। আপনি কৃপা করিয়া উপদেশ করুন আমার কর্ত্তব্য কি? আমার মন যেরূপ চঞ্চল ও বিক্ষিপ্ত, তাহাতে যে ভগবানের কথা স্থান পাইবে, এমন ত' আমার বোধ হয় না।

অক্ষয়চন্দ্র। মন ত' স্বভাবতঃই চঞ্চল, সর্ব্বদাই বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে লিপ্ত, চঞ্চল চিত্তে আত্মজ্ঞান প্রকাশ হইতে পারে না। সূর্য্যকে জলে দেখিতে হইলে, জলকে যেরূপ স্থির করিতে হয়। চিত্তকেও সেইরূপ স্থির না করিলে সে জ্যোতিঃ প্রকাশ হইবে কিরূপে? এই বিক্ষিপ্ত চিত্তকে স্থির করিবার উপায় শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট উপায়াবলম্বন করিলে—অভ্যাস, বৈরাগ্য, ইত্যাদি অবলম্বন করিলে চিত্ত আপনি স্থির হইবে।

নবকুমার। আপনার উপদেশের পর আমি মনকে একাগ্র করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করি বটে, কিন্তু অন্য সময় ত' থাকি ভাল, ঠিক ঐ সময়ে যেন ধ্যান ধারণা আরও কত চিন্তা আসিয়া জুটে।

অক্ষয়চন্দ্র। একি একদিনে দু'দিনে হবে। ভাই! তুমি আমি ত' দূরের কথা, স্বয়ং অর্জ্জুনের উক্তি যে, "মনের নিগ্রহ আমার পক্ষে বড়ই কঠিন।" *

নবকুমার। তবে আমাদের চেষ্টা করাই বৃথা।

অক্ষয়চন্দ্র। কঠিন হইলেই যে চেষ্টা করা বৃথা, ইহা আমি স্বীকার করিনা। কত জন্ম-জন্মান্তর হইতে মন বাহিরের বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইয়া আসিতেছে; আজ তুমি একদিনে তাহার সকল বেগ ঘুরাইয়া অন্তর্ম্মুখী করিয়া ফেলিবে, ইহা কখনও সম্ভব নয়। অভ্যাস চাই—যখনই মন যে বিষয়ে ধাবিত

* তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং। গীতা

হইবে, তৎক্ষণাৎ সেই বিষয় হইতে ফিরাইয়া আনিবে। ধৈর্য্য চাই, উত্তম চাই, যত্ন চাই। আমি অনেক সময়ে দেখিয়াছি যে, আধ্যাত্মিক বিষয়ে অতি অল্পদিনের মধ্যে কিছু বুঝিতে না পারিলেই অনেকে সে চেষ্টা ছাড়িয়া দেয়। কিন্তু বৈজ্ঞানিকদিগের প্রতি চাহিয়া দেখ, তাঁহারা একটা বিষয় বুঝিবার জন্ত কতবার বিফল মনোরথ হইতেছেন, কিন্তু তবুও তাহা পরিত্যাগ করেন না। আহার নিদ্রা ভুলিয়া সত্য আবিষ্কারের জন্ত চেষ্টিত; তবে ত' বিজ্ঞানের আজ এত উন্নতি। অথচ পরিচয় হইতে বড়ই দেরী হয়। আজ যে লেখা তোমার নিকট অতি সহজ বোধ হইতেছে, প্রথমতঃ সেই এক একটী অক্ষরের জন্ত কত পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। চেষ্টা করিলে হইবে না; ইহা আমি বিশ্বাস করি না; তবে চাই—আন্তরিকতাও চাই—প্রাণের বিশ্বাসও চাই।

নবকুমার। বেশ কথা, নিরাশ না হ'য়ে আপনার কথামতই চেষ্টা করিব। কিন্তু আমার মত পিশাচের হৃদয়ে সে বোধ ফুটিবে কেন? তবে ঐরূপ অভ্যাস কর্ত্তে কর্ত্তে অন্ততঃ অসৎ চিন্তা দূরে যাইতে পারে।

অক্ষয়চন্দ্র। ঠিক কথা, অনেক সময়ে পূর্ব্ব অভ্যাসবশতঃ অসৎ চিন্তা আমাদের আক্রমণ করেছে, অথচ আমরা তা' বুঝিতেও পারি না। হঠাৎ দেখি যে আমি কি একটা নিয়ে ভাব্‌ছি; অমনি সজাগ হতে হবে। অবশ্য জোর ক'রে সেই চিন্তা তাড়াতে পারা যাবেনা; কিন্তু তৎক্ষণাৎ অন্য একটা সৎ বিষয়ের দিকে মন দিবে। এইরূপে কিছুদিন পরে দেখিবে যে, মন সৎ বিষয় নিয়েই থাকৃতে চায়। মধ্যে মধ্যে ভগবানের মহিমাব্যঞ্জক স্তোত্র পাঠ করা ভাল। শয়নের পূর্ব্বে কোন সৎ গ্রন্থ পাঠ করিলে নিদ্রাও ভাল হয় এবং অসৎ স্বপ্নাদি প্রায়ই দেখা যায় না। একাগ্রতার মূল তথ্য অভ্যাস ও বৈরাগ্য।

নবকুমার। আমার ত' কোন দার্শনিক চিন্তায় মন যেতে চায় না; তবে এই কয়দিন আমি দেবমূর্ত্তির রূপ কল্পনা করে, যেন অনেকটা ভাল আছি। মস্তিষ্কের সে গোলমাল আর আমার নাই, সর্ব্বদাই আকাশ পাতাল ভাব্‌তাম তা' যেন দু'চার হাত দূরে সরে গিয়েছে।

অক্ষয়চন্দ্র। বেশ কথা, ঐরূপ ভাবেই চেষ্টা কর। পরে আপনিই ভিতর হইতে আদেশ পাইবে। আমার যখন কাঠিন্য বোধ হইয়াছিল, গুরুদেব যেন তখন হৃদয়ে উদয় হইয়া আমার সংশয় ছিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন।

নবকুমার। তাঁহার পক্ষে সব সমান, সূর্য্যালোক কি চণ্ডালের গৃহে প্রবেশ করে না। তাঁহাদের করুণা সর্ব্বদাই সমভাবে প্রবাহিত, আমরাই গ্রহণ করি

না। তাঁহারা আমাদিগকে পথে লইবার জন্ত আমাদের সম্মুখেই দাঁড়াইয়া আছেন, আমরা হাত বাড়াইয়া ধরিলেই হয় ;—দোষ আমাদেরই।

নবকুমার। তাঁহার কি কোন নাম বা পরিচয় নাই।

অক্ষয়চন্দ্র। কি জানি ভাই,—আমি তাঁহাকে মুক্ত পুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করি। ধর্ম্মের কথার জন্ত—জীবের প্রকৃত মঙ্গলের জন্ত, দেহ ধারণ করিয়া আছেন মাত্র। পিতার আদেশ মত তোমায় আমি হু'চার কথা বলিলাম। আমার জ্ঞান অতি স্বল্প, যাহা কিছু শিক্ষা তাঁহারই প্রসাদে। আরও দুই একটী কথা তোমায় বলিয়া রাখি। তুমি দুই একদিনে গৃহে যাইবে, হয়ত' গৃহে তোমার বৃদ্ধা মাতা অনেক দিন হইল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, পত্নীর অবস্থাও যে কিরূপ তাহাও জ্ঞাত নও। সহসা অধীর হইও না।

নবকুমার। সে ত' আমি বুঝিতেই পারিতেছি। অমঙ্গল দৃশ্য ত' আমার চক্ষুর সম্মুখে নৃত্য করিতেছে।

অক্ষয়চন্দ্র। মঙ্গলামঙ্গল এখন ভাবিও না। যাহা কিছু দেখিবে, জানিও তাহার মধ্য দিয়া মঙ্গল সাধিত হইবে।

নবকুমার। আপনি যেন এ হতভাগাকে ভুলিবেন না।

অক্ষয়চন্দ্র। ভুলিব কেন ভাই! তুমি যে আমার ছোট ভাই! ছোট ভাইকে কি দাদা ভুলিতে পারে? আরো তোমাকে বলিয়া রাখি,—যদি নিতান্তই হৃদয় বিদারক বা হতাশজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া সহ্য করিতে না পার, তবে এইখানেই ফিরিয়া আসিও। তারপর আমি যাহা হয় ব্যবস্থা করিব। তবে আমার মনে হয় যে, তোমার স্ত্রী এখনও বাঁচিয়া আছেন।

নবকুমার। প্রাতেই এখান হইতে যাত্রা করিব, দুই তিন দিনে যাইতে পারিব। পূর্ব্ব শক্তি থাকিলে আমি একদিনেই যাইতে পারিতাম। এতদিন যে যত্ন ও শুশ্রূষা করিলেন, জীবনেও তাহার ঋণ শোধ করিতে পারিব না।

অক্ষয়চন্দ্র। বেশী কি করিয়াছি, আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি মাত্র। (ক্রমশঃ)

অর্থ]

খুঁটী।

ফাল্গুন মাস, শুক্লা ত্রয়োদশী ; নিম্নে—ভূপৃষ্ঠে তরুশীর্ষ কাঁপাইয়া মৃদু মধুর বাসন্তী-হিল্লোল, ঊর্দ্ধে কনকছটায় স্নিগ্ধ কৌমুদীর প্লাবন। বামে দক্ষিণে, ঊর্দ্ধে,

নিয়ে চতুর্দ্দিকে শান্তি ও আনন্দ—তৃপ্তি ও সৌন্দর্য্য ! আকাশের কোল হইতে চন্দ্রিকা সহস্র কর প্রসারণে সারা ধরণীকে জড়াইয়া ফেলিতেছে, দখিনে হাওয়া দিকে দিকে চলিয়া চলিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। কি জানি কেন কোন্ অজানা পুলকে মানবের চিত্তও এই বিহ্বল সৌন্দর্য্যে ও প্রাকৃতিক মিলনে মাতোয়ারা হইয়া উঠিতেছে।

বিবাহ বাসর—চারিদিকে ধুমধাম, আনন্দের ফোয়ারা, সাজসজ্জা, জাঁক জমক, গান গল্প ও হাস্য পরিহাস। পুরুষেরা জাঁকাল পোষাকে ফুলের মালা গলায় দিয়া চারিদিকে ফিরিতেছে, হাসিতেছে, গল্প করিতেছে ; রমণীরা বেনারসী ও পার্শী সাড়ী এবং অলঙ্কারের বাহারে অন্দরমহল জাঁকাইয়া রাখিয়াছে। দেখিতে দেখিতে শুভলগ্ন উপস্থিত—ভিতরে শঙ্খ ও হুলুধ্বনি এবং বাহিরে রোসনচৌকী বাজিয়া উঠিল। স্ত্রী আচার—নাপিত উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল "খুঁটি-খাটা ছেড়ে দাও—" জানিনা এ খুঁটি-খাটা সকলে ছাড়িয়াছিল কি না. অথবা খুঁটি-খাটা ছাড়া কিসের বা কাহার জন্য। তবে দেখিলাম যুবক ও কিশোরীর লাজ-কম্পিত—আবেগ-জড়িত চারি চক্ষুর মিলন হইল। তাদের প্রাণের নীরব-সম্ভাষণ—বক্ষের স্পন্দন, চকিতে চক্ষের উপর দিয়া খেলিয়া গেল। এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে উভয়ে কত জিনিস জড়াইয়া. কত খুঁটি ধরিয়াছিল। কিশোরী তাহার খেলার ঘর, কাঁচের পুতুল, আবাল্য সঙ্গিনী আরও কত কি স্বাবলম্বনে তার মানসী লতাটীকে জড়াইয়া জড়াইয়া তুলিয়েছিল, চকিতে সে সমস্ত খুঁটী, সকল অবলম্বন, এক শুভ মুহূর্ত্তের আগমনে ছাড়িয়া দিল। বাহিরে সানাই আলাপ করিতেছিল,—"দাসখৎ লিখে দিলাম রাই হে তোমার চরণমূলে।" সমর্পিত-চিত্ত যুবক নরেশকে বিদ্রূপ করিয়াই বুঝি বা সানাইওয়ালা ঐরূপ তান ধরিয়াছিল।

বিজয়া দশমী - নদীবক্ষে ও তীরে জনকল্লোল, নৌকার বাহার, দিকে-দিকে দেবী দশভূজার মৃণ্ময়ী প্রতিমা বিরাজমানা, আলোকমালা ও আতসবাজী—বাদ্য ও সঙ্গীত।

গোধূলির ধূসর আস্তরণের মধ্য দিয়া দিবসের রজত ছটা ধীরে ধীরে হৈম-কিরণে জ্বলিয়া উঠিল। হঠাৎ রোসনচৌকী করুণস্বরে বাজিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে দর্শক ও পূজকের চিত্তও কারুণ্যরসে উথলিয়া উঠিল। হৃদয়ে গুরুভার—আনন বিরস—আঁখি পল্লব সরস—দিবসত্রয় ব্যাপী মাতৃপূজার আনন্দরোলের পর বিজয়ার সন্ধ্যায় হিন্দু-চিত্ত চিরদিনই এইরূপ কাতর হইয়া উঠে। এ হেন বিসর্জন নিশীথে জগজ্জননীর বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গেই নরেশ ইহ-পরকালের প্রত্যক্ষ ঈশ্বরী জননীকে চিতানলে সমর্পণ করিল।

পর বৎসর অনেকটা এমনি সময়েই তাহার পিতৃদেবও স্বর্গারোহণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহার খুল্লতাতগণ ও জ্যেষ্ঠ সহোদর নশ্বর ধরাধাম ছাড়িয়া গেলেন। যে পবিত্র চণ্ডীমণ্ডপের স্নিগ্ধচ্ছায়ায় এতদিন সে লালিত, পালিত ও বর্দ্ধিত হইতেছিল, একে একে তাহার সকল খুঁটী খসিয়া গিয়া চণ্ডীমণ্ডপটী ধুলিশায়ী হইয়া গেল। নরেশ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল,— বুঝিল সেই এখন বাড়ীর কর্ত্তা। সঙ্গে সঙ্গে কেমন একটা অজ্ঞাত আশঙ্কাও জাগিল,—বুঝিবা এইবার কোন্ দিন তাহাকে ডাক পড়িবে।

(২)

তখন সফরে; একটী ঘন সন্নিবিষ্ট আম বাগানের সম্মুখে মেহগ্নি গাছে ঘেরা শষ্পাচ্ছাদিত সমতল ভূখণ্ডের উপর ডবল বুননের সরকারী বস্ত্রাবাস; সম্মুখে দূর প্রসারিত শ্যামল শস্তক্ষেত্র।

বৃহৎ তাঁবুর পশ্চাতে ক্ষুদ্র দ্বার ও গোশলখানা। মধ্যে শয়ন কক্ষ, তদগ্রে বৈঠকখানা ও আপিস। সর্ব্ব সম্মুখে কাপড়ের খোলা বারান্দা। যখন প্রভাতে নির্ম্মল সৌর-কিরণের সঙ্গে মিঠেন হাওয়া ছুটিয়া আসিত, অথবা দিবসান্তে ম্লান সূর্য্যালোকে তরুচ্ছায়া দীর্ঘ ও দীর্ঘতর হইয়া উঠিত, তখন এই বস্ত্রাবাসের খোলা বারান্দায়, ইজি চেয়ারে নরেশ ও রাজকুমার দুই বন্ধুতে মুখোমুখী বসিয়া কত আনন্দে কত কথা কত গল্প করিত। তখন কাল বৈশাখী—সন্ধ্যার পর আঁধি আসিয়া চতুর্দ্দিক আঁধারময় করিয়া তুলিত। ঝটকা বাতাসে তাঁবুর খুঁটী কাঁপাইয়া আম বাগানে গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া দিয়া দিত। শিলাবৃষ্টির সময় বড় বড় ফোঁটা নামিয়া ধরাপৃষ্ঠ আর্দ্র করিয়া তুলিত।

সে দিন সন্ধ্যার পর হইতে মেঘলা আকাশের বারিধারা অবিশ্রান্ত নামিয়া ভূমি কর্দ্দমাক্ত করিয়া তাঁবুর মেঝের বিচালী ও সতরঞ্চি ভাসাইয়া দিল। মাঝে মাঝে দমকা হাওয়ায় পট্ পট্ করিয়া তাঁবুর খুঁটি ক্রমাগত উপড়াইয়া দিতেছিল; দুই জন বরকন্দাজ অবিরত পরিশ্রমে ঝড়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া পুনরায় খোঁট পুঁতিতেছিল। হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় তাম্বুর একদিককার দশ বারটা খুঁটি উপড়াইল; পত্ পত্ শব্দে সে অংশটা বায়ুভরে উড়িতে লাগিল,—চাপা পড়িবার ভয়ে নরেশ ও রাজকুমার যে মুহূর্ত্তে ছুটিয়া বাহির হইল, "ঠিক সেই মুহূর্ত্তে বরকন্দাজগণ সামলাইবার তাঁবুর অপর পার্শ্ব উড়িয়া গেল; দেখিতে দেখিতে বিছানা আলমারী, জামা, জুতা, পোষাক লইয়া ভূমিতে তাঁবুটী গড়াগড়ি

দিল। বড় সাধের সাজান ঘর চক্ষের নিমেষে চুরমার হইল দেখিয়া নরেশের চক্ষুদ্বয় ছল ছল করিয়া উঠিল।

(৩)

বরষা,—ঝারা শ্রাবণের ধারাপাতে, অলস-মন্থর জলদরাজির গুরু গুরু গর্জ্জনে ও অবিশ্রান্ত রিমি-রিমি ঝিমি-ঝিমি বর্ষণে পৃথিবীর উপর কে যেন বিষাদ কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে। নরেশ পীড়িত; রাজকুমার দেখিতে আসিয়াই শিহরিয়া উঠিল। বুঝিল অন্তিম যাত্রার আর বেশী বিলম্ব নাই। মাথার শিয়রে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, নরেশদা! কেমন আছ?

ন। এসো দাদা এসো,—আজকাল একটু ভাল আছি। একটু সারিয়া উঠিলেই ব্যবসাটার একটা সুব্যবস্থা করে ফেল্‌তে হবে। কেননা ছেলে পুলেদের জন্যে একটা কিনারা ত' কর্‌তে হবে; আমার যে রকম শরীর হোলো, তাতে যে আগেকার মত খাট্‌তে পার্‌ব ব'লে আর ত' মনে হয় না। তা-ছাড়া গোটা-কতক পাওনা টাকা পড়ে আছে, সে গুলোকে ডিক্রী ক'রে আদায় করে নিতে হবে। রাজকুমারের একটু হাসি আসিল, কিন্তু সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিল, আর কেন ওসব নরেশদা! চিরদিনই ত' মামলা মোকদ্দমা, টাকা-পয়সা, ছেলে-পুলে নিয়ে কাটালে; আর কেন ওসব?

ন। ঠিক বলেছ দাদা, এবার একটু সংসার গুছাইয়া নিলেই আর ও সবে-মাথা ঘামাব না,—একেবারে কাশী গিয়ে থাক্‌ব।

রা। নরেশদা, আর গুছাইবার সময় নাই: এখন গুটাইবার ডাক আসিয়াছে; শীঘ্রই জাল গুড়াইয়া প্রস্তুত হও। নরেশ স্তিমিত চক্ষুদ্বয় যথাসম্ভব বিস্তার করিয়া বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করিল, কেন বল দেখি,কেন এ সব কথা বলছ?

রা। দেখ নরেশদা,—তোমায় আমায় বহুদিনের বন্ধুত্ব! তা'ই এ সময় কিছু রূঢ় হইয়াই বলিতে হচ্ছে যে, আর এ সময় বিষয়ে মজে থেকো না; যতদূর সম্ভব ভগবানে নির্ভর করে প্রস্তুত হ'য়ে থাক?

ন। কেন? এখন ত' আমি বেশ সুস্থ আছি?

ন। ওটা তোমার মোহ, নিজের শরীরের অবস্থায় কি বুঝ্‌তে পার্‌ছ না, যে, সমস্ত দেহ মন ইন্দ্রিয় আস্তে আস্তে অবশ হয়ে পড়্‌ছে।

ন। তবে কি নিশ্চয় মৃত্যু!

রাজকুমার দৃঢ়তার সহিত বলিল হাঁ নিশ্চয়! আর তার বড় বেশী দেরীও নাই। বোধ হয় আর চার পাচ দিন মাত্র।

ন। অ্যাঁ বল কি ! নিশ্চয় মৃত্যু ? তবে উপায় ! অনেকক্ষণ চক্ষুজলে ভাসিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া জিজ্ঞাসা করিল, রাজকুমার দা ! তবে উপায় ? এখনো যে মৃত্যুর জন্ম কিছুমাত্র প্রস্তুত নাই। বল কি ? চার পাঁচ দিনের মধ্যেই এ সব ছাড়্তে হবে ?

রা। কি করিবে বল, সংসারের নিয়মই এই। তাই বলিতেছিলাম, এই শেষ সময়ে—পূণ্য মুহূর্ত্তে আর বিলম্ব না করিয়া ইষ্টদেবতা স্মরণ পূর্ব্বক ইষ্ট-মন্ত্র জপ কর।

নরেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া মুখ লুকাইয়া কাঁদিল ;—"রাজকুমার দা বল্ছ বটে, কিন্তু কই পার্‌ছি না ত" ।—

রা। পার্‌তেই হবে দাদা ! না পারা ছাড়া যে উপায় নাই। মানুষ যখন বিষয়ে ও সংসারে একেবারে মজিয়া থাকে—কিছুতেই ছাড়িতে চায় না, তখন ভগবানের দয়ায় মৃত্যু আসিয়া বলপূর্ব্বক মোহ মোচন করিয়া দেয়। যখন নিস্তার নাই,—তখন হয় হাসিমুখে না হয় দাঁত মুখ খিঁচাইয়াও সহ্য করিতে হইবে। তবে যতটা সম্ভব হাসিমুখেই সহ্য কর না কেন ? মনে পড়ে, যে রাত্রে হঠাৎ এক সঙ্গে তাঁবুর সমস্ত খোঁটা উপ্‌ড়াইয়া এক মিনিটে সখের ঘর উড়িয়া গেল ; মৃত্যুও ঠিক সেই রকম। মানুষ সংসারে আসিয়া স্ত্রী, পুত্র, ঘর, বাড়ী, টাকা, পয়সা, মান, যশ, আশা, কল্পনা প্রভৃতি অনেকগুলি খুঁটীতে নিজেকে বাঁধিয়া রাখে ; বড় ভয়, পাছে কোন একটী খুঁটী ভাঙ্গিয়া বা উপ্‌ড়াইয়া যায়। যাহার জন্ম এক সঙ্গে এক মুহূর্ত্তে এই সমস্ত সাংসারিক খুঁটী উপড়াইয়া সমস্ত লৌকিক বিষয় ধ্বংস হইয়া যায়, তাহারই নাম মৃত্যু। এই কারণে মৃত্যু আমাদের চক্ষে এত ভীষণ—এত ভয়ের কথা।

নরেশ শুনিল ও বুঝিল ; আবার হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু এ সব ছেড়ে যাই কোথা—দাঁড়াই কোথা ?

রা। কেন ঝড়ের রাত্রে কি করিয়াছিলে কিছু মনে আছে কি ? তাঁবু ত' উড়িয়া গেল, কিন্তু রাত কি কাটে নাই,—আশ্রয় কি পাও নাই ? ঝড়ের রাত্রে কাপড়ের ঘর ভাঙ্গিয়া গেলে যিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন, আজও বাসাবাড়ী ভাঙ্গিয়া গেলে তিনিই আশ্রয় দিবেন।

কাল মুহূর্ত্ত আসিল ; রাজকুমার শিয়রে বসিয়া। রাজকুমারের বড় আনন্দ যে আজ তাহার আশৈশব ও অকৃত্রিম বন্ধু, বিষম অগ্নি পরীক্ষার দিনে, বীরের ন্যায়—ভক্ত সাধকের ন্যায়—সম্পূর্ণরূপে নিজেকে ছাড়িয়া ধূলা মাটীর নশ্বর দেহ-বাস ও ইট মাটীর প্রস্তুত আবাস ছাড়িয়া সানন্দে অক্ষয় ধামে চলিয়া গেল।

শ্রীঅরূপচাঁদ।

২য় ভাগ । পৌষ, ১৩২০ । ৯ম সংখ্যা

মোক্ষ]

কষ্টহারিণীর ঘাট ।

কষ্ট-হারিণীর ঘাটে, কে নাইবি তোরা আয় ছুটে ॥

ঘাটের শোভা মরি হায়, দেখ্‌লে প্রাণ জুড়ায়,
(তথায়) নয়ন মনের সকল খেদ, সবই মিটে যায় ;
এমন প্রাণ জুড়ানো, মন ভুলানো শোভার মাঝে পড়্ লুটে ॥

(ও) তার ছয়টি ঘাটে, ছ'রকমের কমল ফোটে,
তার বিমল জলে হংসদলে হংসী সনে ধায় সুখে ;
তারা কমল-দলে সদাই খেলে, সুখে মধু লয় লুটে ॥

তথায় যাওয়া দায় অতি, সবার প্রবেশ নাই তথি,
কেবল যতি যাঁরা যান তাঁরা আনন্দে মাতি ;
(ও) তার ঘাটের মুখে, শুয়ে সুখে ভীষণ এক কেউটে ॥

আজব ঘাটের ধারে, কমল-কানন মাঝারে,
কত যোগী ঋষি ধ্যানে বসি, ভাবেন কাহারে ;
সে ঘাটে যে স্নান করে তার ভব, ব্যাধি যায় টুটে ॥

সব ঘাটেরি মাঝে, প্রহরী নিযুক্ত আছে,
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি ঘাঁটি বেঁধেছে ;—
তথায় ডাকিনী যোগিনী [illegible] [illegible] [illegible] সব ঘাটে ॥

কত রকমের আলো, ঘাটে ঝলকে ভাল,
রঙ্গ বেরঙ্গের কতই দীপে ঘাট গুলি আলো ;
তথায় সূর্য্য চন্দ্র সদাই প্রকাশ, বিজলি বেড়ায় ছুটে ॥

তথায় পূজা কে করে, লোকে বুঝ্‌তেই নারে,
দিক ভরে উঠে শঙ্খ ঘণ্টার মধুর ঝঙ্কারে ;
[তখন] তুরী ভেরী বেণু বীণা অনাহতে বেজে উঠে ॥

আজব দেশের কথায়, প্রাণ ছুটে যেতে চায়,
ঘাটগুলিতে স্নান করে প্রাণ শীতল হতে চায় ;
(দীনাতিদীন সেবক বলে, নাইবে যদি সেই জলে,)
তবে দিন থাকিতে মনরে আমার, গুরুর পদে পড়্ লুটে ॥

মোক্ষ] ভাগবতের উপদেশ।

"পন্থা" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,—

আপনি "স্বামীজির জন্মাষ্টমী" প্রবন্ধ লইয়া যে অযথোচিত সুখ্যাতি করিয়াছেন, তাহাতে আমি নিতান্ত কুণ্ঠিত বোধ করিতেছি। ক্ষুদ্র মানব শ্রীগুরু ও শ্রীভগবানের কৃপাতেই পরম তত্ত্ব বুঝিতে পারে। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" ভক্তি দ্বারাই প্রকৃত তত্ত্বাববোধ হইতে পারে। সুতরাং যাহা কিছু বুঝিয়াছি তাহা শ্রীভগবানেরই ; তাহাতে আমাদের কোন কর্ত্তৃত্ব বা কৃতিত্ব নাই। শ্রীভাগবতের সম্বন্ধে আপনি যে লিখিতে বলিয়াছেন, তাহাতে আমার বক্তব্য এই যে, অনন্ত অমৃতের খনি, সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রকাশক, শ্রীভাগবতের মহিমা মৎ সদৃশ ক্ষুদ্র জনের হৃদয়ে কখনও পূর্ণ ভাবে প্রকটিত হইতে পারে না। তবে ভাগবত পাঠে যে ভাবরাশি স্বতঃই প্রকাশিত হয়, তাহাই শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া লিখিতে পারি। আপনাদের হৃদয়গ্রাহী হইবে কি না তাহা জানি না। কিঞ্চিৎ নমুনাস্বরূপ পাঠাইলাম, মতামত লিখিবেন। ইতি। যোগানন্দ ভারতী।

(১)

অমোঘ-লীল শ্রীভগবানের অনেক প্রকারের অভিব্যক্তি আছে। তিনি — [illegible] বাহির-অন্তরে ইন্দ্রিয়গণের জ্ঞানের মধ্যে মন ও প্রবৃত্তির মধ্যে

এক ভাবে খেলেন; ইহা তাঁহার প্রাকৃতিক বিলাস। জীব-হৃদয়ে সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির ও সর্ব্বাত্মিক জ্ঞানের আভাস দিবার জন্য সেই পূর্ণ হইতে পূর্ণতম শ্রীভগবান্ সর্ব্বাত্ম-স্বরূপে প্রকৃতির অনন্ত খেলার মধ্য দিয়া সদা উদ্ভাসিত হইতেছেন। এই খেলা লইয়াই বিজ্ঞানের প্রবৃত্তি। 'বহুর' মধ্যে আপাততঃ ছিন্ন অসংশ্লিষ্ট সচ্চিদানন্দ-ঘন মহান্ স্বত্তার আভাস দেখিবার জন্য বিজ্ঞান প্রবৃত্ত। এই পথের মূল মন্ত্র—সর্ব্বাত্মিকতা (universality)। ইহাই Light on the Path গ্রন্থে Seek out the way নামক বাহিরের প্রকৃতির মধ্যে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণের পন্থা। এই ভাবে পরিপুষ্ট না হইলে জীবের অহঙ্কারের মোহ দূর হয় না; ভেদ-বিশেষ বুদ্ধি অপগত হয় না। এই মোহে কেহ কেহ শ্রীভগবান্‌কে "ছিষ্টি-ছাড়া" ও অসম্পর্কিত করিয়া দেখেন। এই মোহের বশে অপর একদল সাধক ভাবেন যে, শ্রীভগবানের অনন্ত মহিমা কেবল তাঁহাদেরই আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজিত হইতেছে। সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধি এই মোহের একমাত্র ঔষধ। সর্ব্ব ব্যাপার, সর্ব্ব প্রকার প্রকাশ যে 'সর্ব্বের' জন্য, বিশিষ্টের জন্য নহে, ইহা বুঝিয়া জীব তাহার বিশিষ্টাভিমুখী প্রবৃত্তিকে বিসর্জ্জন দিয়া পরিষ্কৃত হইলে, তখন শ্রীভগবানের বিশেষ প্রকাশও আর ভেদভাবে দেখে না।

তারপর বুঝিতে পারা যায় যে, শ্রীভগবানের অবতারাদি বিশেষ অভিব্যক্তি যে কেবল জগতের এক বিশিষ্ট সময়ে বিশিষ্ট কারণে হইয়াছিল তাহা নহে। তখন সেই বিশেষ প্রকাশের মধ্যেও তাঁহার নিত্য স্বরূপের অভিব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়। সেইজন্যই বিশেষ ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান এবং তৎ-কালীন ভক্ত বৃন্দের পরিত্রাণই যে শ্রীভগবানের অবতারের একমাত্র উদ্দেশ্য, এভাবে বৈষ্ণবগণের স্পৃহা নাই। তাঁহারা জানেন যে সাময়িক প্রয়োজন প্রভৃতির পশ্চাতে, শ্রীভগবানের নিত্য লীলার আভাস দিবার জন্যই তাঁহার অবতার। সেইজন্য মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র জীবকে শ্রীভগবানের নিত্যলীলা অন্বেষণ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার লীলার যেমন একটা জাগতিক ও সাময়িক ভাব আছে, তেমনি আর একটী গূঢ়তর মর্ম্মও আছে। প্রত্যেক জীবের হৃদয়ে যেভাবে তাঁহার অভিব্যক্তি ও ব্যঞ্জনা হয়, যে ভাবে তিনি নিত্য জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হইয়া খেলিতেছেন, তাঁহার ইঙ্গিত বা আভাস দিবার জন্যই শ্রীভগবানের বাহ্যলীলা। ৫।১০ হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি একভাবে খেলিয়াছিলেন একথা জানিলে আমার কি হইল? দেবকী ও বসুদেব নামক দুইজন জীবের ভিতর দিয়া তিনি খেলিয়াছিলেন তাহা জানিয়াই বা আমার কি লাভ? লীলা নিত্য না হইলে,

তাঁহার সহিত আমার সম্পর্ক ত' নিত্য হইল না। সেইজন্ত বাহ্ লীলাকে জীব-হৃদয়ে নিত্য অভিব্যক্ত বা স্বরূপ লীলায় পরিণত করিতে না পারিলে, জীবের প্রকৃত শান্তি নাই। ঐতিহাসিক সত্যতা লইয়া কি ধুইয়া খাইব? আর তাহাতেই বা লাভ কি? বোধ হয় এই ভাব স্মরণ করাইবার জন্তই স্বামীজি জন্মাষ্টমী তত্ত্ব নিত্য ও সর্ব্বকালের সিদ্ধ বলিয়া বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। সেই জন্তই জন্মাষ্টমী পূজায় ও মন্ত্রে সাধককে শ্রীভগবানের জননীরূপে সাধনা করিতে উপদেশ আছে। তোমরা কেহ বলিবে এটা আমার খেয়াল; কিন্তু এ খেয়ালে যদি তাঁহাকে আমার আপন করিতে পারি এবং যদি তাঁ'র মত হইতে পারি, তাহা হইলে আমার পক্ষে এ খেয়ালটাও শ্রেয়ঃ ও প্রেয়। তোমরা যদি তাঁহাকে দূরে রাখিয়া সন্তুষ্ট হও, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই; আমি যে তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের হৃদয়, 'আমির' আমি বলিয়া না দেখিলে থাকিতে পারি না। আধুনিক বৈষ্ণব সমাজে যে গোলযোগ চলিতেছে, তাহার মূল কারণ নিত্যভাবের আকাঙ্ক্ষা। বৈষ্ণবগণ নিত্যলীলার কথা মুখে বলেন বটে; কিন্তু এ কথাটী কি প্রকৃত ভাবে তাঁহাদের হৃদয়ের ভাষা হইয়াছে? তাহা হই লে বিভিন্ন ভাবে গৌর মন্ত্র ও গৌরপূজার জন্য এত আন্দোলন হইত না।

সে যাহাই হউক, আমার ধারণা ও বিশ্বাস যে ভগবান্ নিত্যই তাঁহার লীলা প্রকট করিতেছেন এবং ভাগবতে যে লীলার কথা বলা আছে, তাহা যে একবার মাত্রই মানবের ইতিহাসে সাধিত হইয়াছে তাহা নহে। ঐ লীলা যখন তাঁহারই অভিব্যক্তি, তখন উহা নিত্য ভিন্ন অন্য কিছু হইতে পারে না। ধর্ম্মের সংস্থাপন ও অধর্ম্মের বিনাশ জন্য যে সকল লীলা বিবৃত আছে, তাহার ভিতরেও সেই নিত্যভাব আছে। এ কল্পের কংস অন্য কল্পের কংস হইতে বিভিন্ন হইতে পারে; কিন্তু কংসের ব্যক্তিত্ব লইয়া ত' শ্রীভগবানের লীলা নহে। তাঁহার পক্ষে ত' দ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং যাঁহারা এখনও জীব ভিন্ন উচ্চতর ভাব দেখিতে শিখেন নাই, তাঁহারা হয় ত' কংসের নাম বা ব্যক্তিত্ব লইয়া মুগ্ধ হইতে পারেন। কিন্তু কংস ও শিশুপাল যদি গোলোকের দ্বারী না হইয়া অন্য কোন বিশিষ্ট নামধেয় ব্যক্তি হইত, তাহা হইলে কি ভগবানের লীলার কোন তারতম্য হইত?

আমার মনে হয় যে শ্রীভগবানের বাহ্যলীলা কতকটা সতরঞ্চ খেলার ন্যায়। কাঠের 'রাজা' বা হাতীর দাঁতের 'রাজা', যাহাই হউক না কেন, উহারা যে রকম ভাবেই খোদিত হউক না কেন, তাহার সহিত খেলার রহস্যের

বড় একটা সম্বন্ধ নাই। সতরঞ্চ খেলার বলগুলি কেবল আপন আপন 'নাম' ও 'স্থানের' গুণে শক্তিযুক্ত হয়; দাবার ঘরের বড়ে ও ঘোঁড়ার ঘরের বড়েতে বিশেষ তফাৎ নাই। কেবল খেলোয়াড়ের গুণে ও ছকের নাম ও স্থানের গুণে তাহার তারতম্য হয়। ভাল খেলোয়াড় অনেকগুলি বড়ে কাটাইয়া কৌশলক্রমে দাবার বড়ে করিতে পারেন। সেইরূপ মহাভারতের খেলায় বা ব্রজলীলার মধ্যেও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের স্থান নাই। দুর্য্যোধন পাপী বলিয়াই যে বিরুদ্ধ পক্ষের নেতা হইয়াছিল এবং তাহার পূর্ব্বতন জীবভাবের ইতিহাসের সঙ্গে যে মহাভারতের খেলার কোন নিকট সম্বন্ধ আছে, তাহা নহে ভগবানের খেলার জন্ম অন্য যে কেহই 'দুর্য্যোধন' হইতে পারিত। যে অর্জ্জুন মহারথী, তিনিই আবার যখন খেলোয়াড়, খেলা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন পরে সামান্য দস্যুহস্তে অপমানিত, লাঞ্ছিত হইলেন ও এমন কি গাণ্ডীব তুলিতেও পারিলেন না। তা'ই বলি ভাই, ভাগবত পড়িবার আগে, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মোহটা ত্যাগ করা চাই।

এই ব্যক্তিত্বের মোহের দৌড়টা বড় কম নয়। আধুনিক থিয়সফিষ্ট (আমার এক অজ্ঞ বন্ধু বলিতেন, থিও-পিসী ভায়াদের নেতা বলেন যে, মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ একজন বড় ক্ষত্রিয় মাত্র ছিলেন। তিনি আরও বলেন যে, ঘটনার চারিশত বৎসর পরে নাকি মৈত্রেয় ঋষি শ্রীকৃষ্ণের পোষাক পরিয়া বৃন্দাবন-লীলা করেন। এখন এ প্রকার ব্যাখ্যা যার ইচ্ছা সে করে; লিখ্‌তে আর বল্‌তে গেলে ত' ট্যাক্স লাগে না। তবে ভগবানের ভগবত্ব ভাব বেমালুম হজম করিয়া মৈত্রেয় ঋষিকে খাড়া করাতে ভাগবত শাস্ত্রটি ভগবান্‌-বর্জ্জিত "সোণার পাথর বাটির" মত হইল। সে যাহাই হউক, সতরঞ্চের ছকে যেমন ঘরগুলিই সত্য, সেইরূপ শ্রীভগবানের বিশ্বপ্রকাশের মধ্যে যে কতকগুলি মৌলিক ভাব আছে, সেইগুলিই সত্য; যেমন ব্রহ্মার সত্যতা, শ্রীভগবানের বিশ্বতোমুখ মনস্তত্ত্ব লইয়া। কোন কল্পে কোন বিশিষ্ট জীব ব্রহ্মার ব্রহ্মত্বপদ পাইতে পারেন সত্য, কিন্তু তাহা কেবল যে পরিমাণে ঐ জীব আপনার বিশিষ্ট ভেদাত্মক মনকে শ্রীভগবানের মনের সহিত এক করিতে পারেন, তাহারই উপর নির্ভর করিতেছে। ব্রহ্মার সত্যতা কেবল ভগবানের মনস্তত্ত্ব লইয়াই আছে; তাঁহাকে বিশিষ্ট বলিয়া ভাবিলে ঐ বিশ্বাত্মিক মনের (Cosmic mind) প্রকৃত ভাব অবগত হওয়া যায় না। পরন্তু তাঁহাকে ভগবানের মন বলিয়া জানিতে পারিলে, হয় ত' একদিন আমাদের ক্ষুদ্র মনকে ঐ মনস্তত্ত্বে জুড়িয়া দিবার আশা থাকিতে পারে। তা'ই বলি ভাই, শ্রীভগবানের

লীলায় যদি ভগবানকে দেখিতে চাও, তবে ঐতিহাসিক ও ভেদাত্মক ব্যক্তিত্ব-ভাবগুলিকে একেবারে ত্যাগ করিতে হইবে।

খৃষ্ট জগতের ইতিহাসে এ কথার সমর্থনা হয়। খৃষ্ট তত্ত্বকে ব্যক্তিগত বলিয়া ভাবিয়া খৃষ্টিয়ানগণ বড় বিপদে পড়িয়াছেন। উনিশ-শত বৎসর পূর্ব্বে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি দেহত্যাগ করিয়া কিরূপে সমস্ত মানবের উদ্ধারের সেতু হইলেন, তাহা বুঝা বড় কঠিন। সেইজন্য সূক্ষ্মশরীরে খৃষ্টদেবের অবস্থিতি ও মানবের হিতসাধনের জন্য তাঁহার নিত্য চেষ্টা স্বীকার না করিলে, একদল লোক থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাতেও দোষ জন্মে। যাহারা ব্যক্তিগত ভাবে যীশুকে গ্রহণ করিতে পারে না, অথচ তাঁহার উপদেশ ও মহান্ ভাব হৃদয়ে পর্য্যবসিত করিতে পারিয়াছেন, তাহাদের কি কোন উপায় নাই? সুতরাং তত্ত্বজ্ঞান সাহায্যে খৃষ্টদেবকে ভগবানের তত্ত্ববিশেষের প্রকাশক বলিয়া যদি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেই খৃষ্ট ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতা রক্ষা করা যায়।

শ্রীভগবানের লীলা সর্ব্বকালের ও সর্ব্বজনের জন্য। কারণ উহা তত্ত্বাংশেও নিত্য। যখনই সাধক স্বীয় তত্ত্বগুলিকে শ্রীভগবানের মহানুভাবে অনুপ্রাণিত করিতে পারেন, তখনই তাঁহার হৃদয়ে লীলার রস বহিতে থাকে। তখনি তিনি অপ্রকট লীলা প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হন। সাধকজীবনে এরূপ দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। আপনাপন হৃদয়ে ভগবানকে দেখিবার জন্যই ভাগবত। এইভাবে ভাগবতের উপদেশগুলি দেখিবার সাধ আছে। আপনাদের অভিপ্রেত হইলে, সময়ে সময়ে যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)।

মোক্ষ]

বীণাবাদ্য।

প্রভু! বাজাও তোমার বীণা, মন প্রাণ মোর ভরিয়া,
সকল তার ছিঁড়ে যাক্ আজি, তোমার চরণে কাঁদিয়া॥
হৃদি প্রস্তর কাটিয়া বহুক, তব অমৃত ঝরণা।
চৌদিক্ হ'তে ছুটিয়া আসুক, দুঃখরূপে তব করুণা॥
মেঘ কুহেলিকা সরে যাক্ সখা, ছেয়ে লঙ তব মহিমা।
আমার হৃদয় জুড়িয়া বসুক, তোমার কণক-প্রতিমা॥
হৃদয়ের তলে যে আলোক জ্বলে, আসুক আজি তা' ছু
নয়নেতে চাপা আছে যে অশ্রু, পড়ুক অঝরে ঝরিয়া
(তব) চরণ পরশে হৃদি-শতদল, উঠিবে উঠিবে ফুটিয়া।
(তাই) চরণ ধূলায় লুটাতে এসেছি, দেখ সখা! দেখ চাহিয়া

মোক্ষ।

অবতরণিকা।

আজকাল কলিকালের প্রভাবে রন্ধ্রগত ভেদজ্ঞানের প্রতাপে, কলুষিত-চিত্ত জীবগণ 'মোক্ষ' নামক শ্রীভগবানের পরম পদকে একটা কিম্ভূত-কিমাকার পদার্থ বলিয়া মনে করেন। একদল ভাবেন যে, বিশিষ্ট নামধারী ব্যক্তির দেহাদি প্রভৃতি ভাব হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অবস্থানই মোক্ষ। অপর দল ভাবেন যে, মোক্ষের প্রবৃত্তিটী একটী স্বার্থপর প্রবৃত্তি; উহা অপেক্ষা শ্রীভগবানের সেবা-মার্গটী সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর। উভয় দলের ভাব ভেদ-জ্ঞান-দুষ্ট। উভয়েই শাস্ত্রোক্ত 'পুরুষ' শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে না পারিয়া এত গোলে পড়িয়াছেন। যাঁহারা ভাবেন যে, শাস্ত্র ও শাস্ত্রের একমাত্র বেদ্য শ্রীভগবানকে সহজ ভাষায় "জল" করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যায়, তাঁহারাই পূর্ব্বোক্ত ভ্রমে পতিত হ'ন। তাঁহারা বিশিষ্ট অহংজ্ঞানের পিপাসা ত্যাগ না করিয়াই, ভেদ বিশেষের অতীত 'পর' তত্ত্বকে বুঝিতে প্রয়াস করেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি তত্ত্বগুলির প্রকৃত ভাব সমাধান না করিয়া পাশ্চাত্য ধীর (Don Quixote) ডন্ কুইকজোটের ন্যায় দুর্ব্বোধ্য আত্ম-তত্ত্ব আপনাপন মনো-কল্পিত ভাবে সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হ'ন। বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য ইহা নহে যে মোক্ষ বা ভগবৎ পদার্থকে সাধারণ পাঠকের করতলগত আমলকীবৎ প্রতিপন্ন হইবে। কারণ ঐ অবস্থা ধ্যান ও সমাধিগম্য; বিশুদ্ধ ও ভেদজ্ঞান পরিশুদ্ধ বুদ্ধির সাহায্যে উহার ইঙ্গিত মাত্র করা যায়। এই ইঙ্গিত করিতে গেলে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীভগবানের প্রতি অহৈতুকী আকর্ষণ থাকা আবশ্যক; শুধু দেহাদির বিশ্লেষণ করিয়া দেখিলে চলিবে না। যেমন ধনাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির হৃদয়ে, ধন সর্ব্ব সুখের সার বলিয়া যে ভাবমূলক বোধ (Positive knowledge) আছে, সেই জন্যই তিনি জগদ্বস্তুর মোহের মধ্যে পড়িয়াও ঐ সকল বস্তু হইতে আপনার ভাবটীকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখে; তেমনই যাহার হৃদয়ে এখনও ভগবৎ-প্রেম বা ভগবৎ-বিজ্ঞান জাগ্রত হয় নাই, সে কি প্রকারে এই নাম-রূপাত্মক জগতের মধ্যে সেই সত্য পদার্থের অন্বেষণ করিবে? দৃষ্টির গতি সেই পরম পদের দিকে না থাকিলে কি করিয়া 'নেতি' 'নেতি' প্রক্রিয়ার সাহায্যে

অভাবমূলক জগদ্বস্তুর মধ্য হইতে ভাবমূলক ভগবৎপদ লক্ষিত হইতে পারে? এমন কি দ্বৈতবাদী সাংখ্যশাস্ত্রেও যোগ শব্দে "তদা দ্রষ্টুঃ স্বরূপেঽবস্থানম্" (পাতঞ্জল ১) ভাবমূলক 'পুরুষের' স্বরূপে অবস্থানকে যোগ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" যোগ চিত্ত-বৃত্তির নিরোধ, এই ভাবটীও অভাবমূলক; ইহাতে যোগের প্রকৃত স্বরূপ জানা যায় না। উহার দ্বারা এইমাত্র বুঝা যায় যে চিত্তবৃত্তিগুলির লয় না হইলে যোগ হয় না। কিন্তু কেহই শুধু অভাবাত্মক লয় লইয়া থাকিতে পারে না।

মোক্ষ শব্দও ঠিক এইরূপ ভাবে বুঝিতে হইবে। অহংকারের বশীভূত, ক্রিয়া-পর জীব মনে করে যে, কতকগুলি (limitation) দোষ হইতে মুক্ত হওয়াই মোক্ষের স্বরূপ। তাঁহারা ভেদাত্মক 'অহং'জ্ঞানটীকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া মুক্তিলাভ করিতে প্রয়াস করেন। তাঁহারা জানেন না যে ভেদাত্মক বিশিষ্ট 'অহং'এর ক্ষেত্রেও থাকিয়া যাইবে। আধুনিক ভক্তগণ এইরূপে তাঁহাদের 'আমি'টীকে সযত্নে ভেদভাবে পরিপুষ্ট করিয়া ভক্তিপথের অবলম্বন করিয়া ভাবেন যে, সেইরূপ 'অহং'এর সাহায্যে শ্রীভগবানের পরমানন্দ ভোগ করিতে সক্ষম হইবেন। ফলে তাঁহারা 'প্রকৃতি' শব্দে প্রাকৃত স্ত্রীলোক মনে করিয়া তাহাদের 'আমি'টীকে স্ত্রীলোকের পোষাক পরাইয়া, একটী মনঃকল্পিত 'ফুটফুটে' 'কালো কোলো' ছেলের সহিত রঙ্গ-ভঙ্গ করাই সাধনার চরম উদ্দেশ্য বলিয়া ভাবিয়া লয়েন। এই অভিনব দৃশ্য দেখিয়া কাহার না দুঃখ হয়? অনেক দিন হইল, স্বর্গীয় অর্দ্ধেন্দু মুস্তোফী মহাশয় গ্রেট ন্যাশন্যাল থিয়েটারে একটী পঞ্চ রংএর অভিনয় করেন, তাহাতে বৃন্দাবন লীলার সমাবেশ ছিল। বড় বড় প্রকাণ্ড আয়তন চোগোঁপ্পা পুরুষগণ স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া রাধা ও বৃন্দা প্রভৃতি সখী সাজিয়াছিলেন এবং একটী অষ্টম বর্ষীয়া বালিকাকে কৃষ্ণ সাজান হয়; তারপর যথাক্রমে মান ও "দেহি পদপল্লবমুদারম্" প্রভৃতির অভিনয় হয়। আমাদের বৈষ্ণব ভ্রাতাগণের ভাবও কতকটা এইরূপ। তাঁহারা বিশিষ্ট মান, অহঙ্কার, অভিমান প্রভৃতি ভাবগুলি পরিত্যাগ না করিয়াই কেবল কাঁদুনে সুরে "তুমি আমার নাথ! হৃদয়ে এস" ও "তুমিই সর্ব্বস্ব" বলিয়া খানিকটা অভিনয় করাকেই শ্রীভগবানকে লাভ করিবার পথ বলিয়া মনে করেন। কেহ কেহ আপনাকে ভক্তাগ্রগণ্য ও লোক সকলের শিক্ষক বলিয়া প্রতিনিয়ত চিন্তা করিয়াও সাধনার সময় পাছাপেড়ে কাপড় পরিয়া ও স্ত্রীলোক-সুলভ আভরণে মণ্ডিত হইয়া বসিয়া ভগবানকে করতলগত মনে করেন। অপর দিকে বৈদান্তিক মহাশয়

অহংকারে মত্ত হইয়া, তাঁর বিশিষ্ট 'রাম' 'শ্যাম' ভাবটাকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিয়া বগল বাজাইয়া উচ্চৈঃস্বরে 'সোঽহং 'সোঽহং' বলিয়া নৃত্য করেন। আবার ঐ দেখুন থিয়সফিষ্ট দলে কেবল মাত্র জীবের হিতাভিলাষী ব্যক্তিগণ আপনাদিগকে মহাপুরুষগণের বিশেষ অনুগ্রহভাক্ মনে করিয়া মৃদু মৃদু ভাবে গোঁপে তা' দিয়া, নূতন আন্‌কোরা অবতার স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হইতেছেন। The trail of the serpent is over them all. সকলেই আপনাপন বিশিষ্ট ভাব পরিত্যাগ না করিয়াই 'মোক্ষ' বা ভগবৎ লাভের জন্য ব্যস্ত।

সুতরাং মোক্ষ সম্বন্ধে শাস্ত্রের প্রকৃত উপদেশ আলোচনা করা আবশ্যক হইতেছে। কেহ বলিবেন, বাপু! "আদার ব্যাপারী জাহাজের খপর কেন?" তাহাতে আমরা বলিব যে, লক্ষ্য নির্দ্দেশ করিবার জন্য অকালেও এ বিষয়ের অনুশীলন করা আবশ্যক। ফলচ্ছায়া সমন্বিত ভগবৎ-মার্গের অনুশীলনে হয়ত' আমাদের মোক্ষ-ফল লাভ না হইতেও পারে; কিন্তু তদ্দ্বারা ছায়া ত' লাভ হইবেই। তবে সম্পাদক মহাশয় এটী যেন কেহ না ভাবেন, যে আমি মোক্ষ বিষয়ের উপদেষ্টা হইয়া এই প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি। "বোধয়ন্ত্যপরস্পরম্"— পরস্পরে বোধের আদান প্রদান না করিলে প্রকৃত শাস্ত্রের অবগতি হইতে পারে না বলিয়াই বাতুলের ন্যায় শুভ্র নিষ্কল পূর্ণ-ব্রহ্ম মোক্ষ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে ধরিবার প্রয়াস করিতেছি। (ক্রমশঃ)

কস্যচিৎ ভট্টাচার্য্যস্য—

মোক্ষ]

প্রার্থনা।

অনন্ত অচিন্ত্য দিব্য পুরুষ প্রধান;
এ বিশাল ধরাবক্ষে যেদিকে নেহারি।
প্রশান্ত মূরতি তব পবিত্র মহান্,—
পরিব্যাপ্ত পঞ্চভূতে স্বরূপ আবরি॥
আছ তুমি হৃদয়েশ! হৃদয় মাঝারে,
প্রজ্ঞারূপে নিত্যানন্দ প্রাণ-বিমোহন।
তবে কেন ডুবি নাথ অজ্ঞান আঁধারে;
কেন ধ্রুবজ্যোতি তব বঞ্চিত দর্শন?

অপার করুণাময় করুণাসাগর,
তোমার চরণপথে এ মম মিনতি।
কপট মায়ার ফাঁস ঘুচায়ে সত্বর;
আশ্রিত দীনের বাঞ্ছা পূরাও শ্রীপতি॥
চৌদিকে বিপুল বিশ্ব-অবিদ্যার খেলা।
কোন্ পথে তুমি নাথ! কোথা তব ভেলা!

শ্রীশীতাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোক্ষ]

"সাধনার পথে"।*

(১)

মহাত্মাদিগের সম্বন্ধে তোমার যে ধারণা আছে তাহা ছোট করিও না। অথবা তাঁহাদের অন্তবাসী একজন দীন শিষ্যকে "মহাপুরুষ" বলিয়া সম্বোধন করিয়া ঐ নামের গৌরব-হানি করিও না। আমাকে তাঁহাদের শ্রীচরণানুগত একজন অধম শিষ্যমাত্র বলিয়া জানিও; এবং বড়-জোর তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বলিয়া অভিহিত করিতে পার। তাহা হইলেই ঐ সম্বন্ধের যে সুফল, তাহা সর্ব্বদা পাইতে পারিবে। অতিরঞ্জিত ভাবগুলি কিছুকালের জন্য মনোহর এবং উচ্চ বলিয়া বোধ হইতে পারে বটে, কিন্তু পরিণামে উহারা অনিষ্টই উৎপাদন করে। অসত্যের প্রলোভন চিরদিনই ক্ষণস্থায়ী, নিত্যই "আগমাপায়ী"। কিন্তু সামান্য হইলেও সরল সত্যই স্বীয় সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্যে চিরকালের মত মহীয়ান্ হইয়া বিরাজ করে।

তবে কিরূপে, কি ভাবে অথবা কোন্ সাধনায় মানব-চিত্তকে "মহাপুরুষ"দিগের চরণ প্রান্তে লইয়া যাইতে পারে? তাঁহাদের দৈবী কৃপালাভের পিপাসা বা তাঁহাদের সহিত আধ্যাত্মিক জীবনের উচ্চতম স্তরে বা পদবীতে আরূঢ় হইবার আশাই যে কেবল তাঁহাদের দিকে মানব-চিত্তকে আকর্ষণ করে তাহা নহে। বস্তুতঃ প্রকৃত প্রেমপূর্ণ হৃদয়, উদার ভাব, মানবের সুখে ও দুঃখে তাহাদের

* On The Threshold নামক গ্রন্থে Dreamer কর্তৃক সন্নিবেশিত যে পত্রিকার অংশগুলি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার স্বাধীনভাবে অনুবাদ এই নামে প্রকাশিত হইবে। পত্রিকাগুলি উচ্চ সাধকদিগের নিকট হইতে প্রাপ্ত ও সাধন-পথের বিশেষ উপযোগী। মূল গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পন্থা কার্য্যালয়ে এক টাকা মূল্যে প্রাপ্তব্য।

সাথী হইবার জন্য হৃদয়ের যে অজ্ঞানিত অথচ দুর্দ্দমনীয় অভিলাষ, এবং তাহারা যে দুঃখসাগরে নিমগ্ন আছে, তাহার ভার লঘু করিবার জন্য যে আন্তরিক ইচ্ছা —এই গুলিই মানবকে "মহাপুরুষ"দের চরণকমলে উপনীত করায়। যতক্ষণ লোকে নিজেকে এবং নিজের যাহা কিছু আছে, সে সমস্তই মনুষ্যমণ্ডলীর মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত করিতে প্রস্তুত না হয়—যতদিন না লোকে প্রকৃত বোধ লাভ করিতে পারে, যে তাহার শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক যাহা কিছু সম্বল আছে, সমস্তই সেই 'মহাপুরুষ'দিগের ও মানব-সমাজের প্রয়োজনের জন্যই তাহার নিকট গচ্ছিত আছে, ততদিন সে প্রকৃত শিষ্যত্ব লাভ করিতে পারে না এবং "তাঁহাদের" সেবা করিবার অধিকারও লাভ করিতে সক্ষম হয় না।

(২)

তুমি যতই অধ্যাত্ম বা প্রকৃত যোগ-বিদ্যার পথে অগ্রসর হইবে, ততই দেখিতে পাইবে যে আমাদের কি পথে কার্য্য করিতে হয়; তখন দেখিবে আমাদের সহায়তা যে দিগভিমুখী হয়, তাহা যে আমাদের নিজ নিজ ইচ্ছার অনুরূপ বা ব্যক্তিগত 'খেয়াল' তাহা নহে; প্রত্যুত উহা সাধকের চিত্তাকর্ষিণী শক্তিরই ফলমাত্র। "সর্ব্বের"—মহানের ভিতর ক্ষুদ্র ও বিশিষ্টকে পর্য্যবসিত করা, ব্যক্তিগত সংস্কার বা পূর্ব্বানুরাগগুলি বিসর্জ্জন দিয়া চতুর্দ্দিকে লোকহিতকর চিন্তা-প্রবাহের প্রেরণা করা এবং আতসীকাচের ন্যায় যে সকল "কেন্দ্র"গুলি এই প্রবাহ সমূহকে স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির দ্বারা কেন্দ্রীভূত করিতে পারে, সেই সেই ক্ষেত্রে অধিকতর উদ্যমের সহিত সংযুক্ত হওয়া,—এইরূপ কার্য্যানুষ্ঠানকেই স্বভাবানুযায়ী কার্য্য করা বলে;—ইহাকেই প্রকৃতির সহকারিতা বলে। পশু অথবা উদ্ভিদ্‌কে যে উপায়ে সহায়তা করা যায়, মানুষকে সে ভাবে সাহায্য করা যায় না। মনের ভিতর ভগবানের যে শক্তিকণা আছে, তাহার অদ্বিতীয়তা ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া মানবকে সাহায্য করিতে হয়। মানব যখন স্বেচ্ছায় আপনার চৈতন্যক্ষেত্রে এইরূপ পূর্ব্বাবস্থাগুলি সংঘটিত করিতে পারে যে তাহার ভিতর দিয়া সাধুকৃপা প্রবাহিত হইলে, ঐ প্রবাহ একদিকে তাহার প্রকৃতির অনুরূপ ভাবে 'সহজ' বা প্রকৃতিগত হয়, এবং অপরদিকে ঐ শক্ত্যাবেশ তাহার 'আমি'র সহিত এমন ভাবে মিশিয়া যায় যে, উহা আগন্তুক বা বাহিরের বলিয়া মনে হয় না,—পরন্তু উহা তাহার 'আমির'ই স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বলিয়া জানিতে পারে,—তখনই সেই মানব ভগবানের আত্মভূত 'মহাপুরুষ'দিগের কৃপা লাভ করিতে সক্ষম হয়। উপাধির সংস্কার না হইলে ঐ কৃপা বাহ্যভাবে

ছিন্ন ও নষ্ট হইয়া যায়; আর 'আমি'র অনুরূপ না হইলে, ঐ রূপা বাহ্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রকৃত বলিয়া মনে হয় এবং তদ্দ্বারা মানব আপনার অন্তরতম ভগবৎ সত্ত্বার অনুভূতি লাভ করিতে পারে না। সর্ব্বাত্মিক ভাবে—শাস্ত্রানুমোদিত পথে উপাধিকে সংস্কৃত করিতে হইবে; ইহা সাধনার বাহ্যভাব বা অনুষ্ঠান। ভগবদ্ভক্তি দ্বারা 'অহং' জ্ঞানের বিশিষ্টতাকে কেবল ভগবানের প্রকাশ ক্ষেত্র বলিয়া বুঝিয়া, সেই ভাবে 'অহং'জ্ঞানের সংস্কারই সাধনার দ্বিতীয় বা অন্তরতম স্তর। সেই জন্য উপনিষদ বলিয়াছেন,—যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ, যথা দেবে তথা গুরৌ।

(৩)

হরি বড় ভাল ছেলে,—তাহার অন্তঃকরণও মহৎ। কিন্তু তাহার ভূয়োদর্শন আবশ্যক। আধ্যাত্মিক জীবনের অনেক কঠোর শিক্ষাও তাহাকে লাভ করিতে হইবে; নতুবা সে দুর্গম যোগ-বিদ্যার পথে স্থির ও অবিচলিত ভাবে দাঁড়াইতে পারিবে না। তাহার বিচার-বুদ্ধি ও ঐকান্তিকী নিষ্ঠা নাই; যদিও তাহার হৃদয় মহদাকাঙ্ক্ষাপূর্ণ, তথাপি প্রকৃত জ্ঞান হইলে যে বুদ্ধি-স্থৈর্য্য আসে, তাহা তাহার নাই। অতএব তাহাকে যাইবার পথ না দেখাইয়া অজানিত প্রদেশে শুধু ছাড়িয়া দিয়া আসা এবং একজন লোকের চক্ষু বাঁধিয়া পর্ব্বত শিখরপ্রান্তে ছাড়িয়া দিয়া আসা সমান। অতএব তাহাকে এইমাত্র সাহায্য করা যাইতে পারে যাহাতে তাহার বিবেক-বুদ্ধি প্রস্ফুটিত হয় ও তাহার বিচার-শক্তির চালনা হইতে পারে; তাহা হইলেই তাহাতে যে সকল গুণের অভাব তাহাই বিকশিত হইবে। এই প্রবাদবাক্যটী মনে রাখিও যে "যোগী" হইতে হয়, যোগীকে বাহির হইতে "গড়িয়া" তোলা যায় না।

(৪)

তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না যে, স্থৈর্য্য না আসিলে কিছুই হয় না এবং *যাহা তত্ত্ব-শিক্ষার্থীর বা লোক-সেবকের অবশ্য প্রয়োজনীয়, সেই গুণ এখনও তোমাতে নাই* এবং *তুমি দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তিবশে অনেক সময়েই চালিত হও*? প্রেম এবং ভক্তি অবশ্যই মহৎ বৃত্তি, উহাতে হৃদয়-পূত এবং উন্নত হয়। কিন্তু যতক্ষণ ঐ সকল দুর্দ্দম প্রবৃত্তি সমতা প্রাপ্ত না হয় এবং হৃদয়ের প্রশান্ত ভাব পর্য্যাবর্ত্তিত বা জ্ঞানের আলোক তমসাচ্ছন্ন না করে, ততক্ষণই উহাতে উপকার হয়। অতএব তত্ত্ব-বিদ্যার্থী যেমন প্রেমিক, দয়ালু ও পুণ্যশীল হইবেন, যেমন তাঁহার মহত্তর বৃত্তিগুলি ক্রমে সূক্ষ্মতর স্পন্দন ও সত্ত্বা সমূহ অনুভব করিতে পারিবে এবং জ্ঞানশক্তি তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর হইবে, তদ্রূপ তিনি তিতিক্ষার

অভ্যাস করিবেন এবং সুখ দুঃখে সমভাবে সহিষ্ণুতা অবলম্বন করিতে শিখিবেন। দুঃখদায়কই হউক আর আনন্দদায়কই হউক, জীবনের সমস্ত অবস্থা—সমস্ত শিক্ষার ভিতর দিয়া অন্তঃকরণের প্রশান্ত-বাহিতা পরিহার না করিয়া অবিচলিত ভাবে তাঁহাকে যাইতে হইবে।

এক্ষণে তুমি সার্ব্বজনীন প্রেম ও সহানুভূতির সহিত আমাদের জীবভাবের কিরূপে সামঞ্জস্য হইতে পারে বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছ সে সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। আমি যে দুই একটী নিদর্শন দেখাইয়া যাইব, উহা তোমার বর্ত্তমান অবস্থার যথেষ্ট। সার্ব্বজনীনতা ও জীবত্বের সমানুপাত জ্ঞান (the realisation of true proportion) সাধনার পরিপক্ক অবস্থায় আসিবে, কিন্তু তাহা সুলভ নহে। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে তোমাকে প্রথমে দুই একটী বিষয় পরিষ্কার ভাবে বুঝিতে হইবে। প্রথমেই তোমায় বুঝিতে ও অনুভব করিতে হইবে যে, তোমার ও প্রত্যেকের ভিতরেই যে "আমি" বা জীবসত্তা আছে, তাহা বাস্তবিকই ভগবদংশ। ভগবদংশ বলিয়াই ইহার অবশ্যই কর্ম্ম করিবার স্বাধীনতা, মহদাকাঙ্ক্ষা ও যোগদৃষ্টি আছে। যখন জানিতে পারিবে যে, অপরের ভিতর যে 'আমি' আছে, তাহাও একই পদার্থের স্ফুলিঙ্গ ; উহা হইতে মূলতঃ বা বস্তুতঃ বিভিন্ন নহে,—কিন্তু মায়িক উপাধি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় ; তখন ইহা অন্য সকলকে ভাল না বাসিয়া এবং সহানুভূতি না করিয়া থাকিতে পারে না। সকলের নিকটে বা সকলের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিবার আকাঙ্ক্ষা না করিয়া থাকা অসম্ভব।

এই যে স্ফুলিঙ্গ সমূহের কথা বলা হইল, এগুলি বিনা কারণে সৃষ্ট হয় নাই। উহারা কেন্দ্রস্থ আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর হইতে এই জন্যই বিকীর্ণ হইয়াছিল, যাহাতে পুনরায় ঈশ্বরেই পরিসমাপ্তিলাভ করিতে পারে। ঐ পরিসমাপ্তি যে 'অহং'-বোধের বিলোপ করিয়া সাধিত হইবে তাহা নহে। পরন্তু তাহাদের ক্রমেই অধিকতর ভাবে অনন্তরূপে বিকশিত হইয়া অবশেষে সমস্ত বিশ্বকে আলিঙ্গন করিয়া তাহাতে পর্য্যবসিত হইতে হইবে ; অথচ 'অহং'বোধ বিলুপ্ত হইবে না। কিন্তু যাহাতে ক্রমে ক্রমে এই বিকাশ হইয়া অবশেষে সেই মহান্ বিভু আত্মার সহিত একত্ব বোধ ঘটিতে পারে, যাহাতে আপাততঃ বিশিষ্টরূপে প্রতীয়মান্ 'আমি'টী ভগবানের পরম 'আমি'তে আত্ম হইয়া থাকিতে পারে, তজ্জন্যই ইহার স্ফুরণ 'আমির' ভিতর হইতেই হইবে ; এবং এই জন্য ব্যক্ত 'অহং' কেন্দ্রের আবশ্যকতা রহিয়াছে। ব্যক্তিত্ব আমাদের বন্ধনের হেতু নহে, কিন্তু ব্যক্তিত্বের সঙ্কোচ

না সঙ্কীর্ণতাই বন্ধের কারণ। স্ব-তন্ত্রতাও বন্ধহেতু নহে কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের সহিত যে চাপল্য আসে, তাহাই বন্ধনের হেতু।

(৫)

তোমার উপর দিয়া যে অগ্নি পরীক্ষা চলিতেছে, সে বিপদে তোমাকে রক্ষা করিবার জন্যই আমি তোমার কাছে সুক্ষ্মভাবে কিছুদিনের মধ্যে আসি নাই। কিন্তু, বৎস! তুমি আমার কথা ভাবিতেছ এবং তজ্জন্যই এই পরীক্ষার ঝাঁপ দিয়াছ। বিলম্বেই হউক আর শীঘ্রই হউক, তোমার এই কঠোর অবস্থার ভিতর দিয়া যাইতে হইবে। অতএব যদি বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, তবে উহা যে সময়েই আসুক না কেন, তাহাতে আসে যায় না। ভ্রাতঃ! তুমি বিপক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছ,—নিজ গহ্বরে শায়িত সুপ্ত সিংহকে জাগাইয়াছ; অতএব তোমার যুদ্ধে ভয় পাওয়া উচিৎ নহে। জ্ঞানের এবং তত্ত্ব-বিস্তার দ্বার চিরদিনই এইরূপ সযত্নে ও সাবধানে রক্ষিত, এবং উহা লাভ করিতে হইলে প্রত্যেকেরই বিপদ্‌ রাশি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। সাধক মাত্রেরই জীবন ভীষণ ঝঞ্ঝাবাত-পূর্ণ ও বিপদ্‌রাশি-সমাকুল; কিন্তু এই জীবনে প্রবেশ করা না করা মানুষের স্বেচ্ছাধীন। অতএব যে ইচ্ছাপূর্ব্বক এই পথের অনুসরণ করিবে, তাহার এ আনুষঙ্গিক যে কষ্ট সহ্য করিতে হইবে ও যে বিপদের সম্মুখীন হইতে হইবে, তজ্জন্য বিরক্ত হওয়ার কোনও অধিকার নাই। মনে রাখিও ভগবান বলিয়াছেন; "যে আমার করে আশ, তার করি সর্ব্বনাশ। তা'তেও যে না ছাড়ে আশ, হই তার দাসের দাস।" তুমি আমার কাছে বিপক্ষকে দমন করিবার অস্ত্র চাহিয়াছ, কিন্তু তুমি কি নিজেই জান না যে বিপক্ষকে পরাভূত করিতে হইলে কি কি অস্ত্রের আবশ্যক? গীতা এবং Light on the Pathএর উপদেশ স্মরণ রাখ, তাহা হইলেই তুমি সুসজ্জিত হইতে পারিবে। অহঙ্কার দমন কর,—ক্ষুদ্র 'আমি'কে মুছিয়া ফেল; তোমার ভিতরে যে যোদ্ধা আছেন, তাঁহাকে খুঁজিয়া তাঁহার শরণ লও এবং তাঁহার আজ্ঞামত যুদ্ধ কর; তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিজয়লক্ষ্মী তোমার করতলগত হইবে। কারণ তোমার ভিতরে যে যোদ্ধা অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি ভ্রমপ্রমাদের অতীত; তিনি ভুল করিতে পারেন না। "নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ। ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ॥" তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী ও সর্ব্বশক্তিমান্‌, অসিতে তাঁহাকে ছিন্ন করিতে পারে না। তিনি অগ্নির অদাহ্য,—জলে তিনি অক্লেদ্য। তিনি অজর, অমর, শাশ্বত ও নিত্য; তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক। তোমার নিজের

কোনও স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখিও না, নিরপেক্ষ ও সঙ্কল্পহীন হইয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতেই আত্মসমর্পণ কর ; তাহা হইলে তুমি সর্ব্বাবস্থায় নিরাপদ্ হইবে। বদ্ধ এবং সান্ত হৃদয়ের উপরই তামসিক শক্তিনিচয়ের প্রভাব আছে ; যাঁহারা অনন্ত ও মুক্ত, তাঁহারা উহাদের সীমার বাহিরে। অতএব ক্ষুদ্র অভিমানময় অহঙ্কারকে মাথা তুলিতে দিও না—পরন্তু ভগবানের শ্রীচরণে উহাকে বলি দাও। ভগবচ্ছক্তির অনুগত হও ; বুঝিতে চেষ্টা কর যে ভগবানের স্বীয় ইচ্ছা সাধনের নিমিত্তই অহঙ্কার সৃষ্ট ও তাঁহাতে সম্পূর্ণ আত্ম-বিসর্জ্জনই ইহার সফলতা ও পরিসমাপ্তি। তাহা হইলেই তুমি শত্রুকে পরাভূত করিতে সক্ষম হইবে ; কারণ উহা দেশ ও কাল সাগরে ক্ষুদ্র বুদ্বুদ্ মাত্র, মিথ্যা "আমি"টার সকপোলকল্পিত সৃষ্টি মাত্র।

কিছুই চাহিও না, ভগবানের সেবা করিবার যে অধিকার তাহাই মাত্র লাভের জন্য দৃষ্টি রাখ ; তাহা হইলে তুমি এখন যাঁহার জন্য ব্যাকুল হইয়া আছ, তাঁহাকে দেখিতে ও শুনিতে পাইবে। বিভূতি ও শক্তি প্রকৃত সাধনার পথে ধুলি-কণার ন্যায় আপনা আপনি সাধকের পদে সংলগ্ন হয়। অতএব ঐরূপ তুচ্ছ পদার্থে তোমার চিত্তকে নিবদ্ধ করিওনা। কারণ মায়িক ও অনিত্য বস্তুর জন্য তুমি যতই আগ্রহ করিবে, ততই আত্মাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিতে থাকিবে। ঐ চিত্তে আর ভগবজ্জ্যোতিঃ প্রতিফলিত হইতে পারে না। তাঁহার শ্রীচরণকমলে সেবার প্রার্থী হও। উহাতে যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তজ্জন্যই যে উহার প্রার্থী হইবে, তাহা নহে। আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিই কাম এবং কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতিই প্রেম ; কিন্তু যাহাতে তুমি প্রকৃতই তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পার এবং বিপথে ভুলিয়া না যাও, তজ্জন্য তাঁহার চরণে শরণ লও। কারণ শুধু ঐ মহাভাবেই উপাধি হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবে ; শুধু এই উপায়েই আমরা মায়িক জগতের নিত্য পরিবর্ত্তনশীল ছায়াগুলিকে ত্যাগ করিয়া নিত্য শুদ্ধ সত্ত্বে আপনাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারি।

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।"

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

অদ্বৈতানুভূতি।

১।— মহাশূন্য অখণ্ডিত নভঃ যথা খণ্ডিতের মত,
ঘটে পটে বিভিন্ন আকার ;
নিরুপাধি অবিচ্ছিন্ন 'আত্মা' তথা মায়া উপগত,
ধরে ভিন্ন বহুল বিকার।

২।— নেহারি' গগন-পটে মেঘমালা চৌদিকে ধাবিত,
ভাবে মূঢ় চন্দ্র বুঝি ধায় ;
তেমতি অজ্ঞান জীব হেরি' চিত্ত সদা বিচলিত,
চঞ্চলতা আরোপে 'আত্মায়'।

৩।— শশী প্রতিবিম্ব যথা, আন্দোলিত সরসীর জলে,
বিকম্পিত হেন জ্ঞান হয় ;
বিচলিত চিত্ত মাঝে চিদাভাস যবে মৃদু দোলে,
কাঁপে 'আত্মা'—হেন মনে হয়।

৪।— গগনের এক ভানু নানা সরে হইয়ে বিম্বিত,
ধরে বহু ভানুর আকার ;
এক 'আত্মা' মায়াবশে নানা চিত্তে হইলে ফলিত,
বহু রূপ দেখায় তাহার।

৫।— মেঘযোগে বারি যথা ধরে স্থূল করকা আকার,
গলে যবে, নীর না লুকায় ;
মায়া-যোগে 'আত্মা' তথা ধরে এই প্রপঞ্চ বিকার,
টুটে যবে, আত্মা না ফুরায়।

৬।— বহু বর্ণ মণি যোগে স্বচ্ছ শুভ্র স্ফটিক যেমন,
নানা রুচি করয়ে ধারণ ;
'পঞ্চকোষ' সহযোগে শুদ্ধ-সত্তা 'আত্মাও' তেমন
হয় কোষ-গুণের ভাজন।

৭।— মণিগুলি একে একে কেহ যদি দূরে লয়ে যায়,
শুভ্র যথা স্ফটিক আধার ;
কোষ-মুক্ত হয় যবে আত্মজ্ঞানে 'আত্মা' পুনরায়,
জাগে পুনঃ নির্গুণতা তার।

৮।— বিম্বিত তপনে যথা নীর-গুণ নাহিক পরশে,
ভানু করে জল-রবি তায়;
বুদ্ধি-ভাত চিদাভাসে কামনাদি দোষ নাহি পশে,
'আত্মা' পুনঃ দীপ্ত করে তা'য়।

৯।— দুগ্ধের সংযোগে যথা বারি ধরে দুগ্ধের আকার,
'আত্মা' যোগে জীবের চেতনা;
নীরস অয়স যথা বহ্নি তাপে দীপ্ত বার বার,
'চিদাত্মার' বিশ্ব-উদ্দীপনা।

১০।— এক সূত্রখণ্ডে যথা নানা পুষ্পে মালিকা-রচন,
ঝরে ফুল, সূত্র তবু রয়;
একাত্মে তেমতি গাঁথা দেহত্রয় স্থূলাণু কারণ,
দেহ মরে, 'আত্মা' সে অক্ষয়।

১১।— 'আত্মা' নহে স্থূল দেহ জন্ম-জরাভয় মৃত্যুময়,
রস-মিশ্র ইন্দ্রিয় ত' নয়;
নহে 'আত্মা' মন, বুদ্ধি, পঞ্চপ্রাণ, অহঙ্কার নয়,
এ সবার অতীত সে হয়।

১২।— হর্ষ-শোক, রাগ-দ্বেষ,—বুদ্ধি যবে রহে জাগরিত,
চিত্ত মাঝে হয় রে উদয়;
সুষুপ্ত হইলে বুদ্ধি, এ সকলি হয় নির্ব্বাপিত,
চিদানন্দে ঘটে বুদ্ধি লয়।

১৩।— ঘট-বদ্ধ নভ যথা ঘট-নাশে আকাশে মিশায়,
দেহ-নাশে জীবত্বের লয়;
জলে জল, নভে নভ, তেজে তেজ যখন মিশায়,
'ব্রহ্ম' রূপে 'আত্মার' উদয়।

১৪।— জনম জনম ধরি' ভ্রমে দেহী যোনিতে যোনিতে,
কর্ম্ম-পাশ বিরচে বন্ধন;
সকাম করম নাশে, বাসনার বিনাশ সহিতে,
সে বন্ধন হয় রে মোচন।

১৫।— বাসনার অবসানে,—কর্ম্ম শেষে,—যাহা অবশেষ,
সেই 'আত্মা' চিদানন্দময়;

কর্ম্ম-চক্রে না ঘুরে সে, ফল-ফাঁস নাহি পরে লেশ,
নিষ্ক্রিয় সে নির্ব্বিকার হয়।

১৬।— ভুজঙ্গে নির্ম্মোক যথা নহে অঙ্গ, শুধু আবরণ,
জীর্ণ হ'লে করে পরিহার ;
স্থূলাদি শরীরত্রয় আত্মার সে ছদ্ম আচ্ছাদন,
হ'লে ম্লান নাহি পরে আর।

১৭।— সত্ত্ব-রজ-তমোরূপী গুণত্রয় নহে সে আত্মার,
মূর্ত্তি নহে ব্রহ্মা-হরি-হর ;
স্থূল সূক্ষ্ম-কারণজ দেহত্রয় নহে দেহ তার,
তিন লোকে নাহি তার ঘর।

১৮।— সুষুপ্তি স্বপ্ন জাগরণ ভাবত্রয় নাহিক তাহার ;
নাহি করে সৃষ্টি-স্থিতি লয় ;
ত্রিতয়-অতীত সে যে,—তুরীয়তা স্বরূপ তাহার,
নিরঞ্জন আনন্দ-আলয়।

১৯।— বাহ্য সুখ পরিহরি', আসক্তিরে করিয়া বিনাশ,
জীব যবে হয় অন্তর্মুখ ;
ঘটস্থ প্রদীপ সম আত্মালোক হয় স্বপ্রকাশ,
আস্বাদয়ে 'চিদানন্দ' সুখ।

২০।— দীপ যথা জড়ময় ঘট পট করয়ে প্রকাশ ;
ঘট পট দীপে না ফুটায় ;
তেমতি 'চিন্ময়' 'আত্মা' এই বিশ্ব করয়ে বিকাশ,
'আত্মা' কভু তা'হে নাহি ভায়।

২১।— যার ভাতি বিভাতয়ে সূর্য্য সোম গগনমণ্ডলে,
রবি শশী না বিকশে যা'য় ;
স্থাবর জঙ্গম জড় উদ্ভাসিত যার অংশুবলে,
দীপ্ত পুনঃ না করে যাহায়।

২২।— মহৎ হইতে যেবা মহীয়ান্ পশে সর্ব্বভূতে,
এ বিশ্বের বিরাট্ শরীরে ;
অণু হ'তে অণীয়ান্ হ'য়ে যেবা অণুতে অণুতে,
রহে পশি ভিতরে বাহিরে।

২৩।— অনণু অস্থূল অজ নিত্য শুদ্ধ যেবা কালাতীত,
নাহি যার মুকতি-বন্ধন,
চক্ষু-কর্ণ-পাণি-পাদ হীন যেবা সকলি বিদিত,
দেহ ভেদে না হয় হনন।

২৪।— অনুচ্ছিষ্ট, অ-স্বাদিত, অভুক্ত যে একক, অদ্বয়,
অনুভব না হয় যাহার ;—
ওরে ভ্রান্ত! ওরে মূঢ়! তুই সেই আত্মা চিন্-ময়,
'জীবে' 'শিবে' ভেদ কোথা আর।

শ্রীভুজঙ্গধর রায়চৌধুরী।

ধর্ম্ম]　বিদ্যা-বিলাস। *

জয় জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয়, জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥

হে কলি-কলুষনাশন পরমারাধ্য প্রেমময়-কলেবর প্রভু সন্তানগণ, হে ক্ষিতি-পাবন অদোষদর্শী পরম দয়াল বৈষ্ণবমণ্ডলী, হে ধামবাসী পতিতোদ্ধারণ প্রভু-পরিকর, যখন গত বর্ষে এই দিনে শ্রীমন্ নরহরি-চৈতন্যের প্রিয় লীলাভূমি শ্রীখণ্ডে বৈষ্ণবসেবা-নিরত' গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের প্রাণ পুণ্যশ্লোক কাশিম-বাজারাধিপতি পীড়া-কাতরকণ্ঠে সমগ্র ভক্তমণ্ডলীর কৃপাশীর্ব্বাদ শিরে ধারণ করিয়', প্রেম-গদগদ ভাষায় বলিয়াছিলেন, ''যদি শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হয় এবং বৈষ্ণবমণ্ডলীর আশীর্ব্বাদে আমার ব্যাধিক্লিষ্ট পীড়িত দেহের অবসান না হয়, তবে আগামী বর্ষে শ্রীসম্মিলনীর মহোৎসব প্রভুর নিজ প্রিয়ধাম শ্রীনবদ্বীপে হইবে।" করুণৈকসিন্ধু বাঞ্ছাকল্পতরু সর্ব্বেশ্বর গৌরাঙ্গ-সুন্দর ভক্ত-বাঞ্ছা আজ পূর্ণ করিয়াছেন ; তাই আজ প্রেমতরঙ্গিণী সুরধুনী-তীরে প্রেমের তরঙ্গ ছুটিয়াছে। প্রেম-বন্যার অপ্রতিহত প্রতাপে সংসারের পাপ-তাপ-জ্বালা-যন্ত্রণা আজ কোথায় বিদূরিত হইয়া গিয়াছে। প্রেম-হিল্লোলে স্থাবর জঙ্গম আজ নৃত্য করিতেছে। করিবে না কেন? ভক্ত সমাবেশ হইলেই ভক্তের ভগবান্ আর থাকিতে পারেন না ; লীলাবিহারীর ইচ্ছায় লীলাতরঙ্গ আপনিই নাচিয়া উঠে। ঐ দেখ ''প্রেমসিন্ধু গোরারায়, নিতাই তরঙ্গ তায়, করুণা বাতাস

* শ্রীধাম নবদ্বীপে বৈষ্ণব-সম্মিলনীতে পঠিত।

চারিপাশে” ঐ দেখ ভাই 'নদে' ডুবাইয়া 'শান্তিপুর' ভাসাইয়া আবার আজ অবাধ প্রেমের তরঙ্গ ছুটিয়াছে।

“উথলিয়া প্রেম-বন্যা চৌদিকে বেড়ায়।
স্ত্রী বৃদ্ধ বালক যুবা সবারে ডুবায়॥
সজ্জন দুর্জ্জন পঙ্গু জড় অন্ধগণ।
প্রেম-বন্যায় ডুবাইল জগতের জন॥
পাত্রাপাত্র বিচার নাহি, নাহি স্থানাস্থান।
যেই যাঁহা পায় তাঁহা করে প্রেমদান॥”

কালক্রমে—মায়া পভাবে, অবিদ্যাই বিদ্যা হইয়াছে; তা'ই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এই প্রেমরস-পূরিত মহাদার্শনিকতত্ত্ব সমন্বিত পবিত্র ধর্ম্ম নেড়ানেড়ীর ধর্ম্ম বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। যে ধর্ম্মের মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্যের নিকট বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদমর্য্যাদা তৃণবৎ ভাসিয়া গিয়াছে,—মহেন্দ্র-তুল্য ঐশ্বর্য্য অপ্সরা সদৃশ কামিনী পরিবর্জ্জিত হইয়াছে; যে অত্যুজ্জ্বল প্রেমের ধর্ম্মের দিব্যচ্ছটায়—

“সাংখ্য মীমাংসক তর্কাদিক যত,
মলিন দেখি পরতাপ।
যোগদান ব্রত আদি ভয়ে জগত
বোয়ত করম গেয়ান।”

ছিন্নকন্থাধারী বৃক্ষতলবাসী দবীর-খাস শ্রীরূপসনাতন যে ধর্ম্মের আদর্শ,—ভোগ-ত্যাগের জীবন্ত মূর্ত্তি মহাবৈরাগী শ্রীরঘুনাথ দাস যে ধর্ম্মের পথপ্রদর্শক,—ভোগ-ত্যাগ ও চরিত্র গঠন যে ধর্ম্মের মূলমন্ত্র, সেই ধর্ম্ম কি সেবাদাসী বিলসিত ইন্দ্রিয়-সেবী নেড়ানেড়ার ধর্ম্ম হইতে পারে? স্বয়ং প্রভু ও প্রভু-পার্ষদগণের নিকট আজ সেই নিদারুণ মর্ম্ম বেদনা জনাইবার জন্যই আমি আসিয়াছি। আর আসিয়াছি লক্ষকোটী ভক্তপদধূলিপূত এই মহাতীর্থে গড়াগড়ি দিয়া তাপদগ্ধ দেহ শীতল করিতে। হে কৃপাময় ভক্তবৃন্দ, আশীর্ব্বাদ করুন, যেন জীবাধমের আশা পূর্ণ হয়।

“চৈতন্যলীলার আদি অন্ত নাহি জানি।
সেই লিখি যেই মহান্তের মুখে শুনি।
ইথে অপরাধ মোর না লইহ ভক্তগণ।
তোমা সবার চরণ মোর একান্ত শরণ॥”

বৈরাগ্যবিদ্যা নিজভক্তিযোগঃ শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে॥

যুগ-যুগান্তরের কথা নহে, সার্দ্ধ চারিশত বর্ষের অনধিক হইবে, কলি ঘোর তমসাচ্ছন্ন জীবকে চমকিত করিয়া, এই অলৌকিক তূর্য্য-নিনাদ দিগ্‌দিগন্ত বিকম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল ; অমনি বিস্মিত জগদ্বাসী চকিতনেত্রে তাকাইয়া দেখিল, পুরট-সুন্দরদ্যুতি-কদম্ব-সন্দীপিত একটী বালক সন্ন্যাসিমূর্ত্তির পদতলে মহাপ্রভাবান্বিত হিন্দু-সম্রাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর বিলুণ্ঠিত হইতেছেন। আর চরণযুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছেন,—

"জগৎ নিস্তারিলে তুমি সেহ অল্প কার্য্য।
আমা উদ্ধারিলে তুমি এ শক্তি আশ্চর্য্য॥"
তর্কশাস্ত্রে জড় আমি যৈছে লৌহপিণ্ড।
আমা দ্রবাইলে তুমি প্রতাপ প্রচণ্ড॥"

ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তি যুগে যুগে প্রকাশ হয় সত্য ; কিন্তু এরূপ দৃষ্ট কোনও যুগেই বুঝি হয় নাই। অবিরাম সপ্তাহাধিক কালব্যাপী ঘোরতর জ্ঞান-যুদ্ধের পর পরাজিত-প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেতার মহিমা কিরূপ কীর্ত্তন করিতেছেন দেখুন ;—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শচী-সুত গুণধাম।
এই ধ্যান এই জপ এই লয় নাম॥"

ভাইরে, এই নির্জ্জিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে চিনিয়াছ ত'? নানা বিষয়িণী সুগভীর শাস্ত্র-বিদ্যা দেখিয়া যাঁহাকে "সার্ব্বভৌম" উপাধিতে ভূষিত করিয়া হিন্দু-সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় সম্রাট্‌পদে বরিত করিয়াছেন,—বিরহুতিয়া নৈয়ায়িক শিরোমণি পক্ষধর মিশ্রকে 'মাৎ' করিয়া যিনি এই নবদ্বীপে নব্য ন্যায়ের স্রোত প্রবাহিত করিয়াছেন,—চতুর্বর্ণের ও চতুরাশ্রমের দেবতা শ্রীজগন্নাথের দ্বার-পণ্ডিত পদে সমাসীন হইয়া, যিনি অঙ্গুলি হেলনে সমগ্র হিন্দু-সাম্রাজ্য পরিচালন করিতেছেন,—বৈষ্ণব মহারাজেরা যাঁহাকে দেবগুরু বৃহস্পতি বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া বলিয়াছেন ;—

"সার্ব্বভৌম জগদ্‌গুরু শাস্ত্র-জ্ঞানবান্।
পৃথিবীতে নাহি পণ্ডিত যাঁহার সমান॥"

আজ সেই পণ্ডিতকুল-কেশরী মহাবৈদান্তিক বাসুদেব ভট্টাচার্য্য কি বলিতেছেন শুনুন,—"ভাইরে! কৃপাময়ের কৃপায় এতদিনে আমার জ্ঞানচক্ষু খুলিয়াছে, যাহাকে এতদিন বিদ্যা বলিয়া সেবা করিয়া আসিয়াছি, তাহা বিদ্যা নহে—অবিদ্যা। বিদ্যা ভগবানকে চিনাইয়া—জানাইয়া—ধরাইয়া দেয় ; অবিদ্যা ভগবত্তত্ত্বকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলে। তা'ই নিখিল শাস্ত্রবিদ্ মহাপণ্ডিত হইয়াও—স্বচক্ষে অলৌকিক প্রেম লক্ষণ দেখিয়াও এবং ভক্ত গোপীনাথ চিনাইয়া দিলেও, সাক্ষাৎ ভগবানকে

চক্ষে দেখিয়াও চিনিতে পারি নাই; পরন্ত শাস্ত্র-যুক্তিদ্বারা তাহাই অপ্রমাণ করিতেই চেষ্টা পাইয়া বলিয়াছি;—

"মহাভাগবত হয় চৈতন্য গোসাঞি।
এই কলিযুগে বিষ্ণু অবতার নাঞি॥
অতএব 'ত্রিযুগ' করি কহি বিষ্ণু নাম।
কলিযুগে অবতার নাহি শাস্ত্রজ্ঞান॥"

এখন আবার সেই মুখেই বলিতেছি, হে ভাগ্যবান্ নদীয়াবাসী, তোমারা যাঁহাকে 'শচীপিসীর পুত্র' বলিয়া দেখিয়াছ, তিনিই সেই বেদবর্ণিত "মহান্ প্রভু বৈ পুরুষঃ সত্বশেষ প্রবর্ত্তকঃ"। হে ভক্তবৃন্দ, তোমরা যাঁহাকে "শচীর দুলালিয়া, শ্রীবাস অঙ্গনের নাটুয়া" দেখিতেছ, আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি তিনিই তোমাদের "শ্যামসুন্দর শিখিপুচ্ছগুঞ্জাদিভূষণ। গোপবেশ ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন॥"

হে বেদান্তাভিমানী সন্ন্যাসিবৃন্দ, তোমরা যাঁহাকে "ভাবুক সন্ন্যাসী" বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছ, তিনিই পুরাণপুরুষ বেদোক্ত "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ভাইরে, আর একটী আশার বাণী শুন। যুগে যুগে ভগবান্ অবতার হইয়াছেন বটে, কিন্তু এরূপ কৃপাম্বুধি যাহা কোটী জন্ম কঠোর তপশ্চরণে লভ্য হয় না, আমি মহা অপরাধী হইয়াও তাহাই আমার ভাগ্যে লভ্য হইল।

"দেখাইল আগে মোরে চতুর্ভুজ রূপ।
পাছে শ্যাম বংশীমুখ স্বকীয় স্বরূপ॥"

বুঝিয়াছি ইনিই সেই যশোদা-গুণধর শ্রীনন্দদুলাল। নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান এবং কাম্য কর্ম্মের অত্যধিক প্রতাপে ভক্তিদেবী নির্ব্বাসিতা হওয়ায়, প্রভু আমার সেই বৈরাগ্যবিদ্যা এবং ভক্তিযোগ শিখাইতেই লক্ষ্মী-স্বরস্বতীর প্রিয় রঙ্গভূমি এই শ্রীনবদ্বীপে উদয় হইয়াছেন। এখন বুঝিয়াছি "মুক্তি" বা চতুর্ব্বর্গ ফল জীবের পুরুষার্থ নহে; জীবের একমাত্র পুরুষার্থ প্রেম।

"সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম"।

শুদ্ধাভক্তি হইতেই সেই প্রেমের অভ্যুদয় হয়। ভুক্তি মুক্তির সাধ থাকিতে— মুক্তি কামনা বা ভোগ-বাসনার সাধ থাকিতে, সেই ভক্তি মিলিবে না। তা'ই শ্রীপাদরূপ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥

বাস্তবিক জগতে যদি কোন বিদ্যার অনুশীলন করিতে হয়, তবে এই শুদ্ধাভক্তির

অনুশীলন করাই কর্ত্তব্য। তাহাই একমাত্র অভিধেয় বুঝি। প্রভু আমাকে তাহাই শিখাইতে সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সাজিয়াছেন, তাহাই শিখাইতে শৈশবে মুরারী-গুপ্তের সহিত চপলতা করিয়াছিলেন, তাহাই শিখাইতে জ্ঞান-বৃদ্ধ বেদ পঞ্চানন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত প্রেম-কলহ করিয়াছিলেন, আবার তাহাই শিখাইতে উদ্ধত নিমাই 'পণ্ডিত' সাজিয়া ;—

"হয় ব্যাখ্যা নয় করে, নয় করে হয়।
সকল খণ্ডিয়া শেষে সকল স্থাপয়॥"

প্রাকৃত বিদ্যা নিতান্ত অনর্থক ও অপ্রতিষ্ঠ ; তাহাই ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য প্রভুর আর একটী চমৎকারিণী লীলার কাহিনী কহিব ;—

মহাবাহিনী সাজাইয়া, শিশু-শাস্ত্রের অধ্যাপক বালক 'নিমাই পণ্ডিতকে' জয় করিবার জন্য জ্ঞান-গর্ব্বিত দিগ্বিজয়ী কেশব কাশ্মিরী এই নবদ্বীপে আসিয়াছেন। ঐ দেখ অদূরে এই প্রেমতরঙ্গিণী সুরধুনীতীরে শিষ্যবর্গমণ্ডিত হইয়া অখিল ভুবন-পতি পাত্রমিত্র লইয়া বালক-অধ্যাপক সাজিয়া, কিরূপ বসিয়া আছেন ;—

শিষ্যসঙ্গে গঙ্গাতীরে আছেন ঈশ্বর।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে রূপ সর্ব্ব মনোহর॥
হাস্যযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অনুক্ষণ।
নিরন্তর দিব্যদৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন॥
মুক্ত শ্রীদশন অরুণ অধর।
দয়াময় সুকোমল সর্ব্ব কলেবর॥
সুবর্ণিত শ্রীমস্তকে শ্রীচাঁচর কেশ।
সিংহগ্রীব, গজস্কন্ধ, বিলক্ষণ বেশ॥
সুপ্রকাণ্ড শ্রীবিগ্রহ, সুন্দর হৃদয়।
যজ্ঞসূত্ররূপে তাঁহে অনন্ত বিজয়॥
শ্রীললাটে ঊর্দ্ধ সুতিলক মনোহর।
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর॥
যোগপট্টছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।
বাম ঊরুমাঝে থুই দক্ষিণ চরণ॥
করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।
হয় নয় করেন, নয় করেন প্রমাণ॥

দুই মিনিট মধ্যে কি হইল জানি না, কেশব কাশ্মিরীর হিমাদ্রিশেখরের উচ্চ

জ্ঞান গর্ব্ব-চূড়া একেবারে গুঁড়া হইয়া গিয়াছে। দিগ্বিজয়ী বালক অধ্যাপকের পায়ে লুটাইতেছেন আর কান্দিয়া কান্দিয়া বলিতেছেন ;—

গৌড় তিরোত ডিল্লি কাশী আদি করি।
গুজ্জরাট বিজয়ানগর কাঞ্চপুরী॥
হেলঙ্গ তেলঙ্গ ওড্র দেশ আর যত।
পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত॥
দূষিবে আমার বাক্য, সে থাকুক দূরে।
বুঝিতেই কোনজন শক্তি নাহি ধরে॥
হেন আমি তোমা স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে।
না পারিনু, সর্ব্ব বুদ্ধি গেল কোন্ ভিতে॥
কলিযুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ।
তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন জন্।
দিব্য ভাগ্যে পাইনু তোমার দরশন।
এবে শুভদৃষ্টে মোরে করহ মোচন॥

প্রভু হাসিয়া শিখাইলেন ;—

দিগ্বিজয় করিব,—বিদ্যার কার্য্য নহে।
ঈশ্বরে ভজিলে সেই বিদ্যা সত্য হয়ে॥
সেই সে বিদ্যার ফল জানিহ নিশ্চয়।
কৃষ্ণ পাদপদ্মে যদি চিত্ত-বৃত্তি রয়॥
মহা উপদেশ এই কহিনু তোমারে।
সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত সংসারে॥

আবার করুণাময় প্রভু রায় রামানন্দের সহিত প্রশ্নোত্তরে শিখাইলেন ;—

"প্রভু কহে কোন্ বিদ্যা বিদ্যা মধ্যে সার।
রায় কহে কৃষ্ণভক্তি বিনা বিদ্যা নাহি আর॥"

সুতরাং স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বেশ্বর শ্রীমন্ মহাপ্রভুর শ্রীমুখেই পাইতেছি "কৃষ্ণ-ভক্তিই একমাত্র বিদ্যা; তাহাই সর্ব্বদা অনুশীলনীয়।" বর্ত্তমানে ঘোর প্রাকৃত বিদ্যানুশীলনের কাল আসিয়াছে,—আসল ফেলিয়া নকলের পশ্চাতে জগৎ আদিষ্ট হইয়া ছুটিয়াছে; প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করিয়া অসত্যের পূজা প্রতিষ্ঠা চলিতেছে। ভক্তি শিক্ষা ও সদাচার একরূপ উঠিয়া গিয়াছে। অই যে জাহ্নবী-তীরে পর্ণকুটীরে নিষ্কিঞ্চন ভজনাসক্ত বৈষ্ণব গৌর-গতপ্রাণ গৌরকিশোর দাস বিরাজ করিতেছেন,

ঐ মহাপুরুষের অপ্রকটের সঙ্গে সঙ্গে বুঝি গৌড়মণ্ডলের নিষ্কিঞ্চন গৌরভক্তের ছাঁট হারাইয়া যাইবে; তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্মিলনীর প্রাণ পরম ভাগবত কাশিমবাজারাধিপতি ভক্তিশাস্ত্র অধ্যাপনার ব্যবস্থা করাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছেন। আমরা অসাধনে চিন্তামণি পাইয়া অনবধানতায় হারাইতেছি; সকলে সমবেত হইয়া এই সাধু সঙ্কল্পের সহায়তা করুন। শুধু পড়িলে বা পড়াইলে বৈষ্ণবতা হইবে না, সঙ্গে সঙ্গে আচরণ করা আবশ্যক হইবে। তাই ভজনশীল ভক্তিশাস্ত্রবিদ্ মহাজনগণের আশ্রয় লওয়া প্রয়োজন। আর সকলকে সর্ব্বান্তঃকরণে সর্ব্বপ্রকার সহায়তা করিতে হইবে। আইস ভাই, সেই ভক্তিযোগের মূর্ত্তিমান্ মূর্ত্তি শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দরের নিকট আমরা ইহার সফলতা কামনায় ভক্তিভরে প্রার্থনা করি;—

জয় জয় জয় মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।
জয় জয় জয় নবদ্বীপ পুরন্দর॥
জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কোটিনাথ।
জয় জয় শচী পুণ্যবতী গর্ভজাত॥
জয় মহাবেদগোপ্য জয় বিপ্ররাজ।
যুগে যুগে ধর্ম্ম পাল কর নানা সাজ॥
গূঢ়রূপে বেড়াইলা এই নগরে নগরে।
বিনি তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে॥
তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম, তুমি ভক্তি জ্ঞান।
তুমি শাস্ত্র, তুমি বেদ, তুমি সর্ব্ব ধ্যান॥
তুমি ঋদ্ধি, তুমি সিদ্ধি, তুমি যোগ ভোগ।
তুমি শ্রদ্ধা, তুমি দয়া, তুমি মোহ লোভ॥
তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি অগ্নি জল।
তুমি সূর্য্য, তুমি বায়ু, তুমি ধন বল॥
তুমি ভক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি অজ ভব।
তুমি বা হইবে কোন তোমার এ সব॥
যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল নগরে।
এখনে হইলা নবদ্বীপ পুরন্দরে॥
রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর ভিতরে।
হেন ভক্তি নবদ্বীপে হইলা বাহিরে॥

ভক্তিযোগে ভীষ্ম তোমা জিনিল সমরে।
ভক্তিযোগে যশোদায় বাঁধিল তোমারে॥
ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা।
ভক্তিবলে তুমি কালে কৈলে গোপরামা॥
ভক্তি লাগি সর্ব্বস্থানে পরাভব পায়্যা।
জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া॥
সে মায়া হইল চূর্ণ আর নাহি লাগে।
হের দেখ সকল ভুবনে ভক্তি মাগে॥
সে কালে হারিলা জন দুই চারি স্থানে।
একালে বাঁধিবে তোমা সর্ব্বজনে জনে॥

কোথায় পতিতপাবন কাঙ্গালের ধন প্রেমের ঠাকুর, আমরা যে আবার ঘোর তিমিরে ডুবিয়া রসাতলে যাইতেছি! আবার দয়া করিয়া তোমার প্রেমবাহু প্রসারণ করিয়া তোমার কলিতে অধম পতিত জনকে উদ্ধার করিয়া, তোমার প্রেমময় নাম সফল কর। আমাদের আর কেহ নাই প্রভো! আমরা নিতান্ত দুর্ব্বল; তাই বিশেষ কৃপার প্রার্থী!

দীন শ্রীবামাচরণ বসু।

ধর্ম্ম]

আমি।

বিশাল এ বিশ্বরাজ্যে জীবসঙ্ঘ সম্মিলনে;—
যে মহান্ বিশ্ব-হৃদি সৃষ্টি-ধর্ম্ম প্রসাধনে।
প্রকৃতির প্রেম-অঙ্কে বিলায়ে সৌন্দর্য্য ধারা;
স্নিগ্ধস্নাত জ্যোতির্ম্ময়, অব্যক্ত আনন্দভরা।
নিত্যকোটী জীব পাশে সাধনার অবসানে;—
ধরামাঝে ব্যষ্টিরূপে, পরাবিদ্যা আত্ম-জ্ঞানে।
প্রকাশি সাযুজ্যরূপ জীবের মঙ্গল তরে;
অবতার যাঁর কভু এ মর অবণী পরে।
রক্ষিতে ধর্ম্মের মান ঘুচায়ে অধর্ম্ম ভীতি;
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে স্থাপি, আত্মদান লোক-প্রীতি।

অজ্ঞেয় বিভূতি যোগে, অমৃত লহরী তুলি ;
শুদ্ধ চিদানন্দ যন্ত্রে, সত্ত্ব-রজ-তম ভুলি।
প্রণবের মোহমন্ত্রে মোহিয়া জগৎ প্রাণ ;
গাহে মাত্র এক "আমি" উপাধির ব্যবধান।

শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

ধর্ম্ম]

প্রণব-রহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে বুঝিয়াছি যে প্রণবটি একটা শব্দবিশেষ নহে ; উহা প্রত্যেক জগদ্বস্তুর ভিতর দিয়া প্রবাহিত চৈতন্যের স্রোত গতি বা প্রবৃত্তি। চৈতন্য যেখানে যে ভাবে খেলুক না কেন, সর্ব্বাবস্থাতেই তাহার ভিতর এই মৌলিক গতিটী রহিয়া যায়। উহা একটী অবিচ্ছিন্ন, অপরিমেয় গতি বা প্রবণতা। প্রত্যেক বস্তুই "অ" মাত্রায় স্থাপিত হইয়া "উ" বা উৎকর্ষের জন্য প্রয়াস করিতেছে। "উৎকর্ষ" কথাটীর অর্থ যখন আমরা ভেদ জ্ঞানের সাহায্যে বুঝি, তখন উহার নাম Evolution বা ক্রমোন্নতি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃত অর্থ নহে। এই মাত্রার রহস্যগুলি বুঝিবার জন্য আমরা একবার উপনিষদ্ ক্ষেত্রে বিচরণ করিব।

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি, যে ব্রহ্ম পদার্থ দুইটী ভাবে আমাদের নিকট প্রকটিত হন। একটীকে পাদ ও অপরটীকে মাত্রা বলে। পদ্যতে ইতি পাদঃ, ইহা কর্ম্মসাধন ভাবে নিষ্পন্ন। দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যায় আচার্য্য বলিয়াছেন, "পদং পদ্যতে সর্ব্বৈণেতি সর্ব্বপদার্থাস্পদত্বাৎ" অর্থাৎ সর্ব্ব পদার্থের আস্পদ বা আশ্রয় বলিয়া ভগবানকে পরম পদ বলা হয়। সুতরাং পাদ শব্দে সর্ব্বভাবের আধার বা সর্ব্বাত্মিকা (universality) ভাবকে উপলক্ষিত করা হয়। যাহা 'সর্ব্ব' ভাবকে ধারণ করিয়া রাখে, তাহাকে পাদ বলে। সেই জন্য অন্য সকল বর্ণের আধার স্বরূপ, সকল বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের আধার বলিয়া শূদ্রকে ব্রহ্মার পাদ হইতে উদ্ভূত বলা হয়। কারণ শূদ্রের সেবা-ধর্ম্ম অন্য সকল ধর্ম্মের মূল ; এবং ঐ সেবা-ধর্ম্মই মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব জীবের একমাত্র পথ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া

াধুনিক লেখকগণ সমাজের কি সর্ব্বনাশ সাধনই করিতেছেন। সে যাহা হউক সর্ব্ব'ভাবের প্রকাশকে 'পাদ' বলে, একথাটী আর একটু বুঝা যাউক। মনে করুন একজন দর্শন শাস্ত্র পাঠ করিয়াছেন ; ঐ শাস্ত্রের উপদেশগুলি যখন তিনি র্ব্বাবস্থায় প্রয়োগ ও প্রতিপন্ন করিতে পারেন, তখনই তাহার জ্ঞান প্রকৃত আধার বা পাদ শব্দ বাচ্য হয়। সুতরাং সর্ব্বস্থিকতা না আসিলে উহা সিদ্ধ হয় না। $(a+b)^n = a^n + a^{(n-1)}b + a^{n-1} b^2 + etc + b^n$ এই (series) পর্য্যায়ের nটীকে মাত্রা বলে। ঐ মাত্রা বা powerএর বশে a+b ব্যাকৃত হইয়া পর্য্যায় রূপ ধারণ করে। যেমন রামের মনুষ্য বুদ্ধি ;—রাম যতক্ষণ ঐ বুদ্ধির বশে থাকিবে, ততক্ষণ তাহার ভাব ক্রিয়া প্রভৃতির প্রকাশগুলি মানবজাতি সুলভ মৌলিক ভাবের দ্বারা রঞ্জিত হইবে। কিন্তু রাম সাধনা বলে যদি দেবত্ব মাত্রা প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহার চিন্তা ও ক্রিয়াগুলি দেবতারূপে প্রকাশ হইবে। আর একটী দৃষ্টান্ত লইয়া বিষয়টী বুঝিতে চেষ্টা করি। রামকে সম্মোহিত (hypnotised) করিয়া তাহার 'আমি জ্ঞানের মাত্রাটী সাহেবত্ব বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইল, অর্থাৎ তাহাকে বলা হইল 'তুমি রাম নহ একজন সাহেব।' ঐ জ্ঞানের মাত্রাটী যে মুহূর্ত্তে রাম স্বীকার করিয়া লইল, অমনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে যে আমি "টমাস ; আমার বাটী স্কটলণ্ডে" ও হ্যাটকোট পরা চলন চাহনি অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াগুলি ঐ সাহেব ভাবে রঞ্জিত হইয়া প্রকাশিত হইবে। পরক্ষণে রামকে বলা হইল "তুমি বাঙ্গালী স্ত্রীলোক"। রাম স্ত্রীত্ব মাত্রা স্বীকার করিবামাত্রই পরক্ষণে সে স্ত্রীলোকের মত ঘোমটা দেওয়া, কথা কহা ও হাব ভাব প্রভৃতির বিকাশ করিবে। বিকাশ সমষ্টিকে আমরা পাদ বলিতে পারি এবং 'অহং' জ্ঞানের উপর সাহেবত্ব বা স্ত্রীত্ব ভাবাদিকে মাত্রা বলিতে পারি। যাহা দ্বারা অহং-বুদ্ধি স্পষ্টীকৃত ও বিশেষ ভাবাপন্ন হয়, তাহাকে মাত্রা বলে। আমাদের শুদ্ধ 'আমি' জ্ঞানটী এত বড়, যে উহাতে অনায়াসেই দেবত্ব পিতৃত্ব মনুষ্যত্ব, পশুত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন মাত্রার প্রয়োগ করা যায়। এইরূপে ঐ শুদ্ধ আমি জন্মান্তরে বিভিন্ন নাম বা ব্যক্তিত্বের মাত্রা লইয়া খেলা করিয়া, তত্তৎ জাতীয় ক্রিয়াগুলি প্রকাশ করে। মাত্রা না থাকিলে ব্যবহার সিদ্ধ হয় না ; অর্থাৎ বিশেষ ভাবের ক্রিয়ার প্রকাশ ও আহরণ হয় না।

এক্ষণে পাদ শব্দটী আর একটু বুঝিতে হইবে। মাত্রার অনুরূপভাবে ক্রম বা পর্য্যায়রূপে যে প্রকাশ হয় তাহাই 'পাদ'। আমার খাইতে ইচ্ছা হইল, অমনি চর্ব্বণ, লেহন, গ্রাস উত্তোলন প্রভৃতি বাহিক ক্রিয়া ও শরীরের ভিতর উপযুক্ত

রসাদির সঞ্চার হইতে আরম্ভ হইল। এই ক্রিয়াগুলি অনুশীলন করিলে দেখা যায় যে, উহারা স্থির ও সর্ব্বাত্মিক ক্রম বা নিয়মের বশীভূত। শারীরিক এই পর্য্যায় বা ক্রম সেই সর্ব্বাত্মিক ভাবের সহিত না মিলিলে, ঐ প্রকার বিকাশকে চিকিৎসা শাস্ত্রে শারীরিক বিকার বা ব্যাধি বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হয়। এইরূপ মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিপর্য্যয় আছে; উহা যোগের দ্বারা চিকিৎসিত হয়। সর্ব্ব ভাবের উপর স্থাপিত না হইলে, বিকাশগুলি ব্যবহার যোগ্য হয় না। আজ অগ্নি যদি হঠাৎ শীতল হইয়া যায়, তাহা হইলে সেরূপ অগ্নির উপর নির্ভর করিয়া মানব কোন ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিতে পারে না। সেইজন্য ব্যবহারিক চক্ষে বস্তুর সত্তা বা প্রকৃত ভাব তাহার সর্ব্বাত্মিকা স্থির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। 'সর্ব্ব'ভাবের সাহায্যে বস্তুর প্রকৃত ভাব সিদ্ধ করে বলিয়া, প্রকাশ ভাবকে প্রকৃতি বলে। যাহা প্রকৃতিগত, তাহাই সত্য, সুসিদ্ধ ও ব্যবহার যোগ্য। সর্ব্বাত্মিকতাই প্রকৃতির ভাষা এবং উহাই পাদ শব্দে লক্ষিত হয়। 'আমি'তে খাইবার ইচ্ছারূপ মাত্রার আরোপ হইলে, উপাধির ভিতর দিয়া সেই ভাবের অভিব্যঞ্জনা ও পরিসমাপ্তিকে আমরা ভোজন মাত্রার পাদ বলিতে পারি। কারণ ঐ অভি-ব্যঞ্জনার দ্বারাই মাত্রার জ্ঞান প্রতিপন্ন ও সুসিদ্ধ হইতেছে। উপাধি "সর্ব্ব"ভাবে গঠিত; যেমন আমাদের স্থূল উপাধি। এই দেহের ভিতর "সর্ব্ব"ভাবের অনু পরমাণু আছে। আমার ভোজনেচ্ছা শক্তিটী এই "সর্ব্ব" ভাবাত্মক উপাধির মধ্য দিয়া প্রকটিত হয়। "সর্ব্ব" ভিন্ন উপাধি হয় না এবং "সর্ব্বের" ভিতর দিয়াই আমরা বীজরূপ মাত্রার অভিব্যক্তি দেখিতে ও বুঝিতে পারি। তারপর দেখা যায় যে, ঐ অভিব্যক্তির একটী বিশিষ্ট ক্রম আছে ও ঐ ক্রমের সাহায্যে ভাবটী সুসিদ্ধ হয়। ভোজন ক্রিয়ার মধ্যে প্রথমে চর্ব্বণ ও দন্তাদি হইতে নিঃসৃত রসাদি দ্বারা আহার্য্য বস্তুর পরিণাম সিদ্ধি প্রভৃতি একটী ক্রম। এই ক্রমের চ্যুতি ঘটিলে, ভাবের বিকাশ হয় না। সেই জন্যই স্বপ্নাবস্থায় ভোজনাদি করিলেও সেই ভোজন ব্যাপারে পর্য্যায়ের ক্রটী হয় বলিয়া উহাতে তৃপ্তি হয় না। তারপর আহার্য্য বস্তু জঠরাগ্নি দ্বারা পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া, বিশিষ্ট ক্রম বা শৃঙ্খলার মধ্য দিয়া পুনরায় শক্তিরূপে 'আমি'র সহিত মিশিয়া যায়। ভোজনেচ্ছারূপ শক্তির খেলা হইতে আরম্ভ হইয়া, এই খেলাটী ভোক্ত বস্তু 'আমি'র উপযোগী পরিণাম প্রাপ্তি পর্য্যন্ত থাকে। মূলে শক্তি ইচ্ছারূপে প্রকট হয়, শেষেও সমস্ত ব্যাপারটী শক্তিরূপে মিশিয়া যায়; এবং এই দুই অব্যক্ত ভাবের মধ্যে চর্ব্বণাদি ক্রিয়ার পর্য্যায় ও পরে রক্ত, মাংস, অস্থি, মেদ, মজ্জা প্রভৃতি বিশেষ হইতে

অবিশেষরূপের ক্রম দেখা যায়। এই ক্রমটী 'সর্ব্ব' জীবেই আছে এবং উহা 'সর্ব্ব' কালেই সুসিদ্ধ। এই জন্যই আমরা পাদকে সর্ব্বাত্মিকা ভাবের অভিব্যক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি।

'পাদ'রূপ অভিব্যক্তিটী কতকগুলি বিশেষের (steps) মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। উহার একটী স্তর (term) হইতে অন্য স্তরটী আপনা আপনি উদ্ভূত হয়; এবং পূর্ব্ব স্তরটী পরের স্তরে আসিয়া মিশিয়া যায় রক্তের সারভূত পদার্থগুলি মাংসে; মাংসের সার অংশ মজ্জায়; মজ্জার সার অংশ বীর্য্যে ঘনভাবে মিশিয়া থাকে। উহার মধ্যে একটীর ব্যতিক্রম ঘটিলে সম্পূর্ণ পরিণতি সিদ্ধ হয় না। এই সূক্ষ্মাভিমুখী ও সূক্ষ্ম হইতে স্থূলাভিমুখী ক্রমগুলি এক অবিচ্ছিন্ন স্রোতের ন্যায় থাকে। মাংস হইতে মেদ ভাবের প্রকাশ কোন্‌খানে প্রথম আরম্ভ হইল এবং কোথায় কি ভাবে শেষ হইল, ইহার নির্দ্ধারণ করা দুঃসাধ্য। স্থূল শরীরে ইহাই আচার্য্য কর্ত্তৃক উক্ত 'প্রবিলাপন ক্রিয়া'। পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব বা পদার্থগুলি পরবর্ত্তী ভাব বা পদার্থে অবিচ্ছিন্ন ভাবে মিশিয়া যায়। এইরূপে ভুক্ত অন্নের বহুত্ব ও নানাত্ব, রক্তের আপেক্ষিক সূক্ষ্ম একত্বের ও রক্তের ভিতর বহু অনু-পরমাণুরূপে প্রকাশ শক্তিটী মজ্জার একত্বে পরিণত হইয়া, সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ভাবে উপরে উঠিয়া যায়। অবশেষে বীর্য্য বা শক্তিতে ঘন হইয়া নিম্ন স্তরের বিভিন্ন ভাব, শক্তি ও ক্রিয়াশীলতাগুলি ঘন হইয়া অব্যক্তভাবে থাকে। ইহাই আচার্য্যের 'তুরীয়ের প্রতিপত্তি' বা সংসিদ্ধিরূপ ভাবটীর মূর্ত্তিমতী প্রতিকৃতি। সুতরাং পাদ শব্দে শুধু অভিব্যক্তি বুঝায় না। ঐ অভিব্যক্তি সর্ব্বাত্মিকা ভাবের (universal) হওয়া চাই। উহাতে ব্যক্ত 'সর্ব্ব' প্রকারের 'বহু'গুলি মিশিতে পারে, এমনটীও হওয়া চাই। 'বহু' ভাবগুলির সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর পরিণাম সকল 'সর্ব্ব'কালে ও 'সর্ব্বভাবে সিদ্ধ স্তর (steps) ও ক্রমের ভিতর দিয়া সুদৃঢ় শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকা চাই। তারপর ঐ শৃঙ্খলার গতিটী পুনরায় সেই মাত্রার বীজভূত শক্তির সহিত এক হইয়া যাওয়া চাই।

পাঠক দেখিলেন, কিরূপে শক্তি-মাত্রাটী বিশিষ্ট বস্তু প্রভৃতির মধ্য দিয়া পর্য্যায়রূপে অভিব্যক্ত হইয়া পুনরায় শক্তিরূপে স্থির হয়। অভিব্যক্তির ক্রমের দ্বারা আমরা সেই অব্যক্ত 'শক্তি মাত্রার' ইঙ্গিত পাই এবং ঐ ক্রমের ভিতর দিয়া শক্তি-মাত্রার অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয় বলিয়া, অভিব্যক্তির মৌলিক ভাবকে 'পাদ' বলে। ইহাই আচার্য্যের "পদ্যতে অনেন ইতি পাদ," অর্থাৎ যে ক্রম বা পর্য্যায়ের দ্বারা সেই অব্যক্ত বীজভূত ভাবটী প্রতিপন্ন ও সুসিদ্ধ হয়, ও যাহা দ্বারা সেই বীজ

ভাবটী 'সর্ব্ব' ভাবের মধ্য দিয়া প্রকটীকৃত হয়, সেই করণ-সাধন পাদ শব্দ।* এই ভাবে দেখিলে পাদ শব্দের গতি প্রবণতা বা পরিণাম বুদ্ধি থাকে; কিন্তু এই গতিটী সর্ব্বাত্মিকা।

বীজরূপ শক্তিমাত্রা হইতে অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া পুনরায় শক্তিভাব প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং এই সমস্ত খেলাটী দেখিলে, আর এক প্রকার বুদ্ধি জন্মাইতে পারে। প্রথমে যে বীজভাব ছিল পরেও তাহাই রহিল; মাঝে কেবল একটু অভিব্যক্তি ও খেলা হইল। সুতরাং এই অভিব্যক্তিটী সেই স্থির অপকট বীজ ভাবেরই ইঙ্গিত বলিয়া বুঝা যায়। চঞ্চল ও অস্থির ক্রিয়া ও ভাবাদির মধ্য দিয়া, প্রতিক্ষণেই সেই মূল অপরিণামী তুরীয় বীজ ভাবটী কি আশ্চর্য্য কৌশলেই স্বপ্রকাশিত হইতেছে। এ ভাবে দেখিলে পাদ' শব্দে আর গতি প্রভৃতি বুদ্ধি নাই। গতির ভিতর দিয়া 'অগতির', চঞ্চলের ভিতর দিয়া সেই স্থির পদার্থের সর্ব্বদা একভাবের অচঞ্চল প্রকাশকে 'পাদ' বলে। ইহাই আচার্য্যের "পদ্যতে ইতি পাদঃ ইতি কর্ম্মসাধন পাদ শব্দ।"

যাহা হউক মোটামুটী এইটুকু বুঝা গেল যে, শক্তিগত বীজরূপ ভাবকে 'মাত্রা' বলে। ঐ মাত্রা যেন আপনাকে আপনি জানিবার জন্য 'সর্ব্ব' ভাবের সাহায্যে প্রকটিত হয়। বীজভাবের—চৈতন্যগত ভাবের নাম মাত্রা; সর্ব্বাত্মিকা বুদ্ধির ভিতর দিয়া ঐ বীজের স্বরূপ অভিব্যক্তি বা স্বপ্রকাশের নাম 'পাদ'। দুইই এক; তবে একটী 'অহং' বা কেন্দ্রভাবে, অপরটী 'সর্ব্ব' বা প্রকাশভাবে অবস্থিত। দয়া বলিয়া যে দৈবী প্রবণতা সকলেরই ভিতর আছে উহা 'মাত্রা' শব্দবাচ্য। ঐ দয়াভাবটী অনন্ত বিশিষ্ট দয়ার কার্য্য বা প্রকাশের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইতেছে, শেষে সেই মৌলিক দয়া ভাবেই পুনরায় সুসিদ্ধ ও প্রতিষ্ঠিত হইতেছে। তবে প্রভেদ এই যে, জীব প্রথমে এই দয়া প্রবৃত্তিকে তাহার 'আমার' বলিয়া ভাবিত। পরে নিজ শরীরের ভিতর দিয়া দয়ার অভিব্যক্তি ও ভাষা যখন শিখিতে পারিল, তখন দেখিল যে সমস্ত 'স-কল' বিশ্ব ওতঃপ্রোতভাবে অনুস্যূত করিয়া কি এক মহান্ দয়ার স্রোত কোথায় কোন্ পর-তত্ত্ব অভিমুখে, কোন্ পরম পুরুষকে যেন ব্যঞ্জনা করিবার জন্য প্রধাবিত হইতেছে। তখন দয়া আর জীবধর্ম্ম থাকে না; তখন মানব বুঝিতে পারে যে উহা সেই পরম পুরুষের 'পাদ' মাত্র। এইরূপে জীব 'মাত্রা' হইতে যখন পাদে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখনই ক্ষুদ্র জীবভাব পড়িয়া গিয়া পরম তুরীয়ের প্রতিপত্তি সিদ্ধ হয়। (ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলব্ধ-বেদান্ত।

ধর্ম্ম]

"চন্দ্রশেখরে"।

কত কোটী জনমের মহাপুণ্য ফলে,
তোমারি চরণ তলে মিলিয়াছি আজ।
নাহি জানি কোন্ মহা সাধনার বলে,
পেয়েছি পরশ তব ওগো তীর্থ রাজ!
তোমারে কল্পিত মূর্ত্তি কহুক যে কহে,
মোর কাছে নহ তুমি প্রস্তর পুতুল।
ও দুটী চরণ-নিম্নে জানি আমি, বহে—
স্বর্গের অলকানন্দা মহিম রাতুল।
সমস্ত জীবন-ভরা যত পাপ গ্লানি,
নিমেষে টুটিয়া যায় পুণ্য স্পর্শে তব।
জাগরণ সুরে গাঁথা তব মহাবাণী
সুপ্ত-চিত্তে বহি আনে কি চেতনা নব।
চিত্তভরি জাগি উঠে কি মহা স্পন্দন,
তোমারি মঙ্গলময় নাম উচ্চারণে।

আজন্ম-সঞ্চিত চির ভকতি-চন্দন,
লেপি' দিতে চায় সবে তোমার চরণে।
দীন হোক, ধনা হোক, হোক লক্ষপতি,
হোক বা বাসনাহীন সন্ন্যাসী নিষ্কাম।
সকলি তোমার কাছে স্নেহের সন্ততি,
বিতরিছ জনে জনে স্নেহ অবিরাম।
তোমার করুণা-ভাণ্ড চির অফুরাণ,
যে আসে তোমার কাছে করুণা-ভিখারি
অকুণ্ঠিত চিত্তে তুমি কর তারে দান,
তোমার ও স্নেহময় করুণার বারি।
আমিও সে আশা ভরে আসিয়াছি আজ,
তোমার চরণ-প্রান্তে হে মঙ্গলময়!
তব স্নেহ-বিন্দুদানে, ওগো বিশ্বরাজ,
এ হৃদি করিয়া নিও শান্তির নিলয়।

শ্রীহরিকৃপা চৌধুরী।

কাম]

ভিক্ষা।

খুঁজিলাম কতবার, আমার হৃদয়-দ্বার,
আমার বলিয়া কিছু নাহি পেনু দেখিতে।
নিবিড় তমসাময়, হেরিলাম সমুদয়,
"আমাকে" রেখেছ ঢাকি ভীষণ আঁধারেতে॥
মায়াতে পড়িয়া হায়, সকলি ভুলেছি তায়,
"আমি" বা 'আমাকে' আজি পারিনা যে জানিতে।
আমার আমার করি, দিবানিশি কেঁদে মরি,
(কিন্তু) কে আমার কোথা 'আমি' নাহি পারি বুঝিতে
ওহে সর্ব্বশক্তিমান্! ঘুচাও অহং জ্ঞান,
সংসার-সাগরে আর পারিনা যে ভাসিতে।

লহ তুলে স্রোত হ'তে, ধর প্রভু ধর হাতে,
মহিমা দেখাও সে দয়াময় নামেতে ॥
সংসারের প্রহেলিকা, ঘোর কুজ্ঝটিকা ঢাকা,
ওহে প্রভু না চাহি গো, তাহা আমি জানিতে।
ভীষণ সংসার জ্বালা, করিয়াছে ঝালাপালা,
এসেছি জুড়াতে তাই তব পদ ছায়াতে ॥
শরণ লয়েছি তাই, দয়াময় তব ঠাঁই,
তারহ দাসীরে প্রভু ও পদ-তরণীতে।
দাও প্রেম, দাও ভক্তি, না চাহি আমি গো মুক্তি,
প্রেম-অশ্রু বহে যেন তব নাম গাহিতে ॥
গাহিয়া তোমারি নাম, অন্তে যেন যায় প্রাণ,
নাহি সাধ আর কিছু ভব মরু-মাঝেতে।
আমার যা' ছিল হরি, লয়েছ তাঁহারে হরি,
লহ মম প্রাণ হরি, পারি না যে কাঁদিতে ॥
যদি নাহি প্রাণ লও, দাও প্রেম, ভক্তি দাও,
দিবানিশি তোমারে গো পারি যেন ভাবিতে।
শ্রীচরণ দিও মোরে অভাগী ডাকে কাতরে,
ভক্তিভরে নমি দেব তোমার চরণেতে ॥

শ্রীমতী মানময়ী দেবী।

কাম] সংসার।

বাসনা-তরঙ্গময় সংসার-নীলাম্বুধির কূলে দাঁড়াইয়া—জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া, মায়া-মুগ্ধ জীব ভাবিতেছ কি? জলবুদ্‌বুদ্‌ সদৃশ ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া তুমি 'সংসার—সংসার' করিয়া পাগল কেন? তুমি অনিত্য দুঃখময় সংসারে—অলীক ইন্দ্রিয় সুখ-সাগর স্রোতে গা ভাসাইয়া, 'আমার আমার' করিয়া ছুটাছুটী করিতেছ কেন? তুমি সংসারের অনিত্যতা দেখিয়াও কি দেখিতেছ না? কেবল বিষয়-বাসনারূপ লতাকে সাদরে হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছ? তোমার এত সাধের সাজান সংসার, তোমার পুষ্করিণী-পরি-শোভিত সুরম্য সৌধমালা, তোমার রূপ-যৌবন-বিলাস-বিভব কোন্ দিন কালের

কুটিলাঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া কোথায় মিশিয়া যাইবে, কে তাহার নির্ণয় করিবে? সংসার স্বপ্নবৎ অলীক,—ধন, জন, যৌবন নিতান্ত অস্থায়ী; তবে কেন এ অনিত্য সংসারে মিথ্যা মায়ায় মোহিত হইয়া, অনিষ্টে ইষ্ট জ্ঞান করিয়া, জীব নিজ হিত চেষ্টা করিতে ভুলিয়া যায়।

"সম্পদঃ স্বপ্নসঙ্কাশাঃ যৌবনং কুসুমোপমং।
তড়িচ্চঞ্চলমায়ুশ্চ কস্য সম্পাদতোধৃতি॥"

মনুষ্যের ধন ও পুত্রাদির জন্য সম্পদ সুখ-স্বপ্নের ন্যায় অস্থায়ী, যৌবনাবস্থা কুসুমের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী, আয়ুও সৌদামিনীর ন্যায় চঞ্চল। অতএব কি নিমিত্ত অহিতকর সংসারে জীব নিজ হিত চেষ্টা করে না?

সংসার যখন এত অনিত্য, এত চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী, তখন জীব 'সংসার—সংসার' করিয়া এত ব্যস্ত কেন? সংসারটা কি আমরা ভাবিয়া দেখি না, দেখিবার অবসর পাই না বা দেখিতে ভালবাসি না। আমরা অনুক্ষণ সংসারের কাজেই ব্যস্ত; সংসারের কাজ একদিন না হইলে দিনটি বৃথা নষ্ট হইল মনে করি। যেন সংসারের উন্নতিই আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য। সংসারের অতিরিক্ত আর কিছু আছে তাহা ভাবিতে ভুলিয়া যাই। আমরা আমাদের সমস্ত শক্তি সংসারের কার্য্যেই নিয়োগ করিয়া আসিতেছি; সংসারকে ইষ্টদেব জ্ঞানে পূজা করিয়া আসিতেছি। কিন্তু হায়! সংসারটা কি, তাহা একদিনও ভাবিয়া দেখিয়াছি কি? সংসারটা কি? একজন রহস্য-নিপুণ পণ্ডিত বলিয়াছিলেন "সং হইয়াছে,—যাহার সার তাহাই তাহাই সংসার।" কথাটা ঠিক বটে। এ সংসার নাট্য-রঙ্গমাঝে সং সাজা ছাড়া আর কিছুই নয়। হে জ্ঞানাভিমানী শিক্ষিত যুবক! তুমি যতই বড় হওনা কেন, তোমাতে আমাতে প্রভেদ খুব কম; ছোট আর বড়—এপিঠ আর ওপিঠ। তরুতলশায়ী ছিন্ন-চির পরিধায়ী বুভুক্ষু ভিক্ষুক, আর রত্ন সিংহাসনোপবিষ্ট দাসদাসী পরিবেষ্টিত রাজরাজেশ্বর, এতদুভয়ের পার্থক্য বড় বেশী নয়—কেবল সাজ পরিবর্ত্তন। সংসারী জীব রাজাই হউন, কিম্বা প্রজাই হউন, তুল্য অংশে দুঃখী। যখন কাঁদিতে কাঁদিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছে, সারাজীবন কাঁদিয়া কাটিয়া শেষে কাঁদিতে কাঁদিতেই জীবনের সব খেলা ফুরাইয়া যাইবে, তখন প্রভেদ কোথায়? এ দু'দিনের ধূলা-খেলায় বস্তুতঃ কোন প্রভেদ নাই; তবু ভ্রান্ত জীব একটুও ছোট হইতে চাহে না। আপনার অহমিকাকে একটুও কমাইতে পারে না; সংসারকে চিরস্থায়ী,—আপনাকে অজর অমর মনে করিয়া, দিন দিন শত শত নূতন দুঃখের সৃষ্টি করে।

কর্ম্ম-কোলাহলময় জগতের দিকে একবার দৃষ্টিপাত কর, অবিরত স্বার্থ-সংঘর্ষণের ফলে প্রতিদিন সংসারে কত অনর্থেরই সৃষ্টি না হইতেছে। আমাদের এ দৈনন্দিন স্বার্থ-সংঘর্ষণ কেবল সংসারের উন্নতির জন্য। সংসারের অর্থ কি? সংসার (সম+সৃ+ঘঞ্+ঞ্জে)=মিথ্যাজ্ঞান জন্য বাসনা। মিথ্যাজ্ঞান, জ্ঞান নয়,—অজ্ঞান। অজ্ঞানতার ফল নানাবিধ ভোগবাসনা,—ইহাই সংসার। এই সংসার নিত্য দুঃখময়। এখানে সুখের বস্তু থাকিতে পারে না; কেন না, যাহার উৎপত্তি মিথ্যাজ্ঞান হইতে, সেখানে সুখ থাকিবে কি প্রকারে? সুখ—জ্ঞানে; দুঃখ—মোহে বা অজ্ঞানে। সংসার দুঃখময়, সুতরাং ক্লেশের নিলয়। ক্লেশ পাঁচ প্রকার—"অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ।" (যোগসূত্র ২।৩।) "অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ ইহারাই পঞ্চ ক্লেশ।" এই পঞ্চ ক্লেশ পঞ্চ বন্ধনরূপে আমাদিগকে এই সংসারে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অবশ্য অবিদ্যাই ঐ অবশিষ্টগুলির জননী-স্বরূপা। এই অবিদ্যাই একমাত্র দুঃখের কারণ। আর কাহার শক্তি আছে যে, আমাদিগকে—নিত্যমুক্ত আনন্দস্বরূপ আত্মাকে দুঃখ ডোরে বাঁধিয়া রাখিতে পারে?

সংসার যে দুঃখময় তাহা আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। তত্রাচ এখানে সর্ব্বদা দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। একদল সুখবাদী (optimist); আর একদল দুঃখবাদী (pessimist)। যাঁহারা কেবল সুখের দিকটাই দেখেন, আনন্দে যাহাদের হৃদয় ভরপুর, যাঁহারা কখনও দুঃখের কর্কশ কশাঘাত সহ্য করেন নাই, তাঁহারা দুঃখকে লইয়া অত ব্যতিব্যস্ত হন না; আর যাঁহারা দুঃখকেই বড় বেশী করিয়া দেখেন, শোক দুঃখের কুলিশ কঠোর আঘাতে যাঁহাদের হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, যাঁহারা নৈরাশ্য সাগরে ডুবিয়াছেন, তাঁহাদের প্রাণ বৈরাগ্যের ভাবে উদাস হইয়া পড়ে। তাঁহারা অহরহঃ সংসারের চতুর্দ্দিকেই দুঃখের করুণ-কাহিনীর ক্ষীণ ক্লান্ত স্বর শুনিতে পান। বাল্যকাল হইতে যৌবনকাল পর্য্যন্ত প্রায় সকল ব্যক্তিই সুখাশাবাদী; তাঁহারা কেবল সুখের স্বপ্নই দর্শন করেন। মৃত্যু, দুঃখ বা বিষাদ বলিয়া যে কিছু আছে, ইহা তাঁহাদের পক্ষে বিশ্বাস করা কঠিন। বৃদ্ধাবস্থা আসিল,—জীবন একটী ধ্বংস রাশি হইয়াছে, সুখস্বপ্ন আকাশে বিলীন হইয়াছে, বৃদ্ধ দুঃখবাদ অবলম্বন করিয়াছে। এইরূপে সকলেই একদিন না একদিন সংসারকে দুঃখময় দেখিয়া দুঃখবাদ অবলম্বন করিবেন।

হিন্দু দার্শনিকগণ সংসারে দুঃখের কঠোরতা সম্যক্ উপলব্ধি করিয়া জগতে

দুঃখবাদের সৃষ্টি করিয়াছেন। ভারতীয় দর্শনসমূহে চিরদিনই দুঃখবাদের প্রাবল্য দেখিতে পাওয়া যায়। সমস্ত দর্শনগুলি দুঃখবাদেই আরম্ভ এবং সেই দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাভের উপায় নির্দ্ধারণই দর্শনশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। শুধু তাৎকালিক কোন দুঃখ নিবৃত্তি নহে, আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিই ইহার প্রধান লক্ষ্য। সংসারে দুঃখের প্রাবল্য দেখিয়া কবিও গাহিয়াছেন ;—

"এ সংসার দুঃখের আগার।
বিদ্যুতের আভা প্রায়, কভু সুখ দেখা যায়,
গাঢ়তর পুনরায়—হয় অন্ধকার।
যথা মেঘাচ্ছন্ন নিশাকালে, সৌদামিনী হাসিয়া লুকালে,
পথহারা পথিকের ঘটে অনিবার।"

বাস্তবিকই তাহাই। সত্যই এ সংসার দুঃখের আগার। এখানে সুখের লেশ মাত্র নাই। যেখানে দুঃখের উপর দুঃখ, আঘাতের উপর আঘাত, রোগ শোক বিয়োগ-যন্ত্রণা যেখানে শত ফণা তুলিয়া মানব জীবনকে দংশনে দংশনে ক্ষত বিক্ষত করে, সেখানে সুখের আশা বিড়ম্বনা মাত্র। এখানে সুখ চেষ্টায় সুখ পাওয়া যায় না, বরং তৎপরিবর্ত্তে অনন্ত দুঃখই দেখিতে পাওয়া যায়। সুখের আশা করিলে, এখানে দুঃখের ফাঁস পরিতে হয়। দুঃখময় সংসার-মরু মাঝে যে সুখের মরীচিকা দেখিয়া ভ্রান্ত হয়, তাহাকে পাগল বই আর কি বলিব! ঠাকুর শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ দেব বলিতেন,—"সংসার কেমন? যেমন আমড়া—শস্তের সঙ্গে খোঁজ নেই কেবল আঁটি আর চামড়া ;—খেলে হয় অম্লশূল।" আবার কেহ কেহ বলেন যে, সুখ ও দুঃখ লইয়াই সংসার। সুখ এবং দুঃখ উভয়েই জীবনের নিত্য সহচর। সুখ—দুঃখ ভিন্ন এবং দুঃখ—সুখ ভিন্ন থাকিতে পারে না। সুখ ও দুঃখ একটী মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ ; সুতরাং সুখের ভাগটা লইতে হইলে দুঃখের ভাগটা এড়াইবে কি প্রকারে? সংসারে সুখ আদৌ না থাকিলে, দুঃখ আদৌ থাকিত না। একজন থাকিলেই আর একজন থাকিবে, সম্মুখ থাকিলেই পশ্চাৎ থাকিবে, এপিঠ থাকিলেই ওপিঠ থাকিবে, তেমনি সুখ থাকিলেই দুঃখও থাকিবে।

জগতে সুখ আদৌ নাই তাহা নহে। তবে সুখ কদাচিৎ কাহারও ভাগ্যে মিলে। সে সুখ আবার অল্প ও দুঃখ সংভিন্ন। কাহারো আবার স্থায়ী হয় না। অতএব সে সুখ—দুঃখ পক্ষেই ধর্ত্তব্য। তাই সূত্রকার বলিয়াছেন,—

"কুত্রাপি কোঽপি সুখীতি তদপি দুঃখশবলম্।
ইতি দুঃখপক্ষে নিক্ষিপন্তে বিবেচকাঃ॥" সাংখ্যসূত্র, ৬।৭-৮।

সংসারে সুখ দুঃখ উভয়ই আছে, কিন্তু সুখের ছায়া অপেক্ষা দুঃখের তাপই অধিক। দুঃখের যেরূপ তীব্রতা আছে সুখের সেরূপ নাই। সুখ যত স্থায়ী হয়—তত কমে; দুঃখ যত থাকে—তত বাড়ে। সময়ে সময়ে অতিরিক্ত সুখই দুঃখ হইয়া দাঁড়ায়; কিন্তু দুঃখকে কখন সুখ হইতে দেখা যায় না। সংসারে স্নেহ, দয়া, মমতা, ধন, মান, প্রণয় সুখের আশা দেয় বটে, কিন্তু পরিশেষেই দুঃখ আনে। স্নেহ, মমতা, দয়া—যাহা না থাকিলে মানবে আর পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না, তাহাও অনন্ত দুঃখের মূল। সংসারে যাহা কিছু ভাল, তাহাই যখন এত মন্দ—তখন সংসারে সুখ কোথায়? সংসার যখন এত দুঃখময়, এত অনিত্য এবং তাপ, কষ্ট, শোক ও দুঃখের উপাদান, তখন ইহাকে স্থায়ী, ধ্রুব ও পরমানন্দের নিদান মনে করি কেন? যাহা কখন আমার নয়, যাহার প্রতি আমার কিছুই অধিকার নাই, তাহাকে 'আমার আমার' বলিয়া তাহার অভাবে এত অস্থির হইয়া পড়ি কেন? এ দেহ কি আমার? যদি আমার হইত তাহা হইলে কি আমি ইহাকে জরা ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম না? পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র, ভ্রাতা ইহারাও কি আমার? যদি আমার হইত, তাহা হইলে আমি কি তাঁহাদের কষ্ট ও দুঃখের কিছুই প্রতিকার করিতে পারিতাম না? সতী-সাধ্বী পতিপরায়ণা স্ত্রী—পুষ্পপেলব সুকুমার শিশু—প্রাণাধিক প্রিয়দর্শন আজ্ঞাবহ অনুজ, যাহাদের মধুময়ী স্মৃতি—যাহাদের মৃত্যুকালীন ক্ষীণকণ্ঠের অব্যক্ত অস্ফুট কাতর ধ্বনি,—অশ্রুভারাবনত ম্লান মুখের কাতর চাহনি, আমার ভগ্ন হৃদয়ের প্রতি তন্ত্রীতে প্রতিমুহূর্ত্তে শত শত বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা দিতেছে—যাহাদের অভাবে আমার সোণার সংসার শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, তাহাদিগকে কি মৃত্যুর নির্ম্মম নিষ্ঠুর হস্ত হইতে রক্ষা করিতে পারিতাম না? আমার ত' কিছুই নয়, পিতাও আমার নয়, আমার মাতাও আমার নয়, আমার স্ত্রী, পুত্র কিম্বা ভ্রাতাও আমার নয়, এমন কি 'আমিই' আমার নই; অথচ ক্রমাগত দিবারাত্রি 'আমার, আমার' করিয়া মরি। ভগবান শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন;—

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্র।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াত স্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥"

"কে তোমার স্ত্রী, পুত্রই বা কে? এই সংসার অতীব বিচিত্র। তুমি

কার এবং কোথা হইতেই বা আসিলে? হে ভ্রাতঃ এই তত্ত্ব চিন্তা কর।" এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে আমরা আপনাদের প্রকৃত স্বরূপ বুঝিতে পারিলে, আর মিথ্যা মায়ায় মোহিত হইয়া দিবারাত্রি 'আমার,—আমার' করিয়া ছুটাছুটি করিব না; সংসারের সকল তত্ত্ব তখন ধীরে ধীরে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিব। আমরা আর তখন আকাঙ্খার তীব্র তাড়নে পরের অনিষ্ট করিয়া নিজের উদর পূর্ণ করিবার জন্য অর্থের পশ্চাৎ অহর্নিশ অশ্রান্ত ভাবে ধাবিত হইব না; তখন ধীরে ধীরে আমাদের মোহ অপনীত হইবে। স্বার্থান্ধ মানব আমরা, অর্থের জন্য না করিতে পারি এমন কাজ নাই। সংসারে অর্থলোভ মানবের আত্মোন্নতির একটি প্রধান অন্তরায়। অর্থলোভ মানবকে এ পর্য্যন্ত সত্য হইতে যত বঞ্চিত করিয়াছে, এত বোধ হয় আর কিছুতেই নহে। অর্থ অত্যধিক উপার্জ্জন হইলেই বা লাভ কি? বিত্ত দ্বারা কখন মানবের তৃপ্তি হয় না। "ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যো'। (কঠ ১।১।২৭)। অর্থই সকল অনর্থের মূল। "অর্থমনর্থং ভাবয়নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশসত্যম্।" অর্থকেই নিত্য অনর্থ স্বরূপ চিন্তা কর, সত্যই ইহাতে সুখের লেশ মাত্র নাই।

আমরা দিবারাত্রি অর্থের জন্য ছুটাছুটী করি কেন? সংসারে প্রকৃত অভাব আমাদের অতি অল্প। আমাদের কল্পিত অভাবই সর্ব্বনাশের মূল। আর যে অভাবের জন্য আমরা এত অস্থির হইয়া পড়ি, সে গুলিই বা আমরা ভোগ করিব কতদিন?

'Man wants but little here below
Nor wants that little long.'

এই মর্ত্ত্যভূমিতে মানুষের অভাব অতি কম, এবং সেই অভাবও অধিক দিনের জন্য নহে। অর্থের জন্য প্রার্থনা করিও না। যদি প্রার্থনা করিতে হয়, ত' সন্তোষরূপ অর্থের প্রার্থনা কর। এই অর্থ একবার উপার্জ্জন করিতে পারিলে, সারাজীবন রাজরাজেশ্বর অপেক্ষা সুখী হওয়া যায়। এই অর্থ দস্যু তস্কর কর্ত্তৃক লুণ্ঠিত হইবার ভয় থাকে না, কিম্বা ঈর্ষায় কখন পরিম্লান হয় না। সারাজীবন নির্ব্বিবাদে পরম সুখে কালাতিপাত করা যায়।

"সন্তোষামৃত তৃপ্তানাং যৎ সুখং শান্তচেতসাম্।
কুতস্তদ্ধনলুব্ধানামিতশ্চেতশ্চ ধাবতাম্॥ (হিতোপদেশ।)

সন্তোষামৃত তৃপ্ত শান্ত-চিত্ত ব্যক্তিদিগের যে সুখ, ধনলুব্ধ ও ইহা চাই, উহা চাই বলিয়া যাহারা ইতস্ততঃ ধাবিত, তাহাদিগের সে সুখ কোথায়?

সংসারে যখন সুখ নাই, সংসার যখন বন্ধনের স্থান ও ক্লেশের নিলয়, তখন এ সংসারে আর কাজ কি? যাহা 'আমার' নয়, তাহাকে 'আমার' বলিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া লাভ কি? লাভ ত' শুধু ব্যথা, বেদনা, হা-হুতাশ আর অশ্রু। তবে কি এ সংসার ছাড়িয়া যাইব? সংসার ছাড়িলে কি জন্ম-মৃত্যুর আবর্ত্তন চক্র হইতে উদ্ধার পাওয়া যাইবে? না, তাহা নহে; শুধু সংসার ছাড়িয়া বনে যাইলে কোন ফলোদয় হইবে না। বনে যাইলে সংসারের শত্রু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি ত' সঙ্গে যাইবে? ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে, নচেৎ 'ভেক' ধরিয়া কাজ কি? সংসার ত্যাগ করা অর্থে সংসারের আসক্তি ত্যাগ করা। সংসারের আসক্তি ত্যাগ করিয়া কাজ কর, সব বজায় রহিবে,—সংসার ছাড়িবে কেন? এ সংসার কি ভগবানের রাজ্য নয়? ইহা কি সয়তানের রাজ্য? ভগবান যখন পিতামাতা দিয়াছেন, গৃহ পরিবার দিয়াছেন, তখন তাঁহার চরণে প্রাণ সমর্পণ করিয়া সংসারের যাবতীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। সংসারের সমস্ত কার্য্যই তাঁহার করিতেছি বলিয়া করিলে, পাপ স্পর্শ করিতে পারে না, বুদ্ধি বিচলিত হয় না, প্রাণও সর্ব্বদা অমৃতপূর্ণ থাকে। যতই কেন সংসারের কাজ কর না, প্রাণের টান সর্ব্বদাই তাঁহার দিকে থাকা চাই। ভগবান শ্রীশ্রী৺রামকৃষ্ণ দেব বলিতেন,—"নষ্ট স্ত্রীলোক যেমন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে থেকে সংসারের সব কাজ করে, কিন্তু তার মন পড়ে থাকে উপপতির উপর, সে কাজ কর্‌তে কর্‌তে যেমন সর্ব্বদা ভাবে যে কখন তার সঙ্গে দেখা হবে; তোমারও মন সংসারের কাজ কর্‌তে কর্‌তে সর্ব্বদা যেন ভগবানের দিকে পড়ে থাকে।"

আমরা যখন সংসারে প্রেরিত হইয়াছি, তখন অবশ্য সংসারের কার্য্য করিব। তবে বশিষ্ঠ যে ভাবে রামচন্দ্রকে সংসারে বিচরণ করিতে বলিয়াছেন, সেই ভাবে বিচরণ করিতে হইবে।

"অন্তঃ সংত্যক্তসর্ব্বাশো বীতরাগো বিবাসনঃ।
বহিঃ সর্ব্বসমাচারো লোকে বিহর রাঘব॥"

'হে রাঘব! অন্তরের সকল আশা, আসক্তি ও বাসনা পরিত্যাগ করিয়া, বাহিরে সংসারের সমস্ত কার্য্য করিতে থাক।'

"বহিঃ কৃত্রিমসংরম্ভো হৃদি সংরম্ভবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তর্লোকে বিহর রাঘব॥"

'হে রাঘব! অন্তরে আবেগ-বর্জ্জিত হইয়া অথচ বাহিরে কৃত্রিম আবেগ দেখাইয়া, ভিতরে অকর্ত্তা থাকিয়া বাহিরে কর্ত্তা হইয়া সংসারে বিচরণ কর।'

"ত্যক্ত্বাহংকৃতিরাশ্বস্তমতিরাকাশ শোভনঃ।
অগৃহীতকলঙ্কাঙ্কো লোকে বিহর রাঘব॥"

"হে রাঘব! 'আমি করিতেছি' এই অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, কার্য্যের ফলাফল সম্বন্ধে উদাসীন হইয়া, প্রশান্ত চিত্তে আকাশ যেমন সর্ব্বত্রই শোভা পাইতেছে অথচ কোনরূপ কলঙ্কে কলঙ্কিত হইতেছে না, তুমি সেইরূপ সংসারের সমস্ত কার্য্যে ব্যাপৃত অথচ নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া সংসারে বিচরণ কর।' মনে রাখিতে হইবে যে সকল কার্য্যই তাঁহার। আমাদিগকে একধারে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে হইবে যে, আমরা আমাদের প্রভুর আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। আর আমাদের প্রত্যেক কার্য্য-প্রবৃত্তিই প্রতি মুহূর্ত্তে তাঁহা হইতেই আসিতেছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতাতে অর্জ্জুনকে উপদেশের সময় বলিয়াছেন,—

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥"

'যাহা কিছু কর,—যাহা কিছু ভোজন কর,—যাহা কিছু হোম কর,—যাহা কিছু তপস্যা কর, সমুদয়ই আমাতে অর্পণ করিয়া অর্থাৎ ভগবানে সমর্পণ করিয়া শান্ত ভাবে অবস্থান কর।' সংসারী ব্যক্তি সংসারের সকল কার্য্যই করিবেন, কিন্তু তাঁহার চরম লক্ষ্য যেন শ্রীভগবানের দিকে থাকে।

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃস্যাৎ ব্রহ্মজ্ঞান পরায়ণঃ।
যদযৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়॥ মহা-নিঃ তন্ত্র,৮—২৩।

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন, ব্রহ্মজ্ঞান লাভই যেন তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য হয়। তথাপি তাঁহাকে সর্ব্বদা কর্ম্ম করিতে হইবে, তাঁহার নিজের সমুদয় কর্ত্তব্য সাধন করিতে হইবে। তিনি যাহা করিবেন, তাহাই ব্রহ্মে সমর্পণ করিতে হইবে।

সংসারী হও, সংসারের কাজ কর, কিন্তু সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য কি? উদ্দেশ্য—আত্মার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করা ও মুক্ত হওয়া। সর্ব্বদাই স্মরণ থাকা চাই যে, অগণিত জন্ম মৃত্যুর আবর্ত্তন চক্র হইতে উদ্ধার লাভ করার জন্যই আমাদের এ মানব দেহ ধারণ এবং সংসার পরিভ্রমণ। এ সংসার কর্ম্ম-ভূমি; এখানে কেবল কর্ম্ম করিতে হইবে। এখানে খুবই সাবধানে কাজ করিতে হইবে। আমাদের এ জীবনের কার্য্য দ্বারা আগামী

জন্মের সুখ দুঃখ নিয়মিত হইবে। ধনী, নির্ধন, বিদ্বান, মূর্খ, স্ত্রী, পুরুষ নির্ব্বিশেষে আমাদের জীবনের একই লক্ষ্য। পূর্ণতা লাভ করিয়া আত্মার মুক্তি; আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তি ও অন্যান্য শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট পন্থা অবলম্বন করিয়া, আপনার ব্রহ্ম-ভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও,—ইহাই প্রকৃত সংসারীর কার্য্য।

"যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ।
তং হি দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥"

"যিনি আদিতে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া পরে তাঁহাকে বেদ প্রদান করিয়াছিলেন; মোক্ষ লাভেচ্ছায় আমি সেই দেবের শরণ লইলাম। যাঁহার প্রকাশে বুদ্ধিকে আত্মাভিমুখী করিয়া দেয়।" (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ষষ্ঠ অধ্যায় ১৮ শ্লোক।)

শ্রীহৃদয়নাথ মিশ্র।

অর্ঘ]

সন্ধ্যাতারা

তুমি জাগো প্রতিদিন, সায়াহ্নের কালে—
অস্তমিত রবি যথা ধরণীর ভালে,—
সিন্দুর রক্তিম রাগে রাঙাইয়া দিক্;
তা'রই পরে শোভ তুমি দেখি॥
আমিও সে প্রতিদিন,—প্রতিদিন সাঁঝে—
দেখি সে মোহন আঁখি, আমাতেই রাজে।
বরষ চলিয়া গেল বরষের পর,—
তবু তুমি আছ ওগো সেথা অনন্তর॥
আমি দেখি তোমা পানে, তুমি দেখ মোরে
কি কথা কওলো সখি, ও সুধা অধরে॥
জানিনা তোমার ভাষা, তুমি স্বরগের।
জানি শুধু আছে প্রাণে কি গান দুঃখের॥
তা'ই চেয়ে থাক সখী আকুল নয়নে।
ফুটে ওঠে ব্যথা তব ক্ষুদ্র ওই প্রাণে॥
কে তব প্রণয়ী সই, কে বা প্রিয়তম?
ধন্য সে তোমার প্রেমে ক্ষুদ্র অনুপম॥

মৃত্যুপথ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

নব কলেবর।

মৃত্যুকে সাদরে গ্রহণ করা সকলেরই উচিত; কেননা উহার ন্যায় সুহৃদ, পরম দয়াবান ও মহাদাতা আর কেহই নাই।

(১) সুহৃদ্—মৃত্যু আত্মার জ্ঞানোন্নতির জন্য স্থূল শরীর হইতে লিঙ্গ শরীরকে পৃথক করে; এইজন্য ইহা পরম উপকারী—মিত্র। যখন এই স্থূল শরীরের জ্ঞানেন্দ্রিয়-পঞ্চের শক্তি হ্রাস হয়, অর্থাৎ চক্ষু দেখেনা, কাণ শুনেনা, হস্ত ধরেনা, পদ চলেনা; বল ত' দেখি তখন পার্থিব জগতে এমন কোন উপায় আছে কি, অথবা এমন কেহ সুহৃদ আছে কি, যিনি সেই শক্তি পূরণ করিতে পারেন, বা নব শক্তি দানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উন্নতি সাধন করিতে পারেন? যদি কেহ পারেন, তবে তিনি সেই পুরাণ বন্ধু—মৃত্যু। আজীবন শোক, তাপ, দুঃখ, ভোগ-ক্লিষ্ট যে দুর্ভাগা, যাহার দিকে জগতে কেহই ফিরিয়া তাকায় না, যে মৃত্যুকে সাদরে আহ্বান করিতেছে, 'আমায় নে' বলিয়া কাঁদিতেছে, বল ত' দেখি সেই হতভাগ্যকে সাদরে কে ক্রোড়ে গ্রহণ করে? যিনি করেন, তিনিই সে দীনের সখা—দুঃখীর দুঃখ ভঞ্জন কর্ত্তা—তাপীর তাপহারক,—শোকির শোক নাশক পরম সুহৃদ্ 'মৃত্যু'। ইনি ছাড়া জ্ঞানোন্নতি সাধনের জন্য, নব কলেবর—নব ইন্দ্রিয়ের সংযোজনা আর কেহই করিতে পারেনা; তা'ই ইনি মহা সুহৃদ। এমন সুহৃদের আগমনে সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত; অর্থাৎ এমন মহোপকারী মিত্রকে সানন্দে গ্রহণ করাই উচিত।

(২) পরম দয়াল,—বার্দ্ধক্যে জীব সকল রকমেই কষ্ট পায়। স্থূল শরীর তখন ভোগ ও কার্য্য করিতে অক্ষম হয়, পরন্তু উঠিতে, বসিতে, খাইতে, শুইতে সকল রকমেই পরমুখাপেক্ষী। বল ত' দেখি জগতে এমন কোন্ দয়াবান আছেন, যিনি সেই কষ্ট দুর করিতে পারেন? যদি কেহ পারেন, আর যদি কেহ করেন, তবে তিনিই সে পরম দয়াবান —'মৃত্যু'। যিনি সেই ভোগে অক্ষম, বার্দ্ধক্য-ক্লিষ্ট জীবকে নব কলেবর দানে—নব উদ্যম দানে—নব ভোগ-ক্ষেত্রে, নব ভোগে নিযুক্ত করেন; তিনিই সেই একমাত্র নব কলেবর দাতা—'মৃত্যু'। এমন দয়ালুকে সাহ্লাদে *গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে কি?* বস্তুতঃ ইহার নামে ভীত হইবার কোনই কারণ নাই।

(৩) মহাদাতা—বার্দ্ধক্যে জীব শক্তি-হীনতা প্রযুক্ত ভোগে অক্ষম হয়; কিন্তু চিত্ত ভোগের জন্য সদাই সোৎসুক থাকে; পক্ষান্তরে দেহ ভোগে অক্ষম। তখন যদি কাহাকেও জিজ্ঞাসা করা যায়, তোমরা আমার পুরাতন শরীর গ্রহণ করিয়া নব শরীর দান করিবে কি? তাহাতে কিন্তু কেহই বলিবেনা যে দিব বা নিব, এবং কেহ পারিবেও না। যদি কেহ সেই মহা সন্ধিক্ষণে বলেন, যে লইব বা দিব কিম্বা পারে, তবে তিনি সেই "মৃত্যু"। মৃত্যু প্রাণী মাত্রেরই পুরাতন শরীর গ্রহণ করিয়া নূতন দেহ দান করেন; এইজন্যই ইনি মহাদাতা। স্থূল শরীর যখন ভোগ ও কার্য্য করিতে অক্ষম হয় তখনই মৃত্যু আসিয়া নব কলেবর দান করিয়া জীবকে অনুগৃহীত করে এবং তখন সে নব দেহে—নব উৎসাহে—নবরঙ্গে—নূতন ঢঙ্গে, সংসার-রঙ্গের অভিনয়ে প্রবৃত্ত হয়। মৃত্যুতে নব কলেবর কিরূপে উৎপন্ন হয় তাহাই বিচার্য্য। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যথা:—

জগতশ্চ স্বরূপন্তু নির্ম্মিতং স্বেন কর্ম্মণা।
পুনর্দেহান্তরং যাতি সুকৃতৈর্দুষ্কৃতৈর্নরঃ॥
পঞ্চেন্দ্রিয় সমাযুক্তং সকলৈ বিষয়ৈঃ সহ।
প্রবিশেৎ স নবং দেহং গৃহে দগ্ধে যথা গৃহী॥ গরু উ-৩১ অঃ॥

জীবের স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগার্থ জগতের স্বরূপ তৎ তৎ আকারে নির্ম্মিত হইয়াছে। জীব সুকৃত ও দুষ্কৃতানুসারে দেহ মধ্যে প্রবেশ করে। গৃহী যেমন পুরাতন গৃহ দগ্ধ হইলে নূতন গৃহে প্রবেশ করে, জীবও সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে সঙ্গে লইয়া নব দেহে প্রবেশ করে।

এই সমস্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা গেল যে, মৃত্যুতে একটি নব শরীর ধারণ করা হয়; অর্থাৎ যৎ কর্ত্তৃক বা যেহেতু নব কলেবর ধারণ হয়, সেই কর্ত্তৃকারক বা হেতুর নাম মৃত্যু। এতদ্ভিন্ন জগতে মৃত্যুর আর কোন রূপ নাই। মৃত্যুই নব শরীর গঠনের মূল। মৃত্যুতে সেই নব দেহ কিরূপে গঠিত হয়, তাহা এক্ষণে প্রকটিত করা আবশ্যক।

মৃত্যুতে নব শরীর গঠন প্রণালী, আমাদের মাতৃ-গর্ভস্থ দেহ গঠন প্রণালীরই অনুরূপ। জীব বা পদার্থ মাত্রেরই লিঙ্গ শরীর আছে। পদার্থ মাত্রেই যে তৈজস-তত্ত্বে অব্যক্ত, লুক্কাইত বা অদৃশ্য আছে, এমন কি হিমশিলাতেও যাহা অবস্থিতি করিতেছে, তাহাই আমাদের লিঙ্গ দেহ। উহার প্রমাণ এই যে, ঐ তৈজস-সারতত্ত্ব চলিয়া গেলেই সেই অঙ্গ হিমাঙ্গ হয়। ঐ লিঙ্গ দেহ মহা প্রলয়ে কারণ রূপে লীন হয় বলিয়া, লিঙ্গ এবং সূক্ষ্মতা প্রযুক্ত সূক্ষ্ম দেহ

নাম হইয়াছে। ইহার বিশিষ্ট বিবরণ সূক্ষ্ম দেহে দ্রষ্টব্য। ঐ লিঙ্গ দেহ পদার্থ মাত্রেই তেজরূপে এবং জীব মাত্রেই শুক্ররূপে অবস্থিতি করে। ব্রহ্মচর্য্য প্রভাবে যাঁহারা ঐ শুক্ররূপ তেজকে শরীরে স্তম্ভিত করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদেরই সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তি অবিকৃত ও তেজস্বান হয় এবং বল, বীর্য্য, তেজ, সৌন্দর্য্য সমস্তই অবিকৃত থাকে বলিয়া সেই ব্রহ্মচারীর শরীর—"সূর্য্যকোটীপ্রতিকাশং চন্দ্রকোটীসুশীতলম্" বলিয়া প্রতীয়মান হয়। আর যাঁহার ঐ তেজ যে পরিমাণে চ্যুত হয়, তাহার সমস্ত শক্তিই সেই পরিমাণে হ্রাস প্রাপ্ত হয়; ইহা অনিবার্য্য।

প্রশ্ন—জীব যখন মাতৃগর্ভে প্রবিষ্ট হয় নাই, তখন তাহার লিঙ্গ দেহ কোথায় ছিল?

উত্তর—শুন, কোথায় ছিল এবং কিরূপে জন্মিল। পিতাতে সন্তানের লিঙ্গদেহ বা ভাবী তৈজস-দেহ বর্ত্তমান আছে। যথা শ্রুতি,—"তেজোবৈ পুত্র নামাসি" ॥ (কৌষীতকী—২অঃ—৭।) তেজই তুমি, পুত্র নাম ধারণ করিয়াছ। অর্থাৎ পিতৃ তেজ শুক্র, মাতৃ-গর্ভ ভেদ করিয়া আবির্ভূত হওয়ার নামই "নব কুমার"। পক্ষান্তরেও তদ্রূপ, মুমূর্ষুতে তাহার ভাবী জাতকের সূক্ষ্ম তৈজস-দেহ বর্ত্তমান আছে, উহাই মুমূর্ষু গর্ভ ভেদ করিয়া আবির্ভূত হওয়ার নাম "নব কলেবর"। যতক্ষণ পর্য্যন্ত পিতৃতেজ মথিত হইয়া শুক্ররূপে মাতৃ-গর্ভে প্রবিষ্ট হওনান্তর জন্মগ্রহণ না করে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সেই শুক্ররূপী তেজ পিতার সর্ব্বদেহ ব্যাপী থাকে। তদ্রূপ মুমূর্ষু তেজ মথিত হইয়া মুমূর্ষু গর্ভে প্রবিষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত, ঐ তেজ মুমূর্ষুর সর্ব্ব দেহ ব্যাপী থাকে। ঐ তেজ মথিত হইয়া আসিলেই, নব কুমার মানব কলেবরে আবির্ভূত হয়।

প্রশ্ন—মথিত না হইলে তেজ উৎপন্ন হয় না। ঐ তেজ মথিত করিবে কে? কি নিয়মে নব কুমার বা নব কলেবর উৎপন্ন হইবে?

উত্তর—শুন কি নিয়মে উৎপন্ন হয়। যে নিয়মে দুগ্ধ মথিত হইয়া তৎ তৈজস-সার ননী উৎপন্ন হয়; অবিকল সেই সেই প্রণালীতে পিতৃদেহ ও মুমূর্ষু দেহ মথিত হইয়া নব কুমার ও নব কলেবর জন্মগ্রহণ করে।

প্রশ্ন—দুগ্ধ মথিত হয় বংশদণ্ড দ্বারা; শরীর কিসের দ্বারা মথিত হয়?

উত্তর—প্রাণ-দণ্ড দ্বারা। উহা উভয় অবস্থারই সারধর্ম্ম। যে নিয়মে ও যে বায়ুদ্বারা পিতৃ-শরীর মথিত হইয়া একটি সূক্ষ্ম দেহ উৎপন্ন হয়; সেই নিয়মে ও সেই বায়ুদ্বারা মুমূর্ষু শরীর মথিত হইয়া সেইরূপ সূক্ষ্মদেহ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অর্থাৎ রতি-সময়ে পিতাতে দীর্ঘ শ্বাস উপস্থিত হয়; রতিতে আনন্দ প্রচুর বলিয়া সে দীর্ঘ শ্বাস গণ্য হয় না। কিন্তু যে দীর্ঘ শ্বাস উপস্থিত হয়, সেই শ্বাসই পিতার তেজকে মথিত করিয়া একীভূত করে; তাহারই নাম সূক্ষ্ম শরীর বা শুক্র। সেই শ্বাসই মুমূর্ষুর তেজকে মথিত করিয়া একীভূত করে।

প্রশ্ন—দুগ্ধ মথিত করিয়া ননী উৎপন্ন কালে যত দুগ্ধ তত ননী উৎপন্ন হয় না, ইহাও কি তদ্রূপ; অথবা পিতা বা মুমূর্ষু শরীর সার্দ্ধ তিন হস্ত প্রমাণ। সূক্ষ্ম শরীরও কি সাড়ে তিন হাত?

উত্তর—উহা ননীরই অনুরূপ; অর্থাৎ পিতা ও মুমূর্ষু শরীর মথিত হইয়া তৎ সার শুক্র ও সূক্ষ্ম দেহ অল্পই উৎপন্ন হয়। সেইরূপ সার্দ্ধ তিন হস্ত শরীর মথিত হইলে, অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ শুক্র ও সূক্ষ্ম দেহ উৎপন্ন হয়। ইহাই উভয় অবস্থার সারধর্ম্ম।

প্রশ্ন—নব কুমার যেমন পিত্রাদির আকার বিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হয়, নব কলেবরও কি মুমূর্ষুর আকার বিশিষ্ট হইয়া আবির্ভূত হয়?

উত্তর—হাঁ! ইহা উভয় অবস্থারই সমান সারধর্ম্ম। ঐ সূক্ষ্ম শরীর বা নব কুমার পিত্রাদির আকার বিশিষ্ট হইয়াই আবির্ভূত হয়। যথা:—

"লব্ধা নিমিত্তমব্যক্তং ব্যক্তাব্যক্তং ভবত্যুত।
যথা যোনি যথা বীজং স্বভাবেন বলীয়সা॥" ভাঃ—৬—১॥

*কর্ম্ম জন্য অদৃষ্টই জীবের স্থূল বা সূক্ষ্ম শরীরের কারণ। সেই বাসনা অতিশয় বলবতী। যোনি অর্থাৎ মাতৃ ভাবনাধিক্যে মাতৃ সদৃশ, বীজ অর্থাৎ পিতৃ ভাবনাধিক্যে পিতৃ সদৃশ দেহ প্রাপ্তি হয়; কচিৎ উভয় সদৃশ দেহ প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে সেই সূক্ষ্ম শরীর বা নব কলেবরও মুমূর্ষুর আকার বিশিষ্ট হইয়া আবির্ভাব হয়। যথা:—"তৎ প্রমাণবয়োঽবস্থা সংস্থানৈঃ প্রাগ্‌ভবং যথা" (মার্কণ্ডেয়—১০ অ'।) ঐ সূক্ষ্মদেহ মুমূর্ষুর বয়স, অবস্থা ও সংস্থান দ্বারা সংযুক্ত হয়।

প্রশ্ন—শুক্র উৎপন্ন হইয়া প্রথমতঃ যোনিস্থানে আবির্ভূত হয়; সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়া প্রথম কোন্ স্থানে আবির্ভূত হয়?

উত্তর—উভয়ত্রই যোনিস্থানে, ইহা উভয় অবস্থারই সারধর্ম্ম। যে নিয়মে ও যে বায়ুর দ্বারা শুক্র যোনিস্থানে নিক্ষিপ্ত হয়, সেই নিয়মে ও সেই বায়ু দ্বারা সূক্ষ্মদেহ মুমূর্ষুর যোনিস্থানে বা মূলাধারে নিক্ষিপ্ত হয়। উভয়ত্রই দীর্ঘ শ্বাসের দ্বারা এই কার্য্য সাধিত হয়। অর্থাৎ মুমূর্ষুর দীর্ঘ শ্বাস প্রথমেই পায়ের তৈজস-ব

গুটাইয়া আনিয়া যোনিস্থানে উপস্থিত করে, তখনই পা হিমাঙ্গ হয় এবং লোকে বলাবলি করে 'পা ছাড়িয়া গিয়াছে আর বাঁচিল না'। তখন হইতেই সূক্ষ্ম শরীর বা নব কলেবর গঠন আরম্ভ হইল, ইহাই লিঙ্গদেহ গঠন প্রণালীর প্রথম কার্য্যারম্ভ।

যে নিয়মে ও যে বায়ু দ্বারা যোনিস্থ শুক্র দেহ মধ্যে বা গর্ভে প্রবিষ্ট হয়; সেই নিয়মে ও সেই বায়ু দ্বারা যোনিস্থ সূক্ষ্ম শরীর দেহ মধ্যে বা গর্ভে প্রবিষ্ট হয়; তদনন্তর হৃদয়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। উভয়ত্রই এই কার্য্য বায়ুর দ্বারা সাধিত হয়। সূক্ষ্ম দেহ মুমূর্ষু গর্ভে প্রবেশ করিলেই নাভিশ্বাস আরম্ভ হয় ও নাভির নিম্নভাগ অসাড় এবং নিস্তেজ হইয়া যায়। তখনই লোকে বলাবলি করে, 'নাভিশ্বাস আরম্ভ হইয়াছে, বোধ হয় আর বেশী দেরী নাই।'

শুক্র যোনি ভেদ করিয়া দেহে প্রবিষ্ট হইলে, তাহার নাম হয় "ভ্রূণ"। সূক্ষ্ম দেহও যোনি ভেদ করিয়া দেহে বা মুমূর্ষুর হৃদয়ে উপস্থিত হইলে তাহার নাম হয় "ভাবনাময় দেহী"। ইহাই তৃতীয় স্তর, এই স্থানেই ভ্রূণের দেহ গঠন আরম্ভ হয়। পক্ষান্তরে এই স্থানে ভাবনাময় দেহীরও দেহ গঠন আরম্ভ হয়। দুগ্ধ জাল দিলে তাহাতে যেমন প্রথমে অতি সূক্ষ্ম একটি সর পড়ে, তদ্রূপ মৃত্যু সময়ে সূক্ষ্ম শরীররূপ দুগ্ধ, প্রাণের উৎকট ক্রিয়া হেতু উত্তাপিত হইয়া, তাহার উপর সরের ন্যায় সূক্ষ্ম একটি স্তর উৎপন্ন হয়; তাহারই নাম "ভাবনাময় দেহ"। সেই ভাবনাময় দেহের উপাদান সূক্ষ্ম শরীরেই আছে। উহার উপাদানের কোন অভাব কখনই হইবে না।

যে নিয়মে গর্ভে প্রবিষ্ট ভ্রূণের দেহ গঠন আরম্ভ হয়, অর্থাৎ মাতৃ শরীর হইতে উপাদান আকর্ষণ করিয়া পুষ্ট অর্থাৎ বর্ত্তুলাকারে পরিণত হওনান্তর বড় দেহী আকারে আবির্ভাব হয়, সেই নিয়মে হৃদি প্রবিষ্ট ভাবনাময় দেহীর দেহ গঠন আরম্ভ হয়। অর্থাৎ মুমূর্ষু দেহ হইতে তৈজস-তত্ত্ব আকর্ষণ করিয়া পুষ্ট হওনান্তর বড় দেহী আকারে আবির্ভাব হয়। ইহার প্রমাণ সূক্ষ্ম শরীর যেরূপ পুষ্ট হইতে থাকে, স্থূল শরীরও সেইরূপ নিস্তেজ ও হিমাঙ্গ হইতে থাকে

প্রশ্ন—ভ্রূণ দশ মাসে পুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ট হয়, সূক্ষ্ম দেহী কত সময়ে পুষ্ট হইয়া ভূমিষ্ট হয়?

উত্তর—উভয়েই সমান; একজন দশমাসে, একজন দশ দণ্ডে। অর্থাৎ ঐ সূক্ষ্ম ভাবনাময় শরীর গঠিত হইতে দশ দণ্ড সময় লাগে; এই জন্যই একটি

প্রবাদ আছে যে, মৃত্যুর দশ দণ্ড পরে সংস্কার করিবে। কেননা এই সময়ে অধিকাংশই মৃত্যু-কবলিত হয়। দুই একজন ফিরে বটে, তাহারা পরলোকের তত্ত্বও কিছু কিছু বলে; কারণ এই সময় পরলোক দৃষ্টিগম্য হয়।

প্রশ্ন—কি নিয়মে প্রসব হয়?

উত্তর—উভয়ত্র বায়ু বা ধাত্রী দ্বারা।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজানকী নাথ মুখোপাধ্যায়।

অর্ঘ্য]

সম্মোহন বিদ্যা। *

সম্মোহন বিদ্যার মৌলিক তথ্য ডাঃ হড্‌সনের (Dr. Hudson) পূর্ব্বকথিত দ্বিবিধ মন সম্বন্ধীয় প্রতিজ্ঞা কয়টির উপর স্থাপিত। যখন কোন ব্যক্তি জাগ্রত অবস্থায় স্বীয় পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে চতুষ্পার্শস্থ দ্রব্যনিচয়ের অস্তিত্ব অনুভব করে, তখন তাহার মনকে ইন্দ্রিয়গত মন (objective mind) বলে। মস্তিষ্ক এই মনের আধার স্থান; এই নিমিত্ত মস্তিষ্কের অবস্থা বিপর্য্যয়ে ইহারও অবস্থা বিপর্য্যয় হইয়া থাকে। মস্তিষ্ক নিদ্রিত হইলে এই মনও ক্ষণিক নিষ্ক্রিয় হয়। পঞ্চেন্দ্রিয় প্রণালীর মধ্য দিয়া চতুষ্পার্শস্থ দ্রব্য সকলের ছাপ যখন মস্তিষ্কে পতিত হয়, তখন এই মন সেই দ্রব্যনিচয়ের অস্তিত্ব অনুভব করে। ইহাই ইন্দ্রিয়গত মনের কার্য্য। কিন্তু যখন এই মন কোন বস্তু বা ভাবে নিমগ্ন হইয়া তন্ময় হয়; অর্থাৎ যখন এই মন পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্য সমূহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে বিরত হইয়া, কোন বস্তু বা ভাবে নিমগ্ন হয়, (নিদ্রা বা মোহাবস্থা) তখন ইহার তৎকালীন ক্রিয়া অবস্থানুযায়ী আংশিক বা সম্পূর্ণরূপে স্থগিত থাকে। এই অবস্থায় অতীন্দ্রিয় বা আধ্যাত্মিক মনের (subjective mind) অভ্যুদয় হয়। তখনই আমরা অতীন্দ্রিয় মনের অত্যদ্ভুত ক্রিয়ার বিকাশ

---

* যাঁহারা এই বিদ্যা সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা করিতে চাহেন,—যাঁহারা হিন্দু মনস্তত্ত্বের প্রথম সোপানে উঠিতে চাহেন, তাঁহারা লেখক প্রণীত A Complete Course of Hypnotism, Theoritical and Practical পড়িলে উপকৃত হইবেন। মূল্য ২৷৹ টাকা। গ্রন্থখানি পাঠে আমরা পরিতৃপ্ত আছি। পং সং।

দেখিতে পাই। যতই ইন্দ্রিয়গত মন কোন বস্তু বা ভাবে কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে, ততই এই অতীন্দ্রিয় মনের অভ্যুদয় ও ক্রিয়ার বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই ইন্দ্রিয়গত মনের সহিত সম্মোহন বিদ্যার অতি নিকট সম্বন্ধ। মোহাবস্থা আনায়ন করিতে হইলে, ইন্দ্রিয়গত মনকে কিছুক্ষণের নিমিত্ত ক্রিয়া-বিরত করিতে হয়। যাহাকে মোহ-তন্দ্রাভিভূত (Subject) করা হয়, তাহার মন (objective mind) চতুস্পার্শস্থ দ্রব্যনিচয় হইতে অপসারিত করিয়া কোন একটী দ্রব্য বা ভাব বিশেষে স্থির করিতে হয়। ইহাতে তাহার ইন্দ্রিয়গত মন পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া, একটী বস্তু বা ভাবে কেন্দ্রীভূত হয় এবং ক্রমশঃ তাহার মস্তিষ্ক নিশ্চেষ্ট ও নিদ্রিত হইয়া পড়ে। এই প্রকারে তাহার ইন্দ্রিয়গত মন যতই কেন্দ্রীভূত হইতে থাকে, ততই অতীন্দ্রিয় মনের বিকাশ প্রাপ্তি ও ক্রিয়াশীলতা আইসে। এই সময়ে একঘেয়ে শ্রুতিমধুর স্বরে তাহাকে নিদ্রাভিভূত করিবার জন্য প্রেরণা-বাক্য (suggestion) প্রয়োগ করিলে ক্রমশঃ যতই নিদ্রাভিভূত হইতে থাকে, ততই তন্দ্রানয়নকারীর (operator) সহিত এক প্রকার মিলন বা সম্বন্ধ (Rapport) সংস্থাপন হয়; এবং যতই নিদ্রার গভীরতা বৃদ্ধি হইতে থাকে, ততই এই সম্বন্ধ বদ্ধমূল হয়। ইহাই মোহ-নিদ্রাবস্থা; স্বাভাবিক নিদ্রাবস্থা হইতে ইহার শারীরিক (physiological) কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, স্বাভাবিক নিদ্রায় নিদ্রিত ব্যক্তির সহিত অপর কাহারও সম্বন্ধ থাকে না; যত্তপি কেহ তাহার সহিত কথা কহে সে তাহা শুনিতে পায় না এবং প্রত্যুত্তর দিতে পারে না; অত্যন্ত ডাকিলে বা ঠেলিলে জাগরিত হইয়া পড়ে। কিন্তু মোহ-তন্দ্রাবস্থায় কেবল মাত্র নিদ্রানয়নকারীর সহিত বহিঃসম্বন্ধ থাকে। তিনিই কেবল তাহাকে যদৃচ্ছা পরিচালিত করিতে পারেন। সে নিদ্রিত-কারীর প্রতি এতই নিবিষ্ট-চিত্ত হয়, যে অপর কেহ তাহাকে ডাকিলে বা তাহার সহিত কথা কহিলে, সে শুনিতে পায় না এবং উত্তরও দেয় না। অপরন্তু নিদ্রাভিভূতকারীর যে কোন প্রস্তাব সে শুনিতে পায় এবং তাহা অতি অসঙ্গত হইলেও তৎক্ষণাৎ আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় বিনা আপত্তিতে তদনুযায়ী কার্য্য করে। স্বাভাবিক নিদ্রাবস্থা হইতে মোহ-নিদ্রাবস্থায় ইহাই পার্থক্য লক্ষিত হয়। এই মোহ-নিদ্রাবস্থাকে কৃত্রিম বা উৎপাদিত (induced) নিদ্রাবস্থা বলা যাইতে পারে। এই অবস্থায় নিদ্রাভিভূত ব্যক্তি চতুস্পার্শস্থ দ্রব্যনিচয় অনুভব করিতে পারে না। তখন সে তন্দ্রানয়ন-

কারীর বশে থাকে এবং এই তন্দ্রানয়নকারী তখন তাহার মানসিক ও শারীরিক কার্য্যকলাপ যদৃচ্ছা চালনা করিয়া তাহাকে আজ্ঞানুবর্ত্তী করে। এই অবস্থাকে প্রেরণা-বাক্যানুবর্ত্তী মনের একাগ্র ও কার্য্য-তৎপর অবস্থা বলা যাইতে পারে। ইন্দ্রিয়গত মনকে যতই বহির্বস্তু হইতে অপসারিত করিয়া একটী বস্তু বা ভাবে নিবিষ্ট করা যায়, ততই মোহ-তন্দ্রাবস্থায় গভীরতা আসিতে থাকে; এবং যখন বহির্বস্তু-জ্ঞান তিরোহিত হয়, তখনই অতীন্দ্রিয় মনের পূর্ণ আবির্ভাব ও অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়া-বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়গত ও অতীন্দ্রিয় মনের পার্থক্য বিধান কল্পে একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। ইহাতে দুইটী মনের পার্থক্য বুঝিতে পারা যাইবে ও এই মনদ্বয়ের সহিত মোহ নিদ্রার কিরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাহাও বুঝা যাইবে।

সম আকারের দুইটী বৃত্তাকার ধাতু নির্ম্মিত চাকৃতি (Dish) লইয়া একটীর উপর অপরটী এরূপ ভাবে রাখিতে হইবে, যে নিম্নস্থ চাকৃতিটী উপর হইতে দেখিতে পাওয়া না যায়। নিম্নস্থ চাকৃতিটী এরূপ কোন কোমল ধাতুনির্ম্মিত, যাহাতে তাহার উপর সহজে কোন বস্তুর ছাপ অঙ্কিত হয়। কিন্তু উপরিস্থ চাকৃতিটী কঠিন বস্তু নির্ম্মিত। ইহা নিম্নস্থ চাকৃতিটীকে কোনরূপ বস্তুগত ছাপ হইতে রক্ষা করিবার জন্য উপরে স্থাপিত। ইহা এরূপ কৌশলে নির্ম্মিত, যে অতি সহজ উপায়ে ইহার আকার কেন্দ্রাভিমুখে খর্ব্ব করা যায়। যখন ইহার আয়তন কেন্দ্রাভিমুখে খর্ব্ব করা হয়, তখনই কেবল নিম্নস্থিত চাকৃতিটী দেখিতে পাওয়া যায়। এবং যতই ইহার আকার খর্ব্ব হইতে থাকে, ততই নিম্নস্থ চাকৃতিটীর আয়তনের বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। উপরিস্থ চাকৃতিটী ইন্দ্রিয়গত মন ও নিম্নস্থ চাকৃতিটী অতীন্দ্রিয় মন। যখন ইন্দ্রিয়গত মনের ক্রিয়া সঙ্কোচ হইয়া একাগ্রভাব আইসে, তখনই অতীন্দ্রিয় মনের বিকাশ উপলব্ধি হয়, এবং এই ক্রিয়া সঙ্কোচের মাত্রানুযায়ী অতীন্দ্রিয় মনের ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যতই অতীন্দ্রিয় মনের বিস্তৃতি হইতে থাকে, ততই ইহার অদ্ভুত ক্রিয়া-বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ডাঃ ব্রেডের নিম্নলিখিত উদাহরণটী পাঠ করিলে, এ বিষয়টী আরও সুন্দর রূপে বোধগম্য হইবে।

কোন একটী বাটীতে এক জন লোক বাস করে। সে স্বভাবতঃ স্বাধীন ইচ্ছা ও বিচার-শক্তি হীন। সে যে কোন প্রস্তাব বিশ্বাসী ও আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় বিনা আপত্তিতে পালন করে। এমন কি অতি অসঙ্গত প্রস্তাবও সত্য বলিয়া গ্রহণ করে এবং তাহার জ্ঞান ও ক্ষমতার

করে। ঈদৃশ স্বভাবাপন্ন বলিয়া তাহার উপর চৌকি দিবার জন্য সেই গৃহের প্রবেশ দ্বারে একজন প্রহরী সদা সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে। এই প্রহরী সদা সর্ব্বদাই অত্যন্ত সতর্ক। কেহ গৃহ মধ্যস্থ ব্যক্তির নিকট যাই-বার চেষ্টা করিলে, সে তাহাকে বাধা দেয় ও তাহার চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দেয়। গৃহস্থিত ব্যক্তির নিকট যাইয়া তাহার দ্বারা কোন কার্য্য সমাধা করিবার ইচ্ছা থাকিলে, অগ্রে প্রহরীকে কোন উপায়ে আয়ত্তাধীন করিতে হয়। এই প্রহরী ইন্দ্রিয়গত মন ও গৃহ মধ্যস্থ ব্যক্তি অতীন্দ্রিয় মন। অতী-ন্দ্রিয় মন পাইতে হইলে অর্থাৎ কোন লোককে মোহ-নিদ্রাভিভূত করিতে হইলে, প্রথমে তাহার ইন্দ্রিয়গত মনকে দমন করিয়া অকর্ম্মণ্য করিতে হয়। তখন অতীন্দ্রিয় মনকে যাহা কিছু বলা যাইবে, সে তাহা বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাকারী ভৃত্যের ন্যায় প্রতিপালন করিবে।

কাহাকেও মোহ-নিদ্রাভিভূত করিতে হইলে, তাহার ইন্দ্রিয়গত মনকে চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্যনিচয় হইতে অপসারিত করিয়া কোন একটী নির্দ্দিষ্ট বস্তু বা ভাবে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গত মন সঙ্কুচিত হইয়া ক্ষণেক অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং অতীন্দ্রিয় মনের বিকাশ হয়। সাধারণ নিদ্রা মোহ-নিদ্রার অনুরূপ। এই নিমিত্ত কাহাকেও মোহ-নিদ্রাভিভূত করিতে হইলে, তাহাকে নিদ্রা যাইতে বলাই স্বাভাবিক ও প্রকৃষ্ট উপায়। এবং যতক্ষণ সে নিদ্রিত না হয়, ততক্ষণ ক্রমাগত একঘেয়ে শ্রুতিমধুর স্বরে নিদ্রিত করিবার নিমিত্ত প্রেরণা-বাক্য প্রয়োগ করিতে হয়। মোহ-নিদ্রাভিভূত করিবার নিমিত্ত নানা জনের নানাবিধ পদ্ধতি আছে। কিন্তু এই বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে একটী মুখ্য উদ্দেশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। সকল পদ্ধতিগুলিরই উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়গত মনকে চতুর্দ্দিকস্থ দ্রব্যনিচয় হইতে অপসারিত করিয়া, কোন একটী বস্তু বা ভাবে কেন্দ্রীভূত করা ও অতীন্দ্রিয় মনের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করা। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে ইন্দ্রিয়গত মন বহির্বস্তু সমূহের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। সেই নিমিত্ত এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের কোন একটীর সহায়ে ইন্দ্রিয়গত মনকে আয়ত্বাধীন করিবার বা ইহার ক্রিয়া সঙ্কোচ করিবার স্বভাবিক নিয়ম। যখনই ইন্দ্রিগত মনের একাগ্রতা হয়, তখনই অতীন্দ্রিয় মনের আবির্ভাব হয় এবং মোহ-নিদ্রা আইসে। চক্ষুর সাহায্যে মোহ-নিদ্রা আনিতে হইলে, কাহাকেও কোন একটী চাকচিক্যময় দ্রব্যের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে ও তাহাতে মন নিবিষ্ট করিতে বলা হয়।

তাহার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির কার্য্য স্থগিত হয়; পরে চক্ষুও কিছুক্ষণের মধ্যে মুদিত হইয়া কেবলমাত্র মন সেই নির্দ্দিষ্ট দ্রব্যে তন্ময় হয় এবং শীঘ্রই সেই ব্যক্তি তাহার মনের নিবিষ্টতা অনুযায়ী নিদ্রিত হইয়া পড়ে। এই পদ্ধতিটী প্রথমে ডাঃ ব্রেড (Braid) আবিষ্কার করেন। কর্ণের সাহায্যে মোহ-তন্দ্রা আনিতে হইলে, কাহাকেও চক্ষু মুদিত করিয়া নিদ্রা যাইতে বলা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নিদ্রিত করিবার প্রেরণা-বাক্য অতি শ্রুতিমধুর স্বরে প্রয়োগ করিতে হয়। ইহাতে সেই ব্যক্তি নিদ্রানয়নকারীর সুমধুর স্বর শুনিতে শুনিতে ঘোর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে; কিন্তু অঘোর নিদ্রাবস্থায়ও কেবল মাত্র নিদ্রাকারীরই কথা শুনিতে পায়। ন্যান্সি স্কুলের সংস্থাপক ডাঃ লিবল্ট (Liebeault) এই প্রক্রিয়ার আবিষ্কার কর্ত্তা। এই নিয়মানুযায়ী আনীত নিদ্রাই এখানে পাশ্চাত্য মোহ-নিদ্রা নামে উক্ত। ত্বক্ সাহায্যে মোহ-নিদ্রা আনয়ন করিতে হইলে, কোন ব্যক্তিকে বসাইয়া বা শয়ন করাইয়া তাহাকে চক্ষু মুদিত করিয়া নিদ্রা যাইতে বলা হয় এবং তাহার দেহের উপর মৃদুমন্দ ভাবে হস্ত চালনা (Pass) করিতে হয়। এই হস্ত চালন অতি স্নিগ্ধকর; এ জন্য সে ব্যক্তি শীঘ্র নিদ্রিত হইয়া পড়ে। পদ্ধতিটী মেস্-মারের শিষ্যগণ আবিস্কার করেন, এবং তাঁহারাই ইহার ব্যবহার করিতেন। এখনও তাঁহার সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিগণ (Mesmerist) এই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া মোহ-তন্দ্রা আনয়ন করিয়া থাকেন। জিহ্বা ও নাসিকার সাহায্যেও মোহ-তন্দ্রা আনয়ন করা যায়। ক্লোরোফরম্ আঘ্রাণ লওয়াইয়া বা মাদক দ্রব্য পান করাইয়া কখনও কখনও মোহ-তন্দ্রা আনয়ন করা হইয়াছে। কিন্তু ইহা নিকৃষ্ট বোধে ব্যবহৃত হয় না।

মোহ-নিদ্রা আনয়ন করিবার বিচিত্র পদ্ধতিগুলি কেবলমাত্র শিক্ষার্থী-গণের প্রয়োজনীয় বলিয়া এবং এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্যের সহিত কোনরূপ বিশেষ সম্বন্ধ না থাকায়, অনর্থক প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় উহাদের উল্লেখ পরিত্যাগ করিলাম। (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়।

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

উমাপদ ব্রহ্মচারী আসিয়া দেখিলেন, কাশীধাম যেন নিত্যানন্দময় - পতিতপাবনী জ্ঞান-প্রবাহ স্বরূপা ভাগীরথীর পূতধারার সহিত আনন্দের কলতান যেন সর্ব্বদাই ধ্বনিত হইতেছে। বিশ্বনাথ বিশ্বেশ্বর দর্শনে তাহার বোধ হইল, যেন দেবদেব মহাদেব আনন্দরূপে—শুধু মন্দিরের ভিতর কেন, সমস্ত ক্ষেত্র ব্যাপিয়াই বিরাজমান। এই আনন্দের ক্ষেত্রে নিত্য কত শত লোক আসিতেছে—বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতেছে—ভাগীরথীর জড়াতীতা প্রত্যক্ষরূপা দ্রবময়ী ধারায় অবগাহন করিয়া জন্ম-জন্মান্তর সঞ্চিত পাপরাশি ধৌত করিতেছে। ইহা মোক্ষদায়িকা পুরী; তাই জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মী প্রভৃতি সকলেই যাহাতে এই পুণ্য তীর্থের পুণ্যরেণু স্পর্শে সেই মোক্ষ-পথের পথিক হইয়া অন্তে মহাদেব পদত্ত তারকব্রহ্ম নাম শ্রবণ করিতে পারে, তজ্জন্য এই স্থানে বাস করিতে সচেষ্ট। গৃহী, বৈষয়িক, ধনী, নির্ধন সকলেই কাশীধামে বাস করিবার জন্য লালায়িত। তিনি দেখিলেন, যে এই স্থানের এমনি কি এক অদ্ভুত শক্তি আছে যে, চিত্ত আপনি যেন বিষয় ভুলিতে চায়—বাসনা ত্যাগ করিতে চায়। বিশ্বেশ্বরের আরতি দেখিয়া হৃদয় আপনি তাহার তালে তালে নাচিতে চায়। যোগীদিগের এখানে যোগাচরণের প্রতীক্ষা করিতে হয় না,—কর্ম্মীর এখানে কর্ম্মানুষ্ঠানের অপেক্ষা নাই— কিছুক্ষণ এক স্থানে বসিয়া থাকিলেই মন বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিয়া ক্রমে ক্রমে আপনা আপনি অন্তর্মুখী হইয়া পড়ে।

কাশীর বিখ্যাত ঘাটগুলির মধ্যে দশাশ্বমেধ ঘাটটী প্রধান। প্রাতঃকাল হইতে গভীর রজনী পর্য্যন্ত কত লোক ঘাটে দেহ নিমজ্জন করিতেছে,— উচ্চরবে স্তোত্র পাঠ করিতেছে,—ধ্যান-স্তিমিত লোচনে কেহ বা বদ্ধ-পদ্মাসনে আসীন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে—সূর্য্যদেব অস্তাচলে গমনোন্মুখ সময়ে, কত জন ঘাটে বসিয়া গীতা চণ্ডী প্রভৃতি ধর্ম্ম পুস্তক পাঠ করেন—কত সন্ন্যাসী, আগন্তুক, জ্ঞান-পিপাসুদিগকে নানাবিধ ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করেন। একে স্বভাবতঃ পুণ্যময় স্থান, তাহাতে ভগবৎ-ধর্ম্মপরায়ণ সাধু মহাত্মাদিগের নিরন্তর

গমনাগমন : সুতরাং সর্ব্বদাই ধর্ম্ম-প্রসঙ্গ ও ধর্ম্মালোচনা ইচ্ছা না থাকিলেও অনেকে শ্রোতারূপে উপদেষ্টার নিকট সমাগত।

কাশী সাধনার ক্ষেত্র ও সাধকের প্রিয় স্থান। শাস্ত্রবিৎ ও শাস্ত্রার্থবিৎ জ্ঞানী,—প্রকৃত তান্ত্রিক বস্তুবিৎ কর্ম্মী,—এমন কি অনেক যোগসিদ্ধ মহাত্মাদের দর্শনও ঘটিয়া থাকে। কাশীর জনতার বাহিরে অরণ্যাশ্রয়ী উচ্চ সাধন-পরায়ণ অনেক সন্ন্যাসী এখনও দৃষ্ট হয়। কাল সহকারে বর্ত্তমান সময়ে অনেক ভণ্ড এবং স্বার্থপর ব্যক্তির ক্রিয়ার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায় বটে; তবুও এখন এই স্থানের সে মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। সকল সম্প্রদায় এখানে স্বীয় অভীষ্টানুযায়ী সাধনা করিতে পারেন, এমন সুবিধাও আছে। উমাপদ ব্রহ্মচারী এই আনন্দোৎসব ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, এমন স্থানে পিতা কি নিমিত্ত পাঠাইলেন! ধর্ম্মভাব ত' পূর্ণরূপে বর্ত্তমান;—সাধনা, ধ্যান, পূজা কিছুই ত' লুপ্ত হয় নাই! সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা—কাশীপুরাধীশ্বরী প্রকট, তবে আমি এই কাশীধামে কি কার্য্য করিতে আসিলাম। পিতার আদেশ ত' বুঝিতে পারা গেল না; এখন কর্ত্তব্য কি! ব্রহ্মচারী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত ক্রমশঃ পরিচিত হইয়া পড়িলেন। এবং বুঝিলেন যে আছে সব,—কেবল একটী জিনিসের অভাব হইয়াছে;—তাহাই একমাত্র প্রয়োজন। তিনি দেখিলেন যে, সকল সম্প্রদায়ই সেই সম্প্রদায়গত অনুষ্ঠানকে বরণ করিয়া বসিয়া আছে। সেই সম্প্রদায়গত সার সত্য, যাহা সকল সম্প্রদায়ের ভিতর দিয়া ফুটিয়া বাহির হয়, তাহার দিকে দৃক্‌পাত নাই। কেহ কেহ, আসন, প্রাণায়ামাদির সাহায্যে জ্যোতিচ্ছটা বা সূক্ষ্মভূত শক্তিনিচয়ের সামান্য খেলা দেখিয়াই পরিতৃপ্ত। ধর্ম্মের আবরণে আপনার স্বরূপ আবৃত করিয়া, কেহ বা ব্যবসাদারী আরম্ভ করিয়াছে বিশেষ অনুসন্ধানে ব্রহ্মচারী দেখিলেন যে, সকল সম্প্রদায়ই প্রায় মুমূর্ষু—আপনা আপনিই মরিতে বসিয়াছে; ভুলিয়াছে যে সকলেরই লক্ষ্য শ্রীভগবান। তাই সকলেরই সকল সম্প্রদায়ের উপরে যাইবার চেষ্টা—সকলেরই প্রয়াস, আমাদের দল বৃদ্ধি হউক—আমাদের দল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এক সম্প্রদায় স্পষ্টতঃই ব্রহ্মচারীকে বলিলেন যে, আমাদের এই আশ্রমের সভ্য হইলে অদ্ভুত যোগ-বিদ্যা লাভ হইবে—কুণ্ডলিনী জাগ্রত হইবে—তৃতীয় নয়ন খুলিয়া যাইবে। কিছুক্ষণ আলাপে তিনি বুঝিলেন যে, সারসত্য এখন অন্তর্হিত; কেবল আবরণ লইয়াই মারামারি। এক দিবস মুণ্ডিত কেশ, তুলসী মালা শোভিত,

শুভ্রবস্ত্র পরিহিত জনৈক ভক্তপ্রবরের সহিত আলাপ করিয়া দেখিলেন, তাঁহারা স্বামী যুগলানন্দ নামক জনৈক ব্যক্তিকে অবতার খাড়া করিয়া একটী নূতন দল প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় আছেন। ব্রহ্মচারী তর্কাদি করেন নাই ; তিনি ব্রহ্মচারীকে দলে লইবার আশায় অবতার সন্নিধানে লইয়া গেলেন। ব্রহ্মচারী সে আশ্রমে গিয়া একটী নব যুবতী সন্দর্শনে কিঞ্চিৎ আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ;—ভাবিলেন হায়! হায়। ইনিই সেই মহাপ্রভুর অবতার! যিনি মাধবীর নিকট ভিক্ষাহেতু হরিদাসকে বর্জ্জন করেন,—"সন্ন্যাসী হইয়া করে প্রকৃতিভাষণ, স্বপ্নেও তার মুখ আমি না করি দর্শন" ইহা যাঁহার মুখের বাণী, আজ তাঁহার অবতার কিনা নায়িকার মন্দিরে শুভ্র গালিচার উপর দুগ্ধ-ফেণনিভ শয্যায় উপবিষ্ট! ব্রহ্মচারী বাহির হইতে দর্শন করিয়াই প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন—সে ব্যক্তির কথা শুনিলেন না এবং সেই দিন হইতে কেবল মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এখন উপায় কি? যে পথের আদি ও অন্ত শ্রীভগবান সে পথ বাস্তবিকই ঢাকা পড়িয়াছে। সকল পথেই 'আমি' প্রতিষ্ঠা লাভ করিতেছে। তাঁহার বেশ বিশ্বাস জন্মিল যে শ্রীভগবানে 'অহং'-বুদ্ধি ও স্মৃতি পরিস্থাপিত করিয়া, জাগ্রতাদি অবস্থাত্রয়ের ভিতর দিয়া অনুস্যূত এক 'আমির' স্থাপন, ইহা জীব একেবারে ভুলিবার উপক্রম। হৃদয়ে অনুভূত এই কথা তাঁহার সহচরদিগকেও জানাইলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কিরূপে এই ভাবটী পুনঃস্থাপিত হইবে, কিরূপে জীব সকল কার্য্যের ভিতর দিয়া ভগবানকে ইঙ্গিত করিবে! তিনি এই চিন্তায় বিভোর, সন্ধ্যাকালে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া নীরবে একপার্শ্বে বসিয়া আছেন, অনেকেই তাঁহাকে লক্ষ্য করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাঁহার আকৃতি স্বভাবতঃই আকর্ষক, তদুপরি তাঁহার জটা-বিলম্বিত মসৃণ ও সমুজ্জল কেশগুচ্ছ পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত আচ্ছন্ন করিয়া অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। ললাট প্রদেশ ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও তাহার ভিতর দিয়া জ্ঞানের সহিত বিনয়ের ছটা যেন নির্গত হইতেছে। বদনমণ্ডলে চিন্তার আভা বিদ্যমান থাকিলেও প্রীতি ও সন্তোষে সমুদ্ভাসিত। বিশাল বক্ষে তুলসী ও রুদ্রাক্ষের মালা বিলম্বিত, দেহের বর্ণের উপর গৈরিক-রাগ রঞ্জিত বসন, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিণত ও ব্রহ্মচর্য্যের তেজ যেন সর্ব্বাঙ্গ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তিনি আপন মনে উচ্চকণ্ঠে গাহিতেছেন,—

তুষার মণ্ডিত হিমাদ্রির শির, বিগলিত হ'য়ে পীযুষ ধারা।
বহিয়া চলেছ নিবৃত্তিরূপা, পতিতপাবনী ত্রিলোক-তারা॥

স্থাবরের মধ্যে হিমালয় যাঁর, অদ্ভুত বিভূতি গীতায় কয়।
তাঁহারি বিভূতি নীল মহোদধি, যেথায় পুনঃ মা হতেছ লয়॥
কুলু কুলু নাদে জগত মাতায়ে, অবিরাম গতি চলেছ সদা।
ভক্তি, প্রেম ও সুখের সম্পদ, চিরদিন তোমার তটেতে বাঁধা॥
যজ্ঞ করিয়া জগত স্রষ্টা, তোমার তটেতে রাখিল খ্যাতি।
আজও নরলোক ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে হের আনন্দে মাতি॥
তোমার এ ধারা যে যে দেশ হয়ে হয় প্রবাহিত—শাস্ত্রের বাণী।
সিদ্ধক্ষেত্র* বলি হয় তারা খ্যাত, সে দেশ হয় যে দেশের রাণী॥
যমুনা সঙ্গমে প্রয়াগ তীর্থ—কাশী বিশ্বেশ্বর বরুণা আসি।
বিন্ধ্য অচল পবিত্র করিয়া, আপন মনেতে চলেছ হাসি॥
তোমার তটেতে শ্রীনবদ্বীপে, এ ঘোর কলির দুঃখের দিনে।
জনম লভিলা মানব রূপেতে, শ্রীভগবান পার্ষদ সনে॥
কোথা ছল ছল, কোথা কল কল, কোথা বা ধায় প্রশান্ত ধীর।
কখনও উত্তরে, কখন দক্ষিণে, প্রবাহিত তব পবিত্র নীর॥
ধন্য বঙ্গদেশ, ধন্য বিহার, ধন্য উত্তর পশ্চিম দেশ।
পবিত্র করিয়া চলেছ সদাই, মহিমা বলিয়া হয় না শেষ॥
ধন্য আমরা জন্মেছি মাগো, তোমার ক্ষেত্র এই পবিত্র কূলে।
(আবার) যেন মা লভিগো জনম, তোমার তটেতে এ দেহ গেলে॥

গীত সমাপ্ত হইল—সন্ন্যাসী নীরব। সন্ন্যাসীর মূর্ত্তি ও গীত অনেককেই আকর্ষণ করিয়াছে। কয়েকটী যুবক তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসী চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র তাঁহারা প্রণাম করিলেন। তিনি নমো নারায়ণায় বলিয়া প্রতি প্রণাম করিলেন। অনেকের মনে কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও, সাহস করিয়া কেহই বলিতে চায় না। একজন অনুসন্ধিৎসু যুবক বলিলেন,—"মহাত্মন্! আপনার বদনের ও দেহ-কান্তি দেখিয়া আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া মনে হইতেছে। আশা করি আমাদিগকে কিঞ্চিৎ উপদেশ করিবেন! আপনার আশ্রম কোথায় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

সন্ন্যাসী। আমাকে মহাপুরুষ সম্বোধন করিবেন না; আমি তাঁহাদের চরণের ভৃত্য মাত্র। মহাত্মা তাঁহারাই, যাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্য ও ভাব

* যত্র গঙ্গা মহা রাজ্য স দেশস্তৎ তপোবনং।

জীব-হৃদয়ে শ্রীভগবানের ভাব ও মহিমাস্ফুরিত করে—যাঁহাকে দেখিলে মনুষ্য বুদ্ধি ভুলিয়া শ্রীভগবানের আভাষ ফুটিয়া উঠে, সেই মহাত্মা নাম অচল রূপে ভেদ-ভাবাপন্ন আমাদের মত জীবে সংযোগ করা আমি উচিত মনে করি না। মহাত্মারা মুক্ত পুরুষ 'আমরা ত' বিশিষ্ট 'অহং'-কেন্দ্রেই মোহিত।' যাঁহারা বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ প্রভৃতি অবস্থাত্রয়কে ভেদভাবে দেখে', তাঁহারাও সে নামের যোগ্য নহেন। একক দেখিতে না পাইলে মহাত্মা' আখ্যা বিড়ম্বনা। আমাকে মহাত্মা ভাবিয়া আত্ম-প্রতারিত হইবেন না। আর উপদেশের কথা যাহা বলিলেন, সে বিষয়েও বড় কঠিন সমস্যা; কারণ আমার এখনও শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় নাই, কেবল আরম্ভ করিয়াছি মাত্র, তবে আমার জ্ঞানে যতটুকু ফুটে, ততটুকু বলিতে পারি। আশ্রম সম্বন্ধে কোন নির্দ্দিষ্ট আশ্রম আমার নাই। কিছুদিন হইতে আমি এই গ্রামেই আসিয়াছি, একটী মন্দিরে আশ্রয় লইয়াছি। কোন এক মহাত্মার আদেশ প্রতিপালন করিতে আমি এখানে আসিয়াছি।

যুবক। আমরা যুবক মাত্র; সুতরাং আপনার উদ্দেশ্য জানিতে সাহস হয় না।

সন্ন্যাসী। সাহস হইবে না কেন; আমায় যিনি পাঠাইয়াছেন, তিনি এই কাশীতে একটী সেবাশ্রম ও তৎসঙ্গে মহাদেবীর প্রতিষ্ঠা করিতে বলিয়াছেন। জানি না কতদূর সফলকাম হইব।

যুবক। সেবাশ্রম সংকল্প অতীব মহান্। অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গদিগের সেবা-কল্পে জীবন উৎসর্গ হৃদয়ের উৎকর্ষতার পরিচয়। অবশ্য এ মহৎ কার্য্যের সহায়তার অভাব হইবে না। আপনার এই কার্য্যে আমরাও সম্পূর্ণরূপে যোগদান করিতে প্রস্তুত আছি। কিছুদিন হইতে আমরা কয়েক জন মিলিয়া ঐরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছি। আপনার কর্ত্তৃত্বাধীনে সে কার্য্য করিতেও প্রস্তুত আছি; কিন্তু মহাদেবীর প্রতিষ্ঠার কথা বুঝিতে পারিলাম না।

সন্ন্যাসী। মাকে না বুঝিলে চলিবে কেন ভাই! মা যে সকলের মা! সেই মায়ের প্রতিষ্ঠা না হইলে—সেই মাকে না চিনিলে ভাই, ভাইএর সহিত ভাইএর সম্বন্ধ স্থাপন হইবে কিরূপে? মা যে আমার জগতব্যাপিনী—ঐ যে শ্যামস্তমালক্রমের ভিতর দিয়া মায়ের ছটা,—ঐ যে সান্ধ্য-গগণের ভিতর দিয়া মায়ের জ্যোতি ফুটিয়া বাহির হইতেছে,—ঐ যে দ্রুমদল-শোভিনী

অরণ্যের মধ্যে দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত অকুল মহা সমুদ্রের নীলিমা-শোভায় মায়ের রূপ ঝলকিয়া উঠিতেছে! এই সর্ব্বব্যাপিনী মায়ের প্রতিষ্ঠা ভিন্ন সেবা-ধর্ম্ম স্থাপন করিবে কিরূপে ?

যুবক। আপনি যে বিরাট্‌ ভাবের কথা বলিলেন, সে অতি উচ্চ সাধনার কথা; এ কথার সহিত আমাদের কোন মতভেদ নাই। তবে আপনি যে কালী মূর্ত্তির কথা বলিলেন, উহার আবশ্যকতা কি ?

সন্ন্যাসী। ক্ষতি কি ভাই! মূর্ত্তিখানি ভাল করিয়া দেখ দেখি, মহাকাল শবাকারে মায়ের চরণতলে নীরব—নীস্তব্ধ ভাবে শুইয়া আছেন; ঐ কালের বক্ষে অট্টহাসিনী লীলাময়ীর কি অপূর্ব্ব নৃত্য! এক হস্তে বরাভয়—অন্য হস্তে অসি! একদিকে "পরিত্রাণায় সাধুনাং" অন্য দিকে "বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং"। মায়ের প্রতিষ্ঠা না হইলে সেবা-ধর্ম্মের ভিতরে যে 'আমির' প্রতিষ্ঠা হইয়া যাইবে। সেই মায়ের সন্তান হইয়া—সেই মায়ের স্নেহ-পীযূষ ধারায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া–সেই মাকে ভুলিয়া যাইব? ঐ দেখ, মা ক্ষুধিতের ক্ষুধারূপে—তৃষ্ণাতুরের তৃষ্ণারূপে তোমার নিকট উপস্থিত। ক্ষুধিতকে অন্ন দাও—তৃষ্ণাতুরকে জল দাও—মায়ের সেবা কর। এই সেবাই পরম ধর্ম্ম! এস ভাই! তোমাদের সহিত আজ এক প্রাণে মিশিয়া এই মহান্‌ কার্য্যে ব্রতী হই;——

সন্ন্যাসী বাহ্য-জ্ঞান লুপ্তপ্রায়। তিনি সে ভাব সম্বরণ না করিয়াই কত কি বলিয়া চলিলেন। সে ভাব-তরঙ্গ ভাগীরথীর পূত ধারার মত কতক্ষণ চলিল, সন্ন্যাসী তাহা বুঝিতে পারিলেন না। যখন প্রকৃতিস্থ হইলেন, তখন বলিলেন,—"ভাই সব, আমার চপলতা মার্জ্জনা করিবেন, আমি কি বলিতে কি বলিলাম সবই ভুলিয়া গিয়াছি।

যুবক। আপনি ঠিকই বলিয়াছেন। আমরা অতি হতভাগ্য, তাই এ পর্য্যন্ত পথ খুঁজিয়া পাই নাই। অদ্য রাত্রি অনেক হইয়াছে, এক্ষণে চলুন উঠা যাক্‌। আশা করি কাল এই স্থানেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে।

অদূরে দুইটী বৃদ্ধ একদৃষ্টে সন্ন্যাসীর দিকে চাহিয়া ছিলেন; এতক্ষণ সকল কথা শুনিলেন। সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব ভাবে তাঁহারা দুই জনেই মুগ্ধ। এত রাত্রি হইয়াছে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। সন্ন্যাসী ও যুবকেরা চলিয়া গেলে, তাঁহারাও স্ব স্ব গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। একজন অপরকে বলিলেন, দেখ ভাই, আমি অনেক সন্ন্যাসী দেখিতে পাই বটে, কিন্তু এমন

সরল শিশুর মত অমায়িক ভাব আর কোথাও দেখি নাই। আমার মন যেন আবার তাঁহারি নিকট যাইতে চায়। কাল সকাল করিয়া এখানে আসিব এবং আমার যাহা সাধ্য এই নবীন সন্ন্যাসীকে সাহায্য করিব। এ পর্য্যন্ত কোন সৎ কার্য্যই করা হয় নাই; জীবনের দিন কয়টা প্রায় ফুরিয়ে এল। আর অর্থ নিয়েই বা কর্ব্ব কি, সন্ন্যাসীর উদ্দেশ্য অতি সৎ; দিন কয়েক আলাপ ক'রে দেখা যাক।

দ্বিতীয় ব্যক্তি। বেশ কথা; তবে সহসা অতদূর এগিয়ে যেও না; দুই একদিন বেশ করে দেখ। দেখে প্রাণে যা বল্‌ছে তাতে এ যেন সত্য সত্যই সাধন-সম্পন্ন ব্যক্তি।

প্রথম ব্যক্তি। আমার ত' ঠিক বিশ্বাস! আমার মত কৃপণ প্রকৃতি অর্থ-গৃধ্নুর হৃদয় সহজে গলে না। এখন সে সব কথা যাক্, কাল সকাল সকাল আসা যাবে।

(ক্রমশঃ)

অর্ঘ্য] পৃথিবী ও গ্রহগণের ভ্রমণ।

ভারতবর্ষে গ্রহগণের ভ্রমণ বিষয়ে দুইটী মত প্রসিদ্ধ আছে। প্রথম মত পৃথিবী স্থির, তাঁহার চতুর্দ্দিকে সূর্য্যাদি গ্রহগণ ভ্রমণ করেন। দ্বিতীয় মত সূর্য্য স্থির তাঁহার চতুর্দ্দিকে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহগণ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। প্রথম মতবাদীগণ প্রত্যেক গ্রহ পূর্ব্বদিক গমন করিতে করিতে যত সংখ্যক সাবন দিনে পৃথিবীকে একবার আবর্ত্তন করেন, সেই সাবন দিনাদির সংখ্যা দ্বারা রাশিচক্রের পরিমাণ ৩৬০ অংশকে ভাগ করিয়া, ভাগলব্ধ প্রত্যেক গ্রহের এক দিনের গতিকে মধ্যম গতি ও তাদৃশ মধ্য-গতি হইতে অনুপাত দ্বারা অভীষ্ট দিনে রাশিচক্রে গ্রহগণের অবগত স্থানকে মধ্য-গ্রহ বলেন। তাঁহাদিগের মতে রবি, বুধ ও শুক্র এক বৎসরে পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে একবার ভ্রমণ করেন; এজন্য ইঁহাদিগের মধ্য-গতি ও মধ্য-স্থান তুল্যই হইয়া থাকে।

দ্বিতীয় মতবাদীগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে প্রত্যেক গ্রহের একবার ভ্রমণের কাল দ্বারা ৩৬০ অংশকে বিভাগ করিয়া মধ্য-গতি ও তাদৃশ মধ্যম গতি হইতে অনুপাত দ্বারা অভীষ্ট দিনের মধ্যম স্থান নির্ণয় করেন। তাঁহাদিগের মতে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একবার পরিভ্রমণ কালের ভিন্নতা হেতু বুধ ও শুক্রের মধ্যম গতি ও মধ্যম স্থান পরস্পর ভিন্ন হইয়া থাকে। বুধ ও শুক্র কখনও পৃথিবী ও সূর্য্যের

মধ্যবর্ত্তী স্থানে, কখন পৃথিবী ও সূর্য্য উভয়কেই আবর্ত্তন করেন। এজন্য তাঁহাদিগের এইরূপ মধ্যম গতি ও মধ্যম স্থান নির্ণয়ে প্রথম ও দ্বিতীয় মতবাদীগণের মতের ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। কিন্তু মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই গ্রহের ভ্রমণ পথ বৃহৎ হেতু তাঁহারা পৃথিবী ও সূর্য্যের অন্তরে কখনই ভ্রমণ করেন না; পৃথিবী ও সূর্য্য উভয়কেই একেবারে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকেন। এই নিমিত্ত তাঁহাদের মধ্যম গতি ও মধ্যম স্থান উভয় মতেই তুল্য।

যখন আর্য্য ভটের সিদ্ধান্ত ও তাহার সম-সাময়িক কালে সূর্য্য সিদ্ধান্ত প্রণীত হয়, তাহার বহু পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষীয় সিদ্ধান্ত গ্রন্থকারগণ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহগণের ভ্রমণ স্বীকার করিয়াই তাঁহাদিগের ভগণ সংখ্যা অর্থাৎ এককল্পে সৃষ্টির আরম্ভ হইতে সৃষ্টির লয় পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট বৎসরে গ্রহগণ যতবার রাশিচক্র আবর্ত্তন করেন, তাহার সংখ্যা ও গ্রহগণের পাতের ভগণ সংখ্যা (পাত যতবার রাশিচক্র ভ্রমণ করে তাহার সংখ্যা) নির্ণয় করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধে তাহাই প্রতিপাদন জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

ক্রান্তি-বৃত্তে (Ecliptic) সূর্য্য বা পৃথিবী ভ্রমণ করেন। অন্যান্য গ্রহগণের পৃথক পৃথক ভ্রমণের পথ আছে, তাহাকে সেই সেই গ্রহের বিমণ্ডল বা কক্ষা (orbit) বলে। ক্রান্তি-বৃত্তের সহিত বিমণ্ডলের সম্পাত স্থানের নাম সেই সেই গ্রহের পাত (Node)। দুইটি বৃহৎ বৃত্তের এক সম্পাত হইতে ১৮০ অংশ (Degree) অর্থাৎ ৬ রাশি অন্তরে পুনর্ব্বার সম্পাত হইয়া থাকে; ইহা জ্যামিতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। ক্রান্তি-বৃত্ত ও বিমণ্ডলের এক সম্পাত হইতে ৬ রাশি অন্তরে পুনর্ব্বার সম্পাত হইয়া থাকে; সুতরাং উভয়ই পাত-স্থান। গ্রহগণ নিজ নিজ বিমণ্ডলে ভ্রমণ করিলেও ক্রান্তি-বৃত্তেই তাঁহাদের স্থান গণিত হয়। বিমণ্ডলস্থ গ্রহ বিম্ব-কেন্দ্র হইতে ক্রান্তি-বৃত্তের উপর লম্বপাত করিলে, ঐ ক্রান্তি-বৃত্তের যে স্থানে সংলগ্ন হয়, মেষের আদি বিন্দু হইতে সেই স্থানের রাশি অংশ কলাদিরূপ দূরত্বকে স্ফুটগ্রহ এবং বিমণ্ডল ও ক্রান্তি-বৃত্তের মধ্যবর্ত্তী ঐ লম্বকে বিক্ষেপ, ক্ষেপ বা শর বলে। পাত-স্থানদ্বয়ে ক্রান্তি-বৃত্ত ও বিমণ্ডলের অন্তর না থাকায়, সে স্থানে কোন গ্রহ থাকিলে তাঁহার বিক্ষেপ থাকে না। পাত স্থান হইতে ৯০ অংশ (তিনরাশি) অন্তরে পরম বিক্ষেপ হইয়া থাকে। অন্যত্র অনুপাত অনুসারে বিক্ষেপ নির্ণীত হয়। সুতরাং পাত হইতে গ্রহের অন্তর জানা আবশ্যক। গ্রহদিগের পূর্ব্ব-গতি অর্থাৎ মেষ, বৃষ, মিথুন ইত্যাদি ক্রমে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করেন; কিন্তু পাতের পশ্চিম-গতি অর্থাৎ পাত মেষ, মীন,

কুম্ভ ইত্যাদি ক্রমে রাশিচক্র পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন। সুতরাং মেষাদি হইতে পাতের পরিমাণে বিমণ্ডলীয় গ্রহ (শীঘ্র প্রতি-মণ্ডলীয়) অর্থাৎ মন্দ-স্পষ্ট (Heliocentric planet) গ্রহের পরিমাণ যোগ করিলে, পাত ও গ্রহের অন্তর জানা যায়। তাহার নাম বিক্ষেপ-কেন্দ্র। মহামতি ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

মন্দ স্ফুটো দ্রাক্ প্রাত মণ্ডলেচ, গ্রহো ভ্রমত্যত্রচ তস্য পাতঃ।

পাতেন যুক্তাং গণিতাগতেন, মন্দস্ফুটাৎ খেচরতঃ শরোহস্মাৎ ॥

মধ্য-গ্রহে মন্দ ফল* নির্দ্দিষ্ট নিয়মে যোগ বা বিয়োগ করিলে মন্দ-স্পষ্ট গ্রহ হয়। মধ্যম কুজ, গুরু ও শনি উভয় মতেই তুল্য, সুতরাং তাঁহারা মন্দ ফল সংস্কৃত হইলেও সমান থাকে। কিন্তু মধ্যম বুধ ও শুক্র প্রথম মতে মধ্যম সূর্য্য তুল্য। দ্বিতীয় মতে সিদ্ধান্ত গ্রন্থোক্ত শীঘ্রোচ্চ তুল্য। যেহেতু দ্বিতীয় মতে বুধ কিঞ্চিন্ন্যূন অষ্টাশীতি সাবন দিনে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে একবার পরিভ্রমণ করেন। সুতরাং দৈনিক মধ্যগতি অংশাদি ৪।৫।৩২।২১ শুক্র কিঞ্চিন্ন্যূন ২২৪ দিন ৪৫ দণ্ডে একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করেন। এ নিমিত্ত তাঁহার দৈনিক মধ্যগতি অংশাদি ১৩৬।৭।৪৪ ইহা সিদ্ধান্ত গ্রন্থে শীঘ্রোচ্চ গতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ঐরূপ শীঘ্রোচ্চ গতি হইতে অনুপাত দ্বারা অভীষ্ট দিনে যে স্থান অবগত হওয়া যায়, তাহাকে প্রথম মতবাদীগণ শীঘ্রোচ্চ, দ্বিতীয় মতবাদীগণ মধ্য-গ্রহ বলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে মধ্য-গ্রহে মন্দ ফল সংস্কার করিলে, মন্দ-স্পষ্ট গ্রহ ও তাহাতে পাত যোগ করিলে, বিক্ষেপ-কেন্দ্র হয়। কুজ, গুরু ও শনির গণিতাগত পাত সিদ্ধান্তকারগণ মন্দ ফল সংস্কৃত মধ্য-গ্রহেই যোগ করিয়াছেন। কিন্তু বুধ ও শুক্রের গতি মন্দ ফল সংস্কৃত মধ্য-গ্রহে যোজনা করিয়া মন্দ ফল সংস্কৃত শীঘ্রোচ্চ যোগ করিয়াছেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, শীঘ্রোচ্চই সূর্য্য-কেন্দ্রে ভ্রমণ-বাদীগণের মতে মধ্য-গ্রহ। সুতরাং বুধ ও শুক্রের শীঘ্রোচ্চে মন্দ ফল সংস্কার করিলেই, বাস্তবিক মধ্য-গ্রহে মন্দ ফল সংস্কার হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায় সূর্য্য-কেন্দ্র ভ্রমণ স্বীকার করিয়াই বুধ ও শুক্রের গতি ভগণাদি পঠিত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন ;—

"চলাদ্বিশোধ্যাঃ কিল কেন্দ্র সিদ্ধ্যৈ কেন্দ্র স পাতে হ্যচরস্ত যোজ্য.।

অতশ্চলাৎ পাতযুতাৎ জ্ঞ ভৃগ্বোঃ সুধীভিরাদ্যৈঃ শরসিদ্ধিরুক্তাঃ ॥"

---

* যদিও পূর্ব্বাচায্যগণ দীর্ঘ বৃত্তাকার পথে গ্রহদিগের ভ্রমণের কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই, তথাপি তাঁহারা ফল নির্ণয় করিবার জন্য দুইটী কেন্দ্র স্বীকার করিয়াছেন। তাহা স্থি প্রবন্ধান্তরে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এক কল্পের চল অর্থাৎ শীঘ্রোচ্চ ভগণ হইতে মধ্য-গ্রহ ভগণ বিয়োগ করিলে, শীঘ্র-কেন্দ্র ভগণ হয়। তাহা হইতে অভীষ্ট দিনে অনুপাতলব্ধ শীঘ্র-কেন্দ্র পাত ও মন্দ-স্পষ্ট যোগ করিলে, বুধ ও শুক্রের বিক্ষেপ কেন্দ্র হইয়া থাকে। যথা—শীঘ্রোচ্চ—মধ্য-গ্রহ=শীঘ্র-কেন্দ্র। শীঘ্রকেন্দ্র+পাত+মন্দ-স্পষ্ট=বিক্ষেপ-কেন্দ্র। মন্দ-স্পষ্ট=মধ্য-গ্রহ+মন্দ ফল বিক্ষেপ-কেন্দ্র=শীঘ্রোচ্চ—মধ্য-গ্রহ+মন্দফল+পাত। বুধ ও শুক্রের বিক্ষেপ-কেন্দ্রে=শীঘ্রোচ্চ+মন্দফল+পাত। বিক্ষেপ-কেন্দ্র=মধ্যগ্রহ+মন্দফল+পাত। বুধ ও শুক্রের শীঘ্রোচ্চ সূর্য্য-কেন্দ্র ভ্রমণ-বাদীগণের মতে মধ্য-গ্রহ তুল্য। অতএব বুঝা যাইতেছে সূর্য্য-কেন্দ্রে ভ্রমণ স্বীকার করিয়াই আদ্যাচার্য্যগণ বুধ ও শুক্রের গতি ও ভগণাদি নির্ণয় করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালের যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রন্থের ন্যায়-সিদ্ধান্ত গ্রন্থ সে সময় ছিল না; সুতরাং তাঁহাদিগের অভিপ্রায় বুঝা বড়ই দুষ্কর ছিল। এজন্য পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তকারগণ নানারূপ কল্পনা করিয়াছেন। ব্রহ্ম-সিদ্ধান্ত ভাষ্যকার লিখিয়াছেন;—"জ্ঞ শুক্রয়োঃ শীঘ্রোচ্চ স্থানে যাবান্ বিক্ষেপস্তাবানেব যত্র তত্রস্থস্যাপি গ্রহস্য ভবতি। অত্র উপলব্ধিরেব বাসনা নান্যৎ কারণং বক্তুং শক্যতে"।

চতুর্ব্বেদাচার্য্য বলিয়াছেন, এ বিষয়ে উপলব্ধিই প্রমাণ। সিদ্ধান্ত-চূড়ামণি প্রণেতা শীঘ্র-কেন্দ্র ভগণ ও পাত-ভগণের সমষ্টি তুল্য পাত-ভগণ স্বীকার করিয়া স্বীয় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন;—

"যে চাত্র পাত-ভগণাঃ পঠিতা জ্ঞ ভৃগ্বো স্তে শীঘ্র-কেন্দ্র ভগণৈরধিকা যতঃ স্যুঃ।
স্বল্পাঃ সুখার্থ মুদিতাশ্চল কেন্দ্রযুক্তৌ পাতৌ তয়োঃ পঠিত চক্রভবৌ বিধেয়ৌ॥"

বুধ ও শুক্রের শীঘ্র-কেন্দ্র ভগণে পাত-ভগণ যোগ করিলে, বাস্তবিক পাত-ভগণ হয়। কিন্তু গ্রন্থে যে অল্প ভগণ পঠিত হইয়াছে, তাহা পাত-সাধনের সুবিধার জন্যই, অর্থাৎ গ্রহ-সাধনের জন্য কেন্দ্র-সাধন করিতেই হয়। অল্পে পাত-ভগণ পঠিত হইলে, ত্রৈরাশিক দ্বারা অল্প পরিশ্রমে পাত-সাধন করিয়া কেন্দ্রে যোগ করিলেই হইল। সিদ্ধান্তকারগণ কেহই বুধ ও শুক্রের পাত-ভগণ বিষয়ে কোন যুক্তিযুক্ত উপপত্তির বর্ণনা করেন নাই। সূর্য্য-কেন্দ্রে ভ্রমণ ব্যতীত ইহার উপপত্তি হয় না। কুজ, গুরু ও শনির পাত-ভগণ উভয় মতে উপপন্ন হইলেও তাঁহাদেরও সূর্য্য কেন্দ্রে ভ্রমণ আদ্যাচার্য্যগণের অভিপ্রেত তাহাই দেখান যাইতেছে। সিদ্ধান্তকারগণ বলিয়াছেন, মধ্যম সূর্য্যই, কুজ, গুরু ও শনির শীঘ্রোচ্চ। যথা ভাস্করাচার্য্য।—

"অত এব শনি জীব ভূ-ভুবাং কীর্ত্তিতাশ্চগণৈশ্চলোচ্চ জাঃ।

ভূমি হইতে অতি দূরবর্ত্তী গ্রহ-কক্ষার স্থান বিশেষকে উচ্চ স্থান বলে। ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন ;—

"উচ্চস্থিতো ব্যোম চরঃ সুদূরে, নীচস্থিতঃস্যান্নিকটে ধরিত্র্যাঃ।"

সকল রেখা অপেক্ষা কেন্দ্র-গামী রেখা বৃহৎ; ইহা জ্যামিতি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। শীঘ্র ফল নির্ণয় জন্য যে কেন্দ্রদ্বয় কল্পিত হয়, সেই কেন্দ্রদ্বয় গামী যেস্থানে গ্রহ কক্ষা প্রদেশে সংলগ্ন হয়, তাহাই অতি দূরবর্ত্তী, তাহাকে শীঘ্রোচ্চ স্থান বলে। সেই রেখা রবির কেন্দ্রগত না হইলে, রবি তাহাদের শীঘ্রোচ্চ অর্থাৎ রবির সম্মুখ-বর্ত্তী প্রদেশ শীঘ্রোচ্চ ইহা কিরূপে বলা যাইতে পারে? অতএব বুঝা যাইতেছে, গ্রহগণ যে পথে (কক্ষায় ভ্রমণ করেন, তাহার কেন্দ্র-সূর্য্য অর্থাৎ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে গ্রহগণ ভ্রমণ করেন। সূর্য্য-কেন্দ্রে গ্রহগণের ভ্রমণ আদ্যাচার্য্য-গণের অভিপ্রেত হইলেও, তাঁহারা লোকদিগের প্রতীতি ও সহজে গোল-স্থিতি বুঝাইবার জন্য পৃথিবীর গতি সূর্য্যে আরোপ করিয়াছেন। সূর্য্য প্রাতঃকালে পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া সায়ংকালে পশ্চিম দিকে অস্ত যান। রাত্রিতে সূর্য্য ব্যতীত অন্য গ্রহ ও নক্ষত্রগণকে পূর্ব্বদিক হইতে পশ্চিম দিকে গমন করিতে দেখা যায়। গ্রহগণ মেষ, বৃষাদি রাশি ভ্রমণ করেন ইত্যাদি যাহা লোকে সহজ কল্পনাতে বুঝিতে পারে, সেইরূপেই বুঝাইয়াছেন। এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে, সকল গ্রহ সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলেও, সূর্য্য স্বয়ং পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করেন; পৃথিবী স্থির এরূপ বলা যাইতে পারে।

পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে সূর্য্যের ভ্রমণ ও পৃথিবীকে স্থির স্বীকার করিলে, সূর্য্য-কেন্দ্রে ভ্রমণকারী গ্রহ ও নক্ষত্রগণের পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ অগত্যা স্বীকার করিতে হয়। সকলের ভ্রমণ স্বীকার অপেক্ষা পৃথিবীরই ভ্রমণ স্বীকার লাঘব। পৃথিবীর গতি ও সূর্য্যের কল্পিত গতি সমান, মন্দ ফল সাধন-প্রণালীও তুল্য, সুতরাং সূর্য্যের সমান গতিতে ক্রান্তি-বৃত্তে পৃথিবীর ভ্রমণই গ্রহগণের ভগণ নির্ণয়কারী আদ্যাচার্য্যগণের অভিপ্রেত এরূপ স্বীকারই যুক্তিযুক্ত। মহামতি আর্য্যভট্ প্রথমে ইহার উপলব্ধি করেন; তিনিই প্রথমে স্পষ্টভাবে পৃথিবীর ভ্রমণ মত স্বীয় গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তি এই ;—

"অনুকূল গতির্নৌস্থঃ পশ্যত্যচলং বিলোম্যাং যদ্বৎ।
অচলানিভানি তদ্বৎ সম পশ্চিমগাণি লঙ্কায়াং॥"

গতিশীল নৌকার আরোহিগণ যেরূপ তীরস্থ পর্ব্বতকে ও নৌকার বিপরীত

দিকে গমনকারী বিবেচনা করেন, তদ্রূপ পৃথিবী পশ্চিম দিক হইতে পূর্ব্ব দিকে গমন করিলেও আমাদিগের ধারণা নক্ষত্রগণই পশ্চিম দিকে যাইতেছেন।

আর্য্য ভটের পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তকারগণ যুক্তি-বিরুদ্ধ উপায়ে পৃথিবীর ভ্রমণ মত খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মগুপ্ত লিখিয়াছেন ;—

"আবর্ত্তনমুর্ব্ব্যাশ্চেন্নপতন্তি সমুচ্ছ্রয়াঃ কস্মাৎ"

পৃথিবীর যদি ভ্রমণ হইত, তাহা হইলে উচ্চ অট্টালিকাদি কেন পতিত হয় না? ব্রহ্মগুপ্তের এই মত যুক্তি-বিরুদ্ধ। কারণ আমরা দেখিতে পাই রেলগাড়ী প্রথম চলিবার সময় তদুপরিস্থ আরোহীগণের ও দ্রব্যাদির পতন সম্ভাবনা হইতে পারে। তৎপরে গতিশীল গাড়ীর সহিত আরোহীগণেরও সমান গতি হয়। সুতরাং গাড়ী চলিবার পর তাহাদের পতনের সম্ভাবনা থাকে না। গতিশীল পৃথিবীতে নির্ম্মিত উচ্চ অট্টালিকাদিরও পৃথিবীর সহিত সমান গতি হয়; এজন্য পতনের সম্ভাবনা নাই।

নল্লাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

"যদি চ ভ্রমতি ক্ষমা তদাস্বকুলায়ং কথমাপ্নুয়ুঃ খগাঃ।
ইষবোঽপি নভঃ সমুজ্ঝিতাঃ নিপতন্তঃস্যুরপাংপতের্দ্দিশি॥
পূর্ব্বাভিমুখে ভ্রমে ভুবো বরুণাশাভিমুখো ব্রজেদ্‌ঘনঃ।
অথ মন্দগমাত্তথা ভবেৎ কথমেকেন দিবাঃ পরিভ্রমঃ॥"

যদি পৃথিবীর গতি স্বীকার করা যায়, তবে পক্ষীগণ স্বীয় কুলায় হইতে উড্ডীয়মান হইলে, পূর্ব্বদিকে পৃথিবীর গমন হেতু পক্ষীগণ তাহাদের বাসায় আসিতে পারিত না। কোন একটী বাণ উর্দ্ধদিকে নিক্ষেপ করিলে, পৃথিবীর পূর্ব্ব গতির জন্য বাণটী অনেক দূর পশ্চিম দিকে ভূতলে পতিত হইবার সম্ভাবনা; কিন্তু তাহা হয় না। পৃথিবী পূর্ব্বদিকে গমন করিলে, মেঘ সকল সর্ব্বদাই পশ্চিম দিকে যাইত; কিন্তু অন্যদিকগামী মেঘও দৃষ্ট হয়। পৃথিবীর গতিও অল্প স্বীকার করা যায় না। অল্প হইলে কিরূপে একদিনে একবার অবর্ত্তন করিতে পারেন। পৃথিবীর সহিত বায়ুরও সমান গতি হইয়া থাকে; সুতরাং পৃথিবীস্থ প্রাণী ও দ্রব্যাদিরও সমান গতি হয়। এজন্য নল্লাচার্য্যের মতও যুক্তি-বিরুদ্ধ। শ্রীপতি লিখিয়াছেন ;—

যদ্যেব সম্বরচরা বিহগাঃ স্বনীড় মাসাদয়ন্তি ন খলু ভ্রমণে ধরিত্র্যাঃ।
কিঞ্চাম্বুদা অপি ন ভূরি পয়োমুচঃ স্যুর্দ্দেশস্য পূর্ব্ব গমনে ন চিরায় হন্তঃ।

ভূগোল বেগ জনিতেন সমীরণেন কেস্বাদয়োহপ্যপরদিগ্ গতয়ঃ সদা স্যুঃ।
প্রাসাদ ভূধর শিরাংস্যপি সংপতন্তি তস্মাদ্ ভ্রমত্যু ডুগণস্ত্বচলাচলৈব।

পৃথিবীর ভ্রমণ হইলে আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীগণ পুনর্ব্বার স্বীয় নীড়ে আসিতে পারিত না। এক স্থানে অধিক কাল বৃষ্টি পতন হইত না। সর্ব্বদাই পূর্ব্বদিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হইত; সুতরাং পতাকা সকল সর্ব্বদাই পশ্চিমাগ্র হইয়া উড্ডীন হইত। উচ্চ প্রাসাদ ও পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িত। অতএব পৃথিবী অচলা নক্ষত্রগণই গতিশীল। পৃথিবীর সহিত বায়ু অট্টালিকা পর্ব্বতাদির সমান গতি কথনের জন্য শ্রীপতির এই মত যুক্তি-বিরুদ্ধ।

পৃথিবীর ভ্রমণ মতবাদী আর্য্যভট্ ৩৯৮ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া ৪২১ শক অর্থাৎ কলির ৩৬০০ বৎসর অতীতে ২৩ বৎসর বয়সে সিদ্ধান্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ইহা তাহার গ্রন্থের কাল ক্রিয়া পাদের দশম শ্লোক হইতে জানা যায়।

"ষষ্ঠ্যব্দানাং ষষ্টির্যদা ব্যতীতাস্ত্রয়শ্চ যুগপাদাঃ।
ত্র্যধিকা বিংশতিরব্দাস্তদেহ মম জন্মনোঽতীতাঃ॥"

বর্ত্তমান প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্ত ও আর্য্যভট সিদ্ধান্তের নাম সাময়িক কালে রচিত। ইহাই মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিৎ গণের মত। সুধাকর দ্বিবেদী পঞ্চসিদ্ধান্তকার টীকায় লিখিয়াছেন,—সূর্য্যসিদ্ধান্ত রচনা কালস্তু নিত্যানন্দেন সিদ্ধান্ত রাজকৃতা। কালঃ ষট্ত্রিংশৎ শতস্মিতে অব্দগণে ব্যতীতে নিগদ্যতে। স কালস্তু আর্য্যভট্ সিদ্ধান্তস্য প্রসিদ্ধ এব। অতঃ সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ আর্য্যভট্ সিদ্ধান্ত সমকালিক এব সিদ্ধতি। বিভাতি চ তথ্যং নিত্যানন্দ প্রতিপাদিতং আর্য্যভটীয় সিদ্ধান্তে ন কুত্রাপি সূর্য্য সিদ্ধান্ত মত প্রতিপাদনাৎ সাম্প্রতং প্রচলিত সূর্য্যসিদ্ধান্তঃ কৃত যুগান্তকালিকঃ কেনচিদ স্তেন পকল্পিতো নবীনো বা ইতি স্ফুটমেব সূক্ষ্ম বিচার প্রবৃত্তানাং গণকানামিতি"।

আর্য্যভটের বহুকাল পূর্ব্বেই রবি-কেন্দ্রে গ্রহগণের ভ্রমণ আর্য্য ঋষিগণের মনে উদিত হইয়াছিল। তাঁহারা তদনুরূপই গ্রহগণের ভগণ ও তাপ-ভগণ নির্ণয় করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে সিদ্ধান্তকারগণ গণিতের সহিত দৃষ্টির একতা সম্পাদন জন্য ভগণের পরিমাণে কিছু প্রভেদ করিয়াছেন।

শ্রীরাধাবল্লভ জ্যোতিস্তীর্থ।
জ্যোতিষাধ্যাপক সংস্কৃত কলেজ।

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

২য় ভাগ। মাঘ ও ফাল্গুন ১৩২০। ১০ম ও ১১শ সংখ্যা।

মোক্ষ] জয়দেবকৃত দশাবতার স্তোত্র।

১।— প্রলয়পয়োধিজলে ধৃতবানসিবেদম্,
বিহিতবহিত্র চরিত্রমখেদম্।
কেশব ধৃতমীনশরীর, জয় জগদীশ হরে॥
প্রলয় পয়োধি জলে,
বেদ উদ্ধারিলে হেলে,
তরণী-চরিত্র (হরি) সম্পাদন ক'রে।
(কেশব) মীন দেহধারী, জয় জগদীশ হরে॥

২।— ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে,
ধরণিধরণকিণচক্র গরিষ্ঠে।
কেশব ধৃতকূর্ম্মশরীর, জয় জগদীশ হরে॥
ধরণী-ধারণ জাত,
ব্রণ চক্রে সুশোভিত,
অতীব বিপুল পৃষ্ঠে আছ ধরা ধ'রে।
(কেশব) কূর্ম্ম দেহধারী, জয় জগদীশ হরে॥

৩।— বসতি দশনশিখরে ধরণী তব লগ্না,
শশিনি কলঙ্ককলেব নিমগ্না।
কেশব ধৃতশূকররূপ, জয় জগদীশ হরে॥
দশন শিখর' পরে,
লগ্ন ধরা আছ ধ'রে

নিমগ্ন কলঙ্ককলা, যথা শশী ধরে।
(কেশব) শূকররূপিন্, জয় জগদীশ হরে ॥

৪।— তব করকমলবরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গম্,
দলিত হিরণ্যকশিপুতনুভৃঙ্গম্।
কেশব ধৃতনরহরিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
তব করপদ্মজাত,
নখ-শৃঙ্গে অদ্ভুত,
বিদারিলে হিরণ্যের তনু-ভৃঙ্গবরে।
(কেশব) নরহরিরূপী, জয় জগদীশ হরে ॥

৫।— ছলয়সি বিক্রমণে বলিমদ্ভুত বামন,
পদনখনীরজনিতজনপাবন।
কেশব ধৃতবামনরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
অদ্ভুত বামন হ'লে,
ছলিলে বলিকে বলে,
(তব) পদনখজাত নীরে জনগণ তরে।
(কেশব) বামনরূপিন্, জয় জগদীশ হরে ॥

৬।— ক্ষত্রিয়রুধিরময়ে জগদপগতপাপম্,
স্নপয়সি পয়সি শমিতভবতাপম্।
কেশব ধৃতভৃগুপতিরূপ, জয় জগদীশ হরে ॥
ক্ষত্র-রক্তময় নীরে,
জগতের পাপ হ'রে,
স্নান করাইলে ভবতাপ নাশ ক'রে।
(কেশব) ভৃগুপতিরূপী, জয় জগদীশ হরে ॥

৭।— বিতরসি দিক্ষু রণে দিক্‌পতি কমনীয়ম্,
দশমুখমৌলিবলিং রমণীয়ম্।
কেশব ধৃতরামশরীর, জয় জগদীশ হরে ॥
সব দিক্‌পতিগণে,
কাম্য বলি দিলে রণে,
দশানন শির রম্য উপহার তরে।
(কেশব) রামদেহধারী জয় জগদীশ হরে ॥

৮।— বহসি বপুষি বিশদে বসনং জলদাভম্,
হলহতিভীতিমিলিতযমুনাভম্।
কেশব ধৃতহলধররূপ, জয় জগদীশ হরে॥

বহ শ্বেত বপু পর,
জলদাভ নীলাম্বর,
(যেন) অঙ্গে লগ্ন যমুনাভা—হলাঘাত ডরে।
(কেশব) হলধররূপী, জয় জগদীশ হরে॥

৯।— নিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতম্,
সদয়হৃদয় দর্শিত পশুঘাতম্।
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

নিন্দা ক'রেছিল কত,
যজ্ঞবিধি বেদজাত,
সদয় হৃদয় পশু হিংসা দৃষ্টি ক'রে।
(কেশব) বুদ্ধদেহ ধারী, জয় জগদীশ হরে॥

১০।— ম্লেচ্ছনিবহনিধনে কলয়সি করবালম্,
ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্।
কেশব ধৃতকল্কিশরীর, জয় জগদীশ হরে॥

ম্লেচ্ছের নিধন হেতু,
সমতুল ধূমকেতু,
কি করাল করবাল ধরিয়াছ করে।
(কেশব) কল্কি দেহধারী, জয় জগদীশ হরে॥

১১।— শ্রীজয়দেব কবেরিদমুদিতমুদারম্,
শৃণু সুখদং শুভদং ভবসারম্।
কেশবধৃতদশবিধরূপ, জয় জগদীশ হরে॥

জয়দেব কৃতোদার,
শুন স্তুতি ভবসার,
সুখদ, শুভদ (ইহা জয়যুক্ত করে)।
(কেশব) দশরূপধারী, জয় জগদীশ হরে॥

১২।— বেদানুদ্ধরতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্বিভ্রতে,
দৈত্যং দারয়তে বলিং ছলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্ব্বতে।

পৌলস্ত্যং জয়তে হলং কলয়তে কারুণ্যমাতন্বতে,
ম্লেচ্ছান্ মূর্চ্ছয়তে দশাকৃতি কৃতে কৃষ্ণায় তুভ্যং নমঃ ॥

বেদ উদ্ধারিলে, জগৎ বহিলে,
ভূগোল ধরিলে চেলে।
দানব দলিলে, বলিকে ছলিলে,
ক্ষত্র বিনাশিলে বলে ॥
রাবণ বধিলে, হল ধ'রেছিলে,
দয়া বিতরিলে হায় !
ম্লেচ্ছ বিনাশিলে, দশরূপী হ'লে'
(হে) কৃষ্ণ নমি তব পায় ॥

মাক্ষ]

সাধনার পথে।*

(দ্বিতীয়ানুবৃত্তি)

আমাদের মহত্তর শক্তিগুলির অযথা ভাবে বা অবিচারপূর্ব্বক চালনা করা উচিত নয়। উহারা কোনও মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আছে এবং তদর্থে প্রয়োগ করিবার জন্যই উহাদিগকে রাখা উচিৎ।

নিশ্চয়ই তুমি অল্প দিনের মধ্যেই বিশেষ বিশেষ প্রকারের পরীক্ষায় যে বিশেষ বিশেষ ফললাভ করা যায়, তাহা দেখিতে পাইবে। যখন তুমি ইহাদের মৌলিক উদ্দেশ্য জানিতে পারিবে, তখন ইহাদের বিশেষরূপ সবিস্তারে জানিতে তোমার কোনও কষ্ট হইবে না। এক্ষণে এইমাত্র আমি বলিতে চাই যে, যে সময় তোমার মনে হইবে যে বিরুদ্ধ-শক্তি ও কুপ্রবৃত্তির তরঙ্গ তোমাকে পরাভূত করিতেছে এবং তোমায় বুঝি অবনতির নিম্নস্তরে ডুবাইয়া দিতেছে, তখন কদাপি এরূপ ভাবিয়া বসিওনা যে, তোমার আর কোনও গতি নাই; তুমি একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছ। অথবা তোমাকে উহারা একেবারেই অপবিত্র, কলুষিত ও অনধিকারী করিয়া তুলিয়াছে। কারণ ঐরূপ দৈত্যশক্তির চিন্তাই তোমাকে অধিকতর অভিভূত করিবার উপায় স্বরূপ হইয়া উঠিবে। জানিও তোমার এই শিক্ষা ও জ্ঞান লাভের জন্য মহাপুরুষেরা এই পরীক্ষাগুলি

* Dreamer প্রণীত On The Threshold নামক গ্রন্থের স্বাধীন ভাবে অনুবাদ এই নামে প্রকাশিত হইবে। ইহা সাধন-পথের বিশেষ উপযোগী। মূল গ্রন্থটীর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। পন্থা কার্য্যালয়ে এক টাকা মূল্যে প্রাপ্তব্য।

আনিতেছেন ; উহারা অবিদ্যা বিজৃম্ভিত মায়াজাল মাত্র। তুমি যদি বিশ্বাস ও ভক্তিবলে দৃঢ় হইয়া দাঁড়াইতে পার, তাহা হইলে স্বতঃই উহারা বিলীন হইয়া যাইবে।

যতদিন পর্য্যন্ত আমরা মানুষভাব অতিক্রম না করি, ততদিন এই ভেদ ভাবের বীজগুলি আমাদের প্রাকৃতিক বা হীন স্বভাবের (lower nature) সহিত জড়িত থাকে। তামসিক বা দৈত্য-শক্তিনিচয় ঐ বীজগুলি লইয়াই খেলা করে ; কখনও উহাদিগকে অসীম অপ্রমেয় করিয়া দেখায়, কখনও বা উহারা ভীষণ ও দুর্দ্দম্য এইরূপ প্রতীতি জন্মায়। এই বীজগুলি আমাদিগের মধ্যে আছে বলিয়া এবং তামসিক শক্তিসমূহ উহাদিগকে এরূপ বীভৎস আকারে দেখায় বলিয়াই, মহাপুরুষেরা আমাদিগকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতে ও ক্ষমা করিতে প্রস্তুত আছেন। উহাদের ভীষণ অভিঘাতের সময় ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে আমাদের সামান্য চেষ্টাও মহাফলপ্রসূ হয়। জানিও যে সাধনের পথে ঐরূপ ঘোরা তামসী নিশার পরে যে নব উষার উন্মেষ হয়, তাহা অপূর্ব্ব জ্যোতির্ম্ময়ী ও অনাস্বাদিত-পূর্ব্ব আনন্দের জননী।

আরও দেখ, যখন দুঃখ পাই —যখন আঁধারে আমাদের বাহিরটা ঘিরিয়া ফেলে, তখনও যদি আমরা অপরকে সাহায্য করিতে পারি এবং যাদের জন্য আমরা জীবন ধারণ করিতেছি, তাহাদের উপকারার্থ আমাদের ভিতর দিয়া জ্ঞানের জ্যোতি প্রকাশিত হয়, তবে আমাদের ব্যক্তিগত দুঃখ কষ্টে বা তমসাচ্ছন্ন অবস্থায় (personal darkness) কি আসে যায় ? আমাদের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী বিভ্রান্ত জনসমূহের উপকারের জন্যই মহাপুরুষদের সাহায্য ও জ্ঞানের আলোক আইসে। স্বকীয় সুখভোগের জন্য—"আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির" জন্য উহারা প্রদত্ত হয় না। অতএব জ্ঞান ও শক্তি যে উদ্দেশ্যের জন্য প্রয়োজনীয়, তাহা তখন আমাদের স্থূল জ্ঞানের অপরিজ্ঞাত ভাবে সংসাধিত হইতেছে, তখন আপনার জন্য—জ্ঞান ও শক্তিলাভের জন্য অত তীব্র বাসনা কেন ?

অধ্যাত্ম-বিদ্যাশিক্ষার্থীর পক্ষে "ধৈর্য্য" বা "তিতিক্ষা" গুণটীর অনুশীলন করা যতটা প্রয়োজনীয়, তত আর কোনটীই নহে। ভ্রাতঃ! তুমি বোধ হয় এই নিয়মটীর সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা করিয়াছ এবং বোধ হয় মানবীয় নিয়মাবলীর জটিলতা, অনিশ্চয়তা, কার্কশ্য, কণ্টকতা এবং রস-হীনতার জন্য তোমার মনে 'নিয়ম' শব্দটীর সহিত কতকগুলি দুঃখময় ভাব বিজড়িত আছে। কিন্তু মান

রাখিও মানব সমাজের নিয়মাবলী ভগবানের নিয়মের অস্ফুট প্রতিধ্বনি মাত্র— কোনও কোনও স্থলে তাহার হাস্যোদ্দীপক অনুকরণ মাত্র। এমন কি থিয়সফির সাহিত্যে আধ্যাত্মিক নিয়মাবলীর বিষয়ই বেশী আলোচিত হইয়াছে। মানবীয় নীতির সহিত যে ক্ষুদ্র ভাবসমূহ বিজড়িত আছে, আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী পর্য্যালোচনা করিবার সময়ে তুমি সেগুলি একেবারে মুছিয়া ফেলিবে এবং পরিস্ফুটভাবে দেখিতে চেষ্টা করিবে যে, আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী ভগবৎ প্রেমের একটী বিশেষ ভাব বা প্রকাশ মাত্র; এবং উহা "করুণা"র বা "কৃপা"রই নামান্তর।

ইহা বোধ হয় সকলেই স্বীকার করিবেন যে, নীতি লঙ্ঘনকারীদিগের জন্য শাসনের ব্যবস্থা আছে বলিয়াই নীতিশাস্ত্রকে লোকে অতিশয় ভয় করে। যদি শাসনকে "ন্যায়ের প্রতিশোধ" (retributive justice) বলিয়াই মনে কর, তাহা হইলে নিয়ম (Law) অবশ্যই অত্যন্ত কঠোর, দয়ালেশশূন্য ও অনৈশ্বরিক বলিয়া মনে হইতে পারে। দুঃখের কথা যে অনেক সময়ে লোকে 'নিয়ম' শব্দ ঐরূপেই বুঝিয়া থাকে। কিন্তু বোধ হয় প্রশ্নটীকে অন্য প্রকারে, আরও যুক্তিযুক্ত ভাবে বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। শাস্তি প্রাপ্ত ব্যক্তির সংশোধন এবং শিক্ষাই—অর্থাৎ পরিণামে প্রকৃত হিতসাধনই যদি শাসনের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য হয়, তবে কি উহার অর্থ ঠিক অন্যরূপ ধারণ করে না? শাস্তির বা শাসনের মূল উদ্দেশ্য কি তখন প্রকৃত ভগবৎভাব অভিব্যক্ত করে না? তখন কি নিয়ম বা শাসন শব্দে ভগবানের সর্ব্বাত্মিক ভাব ও সেই ভাবের বিকাশ দেখা যায় না? পিতামাতা যখন সন্তানকে ভর্ৎসনা করেন, তখন অজ্ঞ বালক মনে করিতে পারে যে, তাঁহারা বুঝি তাহাকে ভালবাসেন না; কিন্তু যখন সে বড় হয় তখন সে কি বুঝিতে পারে না যে, যদি তাঁহারা ঐরূপ ভর্ৎসনা না করিতেন, তাহা হইলে তাহাতে অনেকগুলি কু-অভ্যাস ও পাপ প্রবৃত্তির সৃষ্টি হইত? অতএব তখন তাঁহাদের ভর্ৎসনার ভিতরে অত্যন্ত নিঃস্বার্থ ভালবাসা ও স্নেহ দেখিতে পাইয়া, অজ্ঞান বয়সে যাহাদিগকে কঠোর ও স্নেহ-লেশহীন বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল, তাহার জন্য তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ভাবে তাহার হৃদয় কি ভরিয়া যায় না?

আরও একটী হেতু আছে যে নিয়ম বা শাসনের কঠোরতা থিয়সফিক শিক্ষায় বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যখন ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কি তাঁহার প্রচার কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন সর্ব্ববিধ ধর্ম্মমতাবলম্বীদিগের ভিতরেই

"ভগবৎকৃপা" সম্বন্ধে এরূপ অদ্ভুত ও অহিতকর ধারণা ছিল যে, এই সব ভ্রান্ত ধারণার মূলোৎপাটনের জন্য বিশেষরূপে প্রতিবাদ করিবার প্রয়োজন হইয়া উঠিয়াছিল। লোকে মনে করিত যে তাহারা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারে এবং তাহাদের সম্পূর্ণ মনোমত ভাবে কামনা ও প্রবৃত্তির র্থ চরিতা করিতে পারে; অথচ এ সমস্ত করিয়াও যদি তাহারা 'খৃষ্টকে' বিশ্বাস করে ও তাঁহার মতাবলম্বীদের দলভুক্ত হয়, অথবা মরিবার পূর্ব্বে "হরি" বা "আল্লা" নাম উচ্চারণ করে, তাহা হইলেই তাঁহারা অতুল কৃপার অধিকারী হইবে। দেখ, এই ভ্রান্ত বিশ্বাসগুলি মনুষ্য-সমাজে অত্যন্ত বিষম ফল উৎপাদন করিতে পারে। তজ্জন্য উহাতে লোকসমূহ যে বিপদাভিমুখে যাইতেছিল, তাহা হইতে অব্যাহতি পাইতে গেলে একমাত্র বিজ্ঞান-শাস্ত্রের (Science) সর্ব্বাত্মিকা ভাবের সহায়তা গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য হইয়াছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ঐ সময়ে কতক পরিমাণে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এইরূপ অদ্ভুত ধারণার মূলোচ্ছেদ করিতেছিল, এবং সর্ব্বাত্মিক নিয়মই যে মনুষ্য সমাজের কার্য্যাবলী পরিচালিত করে, তাহা সর্ব্ব জনগোচর করিতেছিল। মানবের ক্রম-বিকাশের সহায়তা করিতে হইলে "সত্য" বস্তুর যে কোন্ ভাব বিশেষ করিয়া দেখাইতে হইবে, তাহা দেশ কাল পাত্র অনুসারে বিবেচনা করিতে হইবে। অতএব যে জাতির "কর্ম্মবাদে" অসীম বিশ্বাস আছে—এতাদৃশ বিশ্বাস যে তাহারা উহাকেই সমস্ত কার্য্যের পারমার্থিক পরিণাম বা একমাত্র ও সারসত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে—সে জাতিকে প্রকৃত পথ দেখাইতে হইলে, ইহাই বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, "কর্ম্ম" কিরূপে ভগবদিচ্ছার এক প্রকার অভিব্যক্তি মাত্র; উহা কি প্রকারে "প্রেম" রূপ মহত্তর নিয়মের অনুগত এবং ভক্তি ও বাসনা ত্যাগের দ্বারা আমরা কিরূপে কর্ম্মরাশি ভস্মীভূত করিতে পরিতে পারি। আবার পক্ষান্তরে যে যে জাতির ভিতরে "কর্ম্মবাদ" সম্বন্ধে কোনও ধারণা নাই, তাহাদিগকে প্রকৃত পন্থা দেখাইতে হইলে ঠিক বিপরীত ক্রমে নিয়ম বা বিধির সার্ব্বজনীনতার প্রাধান্য দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে হইবে।

(২)

প্রার্থীদিগের মধ্যে প্রকৃত শিষ্যকে কিরূপে বাছিয়া লওয়া হয় এ বিষয়ে তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ, তৎপ্রসঙ্গে আমি এই বলিতে চাই যে কাহাকেও প্রত্যাখ্যান করা আমাদের নিয়মানুমোদিত নহে। অবশ্যই ম্যাডাম ব্লাভাট্স্কির অন্তর্দৃষ্টি ছিল এবং তিনি সর্ব্বদাই জানিতেন যে কাহারাই বা প্রকৃত

অধিকারী আর কাহারা বা শুধু স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে অথবা আরও নিম্নতর উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অগ্রসর হইতেছে। কিন্তু এই বিষয়ের মীমাংসা স্থলে তিনি কদাচিৎ এই শক্তির প্রয়োগ করিতেন। প্রার্থীর আত্মসম্মান ও বিবেক শক্তির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করা হইত; এবং প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রণোদিত হইয়াই প্রবেশার্থী হইয়াছে; এরূপ যাহারা বলিত তাহাদের কাহাকেও বিমুখ করা হইত না। যাহাতে প্রার্থী উন্মীলিত নয়নে প্রবেশ লাভ করিতে পারে এবং অবশেষে তাহাকে ভুলাইয়া আনা হইয়াছে এরূপ অভিযোগ করিতে না পারে, তজ্জন্য তাহার পথ পরিষ্কার করিয়া দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। আমরা অত্যন্ত সরল ভাবেই বলি যে তাহার নিকট সম্পূর্ণ "আত্মত্যাগ" কৈতবহীনতার আবশ্যক। তাহার আপন উন্নতি গৌণ উদ্দেশ্য মাত্র হওয়া আবশ্যক এবং পরার্থে কর্ম্মানুষ্ঠানই তাহার জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইবে। আমরা তাহাকে বলি যে সে যদি "সিদ্ধি" লাভের প্রার্থী হয়, অথবা মহাপুরুষদের সহিত শীঘ্র শীঘ্র পরিচিত হইবার কামনায় আসিয়া থাকে, কিম্বা তৎসদৃশ অন্য কোনও প্রকার অভিসন্ধি পূরণের অভিলাষী হইয়া থাকে, তবে তাহার দূরে থাকাই ভাল। আমরা প্রথমেই প্রার্থী সত্য ও সরলতা হীন কি না, অথবা তীব্র আকাঙ্ক্ষাযুক্ত বা কাপট্য হীন কি না, তাহার বিচার করিতে বসি না; বরং তাহাকে আচরণ দ্বারা নিজের উপযোগিতা সপ্রমাণ করিতে অবসর দিই।

তোমরা সাধকদিগের খুব উচ্চতর অবস্থা হইতেও পতনের কথা শুনিয়াছ। মনে করিও না যে ইহা তাহাদের দীক্ষাদাতা মহাপুরুষের জ্ঞানের এবং বিচারের অভাব হইতে প্রসূত। "চেলা" যে কিরূপ হইয়া দাড়াইবে, গুরু তাহা সম্যক্ প্রকারেই জানেন। কিন্তু "চেলা"কে সে যে অযোগ্য বা অনধিকারী অথবা তাহার যে পতন হইবে, ইহা প্রথমেই বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। বলিলেও তাহার এ বিষয়ে প্রত্যয় হইবে না; তজ্জন্যই তাহাকে পথের সমস্ত বিঘ্নগুলি জানিতে দেওয়া হয়। তবুও যদি সে আসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে এবং মনে করে যে পথের উপযুক্ত গুণ তাহার ভিতর আছে, তাহা হইলে তাহাকে শিক্ষার্থীরূপে (on probation) গ্রহণ করা হয়। এস্থলে গুরুকে যে শিষ্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে নির্দ্ধারণ করিতে হয় তাহা নহে, বরং শিষ্যেরই নিজের নিকট উপযোগিতা বা অনুপযোগিতার পরীক্ষা দিতে হয়। লোকে যে সময় মনে করে যে প্রকৃতই সে পুরস্কারের যোগ্য, তখনই পুরস্কার অধিকতর আনন্দজনক হয়। অযোগ্য বা অপাত্রে দান বুদ্ধিমান্ ও সম্মানী ব্যক্তিকে কেবল অবনত ও ক্লেশ দান করে মাত্র।

আমাদের প্রিয় বন্ধু "হ"—এর নিকটে আমি তোমার আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ ও কুপ্রবৃত্তি দমনের ক্ষমতার উত্তরোত্তর বৃদ্ধির কথা শুনিয়াছি। একজন ভ্রাতা যে মায়াজাল ছিন্ন করিয়া অগ্রসর হইতেছে এবং আলোকের আভা দেখিতে পাইতেছে ইহা শুনিতে পারা অপেক্ষা অধিকতর আনন্দদায়ক আর কি আছে।

তোমার পথে যে সমস্ত বিঘ্ন ও বাধা রহিয়াছে, মহাপুরুষদের কৃপায় ও শ্রীকৃষ্ণের আশীর্ব্বাদে তুমি, তাহা অতিক্রম করিতে পারিবে এবং কালে জগতের হিতের জন্য তাঁহাদের একজন প্রকৃত দাস হইতে পারিবে। কারণ যাঁহারা সঙ্কীর্ণ অহঙ্কারকে পরাভূত করেন ও "পরমাত্মা"র সহিত প্রেম মিলনের জন্য চেষ্টিত হয়েন, উহাই তাঁহাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার।

(৩)

যতদিন আমরা মায়িক জগতে থাকিব ততদিনই আলোক আঁধারের পর্য্যায় বা ক্রম থাকিবে। ব্যক্তে ধর্ম্মই পরিবর্ত্তন বা পরিণাম। যতদিন না আমরা অব্যক্তে মিলাইয়া যাইতে পারিব, ততদিন আমাদের একবার আলোক হইতে আঁধারে—পুনরায় আঁধার হইতে আলোকে, সুদিন হইতে দুর্দ্দিনে—আবার দুর্দ্দিন হইতে সুদিনে গতাগতি করিতে হইবে।

অতএব যাহা অবশ্যম্ভাবী তাহা লইয়া উদ্বিগ্ন হইও না। বিশেষতঃ যখন তুমি এ পথের বিপদ্‌রাশির কথা জানিয়া শুনিয়াই স্বেচ্ছায় এ পথে প্রবেশ করিয়াছ,তখন তৎকালে যে সংঘর্ষ (struggle) উত্থিত হইয়াছে,তাহাতে ব্যাকুল হইবার স্থান নাই। "অসুর"দিগের বিরুদ্ধে তুমি 'অপর' অনেকের অপেক্ষা অধিকতর দৃঢ় ও নিরঙ্কুশ ভাবে দাঁড়াইয়াছ বলিয়াই তোমার পরীক্ষা অপরের অপেক্ষা গুরুতর হইতেছে। আমাদের প্রত্যেকেরই স্বভাবে অসম্পূর্ণতা বা দোষ আছে ; এবং সে গুলি অসুরদের সহিত সংঘর্ষণ কালেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর দুর্দ্দমনীয় ভাবে প্রকটিত হয়। প্রকৃত শিষ্যের স্থলে ঐ গুলি সমস্তই এককালে চোখের উপর এরূপে ভাসিয়া উঠে, যে তাহারা যে কতদূর ভীষণ তাহা তিনি দেখিতে পান এবং তাঁহার যাত্রার প্রাক্কালেই তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারেন ও অগ্রসর হইবার সময় এক একটীকে ধরিয়া উৎপাটিত করিতে পারেন। হৃদয়ে আবর্জ্জনারাশি লইয়া তিনি যাহাতে মন্দিরাভ্যন্তরের পবিত্রতা নষ্ট করিতে না পারেন, উহা বাস্তবিকই প্রয়োজনীয়।

চিত্ত শুদ্ধির কার্য্য যত শীঘ্র হয় ততই ভাল ; কারণ উর্দ্ধে যাইবার বা মহত্তর বিকাশের পূর্ব্বে যদি এগুলি আমরা পরিত্যাগ করিয়া আসিতে না পারি, তবে ফল বড়ই ভীষণ হয়।

বর্ত্তমান সময়ে তোমার যে কোন্ বিশেষ দৌর্ব্বল্যটী আছে, তাহা এখন তোমার নিজেই বাহির করিয়া লওয়া প্রয়োজন। অবশ্যই অনুসন্ধানের কালে তুমি সাহায্য প্রাপ্ত হইবে, কিন্তু সেই সাহায্য তোমার ভিতর হইতে আসিবে। তাহা হইলেই প্রকৃত শত্রু সম্বন্ধে তোমার কোনও সন্দেহ বা ভ্রম থাকিবে না, ও তাহার স্বভাব ও সামর্থ্য প্রকৃতরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে। তোমার হৃদয় হইতে তাহাকে বিসর্জ্জন দিতে বা উৎপাটন করিতে যে কি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তাহাও জানিতে পারিবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মোক্ষ] মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ—রাধাভাব।

মহাপ্রভুর অন্তরস্থিত প্রেমের অমানুষিক শক্তিতে সাধারণে অপরিজ্ঞাত প্রায়। ভক্তিমার্গ যে কিরূপ ভাবে পরিস্ফুট হইয়াছিল, বৈষ্ণবদিগের অমর-তুলিকা স্পর্শে চিত্রিত কাব্যগুলি পরিদর্শনে তাহা বেশ বুঝা যায়। সেগুলি ভাষা সৌন্দর্য্যে যেরূপ চিত্তোন্মাদকর, ভাব-মাধুর্য্যে যেরূপ অতুলনীয়, মধুর রসাত্মক সাধনা বিষয়েও সাধকের নিকট সেইরূপ উপাদেয়। কত কত সাধক সেই প্রেমলীলা হৃদয়ে ধ্যান করিতে করিতে তদ্ভাবে বিভোর হইয়া সংসার ভুলিলেন—বিষয় ভুলিলেন ; আর সেই প্রেম-চিত্র স্মরণ করিতে করিতে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই সকল পদাবলীতে কামচিত্রের সমাবেশ মনে করিয়া অনেকে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। অন্তর্নিহিত পবিত্র কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য্য মূলক ব্রজ-প্রেমের নিগূঢ় তত্ত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। বৈষ্ণব কবিদিগের বর্ণিত বাসকসজ্জা উৎকণ্ঠিতা প্রভৃতি অবস্থা-নিচয় ভাগবত বা অন্য কোন পুরাণে ঠিক এইরূপ প্রকটভাবে দৃষ্টিগোচর না হইলেও, পবিত্রতার মূর্ত্তিমান আদর্শ, যতীন্দ্রপ্রবর, সংসারত্যাগী শ্রীমন্মথ প্রভু ব্রহ্মচর্য্যের দারুণ কঠোরতার মধ্যে থাকিয়াও, পূর্ব্ববর্ত্তী জয়দেব, চণ্ডীদাস প্রভৃতির কাব্যের মধুর রস আস্বাদন করিয়া, যখন সেই বর্ণনায় পবিত্রতার

ইঙ্গিত করিয়াছেন, তাঁহাদের পদাঙ্কানুসরণ করিয়া যে সকল কবি লীলাব্যঞ্জক মধুর রসের অবতারণা করিয়াছেন, সেই সকল পদাবলীতে অপবিত্রতা দর্শন আস্পর্দ্ধার কথা সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের ধ্যানের বস্তু, আপনার জন, হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা। শ্রীরাধা সেই রসস্বরূপ শ্রীভগবানের মহাভাবময়ী অভিন্না প্রকৃতি। শ্রীভগবান্ অবতাররূপে লীলাময় দেহ ধারণ করিলে, সেই মধুর রসের পূর্ণতা সাধন জন্য, কিরূপে শ্রীভগবানের উপাসনা করিতে হয় কিরূপে জীবরূপী 'অহং' মন প্রাণ তাঁহাতে অর্পণ করিয়া আপনার অস্তিত্ব তাঁহাতে ডুবাইতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্য শ্রীমতী চিন্ময়ী হইয়াও শরীরিণীরূপে ব্রজের কুঞ্জে কুঞ্জে অভিসারিকা এক তত্ত্ব যুগলমূর্ত্তিতে ভক্তের জন্য অবতীর্ণ। নায়ক নায়িকার আসঙ্গলিপ্সামূলক অনুরাগের বর্ণনার ভিতর দিয়া ভক্ত ভগবানের প্রেমোজ্জ্বল মিলন চিত্র লুক্কায়িত আছে—সাধনার ক্রমিক অবস্থানিচয়ের ছায়া বর্ণিত আছে; ভক্তিভাবে অনুসন্ধান করুন আপনি প্রত্যক্ষ হইবে। তখন কাম বিশুদ্ধ প্রেমে পরিণত হইবে এবং হৃদয়ের অপবিত্রতা অপসারিত হইবে; ইন্দ্রিয়-লালসা দূরীভূত হইয়া ক্রমে ভগবৎ প্রেমের অধিকারী হইতে পারিবে।

কাম যাঁহার ঈষৎ হাসির হিল্লোলে মূর্চ্ছিত হয়—যাঁহার অপরূপ লাবণ্য পৃথিবীর সর্ব্ব বস্তুর ভিতর দিয়া বহিয়া যাইতেছে—যাঁহার আকর্ষণের বাহিরে একটী পরমাণুরও অস্তিত্ব নাই, সেই মদনমোহনই বৈষ্ণব পদাবলীর নায়ক।

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মূরছা পায়॥ (গোবিন্দ দাস)

শ্রীরাধা এই কাব্যের প্রধানা নায়িকা; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বংশী এই রাধা নামে "সাধা"—

"শ্যামের মুখে শ্যামের বাঁশী রাধাগুণ গায়।"

শ্রীরাধার আত্ম-বিস্মৃতি, শ্রীরাধার তন্ময়তা জীবের শিক্ষার বিষয়। তাই বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রতি পদে শ্রীরাধার নাম; তাই রাধাকৃষ্ণই বৈষ্ণবের ধ্যান —রাধাকৃষ্ণই বৈষ্ণবের উপজীব্য। শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলনের পূর্ব্বে শ্রীরাধা—

বয়সে কিশোরী,   রাজার কুমারী;
তাহে কুলবধূ বালা।   (চণ্ডীদাস

তখন কৈশোর জীবনে—নবাগত যৌবনের অভিনব আনন্দ স্মৃতিতে ;

মগ্ন; রাজার কন্যা, ঐশ্বর্য্যের অঙ্কে পালিত—সকলেরি আদরের পাত্র ; সে অবস্থায় জগতের বাহ্যাংশ সুন্দর দেখাইবার কথা, প্রকৃতির মধুর চিত্র তাঁহার চক্ষের সম্মুখে নৃত্য করাই সম্ভব, ভোগলালসা, হাস্য পরিহাস এ সময়ে স্বাভাবিক। কিন্তু শ্রীরাধার একি পরিবর্ত্তন—

নয়ানক নীর, থির নাহি বাঁধই,
ঘন ঘন মেটসি তাই।

* * * *

ক্ষণে ঘর বাহির, করসি নিরন্তর,
ক্ষণে ক্ষণে দশদিশ হেরি। (ঘনশ্যাম)

* * * *

সদাই চঞ্চল, বসন অঞ্চল,
সম্বরণ নাহি করে।
বসি থাকি থাকি, উঠয়ে চমকি,
ভূষণ খসিয়া পড়ে। (চণ্ডীদাস)

বাহ্য বিস্মরণ আরম্ভ হইয়াছে। বেশ ভূষার দিকে আর দৃষ্টি নাই, অক্ষিযুগল রঞ্জিত, মুখপদ্ম শুষ্ক, চিত্ত বিভ্রম উপস্থিত, ক্রমে সেই সুবর্ণ লতিকা শুকাইতে লাগিল। সখীগণের নিতান্ত অনুরোধে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিলেন ;—

কদম্বের বনে, থাকে কোন জনে, কেমনে শবদ আসি।
একি আচম্বিতে, শ্রবণের পথে, মরমে রহল পশি।
সান্ধিয়া মরমে, ঘুচাঞা ধরমে, করিলে পাগলী পারা।
চিত স্থির নহে, শ্বাস ঘন বহে, নয়ানে বহয়ে ধারা।
কি জানি কেমন, সেই কোন জন, এমন শবদ করে।
না দেখি তাহারে, হৃদয় বিদরে, রহিতে না পারি ঘরে।

প্রেমরূপী মুরলীর যে ধ্বনি জীবের নাম ধরিয়া অবিরত ডাকিতেছে, সেই মধুর আহ্বান তিনি শুনিয়াছেন ; তাই আর স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। চিত্ত তখন বেণুবাদক ভিন্ন আর কিছুতেই শান্ত হইতে চায় না। সদাই ঘনশ্বাস, যেন উন্মাদ অবস্থা, যেন কোন দেবতার আবেশ।

এই বংশী অনাদিকাল প্রবাহের ন্যায় অবচ্ছিন্ন ভাবে জীবের হৃদয়-পুণ্ডরীক হইতে—বিশ্বের হৃদয়-কেন্দ্র হইতে অবিশ্রান্ত ধ্বনিত হইতেছে ; তাই "সেই

নন্দের পুত্র আনন্দময় ক্ষেত্রে অভিব্যক্ত শ্রীনন্দনন্দনই ত' প্রতি হৃদয়ে এইরূপে বাঁশী বাজান"। সকলে এই বাঁশী শুনিতেছে বটে, কিন্তু ইহার যে একটী প্রাণ কাড়া, মন মাতান সুর আছে, তাহা সকলে বুঝিতে পারে না। কারণ বুঝিবার সে শক্তি তখনও নির্ভিন্ন (develop) হয় নাই। সর্ব্বেশ্বরের যে বংশী-নিক্বণে শ্রীরাধার বহির্বিচরণশীল চিত্ত স্তব্ধ হইয়া গেল, যে বাঁশীর সুর শুনিয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেব সমস্ত জীবন কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাটাইলেন, যে বাঁশীর কলতানে গোপীগণ আর্য্যপথ পরিত্যাগ করিয়া—পতিপুত্রের মায়া কাটাইয়া, ঘোরতররূপ হিংস্র জন্তু পরিবেষ্টিত অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, যে বেণুগীতের কথা ভাগবত স্পষ্টাক্ষরে বলিলেন,—

"কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদামৃত বেণুগীতং *
সম্মোহিতার্য্যচরিতান্ন চলেৎ ত্রিলোক্যাং।" ১০।২৯।৪০

সেই বেণুগীত বা কাম-মন্ত্রের আকর্ষণের বিরাম নাই; সর্ব্বদাই একভাবে সেই অচল প্রতিষ্ঠ সাগর পানে টানিতেছে; সেখানেই সকল আকর্ষণের পরিসমাপ্তি। ব্যক্তি বিশিষ্ট কল্পিত-সুখ প্রয়াসী জীব ধন, মান, যশ, কামিনী-কাঞ্চন প্রভৃতির বাহ্যাবরণে মোহিত হইয়া মনে করে বুঝি এই আকর্ষণ তাহার স্বকল্পিত লক্ষ্যে পর্য্যবসিত। ,তাই প্রত্যেক কাম্য বস্তুর ভিতর দিয়া সেই আকর্ষণী মন্ত্রের টান অনুভব করিলেও, বিশিষ্টতার বন্ধনের জন্য সে টানও যে শ্রীভগবানের ইহা বুঝিতে না পারিয়া সারা জীবন ছুটিয়া বেড়ায়। কিন্তু ঐ বন্ধনটী খুলিয়া দিয়া সেই টানে আপনাকে ছাড়িয়া দিলে, ঠেকিতে ঠেকিতে একদিন তাঁহার চরণে পৌঁছান যাইতে পারে। এই টান বা আকর্ষণ প্রতি-নিয়ত বিশ্বে চলিতেছে; জগৎ এই আকর্ষণের লীলাভূমি। ভগবানের এই কাম-ক্রীড়ার বিরাম নাই; তাই বৈষ্ণব কবি বলিলেন;—

"নিরন্তর কাম-ক্রীড়া যাহার চরিত"

যাহাদের চক্ষু রূপের বিশিষ্টতায় মুগ্ধ, কর্ণ যাহাদের বহির্মুখী ভাবে নিবদ্ধ, চিন্তা যাহাদের বিষয় লইয়া, চিত্ত যাঁহাদের অনন্ত সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ, সে শ্রীরাধার ন্যায় "জাতিকুল নাশা" টান অনুভব করিবে কিরূপে? কে শ্রীমতীর ন্যায় সকল বাধা অতিক্রম করিয়া, আপনাকে ভুলিয়া—জগৎ ভুলিয়া

* অঙ্গ তোমার মধুর পদ সমন্বিত অমৃতসিক্ত বেণুগীত শ্রবণ করিয়া ত্রিভুবন মধ্যে

যাইতে চাহ কে? সেই সর্ব্বেশ্বরের চরণতলে "অহং কর্ত্তৃত্বাভিমান" ছাড়িয়া দিয়া "কুলটা" সাজিতে পার কে, প্রাণ খুলিয়া বলিতে পার?

"সব সমর্পিয়া একমন হইয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।" (চণ্ডীদাস)

শ্রীভগবান্ আছেন, শাস্ত্র ত' ইহা ভূয়োভূয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন; কিন্তু কয়বার আমাদের চিত্ত সেই দিকে প্রধাবিত—কয়বার সে অমৃতের অনুসন্ধান করি—কয়বার তাঁহার জন্য উদ্‌গ্রীব হই। শ্রীরাধার সেরূপ অবস্থা নয়। "শ্যাম" এই দুইটী অক্ষর শুনিবামাত্র তাহার প্রাণ আকুল; যেন ঐ নামে নিত্য সুধা ক্ষরণ—বদনে সেই নাম ভিন্ন আর কথা নাই,—

না জানি কতেক মধু শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
(অবিরত)—জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
(তখন চিন্তা) কেমনে পাইব সই তারে। (চণ্ডীদাস)

এই চিন্তা শেষে এইরূপ উৎকট হইল যে বাধ্য হইয়া—

বিরলে বসিয়া, সখীরে কহই,
দেখাইলে রহে প্রাণ। (উদ্ধব দাস)

শ্রীরাধার এ কথা শুনিয়া বিশাখা তখন আর থাকিতে পারিলেন না।

এ বোল শুনিয়া, বিশাখা ধাইয়া, শ্যাম কলেবর দেখি।
রাইয়ের গোচরে, দেখাবার তরে, পটের উপরে লিখি।
আনি চিত্রপট, রাইয়ের নিকট, সমুখে রহিলা সখী।
সেরূপ দেখিয়া, মুরছিত হৈয়া, পড়িলা কমলমুখী।

শাখা ভাব দূরীভূত হইয়া মূল ভাব যাহার স্থির হইয়াছে—যিনি রূপে শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়াছেন; অর্থাৎ ব্যক্ত অহংকার ত্যাগ করিয়া, রূপের বাহ্যিক ভাবকে শ্রীভগবানে লয় করিয়া রূপের অতীত সেই "শ্যাম কলেবর" যিনি দেখিয়াছেন, সেই বিশাখা শ্রীরাধার মানসপটে শ্রীভগবানের রূপ ঠিক ফুটাইতে পারিলেন। গুরুর ইহাই কার্য্য—বিশাখাই আমাদের গুরু। গুরু যখন দেখিবেন যে, সেই শ্যামকলেবর ভিন্ন শিষ্যের প্রাণ নিমজ্জমান ব্যক্তির বায়ুর অভাবের ন্যায় ছটফট করিতেছে, তখন তিনি কৃপা করিয়া তাঁহার

প্রকাশ। গুরুশক্তি ভিন্ন জীব ভগবানের আভাষ পায় না; সেই গুরুদেবের উদ্দেশে প্রণাম করি।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

যদি শ্রীগুরুদেবের কৃপায় সে বীজ উপ্ত হইয়া থাকে এবং তীব্র পিপাসারূপ জল সিঞ্চনে জীব যদি তাহার পুষ্টি সাধনে সক্ষম হয়, তবে প্রকৃতি পর্য্যঙ্কে শয়ান থাকিলেও সেই নিদ্রার ভিতরেও তিনি দেখা দিবেন। কারণ জাগ্রতাবস্থায় সেই ধ্যান করিতে করিতে সুষুপ্তির কালে তাঁহার সহিত দর্শন ঘটিবে। তাই নরোত্তম ঠাকুর বলিলেন;—

"সাধনে ভাবিব যাহা, সিদ্ধ দেহে পাব তাহা"

ইহাই চিন্তামণি ধামে চিন্ময় লীলা দর্শন। তাই চিত্রপটে দর্শনের পর স্বপ্নে দর্শন, সে সৌন্দর্য্যের নিকট চন্দ্রের জ্যোতির তুলনা হয় না। কারণ চন্দ্র ত' তাঁহারি জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান্—কাম তাহার নয়নের কোণে মোহিত, কারণ কাম ত' তাঁহারি পুত্র; কবির ভাষায়—

রূপে গুণে রসসিন্ধু, মুখ-ছটা জিনি ইন্দু,
মালতীর মালা গলে দোলে।
বসি মোর পদতলে, গায়ে হাত দিয়া ছলে,
আমা কিন বিকাইনু বলে।
কিবা সে ভুরুর ভঙ্গ, ভূষণ ভূষিত অঙ্গ,
কামমোহে নয়ানের কোণে।
হাসি হাসি কথা কয়, পরাণ কাড়িয়া লয়,
ভুলাইতে কত রঙ্গ জানে।
রসাবেশে দেই কোল, মুখে না নিসরে বোল,
অধরে অধর পরশিল।
অঙ্গ অবশ ভেল, লাজ মান ভয় গেল,
জ্ঞানদাস ভাবিতে লাগিল।

কি অদ্ভুত প্রেম! কেবল বংশীধ্বনিতে জীবকুলকে আহ্বান করিয়াই ক্ষান্ত নহেন। সেই রসসিন্ধু মূর্ত্তিখানি ভক্তের সম্মুখে রাখিয়া গায়ে হাত দিয়া বলিতেছেন, "আমা কিন বিকাইনু বলে" ভক্ত একবার ভাবিয়া দেখ দেখি, কিরূপ মধুর চিত্র! শ্রীরাধার প্রতি শ্রীভগবানের কি গভীর প্রেম! ভক্তের প্রতি

ভগবানের কি অসীম করুণা! জীব নিদ্রায় পালঙ্কে শুইয়া থাকিলেও তাহার নিকট গিয়া বলেন,—"আমায় কিন।"

কৃষ্ণাগতপ্রাণা শ্রীরাধার সেই দেহাতীত স্পর্শে অঙ্গ অবশ হইয়া গেল, অধরে অধর স্পর্শে কি এক বৈদ্যুতিক মিলনে লজ্জা মান ভয় দূরে গেল, সে হাসির ছটায় হৃদয়ের মলিনতা শুভ্র জ্যোৎস্নায় পরিণত হইল, তাঁহার প্রাণ—শ্রী সেই মধুরিপুর চরণপদ্মে লীন হইল।

এ মিলন কামের মিলন নহে—কামের পরিসমাপ্তি। কামের আকর্ষণ ও সেই প্রেমময়ের কামের লক্ষ্যও তিনি। তবে শ্রীরাধার এই কামে * বিশিষ্ট 'আমির' তৃপ্তি নাই—বিশিষ্ট বস্তুর মোহ নাই; ইহা "সর্ব্বার্পণ" ইহা 'অহং' 'স'এর পরম মিলন। যে মোহন মুরলীর তান শ্রবণ করিয়াছে, সে কি আর বিশিষ্টতার প্রাচীরে বদ্ধ থাকিতে পারে; আর কি সংসারের বহির্ম্মুখী ভাব তাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে; এখন সে যে প্রবৃত্তিরূপা যমুনাতীরে সেই কাল বরণকে দেখিতে পাইয়াছে, এখন সে যাহা দেখে সবই যে তাহার প্রাণনাথের রূপ—

কালিয়ার নয়ান বাণ, মরমে হানিল গো,
কালাময় সব আমি দেখি।

ইহা সেই অবস্থা, যখন—

স্থাবর জঙ্গম দেখে না দেখে তার মূর্ত্তি।
সর্ব্বত্র হয় তার ইষ্টদেব স্ফূর্ত্তি॥

তুমি আমি হয়ত স্ত্রী পুরুষের আকর্ষণ ব্যাপারকে কাম আখ্যা দিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিতে পারি; কিন্তু তাহা হইলেই কি কামনার হাত এড়াইতে পারিলাম? বহির্ম্মুখী আকর্ষণ মাত্রই যে কাম, প্রকৃতির ক্ষেত্রে কামের কার্য্য নিশ্চয়ই হইবে। কামে যে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি, সে প্রীতি কামিনী-সম্ভোগেই হউক কিংবা বিষয় ভোগেই হউক; সে প্রীতি আপনার যশ ও খ্যাতি লাভেই হউক কিংবা ব্রহ্মলোক গমনের জন্যই হউক—উহার ভিতর যদি বিশিষ্ট আমির তৃপ্তি বাঞ্ছা থাকে এমন কি মোক্ষাকাঙ্ক্ষার ভিতর যদি বিশিষ্ট 'অহং'এর তৃপ্তি কামনা অন্তর্হিত থাকে, তবে উহা কাম। এই কাম কেবল পর পুরুষের অঙ্গ সঙ্গে

* প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্।
ইত্যুদ্ধবাদয়োপ্যেতং বাঞ্ছন্তি ভগবৎ প্রিয়াঃ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

গোপরমণীদের প্রেমই কাম নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এইজন্যই উদ্ধবাদি ভগবৎ প্রিয়গণ গোপীর কাম বাঞ্ছনা করেন।

নিবৃত্ত হইতে পারে, জোর-জবরদস্তীতে উহার বিনাশ হয় না। অথচ এই কাম জয় করাও সাধকের আবশ্যক—

"জহি শত্রু মহাবাহো কামরূপং দুরাসদং।"

শ্রীরাধার ইহা কাম নহে; কামে আত্ম-চিন্তা; কিন্তু ইহা যে আত্মসমর্পণ। স্বপনে দর্শন করিয়া তিনি বলিলেন,—

মনের মরম কথা, তোমারে কহি যে এথা,
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু সেহ, শ্যামল বরণ দেহ,
তাহা বিনু আর কারো নই।

সমাজ, কুলগৌরব, কর্তৃত্বাভিমান, ধর্ম্মের অনুশাসন, সবই যেন ভাসিয়া গেল। তখন "তাহা বিনু আর কারো নই" এতদিনের বহির্ম্মুখী আকর্ষণ যেন আকর্ষণের আধার খুঁজিয়া পাইয়াছে। বংশীধ্বনিতে যাঁহার ইঙ্গিত পাইয়াছেন, চিত্রপটে যাঁহার প্রতিবিম্ব দেখিয়াছেন, স্বপ্নে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "তাহা বিনু আর কারো নই"। বাস্তবিক যে সাহস করিয়া লীলাময় ঐ কালো জলে"তুমি বিনা আর কারো নই" বলিয়া ঝাঁপ দিতে পারে—আপনাকে হারাইয়া ফেলিতে পারে, তার কি আর বিষয়ের রসবোধ থাকে না ইন্দ্রিয় সুখের অস্তিত্ব থাকে; তখন সে দেখিতে পায় সর্ব্বময় তাহাকে অঙ্কে গ্রহণ করিয়াছেন। তখন অনন্ত বাসনার অনন্ত স্রোত প্রেমোচ্ছ্বাসময় কালো জলে প্রেম প্রবাহরূপে পরিসমাপ্ত।

মধুর রসের এই সাধনা ইঙ্গিতে বলা থাকিলেও মহাপ্রভুর অদ্ভুত প্রতিভা ও প্রেমের অলৌকিক শক্তিতে বৈষ্ণব কবির ভিতর দিয়া লীলা ছলে বিস্তৃত ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে কাম চিত্রের বর্ণনা ভাবিয়া তুচ্ছ বা হেয় জ্ঞান না করিয়া ভাবুক ব্যক্তিদের আলোচনা করা কর্ত্তব্য। ইহা মন্থনে যে অমৃত উত্থিত হইবে দেবতা ও ঋষিদেরই উহা বাঞ্ছনীয়। সে প্রেম অকৈতব —সে প্রেমে চৈতন্যের পূর্ণ প্রকাশ—সে প্রেমে মহর্ষি রাজর্ষি আত্মহারা—আত্মজ্ঞানশূন্য। এই প্রেমের প্রকট মূর্ত্তি সেদিন এই বঙ্গদেশে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলেও, আমরা এমনি ভাগ্যহীন যে সেই বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া, এত অল্পদিনের ভিতর সে চিত্র স্মৃতিতে রাখিতে পারিতেছি না।

শ্রীরাধার ত্যাগ বা আত্ম সমর্পণ যেরূপ সহজ নহে, গৌরাঙ্গ জীবনেও তদ্রূপ। তিনি নবদ্বীপের আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, যথা-রীতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করত বিদ্বৎমণ্ডলীর মধ্যে অদ্বিতীয় হইবার উপযুক্ত। তাঁহার

অলৌকিক পাণ্ডিত্যে নৈয়ায়িক রঘুনাথ মুগ্ধ, দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত পরাস্ত, বেদান্ত অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মুগ্ধ; সুতরাং তিনি সংসার আশ্রমে থাকিয়া অসাধারণ পাণ্ডিত্যে নবদ্বীপে শীর্ষস্থান অধিকার করিতে পারিতেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আর একটি মহৎ কর্ত্তব্য ছিল,—শচী মাতার সেবা ও বিবাহিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার পরিপালন। ইহা সামাজিক ধর্ম্ম—বৈধী ধর্ম্ম; লোকতঃ ও ধর্ম্মতঃ তিনি এই কর্ত্তব্য পালনে বাধ্য। সমাজ এইরূপ পণ্ডিতের নিকট অনেক আশা করেন—এ সকল কথা তিনি পূর্ণভাবে অবগত ছিলেন; তবে তিনি কাহার ইঙ্গিতে এই মাতৃসেবা, পত্নীর প্রতি পতির কর্ত্তব্য, পণ্ডিতের ধর্ম্ম, বৈধী ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সমাজের সম্মান তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া, অবিরল নয়নের অশ্রু আর ছিন্ন কন্থা সার করিলেন—পাণ্ডিত্যের অভিমান, জ্ঞান-গরিমা পরিত্যাগ করিয়া মুখে শ্রীহরির নাম ও দিবারাত্রি উদ্দণ্ড নৃত্য সার করিলেন।

ইহা শ্রীকৃষ্ণ আকর্ষণের বিশেষত্ব; ঈশ্বর পুরী লৌকিক আচারে তাহাকে কি মন্ত্র প্রদান করিলেন যে, সেই মন্ত্রশক্তির বন্যায় তাহার হৃদয়ের বাহ্যিক ভাব যেন দূরে গেল, সে চপলতা—সে ভক্ত-বিদ্রূপ কোথায় পলাইল। এ যেন আর একজন; সদাই প্রেমে ঢলঢল—যেন উন্মত্ত; ক্ষণে হাসি—ক্ষণে ক্রন্দন, সদাই এক একভাব—

"স্বেদকম্পরোমাঞ্চাশ্রু গদ্গদ বৈবর্ণ্য।
উন্মাদ বিষাদ ধৈর্য্য গর্ব্ব হর্ষ দৈন্য॥" (চৈতন্য চরিতামৃত)

তখন বৈধ-ধর্ম্মের সীমা উল্লঙ্ঘন হইয়াছে, শাস্ত্রোক্ত বিধি নিষেধের গণ্ডীর মধ্যে তিনি তখন আর আবদ্ধ নহেন; তাই সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই সর্ব্বেশ্বর, কিশোর-শেখর, অদ্বয় তত্ত্বের শরণ করিলেন। কে জানে পাপ, কে জানে পুণ্য, কে জানে হাসি, কে জানে কান্না, কে জানে হর্ষ, কে জানে বিষাদ, তখন যেন গগনোপম কি এক আনন্দের সিন্ধু। তাই সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ গ্রহণ করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় উপদেশ দিয়াছেন;—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মাশুচঃ॥"

লোকধর্ম্ম, বৈদিক ধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, সকল ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া সেই বেণুবাদকের শরণ গ্রহণ করিলে, তবে শ্রীরাধার এই অহেতুকী নির্গুণ ভক্তি-পথের পথিক হওয়া যায়; কারণ তখন শ্রীকৃষ্ণই বেদ—শ্রীকৃষ্ণই লোক—শ্রীকৃষ্ণই কুল—শ্রীকৃষ্ণই ধর্ম্ম। তাই প্রেমাবতার শ্রীগৌরাঙ্গ সকল লৌকিক ধর্ম্ম, সকল কর্ত্তব্য

পরিত্যাগ করিয়া, উন্মাদ সাজিয়া জীবনের শেষ সময় নীল মহোদধির সৈকতময় কূলে—যেখানে তাঁহার পরাণবল্লভ জগতের নাথ সর্ব্বজীবের মুখে জাতি নির্ব্বিশেষে অন্ন প্রদান করিতেছেন, যেখানে "সমত্বং আরাধনমচ্যুতস্য" এই মহামন্ত্র স্থূল ভাবে ও সর্ব্বদাই জীবের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইতেছে, যেখানে সাগরের অনন্ত উর্ম্মিমালা গোপীদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ বিরহে অনুধ্যান করিতে করিতে নব জলধর শ্যামের বর্ণ ধারণ করিয়া উচ্ছ্বলিত কণ্ঠে জয়দেবের ভাষায় যেন বলিতেছে,—

"মধুরিপুরহমিতিভাবনশীলা"

যেখানে কোন অনাদিকাল হইতে ভক্তগণের ভগবদ্ আকুলতায় দারুময় বিগ্রহ চিন্ময়রূপে অদ্যাপিও কত ভক্তের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে, ভক্তের পদরেণুকা যেখানে পুঞ্জীকৃত,—সেই অপ্রাকৃত ক্ষেত্রে গমন করিয়া সর্ব্বদাই সেই মহাভাবে সমাধিতে বিভোর হইয়া, জীবকে সেই মহাভাবের আভাষ দিলেন।

কখন মিলন, কখন বিরহ, কখন বিলাপ, কখন হাসি ঠিক উন্মত্তের প্রায়। স্বরূপ দামোদর ও রামানন্দ রায় প্রভৃতি দুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্ত তাঁহার সে ভাব বুঝিতে সমর্থ—

রাধিকার ভাবে প্রভুর সদা অভিমান।
সেই ভাবে আপনাকে হয় রাধা জ্ঞান ॥ চৈতন্য চরিতামৃত।

ঐ দেখুন মহাপ্রভু স্বপ্নে শ্রীবৃন্দাবন-চন্দ্রের বক্ষে কিরূপ গাঢ় সুষুপ্তির অগাধ সলিলে নিমজ্জিত। প্রাণবল্লভের গাঢ় আলিঙ্গনে স্থূল দেহের চৈতন্য যেন ধ্যান সিন্ধুর অতল দেশে চলিয়া গিয়াছে; যোগারূঢ় চিত্ত যেন চির আকাঙ্ক্ষিতের দর্শনে ভাব-সমাধিতে মগ্ন! সহসা প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন সে আক্ষেপ বর্ণনাতীত; যেন প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া ফেলিলেন, যেন বহু দিনের আশায় বস্তু—সেই চিরবাঞ্ছিত হৃদয় সর্ব্বস্ব জাগরণের দৌরাত্ম্যে কোথায় চলিয়া গেল। তখন স্বরূপের কণ্ঠ ধরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন;—

প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া, তার গুণ স্মরিয়া,
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায় স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে হা হা হরি হরি,
ধৈর্য্য গেল হ'লে চপল।

এইরূপে মহাপ্রভু কখনও অন্তর্দ্দশা, কখন বাহ্যদশা, কখনও বা অর্দ্ধ বাহ্য ভাবে সময় যাপন করিতে লাগিলেন ;—

"তিন দশায় মহাপ্রভু রহে সর্ব্বকাল।
অন্তর্দ্দশা বাহ্যদশা অর্দ্ধবাহ্য আর॥
অন্তর্দ্দশার কিছু ঘোর, কিছু বাহ্যজ্ঞান।
সেই দশা কহে ভক্ত অর্দ্ধবাহ্য নাম॥
অর্দ্ধবাহ্যে কহে প্রভু প্রলাপ বচন।" চৈতন্য চরিতামৃত।

রথযাত্রায় মহাপ্রভুর নৃত্য এক অদ্ভুত ব্যাপার। মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ ভক্তগণ খোল করতালের সহিত ভগবানের নাম-মহিমাসূচক যে গীতধ্বনি অযুত কণ্ঠে উচ্চারিত হইত, মধ্যস্থিত শ্রীজগন্নাথের চতুর্দ্দিকে সেই সকল প্রেমিক ভক্ত-নিচয় যখন উন্মত্তপ্রায় হইয়া গোপীদিগের রাস-নর্ত্তনের ন্যায় নৃত্য করিতেন, তখন প্রত্যেক হৃদয়ে যেন প্রেমের উৎস বহিয়া যাইত ; ইচ্ছা না থাকিলেও শরীর সেই তালে তালে নাচিয়া উঠিত। ধ্যান সহায়ে সেই পূর্ব্ব চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দেখুন দেখি, দেখিতে পাইবেন করুণার অবতার যোড়করে দণ্ডবৎ করিয়া বলিতেছেন ;—

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমোনমঃ॥"

ঐ দেখুন মহাপ্রভু জীবের "অহংএর" স্বরূপ বুঝাইবার ছলে বলিতেছেন,— ;

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্ণাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো,
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্ণো বনস্থো যতি র্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিল পরমানন্দ পূর্ণামৃতাব্ধে,
গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ॥"

বলিতে বলিতে—সেই তাণ্ডব নৃত্য করিতে করিতে প্রভুর ভাবান্তর উপস্থিত হইল। যেন শ্রীক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পরিণত তিনি আপনাকে শ্রীরাধা আর ঐ রথের রথী স্বয়ং তাহার প্রাণবল্লভ এই অনুমানে বাহ্যভাব বিস্মরণ হইলেন ; চির-সুন্দরের সহিত মিলনে তাঁহার হৃদয় সিক্ত হইল বটে, কিন্তু প্রাণে কি যেন অভাব—কি যেন অসম্পূর্ণতা—কি যেন উদ্বেগ ;—

"নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর।
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চস্বর॥" চৈতন্য চরিতামৃত।

"যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা
স্তে চোন্মিলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরত ব্যাপার লীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসি তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।"*

এ উৎকণ্ঠা হইবার কথা বটে, কারণ শ্রীরাধা ঐশ্বর্য্যময় জগতের সর্ব্বভাব পরিত্যাগ করিয়া জ্ঞানঘন শ্রীভগবানের শরণ লইয়াছেন, তাঁহার এ ঐশ্বর্য্য চিত্তে স্থান পাইবে কেন ; তাই মিলনের ভিতরও মনে পড়িল—সেই আনন্দময় সুস্নিগ্ধ নির্জ্জন যমুনাতটবর্ত্তী বৃন্দাবন আর সেই বৃন্দাবনে গোপবেশধারী মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ। তিনি ঐশ্বর্য্যময় ভাবে একটু দূরে দূরে, মাধুর্য্যভাবে আপন জন। এই মিলন প্রকৃতিগত স্বরূপগত ; এ মিলনে কেবল আনন্দের ধারা—কেবল অমৃতের ক্ষরণ ; ইহাই শ্রীগৌরাঙ্গ নিজ জীবনে বিশেষ করিয়া দেখাইয়াছেন। জীবের জন্য শ্রীভগবান ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া দেখাইলেন যে, এই নির্গুণ ভক্তি হৃদয়ে উদিত হইলে, সমুদ্র-বাহিনী গঙ্গাধারার ন্যায় জীবের মনোগতি হয় ; সে গতি ফলানুসন্ধান রহিত ও ভেদ-দর্শন রহিত।

"মদ্‌গুণ শ্রুতিমাত্রেন ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোম্বুধৌ ॥" ভাগবত ৩।২৯।১১

তাই তাহার চিত্ত সেই শুদ্ধ কাল ঘন নিষ্কল তত্ত্বে পর্য্যবসিত হইয়া গেল। সেই পুরুষ সেই আকর্ষক, সেই পূর্ণব্রহ্মের পূর্ণ অবতার জীব মাত্রেরই আশ্রয়, তাহাতেই চিত্ত স্থাপন করিতে পারিলে এই দুরত্যয়া মায়া-সাগর আপনি উত্তীর্ণ হওয়া যাইবে। তাই করযোড়ে প্রার্থনা—"হে মহাপ্রভু ! সেই কালো রূপে আমাদের চিত্ত একবার প্রেরণা করুণ।"

শ্রীসুরেন্দ্র নাথ দাস।

* কাব্য প্রকাশের শ্লোক—কোন নায়িকা বলিয়াছিলেন, যিনি আমার কৌমার-কাল হরণ করিয়াছিলেন, সেই বর—সেই পতি, সেই চৈত্রমাসের রজনী, সেই বিকশিত মালতী সৌরভ যুক্ত কদম্বকাননের মন্দ মন্দ সমীরণ আর আমিও সেই ; তথাপি রেবা নদীর তীরবর্ত্তী বেতসা তরুর তলে সুরতলীলা বিধানের জন্য চিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছে। এই শ্লোক অবলম্বনেই রূপ গোস্বামী মহাপ্রভু হৃদয়ের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

উজ্জ্বল গীতি ।

(১)

শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল
কলিত ললিত বনমাল ।
জয় জয় দেবহরে ॥ ধ্রু
কমলার পয়োধর মণ্ডলবিহারী,
(হে) সুন্দর কুণ্ডল বনমালা ধারী ।
জয় জয় দেব হরে ॥ ধ্রু

(২)

দিনমণিমণ্ডলমণ্ডন ভবখণ্ডন
মুনিজনমানস হংস ।
কালিয়বিষধরগঞ্জন জনরঞ্জন
যদুকুলনলিন দিনেশ ॥
তপন মণ্ডলশোভন ভব-খণ্ডন,
হংসরূপী মুণিজন মন সরোবরে ।
(হে) কালিয় নাগ গঞ্জন জনরঞ্জন,
যদুকুল নালন াদনেশ (জয় হরে) ॥

(৩)

মধুমুরনরকবিনাশন গরুড়াসন,
সুরকুলকেলিনিদান ।
অমলকমলদল লোচন ভবমোচন
ত্রিভুবন ভবননিধান ॥
মধুমুর-নরক-অসুর বিনাশন
গরুড়াসন সুরকুলকেলি নিদান ।
(হরি হে , অমল কমলদল লোচন,
ভবমোচন ভুবন ভবন নিধান ॥

(৪)

জনক সুতাকৃতভূষণ জিতদূষণ
সমরশমিত দশকণ্ঠ ।

অভিনব জলধরসুন্দর ধৃতমন্দর
শ্রীমুখ চন্দ্রচকোর ॥
জানকীভূষণ দূষণের দর্পহর,
সমরে শমিত প্রাণ দশ কণ্ঠে কর।
(হরিহে) অভিনব জলধর সুন্দর,
মন্দার ধারক শ্রীমুখচন্দ্রচকোর ॥

(৫)

তব চরণে প্রণতা বয়মিতিভাবয়
কুরুকুশলম্ প্রণতেষু।
শ্রীজয়দেবকবেরিদম্ কুরুতে মুদম্
মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি ॥
চরণে প্রণত মোরা একান্ত জানিও,
প্রণতগণের প্রতি কুশল করিও।
শ্রীজয়দেবকৃত এই উজ্জ্বল গীতি,
করিছে আনন্দ দান সুমঙ্গল গীতি ॥

মোক্ষ]

ভাগবতের উপদেশ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে, লীলা নিত্য হইতে গেলে সর্ব্বকালে ও সর্ব্ব সাধারণে অনুভূতিগম্য হওয়া চাই। যাহা একবার বিশিষ্ট ভাবে সংসাধিত, যাহা পুনরায় উপযুক্ত দেশ কাল ও পাত্রের সংযোগ না হইলে পুনরায় প্রকটিত হয় না, তাহা অনিত্য কল্পিত ও মায়িক ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ইহাই শাস্ত্রের স্পষ্ট উপদেশ এবং এই জন্যই সাধকগণ ভগবান্ ও তাঁহার অভিব্যক্তি-ক্ষেত্র মুক্ত ঋষিগণের লীলা নিজ হৃদয়ে পুনঃ প্রকট করিতে সর্ব্বদাই চেষ্টিত থাকেন। এক্ষণে পুনঃ প্রকট হইতে গেলে, লীলা মানবের অন্তরতম তত্ত্বের সহিত অসম্পর্কিত (unrelated) হইলে, পুনঃ প্রকটতা সম্ভবেনা। লীলার বীজ মানবের তত্ত্বগত না হইলে, মানবের 'আমির' ভিতর মৌলিক প্রবণতা না থাকিলে, সাধক কোনও উপায়ে নিজ চিত্ত-ক্ষেত্রে লীলারহস্য পুনরায় প্রকট করিতে পারেন না;

এই তত্ত্বই আধ্যাত্মিক শব্দে লক্ষিত হয়। যাহা জীব বা 'আত্মা' মাত্রের অধিকরণ রূপে সর্ব্বকালে সত্য, তাহাই 'আধ্যাত্মিক' সুতরাং আধ্যাত্মিক শব্দটীর দ্বারা বিশেষ প্রকার ব্যাখ্যা ও তন্নিপুণতা বুঝায় না। যাহা জীবের চিত্তগত, যাহাকে অবলম্বন করিয়া বিশেষ অভিব্যক্তি সিদ্ধ হয়, যাহা সর্ব্ব পুরুষ সাধারণ ও ব্যক্তিগত ভাবের দ্বারা রঞ্জিত না হয়, তাহাকেই প্রকৃত অর্থ বা সত্য বস্তু বলে। পাতঞ্জল দর্শন ৪।১৬ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে আছে;—"স্বতন্ত্রোঽর্থঃ সর্ব্বপুরুষ সাধারণঃ" প্রকৃত অর্থ বা সত্য বস্তু 'স্ব'তন্ত্র বা জীবের বিশিষ্ট ছিন্ন ভাবের পরতন্ত্র নহে। সুতরাং ভগবানের অবতার স্বতন্ত্র,—অর্থাৎ তাঁহার মূলে শ্রীভগবানের স্বরূপে অপ্রাকৃত বিলাস থাকা আবশ্যক। তাহা কেবল বিশিষ্ট দেশ কাল ও পাত্রের দ্বারা নিয়মিত হইতে পারে না। শুধু তাহাই নহে, ঐ অভিব্যক্তির ভিতর জ্ঞান ও ভক্তি চক্ষে নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, উহা প্রাকৃতিক বা সামান্য ভাবের বিকাশ নহে। উহার ভিতর সেই পরম পুরুষের সেই পরম বিশেষ তত্ত্বের পূর্ণ ব্যঞ্জনা থাকিবেই থাকিবে। এই কথাটী বুঝাইবার জন্য বৈষ্ণব শাস্ত্রে ব্রজলীলার এত প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। ভগবান যদি কেবল ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে তদ্দ্বারা জীবের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি হইতে পারিত না। জীব তাহা হইতে ধর্ম্মের গতি ও অধর্ম্মের পরিণাম প্রভৃতি প্রাকৃতিক 'সর্ব্ব' ভাবের নিয়মাবলী বা তথ্য বুঝিতে পারিত। কিন্তু সে বুঝিয়া কি জীবের তৃপ্তি হইত, না তাহার অন্তরতম আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি হইত? যে সত্য জীবের অন্তরস্থিত 'অহং'রূপে অভিব্যক্ত বিশেষ ভাবের সহিত সংযুক্ত নহে, তাহাতে 'ত' প্রকৃত তৃপ্তি সিদ্ধ হইতে পারে না। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সত্য হইল ত' কি হইল? তাহাতে আমার 'আমির' কি ক্ষতিবৃদ্ধি? কৃষ্ণমূর্ত্তি নামক একটী অবতার হইয়াছেন শুনিলাম; অমনি প্রশ্নের উদয় হইল—তাহাতে আমার লাভালাভ কি? যাহা 'আমির' ভিতর নাই, তাহা সময় বিশেষে ভাল বলিয়া মনে হইলেও, আমার পক্ষে প্রকৃত সত্য বলিয়া অবধারণা হয় না। সেই জন্য গীতায় 'আমিতে' সর্ব্ব এবং 'সর্ব্বে' আমাকে দেখিবার জন্য উপদেশ আছে,—"যো মাং পশ্যতি সর্ব্ব সর্ব্বঞ্চময়ি পশ্যতি"। 'সেই জন্য 'দৃষ্টেবাত্মনীশ্বরে'' অর্থাৎ 'আমিতে' ভগবানকে না দেখিলে কিছুই সিদ্ধ হয় না। সেইজন্য ভাগবতে নেমি রাজাকে শ্রীহরি ঋষি উপদেশ দিলেন,—

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্‌ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ।" ১১।২।৪৫

আত্মনঃ স্বস্য সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মভাবেন সমন্বয়ং পশ্যেৎ। তথা ব্রহ্মরূপে আত্মনি অধিষ্ঠানে ভূতানি চ যঃ পশ্যেৎ। যদ্বা আততত্বাৎ প্রমাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিরিতি তন্ত্রোক্তেরাত্মনো হরেঃ সর্ব্বভূতেষু মশকাদিষ্বপি নিয়ন্তৃত্বেন বর্ত্তমানস্ত ভগবদ্ভাবং নিরতিশয়ৈশ্বর্য্যমেব যঃ পশ্যেৎ ন তু তস্য তারতম্যম্। তথা আত্মনি হরাবেব ভূতানি চ যঃ পশ্যেৎ। কথম্ভূতে। ভগবতি অপ্রচ্যুতৈশর্য্যাদিরূপে। ন পুনর্জড়মলিনভূতাশ্রয়ত্বেন জাড্যাদিপ্রসক্ত্যা ঐশ্বর্য্যাদি প্রচ্যুতিং পশ্যেৎ। স সর্ব্বত্র পরিপূর্ণং ভগবত্তত্বং পশ্যন্ ভাগবতোত্তম ইত্যর্থঃ।" শ্রীধর।

শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যা অতি অপূর্ব্ব ও রুচির। 'আত্মা' শব্দে প্রথমতঃ 'অহং'-প্রত্যয় বাচ্য পদার্থকে বুঝায়; কারণ 'অহং'ই 'স'এর প্রকাশ ভাব। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে যে, আত্মা ধ্যান করিলেন এবং সেই ধ্যানের ফলে একটী মিথুন উৎপন্ন হইল। "অস্মাজ্জাতা মে মিথু চরন্", এই মিথুনই 'সোঽহং'; উহা এক। তবে প্রথম দেখিলে যেন বোধ হয় যে উহা একভাবে 'স'রূপে ও অপর ভাবে 'অহং' রূপে আপনাকে প্রকাশ করিতেছে। এই 'স'ভাবই পর পুরুষ বা পরাগতি; আর 'অহং'ই 'স'এর ব্যক্তভাব মাত্র। এই দুইটী ভাবের দ্বারা শ্রীভগবানের পরম বিশেষ ঐক্যভাব নষ্ট হয় না; পরন্তু ঐ দুই ভাব যে এক, তাহা দেখাইবার জন্যই ত' 'সোঽহং'। মূঢ়েরা মানুষের শরীরে প্রকাশিত বা অভিব্যক্ত 'অহং'কে দেখিয়া তাহার পরম বা ভগবদ্ভাব দেখিতে পায় না।

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥" গীতা

এই বাক্য ভগবানের বিশেষ অবতারে ও জীবরূপ সামান্য অভিব্যক্তিতে প্রয়োজিত হইতে পারে। সেইজন্য সাধক অবস্থায় আত্মা বা 'আমিকে' সর্ব্বভূতে ব্রহ্মভাবে সমন্বিত বলিয়া দেখা আবশ্যক, এবং ব্রহ্মরূপে সিদ্ধ 'আমি' রূপ অধিষ্ঠানে ভূত সকলকেও দেখা আবশ্যক; ইহাই শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যার প্রথম স্তর। সুতরাং এই স্তরে আমরা যতক্ষণ আছি, ততক্ষণ শ্রীভগবানের লীলার মধ্যে সেই প্রকৃত 'আমির' বিকাশ ও লীলা এবং তাহার রহস্য বুঝা আবশ্যক। এরূপ ভাবে না বুঝিলে সাধকের ভিতর পরম 'আমির' প্রকাশ হইতে পারে না। সেই জন্য ভাগবত বলেন যে দুরতিগম্য আত্মতত্ত্ব বা আত্মার প্রকৃত ভাব বুঝাইবার জন্যই ভগবান্ কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হইয়া নিজ লীলার ইঙ্গিতে সেই তত্ত্ব অবগতির সহায়তা করেন। গুরু যখন আপনার জীবনের ও সাধনার কথা শিষ্যকে বলেন, তাহা যেমন

শিষ্যের ক্ষুদ্র 'অহং' জ্ঞান পরিষ্কৃত ও পরিশুদ্ধ করিয়া তাহার ভিতরের 'অহং'এর প্রকৃত স্বরূপ ফুটাইয়া দেয়, সেইরূপ সেই প্রকৃতির পারস্থিত অপ্রাকৃত মদনমোহন জীবের ভিতর তাঁহার স্বরূপ ও স্ব-তন্ত্রতা জাগাইবার জন্য যেন অবতীর্ণ হইয়া লীলা করেন। ইহাই তাঁহার অন্তরঙ্গ লীলা। এই পরম ভাবকে শ্রুতি "অবশেষ অমৃতম্" শব্দে অভিহিত করিয়াছেন। যাঁহারা অভিসন্ধি শূন্য, যাঁহাদের আর 'অহং' স্থাপনের প্রবৃত্তি নাই, তাঁহারা এই শুদ্ধ পরতত্ত্বে চিত্ত সমর্পণ করেন। এ ভাবে সৃষ্টি নাই, জীব নাই, গতি নাই ; আছে কেবল স্থির শাশ্বত অমৃতময় সত্তা মাত্র।

বস্তুর সত্যতার আর একটি ভাব আছে। যাহা সত্য, তাহা সর্ব্বপুরুষ সাধারণ। সত্য বস্তু ব্যক্তিগত ভাব বা অভাবের দ্বারা পরিবর্ত্তিত হয় না ; অথচ উহা 'সর্ব্ব' জীবেরই নিকট একভাবে প্রতীয়মান। বৃক্ষটিকে যেমন সকল জীবই বৃক্ষ বলিয়া দেখিবে ; তদ্রূপ যাহা সকল বস্তুর ভিতর দিয়া, সকল দ্রষ্টার মধ্য দিয়া, সর্ব্বকালে, সর্ব্বাবস্থায় একই ভাবে প্রতীত হয়, তাহাই সত্য। ব্যবহারিক জীবের পক্ষে এই ভাবটি প্রথমে গ্রহণীয় ; কারণ এ ভাবে সাধনার স্থান আছে, ধ্যান ধারণার অবকাশ আছে। আত্মা শব্দ "আত্মাততে ব্যাপ্তবাপি ব্যাপ্তইবস্যাৎ যৎ ব্যাপ্তিভূত" ইতি ; এই ভাবে "নিরুক্তে" লক্ষিত হইয়াছে। 'অত্' ধাতুর উত্তর মনিন্ প্রত্যয় করিয়া আত্মা শব্দ সিদ্ধ। যাহা সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বাত্মিক, সর্ব্বের ভিতর সমরূপে ব্যাপ্ত বলিয়া বোধ হয়, অথচ সর্ব্বের গতি প্রভৃতির দ্বারা যাহা অস্পৃষ্ট, তাহাই আত্মা। কোন বস্তু সত্য হইতে গেলে তাহার ভিতর এই আত্মার ধর্ম্মের ইঙ্গিত থাকা চাই। সাধারণ জীব সর্ব্বকালে ও সর্ব্বভাবে সংসিদ্ধিরূপ এই ধর্ম্মকে ভেদের ভাষায় বুঝে বলিয়া 'মারবেল' পাথরের প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে ; প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষা করিবার জন্য তাজ-মহল তৈয়ারী করে। তাহারা ভাবে যে প্রস্তরাদি ভিন্ন অন্য কোন ভাবে স্মৃতিচিহ্ন প্রস্তুত করিলে, উহা সর্ব্বকালে স্থায়ী হইবে না। এই সর্ব্বাত্মিকা প্রবৃত্তির বশেই মুগ্ধযোগী অহঙ্কারের সাহায্যে 'আমি' জ্ঞানটিকে সর্ব্বপ্রকার বৃত্তি হইতে পৃথক্ করিয়া রাখিবার চেষ্টা করে। তাহার ভয় হয় বৃত্তির মাঝে খেলিতে গেলে পাছে 'আমি' জ্ঞানটির পরিণাম ঘটিয়া যায়। এই ভেদ-দুষ্ট ভাবে বৈষ্ণবগণ অন্য ভগবদ্ প্রকাশ হইতে আপনার অভিনীত আরাধ্য মূর্ত্তিটিকে সর্ব্বদা পৃথক্ করিয়া রাখিবার জন্য ব্যস্ত। এই প্রবৃত্তির মোহে মুসলমান ভক্তগণ তরবারির বলে অন্য ধর্ম্মীকে আপন ধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা করে ও খৃষ্টীয়ধর্ম্ম-যাজকগণ

অন্য ধর্ম্মের নিন্দা ও গ্লানির দ্বারা আপন ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করিবার চেষ্টা করে।

কিন্তু পাঠক! বুঝিয়া দেখুন যে এ ভাবে কি তোমার হৃদয়ের তৃষ্ণা মিটিতে পারে? "বৃন্দাবন লীলা একবার হইয়াছিল, আর কখনও হইবে না" এ কথা বলিলে কি আরাধ্য দেবের সর্ব্বাত্মিকতা সিদ্ধ হইল। সেইজন্য শ্রীধর স্বামী উপরোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় 'সর্ব্বভূতে আত্মভাব দর্শন' শব্দের যে আর একটি উচ্চতর স্তর আছে, তাহা দেখাইবার জন্য বলিলেন "যে শুধু তোমার 'অহং' ভাবকে 'সর্ব্ব'ভাবে দেখিলে চলিবে না। অবশ্য 'অহং'কে 'সর্ব্ব'ভাবে দেখাই প্রকৃত সাধনা। কিন্তু মনে রাখা চাই উহা সাধনার অবস্থা; সাধ্যাবস্থা নহে। যতক্ষণ আত্মার প্রকৃত ভাব সিদ্ধ হয় নাই, যতক্ষণ আত্মার অদ্বিতীয় 'পর' স্বরূপ হৃদয়ে প্রকটিত হয় নাই, ততক্ষণ সর্ব্বভাবে 'সর্ব্ব' ব্যাপারে কেবল আত্মার ব্রহ্মভাব দেখিবার চেষ্টা করিবে। কিন্তু ভুলিওনা, আত্মা স্বরূপতঃ সর্ব্বব্যাপী ও 'সর্ব্ব' ভাবের প্রমাতা, সর্ব্বভূতে এমন কি মশকাদিতে পর্য্যন্ত সমান ভাবে অন্তর্য্যামী বা নিয়ামকরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। যাহা জড় বলিয়া ভাব, দেখ তাহারও অভ্যন্তরে ভিতর বাহির উছলিয়া সেই মহাস্বরূপের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতেছে। সেই জড়ের স্থৈর্য্য ও সত্য স্থির আত্মারই অঙ্গজ্যোতি মাত্র। দেখ! তোমার ভগবান্ জড়ের পোষাক্ পরিয়া পরিচ্ছিন্ন হইয়াও আপনাকে ঢাকিতে পারিতেছেন না। ঐ দেখ তাঁহার নিত্য দেশকালাতীত স্বরূপ জড়ের স্থৈর্য্য কাঠিন্য প্রভৃতির ভিতর দিয়া বিকীর্ণ হইতেছে। ঐ দেখ তাঁহার সর্ব্বব্যাপ্তি স্বরূপ জড়ের ভিতর অনন্ত জগদ্বস্তুর সহিত ঘাত প্রতিঘাতের (Infinite correlation) মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। ভাই! আত্মাকে খুঁজিতে গেলে বেশী দূরে যাইতে হইবে না; ভীষণ পরীক্ষা-সমাকুল সাধন পথের আবশ্যকতা নাই। কারণ সেই প্রেমময় সকল বস্তুর ভিতর দিয়াই সর্ব্বক্ষণ প্রতিভাত হইতেছেন।"

"তমেব ভান্তম্ অনুভাতি সর্ব্বম্, তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্ বিভাতি"

তবে সাধনা ও সাধন পথের আবশ্যকতা কি? তবে কি এ সম্বন্ধে শাস্ত্রের উপদেশ সর্ব্বৈব মিথ্যা? না, তাহা হইতে পারে না। যতদিন অহঙ্কার থাকিবে, যতদিন অহংকে 'স' হইতে ছিন্ন করিয়া দেখিব, যতদিন অহংকে তটস্থ শক্তি মাত্র বা ইঙ্গিত বলিয়া না বুঝিব, ততদিন সাধনা ও পথ সত্য বলিয়া মনে হইবে। আমার 'আমি' জ্ঞানটি দেহে অধিষ্ঠিত ও তদ্দ্বারা পরিচ্ছিন্ন। সুতরাং সর্ব্বাত্মিকা প্রকৃত সত্ত্বা আমার বাহিরে রহিয়া গেল। সেই জন্যই গতির আবশ্যকতা আছে।

যতদিন বাহিরে থাকিব, ততদিন বাহিরের বস্তুকে পাইবার জন্য গতিও থাকিবে। একটী দৃষ্টান্ত দিয়া এই কথাটা বুঝা যাউক। তোমার পুত্র নিরুদ্দেশ; তুমি আকুল হইয়া যোগীদের আশ্রয় গ্রহণ করিলে? একজন বড় যোগীর কাছে গেলে, তিনি যোগ শাস্ত্রে নিপুণ, কিন্তু এখনও 'অহং'কে বিশিষ্ট বলিয়া জানেন। সুতরাং যোগ অর্থে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর শরীরে বিশিষ্ট 'আমিটিকে' উপরে লইয়া যাওয়াই বুঝেন। তিনি তোমার পুত্রের প্রতিকৃতি বা পরিধেয় বস্ত্রাদি প্রভৃতির উপর চিত্ত স্থির করিয়া প্রাকৃতিক নিয়মের সাহায্যে তোমার পুত্রের অনুসন্ধান করিয়া দিলেন। আর একজন যোগী শ্রীভগবানকেই একমাত্র সত্য বলিয়া বুঝিয়াছেন। তিনি তোমার আগমন, প্রশ্ন করণ, তোমার ব্যাকুলতা ও এমন কি তোমার মোহের ভিতরও সেই শ্যামসুন্দরের স্ফুরণ দেখিতে পান। এইরূপে তিনি সেই ভগবদ্ভাবে 'অহং'কে লীন করিলেন, অমনি ভগবানের পূর্ণ শক্তি তাঁহাতে প্রকাশ হইল। দুইজনেই যোগী; তবে একজন ভগবানের সর্ব্বাত্মতা সিদ্ধ করিতে পারেন নাই; আর একজন তাহা পারিয়াছেন। সেইজন্য ফলের ও প্রক্রিয়ারও তারতম্য। পাঠক! এখন বুঝিলেন, আমরা কি ভাবে শ্রীভগবানের লীলার স্বাদ গ্রহণ করিতে বলিতেছি। যে লীলারসে তোমার প্রাণ এত আকৃষ্ট সে ত' তোমার অন্তরতমস্থলের অস্থিতকারী "অবশেষ অমৃত" পরম পুরুষেরই। পরম পুরুষের বলিয়াই উহা ব্রহ্মার সৃষ্ট, কাল পরিমাণ ও দেষাদি দ্বারা অস্পৃষ্ট; সুতরাং উহা তোমার 'আমির' তত্ত্বগত। ঐ লীলার রস যদি বাহিরের ভাষায় বুঝিতে যাও, তাহা হইলে উহার সর্ব্বাত্মিক ও নিত্যভাব নষ্ট হইয়া যাইবে।

সুতরাং বুঝা গেল উদ্ধৃত শ্লোকে আত্মার ভগবদ্ভাব দর্শন করা অর্থে দুইটি স্তর আছে। প্রথমটীতে তখনও পরিশুদ্ধ জীবভাব অবলম্বন করিয়া সেই জীবগত 'আমি' জ্ঞানটীকে ভগবানেরই বা ব্রহ্মের আভাস বলিয়া জানা যায়। ইহাই বেদান্তের হংসাবস্থা; ইহাতে 'আমি' জ্ঞানটী ত্যাগ করিতে হয় না। 'আমিটীর' ভিতর শ্রীভগবানের সর্ব্বাত্মিকা ভাবে ইঙ্গিত দেখিতে পাইলেই হইল। অবশ্য এই ভাবে স্থাপিত হইতে হইলে, পরিচ্ছিন্ন 'আমি' জ্ঞানের বর্জ্জন করিতে হইবে। ব্যক্ত বা প্রকাশিত 'অহং' দেখিবার স্তর—সাধনার প্রথম সোপান। এইরূপে 'আত্মা' ভাব বা সর্ব্বব্যাপী ভাবে অহং বুদ্ধি সিদ্ধ হইলে দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হওয়া যায়। এই স্তরে 'আত্মা' ভাবটী যে পর অতিগ, মায়েশ, ভগবানের বিকাশ মাত্র, এইটীই বুঝিয়া পরিশুদ্ধ সর্ব্বাত্মক 'অহং'কে ভগবানের মহান্ সত্ত্বার ভিতর হারাইয়া ফেলিতে হইবে; আর সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত ভাবটী রাখিলে

চলিবে না। এখন দেখিতে হইবে যে, এই সর্ব্বগত ভাব ও তাহার সাধনভূতা সর্ব্বাত্মিকা বিদ্যা পর্য্যন্তও সেই পর অদ্বিতীয় একেতেই পরিসমাপ্ত। যে শাণিত বিদ্যা-কুঠারের সাহায্যে সর্ব্বাত্মিকতা সিদ্ধ করিয়া সর্ব্বাত্মিক জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ, যে বিদ্যার কৃপায় আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত প্রত্যেক প্রকাশ-কেন্দ্রে এককে দেখিয়া, সেই সূত্ররূপ আত্মাতে বিশ্বকে মালা গাঁথিয়া পরমদেবের চরণ তলে উপহার দিয়াছ, এইবার সেই বিদ্যাও অন্তর্ম্মুখী হইয়া, আপনার স্বামী শ্রীভগবানের উপরত হইয়া তাঁহাতেই প্রকাশলীলা সংহনন করত প্রতি-নিবৃত্ত হইবেন। যতক্ষণ শ্রীভগবানের অতিরিক্ত দ্বিতীয় সত্ত্বায় বুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ এ স্তরে উপনীত হইতে পারিবে না। যতক্ষণ একটুও অহং-কেন্দ্রের প্রতি আসক্তি থাকিবে, যতক্ষণ ভ্রান্ত সাধকের চিত্তে, এমন কি ভগবৎ সত্ত্বা উপভোগ করিবার প্রবৃত্তি থাকিবে, ততক্ষণ এই পরাভাবের আকর্ষণ আসিতে পারে না।

ভক্তিমার্গেও এই দুইটী স্তর আছে। ভগবানকে বিশেষ বা ব্যক্তিগত-ভাবে জানিয়া, সর্ব্বভাবে তাঁহাকে দেখিবার ও তাঁহার ভজনা করিবার প্রবৃত্তিই সাধ্য ভক্তি। ইহাই পাতঞ্জল সূত্রের সম্প্রজ্ঞাত সমাধির অবস্থা। সর্ব্বভাবে ভগবানকে বিশেষরূপে জানাই সম্প্রজ্ঞাত ভাব। তারপর যখন সেই মহান্ পরম অদ্বিতীয় সত্ত্বার আকর্ষণে জীব 'আমি' 'তুমি' ভুলিয়া যায়, যখন আর হৃদয়ে 'অহং' সংস্থাপনের জন্য অভিসন্ধি বা কৈতব থাকে না, যখন সেই অব্যক্ত কালো অথচ সদা স্বপ্রকাশিত রূপের সাগরে জীব ডুবিয়া যায়, তখন এক অদ্ভুত ভাব প্রকাশিত হয়। তখন দেখে যে সেই একেরই অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রবৎ সত্ত্বার মধ্যে কি এক টান্ বহিতেছে; তুমি আমি নাই, অথচ সেই মহাসমুদ্রের ভিতরেই কি এক অমৃতঘন, আনন্দঘন, স্রোত বহিতেছে। দ্রষ্টা ও দৃশ্য নাই ও দৃশ্যের ভাব এবং ভোগ নাই, অথচ কি এক জ্ঞানঘন সত্ত্বা আপনাতে আপনি উছলিয়া উঠিতেছে; বিশিষ্ট রূপ বা আকার নাই, অথচ "রূপ্যতে ইতি রূপম্" কি এক রূপের স্রোত বহিয়া যাইতেছে। "ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কালো রূপের সাগরে" প্রকাশিত রূপ নয় বলিয়াই সে কালো রূপ। ইহাই ভাগবতের উপদেশ;—

'ধর্ম্ম প্রোজ্ঝিত কৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাং।
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্ ॥"

প্রকৃষ্টরূপে উজ্ঝিত কৈতব বা ফলাভিসন্ধিরূপ কপটভাব শূন্য; সুতরাং

এমন কি মোক্ষাভিসন্ধিও যাঁহাদের নিরস্ত হইয়াছে, যাঁহারা নির্ম্মৎসর বা পরোৎকর্ষ অসহিষ্ণু নহেন, যাঁহারা সৎ বা ভূতানুকম্পী, তাঁহাদেরই অবলম্বনীয় ধর্ম্ম ভাগবতে উক্ত। ইহার বেদ্য বাস্তব বা প্রকৃত বস্তু বা পরমাত্মা।

এ সম্বন্ধে শ্রীধরের ভাষ্য সম্বন্ধে দুই একটী বাক্য না বলিয়া থাকা যায় না। স্বামী বলিলেন "প্রশব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ", অর্থাৎ 'প্রজ্মিত কৈতব' শব্দের 'প্র' শব্দে মোক্ষাভিসন্ধি পর্য্যন্ত নিরস্ত হইতেছে। ইহাতে এমন বুঝায় না যে, মোক্ষ নিকৃষ্ট বস্তু; কারণ মোক্ষই ভগবানের স্বরূপ। মোক্ষ জীবলভ্য অবস্থা নহে, উহা ভগবৎ স্বরূপের অভিব্যক্তি বা স্বপ্রকাশশীলতা। যিনি 'আমি মোক্ষ লাভ করিব' বলিয়া ভাবেন, তাঁহার 'আমিটী' থাকিয়া যায়, এজন্য তাঁহার মোক্ষ হইতে পারে না। স্বামী মোক্ষের নিন্দা করেন নাই, মোক্ষের অভিসন্ধিকে নিন্দা করিয়াছেন। ভাগবতে গজেন্দ্রের স্তবে উক্ত হইয়াছে, "নমঃ কৈবল্যনাথায় নির্ব্বাণ সুখসংবিদে।" ৮।৩।১১ অর্থাৎ শ্রীভগবানই কৈবল্য বা মোক্ষের অধিপতি এবং নির্ব্বাণ সুখরূপ চৈতন্য স্বরূপ। পুনরায় "নৈষ্কর্ম্ম্যভাবেন বিবর্জ্জিতাগমঃ স্বয়ং প্রকাশায় নমস্করোমি।" ৮।৩।১৬। অর্থাৎ "নৈষ্কর্ম্ম্যমাত্মতত্ত্বং তস্য ভাবেন ভাবনয়া বিবর্জ্জিতা আগমা বিধিনিষেধলক্ষণা যৈস্তেষু স্বয়মেব প্রকাশো যস্য তস্মৈ" ইতি শ্রীধর। নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ আত্মতত্ত্বের সাধনার দ্বারা, যাঁহারা বিধিনিষেধ মার্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরে যিনি স্বয়ং প্রকাশ হ'ন। পুনরায় "মুক্তাত্মাভিঃ স্বহৃদয়ে পরিভাবিতায়, জ্ঞানাত্মনে ভগবতে নম ঈশ্বরায়॥ ৮।৩।১৮। অর্থাৎ যিনি মুক্তাত্মগণের দ্বারা স্বহৃদয়ে পরিভাবিত হইয়া জ্ঞানরূপে প্রকাশ পান। এইরূপ ভাগবত হইতেই শত শত স্থানে শত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া দেখান যায় যে, ভাগবতের মতে মোক্ষই ভগবানের স্বরূপ, এবং উহা জ্ঞানঘন আনন্দঘন রূপ। এই স্বরূপের অবগতি কেবল "অহং" জ্ঞানের মোহত্যাগ হইলেই হইতে পারে।

"নায়ং বেদ স্বমাত্মানং যচ্ছক্ত্যাহহং ধিয়া হতম্।
তং দুরত্যয়মাহাত্ম্যং ভগবন্তমিতোঽস্ম্যহম্॥" ভাঃ—৮।৩।২৯

'অহং' বুদ্ধিরূপ শক্তি বা মায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন থাকাতে যাঁহার স্বরূপ অবগত হওয়া যায় না, সেই দুরত্যয় মাহাত্ম্য শ্রীভগবানকে নমস্কার।

শ্রীভগবানই ভাগবতে পরম বেদ্য। এই শাস্ত্র এমন ভাবে লিখিত হইয়াছে যে, ভক্তিপূর্ব্বক পাঠ করিলে ভগবানের স্বরূপ আপনাপনি হৃদয়ে

ফুটিয়া উঠে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্ত রহিল যে ভাগবত কেন ব্রহ্মভাব অপেক্ষা ভগবৎ ভাবের মহিমা অধিকতর স্ফুরণ করিবার চেষ্টা করেন? উহা বারান্তরে আলোচিত হইবে। (ক্রমশঃ)

যোগানন্দ ভারতী।

মোক্ষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

"মোক্ষায় মোক্ষরূপায় মোক্ষকর্ত্রে নমোনমঃ।" যিনি মোক্ষ—মোক্ষই যাঁর শুদ্ধরূপ বা প্রকাশ, যাঁহার অনুগ্রহ ভিন্ন মোক্ষলাভ হয় না, সেই শিব শান্ত নিষ্কল ভগবানকে নমস্কার করিয়া প্রবন্ধ প্রকৃত প্রস্তাবে আরব্ধ হইল। সেই শুদ্ধ জ্ঞানঘন পরম তত্ত্ব আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া আপনিই আপনার স্বরূপ উদ্ভাসিত করেন।

মোক্ষ শব্দে মুক্তি বুঝায়। মুক্তি অর্থে কাহার কি এক প্রতিবন্ধক খসিয়া যাওয়া বুঝায়। মুক্তি কাহার হয়, আর প্রতিবন্ধকই বা কি এবং উহা কিরূপেই বা খসিয়া যায় ইত্যাদি কয়েকটী প্রশ্ন আপনা আপনি জাগিয়া উঠে। প্রশ্নগুলির সমাধান না হইলে মোক্ষ কি তাহা বুঝা যায় না। সেইজন্য আমরা প্রথমে এই প্রশ্নগুলি লইয়া কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

"কাহার মুক্তি হয়?"—সকলেই একবাক্যে উত্তর দিবে জীবের মুক্তি। অমনি পুনরায় প্রশ্ন উঠিবে "জীব কে?" যাহার মুক্তির আবশ্যকতা আছে, সে "জীব কে?" এ সম্বন্ধে নানা শাস্ত্রে নানা উপদেশ আছে। চার্ব্বাক বলিলেন, সজীব দেহই জীব। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বলিলেন,—প্রাণন ক্রীয়াশীল দেহ ও চৈতন্যের সংযোগই জীব। 'সদেহস্য আত্মানো বিপর্য্যমান ধর্ম্মাশ্চয় সহিতস্য মনসা সহ সংযোগাঃ সম্বন্ধো জীবনং।" শ্রীধরাচার্য্য ন্যায় কন্দলী। অর্থাৎ আত্মার বিপর্য্যমান বা বিকারশীল কর্ম্মের আশায়ও দেহের সহিত মনের দ্বারা সংযোগকে জীবন বলে। চরক বলেন,—

"শরীর ইন্দ্রিয়সত্বাত্ম আত্ম সংযোগধারি জীবিতম্।
নিত্যগশ্চানুবন্ধশ্চ পর্য্যায়ৈরায়ুরুচ্যতে॥"

অর্থাৎ ভোগ আয়তন পঞ্চ মহাভূত বিকার শরীর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সত্বা বা মন ও আত্মা এই সকল পদার্থের পূর্ব্ব কর্ম্ম নিয়ামিত সংযোগকে আয়ু বলে।

আয়ুর্ব্বেদের জীব, শরীর, মন ও আত্মার সংযোগে মিশ্রিত পদার্থ; সুতরাং আয়ুর্ব্বেদোক্ত জীবের মুক্তি হইতে পারে না; কারণ উহা ভোগায়তন দেহের সহিত সংবদ্ধ থাকিবেই থাকিবে। স্তায় ও বৈশেষিক মতে জীবাত্মার স্বরূপ প্রাণাপান, নিমেষ-উন্মেষ, ক্ষত ও ভগ্নের সংরোহণাদি লক্ষণ, জীবন, কার্য্য, মনোগতি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রযত্ন। "ইচ্ছাদ্বেষপ্রযত্ন-সুখদুঃখজ্ঞানান্যাত্মনোলিঙ্গমিতি।" ন্যায় দর্শন—১।১।১০ "প্রাণাপানঃ-নিমেষোন্মেষজীবনোমনোগতিরিন্দ্রিয়ানান্তরোবিকারাঃ সুখ-দুঃখেচ্ছা প্রযত্না-শ্চাত্মনোলিঙ্গানি।" (বৈশেষিক—৩।২।৪)। সুতরাং আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিশিষ্ট নামধারী ব্যক্তিগত জীবই ন্যায়াদির মতে আত্মা এবং মোক্ষ শব্দে ঈশ্বরানুগ্রহে শরীরাদির সহিত সংযোগশূন্য হইয়া, অথচ নিজের বিশিষ্ট ভাব না হারাইয়া অবস্থানই মোক্ষ। জীব নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছাদিতে ঈশ্বরের অভীপ্সিত ভাবে শাস্ত্রপ্রতিষ্ঠ পথে প্রয়োগ করিতে করিতে মোক্ষ পদের অধিকারী হয়। মোক্ষে তাহার স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয় না। এক্ষণে মনে রাখা আবশ্যক যে, এই প্রকার মোক্ষ কর্ম্ম জন্য এবং উহাতে ভিন্ন জীব ভাবের তারতম্য হয় না। ব্যক্তিগত জ্ঞানে কর্ম্ম না করিয়া ঈশ্বরের অভীপ্সিত পথে চলিতে চলিতে তাঁহার ইচ্ছা ও দ্বেষ প্রভৃতি প্রবৃত্তিগুলি শ্রীভগবানের সর্ব্বাত্মিকা নিয়মাদির সহিত মিলিত হইয়া তদ্ভাবাপন্ন হইয়া আনে। এক কথায় এই প্রকার মোক্ষে জীবের 'জীব'বুদ্ধি অটুট থাকে। কেবল কর্ম্মের প্রবৃত্তি আর ব্যক্তিগত ভাবে প্রণোদিত না হইয়া, ঈশ্বরের অভীপ্সিত সর্ব্বাত্মিকা ভাবে প্রযুক্ত হয়। তাহার সহিত ঈশ্বরের মিলন ঐকদেশিক। তাহার কার্য্যের সহিত ঈশ্বরের কার্য্যেরও মিলন হয়; এবং ঐ মিলন ক্ষণস্থায়ী। কারণ যতক্ষণ ব্যক্ত জগৎ থাকে, যতক্ষণ কার্য্য থাকে, ততক্ষণই ঐ মিলন থাকে। এ পথে আর একটী দোষ আছে, সেটী পরে বিবেচ্য।

পূর্ব্ব মীমাংসা মতে ধর্ম্মাধর্ম্মই শরীর উৎপত্তির কারণ। তাঁহারা বলেন, শরীর যদি কর্ম্ম জন্য—উপভোগের জন্য হইত, তাহা হইলে সেই উপভোগের পর শরীরের কোন কারণ বা হেতু না থাকাতে শরীরও থাকিতে পারে না।

"কর্ম্মজন্য উপভোগার্থং শরীরং ন প্রবর্ত্ততে
তদভাবে ন কশ্চিদ্ধিহেতুস্তত্রাবতিষ্ঠতে।" শ্লোকবার্ত্তিক।

কর্ম্ম প্রবৃত্তিমূলক। যখন প্রবৃত্তিগুলি থাকে না, তখন কর্ম্মও থাকে না।

কর্ম্ম ও প্রবৃত্তি উভয়েই সাময়িক ভাব। এক ক্ষণে এক প্রবৃত্তি, পরক্ষণে অন্য প্রবৃত্তি এবং সময়ে সময়ে কোনরূপ প্রবৃত্তিই থাকে না। সুতরাং শরীর ও জীবভাব কর্ম্মজন্য হইলে, প্রবৃত্তির অভাবে শরীরেরও নাশ হইয়া যায়। বাহিরের বৃত্তের দিকে অভিমুখী গতির নাম প্রবৃত্তি; বৃত্ত পড়িয়া গেলে কেন্দ্রের জ্ঞানও থাকে না। সুতরাং প্রবৃত্তি যদি মূল কারণ হইত, কর্ম্মই যদি জীবের স্বরূপের ভাষা হইত, তাহা হইলে শরীরও ক্ষণস্থায়ী হইত; এবং মৃত্যুর পর স্বর্গ নরকাদি ভোগে প্রবৃত্তিগুলি প্রশমিত হইলে, পুনরায় শরীর ধারণের প্রতি কোন কারণ পাওয়া যাইত না। সেইজন্য পূর্ব্ব মীমাংসকগণ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সূক্ষ্মতর কারণকে জীবের প্রকাশের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মাধর্ম্ম শব্দের অর্থ না বুঝিয়া আজকালকার সাধকগণ মুক্তির অবস্থায় এক জাতীয় কর্ম্ম স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারে না। ধর্ম্ম শব্দে ক্রিয়া-বহুল বিশিষ্ট পদ্ধতিমাত্র বুঝায় না। পাতঞ্জল ভাষ্যে উক্ত আছে,—"স চ সংস্থানবিশেষো ভূতসূক্ষ্মাণাং সাধারণো ধর্ম্ম আত্মভূতফলেন ব্যক্তেনানুমিতঃ স্বব্যঞ্জকাঞ্জনঃ প্রাদুর্ভবতি, ধর্ম্মান্তরোদয়ে চ তিরোভবতি, স এষ ধর্ম্মোঽবয়বীত্যুচ্যতে, যোঽসাবেকশ্চ মহাংশ্চানীয়াংশ্চ স্পর্শবাংশ্চ ক্রিয়াধর্ম্মকশ্চানিত্যশ্চ, তেনাঽবয়বিনা ব্যবহারাঃ ক্রিয়ন্তে।" পাঃ ১।৪৩। অর্থাৎ ধর্ম্ম শব্দে এক বুদ্ধির উপক্রম বা বহুর মধ্য দিয়া একত্বের উপলব্ধি বুঝায়। 'বহু'গুলি এমন ভাবে এরূপ ক্রমের মধ্যে আসিয়া পড়ে, যে তখন উহারা এক উর্দ্ধগ ক্রমের মধ্যে আপনাদের বিশিষ্ট ভাবগুলি এরূপ ভাবে পরিণত করে, যাহাতে ব্যক্ত 'বহু' সত্য বলিয়া মনে হইলেও, তাহার ভিতর দিয়া একের আভাষ পাওয়া যায়। বহুগুলির প্রচয় বা পর্য্যায় কিংবা ক্রমের জন্যই প্রকাশিত ধর্ম্মটীও বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। যেমন গরুর ধর্ম্ম বা ঘটের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম সংস্থান বা বিশিষ্ট ভাবগুলি ক্রমের দ্বারা বিশেষিত, উহা অবয়বী ভাব (Organic life); এবং নিদানভূত ভাবগুলি যেরূপে সন্নিবেশিত, ধর্ম্মটীও সেইরূপ বোধ হয়। উহা নিদানভূত ভাবগুলির সূক্ষ্ম ও সামান্য ধর্ম্ম এবং উহাদের আত্মভূত বা উহাদের স্বরূপের ভিতর দিয়া অভিব্যক্ত। এই ধৃতি বা ধারণশীলতা বা বহুকে একভাবে পরিণতি শক্তিটী তাহার ব্যক্ত ভাবের দ্বারা অনুমিত হয় এবং আপনার ব্যঞ্জক একত্ব ভাবের অঞ্জনা বা প্রকাশ করে। বিভিন্ন ধর্ম্মের উদয় হইলে উহার তিরোভাব হয়, এই ধর্ম্মকেই অবয়বী বলে। উহা এক, কারণ সকল প্রকার অবয়বীর ভিতর দিয়া অবয়বের অতীত একককে দেখাইবার জন্যই উহার প্রবৃত্তি। উহা মহৎ অণুভাবে থাকিতে

পারে এবং স্পর্শের দ্বারাই জ্ঞাত হয়। এই ধর্ম্ম না থাকিলে ব্যবহার সিদ্ধ হয় না।

উপরোদ্ধৃত ব্যাসভাষ্যের মর্ম্ম বুঝিতে গেলে বিশেষ দৃষ্টান্ত লওয়া আবশ্যক। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে মানব ও গো শরীরের নিদানভূত অণুগুলির কোন পার্থক্য নাই; অথচ কোন শক্তির বলে মানবের অণুগুলির দ্বারা মানব ধর্ম্ম ও পশুর অণুগুলির দ্বারা পশু ধর্ম্ম লক্ষিত হয়। সুতরাং অণুগুলির অতীত বৃহত্তর জীবনীশক্তি স্বীকার করিতে হয়। এই শক্তিকে পাশ্চাত্য শরীর-তত্ত্ববিদ্গণ (Somatic life) পশুত্ব জীবনীশক্তি নামে অভিহিত করিয়াছেন। এই শক্তিটী নিজে প্রসুপ্তভাবে থাকে, কেবল ক্রিয়ার দ্বারা ইহার অনুমান হয়। মানবের ভুক্ত অন্নাদি হইতে তাহার শরীরের যেস্থানে যেরূপ শক্তি সম্পন্ন অণুর আবশ্যক, তদনুরূপ অণু সকল সৃষ্ট ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। পশুর দেহে অন্য প্রকার হয়, সুতরাং শরীরের ভিতর দিয়া দেখিতে গেলে, এই ধর্ম্ম অণু সকলের প্রচয় বা সংস্থান দ্বারাই বিশেষিত হয়। সকল অণুগুলিই আপন আপন ভাবে এই এক ধর্ম্মের দ্বারা পুষ্ট হয় বলিয়াই উহা সাধারণ ধর্ম্ম। অথচ এতদ্দ্বারা শরীরস্থ অণুগুলি এরূপভাবে সংগৃহীত (co-ordinated) হয়, যে তাহাদের বিশিষ্ট ভাষার মধ্য দিয়া শরীরধারী জীবের চৈতন্য অভিব্যক্ত হইতে পারে। সুতরাং ধর্ম্ম শব্দে অবয়বী (Organic life) বুঝায়।

সেইরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে একই ধর্ম্মের অভিব্যক্তি হইতেছে। ব্রহ্মাণ্ডরূপ অবয়বের মধ্যে ঋষি, দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় অণুসকল আছে। এই মহান্ শরীরের অধিষ্ঠাতা স্বয়ং ভগবান্ ও সৃষ্টি বিষয়ক ইচ্ছা বা কামই মূল শক্তি। উহা একেরই অভিব্যক্তি বলিয়া সনাতন। অণু-পরমাণুগুলির মধ্যে বিরুদ্ধভাব উৎপন্ন হইলে বা ব্রহ্মাণ্ড অবয়বের ধর্ম্মের গ্লানি হইলে, অবয়বী ভগবানের নিকট হইতে বহির্ম্মুখী (Efferent) শক্তির বিকাশ হয়। ঐ শক্তির অভ্যন্তরস্থ ভগবৎ-বিম্বকে অবতার বলে। যেমন অজ্ঞাতসারে অগ্নিকুণ্ডে হস্ত পড়িলে আমাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও শারীরিক ধর্ম্মের বশে হস্ত আপনিই সঙ্কুচিত হয়, সেইরূপ সত্ত্বগুণনিধি ভগবান্ হইতেও অসংখ্য অবতারের সৃষ্টি হয়। "অবতারাহ্যসঙ্খ্যেয়াঃ হরেঃ সত্ত্বগুণেনিধেঃ।" ভাঃ—১।৬।২৬। সাধারণতঃ এই সকল অবতার ধর্ম্মরক্ষার জন্য, "যদাযদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত * * * * * তদাত্মানং সৃজাম্যহম্।" সুতরাং বুঝা গেল ধর্ম্মই বিশ্বের অবয়বী ভাব। উহা অবয়বী ঈশ্বরের অভিব্যক্তি বটে,

কিন্তু সেই অভিব্যক্তি ব্যবহারিক এবং জগতের সংস্থানের জন্য। উহার দ্বারা এককে জানা যায় বা সেই একত্বের বুদ্ধির উপক্রম হয়। কিন্তু সেই একের অভিব্যক্তি সৃষ্টিমূলক, উহা তাঁহার স্বরূপ ভাব নহে, উহা তাঁহার 'বহুর' সঙ্গে লীলা, উহা হইতে বিশ্ব অপগত হয় নাই। পাঠক, বুঝিলেন কেন শ্রীভগবানের বিষ্ণুভাবই ধর্ম্মের অধিপতি ও অবতারের মূল? তাঁহার ব্রহ্মাভাবে ও শিবভাবে অবতার নাই। উহা সনাতনের প্রকাশ বলিয়া সনাতন হইলেও উহাতে মায়ার বিলাস আছে। ইংরাজী somatic life বা পশুত্ব চৈতন্য কথাটী কি সুন্দরভাবে ক্ষীরোদশায়ী প্রসুপ্ত বিষ্ণুর ইঙ্গিত করিতেছে।

ধর্ম্মের দ্বারা মোক্ষ বা স্বরূপ ভাব লাভ হয় না। সেইজন্য কঠশ্রুতি বলিলেন,—"ধর্ম্মাৎ অন্যত্র অধর্ম্মাৎ অন্যত্র" ধর্ম্ম হইতে অন্য, অধর্ম্ম হইতেও অন্য। সেইজন্য শ্রীভগবান্ নিজ মুখে বলিলেন,—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেক শরণং ব্রজঃ"। সেইজন্য যোগশাস্ত্রে ধর্ম্ম-মেঘ সমাধির অনেক পরে প্রকৃত সমাধি। সেই জন্যই গোপীগণের ধর্ম্মত্যাগ ও যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণ পত্নীগণের স্বধর্ম্ম ত্যাগের কথা উল্লিখিত হয়। তবে যাঁহারা এখনও বিশিষ্ট বস্তু, সুখ-দুঃখ ও চিত্ত-বৃত্তির বশ, যাঁদের ভিতর ধর্ম্ম স্বরূপ ধর্ম্মপতি শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি লক্ষিত হয় না, তাঁহারা ধর্ম্মত্যাগ করিতে গেলেই বিপথগামী হইবেন। আজকাল কয়জন ধর্ম্ম শব্দের প্রকৃত অর্থ বুঝিয়াছেন, কয়জন প্রকৃত প্রস্তাবে আপনার "অহং" জ্ঞান সিদ্ধ করিতে পারিয়াছেন ও পরে সেই "অহং"জ্ঞানকে—সেই সাধের 'আমিটীকে' শ্রীভগবানের বিশ্বাত্মিক মহা প্রকাশের অণুরূপে বুঝিয়া 'অহংটিকে' সেই মহা যন্ত্রীর যন্ত্র মাত্র বলিয়া জানিতে পারিয়াছেন। অথচ যে কেহ একটু মাথা চাড়া দিয়া উঠিলেন, একটু ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন, একটু কপ্‌চাইতে শিখিলেন, অমনি বর্ণাশ্রম ধর্ম্মরে প্রতি কুটিল দৃষ্টি পড়িল। অমনি সেই মহান্ অবয়বীর অবয়বের অণু সংস্থানের পর্য্যায়টী না উল্টাইয়া ফেলিয়া আপনাপন মতে পুনরায় সৃষ্টি করিতে না পারিলে কাহারও তৃপ্তি নাই। যেমন ব্যাসদেবের ব্যাস-কাশী বিশ্বামিত্রের সৃষ্টি, আর মহানুভব ঋষিদের সহিত এক কথায় সংযোজিত করিতে লজ্জা হয়, শ্রীমতী আনি বেশান্তের সঙ্কল্পিত বর্ণাশ্রমের আত্মকৃত্য। ধর্ম্মের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ না হইলে এবং তৎ সাহায্যে বহু হইতে একের অভি-মুখী বুদ্ধি হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত না হইলে, ভগবানের স্বরূপ লইয়া আলোচনা করা কেবল বাতুলতা মাত্র। আচার্য্য শঙ্কর এই জন্যই ধর্ম্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়া-

ছিলেন। স্বয়ং মহাপ্রভুও বৈধী বা শাস্ত্রানুমোদিত সাধনাকে আপনার শিক্ষার ভিতর স্থান দিয়াছেন। ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়াও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভিতর নেড়ানেড়ী ও বাউলের দল তন্ত্রের ভিতর দিয়া ভোগ-রস সিদ্ধির উপায় স্বরূপ সাধারণ ভাবে গৃহীত পঞ্চ'মকার' সাধনা প্রথার সৃষ্টি হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

কস্যচিৎ ভট্টাচার্য্যস্য।

ধর্ম্ম]

পদ।

বহ্নি শিখা সম তাপিত করিল রে, সংসার ধন জন গেহ,
শান্তি শীতল বারি কোথায় পাইব রে, অপার অসীম স্নেহ॥
জগতের সুখে মন নাহি যাওয়ে, (তাহে) দুঃখ ক্লেশ শুধু সার।
তাহে মজিয়া মন দিন গোঁয়ায়লি, (হায়) বিফল জনম এইবার॥
আশা-মরীচিকা সম ধাঁধিছে মন রে, ধাবিত চিত্ত সদা তাহে।
লক্ষ্য নাহি মিলল শ্রম সার ভেল, খিন্ন প্রাণ মন মোহে॥
হে দীন-তারণ দুঃখী-দুঃখ-বারণ, শরণ লইনু তুয়া পায়।
জনম সফল কর করুণা প্রকাশি, দাস ভিক্ষা এহি চায়॥

ধর্ম্ম]

প্রণব-রহস্য।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে প্রণব একটী পরাগতি। ঐ গতি আছে বলিয়াই জীব মায়ার ক্ষেত্রে শ্রীভগবানের ব্যঞ্জনা দেখিতে পায়। প্রণব ভিন্ন ভগবানে পৌঁছিবার দ্বিতীয় পথ নাই বলিয়া, যোগ-শাস্ত্রেও প্রণবের এত আদর। এইজন্য শ্রুতি প্রণবকে ধনুরূপে লক্ষিত করিয়াছেন। ধনুর আত্মভূত শক্তির সাহায্যে শর যেরূপ লক্ষ্যস্থ হইতে পারে, সেইরূপ অনন্ত নামরূপী বিলাসের মধ্যে মুগ্ধ জীব প্রণবের মূল প্রবৃত্তিটী জানিতে পারিলে, তবেই ভগবানের দিকে যাইতে পারিবে। "প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় শব্দ ব্রহ্ম সুদূর বোধ্য" একদিকে নামের অনন্ত খেলা ব্রহ্মা হইতে কীটানু পর্য্যন্ত অনন্ত ভাবের অভিব্যক্তি স্থান বা কেন্দ্র সকল সদা বিতত হইয়া রহিয়াছে, অপর দিকে রূপেরও অনন্ত প্রসার; তাহা মানবের সাধ্য নাই, যাহা ইয়ত্তা করিতে পারে। ভাগবত বলিয়াছেন;—

"শব্দব্রহ্ম সুদুর্ব্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্ ।
অনন্ত পারং গম্ভীরং দুর্বিগাহ্যং সমুদ্রবৎ ॥১১।২২।৩৬
ময়োপবৃংহিতং ভূম্না ব্রহ্মণানন্তশক্তিনা ।
ভূতেষু ঘোষরূপেণ বিসেষূর্ণেব লক্ষ্যতে ॥ ৩৭
যথোর্ণনাভিহৃদয়াদূর্ণামুদ্বমতে মুখাৎ ।
আকাশাদ্‌ঘোষবান্ প্রাণোমনসা স্পর্শরূপিণা ॥ ৩৮
ছন্দোময়োঽমৃতময়ঃ সহস্রপদবীং প্রভুঃ ।
ওঙ্কারাদ্‌ব্যঞ্জিতস্পর্শ স্বরোষ্মান্তস্থ ভূষিতাম্ ॥ ৩৯
বিচিত্র ভাষাবিততাং ছন্দোভিশ্চতুরুত্তরৈঃ ।
অনন্ত পারং বৃহতীং সৃজত্যাক্ষিপতে স্বয়ম্ ॥ ৪০
গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্ চ বৃহতী পঙ্‌ক্তিরেব চ ।
ত্রিষ্টুব্‌জগত্যতিচ্ছন্দোহ্যত্যষ্ট্যতি জগদ্বিরাট্ ॥" ৪১

শ্রীভগবানের প্রকাশ মূর্ত্তিই তাঁহার অসীমতার অভিব্যঞ্জক বলিয়া তিনি ব্যক্ত-রূপেও অনন্ত। তারপর পত্যেক জীবের প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও মন এই তিন ভাবে জটিল হইয়া যাইতেছে। যে বস্তু একের নিকট হেয়, তাহাই আবার মনের বিভিন্ন ভাবের জন্য অপরের নিকট প্রেয়। এইরূপে একদিকে বস্তু ও শক্তির অনন্ততা, তাহার উপর জীবের বিশিষ্ট ভাবরাশির খেলা হইয়া প্রত্যেক বস্তুই অনন্ত ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে। এই মহাসমুদ্র স্বরূপ দুরভিগ্রাহ্য গম্ভীর ও অনন্ত পার প্রকাশের মধ্যে শ্রীভগবানের 'অহং' শক্তি কর্ত্তৃক উপবৃংহীত ব্রহ্ম বা চৈতন্যময়ী প্রকৃতি ভূমার সর্ব্বাত্মিকা মহাভাবের খেলা হইতেছে। মৃণাল সকলে উর্ণার ন্যায় এই বিস্তার প্রণালী প্রাণিগণের নাদ বা ঘোষরূপে লক্ষিত হয়। উহাই প্রত্যেক প্রাণীর হৃদ্‌গত অন্তরতম ভাষা। যেমন উর্ণনাভ স্বীয় হৃদয় হইতে মুখ দ্বারা উর্ণাতন্তু সকল বিস্তার করে, তদ্রূপ স্বরূপতঃ অমৃতময় ভগবানের হৃদয় হইতে প্রাণ বা কারণ-ব্রহ্মের চেতোমুখ হইতে হিরণ্যগর্ভরূপী নাদ অভিব্যক্ত হইয়া প্রাণ ও মন রূপ স্পর্শ বর্ণের মধ্য দিয়া অনন্ত পার বৃহতী ছন্দের অভিব্যক্তি হয়। এই বৃহতীই বিশ্বের অন্তর্গত ব্যক্ত অনন্তাভিমুখী (nemerical infinity) প্রসাদ বৃত্তি বা ছন্দ (Rythem) এই বৃহতী ছন্দের বশেই প্রত্যেক বিশিষ্ট পদার্থ অনন্ত ভাবে ব্যক্ত 'সর্ব্বের' সহিত কার্য্য-কারণ-কর্ত্তৃত্বের সম্বন্ধে অন্বিত হয়; ইহাই বেদের প্রথম ভাষা। এই ভাষা দেখিয়াই কবি Tenyson বলিয়াছিলেন, Stars to Stars vibrate" ইহাই ব্রাহ্ম-

সমাজের “গ্রহ হ'তে গ্রহে ছুটিছে প্রেম, গ্রহ হ'তে গ্রহে ছাড়িছে”। এই ভাষায় বা ছন্দে কবি Wordsworth সামান্য একটী প্যান্সি (Pansy) ফুল দেখিয়া কি এক মহান্ অনন্ত পার সমুদ্রে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। এই ছন্দের বশেই ক্ষুদ্র মানব দেবতাদের সহিত সংবদ্ধ। এই বৃহতী ছন্দের ভাষা অনেক; উহার বিশাল বক্ষে ও কণ্ঠে স্পর্শ বা ব্যঞ্জন ও বিশিষ্ট বর্ণ স্বরঃ বা সংযোগিনী শক্তি, উষ্ম ও লয়-মূলক অন্তস্থ্য বর্ণ দ্বারা ভূষিত হয়। তাহাও বিবিধ ভাষায় বিতত ও উত্তরোত্তর চারি অক্ষরে বা জাগ্রতাদি ভাবের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত। বৃহতী ভিন্ন আরো কয়েকটী ছন্দ আছে, তাহাদিগের নাম উষ্ণিক্, অনুষ্টুপ্, পঙ্ক্তি, ত্রিষ্টুব্, জগতী ও গায়ত্রী প্রভৃতি। জগতী ছন্দে সাধারণ জীবের চিত্ত সংবদ্ধ হয়, সেইজন্য ভিতরে আত্ম-প্রকাশ হইলেও উহা জগতের ভাষায় বিশিষ্ট মন্ত্র, শক্তি, সাধনা বা বস্তুমূলক বলিয়া না ভাবিয়া থাকিতে পারে না। গায়ত্রী ছন্দ প্রণবরূপ পরাগতির অভিব্যক্তি, উহা এক প্রকার ভাব-প্রবণতা। যখন প্রত্যেক জগদ্বস্তুকে দেখিলে, তাহার স্থূল মূর্ত্তিতে তৃপ্ত না হইয়া আমরা উত্তরোত্তর উহার ভুবঃ (Astral) স্বঃ (mental) প্রভৃতি সূক্ষ্মতর ভাব দেখিতে দেখিতে অবশেষে ঐ ভাবরাশির কেন্দ্রস্থল ভগবানের বিরাট্ প্রকাশমূর্ত্তি দেখিতে পাই, যখন প্রত্যেক জগদ্বস্তুর মধ্যে আমাদের চিত্ত বিশিষ্টতায় নিমজ্জিত না হইয়া, চিত্তের সাক্ষী ও বুদ্ধির প্রেরণাকারী শ্রীভগবানের ভাব দেখিতে সক্ষম হয়, তখনই আমরা গায়ত্রীর অধিকারী হই। তাহা না হইলে শুধু 'সাপের মন্ত্র' আওড়াইয়া ফল কি? ছন্দগুলি চৈতন্যের মৌলিক ভাষা। যাহার ভিতর ভাষা না ফুটিয়াছে, সে ছন্দের কি বুঝিবে। পাঠক! কলিকালে আমাদের অবনতি কতদূর হইয়াছে, তাহা ইহা হইতেই বুঝিয়া লইবেন।

এই অভিব্যক্তির অনন্ততার মধ্যে প্রণবই একমাত্র গতি বা পথ। উহাই কঠোপনিষদোক্ত পুরুষরূপী 'পরাগতি'; কারণ উহা সর্ব্বদা পুরুষে স্থির হইবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। এইজন্য ভাগবত বলিলেন;—“পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষ মম চ প্রিয়ম্।” পর অতীত (Transcendent) শ্রীভগবানের স্বরূপ ভাবকে লক্ষ্য করিয়াই ঋষিরা উপদেশ দেন, তাহাদের পক্ষে শ্রীভগবান্ দ্বিতীয় বেদ্য ও বক্তব্য নাই। ভগবান্‌ও পরোক্ষ বা পরাভাবে প্রীত হ'ন। তাই ভাগবত বলিলেন;—

“এতাবান্ সর্ব্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রমনূদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি।” ভাঃ ১১।২১।৪৩

এইরূপ 'সর্ব্ব'ভাবের সর্ব্বাত্মিকতাগুলি যে ভগবানকে আশ্রয় করিয়া আছে, ইহা দেখাইয়া পরে ভেদ সকল যে কেবল মায়ামাত্র, ইহা বুঝাইয়া সর্ব্বশেষে সেই ভেদ-প্রবৃত্তি ও সর্ব্বাত্মিকতারূপ প্রবণতাগুলি শ্রীভগবানে বিশেষরূপে বিলোপ করিয়া, সেই পরম তুরীয়ের প্রতিপত্তিই বেদের ভাষা। ইহাই আচার্য্যের "পূর্ব্ব পূর্ব্ব পাদস্য প্রবিলাপনেন তুরীয়স্য প্রতিপত্তিঃ।"

আমরা আগামী বারে এই প্রতিষেধ খেলার রহস্য আর একটু বুঝিবার চেষ্টা করিব। (ক্রমশঃ)

শ্রীখগেন্দ্রনাথ অলব্ধ-বেদান্ত।

কাম]

অন্বেষণ।

যত যাই, ততই খুঁজি; যত দুর্ব্বহ জীবন-ভারে ক্লিষ্ট হইয়া জীবনের পথে চলিয়া যাই, ততই যেন কাহার আশায়—কাহার প্রতীক্ষায় কাতর নয়নে শূন্য পানে চাহিয়া থাকি! মনে মনে এই আশা যদি কোন দয়াময় আমাকে এই জীবনের পথে ভরসা প্রদান করেন, যদি হৃদয়ে একটু বল দিয়া আমার গতি ও গন্তব্য নির্ণয় করিয়া দেন। পদে পদে বিফল মনোরথ হইয়া হৃদয় শতধা ছিন্ন হইয়া যাইতেছে, কিন্তু তবুও ত' গতির বিরাম নাই, লালসার শান্তি নাই! উঃ না জানি হৃদয়ের রক্তে পদ প্রক্ষালন কতই কঠোর! এদিকে সময় অপেক্ষা করে না, ছিন্ন হৃদয়ের শোণিত যে মুছিয়া ফেলিব, তাহার জন্য কালের স্রোত অপেক্ষা করে না। ভুল হোক্ আর ভ্রান্তিই হোক্—পাপের দণ্ডই হোক্ আর প্রায়শ্চিত্তই হোক্, জীবনের গতির বিরাম নাই। নিমেষের পর নিমেষ গত হইতেছে, প্রতি নিমেষে এই জীবন পরিণাম প্রাপ্ত হইতেছে; এই পরিণাম-শীলতার তিলার্দ্ধ বিশ্রাম নাই। এই পৃথিবীতে যে মানব রাজদ্বারে দণ্ডিত হয়, সে-ও শাসনের মধ্যে বিশ্রামের সময় পায়; কিন্তু এই যে অবিশ্রান্ত গতিতে চলিয়া যাইতেছি, ইহার মধ্যে যে একটু থামিয়া পথ দেখিয়া লইব তাহার সময় নাই, তাহার জন্যও কালের স্রোত অপেক্ষা করে না। এই অবিশ্রান্ত আঁখিজল ফেলিতে ফেলিতে যে একবার মাত্র অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া লইব—গন্তব্য পথটী দেখিয়া লইব, তাহারও ত' অবসর নাই! তাই ত' শূন্যপানে চাহিয়া থাকি, যদি কোন করুণাময় পুরুষ এই বিপদে—এই সঙ্কটে পরিত্রাণ করেন।

এই দারুণ যাতনার মধ্যে একটু শান্তি পাইবার জন্য সততই সেই দয়াময় পুরুষের পদচিহ্ন অনুসন্ধান করিয়া বেড়াই, যদি কোথাও তাঁহার পদাঙ্ক চিহ্ন দেখিয়া তাঁহার চরণতলে আশ্রয় লইবার জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিতে পারি। কিন্তু এ কি দেখি! এই সংসার জ্বালায় জুড়াইবার জন্য যে একটু মাত্র আশ্রয় স্থল ছিল, তাহাও যে ভাঙ্গিয়া যায়! মন কেন এমন উদাস হইয়া যায়! জীবনের প্রতি অনাদর, ক্রিয়া কর্ম্মে বিরক্তি, জগতের প্রতি তাচ্ছিলা, কেন জীবনকে তত কঠোর করিয়া তুলে? এই কি প্রকৃত পথ? দেব, এই কি তোমার পদচিহ্ন? এই কি তোমার প্রকৃত জ্ঞান? না না, সে যে অমৃতময়, তাঁহার স্বল্প মাত্র স্মরণেও মহা ভয় হইতে পরিত্রাণ করেন। তবে কেন তাহার কল্পনায়—তাহার পথে এত যাতনা—এত ক্লেশ? এই সুখের সংসার, প্রিয়কারিণী ভার্য্যা, সুকুমার শিশুগুলি, হিতকারী কুটুম্বগণ, এত বিষময় বলিয়া বোধ হয় কেন? মনে হয় ইহারাই আমার এই দারুণ দুঃখের কারণ। এই পুত্র কলত্রাদি ও বিষয় সকলই মনুষ্যকে কলুষিত করে; ইহারাই সর্ব্ববিধ স্বাধীনতা অপহরণ করিতেছে; ইহারাই সুখের অন্তরায়, ধর্ম্মের অন্তরায়, কর্ম্মের অন্তরায়—সর্ব্ববিধ অনুষ্ঠানের অন্তরায়; ইহারাই আমার দুশ্ছেদ্য ভব-বন্ধন। আমার মনে হয় যখন অন্তিমকাল উপস্থিত হইবে, এই ক্ষণস্থায়ী জীবনটুকু নিশার স্বপ্নের ন্যায় মুহূর্ত্ত মধ্যে মিলাইয়া যাইবে, তখন ইহাদের কেহই ত' সঙ্গে যাইবে না। সংসার অনিত্য, এই সংসারে এত স্নেহ, এত ভালবাসা, চিত্তের এতটা তন্ময়তা সকলই ক্ষণস্থায়ী—সকলই ক্ষণভঙ্গুর। তবে সেই অন্তিমে আমার বলিয়া কাহাকে দেখিতে পাইব? তাই ত' ভাবি,—এই স্নেহ কোলাহল পূর্ণ সংসারে, এই মমতাপূর্ণ প্রিয় পরিজনের সাদর সম্ভাষণের মধ্যে আমি কি একা? একাই কি আসিয়াছি—আবার একাই কি যাইতে হইবে? ভাবিতে ভাবিতে প্রাণ কাঁদিয়া উঠে। শূন্য পানে চাহিয়া চাহিয়া মনে হয় বুক ভরিয়া ডাকি।— কোথা তুমি?" আমার জীবনের চির-সহচর—আমার অন্তিমকালের একমাত্র বন্ধু, একবার এই ভীতিপূর্ণ সংসারে দেখা দাও,—একবার এই পাপীকে অভয় দাও।

জগতের সুখ, দুঃখ আসে ও যায়। দিবা যায়—রাত্রি আসে; আবার রাত্রি যায়, দিবা আসে; বৃক্ষ জন্মায় আবার মরিয়া যায়—ইহা কালের স্বধর্ম্ম। ইহা জগত প্রণালীর একটী প্রণালী মাত্র। আজ আমি আছি, তাই আমার সুখ দুঃখ আছে—জগৎ আছে; পরে যখন না থাকিব, তখন আমার সঙ্গে সঙ্গে সব?

যাইবে—তরঙ্গ বিধৌত সাগর তীরের ন্যায় সব ধুইয়া যাইবে। এ জগতে মৃত্যুর পর কি আছে, তাহা লইয়া আলোচনার প্রয়োজন কি? মৃত্যুর পরে কে সঙ্গে যাইবে, এ অন্বেষণেরই বা প্রয়োজন কি? কিন্তু মৃত্যু হইলেই যে সব শেষ হইয়া গেল, তাহা ত' মনে হয় না! মনে হয় এই যাতনাময় 'আমি' জ্ঞানের এইখানেই শেষ নয়, আরও আছে। তাহাই যদি না হইবে, তবে "আমি যাইব" মৃত্যুর পরেও "আমাকে যাইতে হইবে" এইরূপ ভাব, এইরূপ ধারণা স্বতঃই মনে হইবে কেন? যদি বলি মিথ্যা, ইহা কল্পনা মাত্র, তবে "আমার" মৃত্যু বলিব কেন? "আমি মৃত্যু হইব বলি না কেন?" ইহা ত' মনুষ্য জীবনের স্বাভাবিক ভাষা নয়; "আমার মৃত্যু" ইহাই স্বাভাবিক ভাষা। তাই ত' মনে হয় মৃত্যু হইতে 'আমি' পৃথক। এই 'আমি' জ্ঞানের জন্য মৃত্যু-রূপ যবনিকা উঠিতেছে, ও পড়িতেছে। এই অনন্ত কালের কোলে—অনন্ত ঘটনা-স্রোতের অভিনয় ক্ষেত্রে, জীব এই একই নিরবচ্ছিন্ন 'আমি' জ্ঞানের দ্বারা নানাবিধ ভোগের অভিনয় করিতেছে; সে ভোগের বিরাম নাই—সে ভোগের শেষ নাই—সে ভোগের অন্ত নাই। তবুও ত' হৃদয় শিহরিয়া উঠে, আতঙ্কে দুরু দুরু কম্পিত হয়। কেন হৃদয়? আমার স্ত্রী, আমার পুত্র, আমার ধন, আমার অর্থ, আমার বিষয়, আমার ভোগ বলিতে যে আনন্দে গলিয়া যাও—আর "আমার মৃত্যু" বলিলেই এত শঙ্কা কেন? এত ভয়—এত বিষাদ কেন? সমস্ত স্নেহের বন্ধন এত শিথিল হয় কেন? হায় এ দুঃখ কাহাকে বুঝাইব? "আমার মৃত্যু" এই বাক্যের অন্তরালে একটী অস্পষ্ট বিশ্বাস—একটী হতাশ-সূচক প্রশ্ন হৃদয় মধ্যে জাগিয়া উঠে—"কোথায় যাইব?" এই চিন্তা যখন হৃদয়কে ব্যাকুল ও উদ্বিগ্ন করিয়া ফেলে, তখন পতনোন্মুখ মনুষ্য যেমন দোদুল্যমান করাল কাল সর্পের পুচ্ছ আশ্রয় করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করে, তেমনই আপাতঃ প্রতীয়মান এই যে দারুণ দুঃখময় সংসার, ইহাকেই সেই সর্পের পুচ্ছের ন্যায় আশ্রয় করিয়া, সেই অপরিক্ষীত জগতের ভয় হইতে পরিত্রাণের আশা করে! ছিঃ, হৃদয়! তুমি না এই সংসারে বীতস্পৃহ? তবে কেন আবার সেই জ্বালাময় কণ্টকবৃক্ষ আশ্রয় করিলে? কেন হৃদয়! আবার কেন? ওই দেখ, "জীর্যন্তি জীর্যতঃকেশাঃ, দন্তাঃ জীর্যন্তি জীর্যতঃ, চক্ষু শ্রোত্রে চ জীর্যতঃ"; তখন হৃদয় বলে কোথায় যাইব? সে কেমন দেশ, সে কেমন অনুভূতি? সেখানে কে আমার আঁখিজল মুছাইবে? কে আমার ক্ষুধায় অন্ন, তৃষ্ণায় জল যোগাইবে? সেখানে কি ভালবাসা আছে? সেখানে

কি সহানুভূতি আছে? তবে আমার পুত্র কলত্র ত' আমার বন্ধনের কারণ নয়। তাহা যদি হইত, তবে অন্তিম সময়ে হাসি মুখে বিদায় লইয়া স্বেচ্ছায় মরণের পারে চলিয়া যাইতে পারিতাম না। তবে পথ পাইলাম কৈ? এতক্ষণ আর্ত্ত হইয়া যে পথের অনুসরণ করিতেছি, তাহা যেন আমায় কতই ব্যঙ্গ করিতে করিতে আকাশের কোলে রামধনুকের ন্যায় আমারই সমক্ষে সরিয়া গেল! কোথা দেব, দয়াময়! আর কতকাল এইরূপে প্রতারিত হইব? দেব, প্রসন্ন হও!

হৃদয়—অন্ধকার, ঘোরতর সংশয়ে সমাচ্ছন্ন; জ্ঞানের এতটুকু আলোকও দেখিতে পাইতেছি না। সুতরাং প্রতি পদক্ষেপেই অবিশ্বাস—প্রতি পদক্ষেপেই সংশয়—প্রতি পদক্ষেপেই একটা না একটা ভুল। কোথায় যাইতে কোথায় যাই,—কি করিতে কি করিয়া ফেলি! আচ্ছা পদে পদে এত ভুল, এত ভ্রান্তি হয় কেন? জগতে সকলেরই কি এইরূপ পরিবর্ত্তন হয়? যখন সদ্যজাত শিশু হইয়া মাতার কোল আশ্রয় করিয়া লালিত হইলাম, তখন এই সকল বিষয়ের কথা—বাহ্য বস্তুর কথা—জগতের কথা—আমার মনোবৃত্তির কথা ত' কিছুই জানিতাম না। কে আমায় ক্রমশঃ বস্তু সম্পর্কে সম্পর্কিত করিল? কে আমাকে ক্রমে ক্রমে মনোরমা ভার্য্যা, সুষমা-সুন্দর শিশুগুলি এত সুখের বলিতে লাগিল? কে আমাকে তখন বিষয়-বৈভব, গৃহ-অট্টালিকা, ধন-অর্থ, এত চিত্ত সন্তাপ হারী কাণে কাণে বলিয়া চলিয়া যাইত? কে আমাকে আমার দেহে, আমার কর্ম্মে, আমার জ্ঞানে, আমার প্রতি পদবিক্ষেপ বিষয়ে এরূপ ভাবে মমতা বন্ধন করিতে শিখাইল? আচ্ছা ইহাই যদি জগৎ রচনার প্রণালী বা কৌশল হয়, তাহা হইলে এই সকল কর্ম্মের কর্ত্তা কে? যিনিই হউন তাঁহাকে শত সহস্র ধন্যবাদ। কিন্তু আর নয়, ওই দেখ দুদিন পরে সেইই আবার ওই সকল বিষয়কে এত দুঃখের বলিতেছে—"দুদিনের খেলা দুদিনে ফুরায়,

দীপ নিভে যায় আঁধারে।

কে রহে তখন মুছাতে নয়ন,

ডেকে ডেকে মরি কাহারে?"

যাক্, যাহা যাইবার তাহা সব যাক্। একা আসিয়াছি, একাই যদি যাইতে হয়, তাহাতে ক্ষতিই বা কি? ক্ষতি সম্পূর্ণ! কেননা এতকাল ধরিয়া স্বার্থপরতায় জীবন সংগঠন করিলাম, স্বার্থানুসন্ধান ও অভিসন্ধির বশবর্ত্তী হইয়া পিতা মাতা ভ্রাতা বন্ধু স্ত্রী পুত্র আত্মীয়, কুটুম্ব এই সকলে মমতা বন্ধন

করিয়া সত্যের পথ রুদ্ধ করিলাম, বিষয়ে, ইন্দ্রিয়ে, দেহে, স্বীয় অভিসন্ধি অন্বেষণ করিয়া মিথ্যা ভোগ-লালসাকেই এক মাত্র জীবনের লক্ষ্য করিয়া রাখিলাম, আর এই আশ্চর্য্য শিল্পকারের শিল্প-কুশলতা দেখিয়া দিনেকের জন্যও তাহাকে অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্তি হইল না! তাই ত' আজকালের সধর্ম্মে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য আমার হৃদয়-বীণাটী যে সুরে বাঁধিয়াছিলাম, তাহা ছিন্ন হইয়া গেল; এতদিন যে সুরে সুর মিলাইয়া জীবন সঙ্গীত গাহিয়া আসিতেছিলাম, তাহা বন্ধ হইয়া গেল; আর অমনি আমার জগৎ সেই সুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল? তবে কি সেই স্বার্থপরতার আপাতঃ মধুর সুর হৃদয়-বীণা হইতে চিরতরে অন্তর্হিত হইয়া স্বর্গীয় সুরে সুর বাঁধিয়াছে? হা, অদৃষ্ট! তাই বা কৈ? এখন সেই সুরই সপ্তমে উঠিয়াছে,—সেখান হইতে গাহিতেছে "বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল সঙ্গে যাবে কে?" আহা, প্রত্যক্ষ দেবতা মাতা ও পিতা, যাঁহাদের চরণ দর্শনে, যাঁহাদের চরণে মতি রাখিলে আত্ম-বিসর্জ্জনের ও ত্যাগের স্বর্গীয় ভাব করতলগত এবং স্বর্গ সুখও সেই সেবাধর্ম্মের নিকট সামান্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, যে ননীর পুতলীগুলির দিকে চাহিলে শত্রুও প্রেমের তুফানে আত্ম-বিস্মৃত হয়, যে সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী সেবারূপিণী ললনার পানে চাহিয়া চাহিয়া বুদ্ধদেবের হৃদয়ে বিশ্ব-প্রেমের উন্মত্ত প্রবাহ ছুটিয়া গেল, সেই সকল ভগবানের কল্পিত ও সৃষ্ট বিষয় সকল দিক্ নির্ণয়কারী যন্ত্রের ন্যায় সতত এক মহান্ স্বর্গীয় ভাবের ইঙ্গিত করিলেও, আপনার ক্ষুদ্রতায় আপনি বদ্ধ হইয়া সেই অপার করুণা প্রেরিত বিষয় সকল লইয়াই স্বার্থপরতার ও দারুণ মোহের অতল তলে ডুবিয়া যাইতেছি। ডুবিয়া আজিও শেষ করিতে পারিলাম না—এখনও ডুবিতেছি—এখনও বলিতেছি "সঙ্গে যাবে কে?" অহো! হৃদয়! আপনার কর্ম্ম দোষে, আপনার ভ্রান্তিতে আপনি বদ্ধ হইয়া "সুধা সমুদ্রের তীরে বসিয়া পান করি শুধু হলাহল!" কেন দেব! দয়াময়, তোমার অপার করুণার রাজ্যে পাপীর প্রতি এ ছলনা—এ ভুল কেন? ভুল হয়, আবার ভুল ভাঙ্গে কেন? ভুল না ভাঙ্গলে ত' যাতনা হয় না,—এই অন্বেষণের প্রবৃত্তি হয় না।

জীবনের পথে আসিয়াই জীব ভুল করে; কিন্তু সে ভুল ভাঙ্গিয়া যায়। এখন যাহাকে সত্য মনে করিয়া এত আদর করিতেছি, পরক্ষণেই তাহাকে দূর দূর করিয়া দূরে ফেলিয়া দিতে পারি; কেননা সে সকল পদার্থ সহজেই অনিত্য

বলিয়া বুঝিতে পারা যায়। ইহাতে কিছুমাত্র বিচিত্রতা নাই, ইহা কালের স্বধর্ম্ম। এই মহান্ শক্তিকেই আমরা কাল বলি। এই কালই ভগবানের বিক্রম। তিনিই জীবের মঙ্গলের জন্য এই পরিণাম-শীলতার মধ্য দিয়া—এই পরিবর্ত্তনকে লক্ষ্য করিয়া জীবের হৃদয়ে এক মহান্ বিশ্বাতীত সত্যের আভাষ জাগাইয়া দিতেছেন। তিনিই মহাকাল কিম্বা মহাদেব তাহা জানি না; কিন্তু দেখিতেছি যে সেই সত্য স্বরূপ মহান্ শক্তির প্রভাবে জীবের একটার পর একটী মোহের বন্ধন উপস্থিত হইয়া আবার ছিন্ন হইয়া যায়। প্রতি জীবের হৃদয়ে জ্ঞানকে সত্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রবৃত্তি দিতেছেন। সেই বিশ্বের আদি শক্তি, সেই বিশ্বের বীজস্বরূপ আদি-দেবের কৃপায় মনুষ্য মোহের গভীর নিদ্রার মধ্যেও নিমেষের জন্য জাগ্রত হইয়া কি জানি কেন শিহরিয়া উঠে। তাঁহারই কৃপায় পাপী শত সহস্র পাপের মধ্যে পতিত হইয়াও সহসা ওই পরি-বর্ত্তনের মধ্য দিয়া উদ্ভাসিত কি যেন এক অস্পষ্ট আলোক দেখিয়া তাহাকে ধরিবার জন্য হস্ত প্রসারণ করে। তখন সেই দারুণ মোহের নিপীড়ন ও অসহ্য শোকের যাতনা কত যে মঙ্গলপ্রদ, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তখন সেই মঙ্গল-ময় শিব-শক্তির আশীর্ব্বাদে অল্পে অল্পে জীব বুঝিতে পারে "এসব মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, আমি মিথ্যা" "তবে ত' আমার ক্রিয়া মিথ্যা"—"আমার সাধনা আমার দেবতা মিথ্যা।" তবে কোথায় যাই—কোন পথ ধরি? কাহাকে অবলম্বন করিয়া, কাহার চরণতলে আপনাকে লুকাইয়া দিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হই; একটু দাঁড়াইবার আশ্রয় পাই—অবলম্বন পাই। না-না এ জগৎ মিথ্যা নয়,—এ জীবনও মিথ্যা নয়। যতদিন এই ক্ষুদ্র "আমি" বোধ আছে, এ জগৎ হইতে পৃথক্ ও বিশিষ্ট "আমি" বোধ আছে, ততদিন আমার জগৎ আছে, আমার কর্ম্ম আছে, আমার পাপ আছে, পুণ্য আছে, ধর্ম্ম আছে, অধর্ম্ম আছে দেবতা আছে, সাধনা আছে। যতদিন আমি আছি, আমার বাসনা আছে এবং সেই সকল কাল্পনিক বিষয় সকলের সম্পর্ক প্রতিরোধ করিয়া আপনাকে এক অনন্তে বিলীন করিয়া দিতে না পারি, ততদিন আমার গৃহ আছে, আশ্রম আছে ও আমার গৃহধর্ম্ম আছে; ততদিন বেদ, তন্ত্র, মন্ত্র আছে, বিধি আছে, নিষেধ আছে। প্রতারণা পূর্ণ বাক্যে মনুষ্য তুষ্ট হইতে পারে; কিন্তু দেবতা তুষ্ট হইবেন কেন? প্রতারণা পূর্ণ কর্ম্মে সমাজ ভুলিতে পারে, কিন্তু ভগবান ভুলিবেন কেন? এই সাধনার জন্যই ত' সত্য-স্বরূপ ভগবান এই জগতে অনুগ্রহপূর্ব্বক অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, এই অসত্য জগৎকে সত্য বলিয়া প্রতীয়-

মান করাইতেছেন। সেই সত্য-স্বরূপ ভগবান এই জগতে সতত বিরাজমান বলিয়াই ত' মিথ্যাকে সত্য বলিয়া মনে হয়, নশ্বর জগতকে অবিনশ্বর বলিয়া মনে হয়, এই মিথ্যার 'আমিকে' সত্য বলিয়া মনে হয়, অহঙ্কার ও অভিনিবেশে ব্যক্তি-গত কর্ম্মের সত্যতা প্রতীয়মান হয়। তাঁহারই সত্যে সব সত্য বলিয়া মনে হয়। মরীচীকায় জল ভ্রম হয়; দুর্জ্জয় বাসনা ও দুরন্ত কামকে নিঃস্বার্থ প্রেম বলিয়া দারুণ মোহ উপস্থিত হয়; প্রাণান্তকারী বিষকে সুধা বলিয়া মনে হয়। সেই সত্য-স্বরূপ ভগবানেরই লীলায় পাপী পাপে পতিত হয়; কামুক কামকেই জীবনের সর্ব্বস্ব করিয়া রাখে; ক্রোধোন্মত্ত তাহার হৃদয়ের তাণ্ডব লীলাকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া মনে করে। সেই সত্য-স্বরূপ ভগবানের প্রেরণায় হিংসা, দ্বেষ, সন্ধি-বিগ্রহ, অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি ধর্ম্মনীতি ইত্যাদি জীবের হৃদয়ে এত সত্য বলিয়া ধারণা হয়। এই সকল বিষয় ও বিষয়গত ধর্ম্ম ও অনুশাসনই ক্রমে ক্রমে মনুষ্যকে তাহার অনুসন্ধান-তৎপর বৃত্তির সাহায্যে সেই ভগবানের অভয় পাদপদ্মে আনয়ন করে। আবার যে পরম নাস্তিক, সেও গোপনে গোপনে হৃদয়ের নিভৃত নিলয়ে কি এক অস্পষ্ট আলোক দেখিতে পাইয়া তন্ময় হইয়া যায়; এবং সেই তদ্গত অবস্থায় বুঝিতে পারে না যে কেন আঁখিজলে তাহার বুক ভাসিয়া যায়। তখন সেই অতি বড় নাস্তিকও বুঝি মনে করে ও একবার মুখ ফুটিয়া বুক খুলিয়া বলে "কে তুমি দয়াময়! তুমি কোন্ শক্তি? তোমায় বুঝিতে পারিলাম না!" কিন্তু কেবল পাণ্ডিত্যের মোহে তাহার স্বীয় বিদ্যার গরিমায় মুগ্ধ হইয়া বলিতে সাহস হয় না যে, এই শত শত পাণ্ডিত্য ও বিদ্যার গরিমা লইয়া দর্শন জগতের ও তর্কশাস্ত্রের সম্যক্ অনুশীলন করিয়াও "আজ তোমায় বুঝিতে পারিলাম না"। পণ্ডিতাগ্রগণ্য হইয়া সম্যক্ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি এবং ভূয়োভূয়ঃ প্রশংসা লাভ করিয়া বলে, "আজ তোমায় বুঝিতে পারিলাম না।" শ্রীভগবানের অস্তিত্বের ও প্রকাশের ইহাই অপ্রতিহত লক্ষণ। এই জগতের মধ্যে তাঁহার অণুপ্রবেশই এই জগৎ-রচনা প্রণালীর আশ্চর্য্য কৌশল। তাই ত' তাঁহারই প্রেরণায় খুঁজিয়া মরি; পাতি পাতি করিয়া খুঁজি, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাই না। হায়! অশ্রুতে নয়ন যুগল ডুবিয়া যায়, দেখিব কি! অত্যন্ত আবেগে হৃদয় ভরিয়া যায়, অন্য চিন্তা হৃদয়ে স্থান পায় না, কি জানি কি এক মর্ম্মান্তিক রোদনে বাক্‌রোধ হইয়া যায়। মনে হয় উচ্চৈঃস্বরে খানিকটা ক্রন্দন করিয়া হৃদয়ের ভার লাঘব করি তাহাও পারি না। কোথা দেব! এখনই নির্ব্বাক্ নিস্পন্দ হৃদয়ে এ জীবলীলার শেষ

করিয়া দাও, যাবতীয় ক্লেশের অবসান হউক। যদি তাহা না হয়, তবে একবার এস, একবার জীবনের পথে দেখা দাও, বুক ভরিয়া—প্রাণ ভরিয়া তোমার চরণের ছায়ায় বসিয়া সুশীতল প্রাণে এই বিষয়-রূপ গরল পান করি। যেন এই পুত্র-কলত্র, ভোগ-লালসা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই সকলের মধ্যেও তোমার নিখিল ভয়হারী পদছায়া দেখিতে পাই! তোমার পরশে গরল অমৃত হয়,—মৃত্যুও চির অমরতায় পরিণত হয়। কোথা দেব মৃত্যুঞ্জয়! এই জনম-মরণশীল জীবের হৃদয়ে একবার সেই বেশে দেখা দাও,—যেরূপে সমুদ্রোত্থিত সদ্য প্রাণহর কালকূট স্বয়ং সেবন করিয়া সমগ্র সুরলোককে অমৃতের ভাগী করিলে, সুর ও অসুরগণের প্রাণরক্ষা করিলে। তাই ত' কি সুর কি অসুর সকলেই তোমার যশোগান করিতেছে। একবার সেই চির-প্রসন্ন মূর্ত্তিতে হৃদয়ে এস, আমার হৃদয়ের সংশয় ছিন্ন হউক—জ্ঞানের আলোকে আলোকিত পথে বিচরণ করিয়া তোমারই চরণে শিষ্যরূপে উপনীত হই। একবার সেই পরম গুরু—জগদ্‌গুরুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া বিগত-মোহ ও নির্দ্বন্দ্ব হইয়া, অনন্তকাল ধরিয়া সেই অমৃতময় শিষ্যত্ব পালন করি। এই অসীম 'আমি' জ্ঞানের চরম উৎকর্ষে 'আমি'টীকে বিস্মৃত হইয়া ভক্তি ও প্রেমের তুফানে চিরকালের জন্য বিলীন হইয়া যাই।

জীবের চিত্তবৃত্তি হয় নিত্য অবিনশ্বরের দিকে, না হয় সকল বস্তুর 'পার' বা শেষ দেখিবার জন্য ছুটিতেছে। জীব হয় স্থায়ী নিত্য অবিকৃত আনন্দের অনুসন্ধান করে, না হয় "আরও—আরও" বলিয়া সকল সুখেরই 'পারে' বা শেষে যাইতে যত্ন করে। কিন্তু এ দুইটীই সমান দুরারোহ ও দুর্গম। ইহার কোনটীও মানব-চিত্ত-বৃত্তির সুসাধ্য নয়। তাই ত' খুঁজিয়া মরি, 'তন্ন তন্ন' করিয়া খুঁজিয়া মরি, 'নেতি নেতি' করিয়া খুঁজিয়া মরি। যাহা খুঁজি, যাহাকে খুঁজি, যেমনটী খুঁজি, তেমনটী আর কিছুতেই পাইলাম না। আমার বিদ্যা, আমার বুদ্ধি, আমার উৎসাহ, আমার চেষ্টা, আমার বিজ্ঞতা, বহুদর্শিতা, চিন্তাশীলতা—আমার যত কিছু বিদ্যবত্তার ও পাণ্ডিত্যের গরিমা আছে, সব ঢালিয়া দিয়া দেখিয়াছি; সেই চিরবাঞ্ছিত বস্তু দেখিতে পাইলাম না; আমার চির-আরাধ্য হৃদয়ের নিধিকে দেখিতে পাইলাম না। তাই ত' বলি—তাই ত' ভাবি, কেন দয়াময় হইয়া জীবের হৃদয়ে কাম দিয়াছিলে; কেন সত্যস্বরূপে তাহার মধ্যে ও বিষয় সকলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া সেই দুর্নিবার কামকে—সেই সৃষ্টির মূলীভূত শক্তিকে বিষয়-সম্পর্কে আনিয়া এত উন্মাদকারী, এত মোহকরী ও আপাতঃ মধুর বিচিত্র-

সুন্দর করিয়া রচনা করিলে? কেন পতি-পত্নীর মধ্যে দাম্পত্য-প্রীতি, মাতার হৃদয়ে বাৎসল্য-স্নেহ, ভ্রাতার হৃদয়ে ভালবাসা, বন্ধুবর্গের মধ্যে সহানুভূতি দিয়াছিলে? কেন মানবকে বাহ্য জগতের আকর্ষণে আকর্ষিত কর? আবার তোমারই মায়ায় মোহিত মানব-চিত্ত কেন আপনার মত করিয়া অদ্ভুত কৌশলে সেই বিষয়স্থিত রস-তরঙ্গে এত আনন্দ অনুভব করে? যদি আমার হৃদয়ের বাঞ্ছিত বস্তুই পাইব না, তবে এ সব নিরর্থক ক্রীড়া কৌতুকের প্রয়োজন কি? আবার এই যে মনুষ্য হৃদয়ের বহির্ম্মুখী বৃত্তির গতি, তাহারই বা শেষ কোথায়—তাহাও ত' জানি না। আজ যে শত মুদ্রা কামনা করে, কাল সে শত মুদ্রা পাইয়া আবার সহস্র মুদ্রার কামনা করে; সহস্র মুদ্রা পাইলে লক্ষ মুদ্রা বাঞ্ছা করে; লক্ষ মুদ্রা হইতে রাজত্ব, রাজত্ব হইতে ইন্দ্রত্ব ইত্যাদি ক্রমশঃই কামনার অতৃপ্ত অনন্ত স্রোতে ভাসিয়া যায়। মাতা পুত্রকে বুকে করিলেই কেন তাহার সমস্ত স্নেহের পরিসমাপ্তি হয় না? কেন এইখানেই তাহার হৃদয়ের সমস্ত আবেশটুকু সেই পুত্র মুখ দর্শন ও স্পর্শনে মিশিয়া এক হইয়াই নিরস্ত হয় না? হৃদয়ের আবেগে মাতা কোথায় ভাসিয়া যায়? অগণিত ইন্দ্রিয়-বৃত্তি লইয়া, অগণিত ভোগ্য বস্তু লইয়াও কেন লালসার শেষ দেখিতে পাইলাম না? আর হৃদয়ে রাবণের চুল্লীর ন্যায় ভীষণ চিতা অহঃরহ প্রজ্জ্বলিত; তাহাতে যথা সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিলেও শান্তি হয় না—তাহার সমাপ্তি হয় না। মানব এইরূপে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ধাবিত হইয়া, কামনার নূতন নূতন তরঙ্গে আপনাকে ঢালিয়া দিয়া যেন কোন অনন্তের দিকে—অসীমের দিকে নিরন্তর ধাবিত হইতেছে; সেই নির্দ্দেশের শেষ নাই, লক্ষ্যের অন্ত নাই, সর্ব্বদাই সেই এক অসীমতাকে লক্ষ্য করিয়াই ছুটিতেছে। আমরা ক্ষুদ্র প্রাণী, ক্ষুদ্র বুদ্ধি, ক্ষুদ্রতায় ডুবিয়া আছি বলিয়া বিষয়কে উপলক্ষ করিয়া এক একটী সংখ্যা দ্বারা নির্দ্দেশ করিতে করিতে—এক একটী করিয়া তরঙ্গ গণিতে গণিতে সেই অসীমকে—সেই অনন্তকে নির্দ্দেশ করিতেছি। এক একটী করিয়া গণিতে গণিতে কতই গণিলাম, কতই গণিতেছি আরও যে কত গণিব তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু আর গণনার প্রয়োজন কি? এইখানেই বলি না কেন যে এ গণনার শেষ নাই; এ গণনার দ্বারা—এইরূপ সংখ্যার দ্বারা, সেই অনন্তকে নির্দ্দেশ করা যায় না। ইহার ফলে ক্ষুদ্র বিশিষ্ট চৈতন্য দ্বারা আমরা কেবল আমাদের বাসনায় আবদ্ধ হইয়া ক্রমশঃই বদ্ধ হইতেছি। আমরা যতই মোহের বন্ধনে বদ্ধ হইতে থাকি, ততই সেই বাসনা তাহার অনন্তোন্মুখী বৃত্তিতে

বাসনার গতি, বিষয়ের গতি, জীবের গতি, 'তন্ন তন্ন' করিয়া দেখাইতে দেখাইতে সেই অনন্তকে নির্দ্দেশ করিতে করিতে প্রবাহিত হয়। তখন দেখিতে পাই, তাহার সেই প্রবাহ কোন বস্তুর দ্বারাই রোধ করিতে পারি না। তবে কেন বস্তু ও বিষয় লইয়া এত অন্বেষণ—তাহার জন্য এত আকাঙ্ক্ষা? বাসনা, তাহার খরতর স্রোতে সমস্ত বস্তু, সমস্ত বিষয়, ভাসাইয়া দিয়া এক অসীমে—অনন্তে আবাহমানকাল ধাবিত হইতেছে;—তাহার একমাত্র গন্তব্যের দিকে ধাবিত হইতেছে; যে গন্তব্যে উপস্থিত হইলে, যাহাকে পাইলে এই বৃথা অনুসন্ধান নিবৃত্ত হয়; এই বদ্ধ 'আমি' জ্ঞান মুক্ত হইয়া অনন্তে মিশিয়া যায়; আর ভূৎ ভবিষ্যতের পার্থক্য ভুলিয়া নিরবচ্ছিন্ন কালের অনন্ত কোলে জীব মাতৃ ক্রোড়স্থ শিশুর চির শান্তির সুষুপ্তির মাঝে ডুবিয়া যায়। ওই দেখ, চক্ষু সৌন্দর্য্য দেখাইতে দেখাইতে জীবকে এক অসীমের দিকে ভাসাইয়া লইয়া গেল; কর্ণ সুমধুর সঙ্গীতের মধ্য দিয়া সেই সঙ্গীতের ক্ষুদ্রতা অতিক্রম করিয়া কোন্ অনন্তের দিকে—যেন মহাশূন্যে আনিয়া চিত্তকে মিলাইয়া দিতেছে, চিত্তের ক্ষুদ্রতা এক অগাধ বিশালতার দিকে ছুটিয়া গেল! ত্বক্ স্পর্শানুভূতির মধ্য দিয়া, স্পর্শাতীত দেহাতীত এক মহান্ আবেগে জীবকে ভাসাইয়া দিয়া, অপরিমেয় আনন্দ-তুফানে ডুবাইয়া দিতেছে। জিহ্বা রসাস্বাদন করিতে করিতে, নাসিকা সুগন্ধি কুসুমের সৌরভ লইতে লইতে, কোন সীমাহীন—অন্তহীন দেশে জীবকে তুলিয়া লইয়া তাহার আত্মানুভূতিকে এক অসীম বোধানুভূতির সহিত মিলাইয়া দিয়া যেন এক মহাসত্বার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। বাহিরে বস্তুর সংস্পর্শে একবার আসিয়াই আবার যখন অন্তর্মুখী হইয়া ধাবিত হই, তখন সেখানে দেখিতে পাই এ প্রকারের বস্তু নাই, বিষয় নাই, দেশ নাই। তাহার পর সেখানে কাল থাকে কি না, বা কি ভাবে থাকে তাহা বুঝিতে পারি না। মনে হয় কালের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই তিনটী বিভাগ সেখানে গিয়া সব একাকার হইয়া গিয়াছে। যে কাল-শক্তির প্রভাবে বহির্বৃত্তির দ্বারা এত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাই এবং এই পরিণামকে অপেক্ষা করিয়া যে অভিভাজ্য কালের দণ্ড পলাদিক্রমে বিভাগ করিয়া থাকি, সেই কাল শক্তির প্রভাবেই আবার যখন চিত্তবৃত্তি অন্তর হইতে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অগ্রসর হয়, তখন যেন মনে হয় এক অনন্ত বিস্তৃত সাগর, আর সেই কালরূপী অকূলের কূলে বসিয়া আমরা যত জীব সকলেই বুঝি একটী একটী করিয়া তরঙ্গ গণিতেছি। তরঙ্গই বা কৈ? যেখানে ভূৎ, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান নাই, সেখানে পরিণাম-শীতলতাই বা কৈ? মন মানেনা

—বুঝিয়াও বুঝেনা—সে তরঙ্গ দেখিতে পায়; কেননা সে চঞ্চল। তাহার চাঞ্চল্যে সবই চঞ্চল হইয়া উঠে। তা'ই জীব স্ব স্ব কল্পনাপ্রসূত তরঙ্গগুলি গণিতেছে। ইহার মধ্যে একটী আশ্চর্য্য রহস্য দেখিতে পাই যে, জীব সেই সাধের আকাশ-কুসুমগুলি একটী সূত্রে গ্রথিত করিতেছে; আর অতীতের যাহা কিছু যে গতি প্রাপ্ত হইয়াছে, বর্ত্তমানের যাহা কিছু নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহারও সেই গতি হইতেছে; আবার ভবিষ্যতে যাহা কিছু ঘটিবে তাহারও সেই গতি হইবে; কেবল যুগযুগান্তর ধরিয়া জীব এই আকাশ-কুসুমের চিকন রচনা করিতেছে; কিন্তু তাহার শেষ নাই—সমাপ্তি নাই। আরও কতকাল জীব! এই ক্লেশকর বৃথা কর্ম্মে কালাতিপাত করিবে? যিনি পূর্ণ, তিনি পূর্ণ না করিলে এই অসম্পূর্ণ কর্ম্মে কেমন করিয়া পূর্ণতা হইবে? মা! খড়্গ-মুণ্ড-সমাযুক্তা কালিকে! তুমি এই জীবের অসম্পূর্ণ উপহার গ্রহণ কর মা! জীব তোমায় অর্পণ করে না বলিয়াই ত' মা! তাহারা জন্ম-জন্মান্তর ধরিয়া বৃথা কর্ম্মে বৃথা অন্বেষণে জীবন যাপন করিতেছে! মা! তোমার ওই অসি যেমন একদিকে অসুর ও দৈত্য বিনাশ করিয়া এক অদ্বৈতভাবের স্থাপনা করে, তেমনই নাকি অন্যদিকে লীলাহেতু এই অবিভাজ্য কালকে কলাকাষ্ঠাদিরূপে বিভাগ করিয়া পরিণামশীলতার প্রবর্ত্তন করিতেছ। মা! ওই বিযুক্ত—তোমার অসি দ্বারা বিযুক্ত অণু পরমাণুর মধ্যে আমার এক হৃদয় রতন হারাইয়া গিয়াছে। এই ছিন্ন ভিন্ন ধূলি বালুর মধ্যে—এই জগতের মধ্যে আমার চিরবাঞ্ছিত এক অমূল্য রতন হারাইয়া গিয়াছে—একবারে মিশিয়া গিয়াছে; এমন মিশিয়া গিয়াছে যে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছি না—একবারও দেখিতে পাইলাম না। মা, একবার দয়া কর, একবার প্রসন্ন হও, তোমার ওই করাল মূর্ত্তি সংবরণ করিয়া আমার সেই চিরবাঞ্ছিত ধনের অন্বেষণে মতিকে প্রেরণার দ্বারা সমর্থ কর! তোমার অভয়প্রদ সৌম্যমূর্ত্তি দেখাও মা! আমার এই অসম্পূর্ণ রচনা তোমার রাঙ্গা পায় সমর্পণ করিয়া পূর্ণতার দেশে—শান্তির দেশে ভাসিয়া যাই। শুনিয়াছি সেই দেশ নাকি পূর্ণ অথচ সীমাহীন; সেথা গুরু ও শিষ্য, ধাতা ও ধ্যেয় পরস্পর চির সম্মিলিত। আর এ জগৎ তাহার ইঙ্গিৎ মাত্র—সেই অপূর্ব্ব মিলনের ছায়া মাত্র। মা গায়ত্রীরূপিণি! একবার জীবের হৃদয়ে অবতীর্ণ হও মা! জীবকে প্রকৃত পথে আনিয়া মুক্ত কর মা!

জীব কেবল সুখেরই অন্বেষণ করে; কিন্তু সুখ কি? প্রকৃত সুখই বা কৈ? এখন যাহা সুখের, পরক্ষণেই তাহা দুঃখের; ইহা ত' পুনঃ পুনঃ

দেখিতেছি। এইমাত্র যে পরিচ্ছদ পরিয়া সুখে ছিলাম, পরক্ষণেই তাহা আর সুখের নয়। এই যে ঔষধ সুখে সেবন করিলাম, উপবাস দিলাম পরক্ষণেই রোগাবসানে সে ঔষধ'ও সেই উপবাস আমার সুখের নয়। শৈশবে যাহা সুখের, যৌবনে তাহা আর সুখের নয়। তবে সুখের মৌলিক সত্যতা কোথায়? সুখের সত্যতা কেবল দুঃখের সত্যতায়; তাহা ত' আপেক্ষিক মাত্র। দুঃখ-বোধ ব্যতীত সুখবোধ হয় না, এবং সুখবোধ ব্যতীতও দুঃখবোধ হয় না। তবে এখানেও ত' সেই সুখ ও দুঃখ দুইটী মিশিয়া যাইতেছে। একের অভাবে অন্যের অস্তিত্ব থাকে না। তবে কি সুখ ও দুঃখ ইহারাও মিথ্যা কল্পনা মাত্র? এই দ্বন্দ্বভাবের মৌলিক অস্তিত্ব কি জীবের ভ্রম ও প্রমাদ-প্রসূত? যথার্থই তাই। এই দেখ, আলো আছে বলিয়াই ত' অন্ধকার বুঝিতে পারি। দিন আছে বলিয়াই ত' রাত্রি বুঝিতে পারি। যদি কেবল আলোক থাকিত, তবে আলোকের আদর কে করিত? অন্ধকার হইতে পৃথক্ ভাবিতে পারি বলিয়াই, আলোকের আদর। অন্ধকারে আলোকের অভাব বোধ ও আলোকে সেই অভাবের পূরণ হয় বলিয়াই ত' একটী প্রিয় অন্যটী অপ্রিয় মনে হয়। যদি অভাব বোধ বা দুঃখবোধ না থাকিত, তবে সুখের জন্য কে লালায়িত হইত? প্রিয়, অপ্রিয়, সুখ ও দুঃখ, এই দ্বন্দ্বভাব আমাদের কল্পনাপ্রসূত। এই কল্পিত বস্তুর বাস্তবিক ও মৌলিক সত্যতা নাই। হায়, এই মহাসত্য কেমন করিয়া বুঝিব। এই মহাসত্য কেমন করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিব! এমন কি মহাপাপ করিয়াছিলাম, যে যাহা সত্য তাহা বুঝিতে পারি না! বল দেব! কোথায় এ পাপের মোচন হয়? শুনিয়াছি নাকি প্রয়াগ-তীর্থে গঙ্গা-সঙ্গমে সকল পাপের অবসান হয়। তবে চল হৃদয়! একবার সেই পুণ্যতীর্থে, পুণ্যক্ষেত্রে যাই; যদি এই পাপ এই অজ্ঞান হৃদয় হইতে বিসর্জ্জন দিতে পারি।

সুনীল যমুনা খরস্রোতে প্রবাহিতা। ওই যমুনার কুলু কুলু শব্দে শ্রীকৃষ্ণের সুমধুর মুরলীধ্বনি, গোপিকাগণের কৃষ্ণানুসন্ধানের মনোহারিণী সুললিত নিশীথ সংগীত, প্রেমরূপিণী চৈতন্যময়ী শ্রীরাধিকার কৃষ্ণ-প্রেমের অদ্বৈত-ভাব-প্রণোদিত আকুল উচ্ছ্বাস বুঝি আজিও তরঙ্গে তরঙ্গে ধ্বনিত হইতেছে। যমুনার বুকে কৌমুদী-বিভূষিত রজত সাজে সুসজ্জিত তরঙ্গগুলি উঠিতেছে পড়িতেছে, নাচিতে নাচিতে একান্ত অন্তরে আপন মনে কোথায় চলিয়া যাইতেছে। মনে হয় যমুনা, তরঙ্গের ছলে গোপিকাগণের বাসনারাশি বুকে করিয়া যেন কোন্ নির্দ্দিষ্ট গন্তব্যের দিকে চলিয়াছে। মা যমুনে! বল মা, অমন

উদ্ভ্রান্ত মনে, উদাস প্রাণে, আপন মনে কোথায় যাও? যেমন দলে দলে বিরহিণী গোপ-রমণীগণ হৃদয়মধ্যে কৃষ্ণ সম্মিলনের আশায় বাসর সাজাইয়া, তোমার কূলে আসিয়া তোমাকে সম্বোধন করিয়া, তোমার ওই সুনীল তরঙ্গে তাহাদের চিত্তাপহারী শ্রীমধুসূদনের মনোহারিণী কান্তি ও জ্যোতিঃ দেখিতে পাইয়া, করুণ স্বরে বিলাপ করিত; আমরাও মা! বিষয়ের মধ্যে আমাদের এক হারাণ-রতনের যেন আভাষ মাত্র দেখিয়া তোমার কূলে আসিয়া বাসনা-কলুষিত স্বরে বিলাপ করিতেছি। বল মা, তুমি আমাদের এই মর্ম্ম-কাতরতা, অগাধ সহৃদয়তাগুণে বুকে করিয়া লইয়া কোথায় যাও? যমুনা উত্তর করিল "সাগর-সঙ্গমে"। মা! সাগর-সঙ্গমে? তাহাতে আমাদের দুঃখ কি ঘুচিবে মা? না না বুঝিয়াছি, ক্ষুদ্রতাই দুঃখ—ক্ষুদ্রতাই জীবের বন্ধনের কারণ। মা, বাসনার স্রোতে ফেলিয়া আমাদিগকে সেই এক অনন্তে মিশাইয়া দিবে? মা, বাসনাময়ি, প্রবাহিনী যমুনে! সাগর তোমার, তুমি সাগরের; অনন্ত আকাশের কোল হইতে আসিয়া আবার অনন্তের কোলে মিলিয়া যাইবে। কিন্তু আমাদের 'সাগর' কৈ মা? আমাদের সেই একান্ত প্রেমের অনন্ত আধার সাগর কৈ মা? মা, সুখ দুঃখের ঘাত প্রতিঘাতে বুক ভাঙ্গিয়া যায়; "আত্ম-অনাত্ম" জ্ঞানের মুহুর্মুহু ছিন্নভিন্নকারী যাতনায় জীবন্মৃত, আমরা, কবে সুখ ও দুঃখ, আশা ও বাসনা, ভবিষ্যৎ ও অতীত, সব লইয়া সেই এক অনন্তে মিশাইয়া দিব? ক্ষুদ্রতা ত্যজিয়া কূল ভাঙ্গিয়া অকূলে মিশাইয়া যাইব? খরস্রোতা যমুনা প্রয়াগ-তীর্থে গঙ্গার বুকে আসিয়া মিলিয়া গেল। কেন মা, সাগরে মিলিবে বলিয়া গঙ্গার বুকে আসিয়া মিলিয়া গেলে কেন?—তোমারও কি ছলনা? অথবা অনন্তের পথই এই,—গঙ্গা-সঙ্গমেই অনন্তের পথ। সান্ত স্ব-তন্ত্র্য জ্ঞানের মধ্য দিয়া অনন্ত ও অভেদ জ্ঞানে যাইতে হইলে, অপ্‌তত্ত্বের অধিষ্ঠাত্রী দেবী, বিষ্ণুদেহ-সমুদ্ভূতা গঙ্গায়, যমুনা প্রবাহিনীর ন্যায় আশা, মোহ, ইত্যাদি ক্ষুদ্র ও যাবতীয় পরিচ্ছিন্ন জ্ঞান সব ঢালিয়া দিতে হইবে। তবে ত' অনন্তের পথ উন্মুক্ত হইবে, তবে ত' সসীম হৃদয় ভাবগুলি আমাদিগকে সেই রাসলীলা-তৎপর কৃষ্ণদেহ হইতে সমুদ্ভূতা গঙ্গা-শক্তির মধ্য দিয়া অনন্তে মিশাইয়া দিবে। মা যমুনে, তোমার এত দয়া! এত মধুর করিয়া বদ্ধ জীবকে মোক্ষের পথ, প্রেমের পথ, অনন্তের পথ দেখাইয়া দাও। মা একদিন তোমার বারি কেবল গরল পূর্ণ ছিল, কালিয়ের হলাহলে তোমার বারি সদ্য-প্রাণহর গরল বলিয়া অস্পর্শীয় ছিল, কিন্তু মা, সে দিন সেই কালিয়

হৃদে শ্রীকৃষ্ণ মধুর মুরলীধ্বনি করিতে, দিক্ বিদিক্ যাবতীয় পদার্থ অনুপ্রাণিত করিয়া তোমার বারি চরণের দ্বারা স্পর্শ করিলেন, তদবধি তোমার বারি পবিত্র হইয়াছে, তদবধি তোমার বারি জীবের মঙ্গলপ্রদ হইয়াছে। বোধ হয় মা! সেই দিন হইতেই তুমি এই অধম জীবগণের দুঃখ বুঝিয়া তাহাদিগকে এত মধুর করিয়া সহজ ও সুগম করিয়া সেই মোক্ষের পথ দেখাইয়া দিতেছ। আহা! মাগো তোমার এত দয়া! তাহা না হইলে কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপীগণ কেন প্রাণের দুঃখ তোমাকে কহিবে? আর মা গঙ্গে! তুমিও অধমতারিণী, ত্রিতাপহারিণী। যখন প্রেমরূপিণী পরমা প্রকৃতি শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণকে—লীলাহেতু উপগত ভগবানকে তাঁহার হৃদয়ের দিকে—তাঁহার কেন্দ্রাভিসারিণী, একাকার-কারিণী প্রেমরূপিণী সেই একমাত্র শক্তির দিকে সেই জগন্নাথকে আকর্ষণ করিলেন এবং সর্ব্বগত তোয়রূপিণী গঙ্গাকে—আহা! আমার সেই সকামা সম্বিৎরূপিণী লীলাময়ী, মাকে গণ্ডূষে পান করিতে উদ্যত হইলেন! তখন মহাযোগিনী চৈতন্যময়ি গঙ্গা স্বীয় যোগশক্তি বলে বিষ্ণুর অভয়পদ আশ্রয় করিলেন! তখন রাসলীলার অপূর্ব্ব লীলায় স্বর্গবাসী মুগ্ধ হইল; কিন্তু গঙ্গার অদর্শনজন্য স্বর্গ জলশূন্য হইল; দেব, ঋষি প্রভৃতি সকলে শুষ্ক কণ্ঠ ও শুষ্কতালু হইয়া রাসবিহারে দ্রবীভূত রাধাকৃষ্ণ হইতে সমুদ্ভূতা মা! স্বর্গ-গঙ্গা, তোমাকে উদ্ধার করিলেন। তখন দেবগণ কৃতার্থ হইলেন, সৃষ্টি সার্থক হইল। আনন্দে ও জগতের মঙ্গলের জন্য মহাদেব সেই বারি মস্তকে ধারণ করিলেন, ব্রহ্মা কমণ্ডলুতে স্থাপন করিলেন। তারপর মা! স্বর্গ হইতে এই ভূতলে এই অধমগণের জন্য অবতীর্ণ হইলেন। অবতীর্ণ হইয়া সকাম মনুষ্যগণের প্রার্থনাকে তাহাদের কামনাকে অনন্তোন্মুখী করিবার জন্য এবং তাহাদিগকে সর্ব্বাত্মিকা ভাবে আকর্ষণ করিবার জন্য নিরন্তর যমুনাবারি বুকে করিয়া, তাহাকে উদ্ধার করিয়া, তোমার দেবতার সহিত মিলাইয়া দিতেছ। যমুনা গঙ্গা-সঙ্গমে সঙ্গত হইয়া, অনন্ত সাগরে মিশিয়া গেল। মা গঙ্গে, যখন তুমি স্বর্গ হইতে অন্তর্হিত হও, তখন স্বর্গ শুষ্ক হইয়া গিয়াছিল; সেই ত' মা তুমিই আধারভূতা হইয়া তোয়-রূপে সর্ব্বগতরূপে এই জগৎকে স্নিগ্ধ মধুর করিয়া রাখিয়াছ। বাসনার দ্বারা সর্ব্বাত্মিকা ভাবের প্রবৃত্তি দিয়া, জীবকে সেই রাধা-কৃষ্ণ-রূপ অব্যক্ত ও অনন্ত প্রেমের ইঙ্গিত করিয়া সর্ব্বাত্মিকাভাবে জগৎ পরিপালন ও পতিতকে উদ্ধার করিতেছ। তাই ত' মা যমুনা, তোমার শরণাপন্ন, তাই ত' মা গোপীগণ তাহার প্রাণের যমুনাকে তাহাদের প্রাণের কথা কহিত—হৃদয়ের দুঃখ জানাইত।

একটীর পর একটী যমুনা তরঙ্গ গঙ্গা-তরঙ্গের সহিত মিশিয়া যাইতেছে, ঠিক যেন এই অনন্তবিধ জীব-কোলাহলের একটী তরঙ্গ সেই সর্ব্বাত্মিকা ভাবের মধ্য দিয়া আশা ও অভিসন্ধি শূন্য শ্রীভগবানেরই অভিব্যক্তির পরিচয় প্রদান করিয়া বিলীন হইয়া গেল—লয় বিক্ষেপ হীন সেই অনন্তের সহিত একরস হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল। তাই বলি এই যাহা যমুনা-তরঙ্গ,এই পুণ্য প্রয়াগতীর্থে পরক্ষণেই তাহা গঙ্গা-তরঙ্গ; এই যাহা বাসনাময়ী, পরক্ষণেই তাহা সর্ব্বাত্মিকা ভাবের ইঙ্গিত; পরক্ষণেই তাহা অভিসন্ধিশূন্য হইয়া ভক্তি ও আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের প্রবল স্রোতে পতিত হইয়া কোথায় ভগবানে ন্যস্ত হইয়া নিরস্ত হয়। তখন সেই সর্ব্বাত্মিকা ভাবে, ভক্তির প্রাবল্যে সকল কর্ম্মের সন্ন্যাস হয় সেই সসীমতার মধ্য দিয়া এক আনন্দময় অসীমতার আভাষ উপলব্ধি হয়; ক্ষুদ্রতা ডুবিয়া যায়। তখনই এই বাসনাময় প্রপঞ্চের মধ্যে প্রকৃত পথ দেখিতে পাই। তখনই শিষ্য তাহার আরাধনার লব্ধ শ্রীগুরুর দর্শন ও করুণা লাভ করেন। আজ এই গঙ্গা যমুনার সঙ্গমে একবার ডুব দিয়া হৃদয়ের অন্ধকার দূর করি—হৃদয়ের অজ্ঞান বিনাশ করি। মা যমুনে, মা গঙ্গে, এই অবোধ সন্তানগণকে কৃপা কর মা! মোহ বিনাশ কর মা! প্রেমের দেশে ভাসিয়া যাই। সেখানে আলো ও অন্ধকার নাই, সুখ ও দুঃখ নাই, আমি ও তুমি নাই; আছে মাত্র এক—সেই বঙ্কিম নয়নের বঙ্কিম চাহনি,—কভু নির্গুণে, কভু সগুণে; কভু ব্যক্তে কভু অব্যক্তে; কভু সসীমে, কভু অসীমে; কভু শিবে; কভু জীবে, কভু বিশ্বে, কভু বিশ্বাতীতে। আর সেই দৃষ্টিতে—মনোরম নয়ন-ইঙ্গিতে প্রেমের এক অনন্ত তুফান বহিয়া যাইতেছে, সে তুফানে সৃষ্টি ও প্রলয় এক; সুধা হলাহল এক; অতি-মৃত্যু ও চির অমরতা এক। আমাকে সেই প্রেমের দেশ একবার দেখাইয়া দাও মা! বৃথা অন্বেষণ নিবৃত্ত হউক।

কাম]

পাগলের পত্র।

পূজনীয়—

আপনার কার্ডে আমাকে লিখেছিলেন "অন্তরে কেমন আছ?" আজ তারই উত্তরে দুই একটী প্রাণের কথা লিখিতে চেষ্টা করিব। বলিতে কি এখানে এক রকম সকল দিকেরই সুবিধা আছে, তবে প্রাণের কথা বল্‌বার একটীও লোক

পাই না; সেইজন্য প্রাণটা যেন মাঝে মাঝে কি রকম করে। বাস্তবিকই "within—'অন্তরে অন্তরে' যদি না পাওয়া যায়, তবে বাহিরে মিছে খোঁজা। তা'ই বুঝি Light on the Path বলে যে Look for it within", বড় ঠিক কথা। তাই সাধকও গেয়েচেন ;—

"যদি অন্তরে জাগে গো সখি, নবীন মেঘের বরণ চিকণ কালা",

বাস্তবিকই আমরাই আমাদের জীবনের সমস্যা; আবার সে সমস্যার উত্তর আমাদেরই ভিতরে আছে। ভিতরে যদি না দেখ্‌তে না পাই, সে অন্তরের জিনিষকে—সে হৃদয়ের ধনকে হৃদয়ে যদি না ধরতে পারি, ত' আর কোথায় তা'কে ধর্‌তে যাব? ভিতরে না ধর্‌তে পার্‌লে, কখনই ঠিক ধরা হবে না— তখন অধীর হ'য়ে গাহিব :—

"বাতাওয়ে সখি কোন গলিমে পায়ে মেরে শ্যাম"।

কিন্তু হৃদয়কে বড় কর্‌তে হবে; হৃদয়ের পাপ্‌ড়ীগুলি তাঁ'র পানে—সেই অনন্তের দিকে ছড়িয়ে দিতে হবে, হৃদয়ের দ্বার খুলে দিতে হবে; তবে ত' তিনি আস্‌বেন। বাস্তবিকই মনে হয়, তিনি যেন দরজা বন্ধ দেখে, সুখ দুঃখের কত ঘা মেরে, কত রকমে জাগাবার চেষ্টা করে, সাড়া না পেয়ে কতদিন তিনি মলিন মুখে ফিরে গেছেন। শুধু ফিরে গেছেন? মাতা, পিতা, পুত্র, কন্যা, ভাই, ভগিনী, আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু, বান্ধব প্রভৃতি কত বেশ ধরে, কত রূপ নিয়ে, কত ভালবাসা নিয়ে, তিনি আমাদের ধরা দিবার জন্য আস্‌চেন আমরাই ত তাঁ'কে চাই না, তিনি ত' আমাদেরই রয়েচেন। যদি একবার হৃদয়ের কপাট একটু খুলে দেখি, তা' হ'লে দেখ্‌বো ঐ শ্যামসুন্দর তাঁহার সেই মোহন রূপ নিয়ে আমাদের জন্য কপাটের এক পাশে আমাদেরই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েচেন। হা মন! একবার চেয়ে দ্যাখ্, তখন বল্‌বি ;—

"যে রূপ হেরিলাম তার, কুল মান রাখা ভার,
নাম নাহি জানি তার, থাকে সে গোকুলে।"

বাস্তবিকই কি আমাদের জীবন বড় দুঃখময়? সুখ যেন নাই,—উঠ্‌চে নাব্‌চে—সেই যেন এক ঘেয়ে। তা হতে পারে না। তবে কি? ঐ দেখ না, ঐ যে নদী, তার বুকের উপর ঢেউগুলি উঠ্‌চে নাব্‌চে, কত খেলাই কর্‌চে, কত বর্ণের রূপ নিয়ে ছোট বড় ঢেউগুলি হেলে দুলে, নাচ্‌তে নাচ্‌তে কেমন চল্‌ছে। তারা বুঝি মনে করে এই তাদের শেষ। তাত' নয়—তারা যে নদীর একই জল,—যেন নদীকে, যেন তার প্রাণের ভাবটি আরও ফুটিয়ে তুলবার

জন্ম তাদের প্রকাশ। কিন্তু নদী!—কোথায় সে? এই ছোট বড় তরঙ্গগুলি বুকে করে, মধুর কুল কুল শব্দ করে সে কোথায় ছুটেচে? জোয়ার ভাঁটার মধ্য দিয়ে কোথায় সে বয়ে যায়? সেই সমুদ্রে। নদীর যেমন এই রকম একটী ভিতরের প্রবাহ আছে, যে প্রবাহ সর্ব্বদাই সমুদ্রমুখী, আমাদের জীবনেও সেই রকম একটী অজানা স্রোত একটী লুকান প্রবাহ আছে। সেই স্রোতে গা' ঢেলে দিতে হবে। তখন বুঝ্‌বে জীবনের গতি কোথায়—কোথায় সে কোন্ অজানা প্রদেশে ছুটেচে। সে প্রবাহ, সে স্রোত, সে যমুনা, অন্তরেই বহিবে। অন্তরেই তাঁ'র গতি দেখ্‌তে হবে। আর সেই যমুনার তীরে,—

"ওগো শোন কে বাজায়
বনফুলের মালার গন্ধ বাঁশীর তানে মিশে যায়।
অধর ছুঁয়ে বাঁশী খানি,—চুরি করে হাসি খানি,
বঁধুর হাসি মধুর গানে, প্রাণের পানে ভেসে যায়,
ওগো শোন কে বাজায়?"

আর সে মধুর বাঁশী একবার শুন্‌লে, প্রাণ মন কেঁদে উঠ্‌বে। সমস্ত জীবনটা যেন গলে যাবে, যেন মনে হবে এ তাঁরই গান আর 'আমি' থাক্‌বে না, কুল মান আর রাখা যাবে না, আর সাধের "আমির" ঘরে থাকা যাবে না, তখন হবে :—

"মরি বা মরি বাঁশীতে আমায় ডেকেছে কে?
মনে করেছিলাম ঘরে রব, কোথায় যাব না,
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশী এখন কি করি।

তখন আবার ভুল হবে,—

"ঐ বুঝি বাঁশী বাজে,বন মাঝে, কি মন মাঝে?"

কেন না যেটী অন্তরের সুর, সেইটিই আবার বাহিরের সুর; তখন ত' ভুল হবেই। আজ এই অবধিই থাক, প্রাণের কথা বল্‌তে চোখের জলে বুক ভেসে যায়। আর লিখ্‌তে পারি না।

সহজ যোগ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত কার্ত্তিক সংখ্যার পর।)

গতবারে আমরা চিত্ত সম্বন্ধে বালকসুলভ অপরিস্ফুট ভাষায় তত্ত্বদর্শী ঋষিগণের দ্বারা উদ্ভাবিত চিত্ত-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি যে চিত্ত শ্রীভগবানেরই ভাষা। তিনি সর্ব্ব ও জ্ঞ। তবে এই সর্ব্ব, ঘন-সর্ব্ব। যেমন 'এক' হইতে অনন্ত সংখ্যার প্রকাশ হয়, তেমনি ভগবানের সর্ব্বস্বরূপতা মহান্ ঐক্য হইতে অনন্ত ছিন্ন 'বহু' ভাবের প্রকাশ ও লয় হয়। আমরা দেখিয়াছি যে দার্শনিক ভাষায় বলিতে গেলে চিত্ত শব্দে ভগবানের চিদানন্দময়ী আত্মভূতা প্রকৃতি, স্বরূপের প্রকাশ বা ইঙ্গিতশীলতা বুঝায়। আমার সম্মুখস্থ আম্র-বৃক্ষটি আমার চৈতন্যের ভিতর ঢুকিয়া যায় না। উহা চিত্তগত-প্রবণতা রূপে আমার ভিতর চিরকালই আছে। তবে বাহ্য বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগে ঐ প্রবণতাটি তাহার অবিশেষ সর্ব্বাত্মিকা ভাব হইতে পরিণত হইয়া যেন বিশেষরূপে আমার নিকট প্রতিভাত হয়। আমাদের প্রত্যেকের 'আমি' মূলতঃ শ্রীভগবানের প্রকাশ বলিয়া তাহার ভিতরেও সর্ব্বার্থতা ও সর্ব্বাত্মিকতার স্তর (Stratum) আছে। সেই জন্য 'সর্ব্ব'ভাব সিদ্ধ না হইলে আমাদের তৃপ্তি হয় না। কামুক কখনও একটী রমণীতে সন্তুষ্ট থাকে না, লোভী একটি বস্তু লাভে তৃপ্ত হয় না। সর্ব্বক্ষেত্রেই আমরা অভিপ্সীত বস্তুর সবটুকু চাই। এই জন্য শ্রুতি 'অকাম' ও 'সর্ব্বকাম'কে একই ভাবে দেখিলেন। সর্ব্বার্থতাই চিত্তের ধন। তবে যেরূপ 'আমি' জ্ঞান, সর্ব্বার্থতাও সেইরূপ প্রকাশ পায়। কারণ চৈতন্যময়ী যেরূপে আনন্দ-ঘন পুরুষকে দেখাইবার জন্য খেলেন, সেইরূপ আমাদের ক্ষুদ্র চৈতন্যেও 'আমি'র অনুরূপ ভাবে চিত্তের অধিষ্ঠাত্রী মহাদেবীও খেলেন। আপেক্ষিক ভাবে এই দুইটি লক্ষণের দ্বারা আমাদের ক্ষুদ্র জীবনে চিত্তের খেলা দেখা আবশ্যক। প্রথমতঃ চিত্ত বিশিষ্ট বস্তু জ্ঞান ও বৃত্তি সকলকে নিঃশেষে 'আমি'রূপে দেখাইবার চেষ্টা করে। যখন বস্তু প্রভৃতি দেখিয়াও তাহার ফলে বাহ্য জ্ঞান জাগিয়া না উঠে, যখন চৈতন্যের বৃত্তির সবটুকু কেবল একমাত্র 'আমি' ভাবে নিঃশেষিত হইয়া স্থির হয়, যখন বাহ্য খেলার মধ্যে কেবল পূর্ণ 'আমি' বা 'পুরুষের' বুদ্ধি জাগিয়া উঠে, তখনই চিত্তের শুদ্ধা গতি লক্ষিত হয়। 'বহু'

লইয়া থাকিলেও তখন 'বহুর' প্রত্যেকটি হইতে ঘন 'একের' বুদ্ধি ফুটিয়া উঠে। ইহাই নাম ও মন্ত্র জপের রহস্য। জপের মালার প্রত্যেক দানাটি এক একটি 'বহু' ভাবের আধার স্থান; কিন্তু যখন জপ করিতে করিতে বিশিষ্ট দানা স্পর্শের সহিত ভিতরে—হৃদয়ক্ষেত্রে একই উপাস্যের ঘন ভাব জাগিতে থাকে, যখন বুদ্ধি প্রত্যেক দানা হইতে উত্থিত হইয়া 'একে'ই পর্য্যবসিত হয়, যখন এমন কি বিশিষ্ট সংখ্যার জ্ঞান থাকে না, অথচ একের পর দুই, দুইয়ের পর তিন, ইত্যাদি ক্রমে জপ করিতে করিতে ভিতরে উপাস্যের ঘন ভাব পূর্ণ হইতে পূর্ণতর রূপে প্রকটিত হইতে থাকে, তখন চিত্তের খেলা হইতেছে ইহা বুঝা যায়। একত্ব ভাবটি তখন শুক্রের ন্যায় 'বহু' গুলিকে অনুস্যূত করিয়া ফুটিতে থাকে। প্রত্যেক বার জপে বিশিষ্ট বা নূতন কিছু উপলব্ধ হয় না। প্রথমবারে যে ভগবদ্ভাবের ইঙ্গিত জাগিয়া উঠিল, দ্বিতীয়বারেও তাহাই রহিল ও একশত অষ্টমবারেও তাহা ভিন্ন অন্য কিছু প্রকটিত হইল না। অথচ জপের প্রথম ও শেষ অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, যদিও উপাস্যের একত্ব ভাবের কোন তারতম্য বা বিভিন্নতা দৃষ্ট হয় না বটে, কিন্তু তাহার আনন্দ-ঘন ভাব বা তাঁহার রসটি ক্রমে ঘনীভূত হইতে থাকে ও অবশেষে সেই ঘন স্ফুরণের মধ্যে 'সর্ব্ব' ভাবও ডুবিয়া যায়। ঐ দেখুন বিভিন্নতা বা প্রভেদ না থাকিলেও প্রকাশ থাকিতে পারে।

পূর্ব্ব সংখ্যায় উদ্ধৃত ভাগবতে ব্রহ্মার মোহ নাশ আখ্যায়িকা হইতেও এই বুঝিতে পারা যায়। বলদেব প্রথমে ভাবিয়াছিলেন যে, ভগবান এক ও সত্য হইলেও, বিভিন্ন বস্তুগুলি তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই আছে। এইরূপ ভাবে আমাদের 'আমি' এক হইলেও তাহাতে অনন্ত বিভিন্ন জগদ্বস্তুর সমাবেশ হয়; এই ভাবেই আজকালকার ভাবুকমণ্ডলী বুঝিতে চান। সেই জন্য গম্ভীর ভাবে 'মায়া' নামক আগন্তুক শক্তিতে ভেদের বীজ আছে বলিয়া বুঝেন। ইহাই অহঙ্কারের নিম্ন স্তরের ভাষা। আমাদের বিশিষ্ট 'অহং' যেরূপ বিশিষ্ট ভেদভাবের আশ্রয় বলিয়া মনে হয়, তদ্রূপ বস্তুও ভেদের আশ্রয় বলিয়া দেখা যায়। তারপর অহঙ্কার পরিশুদ্ধ হইলে ঐ ভেদের মধ্যে 'একের' আভাষ দেখা যায়। এই জন্যই যে মানব ক্ষিপ্ত অবস্থার অতিক্রম করিয়া বিক্ষিপ্তের মধ্য দিয়া একাগ্রতার দিকে যাইতেছে, সে এই ভেদের মধ্যেও 'এক'কে দেখিতে পায়। রাম পরদারী লম্পট; রামকে দেখিয়া সকলেই মনে করে যে বুঝি তাহার ভিতর আর কিছুই নাই। সে যে লম্পট, সেই লম্পট চিরকাল আছে ও থাকিবে। আমরা ভুলিয়া

যাই যে রাম বাস্তবিক 'সর্ব্ব' ভাবের আশ্রয়। সে আজ লম্পট হইলেও কাল সাধু হইতে পারে; তাহার 'আমিটি' এই সর্ব্বভাবের অতীত ও অতিগ। কিন্তু যখন দেখি যে রাম হঠাৎ সাধু হইল, তখন আমাদের ভিতর একটা মানসিক বিপ্লব উপস্থিত হয়। তারপর যখন ভগবানের সর্ব্বাত্মিকতার আভাষ পাই, যখন রামের পরিবর্ত্তনের মূলে ভগবানের সর্ব্বার্থতার ইঙ্গিত দেখিতে পাই, তখন আমাদের একটু তৃপ্তি হয়। সেইজন্য বিশিষ্ট উপাসকগণ পাপীর হঠাৎ পরিবর্ত্তনের দ্বারা তাঁহাদের বিশিষ্ট উপাস্যের মহিমা ঘোষণা ও বুঝিতে চেষ্টা করেন। জগাই মাধাই এর পরিবর্ত্তন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যরূপী ভগবানের নিজ শক্তির বিকাশ ইহা বৈষ্ণবেরা বুঝেন। তদ্রূপ মেরী ম্যাগডলেনের কথা শুনিয়া খৃষ্টান ভক্তের হৃদয়ে খৃষ্টদেবের ভগবত্ব প্রতিপাদিত হয় বলিয়া মনে হয়। এই বিশ্বাসের মূলেও চিত্তের শক্তি নিহিত রহিয়াছে। এ বন্ধন পাপীর পরিত্রাণ ব্যাপারে আমাদের এত সুখ হয় কেন বলিতে পার? যদি উহা বিশিষ্ট অবতারের ব্যক্তিগত ভাবের ও আমাদের মত ছিন্ন প্রকাশ হইত, তাহা হইলে কি ভক্ত হৃদয় ঐরূপ ঘটনায় তৃপ্ত হইতে পারিত? আমরা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে চিত্তশুদ্ধের প্রসাদে বুঝিয়া লই যে যাহা একজন পাপীতে সম্ভব, তাহা সকলে ও 'সব'কালে সম্ভব। সুতরাং একটি পাপীর পরিত্রাণে সর্ব্বজীবের পরিত্রাণ ও তাহার মধ্য দিয়া অস্পষ্টভাবে সর্ব্বজীবে ব্যবস্থিত শুদ্ধ নির্ম্মল পাপতাপাদি স্পর্শশূন্য কি এক সত্ত্বার আভাষ পাই বলিয়া আমাদের হৃদয় পরিতৃপ্ত হয়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, সর্ব্বার্থতার আভাষ পাইয়াও আমরা সেই পরম ভাবকে পূর্ব্ব সংস্কারবশে আমাদের 'আমির' অনুরূপ করিয়া ভেদভাবে দেখিতে যাই। সেইজন্য এই সর্ব্বাত্মিকতার মূলে বিশিষ্ট ব্যক্তিগত ভাব দেখিয়া ফেলি ও অবতারকে অহঙ্কারের পোষাক পরাইয়া অন্যান্য উপাসকদিগের উপাস্য ভগবদ্‌প্রকাশ হইতে বিশেষিত করিয়া সেই ভেদভাবাপন্ন বিশিষ্ট ভাবের উপর ভগবানের মহিমা স্থাপিত করি। সেইজন্য দেখা যায় যে বৈষ্ণব ভগবানের সর্ব্বার্থতার উপর প্রাণ মন সমর্পণ করিবার চেষ্টা করিতেছে বটে ও তাঁহার সর্ব্বাত্মিকা কৃপার উপর হৃদয়ের ভরসা পরিস্থাপিত করিয়াও খৃষ্টদেব হইতে ও এমন কি পূর্ণব্রহ্ম ভগবান শ্রীকৃষ্ট হইতেও শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যদেবকে বিশেষিত করিয়া বগল বাজাইয়া চীৎকার করিতেছেন। খৃষ্ট উপাসকগণও ঠিক এই ভাবে অন্যান্য ভক্তগণকে খৃষ্ট-ভক্ত হইবার জন্য উপদেশ দিতেছেন;—

"অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥"

চিত্তের প্রকাশ হইলেও ইহাদের ভিতর এখনও অন্ধকারের ভেদভাব প্রবল রহিয়াছে। আর একটু উচ্চ স্তর বা অহঙ্কারের আর একটু পরিশুদ্ধির অবস্থা শ্রীহনুমানে দৃষ্ট হয়। যখন কৃষ্ণাবতারে ভগবানই সেই কমল লোচন রামচন্দ্র কি না ইহা প্রত্যক্ষরূপে সিদ্ধ করিবার জন্য ভগবানের নিকট আসিল ও রাম-রূপে শ্রীকৃষ্ণকে পুনরায় দেখিয়া তাহার তৃপ্তি হইলে, তখন তিনি আনন্দে বলিয়া উঠিলেন শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি। তথাপি.................. শ্রীনাথ ও জানকীনাথে পরমাত্মা ভাবে ভেদ না থাকিলেও, তথাপি রাজীবলোচন রামচন্দ্র মূর্ত্তিই আমার প্রিয়। এ ভাবে বিভিন্নতার ভেদ প্রায় গিয়াছে। বুদ্ধি একতা গ্রহণ করিতে পারিতেছে। তবে এখনও 'আমিটি' আছে বলিয়া তাহার পূর্ব্ব সংস্কারভূত ভাবটি একটু বেশী প্রিয় বলিয়া মনে হয়। তারপর যখন ব্রহ্মা প্রতি গোপ মূর্ত্তিতে ব্যবস্থিত ভগবানকে স্বরূপ ভাবে জানিতে পারিলেন, যখন প্রত্যেক গোপবালকের মূর্ত্তি ভগবদ্মূর্ত্তি হইয়া গেল, ও এমন কি শিক্য শৃঙ্গ যষ্টি প্রভৃতি বাহ্য বস্তুগুলিকেও সেই এক শ্রীমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন, তখন তাঁহার ভিতর চিত্তের প্রকৃত খেলা হইল। দেখুন আর তাহার নিকট গোপ বালক গাভী প্রভৃতির বিভিন্ন বস্তুর বোধ নাই। আর তিনি জগদ্বস্তুকে ছিন্ন ভাবে দেখিতেছেন না। এখন আর এই 'বহু' ভাবের মধ্য দিয়া প্রকাশিত 'একের' জ্ঞান হইতেছে না। কারণ এ ভাবেও 'বহু' থাকা আবশ্যক। এখন আর বিশিষ্ট 'বহু' নাই; কিন্তু 'সর্ব্ব' আছে। গোপও শ্রীকৃষ্ণ, গাভীও শ্রীকৃষ্ণ, প্রত্যেক বস্তুই শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং আর বিভিন্ন বস্তু নাই। কেবল শ্রীকৃষ্ণরূপে প্রকাশিত একই বস্তু সংখ্যা সাহায্যে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাই চিত্তের ঘন সর্ব্বার্থতা। 'সর্ব্ব' শব্দে আর 'বহুর' সমষ্টি নহে। উহা 'একের'ই ব্যঞ্জনা। বলিতে পার, শিক্যের শ্রীকৃষ্ণে ও গোপের শ্রীকৃষ্ণে কোন পার্থক্য আছে? প্রত্যেক বস্তুই তাহার বিশিষ্টতা ভাব হারাইয়া ফেলিয়া অবশেষে শূন্য হইয়া বা বিশিষ্ট ভাবের কোন চিহ্ন না রাখিয়া সম্পূর্ণরূপে ভগবানেই মিশিয়া গিয়াছে; কিন্তু তখনও প্রকাশ আছে। তারপর যখন ঐ 'সর্ব্ব'ভাব ঘন হইয়া এক শ্রীকৃষ্ণে মিশিয়া গেল, তখন চিত্ত স্বীয় কার্য্য সিদ্ধ করিয়া অভীষ্ট পুরুষে লীন হইল ও ব্রহ্মা তাঁহার আপনার বিশেষ প্রকাশ ভাব রাখিতে না পারিয়া হংসপৃষ্ঠে উল্টাইয়া পড়িয়া জ্ঞানশূন্য হইলেন। ইহাই চিত্তের ভাষা ও উপদেশ। (ক্রমশঃ)

যোগানন্দ ভারতী।

কামায় কামপতয়ে।

কবি, তুমি কোন বাঁশরীর স্বর শুনিয়া গাইয়াছিলে,—

"ঐ বুঝি বাঁশী বাজে, মন মাঝে কি বন মাঝে।"

আজ তোমার তানে তান মিলাইয়া কৃষ্ণকমলের শ্রীরাধার স্বরে গাইতে ইচ্ছা করিতেছে—"তোরা শুনগো নীরবে, বাজে ঐ কি রবে,

বল দেখি এ রবে কে ঘরে র'বে ?

শুনে যে এ রবে, কুলের গৌরবে ?

ঘরে র'বে তবে, রবে রবে রবে।

গোকুল শশী ত্যজি, রাখে যে দুকুল,

দুকুল দিয়ে বেঁধে, রাখুক সে দুকুল,

আমাদের দুকুল, কৃষ্ণ অনুকূল,

তা বিনে মোদের এ দুকুল কি রবে ?"

ও শুধু বংশীধ্বনি নহে, শুধু কাচক রন্ধ্রপথে বায়ু প্রবেশ শব্দ নহে। অই শব্দের সহিত শব্দার সত্ত্বা এবং শব্দের মর্ম্মও অনুভূত হইতেছে। শব্দ আকাশ-তত্ত্ব সম্ভূত ; শব্দের স্বভাবই এই যে একমাত্র শব্দ হইতেই তাহার কর্ত্তা, কর্ম্ম ও কারণের অনুভূতি হইয়া থাকে। সখি তোরা নীরবে শ্রবণ পাতিয়া শুন। বাঁশীতে কি মহান্ মোহন মন্ত্র ধ্বনিত হইতেছে। এঁ যে বিশ্ব-বিমোহন 'কাম' মন্ত্র! এ ধ্বনি শুনিয়া কি কেহ ঘরে থাকিতে পারে ? যে পারে পাকক্ ; সে তাহার ক্ষৌম-বসনাঞ্চলে কুলের গৌরব বাঁধিয়া রাখুক। রসময় বঁধুর সপ্তস্বরা আজ সপ্ত প্রকাশ রন্ধ্রে একত্রে বাজিয়া উঠিয়াছে আর কি ঘরে থাকিতে পারা যায়। বংশীবর—"শুনে মত্ত চিত্ত করী উঠলো নৃত্য করি

কি করি, সে করী—করিগো বারণ॥"

আমাকে এখন ঐ শব্দ উদ্দেশে চিত্ত-হরণ মুরলীধরের সমীপে যাইতেই হইবে। আমার অঙ্গ সদৃশ সখী তোমরা এখন কৃপা করিয়া আমায় সেখানে লইয়া চল, যেখানে আমার চিতচোর বাঁশী বাজাইতেছে,—

"ভাই তোরা পাতিয়া শ্রবণ করগো শ্রবণ, কোন্ বনে বাঁশী বাজায় কালাচাঁদ,
চল যাইয়া সে বনে বধুর সেবনে ঘুচাই বহুদিনের মনের বিষাদ॥" (কৃষ্ণকমল)

গগনবিহারী মরাল-ধ্বনি শ্রবণে বংশীরবের উদ্দীপনাক্রমে, মুরলীধারীর অনুসন্ধানে রাজনন্দিনী অধীর হইয়া গৃহ বহিষ্কৃতা হইলেন। তিনি আর ঘরে থাকিতে পারিলেন না। যে জগতের অনুসন্ধানে রসময় বঁধুর নিত্য নিনাদিত

অনাহত বংশীরবে প্রাণ মন সমর্পন করিয়াছে, সে কি আর ছার বিষয়াশক্তিময়ী গৃহ প্রাচীরে বদ্ধ থাকিতে পারে? সেই চিতচোর বন্ধুর সহিত মিলন না হওয়া পর্য্যন্ত এ গৃহ তাহার কারাগার। সপ্তপুরান্তর নিবাসিনী কুলবধূ রাজনন্দিনী যে অনাহত কাম-মন্ত্র-ধ্বনিতে মোহিত হইয়া উন্মাদিনীর ন্যায় লোক লাজ ভয় পরিত্যাগ করতঃ গৃহ-কারাগারের বাহির হইল, সেই কাম-মন্ত্রের ভাষা কি? 'কাম' কি? কামের স্বরূপ কি? তাহার ক্ষেত্র কি? সেই মন্ত্রের আকর্ষণে জীব এত উন্মত্ত হয় কেন? শক্তিরূপিনী ব্রজগোপী ব্যতীত এই মহামন্ত্রের স্বরূপ কেহই জানে না। ওগো দয়ার আধার শ্রীকৃষ্ণৈকগতপ্রাণা কৃষ্ণসহচরীগণ, তোমাদের শ্রীচরণের দাসী হইতে আমাদিগকে অধিকার দাও মা, আমাদের কৃষ্ণ-সেবায় অধিকার নাই; তোমরা দয়াবতী তোমাদের সেবাধিকার দাও; তোমরা উদারধীয়া মাদৃশ অকিঞ্চনের সেবায় তোমাদের তুষ্টি না হইলেও দীনের প্রতি তোমাদের স্বাভাবিক কৃপা প্রবাহ প্রতিহত হইবে না। তোমাদের কৃপাকণা লাভ করিতে পাইলেই সেই শ্রীনন্দ নন্দন যিনি—

"বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন।
'কাম-গায়ত্রী' 'কামবীজে' যার উপাসন॥
পুরুষ যোষিৎ কিবা স্থাবর জঙ্গম।
সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎ মন্মথ-মদন॥ (কৃষ্ণদাস কবিরাজ)

তিনি হৃদয় কমলে পদার্পণ করিবেন।

সর্ব্ব শাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীশুকদেব মুখে যাঁহাকে "সাক্ষাৎ মন্মথ-মন্মথ" বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন, সেই সর্ব্ব চিত্তাকর্ষক "মন্মথ-মদনের" আকর্ষণই 'কামের' বীজ। এই বীজ হইতেই বহু শাখা প্রশাখান্বিত প্রবাল-পত্র কলি-কুসুম-সুশোভিত কাম তরুবর জীব হৃদয়ে অঙ্কুরিত ও বদ্ধমূল হয়। জীবের যাহা 'আমি' যেই 'আমি জ্ঞান' লইয়া জীব সেই 'আমি' জ্ঞানই কামের ক্ষেত্র ও সেই আকর্ষণই কামের স্বরূপ। মোহ কলুষিত জীব কাম ফল বা ভোগের সহিত মিলিত করিয়া কামকে দেখে বলিয়াই জগদ্বস্তুতে বাসনার স্থিতিকে কাম সংজ্ঞাতে অভিহিত করিয়া শিব গড়িতে বানর গড়িয়া তোলে। কিন্তু যাই কামকে ভোগে পরিসমাপ্ত করিতে যায়, অমনিই ভোগের শেষ হইতে না হইতেই ভোগ বা ভোগ্যবস্তু ছিন্ন হইয়া পরে সেই ভোগ 'আমার' পর্য্যন্ত হইয়া থাকে, 'আমি' হইতে পারে না। আর আমার 'আমির' তৃপ্তির জন্যই আমরা মদতিরিক্ত সকল বস্তু বা ভাবের আহরণ করি। 'আমি'কে পূর্ণানুভব করিতে পারাই কামের

লক্ষ্য। কাজেই বাহিরের ভোগ্যবস্তু 'আমি' হইতে না পারিয়া আমার পর্য্যন্ত হইলে 'কাম' তৃপ্ত হইবে কেন ?

"আমার আমার বলে মত্ত হই অনিবার,
ইন্দ্রিয়াদি দারা সুত সকলি ভাবি আমার ;
কিন্তু আমি কোন্ খানে, 'খুঁজিয়া না পাই ধ্যানে,
কোন পথে গেলে আমার 'আমি' মিলে দেনা বলে,
দ্বিজ রামে ভ্রমে আর রেখ না মা নিস্তারিণী ॥"

কাম আকর্ষণের সম্মুখে যতই ভোগ্যবস্তু দাও না কেন, বাসনাব্যাপী কাম তাহা সমগ্র গ্রাস করিয়াও অতৃপ্তই থাকিবে. সে দারুণ দাবানল কিছুতেই নিবৃত্ত হইবে না। সেই আকর্ষণ বা টান বস্তুতে পরিসমাপ্ত হইবার নহে—

"ন জাতু কামান কামভোগেন সাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয়োইবাভিবর্দ্ধতে ॥"

ফলতঃ যে যাহা চায়, সে তাহা না পাইলে তৃপ্ত হইবে কেন! পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ মৃগ যেমন বারি অনুসন্ধানে ধাবমান হইয়া, বারিভ্রমে মৃগ-তৃষ্ণিকা লক্ষ্য করতঃ আপনার তৃপ্তির জন্য মরিচীকার পশ্চাদ্ধাবন পূর্ব্বক অবশেষে মৃত্যুমুখেই পতিত হয়, পরন্তু আত্ম তৃপ্তি হয় না ; তদ্রূপ জীবও কামের আকর্ষণকে বিষয় বুদ্ধিতে পরিসমাপ্ত করিতে যাইয়া. কেবল বিষয়ের পর বিষয়েরই অনুসরণ করিয়া থাকে, তৃপ্তি কোথাও পায় না। কাম জীবের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য নহে। "কামস্তু-নেন্দ্রিয় প্রীতি জীব জীবেত যাবতা।" কাম আছে বলিয়াই জীব জীবিত থাকে। জীব মায়াবশে পুরুষ হইতে আপনাকে পৃথক বোধ করতঃ তাহাকেই লাভ করিয়া পূর্ণ স্বরূপ হইতে চাহে। জীবের এই পূর্ণত্ব লাভের আকাঙ্খাই 'কাম'। পুরুষাভিমুখী জীবের যে স্বাভাবিক গতি বা প্রবণতা তাহাই 'কাম'।

"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরাগতিঃ।"

কামরূপিনী সুরধুনীর গতি পরম পুরুষরূপ মহা সমুদ্রের অভিমুখিনী ; তাহাকে প্রতিরোধ করিতে যাইয়া কত ঐরাবত ভাসিয়া যায়—তুচ্ছ বালির আলি বান্ধিয়া তাহাকে স্থির করা যাইতে পারে না ; ভোগ্য বস্তুর বাধা মুহূর্ত্তেই উপ্চাইয়া চলিয়া যায়। ভোগ্য বস্তু লাভে কাম স্থির হয় না, ভোগ্য লাভেও টান পূর্ব্বের মতনই থাকিয়া যায়। যে আকর্ষণে জীব আকৃষ্ট, তাহাকে লাভ করিতে না পারিলে আর আকর্ষণের সমতা হইবে কিসে? আকর্ষক ও আকৃষ্ট যতক্ষণ দূরে দূরে, ততক্ষণই টানাটানি ; কাছাকাছি হইয়া মিলিয়া

গেলে আর কে কাকে টানে? টানের মূলকে ভুল করি বলিয়াই যত গোলমাল,—

> 'তুমি' 'আমি' একই বস্তু, সর্ব্ব ভাবে সমান সমান।
> তফাৎ কেবল ভুলি ব'লে, "আমি"'র মাঝে 'তুমি'র টান॥

ফলতঃ জীবের 'আমি' জ্ঞানটি যেখানে অধিষ্ঠিত, কামের টানটিও ঠিক সেই খানেই দেখা যায়। "আমির" অতিরিক্ত একটা কিছু আছে, এই বোধ না থাকিলে, কাম থাকিতে পারে না। "আমি" এবং আমার বাহিরে জগত বোধ আছে বলিয়াই আমরা এটা ওটা লাভ করিতে—আত্মসাৎ করিতে চাহি। যাহার আমি' বোধ কেবল স্থূল শরীরেই সীমাবদ্ধ, যেমন পশুদের—তাহারা স্থূল ভোগের জিনিস ভিন্ন কিছুই চাহে না; আর সাধারণ মানুষের 'আমি' বোধটা একটু উপরে তাই তারা একটু যশঃ মান ধন ইত্যাদি চাহে। তাহা হইতেও যাহাদের সূক্ষ্ম 'আমির' বোধ হইয়াছে, তাহারা যোগ তপস্যালব্ধ শক্তি সিদ্ধি ইত্যাদি চাহে। টানের স্বরূপ এক হইলেও জীব স্বীয় আত্মানুভূতির স্তরের উপর দাড়াইয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রানুসারে 'আমির' বাহিরে টানকে ছড়াইয়া দেয়।

কাম নিত্য; জীব-হৃদয়ে ইহা নিত্য ক্রীড়াশীল। কাঁচা লৌহখণ্ড বৈদ্যুতিক প্রবাহে চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হইবামাত্র যেমন তাহার দুইটী ক্ষেত্র নির্দ্ধারণ করিয়া লয়, তদনুরূপ মহামায়ানুভবে জীবের বিকাশ হইবামাত্র তাহারও দুইটী ক্ষেত্র হয়; এবং উভয় সীমার মধ্যে জীব নিরন্তর বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। চুম্বকের মধ্যভাগে যেমন কোনও বিক্ষেপ থাকে না, জীবের কূটস্থ চৈতন্যও তদ্রূপ বিক্ষেপশূন্য। উভয় ক্রান্তি মধ্যে নিয়ত বিক্ষেপের মূলে কাম। কাম যখন কূটস্থাভিমুখী হয়, তখনই বিক্ষেপ রহিত হইয়া পড়ে। আকর্ষণ যোগ্য দ্বিতীয় লৌহখণ্ড সমীপবর্ত্তী না হইলেও যেমন চুম্বকে আকর্ষক শক্তি সুপ্ত থাকে না; সে তাহার স্বাধিষ্ঠানে নিত্যই বিরাজিত থাকে, সেইরূপ কামরূপিণী মহাশক্তি জীবকে "অপ্রাকৃত নবীন মদনের" 'অঙ্কারূঢ় করিতে নিয়তই যত্নপরায়ণা আছেন। তিনি এই নিত্য কামরূপী আকর্ষণ বলিয়াই সতত পরব্রহ্মরূপে সিদ্ধা। এই 'আকর্ষণ' বা 'কলন' কারিণীশক্তি নিয়তই জীবকে আকর্ষণে নিরত রহিয়াছেন। বহির্মুখী জীব যখন জগদ্বস্তুতে আশক্ত হইয়া থাকে, তখন এই 'কলন' কারিণী মহাশক্তিকে কালীরূপে "প্রকটিত বদনে কামরূপে করালে" বলিয়া ডাকে, তখন তাঁহার করালবদন, বিকটদশন, মুণ্ডমালা বিভূষিত কণ্ঠ, করস্থিত কৃপাণ, ও সৃক্কনি প্রবাহিত গলদ্রুধির ধারা দর্শনে জীব প্রথম প্রথম বড়ই ভয় পায়; পরে যখন

ভোগাশক্তির কলন দ্বারা ক্রমশঃ বাহ্যবস্তু ভোগের আশক্তি একটু কমিয়া আসে, তখন মায়ের বরাভয় করযুগল, স্মেরানন দর্শনে জীব একটু আশ্বস্থ হইয়া তাহাকে দয়াময়ী মা বলিয়া চিনিতে পারে। তখন তাহার মনে হয়,—

"কার মা এমন দয়াময়ী, আমার মাগো তুমি যেমন,—
বাহিরে আরক্ত আঁখি, স্নেহে বিগলিত মন।"

তখন জীব সাধ করিয়া তাহার সাধের ভোগাশক্তি ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য মায়ের পদানত হইয়া তাহার শরণাপন্ন হয়। তাহার পরে জীব যখন সম্পূর্ণরূপে বিগত-বাসনা ও ধৌত-কল্মষ হইয়া মায়ের নিভৃত কুঞ্জ মন্দিরে প্রবেশ করে, তখন সে দেখে যে সে আর পুরুষ নাই, সে প্রকৃতি হইয়াছে, তাহার মাও আর অসি-ধারিণী প্রকৃতি নাই, বংশীধারী—হৃদয়-চোর পরমাকর্ষক পুরুষোত্তম হইয়া বসিয়াছেন। এখানে কলন নাই, আকর্ষণ নাই, আছে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। তাই একই ক্ষেত্রে যে মূর্ত্তি রাধারাণীর সম্মুখে বংশীধারী রূপে স্থিত, তাহাই আয়ানের নিকট অসি-মুণ্ড-বরাভয়ধারিণী কালীরূপে প্রকটিত। ভ্রষ্টাপবাদগ্রস্থা স্বীয় বনিতাকে আপন অভীষ্টদেবীর পদতলে প্রণতঃ দেখিয়া আয়ানের হৃদয়ে সুখের সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। ফলতঃ একই অপ্রাকৃত বিগ্রহকে অধিকারী ভেদে দুইরূপে একই সময়ে, একক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাবে স্ব স্ব ইষ্টরূপে দর্শন করিলেন। জীব যতক্ষণ পর্য্যন্ত আকর্ষককে চিনিতে পারিয়া তাহার অভিমুখী না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সংসার-সলিল ভাণ্ডে চৌম্বক সন্নিহিত ক্রীড়নকের ন্যায় ইতস্ততঃ ভাসিতে থাকে। স্বীয় নাভিমূল সঞ্চিত মহার্ঘ্য কস্তুরিকা-গন্ধমোহিত উদ্ভ্রান্ত-চিত্ত মৃগ যেমন গন্ধানুসন্ধানে ইতস্ততঃ বিচরণ করে, অবোধ জানেনা যে তাহার 'আমির' মাঝেই সেই গন্ধের খনি বিরাজমান রহিয়াছে।

"সব্ কি ঘটমে হরি রহতা হৈ, দেখ্‌তা নহি হৈ কোই।
আপন নাভিকি সুগন্ধ মৃগ নহি জানত, ঢুঁড়ত বিয়াকুল হোই।"
(তুলসীদাস)

চুম্বক সন্নিহিত ক্রীড়নক যেমন আকর্ষণের দিঙ্‌নির্ণয় হইলে, একেবারে যাইয়া আকর্ষকে মিলিত হয়; জীবও সেইরূপ একবার আকর্ষণের গতি স্থির করিতে পারিলে, অদম্য গতিতে তাহাতে মিলিত হইবার জন্য ধাবিত হয়। তখন তাহাকে দেহ, গেহ, লোকলাজ, কিছুতেই বাধা দিতে পারে না, সেই পথে গমন সময়ে পদজড়িত ভুজঙ্গ, ভূষণ মধ্যে গণ্য হইয়া পড়ে।

"চলিতে চরণে কত, বিষধর বেড়িত, মণিময় নূপুর মানি।
আমি আসিতাম বাঁশীর তানে, তখন কেবা চাইত পথ পানে॥
(চরণ পানে ফিরে চেতেম না গো॥")　　(কৃষ্ণকমল)

জীবের 'আমি'টী সেই পরমাকর্ষকেরই স্বজাতি। যখন আকৃষ্ট হইয়া তাহাতে মিলিত হয় ও তদ্‌গুণে গুণবান্ হইয়া উঠে, তখন সে আরো কত শত পতিত জীবকে আনিয়া সেই পরমাকর্ষকের পদে ন্যস্ত করে। এই প্রকার পরমপদ প্রাপ্ত নিগ্রন্থা, আত্মারাম, মুনিগণই কল্পে কল্পে যুগে যুগে ছিন্ন 'আমিত্ব' মুগ্ধ জীবকে পরমাকর্ষকের পাদমূলে সমানয়ন করেন। ইহারাই ঋষি (ঋ ধাতু-গত্যর্থে পরম পদ প্রাপ্ত করান) বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণিত ও লোক গুরু বলিয়া ঘোষিত হইয়া থাকেন।

আনন্দ সদন, শ্রীনন্দ-নন্দন, বিশ্ব-রাসমণ্ডলের অধীশ্বর, পরমাকর্ষক নিয়তই জীবদিগকে তদীয় রাসমণ্ডলাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছেন। সাধারণ জীব তাহা বুঝে না। তবে যাঁহার হৃদয়াকাশে শারদীয় পূর্ণাকার উদয় হইয়াছে; যিনি উৎফুল্ল মল্লিকা কুসুমে কাত্যায়নীর চরণ সেবা করত গোপীভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কেবল তিনিই রাসমণ্ডলে যাইয়া রাসেশ্বরের চরণ-সেবার উপযোগী হইয়াছেন। রসময়ের রসময়ী বংশী জীবকে নিয়তই আকর্ষণ করিতেছে; মুগ্ধ জীব তাঁর 'আমিত্বের' অভিমানে তাঁহাকে ভ্রমক্রমে বস্তুগত করিয়া দেখে বলিয়া, সেই পরম দয়াল রসময় বঁধু কত 'বহুর' সাজে 'সর্ব্বের' আভাস দিবার জন্য কভু বিদেশিনী, কভু দেয়াশিনী, কখনও মানিনী, কভু বাণিয়ানী বেশে আসিয়া, তদীয় স্বীয় আনন্দ-ঘন-রসের আভাস প্রদান করেন। মুগ্ধ জীব যখন কামকে আত্মাতিরিক্ত বহির্বস্তুতে পরিসমাপ্ত করিতে যাইয়া বিষয়ের ভোগে আশক্ত ও তাহাকে আত্মগত করিতে প্রয়াস পায়, কিন্তু বহির্বিষয়ে কামের সমাপ্তি না হওয়াতে বিষয় তাহার 'আমি' হইতে ছিন্ন হইয়া পড়ে, কাম সেই বিচ্ছেদের মধ্যেও ক্ষণিক আনন্দছটার আভা বিকীর্ণ করিয়া যায়; কাম যে আনন্দময়ের আনন্দরস স্বরূপ, তাহা আনন্দময় না হইয়া কি হইবে? এই রূপে কাম আমাদিগের ব্যক্ত ও বিচ্ছিন্ন 'আমি' কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া সেই ব্যক্তের মধ্যে অব্যক্ত, পূর্ণ, আনন্দময়, অজ্ঞাত, সত্বার আভাস প্রদান করে। বহির্মুখী জীব সেই ইঙ্গিতের লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য যতই 'বহু' ভাবে বহু-পথের অনুসন্ধান করিতে থাকে, প্রত্যেক 'বহু' তাহাকে 'বহুর' ভাষায় 'সর্ব্বের' ও অপূর্ণের ভাষায় পূর্ণের আভাস ইঙ্গিত করত ছিন্ন 'আমি'র মধ্যে 'নেতি'

'নেতি' ধ্বনিতে 'তত্ত্বমসীর' বাণী জাগাইয়া তোলে। এই অতৃপ্তির অশরীরী বাণীই তাহাকে তৃপ্তির অনুসন্ধানে পূর্ণের দিকে প্রেরণ করে।

কাম নিত্য ও চির নবীন। কখনও পুরাতন হয় না। কাম অজর ও অমর। কামের আকর্ষণ যখন বস্তুগত হইয়া ছিন্ন হইয়া পড়ে, তখন সেই ছিন্ন বস্তুতে জীবের অতৃপ্তি আসে বটে; কিন্তু কাম পুরাতন বা ছিন্ন হয় কি? কামের প্রভাব লুপ্ত হয় কি? একমাত্র মদন মোহনের পাদমূলে উপনীত হইতে না পারিলে কাম বা মদন মোহিত হয় না। সেই "অপ্রাকৃত" বৃন্দাবনের "নবীন মদন"ই পূর্ণতম, আর মায়াসমুদ্রে ভাসমান বিশ্বান্তর্ব্বর্ত্তী জীব ক্ষুদ্রতম হইলেও ইহা তাঁহার সেই পূর্ণতমেরই অতি ক্ষুদ্রাদপি-ক্ষুদ্র কণিকা; তাঁহারই স্বজাতীয়। বিশ্বান্তর্গত জীব ছিন্ন জীবের হিসাবে চতুরানন, শতানন, সহস্রানন যত বড়ই হউক না কেন, সেই পরম মহান্ পূর্ণতম অচল-প্রতিষ্ঠ মহাসাগরের লহরী অপেক্ষা কেহই বড় নহেন। কবিপ্রবর বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন;—

"কত চতুরানন মরি মরি যাওত, ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুনঃ তোহে সামাওত, সাগর লহরী সমানা"॥

সাগরের সহিত তরঙ্গ ও লহরীর যে সম্বন্ধ, মহান্ ভগবানের সহিত সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবেরও সেই সম্বন্ধ। এই ভরসাতেই বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি গাহিয়াছেন;—

"গণইতে দোষ, গুণলেশ না পাওবি,
যব তুঁহে করবি বিচার।
তুঁহু জগন্নাথ, জগতে কহায়সি,
জগবাহির নহি মুঞি ছার॥"

তাই মহানভিমুখী জীবের যে টান বা আকর্ষণ, তাহা জীবের স্বজাতীয় টান। কেবল স্বজাতীয় এক মানুষের প্রতি অপর মানুষের টান নহে, এই টান প্রাণের। প্রিয়তম পতির প্রতি সতী স্ত্রীর যে টান বা জারের প্রতি কুলটার যে টান, তদনুরূপ টান। 'আমির' প্রতি আমার যে টান,—সেই টান। এ টান যাঁহার প্রতি সে টানের আধার যে আমার কত অন্তরঙ্গ—কত আপন, তাহা ভাষায় প্রকাশ হয় না, যে বুঝে সে বুঝে, তাহা কহিবার কথা নয়—তাহা অনুভবের বস্তু। কবিরাজ গোস্বামী পাদ বলিয়াছেন;—

"কহিবার কথা নয়, তথাপি বাউলে কয়।"

বিদ্যাপতি প্রাণনাথের অন্তরঙ্গত্বের আভাস বুঝাইতে কহিয়াছেন;—

"হাত ক' দরপণ মাথ ক' ফুল, নয়ন ক' অঞ্জন মুখ ক' তাম্বুল।

হৃদয় ক' মৃগমদ গীমক হার, দেহ ক' সবরস গেহ ক' সার।
পাখী ক' পাখ মীন ক' পানি, জীব ক' জীবন হাম তুহু জানি।
তুহু কৈছে মাধব কহবি মোর। বিদ্যাপতি কহ দুঁহু দোঁহা হোয়"।

সে প্রাণনাথ কেবল "আমির" "জীব ক' জীবন" নহে, 'আমার 'আমির' 'দেহ ক' সবরস গেহ ক' সার"ও সেই। তবে যখন বাহিরে তাঁহাকে না দেখিয়া দেহ, গেহ আদিকে ভিন্ন বলিয়া ভাবি, তখন দেহ, গেহ আমার তদভিমুখী অভিসার পথের কণ্টক হইয়া দাড়ায়; সংসার কারাগারস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। ফলতঃ একবার তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার অভিমুখী হইয়া তাহার নিকুঞ্জ কাননাভিসারিণী হইতে পারিলে, সংসার-কারাগার তাহাকে আর আবদ্ধ রাখিতে পারে না। ধৃত-কৃষ্ণ-হৃদয় নন্দালয়াভিমুখী বসুদেবের অঙ্গ হইতে লৌহ নিগড় স্খলিত ও কারাকক্ষের কপাট অনর্গলিত হইয়া পড়ে।

প্রাণনাথের টান চিনিতে হইলে ছিন্ন 'আমির' আবরণ ত্যাগ করিতে হইবে; বিগতাম্বর হইয়া প্রেম-যমুনার জলে অবগাহন করিতে হইবে; আবরণে আবরিত থাকিয়া 'আমিকে' চিনিতে পারিবে না, টানও বুঝিতে পারিবে না। মোহমুদ্গার পদ্য টীকাতে শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;—

"কামং ক্রোধং লোভং মোহং ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যহি কোঽহং।
" " " " বাল্যস্তচিরাদ্যদি বিস্মৃতং ॥"

কাম অর্থাৎ বিষয়, বাসনার গণ্ডী ও তৎ সুলভ লোভ, মোহ ও ক্রোধাদি অতিক্রম না করিলে, 'আমি'কে দেখিতে পাওয়া যায় না। ফলতঃ কামের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিলে বিষয় বাসনা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারা দূরে থাকুক, তাহার সমীপবর্ত্তী হইতেও পারে না। বিশুদ্ধ কাঞ্চন ব্যবসায়ী কি কখনও গিল্টি দেখিয়া ভ্রমে পতিত হয়? ক্ষুদ্রকে আত্মসাৎ করিতে মহানের ও মহানে আত্ম সমর্পণ করিতে ক্ষুদ্রের যে আকর্ষণ বা টান, তাহাই মহাপ্রভুর অচিন্ত্য ভেদাভেদ নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। মহদাদপি মহীয়ান্ পরপুরুষের আকর্ষণের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই কবিরাজ গোস্বামী মহাপ্রভুর কণ্ঠে গাহিয়াছেন ;—

"নাগর কহ তুমি করিয়া নিশ্চয়;
এই ত্রিজগত ভরি, আছে কত যোগ্য নারী,
তোমার বেণু কাঁহা না আকর্ষয়?
কৈলে জগতে বেণু ধ্বনি, সিদ্ধ মাত্রাদি যোগিনী,
দূতী হঞা মোহে নারীর মন।

মহোৎকণ্ঠা বাড়াইয়া, আর্য্যপথ ছাড়াইয়া,
আনি তোমায় করে সমর্পণ"॥

বিশ্ব-রাসমণ্ডলের কেন্দ্রে সমাসীন হইয়া সেই নব-নটবর পূর্ণতম পর পুরুষ যখন তাঁহার সপ্তস্বরা বাঁশরীর রসময় তানে জগতের কেন্দ্র ভেদ করত সুমধুর রবে 'কাম'-বীজের মহাসঙ্গীতে ধ্বনিত জগত প্লাবিত করিয়া দেয়, সেই প্রদ্যুম্ন যখন জগতের মর্ম্মে মর্ম্মে অণুতে অণুতে প্রবেশ করিয়া বিশ্বকে আকর্ষণ করিতে থাকে, তখন তাহার সেই আকর্ষণের শাসন উপেক্ষা করিয়া বল কে কোথা যাইতে পারে? তুমি যে সপ্ত প্রাকার ও প্রাচীর পরিবেষ্টিত অতি সুরক্ষিত পুরী নির্ম্মাণ করত দম্ভ-দৃপ্ত অহমিকার উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া আছ, তোমার এই মহানগরী শোণিতপুরের উপকণ্ঠে ঐ শুন কাহার তূর্য্য নিনাদিত হইল। হে শোণিতপুরাধীশ্বর মহারাজ বাণ (পঞ্চ) ভূতমাত্রার অধীশ্বর তোমারই তনয়া উষা অতি গোপনে যে কৃষ্ণের বংশধরে আত্ম সমর্পণ করত তাহাকে তোমার পুরাভ্যন্তরে অতি গোপনে কক্ষে লুক্কায়িত রাখিয়াছে। তাহারই উদ্ধার সাধনে ঐ শুন পরমাকর্ষক শ্রীকৃষ্ণ সদলবলে আজ তোমার পুর আক্রমণ করিয়াছেন; এ তাহারই তূর্য্য নিনাদ। তুমি ইচ্ছায়ই হউক আর অনিচ্ছায়ই হউক, যখন কামকে চিনিয়া ফেলিয়াছ, তখন সেই কাম-জনকের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহার সহিত মিলন ভিন্ন তোমার গত্যন্তর নাই। তুমি ভাবিতেছ তোমার আরাধ্য-মহান্ তমোরূপী শিব পরমাকর্ষকের নিকট হইতে তোমাকে ফিরাইয়া রাখিবেন। বাবা, সে টানে পড়িতে পারিলে উনি ত উনি, সেই যে স্বয়ং প্রভুটী যিনি কাম-জনক বলিয়া অভিহিত, তিনিও শ্লাঘা মনে করেন। তাঁহার টানের মজাই এই,—

আপন মাধুর্য্য হরে আপনার মন।
আপনা আপনি চাহে করিতে আলিঙ্গন॥

মাধুর্য্য যদি অত্যন্ত অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাতে অনভ্যস্ত ব্যক্তির নিকট উহা অতি তীব্র ও তিক্ত অনুভূত হয়। আলকাতার চিনি সাধারণ চিনি অপেক্ষা অধিক মিষ্ট বলিয়াই তিক্ত বোধ হয়। ভাবে সুভাবে সয়ে গেলে বড় মিষ্টি! বড় মধুর! এ মধুর যে—

"কৃষ্ণমাধুর্য্যের এক স্বাভাবিক বল।
কৃষ্ণ আদি নর নারী করয়ে চঞ্চল॥
শ্রবণে দর্শনে আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন।
আপনা আস্বাদিতে কৃষ্ণ করেন যতন"॥ (চৈতন্য চরিতামৃত)

শ্রীভগবানের মাধুর্য্য রসই প্রেম। তাহাই যখন জগদ্ভাবান্বিত বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়, বাসনা, ও বাহ্য-বস্তু বা বিষয়াদি বিভিন্ন বোধের ক্ষেত্রে আসিয়া পড়ে, তখনই উহা কাম উপাধিযুক্ত হইয়া বাহির হইয়া পড়ে; যাহার বুদ্ধি যেখানে নিবিষ্ট, টানকে সে সেইখানেই লইয়া যায়। চর্ম্মকারের হস্তে পতিত শালগ্রাম শিলা তখন শুষ্ক চর্ম্মের মসৃণতা সম্পাদন করে। যেখানেই পতিত হউক না কেন, কাম তাহার স্বভাবসিদ্ধ আনন্দ স্বরূপত্ব কিছুতেই ত্যাগ করে না।

"দগ্ধং দগ্ধং ন পুনঃ ত্যজতি কাঞ্চন কান্তিবর্ণম্।"

যখন সর্ব্বেন্দ্রিয় মনে, মন বুদ্ধিতে ও বুদ্ধি আত্মাতে স্থির হইয়া 'সর্ব্ব' ভাবের বিশ্ব-বুদ্ধি পরিত্যাগ করত, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি একমাত্র পরপুরুষের অভিমুখী হয়, যখন সেই পরম পুরুষ ভূমার জ্ঞান দ্বারা বিশিষ্ট 'আমির' তন্মুখী প্রবৃত্তি হয়, তখন তাহার সেই 'আমির' মধ্যে স্বতঃই "পরতত্ত্বায় বিদ্মহে" গীত ধ্বনিত হইতে থাকে। তখন 'আমি' আর আমি 'রাম' 'শ্যাম' বা 'যদু' থাকে না। তখন আর তাহার ভাষায় বেদ্মি থাকে না; তাহাতে তখন বিদ্মহে ফুঠে।—তাহার 'আমি' আর তাহার একার ভোগে সন্তুষ্ট থাকে না; তখন 'সর্ব্বের' জ্ঞান তাহার জ্ঞান হয়। আর বুদ্ধি আবার তাহারই ব্যঞ্জক ভাবে সর্ব্ব-স্বরূপে প্রকটিত হইয়া "তৎ নো (অস্মাকং) কৃষ্ণ প্রচোদয়াৎ"এর বাণীতে সর্ব্বকে পরতত্ত্বের অভিমুখী করত "দামোদরায় ধীমহি" বলিয়া "কাম-গায়ত্রীরূপে" প্রতিষ্ঠিতা হয়। এই "কাম-গায়ত্রীর" রসে অভিসিঞ্চিত না হইলে, 'কাম-বীজ' হইতে ভক্তিলতা অঙ্কুরিত হয় না। তাই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব।
গুরু কৃষ্ণ কৃপায় পায় ভক্তিলতা বীজ॥
মালী হইয়া করে সেই বীজ আরোপণ।
শ্রবণ কীর্ত্তন জলে করয়ে সিঞ্চন॥

*　　*　　*　　*

তবে যায় তদুপরি গোলক বৃন্দাবন।
কৃষ্ণচরণ কল্পবৃক্ষে করে আরোহণ॥
তাঁহা বিস্তারিত হইয়া ফলে প্রেমফল।
ইহাঁ মালী নিত্য সেচে শ্রবণাদি জল॥

প্রেম ফল পাকি পড়ে মালী আস্বাদয়।
লতা অবলম্বি মালী কল্পবৃক্ষ পায়॥"

এই প্রেমফল-প্রসবিনী ভক্তিলতার বীজ "কাম-বীজ" প্রতি হৃদয়েই উপ্ত রহিয়াছে; তাহাকে শ্রবণ ও কীর্ত্তন জলে অভিসিঞ্চিত করিতে পারিলে, শ্রীগুরু-প্রসাদাৎ উহার অঙ্কুরোন্মুক্ত হইয়া ক্রমে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তাহাতেই সর্ব্বেন্দ্রিয় কার্য্য—তাহাতেই মন ও বুদ্ধির সন্নিবেশ করিতে হইবে। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ ১২। ৮।"

কবিরাজ গোস্বামী তাহারই প্রতিধ্বনিতে বলিতেছেন;—

"তোমা দেখি তোমা স্পর্শি গাই তোমার গুণ।
সর্ব্বেন্দ্রিয় ফল এই শাস্ত্র নিরূপণ॥

ভাই একবার অকৈতব ফল আশা-বিরহিত চিত্তে সেই কামপতি "মন্মথ-মদনের" টান লক্ষ্য করত তাহাতে আত্ম সমর্পণ কর। ব্রতপরায়ণা ব্রজ-যুবতীগণের ন্যায় সর্ব্বাচরণবিমুক্ত হইয়া তাঁহার প্রেম-যমুনার জলে ঝাঁপ খাইয়া পড়, সেই সর্ব্বাতিগ গতিতে নিমজ্জিত হও; ভাসিতে ভাসিতে এক যায়গায় যাইয়া ঠেকিবেই। যদি নাই ঠেকিতে পাও তাহাতেও ভয় নাই, কূলের আশা ছাড়িয়াই অকূলে ঝাঁপ দেও, অকূল-কাণ্ডারীর যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন। গোপীভাবানুগ হইয়া একটু অনুরাগের সোমরস পান করিয়া লইও, তাহা হইলে আর জমিয়া যাইবার ভয় থাকিবে না। ব্রজেন্দ্র-নন্দনের চরণসমীপে উপনীত হইতে হইলে গোপীভাব ভিন্ন অন্য ভাবে অগম্য। ব্রজগোপীর ন্যায় সর্ব্বাগ্রে কাত্যায়নী মহামায়ার বর লাভ করিতে বিস্মৃত হইও না; তিনি সহায় না হইলে পথের সন্ধান পাইবে না। বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী কি বলেন শুন;—

"সখী বিনা এই লীলায় অন্যের নাহি গতি।
সখী ভাবে যেই তাঁরে করে অনুগতি॥
রাধা কৃষ্ণের কুঞ্জ সেবায় সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায়॥"

ভাই একবার মনে প্রাণে গোপীপদস্পৃষ্ট পবিত্র ব্রজরজে অঙ্গ ভূষিত করত গোপীগণসেবিত পন্থানুগমন কর। এই ব্রজরজ সামান্য ধূলিকণা নহে—

"(এত) ধুলা নয়, ধুলা নয় গোপীর পদরেণু।
এই রেণু মেখেছিল নন্দের বেটা কেনু (কানু)"

ব্রজরজে সর্ব্বাঙ্গ ভূষিত করত মনে প্রাণে ব্রজবল্লভ, গোপীজন বল্লভকে ডাকিলে অবশ্যই হৃদয়কন্দরে তাঁহার আবির্ভাব হইবেই হইবে। তাঁহার শ্রীপাদপদ্মাঙ্ক হৃদয়ে স্থাপিত হইলেই, আজ যাহাকে তোমার 'আমির' পর-সম্মিলনে বিরোধী মনে করিতেছ, তৎ সকলই তাঁহার রসে রসিত হইয়া বড় মধুর হইয়া গিয়াছে দেখিতে পাইবে। তখন তুমি আনন্দোন্মত্ত চিত্তে গাহিতে পারিবে ;—

"জীবন যৌবন সকল করি মানন্নু,
দশ-দিশ ভেল নিরদন্দা॥
আজু মঝু গেহ গেহ করি মানন্নু,
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল,
টুটল সবহু সন্দেহা॥
সোহি কোকিলা অবলাখ ডাকউ,
লাখ উদয় করু চন্দা।
পাঁচ বাণ অব লাখ বাণ হউ,
মলয়-পবন বহু মন্দা॥"

তখন জানিতে পারিবে,—

"শীতের ওঢ়নী পিয়া, গিরিষির বা, বরিষার ছত্র পিয়া, দরিয়ায় না।
নিধন বলিয়া পিয়া না কনু যতন, এবে হম জানল পিয়া বড় ধন"॥

তখন বুঝিতে পারিবে,—

"চিরদিনে বিহি আজি পুরল আশ, হেরইতে নয়নে নাহি অবকাশ।
ভনয়ে বিদ্যাপতি আর নাহি আধি, সমুচিত ঔষধে না রহে বেয়াধি॥"

তখন 'আমি' 'তুমি' ভুলিয়া গিয়া কেবল রহিবে ;—

"বহুবিধ বিলসয়ে বহুবিধ রঙ্গ, কমলে মধুপ যেন পাওল সঙ্গ।
নয়ানে নয়ান দোঁহার বয়ানে বয়ান, দুহু গুণে দুহু গুণ, দুহু জনে গান।"

সকল হৃদয়ে পরমাকর্ষক শ্রীনন্দনন্দনের নিত্যলীলা জয় যুক্ত হউক।

ওঁ তৎসৎ ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ। চিন্তা—

আমি।

প্রভু! দুইটী বিরোধী 'আমির' নিবাস,
দেহের ভিতরে মোর।
তোমারি কারণে দুঁহু দোঁহা সনে,
সতত কলহে ভোর॥
এক 'আমি' সদা তোমা ভুলি' গলে,
জড়ায় মায়ার পাশ;—
আর 'আমি' চায়, লুটিতে ও পায়,
টুটিয়া করম ফাঁশ॥
রোষে, অভিমানে ক্ষুব্ধ পরাণে,
এক 'আমি' রহে দূরে।
মান, অপমান, পাশরি অপরে,
তোমা লাগি' সদা ঘুরে॥
বিষের আধার বিষয় বিকার,—
একে করে জর জর।
তব প্রেম সুধা অপরের ক্ষুধা,
নিবারে নিরন্তর॥
আধেক আমার তোমার মাঝার,
মিশিয়া পূর্ণ হয়।
বাকি আধা মোর তোমারে ভুলিয়া,
সতত ক্ষুণ্ণ রয়॥
একের নয়ন করে দরশন,
বাহিরের পোড়া রূপ।
পলকে অপরে মজ্জিত করে,
অন্তর-সুধা-কূপ॥
এই দুই 'আমার' বাদ অনিবার,
পাগল করিল মোরে।
একেরে ছাড়িয়া অপরে লইতে,
পরাণ নাহিক সরে॥

তুমি এ কুটীরে গড়িয়াছ নাথ !
তোমারে সুধাই তাই।
করুণা করিয়ে পারনা করিতে,
দুই 'আমি' এক ঠাঁই ?

শ্রীভূজঙ্গধর রায় চৌধুরী।

মৃত্যু-পথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রসব ঘর বা মৃত্যু-গৃহ।

প্রসব ঘর বা মৃত্যু-গৃহ একই পদবাচ্য। ছটফটানি ও বিষাদের ছায়া উভয়ই সমান, তা'ই উভয় গৃহেরই নাম "আতুর ঘর"। চল যাই পাঠক! এখন প্রসব সময় উপস্থিত; কারণ দশ মাস ও দশ দণ্ড পূর্ণ হইয়াছে। একবার তত্ত্ব লওয়া উচিত, কেননা একবার প্রবেশ করিয়াছিলাম, আবার প্রবেশ করিতে হইবে। ঐ শুন কিসের কোলাহল হইতেছে। প্রসব সময়ে ও মৃত্যু সময়ে সোরগোল উভয়ই সমান। প্রসূতি ও মুমুর্ষুর প্রসব যন্ত্রনা উভয়ত্রই সমান; যথা কবির উক্তি,—"প্রসব বেদনা যমের তাড়না, সদা ফাঁপড় ফাঁপড় করে"। প্রসব সময়ে যেমন আত্মীয়-স্বজনেরা ধাত্রী অন্বেষণ করে, গ্রামে না হউক গ্রামান্তরে মিলেই; তদ্রূপ মুমুর্ষুর প্রসব সময়েও তাহার আত্মীয়-স্বজন ধাত্রী অন্বেষণ করে; নিকটে না হউক দূরে মিলেই মিলে।

প্রশ্ন—মুমুর্ষুর আত্মীয়-স্বজন কে ?

উত্তর—প্রসূতির আত্মীয়-স্বজন—পিতা, মাতা, ভাই বন্ধু ইত্যাদি। মুমুর্ষুর আত্মীয়—স্বজন "শ্রবণ দেবগণ"। মৃত্যু সময়ে এ জগতের আত্মীয়-স্বজন, পিতা, মাতা, বন্ধুগণ কোনই উপকার সাধন করিতে পারেনা; কিন্তু সেই অন্তিম সময়ে নিদানের ধন, কাঙ্গাল-সখা, জগবন্ধু, জগতের পিতামাতা, মুমুর্ষুর দুঃখ জ্ঞাতা, তাহার মঙ্গলার্থ আত্মীয়-স্বজন নিযুক্ত রাখিয়াছেন। তাঁহাদের নাম "শ্রবণ দেবগণ"। তাহারাই সে সময়ে ধাত্রী আনিয়া উপস্থিত করেন। শুন,—সেই "শ্রবণ দেবগণ" কে, এবং তাঁহাদের কার্য্য কি।

যো যং বদতি লোকেঽস্মিন্ শুভং বা যদি বাশুভম্।
প্রাপয়ন্তি ততঃ শীঘ্রং ব্রহ্মণঃ কর্ণগোচরে ॥ ৪৩

দুরাচ্ছ্রবণবিজ্ঞানং দূরাদ্দর্শনগোচরম্।
সর্ব্বে শৃণ্বন্তি যৎ পক্ষীংস্তেনৈব শ্রবণামতাঃ ॥ ৪৪
স্থিত্বাচৈব তথাকাশেজন্তূনাঞ্চেষ্টিতন্তুযৎ।
তজ্‌জ্ঞাত্বাধর্ম্মরাজাগ্রে মৃত্যুকালে বদন্তি চ ॥ ৪৫
ধর্ম্মঞ্চার্থঞ্চ কামঞ্চ মোক্ষঞ্চ কথয়ন্তিতে।
চত্বারিংশদ্ যোজনানি চতুর্যুক্তানি বৈততঃ ॥ ৪৬
ধর্ম্মরাজ পুরং রম্যং গন্ধর্ব্বাপ্সরসাকুলম্।
চতুরশীতিলক্ষৈশ্চ মূর্ত্তামূর্ত্তৈরধিষ্ঠিতম্ ॥ ৪৭
ত্রয়োদশ প্রতিহারা ধর্ম্মরাজপুরে স্থিতাঃ।
শুভাশুভন্তু যৎ কর্ম্মতে বিচার্য্য পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮
শ্রবণাব্রহ্মণঃ পুত্রা মনুষ্যাণাঞ্চ চেষ্টিতম্।
কথয়ন্তি তদালোকে পূজিতাঃ পূজিতাঃ স্বয়ম্ ॥ ৪৯
নরৈস্তুষ্টৈশ্চ যৎ প্রোক্তঞ্চ কৃতঞ্চ যৎ।
সর্ব্বমাবেদয়ন্তিস্ম চিত্রগুপ্তে যমেচ তৎ ॥ ৫০
দুরাচ্ছ্রবণবিজ্ঞানং দুরাদ্দর্শনগোচরম্।
এবং চেষ্টাস্তুতেহ্যষ্টৌ স্বর্ভূ পাতালচারিণঃ ॥ ৫১
তেষাং পত্ন্যস্তথৈবোগ্রা শ্রবণ্যঃ পৃথগাহ্বয়াঃ।
এবং তেষাং শক্তিরস্তি মর্ত্ত্যে মর্ত্ত্যাধিকারিণঃ ॥ ৫২
ব্রতৈর্দানৈঃস্তবৈর্যশ্চ পূজয়েদিহ মানবঃ।
নীয়ন্তে তস্তুতে সৌম্যাঃ সুখ মৃত্যু প্রদায়িনঃ ॥ ৫৩ গঃ-উঃ-১৭ অঃ ॥

চতুশ্চত্বারিশৎ যোজন ব্যাপ্ত ধর্ম্মরাজ পুর দিব্য স্থান। ইহা গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরোগণে সমাকুল এবং মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত চতুরশীতি লক্ষ প্রাণিগণে অধিষ্ঠিত। এই ধর্ম্মরাজ পুরে দ্বাদশ প্রতিহারী অবস্থিত আছে। মৃত্যু সময়ে ব্রহ্মতনয় শ্রবণগণ মনুষ্যের শুভাশুভ কর্ম্ম জ্ঞাপন করিয়া থাকেন; তদনুসারেই ফলভোগ হইয়া থাকে। মনুষ্যগণ তুষ্ট বা রুষ্ট হইয়া যাহা কিছু বলে, সেই সমুদায় চিত্রগুপ্ত ও যমের নিকট আবেদন করে। ঐ শ্রবণ দেবগণ স্বর্গচারী, ভূচারী ও পাতালচারী হইয়া দূর হইতে শুনিতে ও দেখিতে পায়; এইরূপই তাঁহাদের চেষ্টা ও ক্ষমতা। শ্রবণগণ অতি উগ্র শক্তিশালী, তাহাদিগের নামও পৃথক্ পৃথক্। তাহারা নিজ শক্তি প্রভাবে মর্ত্ত্যলোকে মনুষ্যগণের উপকার সাধন করিতে পারে। যাহারা ব্রত দানাদি দ্বারা যেরূপ দেবতার অর্চ্চনা

করে, এই যমলোকে তাহাদিগের সেইরূপ সুখ দুঃখ ও মৃত্যু হইয়া থাকে। ঐ 'শ্রবণ' দেবগণ এই কার্য্যের জন্যই নিযুক্ত, মৃত্যু সময়ে মুমূর্ষুর মঙ্গলার্থে ইহারা ধাত্রী আনিয়া উপস্থিত করেন। বিশ্ব-নিয়ন্তার কোন স্থানেই সুব্যবস্থার ও নিয়ম সংস্থাপনের ত্রুটী নাই।

প্রশ্ন—এ জীবনের ধাই "ধাত্রীগণ"; পর জীবনের "ধাই" কাহারা?

উত্তর—'আতিবাহিক' দেবগণ অর্থাৎ যম, শিব ও বিষ্ণুদূত—ইঁহারাই পর-জীবনের ধাত্রী।

প্রশ্ন—ধাইগণ কোথায় অবস্থিতি করে?

উত্তর—উভয়ত্রই প্রসূতির নিকটে অবস্থিতি করে। যথা—

> ততঃক্ষণেন চৈতন্যে বিকলে জড়তাং গতে।
> প্রচাল্যন্তে ততঃ প্রাণা যাম্যৈ নিকটবর্ত্তিভিঃ॥ গ-উ-২অঃ॥

অর্থাৎ মুমূর্ষু চৈতন্যহীন হইলে নিকটবর্ত্তী যমদূতগণ তাহার প্রাণকে আকর্ষণ করিতে থাকে। এই শ্লোকের দ্বারা ইহাই প্রকাশ পাইতেছে যে, ধাত্রীগণ যেমন প্রসূতির নিকট অবস্থিতি করে, তদ্রূপ মুমূর্ষু প্রসূতির নিকটও যমদূতগণ অবস্থিতি করে।

প্রশ্ন—কেন ধাত্রীগণ উপস্থিত থাকে?

উত্তর—উভয়ত্রই প্রসূতির কল্যাণের জন্য; যদি সুপ্রসব হয় অর্থাৎ আপনা হইতেই প্রসব হয়, তবে যন্ত্রনার কোন কারণ নাই; নচেৎ ধাত্রীগণ জোর পূর্ব্বক প্রসব করাইবে, তাহা যন্ত্রনা দায়ক। এই বিধি প্রসূতির পক্ষেও যেমন, মুমূর্ষুর পক্ষেও তেমন; যে ক্ষেত্রে ধাত্রীগণ জোর পূর্ব্বক প্রসব করায়, সেই ক্ষেত্রেই প্রসূতি ও মুমূর্ষুর অত্যধিক যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়। যথা—

> অথ সত্যবতঃ কায়াৎ পাশবদ্ধমবসঙ্গতম্।
> অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ যমোবলাৎ॥ মহাভারত॥

অপিতু—বিকর্ষতোঽন্তর্হৃদয়াদ্দাসী পতিমজামিলং।
> যম প্রেষ্যান্ বিষ্ণুদূতা বারয়ামাসুরোজসা॥ ভাঃ-৬ষ্ঠ-১অঃ॥

অর্থাৎ যমরাজ সত্যবানের কায়া হইতে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষকে পাশবদ্ধ করিয়া সবলে আকর্ষণ করিতেছেন। ইহা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, আমাদের প্রসব আপনা আপনি হইতে পারে, কিম্বা না হইতেও পারে; না হইলে ধাত্রীগণ প্রসব করায়; তদ্রূপ মুমূর্ষুর প্রাণ নির্গমন আপনা আপনি হইতে পারে কিম্বা না হইতেও পারে; না হইলে ধাত্রী—যমদূতগণ প্রসব করায়। আমাদের যেমন

ব সময়ে বিশিষ্ট প্রস ঘরে বিশিষ্ট ধাত্রীগণ উপস্থিত থাকে, অবশিষ্ট ঘরে হাতুড়ে গ্রাম্যগণ থাকে, তদ্রূপ বিশিষ্ট মুমূর্ষু অর্থাৎ ধার্ম্মিকের মৃত্যু সময়ে বিশিষ্ট ধাই যম, শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণ স্বয়ং উপস্থিত হন। অধার্ম্মিকের পক্ষে দূতগণ যথা ;—

অয়ং হি ধর্ম্মসংযুক্তো রূপবান্ গুণসাগরঃ।
নার্হো মৎপুরুষৈ নৈ'তুমতোঽস্মি স্বয়মাগতঃ॥ মহা-বন-২৯৬অঃ॥

সাবিত্রী কহিলেন, "হে ভগবান! শুনিতে পাই যে, আপনার দূতেরাই মানবগণকে লইয়া যায়; তবে আপনি স্বয়ং কি নিমিত্ত আগমন করিয়াছেন?" যম কহিলেন, "হে শুভে! এই সত্যবান পরম ধার্ম্মিক, রূপবান ও গুণসাগর; আমার দূতেরা ইহাকে লইয়া যাইলে নিতান্ত অন্যায় হয়, এই বিবেচনায় স্বয়ং আগমন করিয়াছি।"

স্বয়ং কর্ত্তাদের হাত কিছু নরম, দূতদিগের হাত শক্ত; বিশিষ্ট ধাত্রীগণ সুপ্রসব করাইতে পারে; অবিশিষ্ট ধাইগণ যন্ত্রণা দিয়া প্রসব করায়, এই মাত্র বিশেষ।

ভ্রূণ নিষ্ক্রান্ত হয় একটি দ্বার দিয়া; ভাবনাময় দেহী বহু দ্বার দিয়া নিষ্ক্রান্ত হইতে পারে। ভ্রূণ নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহার নাম হয় শিশু, ভাবনাময় দেহী নিষ্ক্রান্ত হইলে তাহার নাম হয় "আতিবাহিক"। শিশু প্রসব হয় ধরণীতে; আতিবাহিক প্রসব হয় শব-বক্ষে। শিশুকে আশ্রয় দেয় মাতা; মাতৃ-ক্রোড়ই শিশুর আশ্রয় স্থল। আতিবাহিককে আশ্রয় দেয় 'আকাশ', বায়ু বা আতিবাহিকী দেবগণ; আকাশই তাহার আশ্রয় স্থল। যথা —

আকাশস্থো নিরালম্ব বায়ূভূত নিরাশ্রয়।
ইদং নীর ইদং ক্ষীর স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব॥

অর্থাৎ "আতিবাহিক" আকাশ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে ও বান্ধব দত্ত ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্যান্তর্গত নীরের দ্বারা স্নাত হয় এবং দুগ্ধ পানে প্রীত হয়।

প্রশ্ন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে "আতিবাহিক" শব-বক্ষে বা তৎ সমীপেই ভূমিষ্ঠ হয়। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র-বর্ণে দেখিতে পাই, আতিবাহিক আকাশ অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে। সে কখন কিরূপে আকাশে গমন করিল? ভূমিষ্ঠ হইয়াই আকাশে গমন করিল বা আহারাদি দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া গমন করিল? আমরা দেখিতে পাই শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র চলা ফেরা করিতে পারেনা; মাতার স্তন পান করিয়া ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় পূর্ব্বক হামাগুড়ি দিতে

আরম্ভ করে। পাখীর ছানা প্রসব হইয়াই আকাশে গমন করিতে পারে না; কিন্তু আকাশ গমনের শক্তি তাহাতে আছে। সেই শক্তি ক্রমে মাতৃ-স্তন্য পানে বর্দ্ধিত হইলে পর আকাশে উড্ডীন হয়। এই উভয় স্থানেই দেখা যাইতেছে যে, আহারাদি দ্বারা পুষ্ট হইয়া হামাগুড়ি দেয় বা আকাশে উড্ডীন হয়। আতিবাহিক ও কি সেইরূপ আহারাদি দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিয়া আকাশে উঠে? আতিবাহিক কোথা হইতে আহার পায়, কে তাহাকে আহার দেয়, তাহার মাতা কে এবং সে কিরূপে ভোগ-পুষ্ট হইয়া শক্তি লাভ করে?

উত্তর—আতিবাহিক প্রসব হইয়াই আকাশ অবলম্বন করিতে পারে না; যেমন আমাদের শিশু বা পাখীর ছানা প্রসব হইবামাত্র বাহ্য বায়ুর শীতল সংস্পর্শে জড়সড় হইয়া যায়, নড়িতে চড়িতে পারে না; অথচ নড়ন চড়নের শক্তি তাহাতে আছে; সেই শক্তি সেক, তাপ ও স্তন্যপানে বৃদ্ধি হয়। ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য, যে যতক্ষণ শিশু, পাখীর ছানা বা আতিবাহিক গর্ভে ছিল, ততক্ষণ সে অত্যন্ত গরমে ছিল এবং যেই প্রসব হইল, অমনি বাহিরের শীতল বায়ুর স্পর্শে সে জড়সড় হইল; সুতরাং আকাশ গমনে অক্ষম; তখন সেক, তাপ ও স্তন্যপানের প্রয়োজন। কিন্তু এ নিয়ম সকলের পক্ষে নহে। অমাদের যেমন বলিষ্ঠ ছেলের পক্ষে অধিক সেক তাপের প্রয়োজন হয় না, দুর্ব্বল সন্তানের পক্ষেই বিলক্ষণ প্রয়োজনীয়; ইহাও ঠিক তদ্রূপ। যাহারা জীবদ্দশায় যোগ তপস্যাদি দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করিয়াছে, তাহারা হৃষ্টপুষ্ট হইয়াই ভূমিষ্ঠ হয়; তাহাদের জন্য বিশেষ সেক তাপের প্রয়োজন হয় না। প্রসব হইয়াই তাহারা একেবারে আকাশ অবলম্বনে উর্দ্ধলোক আক্রমণ করতঃ ভোগ-স্থানে উপস্থিত হয়; তাহাদিগকে আর প্রেতাদি দেহ ধারণ করিতে হয় না। যোগ তপস্যাদির তারতম্যে সূক্ষ্ম শরীরের ও তেজের তারতম্য হয়। সাধারণের পক্ষে স্তন্যপানে পুষ্ট হইয়াই আতিবাহিকের আকাশ গমনের উপযুক্ত শক্তি উন্মুক্ত হয়। আতিবাহিকের দেহ এত লঘু যে তাহাতে আকাশ গমনের শক্তি আছে, এবং আকাশাবলম্বন করিয়া দশ দিন অবস্থিতি করিতে পারে। তবে তাহা সেক, তাপ ও মাতৃস্তন্য-পানে বর্দ্ধিত হওয়া সাপেক্ষ। শিশুকে যেমন অগ্নি দ্বারা সেক তাপ দেওয়া হয়, আতিবাহিকও সেইরূপ অগ্নি দ্বারা সেক তাপ প্রাপ্ত হয়। মাতৃ-স্তন্যপানে শিশু যেমন শক্তিশালী হইয়া হামাগুড়ি দেয় বা আকাশে উড্ডীন হয়, আতিবাহিকও তদ্রূপ মাতৃ-স্তন্যপানে শক্তিশালী হইয়া আকাশে অবস্থিতি করে। আতিবাহিকের

মাতা "শব", কেন না সেই উহাকে প্রসব করিয়াছে। শবরূপী মাতাই আতিবাহিককে সেক তাপ দেয়; এবং শবরূপী মাতাই তাহাকে স্তন পান করায়; অর্থাৎ শবদাহোত্থিত জল ও ধূমাদিরূপ স্তন্য পানে আতিবাহিক শক্তিশালী হইয়া আকাশে উড্ডীন হয়; যথা শ্রুতি,—"অন্ত্যায়াঞ্চ শরীরাহুত্যবগ্নৌ হুতায়ামগ্নিনাদহ্যমানে শরীরে তদুত্থাপোধূমেন সহোর্দ্ধং যজমানমাবেষ্ট্য চন্দ্র-মণ্ডলং প্রাপ্য কুশ মৃত্তিকা স্থানীয়া বাহ্য শরীরান্তিকা ভবন্তি" ॥ ইতি ছান্দোগ্য —৫মঃ প্রপা-১০ম-৪ শাঙ্কর ভাষ্য। অর্থাৎ "যখন অন্ত সময়ে অগ্নিতে শরীরাহুতি প্রদান করা যায় এবং অগ্নি শরীরকে দগ্ধ করে, তখন সেই শরীর হইতে উত্থিত জল ও ধূম রূপে যজমানকে আবেষ্টন করিয়া ঊর্দ্ধ চন্দ্রমণ্ডলে লইয়া যায় এবং তাহারাই কুশ মৃত্তিকা স্থানীয় বাহ্য শরীরাত্মক হয়।" ইহা দ্বারা বুঝা গেল সূক্ষ্ম আতিবাহিক দেহ শবোত্থিত সূক্ষ্ম ধূম ও জলরূপ স্তন-ভোগে পুষ্ট হইয়া আকাশ গমনান্তর দশ দিন অবস্থিতি করে। ঐ সূক্ষ্ম ধূম ও জলই সেই সূক্ষ্ম দেহের উপযোগী ভোগ। তা'ই আর্য্য শাস্ত্রের অপূর্ব্ব সিদ্ধান্ত "শবদাহ"।

প্রশ্ন—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে ইহাই মনে করিতে হয় যে, আতিবাহিক শব বক্ষে বা তন্নিকটেই ভূমিষ্ট হয়; কেননা তাহা না হইলে শবোত্থিত ধূম ও জল তাহাকে কিরূপে আবেষ্টন করিবে এবং কিরূপেই বা ঊর্দ্ধে লইয়া যাইবে? আর যদি তাহাই হয় অর্থাৎ শব-বক্ষেই ভূমিষ্ট হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে যে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত শবদাহ হইতে থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আতিবাহিকও দগ্ধ হইতে থাকে?

উত্তর—শাস্ত্রের সিদ্ধান্তও তাহাই। আমরা মন্ত্র-বর্ণে তাহাই দেখিতে পাই। শ্মশানানলে আতিবাহিক দগ্ধ হয়। যথা—

শ্মশানানলদগ্ধোহসি পরিত্যক্তোহসি বান্ধবৈ।
ইদং নীর ইদং ক্ষীর স্নাত্বা পীত্বা সুখীভব ॥

অর্থাৎ বান্ধব কর্তৃক পরিত্যক্ত ও শ্মশানানলে দগ্ধ, হে আতিবাহিক! এই জলের দ্বারা স্নাত হইয়া শীতল হও এবং এই দুগ্ধ পান করিয়া সুখী হও।

প্রশ্ন—তবে কি ইহাই মনে করিতে হইবে, যে আমাদের শরীর যেমন অগ্নি-দগ্ধ হইয়া ভস্ম হয়, আতিবাহিকও তদ্রূপ অগ্নি-দগ্ধ হইয়া ভস্ম হয়? যদি তাহাই হয়, তবে আতিবাহিকের অভাবে প্রেত দেহের অভাব হইবে, তদভাবে শ্রাদ্ধ পিণ্ডাদিও নিরর্থক হইবে এবং শ্রুতি স্মৃতি সকলেরই বিরোধ উপস্থিত হইবে।

উত্তর—শরীর যেরূপ অগ্নি-দগ্ধ হইয়া ভস্ম হয়, আতিবাহিক সেরূপ অগ্নি-দগ্ধ হইয়া ভস্ম হয় না, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। যথা—

"সদেহো ন ভবেদ্‌ভস্ম জলদগ্নৌ যমালয়ে"।

প্রশ্ন—যদি ভস্মই না হয়, তবে মন্ত্র-বর্ণের "ইদং নীরের" প্রয়োজন কি ?

উত্তর—প্রয়োজন আছে, অগ্নি-দগ্ধ হইয়া আমরা যেরূপ সন্তাপ ভোগ করি, আতিবাহিকও অগ্নি-দগ্ধ হইয়া ভস্ম হয় না বটে, কিন্তু সন্তাপ ভোগ করে। যথা—

"ন চ দগ্ধো ন ভগ্নশ্চ ভুঙ্‌ক্তে সন্তাপমেবচ"॥

অগ্নি-দগ্ধ হইয়া আতিবাহিক দেহ এত জ্বালা বোধ করে যে, তিন দিবস জলে ডুবিয়া থাকিতে হয়; "দিনত্রয়ং বসেত্তোয়ে"। এই জন্যই নীরের প্রয়োজন, এই জন্যই আর্য্য শাস্ত্রের শ্মশানান্তে জল ঢালা বিধি। আমাদের সন্তপ্ত স্থান যেমন জল দ্বারা শীতল করি, আতিবাহিকও সন্তপ্ত শরীর জল দ্বারা শীতল করে। এই জন্যই "ইদং নীরের" প্রয়োজন; এই জন্যই দশ রাত্র পর্য্যন্ত আকাশে বা বাটীর সান্নিধ্যে জল রাখার ব্যবস্থা। যথা—

তস্মান্নিধেয়মাকাশে দশরাত্রং পয়স্তথা।
সর্ব্বদাহোপশান্ত্যর্থমধ্বশ্রম বিনাশনম্‌॥

অর্থাৎ দশ রাত্র পর্য্যন্ত আকাশে জল রাখিতে হয়; ঐ জলে তাহার দগ্ধ শরীরের জ্বালা ও অধ্বশ্রম নিবারণ করে।

প্রশ্ন—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে আতিবাহিক আকাশে অবস্থিতি করে; এখন বলা হইতেছে জলে আসিয়া অবস্থিতি করে, ইহা কি নিয়মে সাধিত হয়? তাহার কি যথেচ্ছা গমনের শক্তি নাই, সে কি কোন দূরস্থ সরোবর বা নদীতে নিমজ্জিত হইতে পারে না, যে তাহার জন্য গৃহে, ছাদে বা শিয়রে জল রাখিতে হয়?

উত্তর—সেই আতিবাহিক দেহ যথেচ্ছা গমন করিতে পারে না। পাখীর ছানা যেমন প্রথমে বেশী দূর উড়িতে পারে না, বাসার নিকটেই উড়িয়া বেড়ায়; ইহাও তদ্রূপ বাটীর নিকটেই উড়িয়া বেড়ায়, যে স্থানে জল দেখে সেই স্থানেই উপস্থিত হয়, বেশী দূর যাইতে পারে না। যদিও সময়ে সময়ে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া কিছু দূরে যায়, তাহা হইলেও নিকটস্থ "আতিবাহিকী দেবগণ" তাহাকে সংযত করে এবং জলের সমীপে লইয়া যায়। ঐ আতিবাহিকী দেবগণ দশ দিন পর্য্যন্ত তাহার নিকটে থাকে। শ্রাদ্ধান্তে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইলে তাহাকে 'যাম্য' পথে লইয়া যায়। যে আতিবাহিক বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই

আতিবাহিক দশপিণ্ড ও শ্রাদ্ধাদি ভোগে পুষ্ট হওনান্তর প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া এত দ্রুতগামী হয়, যে সে প্রত্যহ—

সাধিকার্দ্ধক্রোশযুত যোজানিশতদ্বয়ম্।
চত্বারিংশৎ তথা সপ্ত প্রত্যহং যাতি তত্র সঃ ॥ ৮৫ ॥
অষ্টচত্বারিংশতাচ ত্রিংশতা দিবসৈরিতি।
বৈবস্বত পুরং যাতি কৃষ্যমানো যমানুগৈঃ ॥ ৮৬ ॥ গরু—উত্ত— ৬ অঃ ॥

অর্থাৎ প্রেত যমদূতের সঙ্গে প্রতিদিন প্রায় ন্যূনাধিক সার্দ্ধ সপ্তচত্বারিংশদধিক দ্বিশত যোজন পথ গমন করিয়া থাকে। ত্রিংশতাধিক অষ্টচত্বারিশৎ দিবসে সেই জীব যমপুরে যাইতে পারে। বুঝা গেল দাহ, পুরকাদি ক্রিয়া, এবং "ইদং নীর ইদং ক্ষীরের" একান্ত আবশ্যক। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা জীব কল্যাণ লাভ করে, এবং আতিবাহিকও প্রেত পুষ্ট হয়। ধন্য আর্য্য জাতি, যে জাতির এমন অপূর্ব্ব বিধি, এবং যাঁহারা পরোলোককে ইহলোকের সহিত শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়াছেন তাঁহারাই ধন্য !! ধন্য আর্য্য ঋষি, যাঁহারা আমাদিগকে এই অদৃশ্য পরলোককে প্রত্যক্ষ দৃষ্টিতে আনিয়া তাহার সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন !! বল ত' দেখি পাঠক! এই পরলোক গমনকারী তোমার আত্মীয়-স্বজনকে ঐরূপে স্নানাহার যোগান কর্ত্তব্য কি না? বল ত' দেখি! ভক্তিভরে আর্য্য ঋষিগণের পাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া উচিত কি না? যাঁহারা 'অতীন্দ্রিয়' জ্ঞানেতে তোমাকে এই তত্ত্ব দেখাইলেন, তাঁহারা কি পূজার্হ নহেন? ধন্য আর্য্য জাতি, যে জাতিতে ঋষির আবির্ভাব।

প্রশ্ন—যাহাদের শবদাহ, পুরক পিণ্ডাদির প্রথা নাই, তাহাদের গতি কি হইবে? তাহাদের আতিবাহিক কি নীর ক্ষীরাদি উপাদান অভাবে নষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে?

উত্তর—আতিবাহিক নষ্ট ও বিধ্বস্ত হইবে না। তবে কি দুঃখ-গ্রস্থ হইবে? উপাদানের অভাব কোন কালেই হইবে না। জগতে সকল পদার্থই যখন খাদ্য, তখন আতিবাহিকের খাদ্যাভাব হইবে না। তবে হইবে কি? ভাতের পরিবর্ত্তে ঘাস, শুদ্ধের পরিবর্ত্তে অশুদ্ধ উপাদানে পোষিত হইয়া অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিতে হইবে। দেশময় দুর্ভিক্ষ হইলে আমাদের যে দশা উপস্থিত হয়; দাহ পুরকাদির অভাবে আতিবাহিকেরও সেইরূপ দশা উপস্থিত হয়। দুর্ভিক্ষ সময়ে খাদ্যাখাদ্যের, শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার চলে না; যাহা পায়, তাহাই খায়। "বুভুক্ষিতে কিং নকরোত্যকার্য্যং।" বুভুক্ষিতের কি অকার্য্য

আছে ? ফল হয় এই,—বিশুদ্ধ খাদ্যাভাবে ঘাস পাতা খাইয়া যেমন নানাবিধ ব্যাধির আগার হয় ও ইন্দ্রিয়সকল শক্তিহীন হইয়া অন্ধ খঞ্জ হইয়া অত্যন্ত দুর্গতি ভোগ করে ; দাহ পূরকাদির অভাবে আতিবাহিকও তদ্রূপ বিকলাঙ্গ ও বিরূপাঙ্গ হইয়া দুর্গতি ভোগ করে। এই জন্য বরেণ্য আর্য্যজাতি অপূর্ব্ব শবদাহ প্রথাদি বিধিবদ্ধ করিয়াছেন। শবকে ঘৃত চন্দন ও অন্যান্য উপকরণাদি দ্বারা দাহ করিলে যে বিশুদ্ধ ও প্রচুর উপাদান উৎপন্ন হয়, তদভাবে তাহা কখনই হইতে পারে না। বিশুদ্ধ উপাদানে পুষ্ট আতিবাহিকের সহিত অশুদ্ধ উপাদানে পোষিত আতিবাহিকের সমতুল্যতা কখনই হইতে পারে না। বিশুদ্ধ উপাদানে পুষ্ট আতিবাহিকদের ভোগের প্রতিবন্ধকতা উপস্থিত হয় না ; পক্ষান্তরে তদ্বিপরীতে উহার প্রতিবন্ধকতা ঘটে। অর্থাৎ দাহাদির অভাবে পর্য্যুষিত শবের পূতিগন্ধযুক্ত গ্যাসের উপাদানে আতিবাহিক পুষ্ট হইয়া বিকৃতেন্দ্রিয় হইয়া দুঃখপ্রদ হয় ; ইহাই সিদ্ধান্ত। অতএব আর্য্যজাতি মাত্রেই দাহাদি শ্রাদ্ধকাণ্ডের অবশ্য অনুষ্ঠান করিবেন।

প্রশ্ন—পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে ইহাই স্থিরীকৃত হইল যে, দাহ করা একান্ত আবশ্যক। যদি তাহাই হয়, তবে শিশুকে প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা দিলেন কেন ? যথা—

"ভূমৌ বা নিক্ষেপেদ্বালং দ্বিমাসেন দ্বিবার্ষিকে।
ততঃপরং খগশ্রেষ্ঠ দেহদাহো বিধীয়তে ॥ ৭
শিশুরাদন্তজননাদ্বালঃ স্যাদ্ যাবদাশিখম্।
কথ্যতে সর্ব্বশাস্ত্রেষু কুমারো মৌঞ্জিবন্ধনাৎ ॥" ৮ গঃ-উঃ—২৫ অঃ ॥

অর্থাৎ দুই বর্ষ পর্য্যন্ত বালকের মৃত্যু হইলে তাহাকে ভূগর্ভে প্রোথিত করিবে। দুই বর্ষের পর মনুষ্য-দেহ দাহ করিবে। দন্ত-জনন পর্য্যন্ত শিশু, শিখোৎপত্তি পর্য্যন্ত বালক এবং উপনয়ন পর্য্যন্ত কুমার।

উত্তর - শিশুকে দাহ না করিলে কোন হানি নাই ; কেননা শিশুর দেহে দুগ্ধাদি সুপবিত্র বস্তু ভিন্ন অপবিত্র বস্তুর সংস্পর্শন অতি বিরল। সুতরাং প্রোথিত হইলে তাহা হইতে কোন বায়ু বা বাষ্প জন্মিবে না, কোন ক্ষতিও হইবে না, সুতরাং দাহ কর আর না কর। কিন্তু তদূর্দ্ধেই দাহের ব্যবস্থা। কি অপূর্ব্ব বিধি ! ঋষি-প্রণীত ব্যবস্থা কি সুন্দর ! ধন্য ঋষি ! ধন্য আর্য্যজাতি !

প্রশ্ন—বালকের আতিবাহিক দেহ বালকোচিত ও যুবার আতিবাহিক যবকোচিত হইয়াই আবির্ভাব হয়। যথা—

"তৎ প্রমাণবয়োঽবস্থা সংস্থানাং প্রাগ্ভবো যথা" ॥ গঃ-উঃ—৬ অঃ ॥

অর্থাৎ ঐ দেহ পূর্ব্ব দেহের বয়স ও অবস্থাদির অনুরূপ হইয়াই থাকে, যদি তাহাই হয়, তবে কি মনে করিতে হইবে যে পরলোকে বালকের ভোগ বালকোচিত এবং যুবার ভোগ যুবকোচিত? পরলোকে শিশুও কি হামা দিয়া ভাত মুখে দেয়?

উত্তর—মনে করিতে হইবে তাহাই? শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত—পরলোকে বালকের ভোগও বালকোচিত। যথা—

"গর্ভে নষ্টে ক্রিয়া নাস্তি দুগ্ধং দেয়ং মৃতঃ শিশোঃ।
পরঞ্চ পায়সক্ষীরং দদ্যাদ্বালবিপত্তিতঃ॥ ৪
একাদশাহং দ্বাদশাহং বৃষঞ্চ বৃষবিধিনা।
মহাদানবিহীনাঞ্চ কুমারং কৃত্যমাদিশেৎ॥ ৫
কুমারাণাঞ্চ বালানাং ভোজনং বস্ত্রবেষ্টনম্।
বাল্যে বা তরুণে বৃদ্ধে ঘট্টো ভবতি বৈ মৃতে॥ ৬॥ গঃ-উঃ-২৫অঃ॥

গর্ভ নষ্ট হইলে কোনরূপ ক্রিয়াই নাই! শিশুর মরণ হইলে জলপূর্ণ ঘট, পায়স ও দুগ্ধ প্রদান করিবে। বালকের মরণ মাত্রেই এইরূপ বিধি জানিবে। কেননা বালকের আতিবাহিকও বালকোচিত। সুতরাং তাহার পরিপুষ্টির জন্য জলাদি কোমল উপাদানেরই প্রয়োজন। ঐ কোমল উপাদানের উষ্ম ভাগ সূর্য্যদেব গ্রহণ করিয়া বালককে পুষ্ট করেন। কি অপূর্ব্ব দৃষ্টি, কি অপূর্ব্ব জ্ঞান, কি অপূর্ব্ব বিধি! ইহাতে আর্য্য ঋষির চরণে আত্ম-সমর্পণ ব্যতীত কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আর কোন উপায় নাই। কৌমার অবস্থায় মৃত্যু হইলে একাদশাহে বা দ্বাদশাহে বৃষোৎসর্গ ও মহাদান ব্যতিরেকে অন্যান্য কার্য্য করিবে। কুমার ও বালকের ভোজন বস্ত্র বেষ্টন করিয়া দিবে। বালক বৃদ্ধ বা তরুণ দেহীর ঘটেই ভোজন হয়।

শিশু ভূমিষ্ট হইয়া বহির্জগতের আহার্য্য দ্বারা পুষ্ট হয়। আতিবাহিক ভূমিষ্ট হইয়া বহির্জগতের আহার্য্য পূরক-পিণ্ডাদির দ্বারা পুষ্ট হয়। শিশুকে ভোগের দ্বারা পিতা মাতা পুষ্ট করেন; আতিবাহিককে সূর্য্যদেবতা ভোগের দ্বারা পুষ্ট করেন। দীন দয়াময় দীননাথ জগৎ হইতে আহার্য্য সংগ্রহ করিয়া বা আত্মীয়-স্বজনগণ প্রদত্ত শুদ্ধান্ন পিণ্ডাদি হইতে উষ্ম বা তৈজস ভাগ গ্রহণ করিয়া আতিবাহিক দেহীকে পোষণ করেন। যথা—

গৃহ্নাতি বরুণো দানং মম হস্তে প্রযচ্ছতি।
অহঞ্চ ভাস্করে দেবে ভাস্করাৎ সোঽশ্নুতে ফলং॥ গঃ-উঃ-১৮অঃ।

বন্ধুগণ প্রেতের উদ্দেশে যাহা কিছু দান করে, বরুণ তাহা গ্রহণ করিয়া ভগবানের হস্তে প্রদান করেন ; ভগবান্ ভাস্করকে অর্পণ করেন ; প্রেত ভাস্কর হইতে তাহা গ্রহণ করিয়া ভক্ষণ করে। বালক যেমন ভোগের দ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমে যৌবনে পদার্পণ করে, আতিবাহিকও ভোগের দ্বারা পুষ্ট হইয়া ক্রমে প্রেতত্বে পদার্পণ করে।

প্রেতদেহ-সংঘটনপ্রণালী।

ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ওঁ ॥

ওঁ দেবতা ঋষয়ঃ সর্ব্বে ব্রহ্মাণমিদম ব্রুবন্ !
মৃতস্য দীয়তে পিণ্ডং কথং গৃহ্নন্ত্যচেতসঃ ॥ ১ ॥
ভিন্নে পঞ্চাত্মকে দেহে গতে পঞ্চসু পঞ্চধা।
হংসস্ত্যক্ত্বা গতোদেহং কস্মিন্ স্থানে ব্যবস্থিতঃ ? ॥ ২ ॥

ব্রহ্মোবাচ :—অহং বসতি তোয়েষু অহং বসতি চাগ্নিষু।
অহমাকাশগো ভূত্বা দিনমেকস্তু বায়ুগঃ ॥ ১ ॥
প্রথমেন তু পিণ্ডেন কালানাং তস্য সম্ভবঃ।
দ্বিতীয়েন তু পিণ্ডেন মাংসত্বক্ শোণিতোদ্ভবঃ ॥ ২ ॥
তৃতীয়েন তু পিণ্ডেন মতিস্তস্যাভিজায়তে।
চতুর্থেন তু পিণ্ডেন অস্থি মজ্জা প্রজায়তে ॥ ৩ ॥
পঞ্চমেন তু পিণ্ডেন হস্তাঙ্গুল্যঃ শিরোমুখম্।
ষষ্ঠেন কৃতপিণ্ডেন হৃৎ কণ্ঠং তালু জায়তে ॥ ৪ ॥
সপ্তমেন তু পিণ্ডেন দীর্ঘমায়ুঃ প্রজায়তে।
অষ্টমেন তু পিণ্ডেন বাচং পুষ্যতি বীর্য্যবান্ ॥ ৫ ॥
নবমেন তু পিণ্ডেন সর্ব্বেন্দ্রিয় সমাহৃতিঃ।
দশমেন তু পিণ্ডেন ভাবানাং প্লবনং তথা ॥
পিণ্ডে পিণ্ডে শরীরস্য পিণ্ডদানেন সম্ভবঃ। ৬ পিণ্ডোপনিষৎ-শ্রুতি।

অর্থাৎ পিণ্ডোপনিষদে উক্ত আছে সংসারীদিগের পরাধীন গতি নিরূপণার্থ দেবগণ ও ঋষিগণ সমবেত হইয়া ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, "হে ভগবন্ ! মনুষ্যগণের মরণের পর শরীর চেতনাবিহীন হয় ; সুতরাং মৃত ব্যক্তির উদ্দেশে মনুষ্যেরা যে পিণ্ড প্রদান করিয়া থাকে, ঐ পিণ্ড মৃতেরা কিরূপে গ্রহণ করিয়া থাকে ? এই দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হইলে, আত্মা সেই

দেহ পরিত্যাগ করিয়া কোন্ স্থানে গমন করে এবং কোন্ স্থানে অবস্থিতি করে?" ব্রহ্মা বলিলেন, "আত্মা দেহপাতের পর জলে ও অগ্নিতে বাস করে। অনন্তর আকাশগামী হইয়া একদিন মাত্র বায়ুতে থাকিবার পরে ভোগোচিত শরীর জন্মে এবং সেই শরীর দ্বারা পিণ্ড গ্রহণ করে। মনুষ্যগণের মরণের পর মৃত ব্যক্তিকে উদ্দেশ করিয়া পুত্রাদিরা প্রথম দিবসে যে পিণ্ড প্রদান করে, তাহাতে ষোড়শ-কলা অর্থাৎ পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ এবং ষড়েন্দ্রিয়ের সম্ভব হয়। দ্বিতীয় পিণ্ডে মাংস, চর্ম্ম এবং শোণিতের উদ্ভব হয়, তৃতীয় পিণ্ডে বুদ্ধি, চতুর্থ পিণ্ডে অস্থি ও মজ্জা, পঞ্চম পিণ্ডে হস্তের অঙ্গুলি, শির ও মুখ জন্মে; ষষ্ঠ পিণ্ডে হৃদয়, কণ্ঠ ও তালু, সপ্তম পিণ্ডে দীর্ঘায়ু লাভ, অষ্টম পিণ্ডে বাক্য, পুষ্টি ও বীর্য্যবান্ হয়, নবম পিণ্ডে সর্ব্বেন্দ্রিয়ের সমাবেশ হয় এবং দশম পিণ্ডের দ্বারা ক্ষুধা ও তৃষ্ণাদির বোধ হয়। এইরূপে পৃথক্ পৃথক্ পিণ্ডে পৃথক্ পৃথক্ অঙ্গের উৎপত্তি হইয়া একটী শরীর জন্মে। এবম্প্রকার আতিবাহিক দেহ প্রাপ্তির পর যৌবনরূপ প্রেতত্বে পদার্পণ করে। অনন্তর জীব প্রেত-দেহে এক বৎসর দ্বাদশ মাসিক শ্রাদ্ধ ভোগানন্তর ভোগের জন্য কর্ম্মানুযায়ী দেব তির্য্যক্ পশু পক্ষী ও নরাদি যোনিতে প্রবিষ্ট হয়।" যথা—

কৃতে সপিণ্ডকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরং।
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্যতে॥

বৎসরান্তে সপিণ্ডীকরণ হইয়া গেলে প্রেতদেহ নব ভোগ-দেহে পরিণত হয়। ইহা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, মৃত্যুতে নব জীবন, নবীন দেহ ও নব ভোগ লাভ হয়; সুতরাং মৃত্যুতে শোক করিবার কোনই অবসর পাওয়া যায় না। এবম্প্রকারে জীব নব দেহ লাভ করিয়া নবোদ্যমে নব রঙ্গক্ষেত্রে, নব নব রঙ্গ করিয়া বাল্য যৌবন ও বার্দ্ধক্য ভোগের পর মৃত্যু ও জন্মকে পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতেছে। এ রঙ্গ অনাদি অনন্তকাল হইতে চলিয়াছে ও চলিবে। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, গর্ভে প্রবিষ্ট হওয়া অবধি মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব পরিবর্ত্তন ও নব নব অবস্থা হয় এবং মৃত্যুর পর প্রতি মুহূর্ত্তে নব নব পরিবর্ত্তন ও নব নব শরীর ধারণ করিতে হয়; সুতরাং জন্ম ও মৃত্যু একই পদার্থ; বিশেষের মধ্যে এই যে একটি দৃশ্য, অন্যটি অদৃশ্য।

প্রশ্ন—এই নব নব পরিবর্ত্তন কা'র?

উত্তর—জড়ধর্ম্মাক্রান্ত স্থূল সূক্ষ্ম দুই শরীরেরই। জন্ম ও মৃত্যু এবং মৃত্যু

ও জন্ম উভয়ই নব নব আকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। গর্ভে প্রবেশানন্তর ভূমিষ্ঠ হইয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত এক জীবন; আর মৃত্যু হইতে পুনঃ ভোগ-দেহ প্রাপ্তি এক জীবন। এক জীবনীশক্তির দুই প্রান্ত,—জন্ম ও মৃত্যু, মৃত্যু ও জন্ম। জীব ভূমিষ্ঠ হইয়া বাল্য, যৌবন ও বার্দ্ধক; এই তিন দেহকে ভজনা করে; মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া আতিবাহিক, প্রেত ও ভোগ-দেহকে ভজনা করে। আত্মার পরিবর্ত্তন নাই, পরমাণুরও নাশ নাই; উভয়ই নিত্য। সদা পরিবর্ত্তন-শীলা প্রকৃতি এক মুহূর্ত্তও পরিণতা না হইয়া থাকিতে পারে না। স্থূল সূক্ষ্ম দুই শরীরই প্রকৃত্যাত্মক, সুতরাং অনিবার্য্য পরিণামী। পরিণাম দুই প্রকার, সদৃশ ও বিসদৃশ। মহা প্রলয়কালে যে পরিণাম হয়, তাহা সদৃশ; যখন বিসদৃশ পরিণাম আরব্ধ হয়, তখনই জগৎ রচনা আরম্ভ হয়। জগদবস্থা আসিলে, প্রকৃতি নূতন নূতন বিসদৃশ পরিণাম প্রসব করিতে থাকে। ঐ বিসদৃশ পরিণামও আবার দুই প্রকার,—মৃদু ও তীব্র। মৃদু পরিণাম দীর্ঘকালে অনুভূত হয়. তীব্র পরিণাম অতি শীঘ্র অনুভূত হয়। ব্রহ্মাদি হিরণ্যগর্ভ, চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, মহাজল, মহাবায়ু প্রভৃতি মৃদু ও সূক্ষ্ম পরিণামে আবদ্ধ থাকায়, তাঁহাদের জীর্ণতা অনুভব গোচরে না আসিলেও বাক্য গোচরে আইসে। মৃদু পরিণামের চরম সীমাই সদৃশ পরিণাম বুঝিবার দৃষ্টান্ত। তীব্র পরিণামের এত তীব্রতা আছে, যে পূর্ব্বক্ষণে সমুৎপন্ন বস্তুর পরিণাম পরক্ষণেই অনুভূত হয়। আবার মৃদু পরিণামের এত মৃদুতা আছে, যে তাহা বহু সহস্র বৎসরেও অনুভূত হয় না। সদৃশ ও বিসদৃশ এই দ্বিবিধ পরিণাম থাকাতেই, প্রকৃতিতে কখন প্রলয়, কখনও বা জগৎ জন্মিতেছে। প্রকৃতির বিশেষ বিশেষ পরিণামের নাম জন্ম, মৃত্যু. জরা, উৎপত্তি, স্থিতি, লয়, বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্য, জীর্ণতা, নবতা, মধ্যতা, দৃঢ়তা ইত্যাদি। সূর্য্যকে আমরা কাল যে অবস্থায় প্রত্যক্ষ করিয়াছি, বুঝিতে হইবে আজ তাহার সে অবস্থা নাই। আদি স্বর্গকালে পৃথিবীর বা পৃথিবীস্থ প্রাণীর যেরূপ স্বভাবাদি ছিল, এখন আর তাহা নাই। অধিক কি বলিব, পরিণাম-স্বভাবা প্রকৃতি, তদুৎপন্ন পৃথিবী ও তদাশ্রিত স্থাবর জঙ্গমাত্মক বস্তুর অনির্ব্বাচ্য পরিণামের কথা মনে মনে ভাবনা করা এবং স্মরণ করাও কঠিন ব্যাপার। এই বিষয়টী ভাবিতে গেলে বা ধ্যান করিতে গেলে বিস্ময় সাগরে ডুবিতে হয়, কিছুতেই আশ্বাস থাকে না। স্থূল শরীর তীব্র পরিণামের অধীন, সূক্ষ্ম শরীর মৃদু পরিণামের অধীন। তাই স্থূল শরীর শতবর্ষ জীবী ও সূক্ষ্ম শরীর মহাপ্রলয় জীবী। শত শতবার মহাপ্রলয় হইয়া গেলেও জীবের কারণ-

শরীর বিনাশ হইবে না, এক মাত্র মুক্তিতেই উহার নাশ হয়। সুতরাং মৃত্যুতে জীব নব শরীর ধারণ করিয়া এক ভোগ্য হইতে অন্য ভোগ্যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, এক পান্থশালা হইতে অন্য পান্থশালায় আশ্রয় নেয়। সেই জন্যই শাস্ত্রের উক্তি—"সম্বন্ধ জীবনাবধি"। (ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।

অর্থ]

বসন্ত-পঞ্চমী।

১।— অমিয় মাখান, অই সঞ্জীবনী কায়া,
মৃদুল মধুর সিত হাসিতে মিশিয়া।
কবে দেখা দিল, সিতে!—বুঝি দেবমায়া,
আদিম পুরুষরূপে শতদল হিয়া॥
ভেদিল চরণতলে,— আপনা অবশ,
শতদল-নিবাসিনী! সে মধু লগনে।
গগনে বাজিল বাঁশী,— আশীষ্ সরস,
সঞ্জীবনী দেববাণী পশিল ভুবনে॥
জাগিল ভুবন তিন, জাগিলা প্রকৃতি,
মরকত-মণি রেখা কাননে, জনমি'!
স্বরগে চারণ-কণ্ঠে, নবীন ঝঙ্কৃতি,
রণিয়া উঠিল মৃদু বসন্ত পঞ্চমী।
ছুটিছে সমীর বনে, মধু শ্যামলতা,
সহকার তলে নব বহিছে বারতা।

২।— ভুবনমোহন তব মঞ্জুবীণা নাদে,
অতৃপ্ত পিপাসা-ভরা উতলা ঝঙ্কারে।
শিহরিত দেবসভা, মুছি অবসাদে,
জাগিয়া উঠিল সবা, জড়তার ভারে॥
নামাইল সুধাহাসে গরবিণী ধরা,
আলোকিল প্রেমময়ী মধু ফুল ভরা।

লোহিত বরণী অই হাসি উষারাণী,
নবীন বরণে আজি দিল দেখা বনে—
ললিত উচ্ছ্বাসে পিক নব বাণী আনি,
কুহরে ধরে না গান গগনে পবনে !
আশা, সাধ, প্রাণভরা প্রেম নবরূপে,
প্রবেশে হৃদয় দ্বারে যেন চুপে চুপে।
কালচক্রে ঘুরে কত বসন্ত পঞ্চমী।
মানব জীবন-পথে কেননা এমনি ?

শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কাব্যতীর্থ।

অর্ঘ]

সম্মোহন বিদ্যা।*

মোহ-নিদ্রা কি এবং কি করিয়া লোককে মোহ-তন্দ্রাভিভূত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। এক্ষণে কাহাকেও মোহ-নিদ্রাভিভূত করিয়া কি প্রকারে তাহার শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়া অদ্ভুত দৃশ্যাবলী উৎপাদন করিতে পারা যায়, সেই সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

মোহ-নিদ্রা সাধারণতঃ তিনটী অবস্থাতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম—তন্দ্রা (Light sleep), দ্বিতীয় গভীর নিদ্রা (Deep sleep), তৃতীয়—অঘোর নিদ্রা বা স্বপ্নাটন (Somnambulism)। প্রথম ও দ্বিতীয় অবস্থায় সুপ্ত ব্যক্তির বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে লোপ পায় না। তাহার উপর যে সকল দৃশ্যাবলী আনয়ন করা যায়, তাহার অধিকাংশই উপলব্ধি করিতে পারে এবং নিদ্রা অপসারিত করিলে, নিদ্রাকালীন ঘটনাবলী যথাযথ বর্ণনা করিতে পারে। এই অবস্থায় প্রেরণা-বাক্যের সাহায্যে স্বেচ্ছাধীন মাংস-পেশী সমূহের ও স্নায়ুমণ্ডলীর (Voluntary muscles and nerves)

* যাঁহারা সম্মোহন বিদ্যা শিখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা লেখক প্রণীত Complete Course In Hypnotism, Practical and Theoritical নামক পুস্তকখানি পাঠ করিতে পারেন। পন্থা অফিসে প্রাপ্তব্য। মূল্য ২।০ টাকা মাত্র।

ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য উৎপাদন করা যায়। প্রথম অবস্থায় চক্ষু খুলিতে পারিবে না বা চক্ষু মুদিত করিতে পারিবে না বলিলে, সে বহু চেষ্টাতেও আর চক্ষু মুদিত করিতে বা খুলিতে অক্ষম হয়। হস্ত পদাদির উপর ক্রিয়াও ঐরূপ। সুপ্ত ব্যক্তির হস্ত পদ দৃঢ়তা বা শিথিল করিয়া দিলে, সে আর হস্ত পদের সহজ অবস্থা আনয়ন করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে চালনা করিতে পারে না। তাহাকে চৌকিতে বসাইয়া 'উঠিতে পারিবে না' বলিলে, সে আর চৌকি পরিত্যাগ করিয়া উঠিতে সক্ষম হয় না। তাহার কথা বন্ধ করিয়া দিলে, সে আর কথা কহিতে পারে না। এমন কি এই অবস্থায় তাহার অর্দ্ধেক দেহ অবশ বা শিথিল (Paralised) ও অপরার্দ্ধ দৃঢ় (Cataleptic) করিয়া দিতে পারা যায়; এবং সুপ্ত ব্যক্তি সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও স্বাভাবিক পূর্ব্বাবস্থা আনিতে সক্ষম হয় না। দ্বিতীয় অবস্থায় মাংসপেশীর ক্রিয়া-বৈলক্ষণ্য প্রথমাবস্থা অপেক্ষা আরও সুন্দররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সুপ্ত ব্যক্তির হস্ত উত্তোলন করিয়া ক্ষণকাল পরে পরিত্যাগ করিলে, উত্তোলিত হস্ত তদবস্থায় থাকিয়া যায়। ইহার জন্য প্রেরণা-বাক্যেরও সাহায্য প্রয়োজন হয় না। মাংসপেশীর দৃঢ়তা এত বৃদ্ধি হয় যে, সুপ্ত ব্যক্তির সমস্ত দেহ কাষ্ঠবৎ কঠিন করিতে পারা যায়, এবং একখানি চেয়ারের এক প্রান্তে মস্তক ও অপর আর একখানি চেয়ারের এক প্রান্তে পদদ্বয় রাখিলে, সমস্ত দেহ একটী কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় সরল ভাবে শূন্যে থাকে। এমন কি এই দেহের উপর গুরুভার চাপাইলেও তাহা স্বচ্ছন্দে বহন করে; ভারে দেহ মধ্যভাগে নত হইয়া পড়ে না। এই অবস্থায় সুপ্ত ব্যক্তি জড়বৎ এক স্থানে নিশ্চেষ্টভাবে থাকে, কিন্তু বলিবামাত্র উঠিয়া দণ্ডায়মান হয় ও ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়ায়। তৃতীয় অবস্থায় অঘোর নিদ্রা আইসে। সুপ্ত ব্যক্তির কিছুমাত্র বাহ্য চৈতন্য থাকে না। এই অবস্থাকে স্বপ্নাটন (somnambulism) বলে। এই স্বপ্নাটন অবস্থায় সুপ্ত ব্যক্তি কেবলমাত্র নিদ্রানয়নকারীর বাক্য শুনিতে পায়। অপর কাহারও কথা শুনিতে পায় না। কেহ ডাকিলে বা প্রশ্ন করিলে প্রত্যুত্তর দেয় না। সে নিদ্রানয়নকারীর প্রেরণা-বাক্যে প্রায় সম্পূর্ণরূপে বশবর্ত্তী হয়। তখন তাহার শারীরিক ও মানসিক ক্রিয়ার পূর্ণ বৈলক্ষণ্য উৎপাদিত করা যায়। তাহার ইচ্ছাধীন ও স্বাধীন মাংসপেশী ও স্নায়ুর (voluntary and involuntary muscles and nerves) ক্রিয়া প্রেরণা-বাক্যানুবর্ত্তী হয়। ইচ্ছামত নাড়ীর স্পন্দন হ্রাস বৃদ্ধি করিতে পারা যায়। এমন কি প্রেরণা-বাক্যানু-

যায়ী এক হস্তের নাড়ীর গতি বৃদ্ধি ও অপর হস্তের নাড়ীর গতি হ্রাস হইতে দেখা যায় এবং অনুভব শক্তিও প্রেরণা-বাক্যানুযায়ী বিকার প্রাপ্ত হয়। সুপ্ত ব্যক্তিকে অত্যন্ত শীত বলিলে, সে গ্রীষ্মকালেও শীত অনুভব করিয়া গাত্রবস্ত্রাদি দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করে এবং অত্যন্ত শীতের সময় গ্রীষ্ম হইতেছে বলিলে, গ্রীষ্ম অনুভব করে ও গাত্রবস্ত্রাদি পরিত্যাগ করে। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রেরণা-বাক্যানুসারে এত অসাড় হইয়া যায় যে, অস্ত্রাঘাতও অনুভব করিতে পারে না। এই অবস্থাতে পূর্ব্বে অনেক কঠিন অস্ত্র-চিকিৎসা সম্পন্ন হইত ; কিন্তু ক্লোরো-ফরমের প্রবর্ত্তন হওয়া অবধি অস্ত্র-চিকিৎসার সময় মোহ-নিদ্রার প্রচলন লুপ্ত প্রায় হইয়া গিয়াছে। সময়ে সময়ে শরীরের উত্তাপেরও হ্রাস-বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং কোন কোন সুপ্ত ব্যক্তির শরীরের কোন স্থান লাল, কোন স্থান হইতে রক্তপ্রায় এবং কোন স্থানে ফোস্কা বা ফোস্কার দাগ হইতে দেখা যায়। এই অবস্থায় মলমূত্র প্রণালী এত প্রেরণা-বাক্যের অনুবর্ত্তী হয়, যে সুপ্ত ব্যক্তিকে ৫।৭ মিনিট অন্তর মলমূত্র ত্যাগ করাইতে পারা যায়। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়শক্তির অতিশয় বৃদ্ধি দেখা যায়। একদিন একজোড়া নূতন তাস লইয়া অঘোর নিদ্রাভিভূত একটী ব্যক্তিকে উপরের তাসখানির উল্টাপিট দেখাইয়া বলিলাম ইহা তাহার একজন বন্ধুর চিত্র ; সে প্রায় এক মিনিট ধরিয়া তাসখানির উপর পিঠ অতি সযতনে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিয়া লইল। পরে তাহার অলক্ষ্যে সেই তাসখানি সমস্ত তাসের সহিত মিশাইয়া তাহাকে তাহার বন্ধুর চিত্রটী বাহির করিতে বলিলাম। সে প্রত্যেক তাসের উল্টাপিঠ দেখিতে দেখিতে যেমনি সেই নির্দ্দিষ্ট তাসখানি দেখিল, অমনি তাহা বাহির করিয়া দিল। এইটী অনেকবার বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াছি ; কিন্তু প্রত্যেক বারেই সুপ্ত ব্যক্তি অভ্রান্তভাবে নির্দ্দিষ্ট তাসখানি বাহির করিয়া দিয়াছে। আঘ্রাণশক্তি সম্বন্ধে আর একটী পরীক্ষা করিয়াছিলাম ; সুপ্ত ব্যক্তি ইহাতেও সকল সময়ে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। ইহাতে যে আঘ্রাণশক্তির কেবলমাত্র তীক্ষ্ণতা দৃষ্ট হয় তাহা নহে ; সুপ্ত ব্যক্তি গন্ধের সামান্য তারতম্য বুঝিতে পারে। একদিন তামাসা দেখাইতে দেখাইতে এক জোড়া নূতন তাস হইতে কয়েকখানি লইয়া দর্শকবৃন্দের মধ্যে ৫।৭ জনকে এক একখানি দিয়া বলিলাম, সকলেই যেন নিজ নিজ তাসখানি দুই হস্ত মধ্যে চাপিয়া রাখে। চার পাচ মিনিট পরে তাস কয়খানি সকলের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়া সুপ্ত ব্যক্তির হস্তে দিলাম ; এবং ঐ কয়জনের মধ্যে একজনকে ডাকিয়া তাহার হস্ত সুপ্ত ব্যক্তির

নাসিকাগ্রভাগে ধরিয়া তাহাকে আঘ্রাণ লইতে বলিলাম; পরে তাহাকে সেই তাস কয়খানির মধ্য হইতে এই হস্তের মত আঘ্রাণ যে তাসে আছে তাহা বাহির করিতে বলিলাম। সে তাস কয়খানির আঘ্রাণ লইয়া সত্বর উদ্দিষ্ট তাসখানি বাহির করিয়া দিল। এই প্রকারে অপরাপর কয়জনের হস্তের আঘ্রাণ লইয়া প্রত্যেকের হস্তস্পৃষ্ট তাসগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দিল। এই প্রকারে সুপ্ত ব্যক্তির আস্বাদ শক্তি, শ্রবণশক্তি ও স্পর্শণশক্তি বৃদ্ধি পায়।

এই স্বপ্নাটন অবস্থায় পঞ্চেন্দ্রিয়ের স্বরূপ ক্রিয়ার বিলোপ ও অলীক, মায়াময় এবং ভ্রমাত্মক ক্রিয়ার বিনাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ইন্দ্রিয়গণ তখন বাহ্য বস্তুর স্বরূপ গ্রহণ না করিয়া প্রেরণা-বাক্যানুযায়ী ভ্রমাত্মক রূপ গ্রহণ করে। এক খণ্ড রজ্জু দেখাইয়া সর্প ভ্রম উৎপাদন করা যায়; একটী কাপড়ের পুলিন্দা দেখিয়া সুপ্ত ব্যক্তি শিশুভ্রমে সেইটীকে কোলে লইয়া আদর করে; সম্মুখে ব্যাঘ্র রহিয়াছে বলিলে, সে কাল্পনিক ব্যাঘ্র দেখিয়া প্রাণভয়ে ভীত হয় ও পলায়ন করিবার চেষ্টা করে; তখন তাহাকে বাধা দিলে তাহার অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া পড়ে। সম্মুখস্থ ভূখণ্ডকে সরোবর মনে করে এবং তাহাতে মৎস্য ধরিতে বলিলে সে একটী যষ্টিকে ছিপ স্বরূপ লইয়া কাল্পনিক সুতা বঁড়্শীতে কাল্পনিক টোপ লাগাইয়া মৎস্য ধরিতে থাকে। তাহার মৎস্য ধরিবার ধরণ দেখিলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। সে যখন কাল্পনিক মৎস্য গাঁথিয়া খেলাইতে থাকে; এবং মৎস্য খুলিয়া বা ছিঁড়িয়া যাইলে পশ্চাদ্ভাগে পতিত হইয়া ধুলায় ধুসরিত হয়, তখন হাস্য সম্বরণ করিতে অক্ষম হইয়া দর্শক-বৃন্দের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়ে। সুপ্ত ব্যক্তি প্রেরণা-বাক্যানুযায়ী কল্পিত দৃশ্যাবলী কাল্পনিক বলিয়া কিছুমাত্র ভ্রম হয় না। প্রেরণা-বাক্য সত্য বলিয়া ধারণা হয় ও তদ্রূপ কার্য্য করে।

একদা একটী সুপ্ত ব্যক্তিকে তাহার মৃতা কনিষ্ঠা ভগিনীর প্রেতাত্মা দেখিতে বলিলাম; সে চক্ষু খুলিবামাত্র সভার এক কোণে তাহার ভগ্নীকে দণ্ডায়-মান দেখিয়া অতিশয় প্রীত হইল। পরে ক্রন্দন করিতে করিতে তাহার উদ্দেশ্যে শোক প্রকাশ করিতে লাগিল ও বারবার তাহাকে গৃহে ফিরিয়া আসিতে বলিতে লাগিল। যখন বুঝিল তাহার ভগ্নী মৃতা, সে আর ফিরিয়া আসিতে পারে না; তখন একবার পিতা মাতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইবার বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিল। এই করুণ দৃশ্য দেখিয়া দর্শকবৃন্দ শোকে অভিভূত হইয়াছিল; সেই করুণোচ্ছ্বাসে তাহাদের হৃদয় এতই

বিগলিত হইয়া গিয়াছিল যে, তাহারাও সুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় মোহিত হইয়া মনে করিয়াছিল যে, সত্যই তাহার ভগ্নীর প্রেতাত্মার আবির্ভাব হইয়াছে। আর একদিন এই প্রকার একটা ঘটনা দেখিয়া দর্শকবৃন্দ সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছিল। একদিন কোন একটা লোককে মোহ-তন্দ্রাভিভূত করিয়া বলিলাম, যে তাহার ইষ্টদেবী তাহার সম্মুখে আবির্ভাব হইয়াছে, চক্ষু খুলিলেই দেখিতে পাইবে। সে লোকটী শাক্ত ও বড় ধার্ম্মিক। সে চক্ষু চাহিবামাত্র ইষ্টদেবীকে সম্মুখে দেখিয়া অতীব পুলকিত হৃদয়ে গললগ্নীকৃতবাসে নতজানু হইয়া গদগদ স্বরে ইষ্টদেবীর স্তব উচ্চারণ করিতে লাগিল। ক্ষণেক পরে তাহার মোহ-তন্দ্রা অপনীত করিয়া জাগরিত করিবার পূর্ব্বে তাহাকে বলিলাম যে, জাগরিত হইয়াও এই দৃশ্য মনে থাকিবে এবং ইহা সত্য বলিয়া ধারণা হইবে। তাহার সহিত কয়েক মাস পরে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, দেখিলাম এখনও তাহার সেই ধারণা বদ্ধমূল আছে।

এই প্রকার অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির ও ভ্রমাত্মক ক্রিয়া-বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। টেবিলের উপর মুষ্ঠ্যাঘাত করিয়া কামানের আওয়াজ বলিলে, সুপ্ত ব্যক্তি তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে এবং নিকটে কোথাও যুদ্ধ-বিগ্রহ হইতেছে মনে করিয়া সভয়ে পলায়ন করিবার চেষ্টা করে। যদ্যাপ বলা হয় যে একটী কুকুর তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিতেছে, তাহা হইলে সুপ্ত ব্যক্তি চক্ষু উন্মোচন করিয়া তৎক্ষণাৎ কুকুর দেখিতে পায় এবং তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য যষ্টি প্রহারে তাহাকে তাড়াইয়া দেয়। তাহার নাসিকার নিকট রুমাল ধরিয়া সুন্দর গোলাপ ফুল বলিলে, সে গোলাপ ফুলের সুগন্ধ উপভোগ করে এবং সুন্দর গোলাপ ফুল বলিয়া প্রশংসা করে। নাসিকার আঘ্রাণশক্তি এরূপ বিকৃত করিয়া দেওয়া যায়, যে নাসিকাগ্রভাগে একটী নিশাদলের শিশি ধরিয়া সুন্দর ইউডিকলোন্ বলিলে, তাহার নাসিকা নিশাদলের তীব্র গন্ধে উত্তেজিত না হইয়া ইউডিকলোনের সুগন্ধ উপলব্ধি করে। এই প্রকারে জিহ্বার আস্বাদন শক্তিরও বিকৃতি আনয়ন করা যায়। চিনি বলিয়া লবণ খাইতে দিলে সুপ্ত ব্যক্তি লবণের আস্বাদ না পাইয়া চিনির আস্বাদ পায়। মদিরা বলিয়া এক গ্লাস জল দিলে, সে পান করিয়া উত্তেজিত হয় ও মদিরার উন্মত্ততা প্রকাশ করে। পেয়ারা বলিয়া একটী আলু খাইতে দিলে, সে স্বচ্ছন্দে খাইয়া ফেলে। তাহাকে যদ্যপি বলা হয় যে, সে একটী সুন্দর ফলের বাগানে বেড়াইতেছে, ইচ্ছা করিলে সে যে কোন ফল খাইতে বা লইয়া যাইতে

পরে, তাহা হইলে সে হাত বাড়াইয়া কাল্পনিক ফল তুলিতে থাকে ও গৃহে লইয়া যাইবার জন্য কতকগুলি জামার পকেটে ও পরিধেয় বস্ত্রমধ্যে রাখে তাহার ত্বকের অনুভব শক্তিরও বিকৃতি উৎপাদন করা যায়। যে চেয়ারে বসিয়া আছে, সেই চেয়ারখানি তপ্ত লৌহবৎ গরম হইয়াছে বলিলে, সে উহু করিয়া তৎক্ষণাৎ চেয়ার হইতে লাফাইয়া উঠে এবং জ্বালা অনুভব করে; জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য উপস্থ দেশে হস্ত বুলাইতে থাকে। চেয়ারটী শীতল হইয়াছে বলিয়া পুনরায় তাহার উপর বসিতে বলিলে, সে অগ্রে হস্ত দ্বারা চেয়ারখানি অনুভব করিয়া তবে বসে। এই সময়ে তাহাকে যদ্যপি পুনরায় বলা হয় যে চেয়ারখানি আবার গরম হইয়াছে, তখন সে আর বসিতে পারে না; পূর্ব্ববৎ গরম অনুভব করিয়া চিৎকার করিয়া উঠিয়া পড়ে।

সুপ্ত ব্যক্তির প্রেরণা-বাক্যানুযায়ী কেবলমাত্র যে এক বস্তু অপর বস্তু বলিয়া ভ্রম হয় বা যে বস্তুর অস্তিত্ব নাই তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় তাহা নহে। প্রেরণা-বাক্যানুযায়ী উপস্থিত বস্তুর অস্তিত্ব ও উপলব্ধি করিবার শক্তি নিরোধ করা যায়। এমন কি একই ইন্দ্রিয়শক্তি কোন বিষয়ে নিরোধ ও কোন বিষয়ে বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। মোহ-তন্দ্রাভিভূত ব্যক্তিকে যদি বলা হয় যে সে চক্ষু উন্মোচন করিলে গৃহস্থিত সকল ব্যক্তিকেই দেখিতে পাইবে, কেবলমাত্র রামকে দেখিতে পাইবে না; তাহা হইলে সে আর রামকে দেখিতে পায় না; কিন্তু সে রামের কথা শুনিতে পায় ও তাহার কথার প্রত্যুত্তর দেয় এবং রাম তাহাকে স্পর্শ করিলে সে অনুভব করিতে পারে। তাহাকে যদ্যপি বলা হয় যে রাম চলিয়া গিয়াছে, সে গৃহে নাই; তাহা হইলে সে রামের কথাও শুনিতে পায় না ও কোন প্রকারে তাহার অস্তিত্বও উপলব্ধি করিতে পারে না। যদ্যাপি গৃহে সমাগত ব্যক্তিগণকে গণনা করিতে বলা হয়, তাহা হইলে রামকে বাদ দিয়া গণনা করে। এই ব্যক্তিকে যদ্যপি বলা হয় যে রাম পুনরায় আসিয়াছে সে দরজার নিকট দণ্ডায়মান আছে; তাহা হইলে সে রামের কাল্পনিক মূর্ত্তি দরজার নিকট দেখিতে পায় এবং রামের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে তাহাকে আর চিনিতে পারে না।

ইন্দ্রিয়গণের এই ভ্রমপ্রমাদ ক্রিয়া-বিকাশ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে, পার্থিব দ্রব্যনিচয়ের প্রকৃত অস্তিত্ব কিছুই নাই। সকলই মায়াময়ী জীব মহামায়ার মায়াচক্রে পড়িয়া ঘুরিতে ঘুরতে কেবলমাত্র অলীক দর্শন
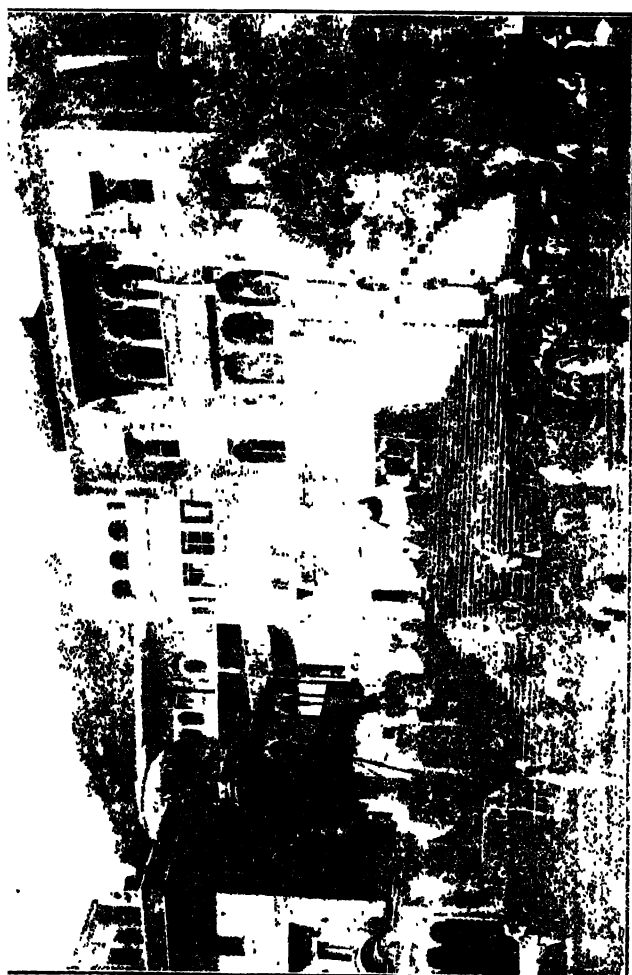
করিতেছে। মহামায়াই জানেন কতদিনে আবার খেলা ভাঙ্গিয়া স্বপ্ন দর্শনের নিবৃত্তি হইবে। কতদিনে আমাদের আত্মজ্ঞান আসিয়া মহামায়ার স্বরূপ তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে পারিব। কতদিনে মহামায়ায় লীন হইয়া আত্মার সদ্গতি লাভ হইবে। (ক্রমশঃ)

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ রায়।

অর্ঘ]

হরিদ্বার

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পথের কথা।

পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত সাহারণপুর জেলায় শিবালিক পর্ব্বতের পাদমূলে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে পুণ্যতীর্থ হরিদ্বার অবস্থিত। হরিদ্বার প্রায় চতুর্দ্দিকেই পর্ব্বত পরিবেষ্টিত। কলিকাতা হইতে রেলপথে ইহার দূরত্ব ৯২১ মাইল, দিল্লী হইতে ১৬১ মাইল, সাহারণপুর সহর হইতে ৩৯ মাইল এবং রুড়্কি হইতে ১৭ মাইল। হাবড়া হইতে গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন দিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলে মোগল সরাই ৪১৯ মাইল, ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ৪।৵০ তথায় গাড়ী বদল করিয়া আউদ রোহিল-খণ্ড রেলে আরও ৪৮৬ মাইল দূরে লুকসার জংসন ষ্টেশন; ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ৪৶০। লুক্সার ষ্টেশনে পুনরায় গাড়ি বদল করিয়া দেরাদুন শাখা রেলে আরোহণ করিয়া ১৬ মাইল যাইলেই হরিদ্বার ষ্টেশন পাওয়া যায়। সুতরাং হাবড়া হইতে রেলপথে হরিদ্বারের দূরত্ব ৯২১ মাইল; ৩য় শ্রেণীর ভাড়া ৮৸৵১০; মধ্যম শ্রেণীর ভাড়া ১৫।১০। ডাকগাড়ীতে কলিকাতা হইতে হরিদ্বার পৌঁছিতে ৩০ ঘণ্টা লাগে। বোম্বাই মেলে রাত্রি ৯-১১ মিনিটে হাবড়া হইতে যাত্রা করিলে ৩০ ঘণ্টা গাড়ীতে অতিবাহন করিয়া প্রাতে প্রায় সাড়ে তিন ঘটিকার সময় হরিদ্বার পৌঁছান যায়। রেল ষ্টেশন হইতে হরিদ্বারের গঙ্গাতীর প্রায় ১॥০ মাইল। বোম্বাই মেল ট্রেনের শেষ দিকে ১ম, ২য় ও মধ্যম শ্রেণীর কয়েকখানি গাড়ী সংযোজিত থাকে, যাহা মোগলসরাই ষ্টেশনে খুলিয়া আউদ রোহিলখণ্ড রেলের সহিত সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। এই গাড়িগুলিতে হাবড়া হইতে দেরাদুন (Howrah to Dehradun) লেখা থাকে। উচ্চ শ্রেণীর যাত্রীগণ এই গাড়ীগুলিতে আরোহণ করিলে, মোগলসরাই বা লুক্সারে গাড়ী বদল করিবার প্রয়োজন হয় না। তীর্থ-

যাত্রীগণ ইচ্ছা করিলে পথে গয়া,কাশী,লক্ষ্ণৌ, নৈমিষারণ্য, * মুরাদাবাদ, বেরিলি, নজিমাবাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ তীর্থ ও সহর দর্শন করিয়া যাইতে পারেন। আমরা গত ৯ই জ্যৈষ্ঠ হিমালয়ের তীর্থ ভ্রমণোদ্দেশে হাবড়া ষ্টেশন হইতে বোম্বাই মেলে রাত্রি ৯-১১ মিঃ সময় যাত্রা করিয়াছিলাম। আমাদের চিত্ত শ্রীকেদারনাথ ও শ্রীবদরীনারায়ণ দর্শনার্থে একান্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং এ যাত্রা কোন স্থানেই নামিতে পারি নাই। অতি প্রত্যূষে বেলা ৬টায় ফল্গু নদীর পুলের উপর হইতে প্রভাত তপন কিরণোদ্ভাসিত একটী সুন্দর চিত্রের ন্যায় প্রতীয়মান গয়াপুরী দর্শন করিয়া গদাধরের পাদপদ্মে প্রণাম করিলাম। মধ্যাহ্ন-কালে ভাগীরথী তটশোভিনী অসংখ্য মঠ মন্দির চূড়া সমন্বিতা বিশ্বেশ্বর পুরী বারাণসীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভুবন-মনমোহিনী ছবি নয়নগোচর হইল। আমরা বিশ্বেশ্বরের চরণে প্রণিপাত করিয়া হিমালয় ভ্রমণের সাফল্য প্রার্থনা করিলাম। এইরূপে সমস্ত দিন এবং রাত্রি রেলে কাটাইয়া শেষ রাত্রে আমরা হরিদ্বারে পৌঁছিলাম। ষ্টেশনে নামিবামাত্র কেদার, বদ্রিনারায়ণ ও হরিদ্বার এই তিন তীর্থের পাণ্ডাগণ দলে দলে আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলিলেন এবং কোথায় বাড়ী, কি নাম, কোন্ জেলায় বাড়ী, তুমি কি অমুকের কেহ ইত্যাদি শতশত প্রশ্নে বিরক্ত করিতে লাগিলেন। হরিদ্বারের পাণ্ডা পান্নালাল কৃষ্ণবর্ণকে আমাদের তীর্থগুরু বরণ করিব, ইহা পূর্ব্ব হইতেই স্থির ছিল। তাঁহার একজন ভৃত্য হরিদ্বারের পূর্ব্ব ষ্টেশন জ্বালাপুরে হইতে আমাদের সঙ্গ লইয়াছিল। ষ্টেশনের বাহিরে আমাদের পাণ্ডা মহাশয়ের নির্ম্মিত একটী বৃহৎ ধরমশালা। অনেক যাত্রী রাত্রির অবশিষ্টাংশ কাটাইবার জন্য তাহাতে আশ্রয় লইলেন। হরিদ্বারের গঙ্গাতীর এখান হইতে প্রায় ১৷৷৹ মাইল, আমরা একখানি ঠেলা গাড়ীর বন্দোবস্ত করিয়া পদব্রজেই ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের তীরবর্ত্তী একটী ত্রিতল গৃহে আসিয়া পৌঁছিলাম। এই বাড়ীটী আমাদের পাণ্ডা মহাশয় বার্ষিক তিন সহস্র মুদ্রায় ইজারা লইয়া যাত্রীগণকে বাসা দিয়া থাকেন। ব্রহ্মকুণ্ড হরিদ্বারের প্রধান ঘাট ; এই বাটীর গঙ্গাতীরস্থ কক্ষগুলিতে অবস্থান করিলে, দিবারাত্র হরি-

* গয়া কাশী প্রভৃতি তীর্থ ও লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সহর মেল লাইনের উপরেই অবস্থিত। এই সকল ষ্টেশন হইয়াই হরিদ্বারে যাইতে হয়। নৈমিষারণ্য যাইতে হইলে "পালামৌ" জংসন ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পালামৌ—সীতাপুর সেক্সন্ শাখা লাইনে ১৬ মাইল মাত্র গেলে নিম্‌সার (নৈমিষারণ্য) ষ্টেশন পাওয়া যায়। পালামৌ হইতে নৈমিষারণ্যের ভাড়া ৶৹ মাত্র। লক্ষ্ণৌ হইতে পালামৌ ৪৩ মাইল দূরবর্ত্তী।

দ্বারের মনোরম শোভা এবং ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের অবিরাম যাত্রী সমাগম দেখিতে পাওয়া যায়। এমন সুন্দর মনোরম দৃশ্য আর কোন স্থান হইতে দেখিবার সম্ভাবনা নাই। আমার জনৈক বন্ধুর নিকট এই বাটীতে অবস্থানের সুবিধা এবং পাণ্ডাজির সৌজন্যতার কথা শুনিয়াছিলাম। ইনি যাত্রীগণকে যথেষ্ট যত্ন করেন ও যিনি যাহা দক্ষিণা দেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হ'ন; অন্যান্য পাণ্ডার ন্যায় জুলুম করেন না। পান্নালাল কুম্ভকর্ণ দুই ভাই। প্রধানতঃ এই বাটীতে অবস্থান করিবার আশাতেই ইঁহাদিগকে পাণ্ডা বরণ করিয়াছিলাম। এই বাড়ীটী অধিকারে থাকায় এবং সৌজন্যতায় ইঁহাদের যাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে। অন্যান্য পাণ্ডারা দুঃখ করিয়া বলিয়া থাকেন, আজকাল প্রায় সকল যাত্রীই তাঁহাদের—"তাঁহাদের কপাল ভাল আছে।" এই কপাল ভালোর কারণ যে সৌজন্যতা, তাহা বুঝাইলেও কেহ বোঝেন না। যাহা হউক ষ্টেসন হইতে পদব্রজে গমনকালে সমস্ত রাস্তা তাঁহারা বিরক্ত করিয়াছিলেন। বাসায় পৌঁছিয়াও নিস্তার নাই; দলে দলে খাতাপত্র বগলে লইয়া বিরক্ত করিতে লাগিলেন। হরিদ্বারের পাণ্ডারা যদিও বিদায় হইলেন, কিন্তু কেদার বদ্রীর পাণ্ডারা ছাড়েন না। তাঁহাদিগকে বলিলাম, দুইদিন পরে দুইজনকে বরণ করিব, আজ আপনারা বিরক্ত করিবেন না; হরিদ্বার তীর্থের কার্য্য করিতে দিন। এখানে অন্ততঃ তিন রাত্রি অবস্থান করিব। তথাপি তাঁহারা ছাড়েন নাই। যে কয়দিন পাণ্ডা স্থির হয় নাই, হরিদ্বারের যে যে স্থানে ভ্রমণ করিয়াছি, অথবা তীর্থকৃত্য করিতে গিয়াছি, তাহারা দলে দলে সঙ্গে সঙ্গে গিয়াছেন; এবং অনবরত বিরক্ত করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহাদের পাণ্ডার প্রয়োজন তাঁহাদের সত্বর পাণ্ডা স্থির করিয়া ফেলাই কর্ত্তব্য; একবার স্থির হইলে আর অধিক বিরক্ত হইতে হইবে না। গঙ্গাতীরে কক্ষগুলির যাত্রী দেখিয়া আমরা কিছু নিরুৎসাহিত হইয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই শুনিলাম যাত্রীগণ এখনই শ্রীবদরীনারায়ণ যাত্রা করিবেন।* কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহারা লাঠি লোটা হস্তে বাহির হইয়া পড়িলে, আমরাও গঙ্গাতীরের দ্বিতল ও ত্রিতল দুইটী কক্ষ অধিকার করিলাম। এখান হইতে গঙ্গার ত্রিধারার কলকল প্রবাহ ও অপর পারের পর্ব্বত-মালার মনোরম দৃশ্য এবং ব্রহ্মকুণ্ডের যাত্রী সমাগমের ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের যে অপরূপ দৃশ্য দিবারাত্রি নয়নগোচর হয়, তাহার কিছু আভাস পূর্ব্বেই দিয়াছি। এই

---

* কেদার বদ্রি যাত্রীর পাণ্ডা সঙ্গে লওয়ায় সুবিধা ও অসুবিধার কথা যথাস্থানে বলিব।

মনোলোভা দৃশ্যের জন্যই এইস্থানে বাসা নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলাম। বাসাটী কিছু অপরিষ্কার এবং অন্যান্য অসুবিধাও ছিল। হরিদ্বারের অবস্থানের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং নিরাপদ স্থান কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী রায় সুরজমল্ ঝুন্ ঝুন্ ওয়ালা বাহাদুরের প্রসিদ্ধ ধরমশালা অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং তাহার বন্দোবস্তও অতি উত্তম। ধর্ম্মশালাটী বৃহৎ ও খুব উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত। সদর রাস্তার উপর দরজা হইতেই সিড়ি দিয়া একতালা প্রমাণ উর্দ্ধে উঠিয়া বাটীর চত্বরে প্রবেশ করিতে হয়। বৃহৎ চত্বরের চারিদিকে দ্বিতল গৃহশ্রেণী। ধরমশালাটী গঙ্গা হইতে কিছু দূরে, কিন্তু দ্বিতলের ছাদে উঠিলেই সদর রাস্তার বিচিত্র জন-প্রবাহ এবং ভাগিরথীর পবিত্র জল-প্রবাহ দৃষ্টিগোচর হয়। তদ্ভিন্ন দূরে সম্মুখে ও পশ্চাতে মনোরম পার্ব্বত্য ও অরণ্য-শোভাও নয়নগোচর হইয়া থাকে। যাত্রীগণ অবস্থান ও রন্ধনাদির জন্য পৃথক পৃথক কুঠ্‌রী পাইয়া থাকেন। ধরমশালার মধ্যেই একটী সুন্দর ইন্দারা আছে। হরিদ্বারে আরও অনেকগুলি ধর্ম্মশালা এবং সদাব্রত আছে। সদাব্রত গুলিতে সাধু,সন্ন্যাসী ও গরীব যাত্রীগণ যেথনে আহার্য্য ভিক্ষা পাইয়া থাকেন। সাধারণ যাত্রীগণ স্বহস্তে পাক করিয়া অথবা ব্রাহ্মণের হোটেলে খাইতে পারেন। কয়েকটী ব্রাহ্মণের হোটেলে খাদ্যদ্রব্য বেশ সস্তায় পাওয়া যায়। হরিদ্বারে দধি রাব্‌ড়ী প্রভৃতি খুব ভাল পাওয়া যায়। আমাদের বাসার নিকটেই একটী হিঁন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের হোটেল। অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যও দুর্ম্মূল্য নহে। হরিদ্বার সাহারণপুর জেলার একটী স্বাস্থ্যকর প্রসিদ্ধ সহর ও প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র। সংস্কৃত বিদ্যাচর্চ্চারও একটী প্রধান স্থান এবং বহু নিবৃত্তি-পরায়ণ সাধু সন্ন্যাসীর সাধনক্ষেত্র ও গৃহীগণের বিশ্রাম ক্ষেত্র। সুতরাং ত্যাগী সাধক এবং সংসার-পরায়ণ গৃহীগণের আবশ্যকীয় সকল প্রকার ভারতীয় ও য়ুরোপজাত দ্রব্য এখানে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানে পোষ্ট, টেলিগ্রাফ আফিষ সরকারী দাতব্য চিকিৎসালয়, সকল প্রকার দ্রব্যের দোকান, অনেকগুলি ধরমশালা, বাসাবাটী এবং সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের মঠ আছে। সন্ন্যাসিগণ স্বীয় স্বীয় সম্প্রদায়ের মঠে অবস্থান করেন। প্রায় সকল পাণ্ডারই হরিদ্বারে যাত্রীর জন্য নির্দ্দিষ্ট বাসা গৃহ আছে। পাণ্ডা মহাশয়কে তীর্থ-পূজার উপকরণাদি সংগ্রহের ভার দিয়া আমরা প্রাতঃকৃত্য সম্পন্ন করিতে গেলাম। প্রথমতঃ শাস্ত্রোক্ত তীর্থযাত্রা পদ্ধতি ও হরিদ্বার মাহাত্ম্যের সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া, আমরা তীর্থ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইব।

হরিদ্বার তীর্থযাত্রা-পদ্ধতি ও মাহাত্ম্য।

তীর্থযাত্রার পূর্ব্বদিন বাটীতে গণপতি, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ভৈরব, পুরাণ ঋষি বেদব্যাস ও ইষ্টদেবতার পূজাপূর্ব্বক বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ ও সদব্রাহ্মণ ভোজন সমাপন পূর্ব্বক শুভলগ্নে যাত্রা করিতে হয়। জিতেন্দ্রিয়, শান্ত ও ব্রহ্মনিষ্ঠাপরায়ণ ও দয়ার্দ্র চিত্তে তীর্থ ভ্রমণ করা কর্ত্তব্য।* "গচ্ছেজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ শান্তো ব্রহ্মনিষ্ঠো দয়াচারঃ।" আর সর্ব্বদাই স্মরণ রাখিবেন যে, শ্রদ্ধাবিহীন, পাপাত্মা, নাস্তিক, অচ্ছিন্ন-সংশয় এবং হেতুনিষ্ঠ অর্থাৎ বৃথাতর্কপরায়ণ ব্যক্তি তীর্থ ভ্রমণের ফল পান না। ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ;—

"অশ্রদ্ধানঃ পাপাত্মা নাস্তিকোঽচ্ছিন্নসংশয়ঃ।
হেতুনিষ্ঠশ্চ পঞ্চৈতে ন তীর্থফলভাগিনঃ॥
তীর্থপ্রাপ্তিদিনে কুর্য্যাৎ নিরাহারং চ মজ্জনম্॥
ততঃ প্রাতঃ সমুত্থায় কৃতনিত্যক্রিয়ো মুনে।
ভৈরবাজ্ঞাং গৃহীত্বাতু তীর্থস্নানমথাচরেৎ॥
স্নানং বিপ্রাজ্ঞয়া কুর্য্যাৎ দক্ষাদীন্ স্নানকর্ম্মণি।
নমস্কৃত্য ততো বিপ্রানাবাহ্য চাত্র দেবতাঃ॥
শ্রাদ্ধং কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন শ্রাদ্ধদৃষ্টবিধানতঃ।
অন্নদানং চ ততঃ কুর্য্যাৎ সাফল্য সিদ্ধিহেতবে।
এতত্তীর্থে প্রকর্ত্তব্যং শ্রাদ্ধং শ্রদ্ধাসমন্বিতৈঃ॥
যো নরঃ শ্রাদ্ধহীনঃ স্যাৎ তস্য নো বর্দ্ধতে প্রজা।
মৃতে নরকমাপ্নোতি তস্মাৎ শ্রাদ্ধং ন সংত্যজেৎ॥
তীর্থাগমে যো মর্ত্ত্যঃ শ্রাদ্ধকর্ম্মবিবর্জ্জিতঃ।
সর্ব্বতীর্থফলং ব্যর্থং তীর্থশ্রাদ্ধং বিনা মুনে॥
তেন তপ্তং হুতং তেন তেন দত্তা বসুন্ধরা।
তেন সর্ব্বং কৃতং কর্ম্ম মুক্তিদ্বারপ্রদং মুনে॥

---

* স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য তীর্থ ভ্রমণকালে চিত্ত সংযত ও দয়ার্দ্র রাখা আবশ্যক। ভিক্ষুক ও পাণ্ডাগণে ভিক্ষা করিয়া সর্ব্বদাই বিরক্ত করিবে। ইহা তীর্থের পরীক্ষা বলিয়া মনে হয়। সর্ব্বভূতেই এক তিনি বিরাজ করেন, এই ভাবে চিত্ত স্থির রাখিতে পারিলে বিরক্তি হইবে না। এবং দরিদ্রগণকে যথাসাধ্য দান করা উচিত। তবেই তীর্থ-ফল পাওয়া যায়। বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইলে চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। অশান্ত ও বিক্ষিপ্ত চিত্তে তীর্থের মহিমা অনুভব হয় না। তাই শাস্ত্রের এই উপদেশ স্মরণযোগ্য। মহাভারতেই আছে;—"অক্রোধনশ্চ রাজেন্দ্র সত্যশীলো দৃঢ়ব্রতঃ। আত্মোপমশ্চ ভূতেষু স তীর্থফলমশ্নুতে।" অক্রোধী, সত্যশীল, দৃঢ়ব্রত ব্যক্তি এবং যিনি সর্ব্বভূতে আত্মা অনুভব করিতে পারেন, তিনিই তীর্থের ফল প্রাপ্ত হন।

যেনাত্র বিদুষে দত্তা গৌ স্বর্গীয় ফলপ্রদা॥
অন্নদানান্মহাভাগ সর্ব্বং দানং কনিষ্ঠকম্।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন হ্যন্নং দদ্যাৎ ক্ষুধাব্রতে॥
সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে সর্ব্বপাত্রে মহামতে।
দদ্যাৎ দানং পরং ভক্ত্যা সর্ব্ব প্রাণিপরায়ণঃ॥"

বোম্বাই মুদ্রিত কেদারখণ্ড। ১১০ অধ্যায়।

তীর্থ-প্রাপ্তি দিনে উপবাস করিয়া গঙ্গাস্নান করা কর্ত্তব্য। পরদিন প্রাতে নিত্যক্রিয়া সমাপন করিয়া ভৈরবাজ্ঞা গ্রহণপূর্ব্বক ও বিপ্রাজ্ঞায় সংকল্প-মন্ত্রাদি উচ্চারণ করত তীর্থস্নান করিবে এবং দক্ষ আদি দেবতাকে নমস্কার করিয়া পুনরায় স্নান করিবে। শ্রাদ্ধহীন ব্যক্তির বংশ বৃদ্ধি হয় না ইহাই শাস্ত্রের উপদেশ। তীর্থে গমন করিয়া শ্রাদ্ধ না করিলে, তাহার তীর্থযাত্রা বিফল হয়। অতঃপর যথাসাধ্য ব্রাহ্মণ ভোজন, অন্নদান ও গো দান করা বিধেয়। গো দান স্বর্গফলপ্রদ। গো দান বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকেই করা উচিত। সর্ব্ব দান অপেক্ষা অন্ন দানই শ্রেষ্ঠ। ক্ষুধার্ত্ত ব্যক্তিকেই অন্ন দান করিবে। সর্ব্বকালে, সর্ব্বদেশে, সর্ব্বপাত্রেই অন্ন দান বিধেয়। অতঃপর তীর্থাধিষ্ঠাত্রি-দেবতার দর্শন ও পূজন কর্ত্তব্য।

হরিদ্বারের প্রধান তীর্থ গঙ্গা। সুতরাং গঙ্গার মাহাত্ম্য সংক্ষেপে বর্ণনা না করিলে হরিদ্বার প্রবন্ধ অসম্পূর্ণ হয়। "গম্যতে ব্রহ্মপদম্ অনয়া" ইতি গঙ্গা। যিনি ব্রহ্মপদে লইয়া যান, তিনিই গঙ্গা ও ইহাই গঙ্গার ধাত্বর্থ। ঋগ্বেদ * কাত্যায়ন সূত্র, শতপথ ব্রাহ্মণ, স্মৃতি, পুরাণ,রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি সকল শাস্ত্রেই গঙ্গা মহিমা ব্যক্ত। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত করা অসম্ভব; কয়েকটীর উল্লেখ করিতেছি। গঙ্গা সর্ব্বতীর্থময়ী। বায়ু বলিয়াছেন স্বর্গে, মর্ত্তে ও অন্তরীক্ষে সাড়ে তিন কোটী তীর্থ আছে। ঐ সাড়ে তিন কোটী তীর্থই গঙ্গায় অবস্থিত (পদ্মপুরাণ)। † গঙ্গা সর্ব্বদেবময়ী, সুতরাং গঙ্গাপূজা করিলে সর্ব্ব দেবতার পূজা করা হয়। অতএব সর্ব্ব প্রযত্নে গঙ্গাপূজা বিধেয়। (অগ্নিপুরাণ)। ‡ গঙ্গা পরমাত্মা বিষ্ণুর দ্রবময় রূপ। বিষ্ণুই দ্রবরূপ ধারণ করায় গঙ্গার উৎপত্তি, সুতরাং পরমাত্মার দর্শনে যে ফল লাভ হয়, ভক্তিভাবে গঙ্গা দর্শন করিলে সেইরূপ ফল

---

* ঋগ্বেদ ১ম মণ্ডল ৬ষ্ঠ অনুবাক ৭ম সূত্র, ৫ খণ্ড "ইমং মে গঙ্গে যমুনে সরস্বতী" ইত্যাদি।

† তিস্রঃ কোট্যোহর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ। দিবি ভুব্যান্তরীক্ষেচ তানি তে সন্তি জাহ্নবী॥
গঙ্গায়াং পূজিতায়ান্তু পূজিতাঃ সর্ব্বদেবতাঃ। তস্মাৎ সর্ব্ব প্রযত্নেন পূজয়েদমরাপগাম্॥

হয়। (ভবিষ্যপুরাণ)। * মহাভারত পাঠে অবগত হওয়া যায়, মহর্ষি পুলস্ত্য তীর্থ-যাত্রাকালে ভীষ্মদেবকে এই হরিদ্বারেই গঙ্গা-মহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া বলিয়াছিলেন "শত শত অকার্য্য করিয়াও গঙ্গাস্নান করিলে, অগ্নি যেমন ইন্ধন দাহ করেন, তদ্রূপ পবিত্র গঙ্গা-সলিলে স্নাত ব্যক্তির সমুদায় পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া যায়। সত্যযুগে সকল স্থান, ত্রেতায় পুষ্কর ও দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র পুণ্যজনক তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত ছিল ; কিন্তু কলিযুগে একমাত্র গঙ্গাই পুণ্য-বিধাত্রী হইয়াছেন। * * * গঙ্গার নাম কীর্ত্তনে পাপ বিনষ্ট হয়, দর্শনে শুভ লাভ হয়, অবগাহন ও জলপানে সপ্তমকুল পর্য্যন্ত পবিত্র হয়। যতকাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের অস্থি গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়া থাকে, তাবৎকাল সেই ব্যক্তি স্বর্গভোগ করে। পবিত্র তীর্থ ও পুণ্যাশ্রম সকল সেবা করত পুণ্যোপার্জ্জন করিয়া সুরলোকে উত্তীর্ণ হয় ইহা সত্য, কিন্তু গঙ্গার সদৃশ তীর্থ নাই ; কেশব হইতে শ্রেষ্ঠ দেবতা নাই। মহারাজ ! যেস্থানে গঙ্গা আছেন সেই যথার্থ দেশ, গঙ্গাতীরসন্নিহিত স্থান সমূহ তপোবন স্বরূপ।" † মহাভারত, প্রতাপরায়ের সংস্করণ বনপর্ব্ব ৮৫ অধ্যায়। যজ্ঞ দান তপস্যা, জপ, দেবপূজা ও শ্রাদ্ধাদি গঙ্গাতীরে অনুষ্ঠান করিলে কোটীগুণ ফল হয়। গঙ্গা দর্শনে পাপ হরণ, স্পর্শনে স্বর্গলাভ ও অবগাহনে মোক্ষ প্রাপ্তি হয়। (ব্রহ্মাণ্ড ও অগ্নিপুরাণ) ¶ গঙ্গাস্নানে অনেক জন্মের সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়। § কেদার খণ্ডে শ্রীমহাদেব দেবীকে বলিতেছেন ;—

"তদেতৎপরমং ব্রহ্ম দ্রবরূপং মহেশ্বরি।
গঙ্গাখ্যং যৎ পুণ্যতমং পৃথিব্যামাগতং শিবে॥"

হে মহেশ্বরি! সেই পরব্রহ্মই জলরূপী হইয়া পরম পবিত্র গঙ্গারূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইয়াছেন। পরমাত্মার দ্রবময়ী মূর্ত্তি জাহ্নবী তীরস্থ তীর্থরাজির মধ্যে

---

* যৎফলং জায়তে পুংসাং দর্শনাৎ পরমাত্মনঃ। তত্তবেদেব গঙ্গায়া দশনে ভক্তিভাবতঃ॥
যদ্যকার্য্যং শতং কৃত্বা কৃতং গঙ্গাবসেচনম্। সর্ব্বং তৎ তস্য গঙ্গাম্ভো দহত্যগ্নিরিবেন্ধনম্।

† সর্ব্বং কৃতযুগে পুণ্যং ত্রেতায়াং পুষ্করং স্মৃতম্। দ্বাপরেতু কুরুক্ষেত্রং গঙ্গা কলিযুগে স্মৃতা॥
স্নাত্বা তারয়তে জন্তুঃ সপ্ত সপ্তবত্বাংস্তথা। পুণাতি কীর্ত্তিতাপাপং দৃষ্ট্বা ভদ্রং প্রযচ্ছতি॥
অবগাঢ়া চ পীতা চ পুণ্যাত্মা সপ্তমং কুলম্। যাবদস্থিমনুষ্যস্য গঙ্গায়া স্পৃশতে জলম্॥
তাবৎ স পুরুষো রাজন্ স্বর্গলোকে মহীয়তে। যথা পুণ্যানি তীর্থানি পুণ্যান্যায়তানি চ।
উপাস্য পুণ্যং লব্ধ্বা চ ভবত্যমরলোকভাক্॥ ন গঙ্গা সদৃশং তীর্থং ন দেব কেশবাৎপরঃ।
যত্র গঙ্গা মহারাজ স দেশস্তৎ তপোবনম্। সিদ্ধক্ষেত্রঞ্চ তজ্জ্ঞেয়ং গঙ্গাতীরসমাশ্রিতম্॥

¶ যজ্ঞোদানং তপোজপ্যং শ্রাদ্ধঞ্চ সুরপূজনং। গঙ্গায়াং যৎকৃতং সর্ব্বং কোটীকোটীগুণং ভবেৎ॥
দৃষ্টা তু হরতে পাপং স্পৃষ্ট্বা তু ত্রিবিদং নয়েৎ। প্রসঙ্গেনাপি যা গঙ্গা মোক্ষদা ত্ববগাহিতা॥

§ অনেকজন্মসম্ভূতং পাপং পুংসাং প্রণশ্যতি। স্নানমাত্রেণ গঙ্গায়াং সদ্য পুণ্যফলা জনং॥

গঙ্গাদ্বার, প্রয়াগ ও গঙ্গাসাগর দুর্ল্লভ তীর্থ এবং অশেষ পুণ্যজনক। তা'ই শাস্ত্র বলিতেছেন ;—"সর্ব্বত্র সুলভা গঙ্গা ত্রিষু স্থানেষু দুর্ল্লভা।

গঙ্গাদ্বারে প্রয়াগে চ গঙ্গাসাগরসঙ্গমে ॥" কূর্ম্মপুরাণ

'সবাসবাঃ সুরাঃ সর্ব্বে হরিদ্বারং মনোরমম্।

সমাগত্য প্রকুর্ব্বন্তি স্নানদানাদিকং মুনে ॥

দৈবযোগান্মুনে তত্র যে ত্যজন্তি কলেবরং।

মনুষ্য-পক্ষি-কীটাদ্যাস্তে লভন্তে পরং পদং ॥" পদ্ম-পুঃ ৩য় অঃ।

"হে মুনে! বাসবপ্রমুখ দেবগণ মনোরম হরিদ্বার তীর্থে আগমন করিয়া স্নানাদি তীর্থকৃত্য করিয়া থাকেন। মনুষ্য, পক্ষী ও কীটাদি যদি দৈবযোগে হরিদ্বারে কলেবর ত্যাগ করে, তবে পরমপদ প্রাপ্ত হয়।" মহাভারতে মহর্ষি পুলস্ত্য গঙ্গাদ্বার মাহাত্ম্য প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ;—

"ততো গচ্ছেত্তু ধর্ম্মজ্ঞ নমস্কৃত্য মহাগিরিম্।

স্বর্গদ্বারেণ যৎ তুল্যং গঙ্গাদ্বারং ন সংশয়ঃ ॥

তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত কোটীতীর্থে সমাহিতঃ।

লভতে পুণ্ডরীকঞ্চ কুলঞ্চৈব সমুদ্ধরেৎ ॥

উষ্যৈকাং রজনীং তত্র গোসহস্র ফলং লভেৎ।

সপ্তগঙ্গে ত্রিগঙ্গে চ শক্রাবর্ত্তে চ তর্পয়ন্ ॥

দেবান্ পিতৃংশ্চ বিধিবৎ পুণ্যে লোকে মহীয়তে ॥

ততঃ কনখলে স্নাত্বা ত্রিরাত্রোপোষিতো নরঃ।

অশ্বমেধমবাপ্নোতি স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি ॥" মহাভারত বন ৮৪ অঃ

"হে ধর্ম্মজ্ঞ! মহাগিরি হিমালয়কে নমস্কারপূর্ব্বক গঙ্গাদ্বারে গমন করিবে। ঐ গঙ্গাদ্বার স্বর্গদ্বারের তুল্য তাহাতে সংশয় নাই। সমাহিত হইয়া তত্রস্থিত কোটী তীর্থে স্নান করিলে পুণ্ডরীক যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয় ও কুল উদ্ধার হয়। তথায় এক রজনী বাস করিলে সহস্র গো দানের ফল হয়। সপ্তগঙ্গা (সপ্ত স্রোতা) ত্রিগঙ্গা ও শক্রাবর্ত্তে পিতৃ ও দেবগণের যথারীতি তর্পণ করিলে পুণ্যলোকে গমন করিতে পারে। তদনন্তর কনখলে গমনপূর্ব্বক ত্রিরাত্র উপবাস ও স্নান করিলে, মনুষ্য অশ্বমেধের ফল এবং স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়েন। পুরাণেও আছে ;—

...."মায়াপুরী দুষ্প্রাপা পাপকারিভিঃ।

যত্র সা বৈষ্ণবীমায়া মায়াপাশৈর্ন পাশয়েৎ ॥

বৈকুণ্ঠৈকসোপানং হরিদ্বারং জগুর্জনাঃ।

অত্রাপ্লুতা নরা যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥" কাশী-খঃ ৭ম অঃ

"মায়াপুরী পাপিগণের পক্ষে দুর্লভ। এখানে বৈষ্ণবীমায়া জীবকে মায়াপাশে বন্ধন করেন না। বৈকুণ্ঠের প্রধান সোপান বলিয়া লোকে এই স্থানকে হরিদ্বার বলে। মানবগণ এই স্থানে স্নান করিলে বিষ্ণুর পরম পদ লাভ করেন।" কেদারখণ্ডান্তর্গত মায়াপুরী মহাত্ম্যে রম্ভার প্রতি ইন্দ্রের উক্তি :—

"...............মায়াক্ষেত্রান্তবাসিনঃ।

মৃতা গচ্ছন্তি পরমাস্তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥

মায়াক্ষেত্রসমং পুণ্যং পৃথিব্যাং নৈব বিদ্যতে।

তিস্রঃকোট্যর্দ্ধকোটী চ তীর্থানাং বায়ুরব্রবীৎ॥

তানি সর্ব্বাণি তত্রৈব মায়াক্ষেত্রে ন সংশয়ঃ।

বয়ং সর্ব্বেঽপি তত্রৈব বসামো মুক্তিলালসা॥

এতদেব মহাক্ষেত্রং শ্রেষ্ঠং প্রাহ সদাশিবঃ।

কৃতকৃত্যো ভবেন্মর্ত্ত্যো মায়াক্ষেত্রস্য দর্শনাৎ॥

দেবা অপি মহাত্মানো নিত্যং বৈ মুক্তিলালসাঃ।

ইচ্ছন্ত্যস্মিন্ স্থলে রম্যে জন্মাপি ছিন সংশয়ঃ॥

মুনয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা যক্ষকিন্নরতাপসাঃ।

নিত্যং বসন্তি বিপ্রেদং নারায়ণপরায়ণাঃ॥

ইদমেব মহাভাগ স্বর্গদ্বারং স্মৃতং বুধৈঃ।

যস্য দর্শনমাত্রেণ বিমুক্তো ভববন্ধনৈঃ॥

ব্রহ্মবিষ্ণুমহেশাদ্যা দেবা নিত্যং প্রতিষ্ঠিতাঃ।

মুনয়ঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বা গুহ্যকাপ্সরসাংগণাঃ॥

তিষ্ঠন্ত্যত্রৈব ভগবন্ হেতুং সংসারবন্ধনম্।

সংসারতাপতপ্তানাং ভেষজং তীর্থমুত্তমম্॥" কেঃ-খ ১১৫ অঃ।

"যাঁহারা মায়াক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন। মায়াক্ষেত্রের সমান পুণ্যদায়ক তীর্থ পৃথিবীতে নাই। বায়ু বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মাণ্ডে সাড়ে তিন কোটি তীর্থ আছে। ঐ সমস্ত তীর্থই যে মায়াক্ষেত্রে আছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইন্দ্র বলিতেছেন যে, আমরা সকল দেবতাই মুক্তিকামী হইয়া হরিদ্বারে বাস করিয়া থাকি।" "সদাশিব বলিয়াছেন—মায়াক্ষেত্র মহাতীর্থসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। মনুষ্য ইহা দর্শন করিলে কৃতকৃত্য হ'ন।

দেবতারাও মুক্তি-লালস হইয়া এখানে জন্মগ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন। মুনি, সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, কিন্নর এবং তাপসগণ নারায়ণ-পরায়ণ হইয়া নিত্যই হরিদ্বারে বাস করিয়া থাকেন।" "হে মহাভাগ! এ স্থানকে বুধগণ স্বর্গদ্বার বলিয়া থাকেন। যাঁহার দর্শন মাত্র সেই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মা-বিষ্ণু মহেশাদি দেবতাগণ এখানে নিত্য প্রতিষ্ঠিত আছেন। মুনিগণ, সিদ্ধ-গন্ধর্ব্ব-গণ গুহ্যক ও অপ্সরাগণ সংসার তাপগুপ্তগণের ভেষজস্বরূপ উত্তম তীর্থ।"

কোন্ সময় হরিদ্বার দর্শন প্রশস্ত ?

সর্ব্বকালেই গঙ্গাদর্শন পুণ্যপ্রদ। ইহার কালাকাল বিচার নাই। শাস্ত্রানু-সারে বিশেষ বিশেষ পুণ্য তিথি-নক্ষত্রের যোগে তীর্থ দর্শনে ফল অধিক হয়। মায়াপুরী মাহাত্ম্যে আছে, "সেই পুরুষ ধন্য যে গঙ্গাদ্বার দর্শন করিয়াছে, বিশেষতঃ মেষ-সংক্রান্তি (চৈত্র সংক্রান্তি) বৃহস্পতি কুম্ভরাশিতে প্রবেশ করিলে * বিষুব সংক্রান্তি, চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ, ব্যতিপাতযোগ, পূর্ণিমা, সোমবারযুক্ত অমাবস্যা, মাঘ, বৈশাখ এবং কার্ত্তিক মাসে সাড়ে তিন কোটী তীর্থই হরিদ্বারে সন্নিহিত হয়েন। তীর্থযাত্রিগণ স্নান করিলে সকল তীর্থস্নানের ফল প্রাপ্ত হয়েন। † জ্যৈষ্ঠ মাসের দশমী তিথিতে অর্থাৎ গঙ্গা দশহারার দিন স্নান করিলে যোগিগণের দুর্লভ পরম স্থান প্রাপ্তি ঘটে। ‡ গঙ্গাস্নান উপলক্ষে হরিদ্বারে সর্ব্বদাই যাত্রিসমাগম হয়। উপরোল্লিখিত পর্ব্বকালে যাত্রিসংখ্যা অধিক হয়। হরিদ্বারে চৈত্র সংক্রান্তি ও গঙ্গা দশহারার সময় স্নানের বিশেষ কাল। চৈত্র সংক্রান্তির সময় প্রতি বৎসর গঙ্গা স্নানার্থ লক্ষাধিক যাত্রীর সমাগম হয় এবং তদুপলক্ষে বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। মেলায় বহু অশ্ব, উষ্ট্র, গাভী ও বহুবিধ দ্রব্য বিক্রয়ার্থ প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়। সরকার বাহাদুরও এ সময় দেশী পল্টনের জন্য অশ্বাদি ক্রয় করিয়া থাকেন। যাঁহারা মেলা দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই

---

* দ্বাদশ বৎসর অন্তর বৃহস্পতি কুম্ভ রাশিতে প্রবেশ করিলে হরিদ্বারে কুম্ভমেলা হয়। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে হরিদ্বারে পূর্ণ কুম্ভমেলা হইবে। কুম্ভমেলায় ২৫। ৩০ লক্ষ সাধুসন্ন্যাসী ও তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

† ধন্যানাং পুরুষাণাং হি গঙ্গাদ্বারস্য দর্শনম্। বিশেষতস্তু মেষার্কসংক্রমেহতীবপুণ্যদে॥
তত্রাপি কুম্ভরাশিস্থে বাক্‌পতৌ সুরবন্দিতে। অয়নে বিষু বৈচৈব সংক্রান্তৌ চন্দ্রসূর্য্যয়োঃ।
গ্রহণে বা ব্যতিপাতে পূর্ণিমায়াং মহামুনে। সোমবারান্বিতায়াং বা যস্যাং কস্যামথাপি বা॥
অমায়াং চ তথামাঘে বৈশাখে কার্ত্তিকেহপিবা। তিস্রকোট্যাহর্দ্ধংকোটিচ তীর্থানাং মুনিসত্তম্।
ভজন্তে সন্নিধিং তত্র স্নাতঃ সর্ব্বত্র জায়তে॥

‡ জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশম্যাং স্নানমাত্রতঃ। প্রাপ্যতে পরমং স্থানং দুর্লভং যোগিনামপি॥

সময় আসিতে পারেন। শীতকালে হরিদ্বারে শীত অত্যধিক, সুতরাং বাঙ্গালী যাত্রীর পক্ষে কিছু কষ্টকর। বর্ষার শেষে হরিদ্বারে আজকাল ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে; সুতরাং বাঙ্গালী যাত্রীর পক্ষে ফাল্গুন হইতে বর্ষার পূর্ব্ব পর্য্যন্তই হরিদ্বার ভ্রমণ প্রশস্ত ও আনন্দজনক। এই সময় হরিদ্বারের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর এবং শীতল। গ্রীষ্মকালের দারুণ উত্তাপের সময় গ্রীষ্মজনিত কোন অসুবিধা বোধ করিতে হয় না; কারণ এখানকার জল বায়ু উভয়ই সুশীতল। এই সময় শ্রীকেদার গঙ্গোত্রী ও বদরীনারায়ণ যাত্রিগণও দলে দলে হরিদ্বার দর্শনান্তে হিমালয় যাত্রা করিয়া থাকেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীপান্নালাল সিংহ।

অর্থ]

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে যে, নির্ম্মলকুমারের পিতা বীরেন্দ্র বাবু অনেক দিন হইতে কাশীতে বাস করিতেছেন। তিনি এতদিন পরে বেশ বুঝিয়াছেন যে তাঁর জীবন প্রায় শেষ হইয়া আসিল। তাঁহার যেরূপ আয়, তাহাতে এতদিনে বহুল অর্থ মজুদ হইয়াছে; ভবিষ্যৎ অধিকারীও কেহ নাই। পুত্রের পরলোকগমন এবং হেমলতার নিরুদ্দেশ, এই দ্বিবিধ কারণে তাঁহার মনে যে আঘাত লাগিয়াছে, তজ্জন্যই তিনি শান্তিলাভেচ্ছায় কাশীতে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এই অর্থ কোন্ দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়ের করায়ত্ত হইবে তাহার স্থিরতা নাই। তাই তিনি মনে মনে সর্ব্বদাই এই বিষয়ের সুব্যবস্থার জন্য চিন্তা করিয়া থাকেন। সে দিন উমাপদ ব্রহ্মচারীর সুমধুর বাক্য শ্রবণে তাঁহার মনে বেশ প্রতীতি হইয়াছে যে, এই কার্য্যে তাঁহার অর্থ ব্যয় হইলে মন্দ হয় না। বিশেষতঃ তাঁহার মনে পড়িল যে, পুত্র নির্ম্মলকুমার অনেক সময়ে তাঁহাকে অর্থের সদ্ব্যয় ও সেবার জন্য অনুরোধও করিতেন। বিষয়ের চিন্তা—অর্থের চিন্তা তাঁহার হৃদয় হইতে অপসারিত হইয়াছে তাহা নহে; তবে ভবিষ্যতে যাহাতে অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, তজ্জন্য তিনি দৃঢ় সংকল্প। তাঁহার বন্ধু জনার্দ্দন বাবুও সেই সময়ে কাশীতে

তাঁহার বাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহারও এ বিষয়ে বিশেষ অমত নাই। এই সকল বিষয়ের পরামর্শের জন্যই উমাপদ ব্রহ্মচারীকে তাঁহারা বাটীতে আনয়ন করিয়াছেন। সন্ন্যাসী ও তাঁহার কয়েকজন সহচর ভিন্ন ভিন্ন আসনে উপবিষ্ট। উমাপদ ব্রহ্মচারী সহাস্য বদনে বলিলেন,—দেখুন আপনারা যে সকল প্রশ্ন উত্থাপন করিতেছেন, আমি তাহার মীমাংসা করিতে পারিব না। আপনারা যে অর্থ দ্বারা আমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, তাহা আমার উদ্দেশ্যের অনুকূল বটে; কারণ আদেশ প্রতিপালনের জন্যই আমি কাশীতে আসিয়াছি; এ বিষয়ে অর্থব্যয় আপনার কর্ত্তব্য কিনা, সে পরামর্শ আমি দিতে পারিব না। ইহাতে আমার অপরাধ গ্রহণ করিবেন না।

বীরেন্দ্র। অবশ্য আপনি যাহা বলিলেন, আমি তাহা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছি। আমার মোটামুটি কথা এই যাহাতে আমার এই অর্থের সদ্ব্যবহার হয়, তাহার উপায় আপনাকে করিতে হইবে। আমি কাশীতে অনেক দিন হইল আসিয়াছি, বহু সন্ন্যাসী যোগী ব্রহ্মচারীর সহিত আলাপ করিলাম; কিন্তু আপনার ন্যায় উদার এবং মহানুভব কুত্রাপি দেখি নাই। আপনি যাহা বলেন, আমার প্রাণে যেন তাহার ছাপ পড়িয়া যায়।

উমাপদ। আমি কখন কি বলিয়াছি মনে নাই; তবে সেবাধর্ম্ম অবশ্য পালনীয়—তাহাই গুরুদেব আমাকে আদেশ করিয়াছেন। সুতরাং ভগবান্‌কে বাদ দিয়া এ সেবা হইতে পারে না। নিজের হৃদয়ক্ষেত্রে ভগবানের বিকাশ জানিতে পারিয়া যখন সর্ব্বভূতে সেই ভগবানের লীলাভূমি দেখিতে পাওয়া যায়, তখন সর্ব্বজীবকে ভালবাসা সম্ভব। সেই 'এক'কে ভাল না বাসিলে সর্ব্ব জীবকে কিরূপে ভালবাসা সম্ভব ?

বীরেন্দ্র। সেই জন্যই ত' আমাদিগের দ্বারা সে কার্য্য সম্ভব হয় না। আমি আসিয়া অবধি কত দিন হইতে গুরুর অনুসন্ধান করিতেছি; কিন্তু এ পর্য্যন্ত গুরুর সন্ধান হইল না। আপনি বয়সে আমার সন্তান তুল্য হইলেও গুরুস্থানীয়। আপনারাই জগতে ধন্য! আমরা বিষয়-কূপে নিমগ্ন হইয়া সেই প্রকৃত বস্তুর রস বোধ করিতে সমর্থ হইলাম না, এ দিকেও আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছে!

উমাপদ। সে জন্য চিন্তা কেন? এত আমাদের রঙ্গমঞ্চে অভিনয়। তাঁহার অভিপ্রায়েই আমি সন্ন্যাসের সাজ পরেছি—আপনি বিষয়ের সাজ পরেছেন;
[illegible] কি ? সেই বিশ্বনিয়ন্তার [illegible]

পরি না কেন, আমরা যা—তাই ; সাজে কিছুই আসে যায় না। এই বলিতে বলিতে ব্রহ্মচারী ঊর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিতে লাগিলেন,—"হে অনাথবন্ধু, কবে এ ভ্রম দূর হইবে! মহামায়া! কবে বুঝিব যে 'আমি' তোমার যন্ত্র! কবে 'আমাকে' ভুলিয়া—'আমিত্বের' অভিমান বিস্মৃত হইয়া তোমার মহিমার স্রোতে আমার ক্ষুদ্র 'আমি'টাকে ভাসাইয়া দিব। কবে নিরভিমানে সেবাধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তোমার আদেশ প্রতিপালন করিব।" কবে বুঝিব,—

"ঈশ্বর সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥"

সকলেই ব্রহ্মচারীর এই ভাব মাধুর্য্যে মুগ্ধ হইল। সন্ন্যাসীর তখন বাহ্যভাব নাই ; মনে কি এক ভাবের লহরী খেলিতেছে ; দৃষ্টি স্থির—বাক্‌শক্তি ক্রমে লুপ্ত। অনেকক্ষণ পরে ব্রহ্মচারী বলিলেন,—"তবে আসি"।

"সে কি কথা! যে জন্য আপনাকে আনাইয়াছি, তাহার কি উত্তর দিলেন।"

ব্রহ্মচারী। আমি কি উত্তর দিব,—উত্তর দিবেন আপনার অন্তরাত্মা। সেখান হইতে যে উত্তর পাইবেন, তদনুযায়ী কার্য্য করুন। ক্ষণিক উত্তেজনার বশে কার্য্য করিলে, অনেক সময় অনুতাপ আসে। আমার একান্ত অনুরোধ যে আপনি বিশেষ ভাবে বিবেচনা করিয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবেন।

বীরেন্দ্র। তবে কি আমার এ অর্থের সদ্ব্যবহার হইবে না ?

ব্রহ্মচারী। সে কি কথা! আমি কে ? ক্ষুদ্র 'আমিতে' আপনি নির্ভর করিতেছেন কেন ? ভগবানের ইচ্ছা হইলে সে কার্য্য আপনা হইতে নিষ্পন্ন হইবে। আপনি পুনরায় বিবেচনা করুন, আপনার অন্তর হইতেই সদুত্তর পাইবেন। স্মিত-বদনে এই কথা বলিতে বলিতে সন্ন্যাসী বিদায় হইলেন।

যাহা হউক বীরেন্দ্র বাবুর ঐ অর্থ সেবাশ্রম নির্ম্মাণ ও দেবীর প্রতিষ্ঠার্থে ব্যয়িত হইল। তিনি জীবিত কালের জন্য সামান্য কিছু রাখিয়া আশ্রমের জন্য সমস্তই দান করিলেন। কাশীর মহারাজা ও বহু ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ এই ব্যাপারে যোগদান করিলেন। সৎকার্য্যে আন্তরিকতাই মূল প্রয়োজন। সেই কৌপীনধারী সন্ন্যাসী আজ আন্তরিকতার বলেই এত বড় সেবাশ্রম পরিচালনে সক্ষম হইয়াছেন। কত শত স্বেচ্ছাসেবক সেবামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া কার্য্যে অগ্রসর হইলেন। ব্রহ্মচারীর হৃদয় পুলকিত ; শিষ্যের প্রতি গুরুর আশীর্ব্বাদ সফলীকৃত দেখিয়া তাঁহার হৃদয় পূর্ণ আনন্দে ভাসমান। যখন সন্ধ্যার আরতি বাজিয়া উঠে, শঙ্খধ্বনি যখন

তাঁহার কর্ণে প্রবিষ্ট হয়, তখন তাঁহার হৃদয় শ্রীগুরুপাদপদ্মের মহিমায় ডুবিয়া যায়। তাঁহার সেই সৌম্য প্রশান্ত স্মিত-বদনের অমিয় উপদেশ মনে পড়ে। অন্নপূর্ণার ক্ষেত্রে অন্নের অভাব নাই, বহুস্থানেই অন্ন বিতরিত হয়। তাঁহাদের প্রধান কার্য্য হইল রোগীর শুশ্রূষা ও দুস্থের সেবা। এখন এই সেবকেরা ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করেন। ক্রমে তাঁহাদের কার্য্যাবলী দেখিয়া কাশীস্থ অনেকেই এই আশ্রমের উপর শ্রদ্ধাবান্ হইলেন। এমন কি মহারাজ স্বয়ং এই আশ্রমে উপস্থিত হইয়া মাসিক সাহায্যের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। আশ্রমের ভিন্ন ভিন্ন অংশে কলেরা, বসন্ত, কুষ্ঠ, প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ আশ্রয় পাইলেন এবং সেবকগণ যথেষ্ট পরিশ্রমে তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, সায়াহ্নে—পর্য্যায়ক্রমে তাঁহারা কার্য্য করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মচারীকে সেবকেরা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় সম্মান করিয়া থাকেন। তিনি সন্ধ্যার পর শাস্ত্রাদি আলোচনা করিয়া অনেকের সন্দেহ নিরসন করেন; অনেক জিজ্ঞাসু ব্যক্তিও সেই সময়ে উপস্থিত হন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

অনেক দিন হইল ভৈরবী ও হেমলতা সেই নির্জ্জন অরণ্যে কালাতিপাত করিতেছেন। আজ সন্ন্যাসী প্রাতে সেই অরণ্যে আসিয়াছেন; তিনি মায়ের পূজা সমাপন করিয়া পর্ব্বত-শিখরদেশে গিয়াছেন, এখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। প্রসাদ গ্রহণান্তে হেমলতা ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, সেদিন বলেছিলে যে, বাবার পরিচয় বাবাই জানেন; কথাটী আমি ঠিক বুঝিতে পারি নাই।"

ভৈরবী। আমি কি করে জানব, আমি ত' বলেছি যতদিন আমি একাকী এইখানে থাকিতে অক্ষম ছিলাম, ততদিন তিনি আমার নিকটেই থাকিতেন; তাঁহার কৃপাতেই আমি একাকী এই বিজন বনে বাস করিতেছি। তাঁহার ভালবাসাতেই আমি বর্দ্ধিত ও মুগ্ধ; পবিত্র মাতৃ-স্তন্যের অমৃতধারার ন্যায় তাঁহার ভালবাসা আমাকে হৃদয়ের বলে বলী করিয়াছে, মায়ের পূজায় ব্রতী করিয়াছে। তাঁহার কৃপাতেই মায়ের পাষাণময়ী মূর্ত্তি আমার নিকট চিন্ময়ী।

হেমলতা। তুমি ত' বুঝিতে পার, কেননা আজন্ম তাঁহারই কোলে প্রতিপালিত। আমার ন্যায় হতভাগিনীও বেশ বুঝিয়াছে, যে তাঁহার কৃপায়

বাহিরে কেহই নাই। আমি কবে এখানে আসিব, তাহা পূর্ব্বে হইতে স্থির জানিয়া আমার জন্ম বন্দোবস্ত করিয়াছেন।

ভৈরবী। তাঁহার সে শক্তির তুলনা নাই। তবে শোন যে দিন আমি দীক্ষিত হই,—সে কথা বলিবার নয়, তবে তোমাকে না বলিলেও নয়। সেদিন আমার নূতন জন্ম; সে কি আনন্দ—কি উল্লাস! দেহ মন যেন পূর্ণ, যেন জগৎ নূতন ভাবে দেখিলাম! সেই হৃদয়ানন্দকর সৌম্য আনন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া নয়ন যেন কিছুতেই তৃপ্ত হইতে চাহেনা! সেই অপরূপ রূপ দেখিয়া ভাবিলাম, যে এমন রূপ আর হয় না! সে অবস্থা আমার জাগ্রত-স্বপ্ন কিংবা তন্দ্রা, তাহা আমি জানি না। সকল বস্তুর ভিতর দিয়া তাঁহারই ছায়া। মন তখন নিরবলম্ব; সংকল্প-বিকল্প কোথায় ডুবিয়া গেল। মনের বিভিন্ন ভাবগুলি যেন একভাবে ছুটিয়া চলিল, বুদ্ধি তখন একাভিমুখী, মুখেও যেন বলিলাম;—

"অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

হেমলতা বলিয়া উঠিলেন;—দিদি আমার সে সৌভাগ্য কি হইবে না; ঐ দেখ পিতা আসিতেছেন।

পিতা আসনে উপবেশন করিয়াই বলিলেন, "হেমলতা! তোমাকে আবার কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে হইবে। ভৈরবীর সহিত তোমায় বিচ্ছিন্ন হইতে হইবে।"

হেমলতা' অবাক্ হইয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে থাকিয়া বলিয়া উঠিল,—"কি বলিলেন পিতঃ! আমাকে আবার সংসারে যাইতে হইবে?" হেমলতার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সন্ন্যাসী হাস্যমুখে বলিলেন,—"হাঁ, তোমার সংসারব্রত এখনও উদ্‌যাপন হয় নাই।"

হেমলতা। কেন এ নিদারুণ আজ্ঞা প্রদান করিতেছেন। আমি ত' ভৈরবীর সহবাসে তাহার উপদেশে যথাজ্ঞান কর্ম্ম করিতেছি! মায়ের সেবার জ্ঞানত কোন ত্রুটীই করি নাই; এক্ষণে দীক্ষালাভে জীবন সার্থক করিব এই কথাই দিদির সহিত হইতেছিল। সহসা হৃদয়ে বজ্রাঘাত কেন? দিদির সঙ্গ ছাড়িয়া আবার সংসার! যাহার স্বামী নাই, পিতা-মাতা, ভাই-ভগ্নী নাই, তাহার আবার সংসার কি প্রভো!

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন,—এই জন্যই তোমাকে সংসারে যাইতে হইবে; সেখানে গেলে দেখিতে পাইবে, যে তোমার সব আছে; "যার কেহ নাই, তার সব

আছে”। ব্যক্তিগত পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানের উপরে তোমাকে সংসারে যাইতে হইবে। এ সংসার মহামায়ার ;—তিনিই সকলের মা—আর সব তার পুত্র ও কন্যা। সেই মহামায়ার সংসারে দেখিবে তুমি আর বিচ্ছিন্ন নও ; সেই ‘এক’কে দেখ ; সব সেই ‘একে’ই পরিসমাপ্ত। “বাস্তবিক ব্রহ্মবস্তুই ওতঃপ্রোতভাবে তন্তু বিস্তার করিয়া জগৎরূপে ও জীবরূপে পরিদৃশ্যমান, বিকল্প বা দ্বিতীয় ভাবের স্থান নাই। ‘আমি’ ‘তুমি’ ‘উচ্চ’ ‘নীচ’ নাই, একই অখণ্ড একরস আনন্দ-ঘন চৈতন্যই বস্তু বা সত্ত্বা। তবে আধার ভেদে সেই সত্ত্বাই জ্ঞান ও অজ্ঞানরূপে প্রকাশিত হন। পরিচ্ছিন্ন-প্রায় জীবে সেই এক উচ্চ সত্ত্বা আছে ; শ্রীভগবান্ সর্ব্ব জীবে আপনি বিহার করিতেছেন,—তিনিই ‘সর্ব্ব’। জীবসেবা না করিলে এই সব ভাষা শিখা যায় না। তুমি এতদিন পড়িয়াছ ;—“নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং জগৎ ॥” সেই নিত্য জগন্মূর্ত্তি মাকে সকল ভেদের মধ্যে—সকল মূর্ত্তের মধ্যে দেখিতে ও বুঝিতে হইলে, জীবসেবা একান্ত আবশ্যক। তাই তোমার মঙ্গলের জন্য এই আদেশ।

“পিতঃ—আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, আমার এই ক্ষুদ্র জ্ঞানে সেই অবিশেষ সর্ব্বানুস্যূত মায়ের মূর্ত্তি কিরূপে প্রতিবিম্বিত হইবে, তাহা কল্পনাও করিতে পারি না।”

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন,—“কথা শক্ত সন্দেহ নাই ; কিন্তু উহাই মায়ের রূপ। মায়ের বর্ণ কেহ নির্ণয় করিতে পারে না, তাই মা আমার কৃষ্ণবর্ণা। মহামায়াই জ্ঞান-অসি দ্বারা বিশিষ্টতা ভাঙ্গিয়া দিবেন, ইহাই মায়ের করুণা।

হেমলতা। এ ত’ মায়ের সংহার মূর্ত্তি—ইহাতেও ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। যে বিশিষ্টতার বন্ধনে আপনাকে বাঁধিয়া সংসারে কার্য্য করিতেছি, তাহার ছেদন যে বড় ভয়ের কথা ! প্রভু আপনি ইহাকে করুণা বলিলেন, কিন্তু আমাদের পক্ষে বড়ই ভয়ের কথা।

সন্ন্যাসী। কোন ভয় নাই, ইহার ভিতরেই মায়ের শান্তিময় কোল পাইবে। দীপ-শিখায় তিনটী অংশ, মধ্যের কেন্দ্রস্থলে কোন জ্যোতি নাই। সেইরূপ মায়ের এই সংহার মূর্ত্তির কেন্দ্রস্থলে যে শান্তিময় স্থান আছে, তাহাই মায়ের কোল। সেই স্থানই—

“নতদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কোন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥”

হেমলতা। এই শান্তিধামই যদি লক্ষ্য হয়, তবে প্রভু কৃপা করুণ, আবার যেন সংসারে গিয়া সেই লক্ষ্য ভুলিয়া না যাই।

সন্ন্যাসী। বিশিষ্টতা বা ভেদাত্মক ভাবকে ভাঙ্গিবার জন্যই ত' সংসারের ঘাত-প্রতিঘাত। যতদিন দেশ, কাল, কার্য্য, কারণ ইত্যাদির ভিতর 'এক' ভাব দেখিতে না পাও, ততদিন সংসারে যাও। এখনও স্বামীর বিশিষ্ট দেহজ মোহ অতিক্রম করিতে পার নাই এবং তদভাবজনিত দুঃখ অনুভব করিয়া থাক। এখনও বুঝিতে পার নাই যে, স্বামী স্বামীর জন্য প্রিয় নহে, কেবল আত্মার জন্য প্রিয়।

হেমলতা—সে কথা সত্য। আমি এখনও স্বামীর বিশিষ্টতার মাত্রার অতীত ভাব বুঝিতে পারি নাই এবং তজ্জন্য এখনও যে দুঃখ না হয় তা' নয়।

সন্ন্যাসী। সে সব কথা ছাড়িয়া দাও। তুমি সেবার জন্য কিছুদিন সংসারে প্রবেশ কর। ভগবানে ফল অর্পণ করিয়া সেবা কর, দেখিবে সেই সত্য হৃদয়ে আপনি ফুটিয়া উঠিবে। নিজেকে হতভাগিনী ভাবিও না।

হেমলতা। এই কয় বৎসর ভৈরবী দিদির নিকট যে উপদেশ পাইয়াছি, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, এক নিত্য সত্য অব্যক্ত তত্ত্ব হইতে এই প্রতিভাসিক জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। 'আমি' 'তুমি' প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবগুলি সেই মহাসাগরের তরঙ্গোৎপন্ন বুদ্‌বুদ্‌ মাত্র। কিন্তু এখনও তাহা অনুভব করিতে পারি নাই।

সন্ন্যাসী। তাই তোমাকে এই আদেশ দিতেছি। তুমি মায়ের সংসারে যাও, দেখিবে আপনি সে বোধ হৃদয়ে সংক্রমিত হইবে। মা আমার মাতৃরূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিতা; মা আমার সর্ব্বভূতে শান্তিরূপে অবস্থিতা। সেই সর্ব্বভূতে অবস্থিতা মায়ের দিকে চাহিয়া কর্ম্ম কর—সেবা কর, ফলের আকাঙ্ক্ষা করিও না। "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।" তারপর আপনি বুঝিতে পারিবে যে মা-ই কর্ম্ম করিতেছেন,—পুরুষ বসিয়া আছেন। বেশী কথা বলিবার এখন প্রয়োজন নাই—জীবনে কার্য্যই আদর্শ জ্ঞাপন করে। এমন ভাবে জীবন যাপন কর যে সুখ দুঃখ সমান হইবে,—মান অপমান সমতুল্য হইবে—শত্রুমিত্র ভেদ থাকিবে না—চন্দন বিষ্ঠা সমান হইবে; আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট থাকিবে। এইভাবে দেখিবে যেন নবকুমার তোমার মহা অনিষ্ট করিতে আসিয়াছিল, তাহাকে তুমি ঘৃণা করিতে পারিবে না। তখন নবকুমার ও তোমাতে কামের অভিব্যক্তি দেখিতে পাইবে না। এ জ্ঞানে 'তুমি' ও 'আমি'তে একমাত্র মা আছেন; এ জ্ঞানে জগৎ সংসারে একমাত্র মা আছেন; এ জ্ঞানে নবকুমার ও নির্ম্মলকুমার সেই অনন্তের এক এক বিন্দু; বৃক্ষ, লতা, স্থাবর, জঙ্গম, নগর, প্রান্তর, আকাশ, সমুদ্র এক এক বিন্দু। যাও মা, সংসারে সর্ব্বভূতস্থ মায়ের পূজা কর; দুঃখ নাই, কষ্ট নাই, দৈন্য নাই। সেই মায়ের চরণতরী আশ্রয়

করিয়া সংসার-সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়, একদিন তাঁহার কৃপায় কূল পাইবেই পাইবে।

হেমলতা। যে আজ্ঞা প্রভু! আর দুঃখ নাই; আপনার চরণকৃপায় আর দুঃখ নাই। আপনার আশীর্ব্বাদে আমার মঙ্গল হইবে।

সন্ন্যাসী। কোন চিন্তা নাই। তোমার জ্ঞান ও ভক্তি কর্ম্মের সহিত মিলিয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, এই ত্রিবেণী-সংযোগে মহাসমুদ্রে মিলিয়া যাইবে।

হেমলতা চরণ ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল, "পিতা! আমি অভাগিনী তনয়া, আপনি বুদ্ধিরূপে হৃদয় মধ্যে প্রকট হইয়া আমাকে চালিত করিবেন, ইহাই প্রার্থনা"! সন্নাসী সস্নেহ সম্বোধনে বলিলেন,—"দেখ হেমলতা মহামায়া সব শোনেন—সব দেখেন। তিনি বড় করুণাময়ী, তাঁর মত দয়া আর কার আছে মা! দেবী তোমায় কোলে লইবেন—পথ দেখাইয়া দিবেন। সেই মহামহিমাময়ী প্রেমের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে—সেই করুণার প্রস্রবণ—সেই কোমল স্নিগ্ধ সুষমারাশি মণ্ডিত অমৃতময়ী নিকেতনে আশ্রয় দিবেন। প্রাণ খুলিয়া একবার ডাক, হৃদয়ের শঙ্কা—যত কিছু জ্বালা ও উদ্বেগ কোথায় চলিয়া যাইবে; সব স্রোতের মুখে তৃণবৎ ভাসিয়া যাইবে। মা! তোমাদের প্রতীক্ষায় কত যুগ হইতে হৃদয়ে মাতৃ-স্তন্যের ন্যায় পীযূষধারা লইয়া প্রতীক্ষা করিতেছি—শুভ মুহূর্ত্তের অবসর খুঁজিতেছি। বহুদিন হইতে তোমার দৃষ্টির বহির্ভূত ভাবে তোমাকে লক্ষ্য করিয়া আসিয়াছি; ইহাও সেই মহাযোগিনী যোগমায়ার খেলা। সেই সূত্রকে অবলম্বন করিয়া আমরা বর্ত্তমান। যে দিন তুমি নবকুমারের হস্ত হইতে রক্ষা পাও, সে দিন মহামায়াই তোমাকে রক্ষা করিয়াছেন।"

আনন্দাতিশয্যে কৃতজ্ঞতাভরে হেমলতার চক্ষে আপনি অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তখন সন্ন্যাসীর অবয়ব এক অদ্ভুত স্বর্গীয় কান্তিতে উদ্ভাসিত। হেমলতা নীরব; ভৈরবী ডাকিলেন, "হেমলতা"; হেমলতার উত্তর নাই, বাহিরের ডাক তখন কর্ণে প্রবেশ করিল না। কিয়ৎক্ষণ পরে সন্ন্যাসী তাহার মস্তক স্পর্শ করিয়া ডাকিলেন,—"হেমলতা"; হেমলতা তখন জ্বালাময় সংসারের অনেক উর্দ্ধে! হৃদয়ের মোহ তখন ছুটিয়া গিয়াছে,—চক্ষের সম্মুখে কি উজ্জ্বলতম মহারত্নের অপার্থিব জ্যোতি ফুটিয়া উঠিতেছে; সূর্য্যের জ্যোতিও তাহার নিকট অতি মলিন। আবার সেই জ্যোতি যেন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল ও মধুরে মেশামিশি। মহামায়ার সেই জ্যোতি-স্রোতের ভিতর যেন আর একটী অপরূপ মনোরম নবীন মূর্ত্তি। সেই মূর্ত্তির কমনীয়তা প্রেমময় ভাব ও মদনমোহন রূপ অতি অপূর্ব্ব! হেমলতা চাহিয়া দেখিল, যে এই জ্যোতিই সেই বালকরূপের আভা! যে জ্যোতি সুখ, দুঃখ, পাপ, পুণ্য, জন্ম, মৃত্যু, আশা,

নৈরাশ্য, দৈন্য, বিষাদের মধ্য দিয়া সমভাবে প্রবাহিত ; যে জ্যোতি আকাশ প্রান্তর অন্তরীক্ষ আলোকিত করিয়া জীবকে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে ; যে জ্যোতিতে গ্রহ চন্দ্র তারকা উজ্জ্বলীকৃত। হেমলতা সেই জ্যোতি দেখিয়া স্থির হইতে পারিল না ; বলিয়া উঠিল,—'প্রভু! কি দেখিলাম।' সন্ন্যাসী আর কিছু বলিলেন না, কেবল বলিলেন, "তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।" এস হেমলতা মুক্তকণ্ঠে বলি,—

"ত্বমাদি দেবঃ পুরুষঃ পুরাণস্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চধাম ত্বয়াততং বিশ্বমনন্তরূপং॥"

সন্ন্যাসী সেই দিনই প্রস্থান করিলেন। হেমলতাও পরদিন প্রত্যুষে ভৈরবীর মায়া কাটাইয়া বিজন অরণ্য পরিত্যাগ করিয়া লোকালয়ের দিকে চলিতে লাগিলেন। এক একবার আসেন আর পশ্চাৎ ফিরিয়া নিরীক্ষণ করেন। তাহার মনে তখনও সেই পূর্ণতা—সুদূর বিস্তৃত শ্যামলা ধরণীর বক্ষ দিয়াও সেই ছটা—উর্দ্ধে অনন্ত নীলিমাময় আকাশপানে চাহিয়া দেখিল, সেই মূর্ত্তি! হেমলতার মনে জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই, কামনা নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই ; সুখশান্তি যেন তাহাকে প্লাবিত করিয়া রাখিয়াছে ; হেমলতা প্রাণে সেই অমৃতময়ীর ভাষা বুঝিতে পারিয়াছে। এখন সে যাহা দেখিতেছে, সবই মধুর—সবই সুখের উৎস—সবই প্রেমের নদী। হেমলতা গহন বিজন পশ্চাৎ করিয়া সংসারের জনসঙ্ঘে প্রবেশ করিলেন। মুখে বলিতে লাগিলেন ;—

নমস্তে জগচ্চিন্তমানস্বরূপে,
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে ;
নমস্তে চিদানন্দানন্দস্বরূপে—
নমস্তে জগত্তারিনি ত্রাহি দুর্গে॥
অনাথস্য দীনস্য তৃষ্ণাতুরস্য,
ভয়ার্ত্তস্য ভীতস্য বদ্ধস্য জন্তোঃ ;
ত্বমেকা গতির্দেবি নিস্তারদাত্রি ;—
নমস্তে জগত্তারিণি ত্রাহি দুর্গে॥
শরণাগত-দীনার্ত্ত-পরিত্রাণ-পরায়ণে।
সর্ব্বস্যার্ত্তি হরে দেবি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥
সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥   (ক্রমশঃ)

সত্য।

১।— অসীম রহস্যময় এ জগত-লীলা—
এই স্নেহ, প্রেমের বাঁধন ;
ভ্রান্ত মতি জীব নিত্য যার মোহিনীতে,
খেলিতেছে মুগ্ধ অনুক্ষণ।

২।— সুখ দুঃখ হর্ষ ক্ষোভ লাভ ক্ষতি কত—
ঊর্ম্মি পর ঊর্ম্মি যায় আসে ;
দিব্যরত্ন ত্যজি সেই কাচখণ্ড লয়ে,
খেলিতে সবাই ভালবাসে।

৩।— এ রহস্য ভেদ যবে করিলে দয়াল,
দেখিনু স্বপন, সবই ছায়া ;
খেলাতেছ বিশ্বমঞ্চে চির অভিনয়,—
ভুবনমোহিনী তব মায়া !

৪।— মহা ঝটিকান্তে যথা জ্যোৎস্না হসিত,
প্রকৃতি সে মনোজ্ঞ সুন্দর ;
তেমতি হইল শান্ত, বিক্ষুব্ধ হৃদয়,
জ্যোতিঃস্নাত হইল অন্তর।

৫।— নেহারিনু সে আলোকে একমাত্র তুমি,
সত্য নিত্য দেবতা আমার ;
উঠিছ অজ্ঞান ভেদি আলো করি হিয়া,
জীবনে মরণে আপনার।

৬।—অনিত্য ঝটিকা বাত্যা সত্য শুধু ওই,
লুক্কায়িত মাতরিশ্বা রাশি ;
তথা পরিদৃশ্যমান নশ্বর এ বিশ্বে,—
গুপ্ত তুমি, সত্য অবিনাশী।

শ্রীমতী ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ।

"নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্ম্মঃ।"

২য় ভাগ। চৈত্র ১৩২০। ১২শ সংখ্যা

মোক্ষ]

পরিপূর্ণ

সুখ মোরে দাও নাই,
তাহে মোর নাহি দুঃখ
অনেকে আছে ত' সুখে,
সেই ত' পরম সুখ॥
কোন অঙ্গে সুখ স্পর্শ,
কারো যদি হয় সখা।
শুধু সেই অঙ্গ খানি,
সুখী হয় না ত' একা॥
সর্ব্ব অঙ্গে একই কালে,
হয় সুখ অনুভব।
নহে ভিন্ন, সব মিলে,
একই পূর্ণ অবয়ব॥
আমার পৃথক্ সুখ,
সে ত' কভু সুখ নয়।
সে যে খণ্ড অপূর্ণতা,
সুখ তারে নাহি কয়॥

একা আমি নহি কিছু,
জলে জলবিম্ব সম।
সমস্ত চেতনে ভাসে,
অখণ্ড চেতন মম॥
আমি অকিঞ্চন বটি,
তবু আছি সুখে বেশ।
সব নিয়ে পূর্ণ তুমি,
নাহি খণ্ডতার লেশ॥
তোমাকে হেরিলে নাথ,
তব পূর্ণ মহিমায়।
অপূর্ণতা যাহা মম,
সকলি মুছিয়া যায়॥
আমি যে সুন্দর নই,
নাহি বা হ'লাম তাই;
কত সুন্দর তুমি,
গড়িয়াছ কত ঠাঁই॥

সুন্দর সুকণ্ঠ নহি,
তাহাতে নাহিক ক্ষোভ।
তুমি যাহা দাও নাই,
তাহে নাহি কিছু লোভ॥
যা দিয়েছ তাই বেশ,
তাহাতেই সুখী আমি।
সবার অন্তর মাঝে,
তুমি যে অন্তর্য্যামী॥
মোর বিদ্যা জ্ঞান নাই,
তাহাতে কি যায় আসে।
কত যে বিদ্বান্ জ্ঞানী
রয়েছে ত' কত দেশে॥
নাহি অন্ন গৃহে মোর,—
সে কি কষ্ট হ'ল বড়।
কত গৃহে কত অন্ন,
রেখেছ করিয়া জড়॥
মোর মুখে অন্ন নাই,
অনেকে খেতে ত' পায়।
তাদের খাওয়াতে হ'লো,
আমার কি খাওয়া নয়?
আমার দারিদ্র্য নহে,
তোমার রিক্ততা কভু।
তোমাতে যে সব কিছু,
লভেছে পূর্ণতা কভু॥
জলবিন্দু সমষ্টিতে,
সিন্ধু যথা ভরপুর।
সব সাথে হয় তথা,
মোর অপূর্ণতা দূর॥
তাহাতেই ধন্য আমি,
মোর দুঃখ দৈন্য যাহা।
সাগরের মাঝে ক্ষুদ্র,
জলবুদ্বুদ্ তাহা॥
তাহাকে গণিনা কিছু,
আমি দেখি আছে ভরে।
সুখ, শান্তি, শ্রী, সৌন্দর্য্য,
সারা বিশ্ব-চরাচরে॥
সবই পূর্ণ নহে ক্ষুদ্র,
ছিদ্রটির(ও) রেখাপাত,
নিখিল পূর্ণতা হেরি,
তব পূর্ণতাতে নাথ!
নাহি দৈন্য, নাহি মৃত্যু,
নাহি ব্যাধি, ক্লেশ কোন।
নির্ম্মল নবীন তুমি,
স্নিগ্ধ শান্ত মনোরম॥
হারায় না কিছু কোথা,
যায় নাকো কিছু হেথা।
যা কিছু তা সবি যুক্ত,
তোমাতে রয়েছে পিতা!
আমার জীবন সাথে,
তোমার জীবন প্রভু!
আছে এক ডোরে গাঁথা,
নহে ভিন্ন ভেদ কভু॥
পরিপূর্ণ জ্ঞানময়,
তুমি চিদানন্দ মোর।
তব ধ্যানে তব জ্ঞানে,
আছি এ জীবন ভোর॥
স্থির যৌবন, চির সুকুমার,
চির লাবণ্য ভরা।
[illegible] হয় না কভু পুরাতন,
এমনি তোমার গড়া॥

আমি দেখি ব'সে মোহের আবেশে,
সব হ'য়ে যায় জীর্ণ।
মোহ ভেঙ্গে গেলে দেখি যে সকলে,
একি নবীনতা পূর্ণ !!
সরস বসন্তে ভরে গেছে দিক্,
ফোটে চৌদিকে ফুল।

গন্ধে শোভায় পূর্ণ আকাশ,
দিগন্ত আলোকাকুল॥
একি বিস্ময়! সবই অক্ষয়!
মৃত্যু কোথাও নাই!
সবই আছে যদি, কেন তবে কাঁদি,
আর কি আমার চাই ?

. মোক্ষ]

আত্ম-তত্ত্ব।*

"আনন্দমূল-গুণপল্লব-তত্ত্বশাখা-বেদান্তপুষ্প-ফলমোক্ষরসাদিপূর্ণং।
. চেতো বিহঙ্গ হরিতুঙ্গতরুং বিহায় সংসারশুষ্কবিটপে বদ কিং রতোঽসি॥"

ওঁ শ্রীগণেশায় নমঃ। শ্রীকেশবানন্দায় নমঃ। শ্রীকাশীবিশ্বেশ্বরাভ্যাং নমঃ॥

"শঙ্করং শঙ্করাচার্য্যং কেশবং বাদরায়ণং।
সূত্রভাষ্য কৃতৌ বন্দে ভগবন্তৌ পুনঃ পুনঃ॥"

পূর্ব্বে কোন সময়ে সংসারতাপে সন্তপ্ত হইয়া একান্ত দেশে কতিপয় মুনি একত্রিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা পরস্পর অত্যন্ত স্নেহবান্ এবং প্রাতঃ-সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্মে অতিশয় প্রীতিমান্ ছিলেন। তাঁহারা ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গ সহিত চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া বেদোক্ত নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসনা করিয়া আসিতেছিলেন। তদনন্তর সেই কর্ম্ম ও উপাসনার প্রভাবে তাঁহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হওয়াতে আনন্দস্বরূপ আত্মাকে সাক্ষাৎকার করিবার ইচ্ছা করিতে লাগিলেন। সেই আনন্দস্বরূপ আত্মা কিরূপ? এই ভূলোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যাহা কিছু বিষয় জন্য আনন্দ আছে, সেই সম্পূর্ণ আনন্দই আত্মস্বরূপ আনন্দের অন্তর্ভূত। সেই আত্মাদেব এই সব জগতের অধিষ্ঠান, সর্ব্বকালে একরস, স্বয়ং প্রকাশ এবং আকাশের ন্যায় সর্ব্বত্র পূর্ণ। তাঁহার জ্ঞান দ্বারা বিদ্বান্ পুরুষ কর্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাদি অধ্যাসরূপ সর্ব্ব শোক হইতে উত্তীর্ণ হ'ন। সুতরাং সেই আত্ম-জ্ঞান সর্ব্ব শোক নিবৃত্তির কারণ। তিনি দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছেদ রহিত হওয়াতে অনন্তরূপ এবং সর্ব্ব অভয়ের অবধিরূপ, বুদ্ধি আদি সর্ব্ব সংঘাতের সাক্ষিরূপ। নেত্রাদি ইন্দ্রিয় এবং মনের সংযম রহিত যে বহির্মুখ পুরুষ, সেই বহির্মুখ পুরুষ তাঁহাকে অবগত হইতে পারে

* লেখক একজন খ্যাতনামা বৈদান্তিক। সুগম ভাবে, ধারাবাহিক ক্রমে পন্থা পত্রিকায় লিখিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। পং সং—

না। অগ্নি যেরূপ সর্ব্ব কাষ্ঠে গুহ্য হইয়া থাকে, তিনিও সেইরূপ সর্ব্ব শরীরে গুহ্যরূপে অবস্থিতি করেন। হৃদয়-দেশস্থিত বুদ্ধিরূপ গুহাতে নিবাস করেন। "সত্যব্রহ্ম আমি" এই প্রকার নিদিধ্যাসন রূপ যোগ দ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই ব্রহ্ম স্বরূপ আত্মা শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরু এবং শাস্ত্রের উপদেশ-রূপ "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যস্থিত 'তৎ' এবং 'ত্বং' এই দুই পদের শোধন দ্বারা উৎপন্ন জীব-ব্রহ্মের একত্ব রূপ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা একমাত্র গম্য। অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে অপরোক্ষ রূপে জানিবার সম্ভাবনা নাই। শ্রুতি যথা— "জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যং নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে হি অয়নায়।" অতএব তিনিই আমাদের জানিবার যোগ্য। তাঁহারা পুনঃ পুনঃ এইরূপ ভাবিতে লাগিলেন, 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য শোধন দ্বারা উৎপন্ন যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা কিরূপ? এই মহাবাক্যে স্থিত যে 'তৎ' 'ত্বং' দুই পদ আছে, তাহাদের মধ্যে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ মায়াবিশিষ্ট সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ ও অবিদ্যা বিশিষ্ট অল্পজ্ঞ জীবাত্মা ত্বং পদের বাচ্যার্থ। যিনি সত্য জ্ঞান আনন্দ অনন্ত এই সত্যাদি চতুষ্টয় স্বরূপ, দেশ কাল নিমিত্ত দ্বারা অব্যভিচারী, অর্থাৎ কোন দেশে কোন কালে কোন কারণে যাঁহার স্বরূপের অন্যথা হয় না, তাদৃশ চৈতন্য "তত্ত্বমসি" বাক্যের "তৎ" পদের প্রতিপাদ্য (লক্ষ্যার্থ্য)। আর যখন আত্মা ক্ষেত্রজ্ঞ, সাক্ষী, কূটস্থ, অন্তর্য্যামী এই সকল উপাধিবিনির্ম্মুক্ত হইয়া বিজ্ঞান ও চিন্মাত্র রূপে অব-ভাসিত হয়েন, তাদৃশাবস্থ আত্মাকে প্রত্যগাত্মা বলে। ইনি "তত্ত্বমসি" বাক্যস্থ 'ত্বং' পদের প্রতিপাদ্য বস্তু * (লক্ষ্যার্থ্য)। অতএব যে অধিকারী পুরুষ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর মুখ হইতে সেই 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের অর্থ শ্রবণ করিয়া 'তৎ'

---

* সত্য, অবিনাশী অর্থাৎ দেশ কাল বস্তু ও নিমিত্তের বিনাশ হইলেও যিনি বিনষ্ট হয় না। উৎপত্তি ও বিনাশ রহিত চৈতন্যকে জ্ঞানস্বরূপ বলে। যেরূপ মৃত্তিকার বিকারভূত সমস্ত পদার্থে ব্যাপক ভাবে মৃত্তিকা থাকে, সেইরূপ প্রধান হইতে সমস্ত সৃষ্টি প্রপঞ্চে যে চৈতন্য ব্যাপক ভাবে আছেন, তাঁহাকে অনন্ত বলে। যে চৈতন্য অপরিমিত আনন্দসাগরস্বরূপ, তাঁহাকে আনন্দ কহে। যে আত্মার উপাধি বিশেষ অনিত্য হইয়াও নিত্য আত্মার সন্নিধান বশতঃ নিত্য বলিয়া অবভাসিত হয় তাহাকে লিঙ্গশরীর বলে। ইহার আর একটি নাম হৃদয়গ্রন্থি। এই লিঙ্গো-পহিত হইয়া যে চৈতন্য প্রকাশ পায়, তাহার নাম ক্ষেত্রজ্ঞ। যে চৈতন্য জ্ঞাতৃ জ্ঞান অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি এবং বিষয়ের উৎপত্তি ও বিষয় উপলব্ধি করেন এবং স্বয়ং উৎপত্তি ও বিলয় রহিত জ্যোতিস্বরূপ, তাঁহাকে সাক্ষী কহা যায়। যে চৈতন্য ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণী বুদ্ধিতে অবশিষ্টরূপে কেবলমাত্র চৈতন্যাকারে প্রতীয়মান হন এবং সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তি অবলম্বনে অবস্থিত করেন তাঁহাকে কূটস্থ বলে। সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, সেই প্রকার যে চৈতন্য সর্ব্ব শরীরে অনুস্যূত রহিয়াছেন, যিনি কূটস্থাদি সমস্ত উপাধিযুক্ত বিশেষ বিশেষ অবস্থায় স্বরূপ লাভের কারণ, তাদৃশাবস্থ আত্মাকে অন্তর্য্যামী বলা যায়।

পদার্থে মায়া সর্ব্বজ্ঞাদিরূপ বাচ্য ভাগ পরিত্যাগ করিয়া এক চেতন মাত্র লক্ষ্য ভাগ গ্রহণ করেন, এবং সেই প্রকার 'ত্বং' পদার্থের অবিদ্যা—অল্পজ্ঞত্বাদি রূপ বাচ্য ভাগ পরিত্যাগ করিয়া এক চেতন মাত্র লক্ষ্য ভাগ গ্রহণ করেন। এই প্রকার চেতন রূপ লক্ষ্য ভাগ বা ভাগ ত্যাগ লক্ষণা দ্বারা, গ্রহণ করিয়া যে অধিকারী পুরুষ "আমি অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" অহং ব্রহ্মাস্মি এই প্রকার ব্রহ্মরূপে জানেন, সেই অধিকারী পুরুষই ব্রহ্মানন্দ রূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বদা পসন্ন থাকেন। এক্ষণে সেই ব্রহ্মানন্দ কিরূপ তাহা নিরূপণ করা যাইতেছে। ইহা সর্ব্ব প্রাণীর আনন্দ প্রাপ্তিকারী। শ্রুতি যথা—"এষ হ্যেবা নন্দয়তি"। এই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই সর্ব্ব প্রাণীকে আনন্দ প্রদান করেন। হৃদয়রূপ গুহাতে যে ব্রহ্মানন্দরূপ গৃহ আছে, সেই গৃহ এই অধিকারী পুরুষই গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশ দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এরূপ 'ব্রহ্মানন্দরূপ গৃহের দ্বারা জ্ঞানী লোকের সমীপে উদ্‌ঘাটিত থাকে। কারণ চিত্তের অন্তর্মুখতাই সেই ব্রহ্মানন্দরূপ গৃহে প্রবেশ করিবার পথ। আর সেই মার্গ দ্বারা ব্রহ্মানন্দরূপ গৃহ প্রাপ্তি বিষয়ে এই বিষয়াকার অন্তঃকরণের বৃত্তি প্রতিবন্ধক। সেই বিষয়াকার বৃত্তিরূপ পাশ বিচারের বলে নষ্ট হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি আত্মানাত্ম বিচার দ্বারা সেই পাশচ্ছেদ করিয়াছেন, তাঁহার ব্রহ্মানন্দরূপ গৃহ প্রবেশ বিষয়ে অন্য কোন প্রতিবন্ধক নাই। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধা ভক্তিপূর্ব্বক ব্রহ্মবেত্তা গুরুর মুখে ইহা শ্রবণ ও বিচার করিবেন, তিনি অর্থধারণক্ষমবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবেন। এই প্রকার প্রত্যক্ষ ফল বিষয়ে কিছুমাত্রও সংশয় নাই। এইরূপ তর্ক বিতর্ক করিতে করিতে সেই মুনিগণ মিলিত হইয়া এই প্রকার বিচার করিতে লাগিলেন যে, যে বিদ্বান্ পুরুষ বিদ্যাদি গুণবশতঃ আমাদিগের অপেক্ষা অধিক জ্ঞানী হইবেন এবং শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইবেন, সেই বিদ্বান্ পুরুষই আমাদিগকে নির্গুণ ব্রহ্মের উপদেশ দিবেন। পরন্তু এরূপ শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ কে আছে? যখন সেই মুনিগণ এই প্রকার চিন্তাযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া ভগবান্ ভরদ্বাজ মুনি স্ব ইচ্ছায় ভ্রমণ করিতে করিতে তদভিমুখে আসিতেছিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া মুনিগণ প্রসন্ন অন্তঃকরণে পরস্পর বলিতে লাগিলেন, ইনিই আমাদের প্রশ্নের উত্তর করিবেন। অনন্তর ভরদ্বাজ মুনি সমিপবর্ত্তী হইলে তাহারা স্ব স্ব আসন হইতে উত্থিত হইয়া ভরদ্বাজ মুনির যথাযোগ্য পূজা করত কৃতাঞ্জলি-

পুটে শাস্ত্রবিধি অনুসারে সমিদাদি পদার্থ হস্তে ধারণ করিয়া এই প্রকার বলিতে লাগিলেন, "হে ভগবন্, এই সংসারে জন্মমরণ দুঃখ হইতে ভীত হইয়া আমরা সকলে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। আপনি আমাদের গুরু, অতএব কৃপা করিয়া আমাদিগকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিয়া জন্ম-মরণাদি সর্ব্ব দুঃখ হইতে উদ্ধার করুন। হে ভগবন্, যে পরমাত্মদেব এই স্থাবর-জঙ্গমরূপ সর্ব্ব জগৎ, আমাদিগকে সেই পরমাত্মদেবের উপদেশ দিন।" শ্রীগুরু বলিলেন, "হে শিষ্য ! এই স্থাবর-জঙ্গমরূপ সমস্ত জগতে অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান কারণ রূপে ঈশ্বর ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। এক্ষণে এই অর্থ অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা নিরূপণ করা যাইতেছে। যেরূপ উপাদান কারণ-রূপ মৃত্তিকা এই ঘট শরাবাদি ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, সেইরূপ উপাদান কারণ-রূপ ঈশ্বর এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। রাজা যেরূপ দৃষ্টি দ্বারা আপনার সর্ব্ব নগরাদি ব্যাপ্ত করেন, সেইরূপ নিমিত্ত কারণরূপে ঈশ্বরও এই সর্ব্ব জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। যেরূপ মনুষ্যের শরীর বাহ্য হইতে বস্ত্র দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, সেইরূপ সর্ব্ব জগৎ বিভু ঈশ্বর দ্বারা ব্যাপ্ত আছে। সুগন্ধি পুষ্প যেরূপ আপনার সৌগন্ধ সূক্ষ্ম অবয়ব দ্বারা শীতল জলে পরিব্যাপ্ত হইয়া সেই জলে রমণীয়তা প্রদান করে, সেইরূপ ঈশ্বরও আপনার সত্তা স্ফূর্ত্তি দ্বারা এই সর্ব্ব জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া রমণীয়তা প্রদান করেন। আর যেরূপ প্রবৃত্তির কারণ রূপ বাসনা এই জীবের মন ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ অন্তর্যামী ঈশ্বরও এই সর্ব্ব জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। সুতরাং আপনার এবং অন্যের যত কিছু স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থ আছে, সেই সর্ব্ব পদার্থও পূর্ব্বোক্ত রীতিতে ঈশ্বররূপই হইতেছে। জগতে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন স্বত্তাবান্ কোন পদার্থই নাই। সুতরাং সেই সর্ব্ব পদার্থ ঈশ্বরেরই হইতেছে; এই জীবের কোনও পদার্থই নাই। যেরূপ গন্ধর্ব্ব নগর আকাশরূপ হওয়াতে,—আকাশেরই; সেইরূপ এই সমস্ত জগৎও ঈশ্বর-রূপ হওয়াতে,—ঈশ্বরেরই। আর যেরূপ রাজাদি মহান্ পুরুষ বিষয়ে এবং তাঁহাদের ধনাদি পদার্থ বিষয়ে বুদ্ধিমান্ পুরুষ সত্তা দৃষ্টি করেন না, সেইরূপ সত্তা দৃষ্টি রহিত হওয়াতে, এই পুরুষ স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থকে ঈশ্বররূপ জানিয়া, অথবা এই সর্ব্ব পদার্থ ঈশ্বরেরই, ইহা জানিয়া সেই স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থের কামনা পরিত্যাগ করেন। তন্মধ্যে এই সর্ব্ব জগৎ ঈশ্বররূপ এই প্রথম দৃষ্টি বিষয় এই সর্ব্ব প্রপঞ্চের বাধ দ্বারা সেই সত্তা দৃষ্টি পরিত্যাগ হইয়া পরিশেষে

নির্গুণ ব্রহ্মের জ্ঞানরূপ ফল সিদ্ধ হয়। আর এই সর্ব্ব জগৎ ঈশ্বরের এই দ্বিতীয় দৃষ্টি বিষয়ে তো সগুণ ব্রহ্মের ফলরূপ সিদ্ধ হয়।” এক্ষণে এই অর্থ স্পর্শ করিবার নিমিত্ত দুই দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা যাইতেছে। যেরূপ মিথ্যা গন্ধর্ব্ব-নগরে সত্ত্বের আশা এই পুরুষের দুঃখ প্রাপ্তির কারণ, যেরূপ মহারাজের স্ত্রী প্রভৃতি পদার্থে স্বত্বের আশা এই পুরুষের দুঃখই প্রাপ্তি করে, সেইরূপ আপনার জ্ঞান লাভ করিয়া স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থের আশাও এই পুরুষের দুঃখই প্রাপ্তি করে। সুতরাং এই অধিকারী পুরুষ সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়া সকলের অধিষ্ঠানরূপ ঈশ্বরকে আপনার আত্মারূপে দেখিবে। অথবা সর্ব্ব জগতের প্রেরক রূপে সেই ঈশ্বরের আরাধনা করিবে। হে শিষ্য! চিত্ত-শুদ্ধির অভাব হওয়াতে যদি কদাচিৎ তোমাদের সেই নির্গুণ ব্রহ্মজ্ঞান বিষয়ে অধিকার না হয়, তাহা হইলে তুমি এই স্ত্রী পুত্র ধনাদি পদার্থ ঈশ্বরেরই, আমাদের নহে, এই প্রকার জানিয়া কর্ম্মের ফলরূপ স্বর্গাদি লোক পরিত্যাগ কর। এই প্রকারে যখন তুমি নিষ্কাম কর্ম্ম করিবে, তখন এই জন্মেই হউক অথবা অন্য জন্মেই হউক, তোমাদের অন্তঃকরণশুদ্ধির পর ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তি হইবে; এবং সেই ব্রহ্ম জ্ঞানের প্রভাবে তোমাদের জন্ম-মরণাদি সর্ব্ব দুঃখ নিবৃত্তি হইবে। এক্ষণে এই অর্থ স্পষ্ট করিবার জন্য তিন মার্গের বিষয় নিরূপণ করা যাইতেছে। হে শিষ্য! স্বর্গলোক ব্রহ্মলোকরূপ যে অভ্যুদয় এবং মোক্ষরূপ যে নিঃশ্রেয়স্; এই অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স্ প্রাপ্তিকারী তিন প্রকার মার্গ আছে। তন্মধ্যে অগ্নিহোত্রাদিরূপ ইষ্ট কর্ম্ম এবং বাপী কূপ তড়াগাদিরূপ পূর্ত্তকর্ম্মকারী যে পুরুষ, সেই কর্ম্মী পুরুষের স্বর্গ লোকরূপ অভ্যুদয় প্রাপ্তির জন্য পিতৃযান নামক দক্ষিণ মার্গ বিদ্যমান আছে। আর অহং গ্রহাদি উপাসনাকারী যে পুরুষ, সেই উপাসক পুরুষের ব্রহ্মলোকরূপ অভ্যুদয় প্রাপ্তির জন্য দেবযান নামক উত্তর মার্গ বিদ্যমান আছে। শ্রবণাদি সাধনসম্পন্ন যে নিষ্কাম পুরুষ, সেই নিষ্কাম পুরুষের মোক্ষরূপ নিঃশ্রেয়স্ প্রাপ্তির জন্য ব্রহ্মজ্ঞানরূপ মার্গ বিদ্যমান আছে। এই তিন মার্গ ভিন্ন জীবের অন্য কোনও সুখপ্রদানকারী মার্গ নাই। হে শিষ্য! পিতৃযান দেবযান ও ব্রহ্মজ্ঞান এই তিন মার্গ ব্যতিরেকে যে পুরুষ কেবল পাপ কর্ম্ম করে, সেই অল্প বুদ্ধিবিশিষ্ট পুরুষ সর্ব্বদা দুঃখই প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে সেই তিন মার্গের মধ্যে তৃতীয় ব্রহ্মজ্ঞানরূপমার্গের শ্রেষ্ঠতা বর্ণনা করা যাইতেছে।

হে শিষ্য! ব্রহ্মলোক এবং স্বর্গলোক স্থিত যে দেবতা সকল, সেই দেবতা-

দিগের মধ্যে যে যে দেবতা ব্রহ্মজ্ঞানরহিত, সেই অজ্ঞানী দেবতাদিগেরও বাস্তবিক কিঞ্চিন্মাত্র সুখ নাই। কারণ যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা মহান্ আত্মাদেবকে না জানিয়াছেন, সেই অজ্ঞানী পুরুষ সেই আত্মাদেবের তিরস্কাররূপ হনন প্রযুক্ত আত্মঘা নামে অভিহিত হ'ন। সেই আত্মঘাতী পুরুষের শ্রুতি ভগবতী সংসাররূপ দুঃখ প্রাপ্তি কথন করিয়াছেন। শ্রুতি যথা—"অসূর্য্যা নাম তে লোকা, অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥" যে পুরুষ আপনার আত্মা বিষয়ে উত্তমরূপে রমণ করেন, সেই পুরুষের নাম সুর। এরূপ আত্মবান্ বিদ্বান্ পুরুষই হইয়া থাকেন। সেই বিদ্বান্ পুরুষ হইতে ভিন্ন অজ্ঞানী পুরুষের নাম অসুর। সেই অসুর পুরুষের প্রাপ্তির যোগ্য যে শুভ অশুভ কর্ম্ম-জন্য লোক, সেই লোকের নাম অসূর্য্য। সেই অসূর্য্য নামক লোক আত্মার আবরণকারী অজ্ঞানরূপ অন্ধতম দ্বারা ব্যাপ্ত। এরূপ অসূর্য্য লোককে আত্মঘাতী পুরুষ মৃত্যুর পর প্রাপ্ত হয়। এক্ষণে যে আত্মজ্ঞান দ্বারা অসূর্য্য লোক প্রাপ্তি হয় না, সেই আত্মার স্বরূপ বর্ণনা করা যাইতেছে। হে শিষ্য! এই আত্মার স্বরূপ অত্যন্ত আশ্চর্য্যরূপ। কারণ এই আত্মাদেব আপনি ক্রিয়ারহিত হইয়াও মন অপেক্ষা অধিক বেগবান্। তাৎপর্য্য এই যে আপন সংকল্প দ্বারা এই মন যে যে পদার্থ প্রাপ্ত হয়, সেই সেই পদার্থে এই আত্মাদেব মনের গমনের পূর্ব্বেই পরিপূর্ণ আছেন। এই আত্মাদেব নেত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা অগম্য হইয়াও ব্রহ্মজ্ঞানগম্য। আত্মাদেব নিজে পর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চল হইয়াও দ্রুতগামী বায়ু আদিকেও উল্লঙ্ঘন করিয়া অগ্রসর হন। বাস্তবিক সর্ব্ব ক্রিয়ারহিত হইয়াও সর্ব্ব ক্রিয়াবান্ হন। এই আত্মাদেব অজ্ঞানী পুরুষের অত্যন্ত দূর হইয়াও বিদ্বান্ পুরুষের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী হন। এবং দৃশ্য প্রপঞ্চের অন্তর বাহ্য পরিপূর্ণ করিয়া অবস্থিতি করেন। ইহা শ্রবণ করিয়া মুনিগণ পুনঃ সন্দেহযুক্ত হইয়া সেই ভরদ্বাজ মুনিকে কহিলেন, হে ভগবন্ যে বস্তু কার্য্য-কারণ-ভাবরহিত এবং যে বস্তু সুখ-দুঃখরহিত, যে বস্তু ধর্ম্ম অধর্ম্ম রহিত এবং যে বস্তু ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই তিন কাল রহিত, সেই সকল বস্তুর উপদেশ আমাদিগকে দিন। এই রূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া মুনি সেই শুদ্ধ আত্মাকে বোধ করাইবার জন্য প্রথমে প্রণবরূপে এই আত্মার উপদেশ করিলেন। তিনি বলিলেন, হে শিষ্য! যে ব্রহ্মকে এই অধিকারী পুরুষ ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধন দ্বারা সাক্ষাৎকার করেন এবং যে ব্রহ্মকে এই ঋগাদি সর্ব্ববেদ কথন করেন এবং যে ব্রহ্মকে এই কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়নাদি তপ কথন করেন সেই

ব্রহ্মকে তোমরা প্রণব রূপে অবগত হও। হে ভগবান্! শব্দরূপ ঋগাদি বেদ সেই পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যদ্যপিও সম্ভব হইতে পারে, তথাপি অর্থরূপ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি তপ সেই পরব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা সম্ভব নহে। হে শিষ্য! অশুদ্ধ অন্তঃকরণে সেই পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয় না; কিন্তু কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি তপ দ্বারা যে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে, সেই অন্তঃকরণেই এই অধিকারী পুরুষের পরব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইয়া থাকে। সুতরাং যেরূপ ঋগাদি বেদ সেই পরব্রহ্মের প্রতিপাদক, সেইরূপ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদি তপও সেই পরব্রহ্মের প্রতিপাদক। হে শিষ্য! যে ব্রহ্ম প্রাপ্তির জন্য এই অধিকারী পুরুষ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, সেই ব্রহ্মই ওঁকার রূপ 'প্রণব' শব্দের অর্থরূপ; অথবা সেই ব্রহ্মই 'প্রণব' শব্দ রূপ প্রতীক বিশিষ্ট। অতএব সেই ব্রহ্মকে তোমরা 'প্রণব' শব্দ হইতে অভিন্ন রূপে অবগত হও। হে শিষ্য! এই অধিকারী পুরুষের এই 'প্রণব' রূপ অক্ষরই হিরণ্যগর্ভ রূপে এবং পরব্রহ্ম রূপে ধ্যান করিবার যোগ্য। এই প্রকার যে অধিকারী পুরুষ সেই 'প্রণব' রূপ অক্ষরকে পরব্রহ্ম রূপে ধ্যান করেন, তিনিই পরব্রহ্ম ভাব প্রাপ্তি রূপ ফল প্রাপ্ত হন। সুতরাং এই অধিকারী পুরুষ সেই 'প্রণব' রূপ অক্ষরের প্রতীক উপাসনা অবশ্য সম্পাদন করিবেন। 'প্রণবের' 'অকার' 'উকার' 'মকার' অর্দ্ধ মাত্রা এই চারিটি মাত্রা আছে। সেই অকারাদি চারি মাত্রা যথাক্রমে স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ ও তুরীয় এই চারি অবস্থা বাচ্য অর্থ বলিয়া পরিগণিত। "সেই চারি অবস্থা উপাহত শুদ্ধ চেতন আমি" এই প্রকার যে নিরন্তর চিন্তা, তাহার নাম আলম্বন উপাসনা।

এই আলম্বন উপাসনাকারী পুরুষ যে ফল প্রাপ্ত হন, তাহা তোমরা শ্রবণ কর। এই 'প্রণব' রূপ আলম্বনই হিরণ্যগর্ভের ধ্যানের উপযোগী এবং এই 'প্রণব' রূপ আলম্বনই পরব্রহ্মের ধ্যানের উপযোগী। এইরূপ প্রণবকে আলম্বন দ্বারা যে অধিকারী পুরুষ হিরণ্যগর্ভ এবং পরব্রহ্মের ধ্যান করেন, সেই অধিকারী পুরুষ ব্রহ্মলোকে যাইয়া তথায় মোক্ষ লাভ করেন। শ্রুতি যথা—"ব্রহ্মণা সহ মুচ্যন্তে সম্প্রাপ্ত প্রতি সঞ্চরে।" এই পর্য্যন্ত ফল সহিত প্রতীক উপাসনা এবং আলম্বন উপাসনা নিরূপিত হইল। এক্ষণে সেই উপাসনা দ্বারা যে অধিকারী পুরুষের চিত্ত শুদ্ধ হইয়াছে, সেই অধিকারী পুরুষের প্রতি আত্মার বাস্তবিক স্বরূপের উপদেশ নিরূপণ করা যাইতেছে।

শিষ্য কহিল, হে ভগবন্ সেই 'প্রণব' মন্ত্র দ্বারা প্রতিপাদিত যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের স্বভাব যথাযথ অবগত হইবার জন্য যাজ্ঞবল্ক্য মুনি আপনার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে যে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিয়া সংন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই ব্রহ্মবিদ্যা শুনিতে আমাদিগের ইচ্ছা হইতেছে; অতএব আপনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সেই ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ প্রদান করুন। শিষ্যদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই গুরু পরমানন্দ প্রাপ্ত হইলেন; অনন্তর বৃহদারণ্যকের মধ্যকাণ্ডে ও যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ডের উক্তি সকল শিষ্যকে বলিতে লাগিলেন। সেই কথা কিরূপ? অধিকারী পুরুষের মন এবং শ্রবণ তাহা শুনিলে পুলকিত হইয়া যায়। শ্রীগুরু বলিলেন, হে শিষ্য! যে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি জনক রাজাকে উপদেশ দিয়াছিলেন, সেই যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বাল্যাবস্থা হইতে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বিষয়েচ্ছা বিরহিত হইয়াছিলেন। যদ্যপিও যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে বাহ্যিক বিকারী পুরুষের ন্যায় প্রতীত হইত, তথাপি তিনি আপনার চিত্তে সর্ব্ব বিকার রহিত ছিলেন এবং সর্ব্ব লোকের উপকার করিতে সর্ব্বদা প্রীতি অনুভব করিতেন। তিনি বিদ্যালাভের জন্য বাল্যাবস্থায় ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলেন। তাঁহার তপ দেখিয়া দেবরাজ ইন্দ্র ভীত হইয়া তাঁহার তপস্যা বিঘ্ন করিবার জন্য অনেক অপ্সরাকে সেখানে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। সেই অপ্সরা রূপ বৃক্ষ পূর্ণ যে বন, সেই বনে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি থাকিয়া অপ্সরা-হাব্ভাব্ কটাক্ষ দেখিয়াও স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হ'ন নাই। এক্ষণে যাজ্ঞবল্ক্য মুনির তপস্যার বিষয় নিরূপণ করা যাইতেছে। যখন বর্ষাকাল আসিত, তখন সেই যাজ্ঞবল্ক্য মুনি বৃক্ষ এবং পর্ব্বতের ন্যায় বিনা আবরণে সমতল ভূমিতে অবস্থিতি করিতেন এবং বর্ষার জলধারা আপনার দেহে সহ্য করিতেন। পুনঃ যখন গ্রীষ্ম ঋতু আসিত, তখন তিনি মধ্যাহ্নের প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড তাপে সন্তপ্ত শিলোপরি চতুর্দ্দিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সেই অগ্নি মধ্যে উপবিষ্ট থাকিতেন। যখন শীতকাল আসিত, তখন তিনি অত্যন্ত শীতল এবং চতুর্দ্দিক নিরাবরণ স্থানে স্থিত যে জলাশয়, তন্মধ্যে নিমগ্ন থাকিতেন এবং ঋক্, যজু, সাম, এই তিন বেদ স্বরূপ আদিত্য-মণ্ডলস্থিত যে সূর্য্য, সেই সূর্য্য ভগবানের প্রতি আপনার দৃষ্টি স্থির করিয়া অন্তরে সূর্য্য ভগবানের ধ্যান করিতেন ও আপনার প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি বৃক্ষ পত্র এবং ফল মূল ভক্ষণ করিতেন। তাহাও প্রতিদিন ভক্ষণ করিতেন না, পরন্তু কখন তৃতীয় দিনে, কখন ষষ্ঠ দিনে, কখন দ্বাদশ দিনে পত্রাদি

ভক্ষণ করিতেন। এই প্রকার পত্রাদি ভক্ষণ করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনি নিজের শরীর শুষ্ক করিতে লাগিলেন এবং নিদ্রা ও পরিশ্রম হইতে নিরত হইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে উপনয়ন কালে পিতা যে গায়ত্রী মন্ত্র উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহাই মুখে জপ করিতে করিতে মনে মনে নিরন্তর সূর্য্য ভগবানের ধ্যান করিতে লাগিলেন। হে শিষ্য! এইরূপে যাজ্ঞবল্ক্য মুনি যখন অনেক দিন পর্য্যন্ত তপস্যা করিলেন, তখন তাঁহার তপস্যা দ্বারা সূর্য্য ভগবান প্রসন্ন হইয়া পুরুষের রূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর সমস্ত জগতের বাহ্য প্রাণ স্বরূপ এবং নিজের মহান্ তপের ফল স্বরূপ ভগবান সূর্য্যকে দেখিয়া, প্রণামান্তর অত্যন্ত পুলকিত মনে সূর্য্য ভগবানের স্তুতি করিতে লাগিলেন! হে শিষ্য! যাজ্ঞবল্ক্য মুনির এইরূপ প্রেম দেখিয়া সূর্য্য ভগবানও অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং তাঁহার নেত্র হইতে অনবরত আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল ও প্রেমে তাঁহার রোমাঞ্চ হইয়া উঠিল। এই প্রকার প্রেমপূর্ণ হইয়া সূর্য্য ভগবান্ আপনার দুই হস্ত উত্তোলন করিয়া যাজ্ঞবল্ক্য মুনির মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া এইরূপ বাক্য বলিতে লাগিলেন, "হে পুত্র, তুমি বাল্যাবস্থা হইতে এই বনে থাকিয়া মহান্ তপস্যা করিয়া অত্যন্ত ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছ। তোমার তপস্যা দ্বারা আমি সাতিশয় প্রসন্ন হইয়াছি; সুতরাং ইচ্ছামত বর প্রার্থনা কর। আমি তোমাকে সেই বর প্রদান করিব।" হে শিষ্য! যখন সূর্য্য ভগবান এই প্রকার বলিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য মুনি আপনার মস্তকোপরি দুই হস্ত যোজনা করিয়া অবনত বদনে সূর্য্য ভগবান্‌কে বলিলেন, "হে ভগবান আপনি সমস্ত জগতের প্রাণ এবং সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষী; সুতরাং এই জগতে যদ্যপি কোন বস্তুই আপনার অবিদিত নাই, তথাপি আপনার সমক্ষে আমি বালক; আমার নিজের বৃত্তান্ত বলিতেছি।" হে ভগবান, ব্যাস ভগবানের শিষ্য বৈশম্পায়ন ঋষির নিকট আমি পূর্ব্বে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলাম; এবং শরীর বাণী ও মন দ্বারা সেই বৈশম্পায়ন গুরুর সেবা করিয়াছিলাম।

পরে কোন সময়ে সমস্ত ঋষিগণ মিলিয়া পরস্পর এইরূপ সঙ্কেত করিলেন যে, অমুক দিন মহামেধ উপলক্ষে যে ঋষি সমাজে না আসিবেন, সেই ঋষির সপ্ত রাত্রির পর ব্রহ্মহত্যা প্রাপ্তি হইবে। আমার গুরু বৈশম্পায়ন সেই সঙ্কেত ভেদ করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই বৈশম্পায়নের কিঞ্চিৎ নিমিত্ত বশতঃ ব্রহ্মহত্যা পাতক স্পর্শ করিয়াছিল। সেই ব্রহ্মহত্যা

পাতক দ্বারা গ্লানি প্রাপ্ত আস্ত (মুখ) বিশিষ্ট আমার গুরু সেই পাতক নিবৃত্তির জন্য আমাদিগকে প্রায়শ্চিত্ত করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। তদনন্তর আমি তাঁহার অন্যান্য ব্রহ্মচারী শিষ্যদিগের উপর অনুগ্রহ করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সেই বৈশম্পায়ন গুরুকে বলিলাম; হে গুরো! আপনার বৃদ্ধাবস্থা হইয়াছে; সুতরাং এই প্রায়শ্চিত্ত করিতে আপনার ত' সামর্থ্য নাই; আর এই যে আপনার শিষ্যগণ, তাহারাও বালক; সুতরাং এই শিষ্যেরাও সেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে সমর্থ নহে; পরন্তু আমি সবল এবং যৌবন অবস্থাপন্ন, সুতরাং আপনার ব্রহ্মহত্যা নিবৃত্তির জন্য আমিই প্রায়শ্চিত্ত করিব। হে ভগবন্, এই প্রকার বাক্য যখন আমি গুরুকে বলিলাম, তখন সেই বৈশম্পায়ন ব্রহ্মহত্যার প্রভাবে বিপরীত ভাব প্রাপ্ত হওয়াতে আমার উপর অন্যায় রাগান্বিত হইয়া উঠিলেন। এই প্রকার ক্রোধান্বিত হইয়া আমার গুরু নির্দ্দয় পুরুষের ন্যায় আমাকে কহিলেন, হে ব্রাহ্মণদিগের নিন্দক যাজ্ঞবল্ক্য! আমি তোমাকে আজ পর্য্যন্ত যে সকল বিদ্যা দিয়াছি, তুমি সেই বিদ্যা শীঘ্রই পরিত্যাগ কর। হে ভগবন্, সেই বৈশম্পায়ন এই প্রকার বাক্য যখন আমাকে বলিলেন, তখন আমি নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিবার জন্য শরীর বাণী ও মন দ্বারা নানাপ্রকার প্রণামাদি উপায় করিলাম। পরন্তু তিনি আমার উপর প্রসন্ন হইলেন না; বরং আমার প্রার্থনা দেখিয়া অধিকতর ক্রোধান্বিত হইয়া আমাকে বলিলেন, হে ব্রাহ্মণদিগের নিন্দক যাজ্ঞবল্ক্য! তুমি যদি আমাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত চেষ্টা কর, তবে আমি তোমার দেহ প্রাণাদি নাশকারী অভিসম্পাত করিব। সেই শাপ দ্বারা তুমি ইহলোকে এবং পরলোকে দুঃখই প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং যদি তুমি ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমাকে প্রসন্ন করিবার অভিলাষ পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্রই আমার বিদ্যা পরিত্যাগ কর। যদি তুমি আমার বিদ্যা শীঘ্র পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে এখনই আমি তোমাকে শাপ দিয়া নষ্ট করিব! হে ভগবন্, সেই বৈশম্পায়ন নামক আমার গুরু যখন আমাকে এই প্রকার বলিলেন, তখন আমি অত্যন্ত ভীত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার বাসনা পরিত্যাগ করিলাম। এবং যেরূপে কোন লোক অন্ন বমন করে, সেইরূপ আমি সেই সমস্ত বিদ্যা বমন করিলাম। এই প্রকার সমস্ত বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া আমি বিদ্যাহীন হইলাম। পরন্তু মনুষ্য গুরু হইতে বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়া আমি দুঃখ পাইয়াছি; সুতরাং পুনঃ কোন মনুষ্য গুরুর-সমীপে

বিদ্যা প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করিনা ; এক্ষণে যাহাতে আপনার ন্যায় ঈশ্বরের নিকট পুনরায় বিদ্যালাভ করিতে পারি, তজ্জন্যই আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি। শ্রীগুরু বলিলেন, হে শিষ্য! যাজ্ঞবল্ক্য যখন সূর্য্য ভগবানের সমীপে এই প্রকার প্রার্থনা করিলেন, তখন সূর্য্য ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্য মুনিকে আপনার রথে বসাইয়া ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গযুক্ত চারি বেদ শিক্ষা দিতে লাগিলেন ; আর যেরূপে পূর্ব্বে অশ্বিনী নামক দেবতা সূর্য্য ভগবানের শিষ্য হইয়াছিলেন, সেইরূপে সেই যাজ্ঞবল্ক্য মুনিও সূর্য্য ভগবানের শিষ্য হইলেন।　　　　(ক্রমশঃ।)

শ্রীহেমচন্দ্র মিত্র।

মোক্ষ]　　　　## "সাধনার পথে"।

(তৃতীয়ানুবৃত্তি)

এই প্রকার বিপদ যে সময় আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখে, তখন শ্রীভগবানের শ্রীপাদপদ্মে অনন্যশরণ হইয়া দৃঢ়রূপে আশ্রয় গ্রহণ করা, তাঁহার ইচ্ছার অতিরিক্ত অন্য কোন প্রকার অভিলাষ না করা, ও ঐকান্তিকী ভক্তি এবং বিশ্বাস সহকারে তাঁহার শরণ লওয়াই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। দাশনিক জ্ঞান কখনও কখনও আমাদের সাহায্যে আসে বটে ; কিন্তু ভক্তির অবলম্বনই তখন প্রকৃত বল। সে কি প্রকার ভক্তি? প্রকৃত ভক্তি—খাঁটি প্রেম ; যার অর্থ, নিজ জীবনে তত্ত্ব-শাস্ত্রের ধ্রুব সত্যগুলি অনুভব করা, যদ্দ্বারা আত্ম "জ্ঞান" যেন আত্ম "সম্পূর্ত্তি" বা বোধেতে পরিণত হইয়া যায়। যথা—

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে মাং তদনন্তরম্॥　গীতা ১৮।৫৫
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥　গীতা ১১।৫৪

জ্ঞান শুধু জ্ঞানের জন্যই যে প্রয়োজনীয় তাহা নহে; কিন্তু জীবন যা'তে মধুরতর মহত্তর ও শ্রীভগবানের নিয়ম ও স্বরূপের অনুবর্ত্তী হয় তাহাই প্রয়োজন। অতএব হে প্রিয় ভ্রাতঃ, যাহাই ঘটুক না কেন, হতাশ হইও না। অসিদ্ধি বা স্খলন যেন তোমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া না দেয় ; বরং শ্রীভগবানের—সেই পরম পুরুষের ন্যায় ও কৃপার উপরে অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন করিয়া বিরোধী শক্তি সমূহের সম্মুখীন হও ; যতদিন তুমি সেই সত্য ও মহিমাময় পরম পিতা বিশ্বপতির সহিত

পুনর্মিলিত হইতে না পারে, ততদিন পর্য্যন্ত উহারা বিরোধী ভাবে ক্রমবিকাশের কার্য্য সাধন করিবে; তাহাতেই তুমি অবশেষে বিজয়ী হইয়া 'সর্ব্বে' "আমি" ও "আমি"তে "সর্ব্ব" দেখিতে সক্ষম হও।

সচ্চিদানন্দের পরাভাব ব্যক্তিত করিবার জন্যই জীবের 'অহং' বুদ্ধি—বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব বোধ থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তিত্ব-বিশিষ্ট 'অহং' বুদ্ধি থাকিবে, ততদিন অবশ্যই ব্যক্তিগত কর্ম্ম অব্যাহত থাকে, কারণ সেই নির্ব্বিশেষ সার্ব্বভৌম আত্মা ব্যক্তিত্বকে বৃথা সৃজন করেন নাই। সেই সর্ব্বাত্মিকা ভগবচ্ছক্তি সর্ব্বদাই তথায় "মহান্ নিয়ম" রূপে কার্য্য করিতেছেন। তবে ব্যক্তিত্ব কি জন্য? নিশ্চয়ই অলস ও অকর্ম্মণ্য হইয়া বসিয়া থাকিবার নহে, বরং শক্তিসমূহকে চালনা করিবার জন্যই ব্যক্তির সৃষ্টি। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, কোন্ পথে কার্য্য করিলে সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্টরূপে এই জীবশক্তির কাজ করা যাইবে? বস্তুতঃ এই প্রশ্নের মীমাংসা (সমাধান) জীবের স্বভাব ও আশ্রমের উপরই—অর্থাৎ তিনি ক্রম বিকাশের কোন্ স্তর পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছেন, তাহার উপরই নির্ভর করে। আমাদের আত্ম-বিকাশের সহিত, জ্ঞানের প্রসারের সহিত ও শক্তির বিবৃদ্ধির সহিত (অবশ্য সেই শক্তি যাহাতে আমাদিগকে "অমানী মানদ" করায়) কর্ত্তব্যেরও পরিবর্ত্তন হয়। তোমার পক্ষে, শ্রীভগবানের বিচারে আত্মকৃত কর্ম্মের ফল কিরূপে ভোগ করিতে হইবে তাহা যখন তুমি ঠিক জাননা, তখন সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ভাবাবেগের (আকাঙ্ক্ষার) অনুযায়ী হ'য়ে চলাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট পন্থা। অবশ্য আকাঙ্ক্ষার বশে কোনও কাজ করিবার পূর্ব্বে তোমার অন্তঃকরণকে উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া লইবে। দেখিও যে আকাঙ্ক্ষাটি ক্ষুদ্র আমিত্বের—যাহা সর্ব্বদাই বিশিষ্ট ভেদ যুক্ত অহংবুদ্ধির স্থাপনে প্রয়াসী—তাহার দ্বারা প্রণোদিত কি না এবং উহার গতি সম্পূর্ণরূপে "পরহিতায়" বা "জগদ্ধিতায়" কি না? তারপর বিবেককেও বর্জ্জন করা উচিত নহে; কারণ আমাদের এমন অনেক আকাঙ্ক্ষা থাকিতে পারে, যাহা অতিশয় মহান্ ও সার্ব্বভৌম হইলেও অতীব বালক-সুলভ, মূঢ় ও নির্ব্বুদ্ধিভাজন; এবং সেই গুলির অনুবর্ত্তী হওয়া একেবারে পাগলামী মাত্র।

আমাদের হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশে অনেক বাসনা (কাম বা এষনা) আছে; যাহা সাধারণতঃ লুকায়িত বা মৃতবৎ পড়িয়া থাকে, কিন্তু অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং দুর্ব্বোধ্য উপায়ে যাহারা আত্ম-তৃপ্তির প্রার্থী। অনেক সময়েই আমরা এই স্বতঃ বিশ্বহত-সাধক অভিলাষ গুলিকে কোনও না কোনও আত্মেন্দ্রিয় তৃপ্তির

বাসনা হইতে প্রসূত দেখিতে পাই। অতএব বাহ্যতঃ দেখিতে মহদাকাঙ্ক্ষা মাত্রেই যে দৈবী শক্তির প্রেরণা, এরূপ বিবেচনা করা ভ্রম মাত্র। স্বীয় প্রকৃতিকে শ্রীভগবদিচ্ছার অনুবর্ত্তী করিতে হইলে প্রকৃষ্ট উপায় এই যে, সর্ব্বাগ্রে আমাদের কামনা-অশ্বত্থের মূলোৎপাটন করিতে হইবে; ক্ষুদ্র আমিত্ব হইতে প্রসূত ভাবগুলি যখনই পরিতৃপ্তি চাহে, তখনই তাহাদিগকে দমন করিয়া সর্ব্বদা ভক্তি এবং প্রণিপাতের ভাব রাখিতে হইবে। স্বীয় প্রবণতা বা প্রকৃতি এবং গুপ্ত ও লুক্কায়িত মনোভিলাষ সমূহ আবিষ্কার করিবার পক্ষে আত্মপরীক্ষা বা আত্মবিবেকও একটী উৎকৃষ্ট এবং অপরিত্যাজ্য উপায়। যদি তুমি প্রত্যেক জীবন ব্যাপারের ভিতর দিয়া যে সার্ব্বভৌম এবং বিশ্বাতিগ "পর" সত্ত্বা আধাররূপে অধিষ্ঠিত আছেন এবং প্রবাহিত হইতেছেন, সেই দিকে দৃষ্টি রাখিয়া ঐ রূপ পরীক্ষা কর, যদি তুমি সর্ব্বদাই জাগরুক থাক এবং একদিকে যেমন তোমার বাসনা ও কামনাগুলিকে সর্ব্বদাই দমন কর ও অপরদিকে হৃদয় কুসুমকে ভগবদভিমুখী করিয়া প্রস্ফুটিত করিতে ব্যগ্র ও শ্রীগুরুর সেবা করিতে নিত্যই উন্মুখ থাক এবং তোমার মহান্ ও নিত্য ভাবগুলি পরিপুষ্টির জন্য নিম্ন এবং অনিত্য ভাবগুলিকে বলি দাও, তাহা হইলে তোমার স্বতঃ প্রসূত আকাঙ্ক্ষাগুলি ক্রমেই সেই ইচ্ছাময়ী চিন্ময়ীর প্রতিবিম্ব মাত্র হইবে; এবং প্রেরণা (উদ্দেশ্য) ও জ্ঞান সম্বন্ধে ভ্রম যেরূপ অসম্ভব হইবে, কর্ম্মে ভুল ভ্রান্তিও তদ্রূপ তোমার পক্ষে অসম্ভব হইয়া দাড়াইবে।

তবে যতদিন পর্য্যন্ত আমরা এতাদৃশ অবস্থা প্রাপ্ত না হই, ততদিন আমাদের উহা আনিবার জন্যে উদ্যুক্ত হওয়া ভিন্ন আর কোন পথ নাই। সে কিরূপে আনিতে হইবে? আমাদের অন্তঃকরণের মহত্তর ও অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ বা ভেদভাব বর্জ্জিত বৃত্তিগুলিকে পাশবিক প্রবৃত্তিগুলির দমনে নিযুক্ত করিতে হইবে ও আমাদের মৌলিক প্রেরণায়, তত্ত্ব নির্ণয়ে ও চতুঃপার্শ্বস্থ বস্তুবিচারে ক্রমশঃই বিশিষ্ট আমিত্বগত ভাব ('পছন্দ অপছন্দ') ছাড়িবার চেষ্টা সর্ব্বদাই করিতে হইবে এবং আমাদের জীবনের গতি যাহাতে উত্তরোত্তর "পরিহিতায়' বিশ্বতোমুখী ও অবিশেষ ভাবান্বিত হয়, তাহা করিতে হইবে। তাহা হইলে এইরূপ একটী অভ্যাস গঠিত হইবে, যাহাতে আমাদের বিচার ও ব্যবহার (আচরণ)— ব্যক্তিগত বিশিষ্ট সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের অনুরূপ ও ব্যবসাদারী লাভালাভের পরিমাণে গঠিত না হইয়া সনাতন সত্য তত্ত্ব এবং সার্ব্বভৌম বিধিরই অনুগত হইয়া উঠিবে। অবশেষে আমাদিগের ক্ষুদ্র বিশিষ্ট সত্ত্বাকে সেই মহা

সত্ত্বার মহাসাগরে নিমজ্জিত করিয়া দিবে। অবশ্যই এই সাধনের সময়ে আমাদের পদে পদে ভুল-ভ্রান্তি হইবে ও তাহার জন্য আমাদের ভুগিতেও হইবে ; কিন্তু সেই ভোগ শারীরিক ও মানসিক মাত্র, আধ্যাত্মিক হইবে না ; অর্থাৎ ইহা আত্মোপলব্ধির পথে কোন বাধা আনিবে না, কেবল আত্ম-স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের যে "অবিদ্যা" বা "অজ্ঞানতা" আছে, যার জন্য আমরা আমাদের আত্মায় সেই এক এবং অদ্বিতীয় পুরুষের অভিব্যঞ্জনা দেখিতে পাই না এবং যার জন্যই সেই সব ভুল ভ্রান্তি ঘটিয়াছিল, তাহাকে অপসারিত করিবে মাত্র। অতএব সানন্দে ঐ প্রকার কর্ম্ম ভোগকে আমাদের আলিঙ্গন করা উচিত।

তোমার জীবিকাবৃত্তির সহিত যে সব দুঃখ বিপত্তি বিজড়িত আছে, তাহা আমি সম্পূর্ণ রূপেই অবগত আছি। কিন্তু সকল বিষয়েরই দুইটা দিক আছে— একটা ভাল, আর একটা মন্দ। ওকালতীর ক্ষেত্রটী সমস্ত ব্যবসায়ের মধ্যে হেয় হইয়া পড়িয়াছে বলিয়াই, উহা ক্ষিপ্রতম উন্নতির সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা প্রদান করে। পরীক্ষাটী যতই কঠোর—চেষ্টা যতই তীব্র হইবে, ক্রমবিকাশ ততই সত্বর হইবে। যেখানে কোনও ভাবের সহিত মানুষের প্রতিযোগিতা করিতে হয়না, যেখানে বাধা দেওয়ার বস্তু কিছুই নাই, তথায় মহত্তর আধ্যাত্মিক বৃত্তি সমূহের অনুশীলন হইতে পারেনা ; কাজেই প্রকৃত বিকাশ কিছুই হয়না। অতএব ভুল ভ্রান্তিতে ও সাময়িক পরাভবে বা অসমর্থতায় বিচলিত হইও না ; ক্রমে উদ্যুক্ত হও—অগ্রসর হও। যতক্ষণ চিত্ত বিজয়-লাভের দিকে অভিনিবিষ্ট থাকে, ততক্ষণ ভুল ভ্রান্তিতে বিশেষ কিছু আসে যায়না।

চিত্তের অভিনিবেশ, ধারণাশক্তি কিরূপে আসিবে বলিয়া যে প্রশ্ন করিয়াছ, তার যে কিরূপ উত্তর দিব তাহা আমি জানিনা। তবে উত্তর আসিবে ; তোমার ভিতর হইতে—বোধ ক্ষেত্র হইতেই আসা ভাল। লিখিত অথবা কথিত উত্তর যে কতটা কার্য্যকর ও বোধগম্য হইবে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। উপাস্যের প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন করিতে হইবে ; কারণ হৃদয়ই সর্ব্ববিধ কামনার আবাসস্থান এবং এইখানেই কামনা- বাসনা বিচিত্র ভাবে বিকসিত হইয়া শাখা পল্লব বিস্তার করিয়া দেখা দেয়। যেমন উদ্যানের আগাছা দূর করিতে হইলে উদ্যান স্বামীকে ভাল ভাল তেজো লতা ও গাছ রোপন করিতে হয়, সেইরূপ আমাদের পাপ বাসনাগুলি সমূলে উৎপাটিত করিবার সর্ব্বাপেক্ষা ফলশালী ও কার্য্যকর উপায়—সেই "শুদ্ধমপাপবিদ্ধং" মহৎ অপেক্ষাও মহীয়ান্ ও সর্ব্ব মঙ্গলালয়কে স্থাপন করা।

যতই তোমার প্রশ্ন বাহ্য কমিয়া আসিবে, ততই তোমার বিকাশ দ্রুততর ও মহত্তর হইবে। কারণ তুমি নিজের অন্তরের কাছে যদি ঐ প্রশ্নগুলির মীমাংসা চাও, তাহা হইলে শুধু যাহার বিকাশ দ্বারাই উন্নতি সম্ভবপর হয়, সেই "বুদ্ধি" বৃত্তিরই অনুশীলন করা হইবে।

প্রথমেই হৃদয়ের মহত্তর বৃত্তিগুলির দিকে পরাঙ্মুখ হইলে, কামনার উচ্ছেদ হয় না। পরন্তু পাশবিক প্রবৃত্তি ও বিতর্কগুলির (পাতঞ্জল দর্শন ২।৩৩) বিরুদ্ধে ঐ মহত্তর বৃত্তিগুলির যে স্বাভাবিক গতি ও শক্তি আছে, তাহা ব্যবহার করিতে হইবে ও ঐ শক্তিকে কাজে খাটাইতে হইবে। যখন ঐ পাপ বাসনাগুলি দূরীভূত হয়, তখন প্রেম, পুণ্য, দয়া, ঔদার্য্য প্রভৃতি হৃদয়ের মহৎ ভাব ও প্রবণতা সমূহ স্বতঃই সেই জ্ঞানময় ও ইচ্ছাময়ের জ্ঞান ও ইচ্ছার সহিত ঐক্য বা সামঞ্জস্য প্রাপ্ত হয়। কারণ ঐগুলি বস্তুতঃই 'দৈবীসম্পৎ',—পরমদেবের একত্ব ও সর্ব্বময়ত্বে পরিনিষ্ঠিত—মানবহৃদয়ে সেই পরমদেবের প্রতিবিম্ব বা চিদাভাস। তাহাতে যে একটু অহঙ্কার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের রঙ্ ফলান থাকে, সেটা যে আধারের ভিতর দিয়া প্রতিবিম্বটা পড়ে তারই গুণে।

শ্রীমান দেবেন্দ্রের জন্য আমি বাস্তবিকই বড় দুঃখিত আছি। তাহার অন্তরটা বড়ই সুন্দর; কিন্তু সে একটা বিষম দৈবাপৎ বা সমস্যার ভিতর দিয়া চলিয়াছে। অতএব অধুনা তাহার কথা বা কার্য্যের দ্বারা তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া ফেলিও না। অবশ্যই তাহার অনেকগুলি দৌর্ব্বল্য বা দোষ আছে এবং সাধনা পথের বিরুদ্ধ শক্তিনিচয়গুলিকে আড়ম্বর সহকারে এখন যতদূর পারে বড় করিয়া দেখাইতেছে। দৈত্যগণের কি ভয়ানক শক্তি! আবার তাহারা যদি না থাকিত, তাহা হইলে ব্যক্ত জগতে কোনও প্রকার উন্নতি সম্ভবপর হইত না। এইজন্যই জ্ঞানীজন 'শয়তান' ও তাহার দলবলকে (পার্ষদ ও উপাঙ্গ সমূহকে) অবজ্ঞা করেন না; বরঞ্চ বিশ্বের ক্রমবিকাশের পথে তাহারা যে অংশের অভিনয় করে, তাহা দেখিতে পাইয়া তাহাদের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করেন। পুরাণের সেই ইতিহাস স্মরণ কর, যথায় মহাদেব অসুর সৃষ্টির হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন ও তাহারা যে তাঁহারই অংশ-কণা তাহাই বলিয়াছেন।

অভিমান যদিও ভাল জিনিস নহে, তথাপি মানবের কোন কোন অবস্থায় উহা বড়ই প্রয়োজনীয়। তোমার ভিতরে যে উহা সুফল-প্রসূ হইবে না, তাহা আমি নিশ্চিতরূপে জানিনা। উহা তোমাকে এক প্রকার

কর্ম্মশীলতার দিকে প্রণোদিত করিতে পারে, যাহা গৃহস্থের পক্ষে ধর্ম্মস্বরূপ এবং যাহার অভাব সংসার-ভারগ্রস্থ ব্যক্তির পক্ষে একটি মহা অপরাধ। বাহ্যাবস্থায় উপেক্ষা বা অবিচলিত-চিত্ততা খুব ভাল বটে কিন্তু ঐ বৈরাগ্য শুধু ভিতরের জিনিস হওয়া উচিত। যদি উহা যথাযথ কর্ত্তব্যপালনের অন্তরায় হইয়া দাড়ায়, তাহা হইলে উহা পাপে পরিণত হয়। তজ্জন্যই Light on path গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে:—"অভিমানকে সমূলে উৎপাটিত কর; কিন্তু অভিমানীরা যেরূপ অভি-নিবেশ সহকারে কার্য্য করে, তদ্রূপ ভাবে কার্য্য কর।" এই সিদ্ধান্তের উপদেশের বা প্রকৃত ভাব ও তত্ত্ব অবলম্বনে তোমাকে কার্য্যে চলিতে হইবে হে ভ্রাতঃ' "নিয়ম" জিনিসটা যে বড়ই কঠোর তাহাতে সন্দেহ নাই, উহা—অল্পবুদ্ধি লোকের সমক্ষে নির্ম্মম দয়াহীন করুণালেশ শূন্য বলিয়াই অনুক্ষণ প্রতিভাত হইবে, কিন্তু জ্ঞানী উহাকে অবিশেষ অপার করুণার মূর্ত্তি বা প্রকার জানিয়া উহাতে বিরক্তি প্রদর্শন করেন না। (ক্রমশ.)

শ্রীপ্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ধর্ম্ম]

ব্রহ্মবিদ্যা ও পাণ্ডিত্য।

দেখ, তোমাদের এ পাণ্ডিত্য—পাণ্ডিত্যই নয়: এর এক কড়া না থাকলেও যে বিশেষ ক্ষতি আছে—তা নয়! আসল পাণ্ডিত্য তাঁদেরি; যাঁরা ব্রহ্মবিদ্যাকে জানেন। ব্রহ্মবিদ্যা লাভ শুধু বই পড়ে হয় না। তা'ই বলে না পড়ে মূর্খ হ'য়ে থাক্‌লেই যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হবে বা দেশের সব গণ্ড মূর্খেরাই যে এক একটি রামকৃষ্ণ পরমহংস হয়ে দাঁড়াবে—এ ধারণাও যেন মনে স্থান না পায়!

আসল বিদ্যাই হ'লো কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা, তারপর এই সব লৌকিক বিদ্যা—বিদ্যা বটে, তবে তা' ব্রহ্মবিদ্যারূপ উপাদেয় ফলের গায়ের খোষা মাত্র! তাতে রসও নেই এবং তা' খেতেও ভাল লাগে না। যেমন বেল পাক্‌লে কাক তার ভিতরকার জিনিষটার স্বাদ পায় না—মধ্যে মধ্যে কেবল ঠোকর মারে, কিন্তু তাতে তার ঠোঁট দু'খানাই বেদনাভারে পীড়িত হয়; তদ্রূপ মনুষ্যের মধ্যে যাঁরা কাক জাতীয়, তারা লোভে পড়ে ঠোকর মারে, কিন্তু সেটা খোসার উপর আসল ভিতরকার শাঁসের খবর পায় না; ঠোক্‌রাতে ঠোক্‌রাতে শুধু তাদের প্রাণ তিক্ত হয়ে যায়। তা'ই বল্‌চি আসল যদি পণ্ডিত হতে চাও, তবে উপরে ঠোক্‌রালে

চল্‌বে না; খোলাটাকে ভেঙ্গে ফেলে তার ভিতরকার শাঁসটুকু খেতে হবে। বেলের খোলাটা যদি দিন রাত চুষিতে থাক, তাতে এক ফোঁটা রস পাবে না বটে, কিন্তু ঐ খোলাশুদ্ধ বেল যদি কারও মাথায় আঘাত কর, তবে তার মাথার সুস্থ অবস্থায় থাকা কঠিন হবে। আমাদের লৌকিক পাণ্ডিত্যেরও দশা ঐ একই রকমের; দিনরাত ঘাঁটাঘাঁটি কর, রস এক বিন্দু পাবে কিনা সন্দেহ; কিন্তু কূট তর্কের খোলা ছুঁড়ে লোককে যথেষ্ট আঘাত করতে পার—এর দৌড় এই পর্য্যন্তই। ব্রহ্মবিদ্যা কিন্তু এ রকমের নয়; যদি কোন প্রকারে ভিতরে প্রবেশ করতে পার, তবে অফুরন্ত রস—অবিরাম তৃপ্তি! এই রসের আস্বাদন পেলেই সব মিটে গেল—সব গোলমাল চুকে গেল। আনন্দেতে যেমন সব ভেদ মিটিয়ে দেয়—সব বৈষম্য ঘুচিয়ে দেয়, এমন আর কিছুতে নয়; তখন লোকের সঙ্গে লোকের মিলন সহজ হয়, স্বাভাবিক হয় এবং সুন্দর হয়। আনন্দের দিনে সবই লুটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে। শত্রু, মিত্র, পর, আপনার ভেদ রাখ্‌তে ইচ্ছা করে না; এটা আমার—ওটা তোমার বলে কোন গণ্ডী রচনা করবার প্রয়োজন হয় না; তখন সবই যেন হাল্কা হয়—সব বোঝার ভারই যেন নেমে যায়। এই হলো ঠিক আনন্দের লক্ষণ; এই আনন্দকে জেনে বিদ্বান "ন বিভেতি কদাচন"। সুখ, দুঃখ পর, আপনার, শীত, গ্রীষ্ম, জন্ম, মৃত্যু, সব দ্বন্দ্ব—সব ভেদই যদি মিটে গেল, তখন বাঝা ত' আর রইল না; তখন প্রাণ কোন জিনিষ বা বাসনায় গণ্ডীর মধ্যে আট্‌কে নেই! তখন সব খোলা; তার প্রাণ খোলা—তার মন খোলা—তার সিন্দুক প্যাট্‌রা সবই খোলা। সবই তার আপনার—তবে আর কার কাছে লুকাবে? এই হলো ঠিক ভেদ-রহিত অবস্থা, এই অবস্থার নামই পাণ্ডিত্য এবং এই ভাব যাতে আছে, তিনিই হ'লেন পণ্ডিত! তোমার গীতাতেও আছে "পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ" অর্থাৎ যিনি জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ কর্ম্মা; জ্ঞানীরা তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন। এই জ্ঞানকে পেতে হবে এবং এই জ্ঞানের আগুনে কর্ম্ম টম্মকে পুড়িয়ে ছাই করে ফেল্‌তে হবে! পরে এই ছাই মাখ্‌তে পারলে, তবে তুমি ত্যাগী ও সন্ন্যাসী হলে। নচেৎ বাবা সবই ফাঁকি—সবই ফক্কিকার—শুধু ধুলো মাটি মাখাই সার!

ধর্ম্ম]

বন্দনা।

যাঁহারে স্মরিয়ে শশী, সুনীল গগণে বসি,
প্রেমেতে মাতায় ধরা।
ফুটিয়ে শেফালি রাশি, লুটায় চরণে হাসি,
প্রেমেতে পাগল পারা॥
গুণ গুণ রব তুলি, মৃদু স্বরে অলিগুলি,
গুণ গাহে কোটি ছন্দে।
সমুদ্র তুলিয়া তান, গম্ভীর ওঙ্কার গান,
নিরন্তর যাঁরে বন্দে॥
প্রকৃতির সনে আজ. উঠিছে হৃদয় মাঝ,
তাঁহারি গীতি বন্দনা।
শুধু ভকতি পুষ্পেতে, ও রাতুল চরণেতে,
করিব আজ অর্চ্চনা॥

শ্রীমতি আশালতা রাহা

ধর্ম্ম]

কঃ পন্থা।

(ভরদ্বাজ কাত্যায়ন সংবাদ।)

মগধ নিবাসী কাত্যায়ন নামক কোন ব্রাহ্মণ কুমারের চিত্তে প্রশ্ন উত্থিত হইল, "কঃ পন্থাঃ" পথ কি ? কোন্ পথে যাইলে অভীষ্ট সিদ্ধি হইবে—অভাবের শত বৃশ্চিক দংশন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইবে—বাসনা-পিশাচীর করাল আলিঙ্গন বিমুক্তি ঘটিবে। তাহার মনে হইল. সে যেন অকূল কাল-সাগর স্রোতে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, সম্মুখে তীরের রেখা মাত্র নাই। সে যেন ঘন দুর্ভেদ্য অন্ধকারে মিশিয়া গিয়াছে, আলোকের ক্ষীণ রশ্মি দর্শনের সম্ভাবনা নাই। কোন কর্ম্মেই তাহার অনুরক্তি বা আসক্তি নাই, সাংসারিক কোন উন্নতি বা কোন প্রকার জয়েই উৎফুল্ল ভাব নাই। দারুণ সংশয় ও বেদনা বুকের মধ্যে লইয়া ব্রাহ্মণ কুমার গৃহত্যাগ করিল। শস্য শ্যামলা জন্মভূমি তাহার

নয়নে আর আনন্দের ছবি বলিয়া বোধ হইল না। জননী ছিল না যে, তাঁহার পাষাণ বিদ্রাবী ক্রন্দন অভীষ্ট সিদ্ধির পথ কণ্টকাকীর্ণ করিয়া রাখিবে, অবিরল উত্তপ্ত নয়নাশ্রু পথের পিচ্ছিলতা সম্পাদন করিবে। আত্মীয়-স্বজনেরা অবশ্য বারণ করিল, কিন্তু সে বারণে কোন ফল হইল না,—সাগরাভিমুখী নদ কোন বাধাই মানিল না।

কাত্যায়ন বহু দেশ ভ্রমণ করিল, বহু শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া তাঁহাদের উপদেশাবলী কণ্ঠস্থ করিল, কিন্তু প্রাণে শান্তি মিলিল না। অনেকগুলি পথের সন্ধান পাইল বটে, কিন্তু কোন্ পথটি তাহার উপযোগী, ইহা নিশ্চয় করিতে পারিল না। অশান্তির জ্বালায় কখন কখন দেবতার চরণে কাতর ভিক্ষা করিতে লাগিল—"দেবতা কোন্ পথ ধরিব বলিয়া দাও"!

চিত্তের আকুল আগ্রহ ব্যর্থ হয় না। বহু অনুসন্ধানে উপযুক্ত গুরুর দর্শন লাভ ঘটিল : জন্মান্তরীণ কর্ম্মফল যাহা কাত্যায়নকে এইরূপে নানা দেশ, নানা পণ্ডিত, নানা মতের মধ্যে লইয়া গিয়া বিভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার ক্ষয় হইয়া আসিল। গুরুকে দেখিবামাত্র ব্রাহ্মণ কুমারের দৃঢ় প্রতীতি হইল,—"ইনিই আমাকে সকল প্রকার উপদেশে চিত্ত-বিভ্রান্তি দূর করিবেন, কোন্ পথ উপযোগী তাহার ব্যবস্থা দিবেন।"

সমিৎ হস্তে সেই কুমার অন্তরে প্রগাঢ় শ্রদ্ধা লইয়া যখন গুরুর চরণতলে নিপতিত হইল, তখন গুরু অস্তোন্মুখ তপন লক্ষ্যে সূর্য্যোপস্থান মন্ত্রোচ্চারণে ব্যাপৃত। তাঁহার নয়নে ভক্তি-ঢলঢল ভাব, বদনে অপূর্ব্ব ব্রহ্মণ্য জ্যোতি! সমস্ত অবয়ব যেন জ্ঞান-জ্যোতি বিকীর্ণ করিতেছিল। কাত্যায়ন করযোড়ে চিত্র-পুত্তলির মত নিস্পন্দভাবে সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিল। সন্ধ্যা সমাপনান্তে গুরু জিজ্ঞাসা করিলেন—"কস্ত্বং, কুত আগতোঽসি" বৎস, কে তুমি, কোথা হইতে আসিতেছ? শিষ্য নিবেদন করিল—"কোঽহং ন জানে কুত আগতোঽস্মি" আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, জানি না।

গুরু। "কথং ত্বং জ্ঞাস্যসে ময়া" তবে কি প্রকারে আমি তোমাকে জ্ঞাত হইব?

শিষ্য। "পরীক্ষা সর্ব্বভাবেন" সর্ব্বতোভাবে পরীক্ষা করিলেই জানিতে পারিবেন।

গুরু। "অজ্ঞস্ত্বং" তুমি ত বড় অজ্ঞ!

শিষ্য। "সত্যং হি ভগবদ্বচঃ। অজ্ঞোঽহং নতু বা দেব কথং ত্বাং শরণং

গতঃ"। ভগবদ্বাক্য সত্যই হইয়া থাকে আমি বড়ই অজ্ঞ ; তাই দেবতা, আপনার শরণাপন্ন হইয়াছি।

পরীক্ষা শেষ হইল। শিষ্যকে পরীক্ষা করতঃ যোগ্যতা অবধারণ করা সদ্‌গুরুর কর্ত্তব্য। এই মহাজ্ঞানী গুরুর নাম ভরদ্বাজ। ইঁহাকে কেহ জ্ঞানী, কেহ যোগী, কেহ কর্ম্মী, কেহ বা ভক্ত বলিয়া জানিত। তখন গুরু ভরদ্বাজ শিষ্যকে বলিলেন—"ব্রহ্মচর্য্যেন তপসা স্বাধ্যায়েন চ সেবয়া' সকলের অগ্রে ব্রহ্মচর্য্য পালন কর, তপস্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি সম্পাদন কর, বেদ শ্রবণ দ্বারা চিত্তকে আত্মজ্যোতি প্রতিফলনের যোগ্য কর ; স্বয়ং ভাত জ্যোতি আপনিই পতিভাত হইবে। শুশ্রূষা দ্বারা তোমার গুরু পত্নীর সন্তুষ্টি বিধানে অবধান থাকিও।

(২)

শিষ্য কাত্যায়ন কয়েকদিন গুরুগৃহে সুখে অতিবাহিত করিতে লাগিল। একদিন গুরু ভরদ্বাজ কাত্যায়নকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বৎস, আনন্দে আছ, কোন কষ্ট নাই ত'? গুরুপত্নী তোমাকে সন্তানের মত স্নেহ করেন? গো সকল তোমার সেবায় অনুরক্ত ও সুখী হইয়াছে ত'?"

শিষ্য। প্রভু, বড় আনন্দে আছি, নিশ্চিন্ত ভাবে সুখে দিন কাটিতেছে। জননী আপনার গুণে অকৃতি সন্তানকে পুত্রের মতই স্নিগ্ধ চক্ষে দেখিয়াছেন। জননীর স্নেহ লাভে ধন্য হইয়াছি। আর গো সকল আমার সেবায় সুখী হইয়াছে, আমার প্রতি অনুরক্ত আছে গুরুদেব!

ব্রহ্মচর্য্য।

ব্রহ্মচর্য্য পালনের আজ্ঞা দিয়াছেন, সম্যক্ পালন করিতে পারিতেছি কি না জানি না! আপনি ব্রহ্মচর্য্য সম্বন্ধে যাহা জ্ঞাতব্য, তাহা উপদেশ দিউন। আমি উপদেশ অনুসারে চলিব। ব্রহ্মচর্য্যের ফল কি? তাহা বুঝাইয়া দিবেন।

গুরু। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ" ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা বীর্য্য লাভঃ। বীর্য্য লাভে বলসঞ্চয়। বলীই আত্মজ্ঞানে অধিকারী। "নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ" বলহীন ব্যক্তির আত্মলাভ ঘটে না। এই বল আধ্যাত্মিক শক্তি। বিজ্ঞেয় বস্তুতে মনের যে প্রতিভান সামর্থ্য, তাহাই বল। ইহাই মুখ্য বল। অন্নাদি পরিপাকজ শারীর বলও ব্রহ্মচর্য্য লভ্য। "মরণং বিন্দুপাতেন ধারণে ন চ

জীবিতং” শারীর বল গৌণ বল। শারীর বলও অত্যাবশ্যকীয়। কারণ “শারীর-মাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনং।” ব্রহ্মচর্য্যাই সর্ব্বপ্রথম অভিলষিত বলিয়া “ইষ্ট” একটি ব্রহ্মচর্য্যের নাম। শম দম তিতিক্ষা উপরতি সমাধি প্রভৃতি ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত সম্ভবই নহে। ধর্ম্ম ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত। দেবরাজ পুরন্দর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিয়া বিশ্বাধিকারে সমর্থ ও শতাধিক বৎসর ব্রহ্মচর্য্য পালনান্তে পরমার্থ লাভের অধিকারী হয়েন।

কাত্যা। ব্রহ্মচর্য্যের কি ইতর বিশেষ আছে?

ভর। আছে বৈ কি! এক, আমরণ ব্রহ্মচর্য্য পালন; অপর, যাবজ্জীবন গৌণ ব্রহ্মচর্য্য পালন। আমরণ ব্রহ্মচর্য্য পালনকারীর নাম নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। অষ্টবিধ মৈথুনাভাবই মুখ্য ব্রহ্মচর্য্য। অষ্টবিধ মৈথুন যথা—

“স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সংকল্পোঽধ্যবসায়শ্চ মৈথুনমষ্টলক্ষণং॥”

স্ত্রী বিষয় চিন্তাদিও ব্রহ্মচর্য্যের নাশক। নৈষ্ঠিক অর্থে ব্রহ্ম তৎপর।

যাবজ্জীবন গৌণ ব্রহ্মচর্য্য পালনকারীকে উপকর্ব্বাণ বলে। উপকুর্ব্বাণ ব্রহ্মচারী যথা—“যোঽধীত্য বিধিবদ্বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাচরেৎ” যথাবিধি বেদাধ্যয়নানন্তর গৃহস্থাশ্রমীর নাম উপকুর্ব্বাণ। ইঁহাদের পক্ষেই “ব্রহ্মচর্য্যং (মুখ্য ব্রহ্মচর্য্য) সমাপ্য গৃহী ভবেৎ, গৃহস্থঃ সদৃশীং ভার্য্যামুপেয়াৎ” তাহার পর ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন করতঃ শাস্ত্রীয় বিধিনিষেধ মানিয়া লইয়া গৃহস্থাশ্রম পালন করায় গৌণ ব্রহ্মচর্য্য পালন করা হয়। গৃহস্থই প্রধানাশ্রমী, কারণ গৃহস্থাশ্রমকে অবলম্বন করিয়াই সকল আশ্রমী জীবিত থাকে। উপকুর্ব্বাণ—উপকারক।

কাত্যা। গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্যেরও মুখ্য গৌণ আছে?

ভর। না, গুরুগৃহে মুখ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে হয়। গৌণ ব্রহ্মচর্য্য পালন গুরুগৃহে ব্যবস্থিত নাই তবে দেখ বৎস, নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণকারীর ত' কথাই নাই; গৃহস্থাশ্রমীও প্রথম গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবেন। তোমাকে এক্ষণে মুখ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন ও ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মগুলি যথাযথ ভাবে পালন করিয়া যাইতে হইবে।

কাত্যা। ছাত্রাবস্থায় গুরুগৃহে যে মুখ্য ব্রহ্মচর্য্য পালন, তাহার নিয়ম কি? ছাত্র ব্রহ্মচারীর গুরুগৃহে কর্ত্তব্য কি?

ভরদ্বাজ। ভিক্ষাচর্য্যাথ শুশ্রূষা গুরোঃ স্বাধ্যায় এব চ।
সন্ধ্যাকর্ম্মাগ্নিকার্য্যঞ্চ ধর্ম্মোহয়ং ব্রহ্মচারিণঃ॥

ভিক্ষাচর্য্য।

প্রত্যহ দৈনিক আহারোপযোগী খাদ্যদ্রব্য ভিক্ষা দ্বারা আহরণই ভিক্ষাচর্য্য। "ভৈক্ষঞ্চাহরশ্চরেৎ" ইহাই বিধি। গুরুকুলে এবং আপনার জ্ঞাতি ও বন্ধু-কুলে ভিক্ষা নিষিদ্ধ। ভিক্ষান্নে একাহারী, ব্রহ্মচারীর এই ব্রতরূপা বৃত্তি উপবাস তুল্য ফলপ্রদ বলিয়া শাস্ত্রে কথিত।

স্বাধ্যায়।

স্বাধ্যায়—বেদাধ্যয়ন। "স্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ" ব্রাহ্মণ বালকের গুরুমুখোচ্চারিত বেদ শ্রবণই কর্ত্তব্য। গুরুমুখোচ্চারিত বেদমন্ত্র অধিকতর শক্তি-সম্পন্ন হইয়া থাকে। গুরুমুখ হইতে অনুচ্চারিত বেদপাঠ কখনই বিধেয় নহে, কারণ তাহা নিষ্ফল বলিয়াই শাস্ত্রে উক্ত আছে। "শ্রোতব্যঃ" শ্রবণই বিধি। তাহার পর সেই শ্রুত বেদার্থ চিন্তনই মনন। মনন—বেদার্থ বিষয়ক তর্ক। শ্রুতানুকূল তর্কের প্রতিষ্ঠা আছে, আর শ্রুত বেদার্থ চিন্তারূপ তর্ক ঘটত্ব ঘটত্বাদি আনুমান কাণ্ডের অসার তর্ক নহে। এই অসার বিতণ্ডারূপ তর্ক ধর্ম্মপথের প্রতিবন্ধক। ধ্যেয় বস্তুতে চিত্তের যে স্মরণাত্ম প্রবাহ—তাহাই ধ্যান। উপাস্যে তদ্গত চিত্ততাই ধ্যানের লক্ষণ। "তৎপ্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানং" তৈলধারার মত অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি সন্মানরূপ ধ্যান দ্বারা সাধক পরমার্থ লাভে কৃতকৃত্য হয়েন। এই স্মৃতি সন্তানরূপ ধ্যানই ভাবনা প্রকর্ষে প্রত্যক্ষ দর্শনরূপত্ব প্রাপ্ত হয়—ইহাই রামানুজাচার্য্যের মত।

সাধ্যায়—জপ।

সাধ্যায় কথাটির আর একটী অর্থ জপ। ব্রহ্মরূপ বা ভগবদ্বিভূতিরই ধ্যান হইয়া থাকে। তদ্রূপ ব্রহ্মনামের বা মন্ত্রাদিরই জপ হইয়া থাকে। জপ—নাম বিষয়ক। নাম—শব্দ ব্রহ্ম। ওঙ্কারাদি ব্রহ্মের নাম। কালী দুর্গা কৃষ্ণ ব্রহ্মাদি পরমেশ্বরেরই নাম।

"স্বাধ্যয়ো জপ ইত্যুক্তো বেদাধ্যয়নকর্ম্মণি" বৈদিক মন্ত্র জপও স্বাধ্যায়।

শ্রদ্ধা।

বৎস কাত্যায়ন, শুশ্রূষা বুঝিবার পূর্ব্বে শ্রদ্ধা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ উপদেশ দিবার আছে। যদিও শ্রদ্ধা না থাকিলে বেদাধ্যয়ন বা গুরুগৃহাগমনে ছাত্রের প্রবৃত্তি জন্মিবার সম্ভাবনা নাই, তথাপি অনুশীলন দ্বারা শ্রদ্ধা বৃদ্ধি করা আবশ্যক। আস্তিক্য বুদ্ধিই শ্রদ্ধা—গুরু ও বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাসই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধা দ্বারাই গুরুসেবা সফল হয়; অতএব শুশ্রূষার পূর্ব্বে শ্রদ্ধার আবশ্যকতা আছে। এই শ্রদ্ধাই অনুশীলনের ফলে গুরু ভক্তিতে পরিণত হইতে পারে। বেদজ্ঞেরা ভক্তিকে শ্রদ্ধারই পরিণতি বা অবস্থান্তর বলিয়া জানিতেন, এই কারণে স্বতন্ত্র-ভাবে আর ভক্তির মহিমা কীর্ত্তন করেন নাই। শ্রদ্ধা না জন্মিলে বেদাধ্যয়ন সম্যক্ সফল হইবে না। বুদ্ধি মেধার আতিশয্য থাকিলেও শ্রদ্ধার অভাবে বেদার্থের সম্যক্ জ্ঞান না হইতে পারে। শ্রদ্ধা সহিত শুশ্রূষাই এস্থলে শুশ্রূষা।

শুশ্রূষা।

শ্রদ্ধা সহিত শুশ্রূষা দ্বারাই গুরুর পরিতুষ্টি। গুরুর পরিতুষ্টি ব্যতীত বিদ্যালাভ সম্ভব নহে। গুরু প্রসন্ন না থাকিলে শিষ্যের পরমার্থ তত্ত্বাধিগম্য অসম্ভব। গুরু রুষ্ট হইলে শিব অসন্তুষ্ট থাকেন। মনুষ্যরূপী হইলেও গুরুকে দেবতা জ্ঞান করিতে হইবে; দেবতা জ্ঞানেই শুশ্রূষা করিতে হইবে। বৎস, আমি তোমার উপর বড়ই প্রসন্ন। তোমার সিদ্ধি অচিরভাবিণী! তুমি দিব্যালোক প্রাপ্ত হইবে—ইহা আমি বেশ বুঝিতেছি। যাও, এক্ষণে নিদ্রাদেবীর সুশীতল ক্রোড়ে সুষুপ্তির ব্রহ্মানন্দ লাভ করগে, কল্য প্রভাত মধুময় হইয়া দেখা দিবে।

কাত্যা। শুশ্রূষার প্রকার কি?

ভর। প্রত্যহ গুরুর নিদ্রাভঙ্গের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ, গুরুর শয়নের পর শয়ন। যতক্ষণ না গুরুর নিদ্রাকর্ষণ হয়, ততক্ষণ ব্যজন পাদসংবাহনাদি কর্ত্তব্য। গুরুর আজ্ঞা পালনে ক্লান্তি বোধ করিবে না। ন্যায় অন্যায় হউক, আজ্ঞা পালনে কোন প্রকার দ্বিধা যেন চিত্তে কদাপি উদিত না হয়। গুরুর আজ্ঞা বলিয়া নহে, যে কার্য্য গুরুর অভিপ্রেত বলিয়া জানিবে বা যে কার্য্য করিলে গুরুর হিতকর হইবে, সে কার্য্য করিতে সর্ব্বদাই অবহিত রহিবে। গুরু নমস্কার, গুরুর প্রসাদ গ্রহণও প্রত্যহ কর্ত্তব্য। গুরু বসিবার আদেশ প্রদান করিলে পর তবেই তাঁহার সম্মুখে আসন গ্রহণ বিধি।

কাত্যা। গুরুগৃহে ব্রহ্মচারী শিষ্যের আর আর কি কর্ত্তব্য আছে, তাহার উপদেশ করুন।

ভর। একাকী কঠিন শয্যায় শয়ন। প্রত্যহ অবগাহন স্নান, মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য তাম্বুল, রস, নারী, এগুলি ব্রহ্মচারীর পরিত্যাজ্য। জীব হিংসা অকর্ত্তব্য, বিলাসাদি দ্রব্য ব্যবহার একেবারেই নিষিদ্ধ। ক্রোধ লোভ মদাদি আধ্যাত্মিক শত্রু দমনে তিলমাত্র আলস্য যেন না থাকে। ক্ষমাগুণের নিরন্তর আলোচনা, ক্রোধের পরিণাম ফল চিন্তনই ক্রোধ নাশের উপায়। তৃষ্ণার কখনও শেষ নাই, অভাব বোধের কখন বিরাম নাই, সন্তোষই সুখের কারণ, অসন্তুষ্টতা দুঃখের নিদান, ইত্যাকার ভাবনা লোভ বিজয়ের অস্ত্র। মানব জীবন ক্ষণভঙ্গুর, উন্নতি অবনতিতে মানবের কৃতিত্ব নাই, মানবীয় চেষ্টা দেবতার এক একটী অঙ্গুলি সঞ্চালনে ব্যর্থ হইতে পারে, ইত্যাদি চিন্তার অনুশীলন মদনাশক। ইন্দ্রিয়বিজয় মনোবিজয় সাপেক্ষ, মনোবিজয়ই প্রকৃত বিজয়। মনোবিজয়ের জন্য ভগবানের নাম স্মরণ, ঐহিক পারলৌকিক ফলে বিতৃষ্ণা, শমাদির অনুশীলন, বেদ পাঠ, ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান, ব্রহ্মচারী শিষ্যের করণীয়। জগতের নশ্বরত্ব বোধ বাসনা নিবৃত্তির উপায়, বাসনা নাশেই চিত্তের জয়।

সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম।

কাত্যা। সন্ধ্যাকার্য্যের কথা বলুন।

ভর। উপনয়নের পর হইতেই সন্ধ্যায় অধিকার; বৈদিক সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম। অকরণে প্রত্যবায়, করণে কোন ফল জন্মে না। নিত্যকর্ম্মের ফল কেহ বলেন আছে, কেহ বলেন নাই। যাঁহারা নাই বলেন, তাঁহাদের মতে প্রত্যবায় নাশার্থ ও চিত্ত শুদ্ধার্থই নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। আর যাঁহাদের মতে ফল আছে, তাঁহারা পাপের নাশ, ভগবৎ করুণার লাভের যোগ্যতা অর্জ্জনই নিত্য কর্ম্মের ফল বলিয়াছেন।

কাত্যা। যাঁহারা নিত্যকর্ম্মের ফল নাই বলেন, তাঁহারা যখন চিত্তশুদ্ধির নাশ জন্য নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠেয়তা প্রতিপাদন করেন, তখন উহাই—চিত্তশুদ্ধিই ত' ফল?

ভর। এই মতে চিত্তশুদ্ধি ফল নহে; ফল—যাহা প্রাপ্তব্য। স্বর্গ ও মোক্ষ দুইটী ফল, নিত্যকর্ম্মের দ্বারা স্বর্গফল জন্মে না। আর চিত্তশুদ্ধি ত' প্রাপ্তব্য নহে; প্রাপ্তব্য মোক্ষ। তবে মোক্ষফল বিষয়ে চিত্তশুদ্ধির উপযোগতা আছে।

যাহা উপযোগী তা'হা ফল নহে। পরমার্থতঃ স্বর্গাদি অপূর্ব্ব ফলই ফল। মোক্ষ স্বস্বরূপ বলিয়া ফলই নহে। ফলমিব ফলং এই কারণে মোক্ষ ফল। অজ্ঞান নিবৃত্তিরই নাম যখন জ্ঞান, তখন জ্ঞান প্রাপ্তব্য নহে বা ফল নহে, জ্ঞান স্বর্গাদির মত উপাদেয় নহে, এই কারণেই ফল হইতে পারে না। চিত্তশুদ্ধি নিত্যকর্ম্মের পরিণাম। ইহাকেই যদি ফল বল ত' আপত্তি নাই।

কাত্যা। আর যাঁহারা নিত্যকর্ম্মের ফল স্বীকার করেন, তাঁহাদের নিত্য-কর্ম্ম সম্বন্ধে অভিমত কি?

ভর। এ মতে দৈনন্দিন পাপ নাশই ফল। পাপই চিত্তের মলা। এই মলা পরিস্কার করা নিত্যকর্ম্মের সাধ্য। নির্ম্মল চিত্ত সাধকই জ্ঞান লাভের অধিকারী, বিশুদ্ধমনা ভক্তি রসিকই ভগবৎ করুণার পাত্র।

• কাত্যা। নিত্য ও কাম্যের স্বরূপতঃ পার্থক্য কি?

ভর। নিত্যকর্ম্মের ফলাফল সম্বন্ধে যতই কেন বিবাদ থাকুক না, ইহা স্থির যে, নিত্যকর্ম্মের ফল স্বর্গাদি নহে। স্বর্গাদি কাম্য কর্ম্মেরই ফল। একই কর্ম্ম নিত্য ও কাম্য। স্বরূপতঃ উভয়ের পার্থক্য নাই। স্বর্গাদি ফলের সংকল্প-পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাই কাম্য কর্ম্ম। আর যে কর্ম্ম সেরূপ স্বর্গাদি ফলে সংকল্পপূর্ব্বক করা হয় না, তাহাই নিত্য। কর্ত্তার মনোবৃত্তি অনুসারে কাম্য নিত্য বিভাগ। একই অগ্নিহোত্র যজ্ঞ কর্ত্তৃভেদে কাম্য ও নিত্য হইতে পাকে। ঈশ্বর পূজাও কাম্য ও নিত্য হইতে পারে। আবার কোন মতে নিত্য কর্ম্মই প্রকৃত ধর্ম্ম। এই নিত্যকর্ম্মের (সন্ধ্যাবন্দনাদির) ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার ফলই বিদ্যমান। ঐহিক পারত্রিক ফল আকাঙ্ক্ষা না করিলে চিত্তশুদ্ধি ফল হইবে।

কাত্যা। এই নিত্যকর্ম্মাদি দ্বারা জ্ঞান লাভ হয় কি?

ভর। এ সম্বন্ধে দুইটী মত আছে। একটী মত কর্ম্ম—অবিদ্যাসম্ভূত। ভেদজ্ঞান অবিদ্যার খেলা, আর ভেদজ্ঞান কর্ত্তা কর্ম্ম করণ ক্রিয়াদির জ্ঞান। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণাদি কারক আর ক্রিয়ার জ্ঞান ব্যতীত কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব নহে। তাহা হইলে এই অবিদ্যাদি কর্ম্ম কথনই অবিদ্যার নাশক হইতে পারে না। অবিদ্যা অজ্ঞান। অজ্ঞান আবরক বলিয়া অন্ধকার তুল্য। কর্ম্ম ও অজ্ঞান-সম্ভূত কর্ম্ম আলোক স্বরূপ নহে। অজ্ঞান সম্ভূত কর্ম্ম স্বীয় কারণ অজ্ঞানের নাশক হইতে পারে না; তবে চিত্তশুদ্ধি দ্বারা জ্ঞান লাভের প্রতি পরম্পরা কারণ।

দ্বিতীয় মত, নিষ্কাম কর্ম্ম—ধর্ম্ম। বিষ যেমন রাসায়নিক গুণে বিশুদ্ধ হইয়া বিষের নাশক হয়, কর্ম্মও তদ্রূপ অজ্ঞান নাশক হইতে পারে। যে কর্ম্ম অবিদ্যা বা অজ্ঞান নাশক, তাহা উপাসনাত্মক কর্ম্ম। উপাসনাত্মক কর্ম্ম ভাবনা প্রকর্ষে ভাবনাত্মক হইয়া অজ্ঞান নাশ করিবার শক্তি ধারণ করে। জনকাদি কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, উপাসনাত্মক কর্ম্ম দ্বারাই ভগবৎ করুণা লাভ ঘটে বলিয়া, কর্ম্মই অজ্ঞান নাশক বা জ্ঞানলাভের সাক্ষাৎ কারণ। যে মতেই যাও, নিত্যকর্ম্মের সার্থকতা আছেই। সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে কর্ম্মই সিদ্ধির কারণ।

কাত্যা। নৈমিত্তিক কর্ম্ম কি ?

ভর। পুত্রাদি জন্ম উদ্দেশ্যে মধ্যে মধ্যে যে ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা নৈমিত্তিক। কোন নিমিত্তকে উপলক্ষ্য করিয়া যে কর্ম্ম উপস্থিত হয়, তাহাই নৈমিত্তিক।

কাত্যা। তাহা হইলে কাম্য কর্ম্মও উৎকৃষ্ট নহে ?

ভর। নিত্য কর্ম্মের তুলনায় কাম্য অনুৎকৃষ্ট, কিন্তু আবার কর্ম্ম না করা বা কুকর্ম্ম অপেক্ষাও শতগুণে উৎকৃষ্ট।

কাত্যা। কামনা পূর্ব্বক কর্ম্মই যখন মহা ফলদ, তখন স্বার্থানুরোধেও নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। তবে লোকে কাম্যের অনুরাগী কেন ?

ভর। নিষ্কাম মুখের কথা নহে। সকামের ভাবে যাহারা আচ্ছন্ন, তাহারা নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী নহে। মানুষ ভোগ-লোলুপ, কামনার দাস; তুচ্ছ অনিশ্চিৎ ঐহিক কামনার জন্য মানব কত পাপ কর্ম্ম, কত কষ্টসাধ্য উপায়াবলম্বন করিতেছে; সেই মানবই যে নিশ্চিৎ পারত্রিক স্বর্গাদি ফলের আকাঙ্ক্ষা করিবে না, ইহা কি সম্ভব ? ঐহিক কামনার দাস হইয়া পারত্রিক নিষ্কামের অধিকারী হওয়া যায় না। অগ্রে ঐহিক কর্ম্মে নিষ্কাম ভাব অভ্যাস কর, তবে পারত্রিক নিষ্কাম ভাব আসিবে। ঐহিক কামনা পরিহার অপেক্ষা পারত্রিক কামনা পরিহার অধিক কৃতিত্বের পরিচায়ক। তবে যে কামনার দাস, যাহাকে নিষ্কাম কর্ম্ম করিতেছে বলিয়া বোধ কর, তাহা ভ্রান্তি মাত্র। কেহ পারত্রিক স্বর্গাদি ফলের উপর দৃঢ় বিশ্বাস ও গভীর শ্রদ্ধার অভাবে নিষ্কাম, কেহ বা কাম্য কর্ম্ম অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মই মহা ফলদ—এই বোধে কাম্য বর্জ্জন প্রয়াসী অর্থাৎ নিষ্কাম। এই উভয় প্রকার ব্যক্তির মধ্যে কেহই নিষ্কাম নহেন। প্রথম, অবিশ্বাসী, অশ্রদ্ধাল; দ্বিতীয়, অধিকতর সকাম।

অগ্নিকার্য্য।

কাত্যা। অগ্নিকার্য্য সম্বন্ধে উপদেশ দিউন।

ভক্ত। অগ্নিকার্য্য হোমাদি। ব্রহ্মচারীর পক্ষে সায়ংকাল ও প্রাতঃকালে হোম কর্ত্তব্য। "সায়ং প্রাতশ্চ জুহুয়াৎ অভিরগ্নিরতন্দ্রিতঃ" সমিধ আহরণ করতঃ সঘৃত সমিধঃ মন্ত্রপূত করিয়া হোমাগ্নিতে নিক্ষেপ সাগ্নিক গৃহস্থ ব্রাহ্মণের পক্ষেও ধর্ম্ম। বিল্বদলাদি হোমদ্রব্য আহরণ প্রত্যেক দিনই ব্রহ্মচারীকে করিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত হোমের ঐহিক ও পারত্রিক ফল সম্বন্ধে যাহা বলিবার পরে বলিব ; অদ্য এই পর্য্যন্ত। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামসহায় কাব্যতীর্থ (ভট্টাচার্য্য)।

ধর্ম্ম]

কৃষ্ণভক্তি-রস।

কৃষ্ণভক্তি-রস-ভাবিতামতি ক্রীয়তাম্ যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং জন্মকোটী সুকৃতৈঃ ন লভ্যতে।

সাধন ভজনে সিদ্ধিলাভের একমাত্র উপায় হইতেছে "কৃষ্ণভক্তি-রস-ভাবিতা-মতি"। আমাদের কৃষ্ণ বহির্ম্মুখমতি প্রাকৃত বিষয়-রসে মজিয়া আছে এবং সেই রসেই দিবানিশি ডুবিয়া থাকিতে চাই। তাই স্বয়ং শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাগুরু পরম ভাগবত রায় রামানন্দ সংক্ষেপে আসল কথাটী বলিতেছেন, জীবের একমাত্র পুরুষার্থ "সর্ব্বানন্দধাম প্রেম-চিন্তামনি" তাহাই যেরূপে হউক পাইতেই হইবে। বৈদ্যরাজ যেরূপ ভাবনা দিয়া ঔষধ প্রস্তুত করেন, সেইরূপ জীবের বিষয়-দুষ্ট চিত্তটীকে কৃষ্ণভক্তি-রসের ভাবনা দিয়া উহাকে একেবারে অণু পরমাণুতে অনুভাবিত (Saturated) করিতে হইবে। অপ্রাকৃত রস কিরূপ, আমরা বুঝি না, তবে প্রকৃত কাম মোহিত জীবের চিত্র হইতে তাহা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে। যখন দুর্ব্বল জীব কাম-রস ভাবিত হইয়া পড়ে, তখন তাহার দেহ মন বুদ্ধি একেবারে বিকল হইয়া দাঁড়ায়, উত্তমা বুদ্ধি বিগড়াইয়া যায়, শত বর্ষের সংযমী মন ক্ষেপিয়া উঠে, দেহখানিও কাম-পরতন্ত্র হইয়া একেবারে ইন্দ্রিয়ের গোলাম হইয়া পড়ে। তাই আমরা দেখিতে পাই স্বয়ং বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা কাম-মোহিত হইয়া ষণ্ডের ন্যায় নিজ কন্যার পশ্চাতে পশ্চাতে প্রধাবিত হইয়াছেন; ইন্দ্রচন্দ্রের কথাও ঐরূপ অকথ্য। আবার মহাযোগীন্দ্র সর্ব্বত্যাগী শম্ভুকেও মোহিনী

মূর্ত্তি দর্শনে বিকল করিয়া তুলিয়াছিল। সৌভারী ঋষির সহস্র বর্ষের তপশ্চরণ এক মুহূর্ত্তে কোথায় ভাসিয়া গেল। বাস্তবিক চিত্ত যখন রসভাবিত হইয়া যায়, তখন জীব সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্রতা হারাইয়া বসে, জীবের আত্ম-সংযমের শক্তি এক-কালে বিলুপ্ত হইয়া যায়, দেহে ইন্দ্রিয় সর্ব্বথা অবাধ্য হইয়া জীবকে কিম্ভূত-কিমাকার করিয়া তোলে। তাইতে এইত গেল প্রাকৃত কাম-রসের কথা। আমরা এই বিষয়-বিষ্ঠারসে মজিয়া আছি, কামের গোলাম হইয়া অবস্তুকে বস্তু করিয়া তুলিয়াছি, অকর্ম্মকে সুকর্ম্ম জ্ঞান করিতেছি, কোহিনুর ফেলিয়া কাচের পশ্চাতে ছুটিতেছি ; এই কামনার হাত হইতে মুক্তি পাওয়াও সহজ নহে। অন্য পরে কা কথা। অই শুন আমাদের সাধক চূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর সঙ্কেতে কি বলিতেছেন ;—

কামে মোর হত চিত, নাহি মানে নিজ হিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা

ভগবত কৃপায় এই প্রকৃত কামকে বেদখল করিয়া যখন অপ্রাকৃত কামদেব জীবের দেহ মন প্রাণকে অধিকার করিয়া বসেন, সেই কামমোহিত জীব তখন দেখিতে দেখিতে সম্পূর্ণ অন্যরূপ হইয়া দাঁড়ায় অপ্রাকৃত বস্তুর সঙ্গ গুণে একটি অপ্রাকৃত রসের অভ্যুদয় হয়। সঙ্গে সঙ্গে জীবের প্রাকৃত রস-দুষ্ট চিত্তেন্দ্রিয় কায় পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। মায়া দেবীর চতুর্দ্দশ পুরুষের অতি পুরাতন ভিতাটি ক্রমে ক্রমে বেহাত হইয়া যায়, কোথা হইতে এক অলৌকিক শক্তি আসিয়া তাহার দুর্ব্বল চিত্তকে সবল করিয়া তোলে, তাহার অশীতি লক্ষ জীবনের অতি মরমের বস্তুগুলিকে দূরে—অতি দূরে নিক্ষেপ করিতে থাকে, মায়া রচিত সুদৃঢ় সুবর্ণ শৃঙ্খল তখন টুক্ টুক্ করিয়া কাটিয়া ফেলে। সাধক তখন উর্দ্ধবাহু হইয়া প্রপন্ন-শরণ ভক্তবৎসল অপ্রাকৃত নবীন মদন শ্রীনন্দ দুলালের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

"কামাদীনাং কতি ন কতিধা পালিতা দুর্নিদেশা, স্তেষাং জাতা ময়ি ন করুণা ন ত্রপা নোপশান্তিঃ উৎসৃজ্যৈতানথ যদুপতে সাম্প্রতং লব্ধবুদ্ধি স্তামায়াতঃ শরণমভয়ং মাং নিযুঙ্ক্ষ্বাত্মদাস্যে।" হে প্রভো আমি আজীবন কামাদি রিপুগণের কত প্রকার দুর্ণিদেশ পালন করিলাম, কিন্তু তাহাতে আমার প্রতি তাহাদের দয়া লজ্জা বা বিরতি হইল না। সম্প্রতি আমার চোখের ঘোর ভাঙ্গিয়াছে, আমার সুবুদ্ধির উদয় হইয়াছে ; তাই তোমার অভয় চরণে শরণ লইলাম। আমি তোমার সেবক, তোমার সেবাকার্য্যে আমাকে নিযুক্ত কর।

আমাদের সাধনাকাশের ধ্রুবতারা শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর তাই রিপু জয়ের উপায় বলিয়া দিতেছেন ;—

কাম ক্রোধ লোভ মোহ,　　　মদ মাৎসর্য্য দম্ভ সহ,
স্থানে স্থানে নিযুক্ত করিব।
আনন্দ করি হৃদয়,　　　রিপু করি পরাজয়,
অনায়াসে গোবিন্দ ভজিব॥
কৃষ্ণসেবা কামার্পণে　　　ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে,
লোভ সাধু সঙ্গে হরি কথা।
মোহ ইষ্ট লাভ বিনে,　　　মদ কৃষ্ণ গুণগানে,
নিযুক্ত করিব যথা তথা॥
অন্যথা স্বতন্ত্র কাম,　　　অনর্থাদি যার নাম,
ভক্তি-পথে সদা দেয় ভঙ্গ।
কিবা সে করিতে পারে,　　　কাম ক্রোধ সাধকেরে,
যদি হয় সাধুজনার সঙ্গ॥
ক্রোধ না করে কিবা,　　　ক্রোধ ত্যাগ সদা দিবা,
লোভ মোহ এই ত' কথন।
ছয় রিপু সদা হীন,　　　করিব মনের ভিন,
কৃষ্ণচন্দ্র করিয়া স্মরণ॥
আপনি পলাবে সব,　　　শুনিয়া গোবিন্দ রব,
সিংহরবে যেন করিগণ॥

আকুমার ব্রহ্মচারী রাজপুত্র শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর নিজের জীবনে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, কামিনী-কাঞ্চন, মদ, মাৎসর্য্য, লোভ, মোহ, প্রতিষ্ঠা হইতে যদি পরিত্রাণ পাইবার বাসনা থাকে, তবে ভাই সেই অপ্রাকৃত কামদেব শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া দিবানিশি তাহার অভয় নামাশ্রয় কর। সিংহ গর্জ্জন শ্রবণে যেমন অন্য পশু পলায়ন করে, রিপুগণও গোবিন্দ রব সেই রূপে পলায়ন করিবে ; কিন্তু এই স্থলে পাতকোদ্ধারণ শ্রীচৈতন্যদেব সতর্ক করিয়া বলিতেছেন,—"হে জীব তোমাদের হৃদয় কন্দরে শার্দ্দূলাদি হিংস্র জন্তুগণ কতকাল ধরিয়া স্বেচ্ছামত বসবাস করিয়া আসিতেছে। দ্বাদশ বর্ষের উদ্ধকাল অবিরোধে ও অন্যের বিরুদ্ধ সত্ত্বে দখল করিতে থাকায় উহাতে ঐ শয়তানগণের উৎকৃষ্ট বিরুদ্ধ সত্ত্বের উদ্ভব হইয়াছে ; এক্ষণে সহজে উহারা ঐ অধিকার ত্যাগ করিবে কি জন্য ?"

যেমন বন্দুকের আওয়াজে শিকার ছাড়িয়া ব্যাঘ্র কিছু সরিয়া যায়, কিন্তু সুযোগ পাইলেই আবার ঘুরিয়া আইসে; সেইরূপ প্রাকৃত কাম অনাদি বহির্ম্মুখ জীব হৃদয়কে সহজে ছাড়িতে চায়না। তাই জগদ্গুরু সর্ব্ব মঙ্গলালয় শ্রীচৈতন্যদেব বিশেষ নির্ব্বন্ধ সহকারে বলিয়াছেন;—

"ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া কহে মোর গৌরধাম।
অনিন্দুক হৈয়া সদা লহ কৃষ্ণ নাম॥"

অনবরত কৃষ্ণ নাম লইবে আর কাহারও নিন্দা করিবে না। শাস্ত্রও ঠিক সেই উপদেশই দিতেছেন। "স্মর্ত্তব্যো সততং বিষ্ণু বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতুচিৎ সর্ব্বে বিধিনিষেধাস্যু রেতয়ো রেব কিঙ্করাঃ।"

নিখিল শাস্ত্রে যত বিধি ও নিষেধ আছে, এই দুইটী সেই সব বিধি-নিষেধের রাজা। বিধি—সর্ব্বদা বিষ্ণু স্মরণ করিতে হইবে, নিষেধ—কখন বিষ্ণুকে ভুলিবে না। "কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম একই বস্তু সচ্চিদানন্দ স্বরূপ।"

"নাম চিন্তামানিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্য রস বিগ্রহঃ
পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্তোঽভিন্নতান্নাম নামিনোঃ॥"

নাম নামী অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণ যেমন সর্ব্বাকর্ষ রসায়ন পূর্ণ শুদ্ধ নিত্য মুক্ত, নামও তাই; সুতরাং নাম করিলে তোমার নিকটে পাপ ঘেঁসতে পারিবে না।

"কৃষ্ণ সূর্য্য সম মায়া হয় অন্ধকার।
যাঁহা কৃষ্ণ তাঁহা নাই মায়ার অধিকার॥"

রোগের সুপরীক্ষিত অমোঘ ঔষধ পাওয় গিয়াছে, এই নাম শ্রবণ কীর্ত্তন হইতে অনর্থ নিবৃত্তি, তৎপরে ক্রমে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও প্রেমের অভ্যুদয় হইবে। কবিরাজ কৃষ্ণদাস গোস্বামী এইরূপে সাধন-ক্রমের পর্য্যায় নির্দ্দেশ করিয়াছেন,—

কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥
সাধু সঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধন ভক্তি হৈতে হয় অনর্থ নিবর্ত্তন॥
অনর্থ নিবৃত্তি হৈতে ভক্তে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণ প্রীত্যঙ্কুর॥

সাধক যখন সর্ব্বানন্দ ধাম প্রেমামৃতের আস্বাদন পাইতে থাকেন, তখন প্রকৃত

সুখভোগ তাঁহার নিকট নিতান্ত হেয়, ঘৃণ্য ও সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয় বোধ হয়। এই আসক্তি বৃদ্ধির সহিত সাধকের দেহ-ধর্ম্ম, লোক-ধর্ম্ম, বেদ-ধর্ম্ম, লজ্জা, মান, আদি সমস্ত চলিয়া যায়, ইহ পরকাল ধর্ম্মাধর্ম্ম সব সরিয়া পড়ে; সেই কৃষ্ণ-রস-ভাবিতামতির তখন কেবল মাত্র শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধ থাকে। সেই কৃষ্ণ-চন্দ্রই তখন তাঁহার জীবন কাঠি ও মরণ কাঠি। কখনও হাসাইতেছেন, কখনও আকাশে তুলিতেছেন, কখনও পাতালে ডুবাইতেছেন। ছাড়িবার উপায় নাই, বেচারি যে বড়িসায় বদ্ধ মৎস্যের ন্যায় প্রেমের দায়ে ঠেকিয়া পড়িয়াছে। মানবেরা যে তাঁহার মনটীকে বেহাত করিয়া লইয়াছে। সে যে অবুঝের মত দেহ মন প্রাণ সব বিকাইয়া ফেলিয়াছে। এই কৃষ্ণ-রস-ভাবিতামতিগণের সর্ব্বোত্তম চিত্রটী মানস-নেত্রে দেখিয়া রসাচার্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী অপ্রাকৃত রসের বিভিন্ন পর্য্যায়ের কিরূপ ক্রিয়া তাহাই প্রদর্শন করিয়াছেন। উজ্জ্বল নীলমণি গ্রন্থে এই কৃষ্ণ-ভক্তি-রসের চূড়ান্ত বিচার করিয়াছেন। কৃষ্ণকান্তা শিরোমণি মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী রাধাঠাকুরাণীর চিত্রে রস পরিণতির সর্ব্বোচ্চ দৃশ্য প্রকটিত হইয়াছে। রস শাস্ত্রে দশবিধ পর্য্যায় প্রদর্শিত হইয়াছে, যথা,—

লালসোদ্বেগ জাগর্য্যাস্তানেবং জড়িমা তনু।
বৈয়গ্র্যং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশাদশ॥

(১) লালসা, (২) উদ্বেগ, (৩) জাগরণ অর্থাৎ অনিদ্রা, (৪) কৃশতা, (৫) জড়িমা অর্থাৎ হিতাহিত জ্ঞান রহিত ও শ্রবণাদির জড়তায় ভাব, (৬) বৈয়গ্র্য অর্থাৎ দুর্ব্বার ক্ষোভ চিত্ত-চাপল্য, (৭) ব্যাধি অর্থাৎ ইষ্ট বস্তু অপ্রাপ্তি হেতু শরীরের পাণ্ডু বর্ণতা ও উষ্ণতা, (৮) উন্মাদ, (৯) মোহ, (১০) মৃত্যুর উদ্যম।

কৃষ্ণ-গৃহীত-মানসা শ্রীমতী রাধিকার চিত্রে উহা কিরূপ বিকসিত হইতেছে দেখুন; শ্যামের বাঁশরী যেমন বাজিল, অমনি শ্রীমতীর মন বঁধু দরশন আশে লালায়িত হইয়া উঠিলেন—"অপরূপ তুয়া মুরলীধ্বনি। লালসা বাঢ়ল শবদ শুনি॥" গুরুগঞ্জনা ও গৃহধর্ম্ম বাদিনী হইল, তাহাতে লালসার পরিপাক আরো বাড়িতে লাগিল, লালসা শেষে উদ্বেগে যাইয়া পৌঁছিল,—

"বাঁশী বাজে বিপিনে,　　　　চিতে না ধৈরজ মানে।
কিরূপে এরূপ দেখিয়া সেহ, উদ্বেগে ধান না ধরে দেহ॥"

উদ্বেগের মাত্রা অত্যন্ত বাড়িল, তখন দেহ-ধর্ম্ম বিদূরিত হইলে জাগরণ ও কৃশতা আসিয়া উপস্থিত হইল;—

"জাগিয়া জাগিয়া হইল ক্ষীণ, অদিত চাঁদের উদয় দিন।"

তদনন্তর সেই রোগটীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে হিতাহিত জ্ঞান লোপ হইল ও দুর্ব্বার ক্ষোভ আসিল।

"জড়িত হৃদয়ে করয়ে ভেদ, আউ বেয়াকুল কো সহে খেদ॥"

তারপর ব্যাধির লক্ষণ প্রকাশ পাইল,—

"পাণ্ডুর বদন বেয়াধি বাধা, মুরছি নিশ্বাস তেজল রাধা॥"

এই ত' সেই দশম দশা উপস্থিত হইল। এখন আবার রাধিকার জীবনের মমতা নাই—দেহেও প্রাণের লক্ষণ নাই ; এখন মৃতবৎ শ্রীমতীকে বাঁচাইবার ঔষধ কোথায় মিলিবে? তাই কবি জ্ঞানদাস বলিতেছেন যদি শ্রীমতীকে বাঁচাইয়া গোকুল রক্ষা করিতে চাও, তবে কর্ণমূলে শ্যামনাম কীর্ত্তন কর।

"অব যদি তুঁহু মিলন তায়, গোকুল মঙ্গল সবাই গায়।
জ্ঞানদাস কহে শুনহ শ্যাম, জীবন ওখদ তুহারি নাম॥

ইহাই কৃষ্ণভক্তি-রস-ভাবিতামতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পূর্ণতম চিত্র। ইহা কেবল মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীমতী কৃতই সম্ভবে ; অন্যেতে ইহার পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব। তাই কবি গাইয়াছেন,—

"ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নায়ক শিরোমণি।
নায়িকার শিরোমণি রাধা ঠাকুরাণী॥
প্রেমের স্বরূপ দেহ প্রেম বিভাবিত।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা জগতে বিদিত॥
কৃষ্ণনাম গুণ যশ অবতংস কাণে।
কৃষ্ণনাম গুণ যশ প্রবাহ বচনে॥
কৃষ্ণের বিশুদ্ধ প্রেম রত্নের আকর।
অনুপম গুণগান পূর্ণ কলেবর॥

ইহাই কৃষ্ণভক্তি-রস-ভাবিতামতির উজ্জ্বলতম চিত্র। তাই কবি বলিয়াছেন,—

কা কৃষ্ণস্য প্রণয়জনিভূঃ শ্রীমতী রাধিকৈক কা।
কাস্য প্রেয়স্যনুপমগুণা রাধিকৈক কা ন চান্যা॥

শ্রীবামাচরণ বসু।

দিব্যজ্ঞান।

১।— অনাদ্যন্ত কাল স্রোতে চলিয়াছি ভেসে,
কোথায় গন্তব্য পথ নাহি জানি হায়।
মিশিব কোথায় গিয়া কি আছে গো শেষে;
এ পারের পরপারে কি আছে সেথায়?

২।— ঐ যে আসিছে নিশি নিবিড় আঁধার,
অস্তমিত যায় ক্রমে জীবন তপন।
ঘন অন্ধকারে ঢাকে ভাব একবার;
পথের সম্বল কিবা লইয়াছ মন?

৩।— অনিত্য সুখেতে মজে ভুলে আছ মন,
চাহ নাই নিত্যসুখ ভ্রমে একবার।
কি যেন হ'লো না বলে কাঁদিবি তখন;
ত্যজিতে হইবে যবে পুত্র পরিবার।

৪।— দারা পুত্র ধন জন বিষ সম সুধা,
পরিও না সাধ ক'রে মায়ার শৃঙ্খল।
মিটিবে না—মিটিবে না কভু ভব ক্ষুধা;
পরিণাম ভয়াবহ লাভ অশ্রুজল।

৫।— ভাল যারে বেসেছিলি আপনা ভুলিয়া,
ধরিয়া রাখিতে কেন পারিলে না মন।
কেন তোরে একা ফেলি গেল সে চলিয়া;
কেন তুই সঙ্গে তার গেলি না তখন।

৬।— এইরূপে কর্ম্মক্ষেত্রে আসে প্রাণীকুল,
কর্ম্ম সাঙ্গ হ'লে পরে কোথায় লুকায়।
মায়া কুহকিনী ছলে না পাইয়া কুল;
আত্মীয় স্বজন কাঁদি ধুলাতে লুটায়।

৭।— দেখে শুনে ঠেকে তবু ঠকিতেছ মন,
হায় তোর ব্যবহারে মন প্রাণ জ্বলে।
না জানিলি এখন(ও) রে কিবা নিত্যধন;
এখন(ও) ভুলিয়া আছ কুহকিনী ছলে?

৮।— এসেছিলে দেহ লয়ে তাও যাবে ফেলে,
সে পথের সাথী কেহ হবে না রে তোর।
নাম সুধু লয়ে যায় শান্তিমাখা কোলে;
অতএব নাম গানে হওরে বিভোর।

৯।— সত্য বটে নামধারী রহে অন্তরালে,
নাম তো লুকায়ে নাহি রে মন অজ্ঞান।
হরিহর নাম তাঁরি সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে;
নামের গুণেতে লভ' শাশ্বত নির্ব্বাণ।

১০।— এস তুমি মম বশে রে অবাধ্য মন,
বিজলির মত দেখি তোরে যে চঞ্চল।
হের আত্মারামে তব সাধনার ধন;
স্থির হও ক্রমে তুমি পাবে শক্তি বল।'

১১।— মন প্রাণ এক করি ডাক সদা তাঁরে,
ভক্তি প্রেম ভিক্ষা বারি লহ তাঁর কাছে।
অদেয় তাঁহার জীবে কিছু তো নাহি রে;
যাহা চায়, তাই পায়, যেই যাহা যাচে।

১২।— এ ধরায় যাহা দেখ ইন্দ্রজাল প্রায়,
এই আছে এই নাই এই যায় চলে।
লীলাময়ী করে লীলা এই রঙ্গে হায়;
দৃঢ় করি ধর তাঁর চরণ যুগলে।

১৩।— মানবে বাসিলে ভাল কি করিবে তারা,
না হয় কাঁদিবে গিয়া শ্মশান পর্য্যন্ত।
নাম ভালবাস—হও নামে আত্মহারা;
নাম তোরে দেখাইবে কোথা আদি অন্ত।

১৪।— না যাইবে সঙ্গে তোর আত্মীয় স্বজন,
না যাইবে সঙ্গে তোর বর-বপুখান;
না যাইবে সঙ্গে তোর বিলাস ভবন,—
নাম সঙ্গে যাবে নামে লভিবে নির্ব্বাণ।

শ্রীমতী মানময়ী দেবী।

কাম]

অন্বেষণ

শৈশবে

শিশুকালে, সকল ভুলে,
মায়ের কোলে খেতাম দোল।
নিদ্রা আহার, ভিন্ন কিছু—
ছিল নাকো গণ্ডগোল ॥
বুকে বুকে, হাতে হাতে,
ছিল কেবল যাতায়াত।
একই সুরে, একই ভাবে,
কাট্‌তো ওগো দিবস রাত ॥
কেবল আদর, কেবল চুমু,
এই ত' ছিল ভোগ বিলাস।
জোয়ার ভাঁটা, ছিল নাক',—
সমান ভাবে বারমাস ॥
সকল চেয়ে সুখের ছিল,
লক্ষ্মী আমার মায়ের কোল।
আর কিছু নয়, চারিদিকে—
ছিল কেবল হাসির রোল ॥

জেগে জেগে, ফ্যাল্ ফেলিয়ে,
চক্ষু আমার দেখতো কা'য়।
বল্‌তো সবাই, দৃষ্টি আমার,
ছিল কেবল মায়ের পায় ॥
ঘুমিয়ে কত কান্না হাসি,
দেখা দেখি ছিল মোর।
বুঝতো সবাই, সেটা কেবল,
কোমল প্রাণের একটু ঘোর ॥
আমি কিন্তু এখন ভাবি,
উদাস ভাবে কাঁদা হাসা।
কিম্বা ত্রাসে শূন্য ভাবে—
নয়ন দুটীর চমক ভাসা ॥
সবই ওগো তোমার তরে,
বিশ্ব পিতা, দয়াময় !
বুঝতো না কেউ আমার দৃষ্টি,—
ছিল যে গো বিশ্বময় ॥

কৈশোরে।

কিশোর যখন নিত্যই নূতন,—
খেলার কত ছিল ধুম।
আলোক আঁধার, ছিল না জ্ঞান,
ছিল নাক' বেশী ঘুম ॥
কেবল খেলা, দিনের বেলা,
রাত্‌টা যদি হ'তো দিন।
মনের সুখে, প্রাণটা ভরে,
খেলেই না হয় হ'তাম ক্ষীণ ॥

বাবা মায়ের কত আদর,
খাবার কত রং বেরং।
কিছুতেই আশ, মিটতো না'ক
ছিল কত রকম ঢং ॥
আজ যদি খাই ক্ষীরের বাটী,—
কাল্‌কে সেটা তীব্র বিষ।
হরিষে বিষাদ আসি,—
দুঃখ দিত অহর্নিশ ॥

আজ্‌কে নূতন জুতার বাহার,
কাল্‌কে কাপড় নূতন তর।
কখন সাহেব, কখন বাবু,
পোষাক কত অভিনব॥
বাপ মা ভাবে, তাঁদের ছেলে,
হাকিম হবে হ'লে বড়।
ছেলে কিন্তু, নিজের তালে,
গুণ্ডামিতে বড়ই দড়॥

কখনও বা অল্পে খুসী,
কখনও কিছুতেই নয়।
অতৃপ্তি চাঞ্চল্য শুধু,—
সদাই রাজে মনোময়॥
ছেলের নামে কাটে সেটা,
সবাই ভাবে কিছুই নয়।
আমার প্রভু! প্রাণের কথা,
তোমার তরে সকল হয়॥

যৌবনে

সকল দশার এইটে সেরা,
বিভোর সদা মদিরায়।
ঈর্ষা, দম্ভ, যতেক সখা,
তোষামোদে মন যোগায়॥
কাম, ক্রোধাদি, যতেক বন্ধু,
দিত সদাই উৎসাহ।
বস্‌লে পরে উঠিয়ে দিত,
ঢাল্‌তো সুখের প্রবাহ॥
পিতা মাতার সকল আদর,
মনে হ'তো উৎপীড়ন।
ইচ্ছা হ'তো ক'রে ফেলি,—
মাতৃ-দুগ্ধ উদ্গীরণ॥
একটি কোমল হাতের স্পর্শ,
একটু খানি মিষ্ট স্বর।
ছিল আমার ইষ্ট মন্ত্র,
কাঁপিয়ে দিত থর থর॥
কখনও বা নেশার ঝোঁকে,—
শূন্য হ'তো জীবন ভার।
কখনও সুমিষ্ট হ'তো
দুর্বিসহ এ সংসার॥

শাস্ত্র কথা বিভুর নামে,
তুল্‌তো প্রাণে তুমুল গোল।
মনে হ'তো, সবই মিথ্যা,
ব্রহ্মাণ্ডটা কেবল ভোল॥
সুখ শয্যা নারীর সঙ্গ—
বিলাসিতা মিথ্যাচার।
প্রাণের চেয়ে লাগ্‌তো ভাল,
ছিল না আচার বিচার॥
বিধবা বিবাহ চাই,
জাতীয়তা কিছু নয়।
সমাজটা নির্ব্বোধের কৃতি,
কর্‌তে হবে এইটে লয়॥
সবার শেষে এক নিরাশা,
দুঃখ দিত হৃদয়ে।
মনটা তখন, ক্ষুদ্র হ'তো
অনুতাপে, সভয়ে॥
সেই অতৃপ্তি রাজ্যমাঝে,
ভ্রমণ করি শূন্য চিতে।
হাহাকারে ঘুরে মরি,
(কেউ) ছিল না সান্ত্বনা দিতে॥

কি আকাঙ্ক্ষা, কি দুরাশা,
ছিল যে গো অন্তরে।
হ'তো না স্থির, সবাই বধির,
শুনতো না কেউ প্রাণ ভোরে॥
এখন আমি, বুঝতে পারি,
কোথায় ছিল দৃষ্টি মোর।
প্রাণসখা! দীনবন্ধু!
তুমিই ছিলে হৃদয়-চোর॥
তোমার দেখা পেলে প্রভু,
পূর্ণ হ'তো পিপাসা।
দুঃখ দিতে না পারিত,
অতৃপ্তি আর নিরাশা॥

অন্ধকারে তোমার তরে,
যেথায় সেথায় ঘুরেছি।
প্রাণের বন্ধু ভুলে গিয়ে,
শত্রু ঘরে এনেছি॥
সুখ ব'লে দুঃখের বোঝা,
মাথায় তুলে নিয়েছি।
অবশেষে দুঃখের চাপে,
মাথার বোঝা ফেলেছি॥
কোথাও তোমার, পাইনি সাড়া,
শূন্য ছিল মনোময়।
হ'য়েছিনু লক্ষ্মীছাড়া,
তোমার জন্যে দয়াময়॥

বার্দ্ধক্য।

বছর কতক কেটে গেলে,
এই দশাটি আশে হায়।
রক্ত শীতল শিথিল চর্ম্ম
দন্তগুলি পড়ে যায়॥
শক্তিহীন হস্ত চরণ,
বইতে নারে দেহের বোঝা।
বক্রগতি স্বল্প দৃষ্টি,—
দাঁড়াতে পারে না সোজা॥
রাজনীতি পূরিত মাথা,
পারি না বুঝিতে সব।
পূর্ব্ব কথা মনে হলে,
মনে হয় সব অভিনব॥
আত্মীয় রক্ষিত অর্থ,
ভ্রমেতে লুকাই পাছে।
যাহা পাই, তাই দখল করি,
দিই না কারে যতই যাচে॥

পেন্সনের পঞ্চাশ মুদ্রা,
গিন্নীর হাতে দিই ফেলে।
শুষ্ক অন্ন, জীর্ণ বস্ত্র,
কাটে দিন হেসে খেলে॥
সন্ধ্যাবেলা হুঁকা হস্তে,
বসি বাটীর বাহিরে।
দু'চার বুড়া ইয়ার জুটে,
নিন্দা কার প্রাণ ভ'রে॥
সন্ধ্যা শেষে শয্যাপাশে,
স্মরণ করি 'ঈশ্বরে'।
পাছে বুকের রক্ত অর্থ,
চুরি করে তস্করে।
সবাই ভাবে সকল অভাব,
পূর্ণ আমার জীবনে।
হায় অদৃষ্ট! অভাব আমার,
সঙ্গী জীবন মরণে।

কি আকাঙ্ক্ষা চিত্তে আমার,
সদানন্দ কোন খানে।
বুঝতে নারি বিপদ ভারি,
কোথায় আমার প্রাণ টানে।
ঐশ্বর্য্য সম্পত্তি মাঝে,
কোথায় কারও নাই সাড়া।
অতৃপ্তি যত বিনাশী,
হয় না সে আমা ছাড়া॥

বিশ্বপিতা হে দয়াময়,
কর দয়া অভাগায়!
রাঙ্গা দু'টী রতন বুঝি,
রাখহ আমার মাথায়॥
ঐ দু'টী রতন বুঝি,
খুঁজে মরি জনম ভোর।
কবে যে সেদিন হবে,
জান না কো মনচোর॥

শ্রীশরচ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

অর্থ]

প্রস্থান-ভেদ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

নাস্তিক দগেরও * নানা প্রস্থান তাঁহাদের শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তন্মধ্যে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ চারিভাগে বিভক্ত। (১) শূন্যবাদী বা মাধ্যমিক, (২) ক্ষণিক বিজ্ঞান-বাদী যোগাচার, (৩) বিজ্ঞানকারের বাহিরের পদার্থের অনুমেয়বাদী সৌত্রান্তিক, (৪) বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ ও স্বলক্ষণ ক্ষণিক বাহ্যার্থবাদী বৈভাষিক। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে ভগবান বুদ্ধদেবের উপদেশ একমাত্র 'সকল শূণ্য' ও 'সকল বস্তু ক্ষণিক' এই মতেই সকলের মতের পর্য্যবসান চরম উদ্দেশ্য। দুঃখময় সংসারে সুখ-খদ্যোতের তিমিরে আলোক অনিত্য দেখা যায়! বৈষয়িক সকল বিষয়েরই পূর্ব্বাপর ভাবক-দুঃখ বিদ্যমান রহিয়াছে। কেবলমাত্র সর্ব্বান্তর্যামী পরমেশ ভগবানের আরাধনাতেই নির্ব্বিশেষ সুখ পাওয়া যায়; ইহাই সকল দার্শনিকের মত। এই বিষয়ে অর্থাৎ সাংসারিক কার্য্য-সমূহের পরিণাম ও আরম্ভে দুঃখ অনিবার্য্য হেতু নারায়ণাবতার ভগবান বুদ্ধদেব উপদেশ দিয়াছেন যে, সকল বস্তুই দুঃখের সাধন বা কারণ, দুঃখের আকর, দুঃখময় এইরূপ

* "অস্তি নাস্তিদিষ্টংমতিঃ" পাণিনি সূং (৪ ৪—৬৩)
"না স্তকো বেদ-নিন্দক" মনুঃ (২-১১)
"লোকায়তা বদন্ত্যেবং নাস্তিদেবা ন নিবৃত্তিঃ" (ষড়দর্শন সমুচ্চয়ঃ)
"লিঙ্গার্চ্চনপরাঃ শৈবা নাস্তিকাঃ সম্প্রকীর্ত্তিতাঃ" (মধ্বাচার্য্য)
"অথান্তত্রাপ্যুক্তং সম্মোহোভয়ং নাস্তিক্যমজ্ঞানং" (মৈত্র্যুপনিষদ্)

ভাবনা করিবে, যাহাতে বিমলানন্দ বিশুদ্ধ বিজ্ঞান প্রবাহের উদয় হয়। সকল দুঃখ সকল সুলক্ষণ, সকল ক্ষণিক, সকল শূন্য, চারিটি তত্ত্ব বা আর্য্য-সত্ত্ব বুদ্ধদেবের উপদেশ।* যদিও ভগবান্ বুদ্ধদেব একরূপই উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু শিষ্য বা বিনেয়গণের বোধশক্তির তারতম্যে চারি শ্রেণীতে তাঁহারা বুদ্ধের উপদেশের বিভাগ করিয়া বুঝিয়াছেন যে, অনেক সময় একার্থবাচক শব্দের প্রয়োগ হইলেও বোদ্ধৃগণের বুদ্ধি-ভেদে অনেক প্রকার অর্থবোধ হয়। যেরূপ এই বিশাল কলিকাতা নগরীতে প্রত্যূষে যদি কেহ তারস্বরে বলে—"রাত্রি প্রভাত হইয়াছে" ইহাতে স্বাস্থ্যহীন বিলাস-সর্ব্বস্ব কতিপয় ধনী বুঝিবে যে, আটটা পর্য্যন্ত ঘুমাইব, তবে আরও তিন ঘণ্টা থাকী আছে। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণ বলিয়াছেন যে, প্রভাতের নিদ্রা ও মধ্যাহ্ন-নিদ্রা উভয়ই আয়ুঃক্ষয়কারী।† অধ্যয়নশীল বালকগণ বুঝিবে আমাদের শীঘ্র পাঠাভ্যাসের প্রয়োজন, যেহেতু ১০টার মধ্যে দৈনিক পাঠ ও স্নানাহার প্রভৃতি সমাপন করা চাই। যাঁহারা প্রত্যহ প্রাতে স্নান করেন, তাঁহারা জানিবেন শীঘ্র শৌচাদি কার্য্য শেষ করিয়া গঙ্গায় যাইতে হইবে। যাঁহারা সমস্ত রাত্রি জাগিয়া অল্প বেতনে আপিসে কার্য্য করেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, একটুকু বিশ্রামের সময় আসিয়াছে। ইহাদ্বারা বুঝা গেল যে, বাক্য এক হইলেও বোদ্ধৃগণের বহু উদ্দেশ্য হওয়াতে, নানা অর্থও গৃহীত হয়। এস্থলে বুদ্ধদেবের মুখ্য উপদেশ শূন্যবাদ ও ক্ষণিক বাদ। কিন্তু শিষ্যগণের মধ্যে মাধ্যমিক বা মহাযানিক সম্প্রদায় অর্থাৎ সর্ব্ব শূন্যবাদীই শ্রেষ্ঠ ও সাক্ষাৎ গুরূপদিষ্ট বলিয়া বোধ হয়। কোন কোন বৌদ্ধ বাহ্য পদার্থ শব্দাদি বিষয়ের এবং আন্তর পদার্থ রূপাদি স্কন্দ বিষয়ের অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক বাহ্য ও আন্তর এতদুভয় পদার্থই মিথ্যা বা শূন্য। এইরূপ উপদেশ লাভ করিয়া যাঁহারা ভাবনা করিয়াছেন, তাঁহারা শূন্যবাদী বা মাধ্যমিক মহাযান সম্প্রদায়। অন্য এক শ্রেণীর বুদ্ধোপদিষ্ট শিষ্য, ইঁহারা 'বিজ্ঞান মাত্রই' সৎ, এইরূপ জ্ঞান ও ভাবনা-পরায়ণ এবং উপদিষ্ট বিষয়ে যোগ ও আচরণ এই উভয় সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া ইঁহাদের নাম 'যোগাচার' হইয়াছে। অপর এক শ্রেণীর শিষ্য, উপদিষ্ট বিষয় সত্যও বটে,

---

* "দুঃখ সমুদায় নিরোধ মার্গচত্বার আর্য্যস্য বুদ্ধাভিমতানি তত্বানি" (সর্ব্ব দং সং বৌদ্ধ দং)

† "আয়ুক্ষয়ী দিবানিদ্রা দিবা স্ত্রী পুণ্যনাশিনী" (ধর্ম্মশাস্ত্রম্) দ্রষ্টব্য (চরক সংহিতা অষ্ট ঙ্গ হৃদয়ঃ) "দিবাশয়া ন মে পুত্র গুর্ব্বিণী নানুসেবস্তে" (মহাভারত)

মিথ্যাও বটে, এবং বাহ্য ও আন্তর পদার্থ বিজ্ঞেয় এবং অনুমেয়, এইরূপ চিন্তা-পারায়ণ বৌদ্ধগণের নাম "বৈভাষিক" হইয়াছে। যেহেতু ইহাঁরা গুরূক্ত বিষয়ের সত্য মিথ্যা, বিজ্ঞেয় অনুমেয় রূপে 'বিকল্প' বা বিভাষা করিয়াছেন। অন্য সম্প্রদায়ের নাম 'সৌত্রান্তিক',—ইহাঁরা গুরূপদিষ্ট সূত্রের অন্ত বা শেষ ভাগ ধরিয়া প্রশ্ন করিয়াছিলেন; এইজন্য ভগবান্ তথাগত দেব তাঁহাদিগকে 'সৌত্রান্তিক নামে সংজ্ঞিত হও এই বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলিয়া থাকেন, যে সকল বস্তু স্বপ্নাবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়; জাগ্রতাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না; এবং যে সমস্ত বস্তু জাগ্রতাবস্থায় দৃষ্ট হইয়া থাকে, স্বপ্নাবস্থায় তাহার কিছুই দেখা যায় না। আর সুষুপ্তি দশায় কি জাগ্রত, কি স্বপ্ন এই উভয়ের কিছুই প্রকাশ পায় না। ইহাতে বিলক্ষণ প্রতীত হইতেছে যে, বস্তুতঃ কি জাগ্রত, কি স্বপ্ন, কিংবা সুষুপ্তি দশা এই অবস্থাত্রয়ের মধ্যে প্রতিভাত কোন বস্তুই সত্য নহে। যদি সত্য হইত, তবে এই তিন অবস্থায় এক বস্তুর সমান ভাবে প্রতীতি হইত। বাহ্য বস্তু মাত্রেই অলীক, একমাত্র ক্ষণিক বিজ্ঞানাত্মাই সত্য। বিজ্ঞান দুই প্রকার, প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান ও আলয় বিজ্ঞান।* জাগ্রত এবং সুষুপ্তি অবস্থায় যে জ্ঞান জন্মে, তাহাকে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বলে, সুষুপ্তি দশায় যে জ্ঞান হয়, তাহার নাম আলয়-বিজ্ঞান; অর্থাৎ সকল অবস্থায় 'অহং অহং' এইরূপ অববোধ হইলে, তাহাই আলয়-বিজ্ঞান। আ=সম্যক্ রূপে সকল ক্ষণিক বস্তুর যে লয় প্রাপ্তি ঘটে, তাহাই আলয়-বিজ্ঞান: ইহা আন্তর পদার্থ।

প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান বাহ্য বস্তুর অভাবেও 'এই নীল বস্তু' 'এই পীত বস্তু' এই-রূপ জ্ঞান হয়। কিন্তু আলয়-বিজ্ঞান কেবল আত্মাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে। অপর এক শ্রেণীর (বৈভাষিক) বৌদ্ধগণ বলিয়া থাকেন, বাহ্য বস্তু সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ।† নারায়ণাবতার ভগবান্ বুদ্ধদেবই বৌদ্ধধর্ম্মের উপদেষ্টা। কল্পভেদে অনেকেই বিজ্ঞান, বিবেক, কারুণ্য, বৈরাগ্য ও মৈত্রী প্রভৃতির উপদেশের নিমিত্ত বহুবার বুদ্ধদেবের আবির্ভাব হইয়াছে। সাধন-

---

(*) "তৎ স্যাদালয় বিজ্ঞানং যদ্ভবেদহমাস্পদং। তৎ স্যাৎ প্রবৃত্তি বিজ্ঞানং যন্নীলাদিক-মুল্লিখেৎ॥" (ধর্ম্মকীর্ত্তিঃ)

(†) শ্রীভগবত্তত্ত্বপূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বাবিংশ অবতারের মধ্যে একবিংশ অবতার বলিয়া বুদ্ধদেবকে অভিহিত করিয়াছেন। পুরাণাদিতে দশম অবতারের মধ্যে নবম অবতার উক্ত হইয়াছেন।

মালা তন্ত্রের মতে এই গৌতম বুদ্ধের পূর্ব্বে আদি বুদ্ধ "অমিতাভ বুদ্ধ" দেহ পরিগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজ্ঞান-বিরহিত দুঃখ, যন্ত্রণা, শাঠ্য, কাপট্যময় সকল বিষয়কেই ক্ষণভঙ্গুর জানিবে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এই দ্বাদশ আয়তনাত্মক দেহকে যথালব্ধ ধনাদি দ্বারা ও উত্তমরূপে শুশ্রূষা প্রভৃতির দ্বারা রক্ষা করাই প্রধান কর্ম্ম। দেবতা ভগবান্ সুগতদেব, পরিদৃশ্যমান জগত ক্ষণভঙ্গুর, প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রমাণ। এবং দুঃখ, আয়তন (দুঃখের আধার শরীর), সমুদয়, (বাহ্য পরমাণুপুঞ্জ ও আন্তরিক পদার্থ) মার্গ এই চারিটি তত্ত্ব; বিজ্ঞান-স্কন্দ, বেদনা স্কন্দ, সংজ্ঞা-স্কন্দ, সংস্কার-স্কন্দ, রূপ-স্কন্দ, এই পাঁচটী স্কন্দকে দুঃখ-তত্ত্ব কহে। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটী, এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য বিষয় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, এই পাঁচটীকে মন ও ধর্ম্মের আয়তন বুদ্ধিকে "দ্বাদশ আয়তন তত্ত্ব" বলা হয়। মানবগণের বিষয়ের সম্বন্ধে স্বাভাবিক যে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি জন্মিয়া থাকে, তাহাদিগকে 'সমুদয়-তত্ত্ব' কহে। সকল সংস্কারই ক্ষণমাত্র স্থায়ী, এইরূপ স্থির-বাসনার নাম 'মার্গ-তত্ত্ব'; এই মার্গ-তত্ত্ব মোক্ষের নামান্তর। চর্ম্মাসন, কমণ্ডলু, মুণ্ডন, যতি-বেশ, সূচী-বিদ্ধ বস্ত্রপরিধান, চীরধারণ, ব্রহ্মচর্য্য, পূর্ব্বাহ্ন ভোজন, সঙ্ঘবদ্ধ, (সমূহা-বস্থান) পীত ও রক্তবস্ত্র ধারণ এই কয়েকটী বৌদ্ধগণের যতিধর্ম্মের অঙ্গস্বরূপ। সুখ দুঃখাদির বোধ হওয়াকে 'বেদনা-স্কন্দ' বলে। চৈত্র, মৈত্র, গো, অশ্ব ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণে যে প্রতীতি হয়, তাহাকে 'সংজ্ঞা-স্কন্ধ' বলে। এই সকলের বাসনা ও রাগ দ্বেষাদিরূপ ক্লেশ এবং উপক্লেশ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মকে 'সংস্কার-স্কন্দ' বলে। সকল বিষয়ের জ্ঞান চিত্তে বা মনে হয় বলিয়া তাহাকে 'বিজ্ঞান-স্কন্দ' বলে। বিজ্ঞান-স্কন্দ ভিন্ন অপর চারিটী স্কন্দ চৈত্য অর্থাৎ বিজ্ঞান-প্রবাহ। এই প্রবাহের অন্তর্গত সকল চৈত্য-বস্তুই "রূপ-স্কন্দ" নামে অভিহিত হয়। অন্তর্জগতের সকল বস্তুই চিত্ত-চিন্তাত্মক; তাহার কারণ কেহ কেহ উক্ত পঞ্চ স্কন্দ বিষয় যুক্ত ইন্দ্রিয়কে "রূপ-স্কন্দ" বলেন।

"ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সম্মোহায় সুরদ্বিষাং। বুদ্ধো নামাঽঞ্জনসুতঃ কীটকেষু ভবিষ্যতি"॥ ভাঃ ১ স্ক, ৩ অ, ২৫ শ্লো।

"চরণাদ্রিং সমারভ্য গৃধ্রকূটান্তকং শিবে। তাবৎ কীটক দেশস্তান্তদন্ত মগধোভবেৎ"॥ (তন্ত্র)

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের বাঙ্গালা ব্যাখ্যায় বৌদ্ধদর্শনের বিষয় বিশদরূপে লিখিতেছি। অতএব এখানে অতি সংক্ষেপেই বলিলাম। মাধ্যমিক বৃত্তি ও অষ্টসাহস্রিকাতে এই দর্শনের মত বর্ণিত আছে।

(মূলং) "তথা দেহাত্মবাদে নৈকং প্রস্থানং চার্ব্বাকাণাং, এবং দেহাতিরিক্ত দেহ পরিমাণাত্মবাদেন দ্বিতীয়ং প্রস্থানং দিগম্বরাণাম্" ।

চার্ব্বাকদর্শন*—এই দর্শন আর্য্য দার্শনিকগণের মতে নাস্তিক দর্শন বলিয়া খ্যাত। চার্ব্বাকদর্শনের পূর্ব্বে বৃহস্পতি এই মতের সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় আস্তিক দর্শনের সঙ্গে পাশাপাশি ভাবে স্বীয় মতে নাস্তিক দর্শনও চলিয়া আসিতেছে। আমরা উপনিষদের† কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে উভয় বাদের অস্তিত্ব দেখিতেছি। মহাভারতে‡ এইরূপ আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায় যে, "অতি পূর্ব্বকালে চার্ব্বাক নামক কোন এক অসুর কঠোর তপস্যা করত ভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রীত করিয়া তাঁহার নিকট বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে, 'সকল ভূতে অভয় লাভ করা'; তদনুসারে কমলানন ব্রহ্মা উক্ত অসুরকে ব্রাহ্মণের অবমাননা ভিন্ন অপর সকল ভূতে অভয় প্রদান করিলেন। ব্রহ্মার বর লাভ করিয়া দৈত্যেশ্বর চারিদিকে অতিশয় উপদ্রব উৎপাত আরম্ভ করিল। তাহার তীব্র অত্যাচার সহনে অক্ষম হইয়া দেবগণ ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন। তাঁহারা এই বর-লব্ধ দৈত্যের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য কোন একটী উপায় প্রার্থনা করিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনায় ব্রহ্মা বলিলেন;—মানবগণের মধ্যে রাজা দুর্য্যোধন এই অসুরের একমাত্র বন্ধু হইবেন, তাঁহার স্নেহে ও প্রশ্রয়ে যখন ব্রাহ্মণগণের প্রতি অতিশয় অসদাচরণ করিবে, তখন রোষানল-দীপ্ত দ্বিজগণ বাগ্‌বজ্রের দ্বারা এই অসুরকে অভিশপ্ত করিলে, তৎপর স্বয়ংই বিনষ্ট হইবে। এই কথার পর ব্রহ্মা দেবগণকে 'বিগত-জ্বর হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।......অনন্তর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদিকে সংগ্রামে নিহত করিয়া স্বজনগণের সহিত যখন হস্তিনাপুরে প্রবেশ করিতে-ছিলেন, সেই সময়ে ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া চার্ব্বাক বন্ধু নাশের প্রতি-কারের জন্য ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে আসিয়া তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া

(*) "নয়তে চার্ব্বী লোকায়তে। চার্ব্বী বুদ্ধিঃ। তৎ সম্বন্ধাদাচার্য্যোঽপি চার্ব্বী ; স লোকায়ত শাস্ত্রে পদার্থান্ নয়তে উপপত্তিভিঃ স্থিরীকৃত্য শিষ্যেভ্যঃ প্রাপয়তি" (৩।৩।৩৬ কাশিকা-পাণিনিঃ)

(†) মৈত্রুপনিষদ্-(১।৩।৫)—নাস্তিক্যমজ্ঞানং তামসানি"। ছান্দোগ্য (৮।৯।১২) "প্রজাপতিস্তেভ্য স্তমঞ্চ মায়াঞ্চ প্রদদৌ"। শতপথ ব্রাহ্মণ (২।৩।৪।৫)।' মহাভারত (১৩।১৭।১১।১৫)। ন্যায়দর্শন (১।২।২।৩)। বিষ্ণুপুরাণ (৩।১৮।১৯)। অভিধান প্রদীপিকা-বৌদ্ধ (১২২) রামায়ণ। (২।১০০।৩৮।৯১)।

(‡) মহাভারত শান্তিপর্ব্ব (৩৯ অঃ)

সহগামী ব্রাহ্মণগণকে কোপাবিষ্ট করাতে, তাঁহারা নিধন মন্ত্রোচ্চারণ ও হুঙ্কার দ্বারা দ্বিজবেশধারী চার্ব্বাককে নিহত করিলেন।

চার্ব্বাকের মতে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট ক্ষিতি, জল, অনল, অনিল—এই চারিটি পদার্থই আকাশের প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া তাহা কোন তত্ত্ব নয়। আকাশ পদার্থ অপর দার্শনিক মতে অনুমানগম্য। চার্ব্বাক অনুমান মানেন না, সুতরাং আকাশ অপ্রসিদ্ধ। তবে 'প্রপিতামহ' প্রভৃতি অদৃষ্ট পদার্থের অস্তিত্ব কিরূপে জ্ঞাত ও বিশ্বস্ত হওয়া যায়? ইহাতে চার্ব্বাক বলেন,—প্রপিতামহ প্রভৃতির সঙ্গে বিষয় ইন্দ্রিয় জন্য লৌকিক সন্নিকর্ষ না থাকিলেও 'জ্ঞান-লক্ষণা' (ন্যায়োক্ত) স্বরূপ অলৌকিক সন্নিকর্ষ (সম্বন্ধ বা ব্যাপার বিশেষ) দ্বারা প্রমিত হইয়া থাকে। অতএব ঈশ্বর ও ঈশ্বর কর্তৃক সৃষ্টি, সৃষ্টির পরপারে পরলোক, অদৃষ্ট, স্বর্গ, অপবর্গ, দেবতাদি স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।* 'আমি মানুষ' 'আমি জ্ঞানী' 'আমি সুখী' এইরূপ প্রতীতি দ্বারা জ্ঞান সুখাদির আশ্রয়রূপ দেহই আত্মা বলিয়া বোধ হয়। শরীরাতিরিক্ত আত্মা আছে বলিয়া তাহাতে কোন প্রমাণ নাই। তবে চার্ব্বাক মতে আত্মা কিরূপ পদার্থ? ক্ষণিক ক্ষিতি জল প্রভৃতি চারিটী ভূতের ত্রুটীর (ত্রসরেণু) সংহতি রূপ দেহই আত্মা। 'দেবদত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছে'—এইরূপ স্থলে আত্মা প্রাগ্‌ভাবের প্রতিযোগী, 'বসু গুপ্ত করিয়াছে'—এইরূপ উদাহরণে তদীয় আত্মা ধ্বংসের (নাশের) প্রতিযোগী হইবে। এই বিষয়ে বৃহস্পতি বলিয়াছেন,† —"চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই পুরুষ", 'কামই একমাত্র পুরুষার্থ' 'মরণই অপবর্গ' 'প্রত্যক্ষই প্রমাণ'।‡ এই মতের খণ্ডন আত্মতত্ত্ব বিবেক, কুসুমাঞ্জলি, অদ্বৈত ব্রহ্মসিদ্ধি, ভগবৎ শাঙ্কর-ভাষ্য প্রভৃতিতে বিশেষ ভাবে রহিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয়াংশে অষ্টাদশ অধ্যায়েও চার্ব্বাকের মত বর্ণিত আছে।

দিগম্বর বা আর্হত দর্শন,—এই মতের অনেকগুলি নাম আছে। স্যাদ্বাদ, অনেকান্তবাদ, আর্হত মত, শ্রাবক বাদ, জৈন মত প্রভৃতি। মগধ প্রদেশ প্রান্তে

(*) "ন স্বর্গো নাপবর্গো বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ"। সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ (১।১।৫।)
"তাবানেব হি লোকো ইয়ম্ যাবানিন্দ্রিয়গোচরঃ" (ষড়দর্শন সমুচ্চয়-টীকা)

(†) "চৈতন্য-বিশিষ্টঃ কায়ঃ পুরুষার্থঃ" "কাম এবৈকঃ পুরুষার্থঃ" "মরণমেবাপবর্গঃ পুরুষার্থ" প্রত্যক্ষমেকং প্রমাণং পুরুষার্থঃ।"—(বার্হস্পত্যসূত্রং)

(‡) প্রমাণমেকং প্রত্যক্ষতত্ত্বং ভূতচতুষ্টয়ং। মোক্ষশ্চ মরণাস্তঃ কামার্থৌ পুরুষার্থবেগ" নহি শম্ভীশ্বর' কর্ত্তা পরলোককথা বৃথা। দেহং বিনাস্তিচেদাত্মা কুম্ভবদ্ দৃশ্যতাং পুনঃ॥

(অদ্বৈতব্রহ্মসিদ্ধি)

বৈশালী নগরীতে জৈনমুনি জন্ম পরিগ্রহণ করিয়া এই মতের প্রচার করিয়াছিলেন। শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর এই সম্প্রদায়ে জৈনগণ বিভক্ত। বৌদ্ধমত হইতে এই ধীর জিন মুনির ধর্ম্ম সম্পূর্ণ পৃথক্। সংক্ষেপে দুই পদার্থ—জীব ও অজীব। যাঁহাদের চৈতন্য আছে, তাঁহারা জীব পদার্থ সংজ্ঞায় কথিত; জড় বর্গ বা চেতনাশূন্য অপর পদার্থ অজীব নামে অভিহিত। এই দ্বিবিধ পদার্থই পুনঃ সপ্তবিধ; যথা—জীব, অজীব, আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, বন্ধ, মোক্ষ। উক্ত দ্বিবিধ পদার্থকে পুনঃ পঞ্চাস্তিকায় বলে। জীবাস্তিকায়, পুদ্গলাস্তিকায়, ধর্ম্মাস্তিকায়, অধর্ম্মাস্তিকায়, আকাশাস্তিকায়। এই আস্তিকায় শব্দ জৈন দর্শনের সঙ্কেতানুসারে পারিভাষিক বা অনিয়ত পদার্থের বাচক।* অনেকান্ত বাদে কোন বস্তুরই নিয়ত সত্তা নাই। সকল দেহ পরিমাণ চৈতন্যের স্বরূপ জীবপদার্থ সতত ঊর্দ্ধগামী সাবয়ব। এই জীবাস্তিকায় তিন প্রকার,—বদ্ধ, মুক্ত, নিত্যসিদ্ধ। অর্হৎ মুনি নিত্যসিদ্ধ জীব অপর কোন কোন জীব সাধন দ্বারা মুক্ত; অন্যজীব বদ্ধ বা রাগাদিযুক্ত। পুদ্গলাস্তিকায় ছয় প্রকার; পৃথিবী জল প্রভৃতি ভূত-চতুষ্টয়, স্থাবর ও জঙ্গম। প্রবৃত্তির দ্বারা অনুমেয় ধর্ম্মাস্তিকায়, স্থিতির দ্বারা অনুমেয় অধর্ম্মাস্তিকায়। তপ্ত শিলায় আরোহণ ও কেশ মুণ্ডন প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কার্য্যদ্বারা, বাহ্য চেষ্টারূপ সম্যক্ প্রবৃত্তির দ্বারা অন্তরের অপূর্ব্ব ধর্ম্ম অনুমিত হয় বলিয়া ইহাকে ধর্ম্মাস্তিকায় বলে। সর্ব্বদা ঊর্দ্ধগমনশীল জীব দুরদৃষ্টরূপ কর্ম্ম দ্বারা শরীরে আবদ্ধ থাকে। সেই হেতু দেহে অবস্থিতি দ্বারা জীবের অধর্ম্ম অনুমিত হয় বলিয়া তাহাকে অধর্ম্মাস্তিকায় বলে। আকাশাস্তিকায় দ্বিবিধ, লোকাকাশ ও আলোকাকাশ। উপর্য্যুপরি স্থিত ভূ প্রভৃতি চতুর্দ্দশ ভুবনে অবস্থিত লোকগণের মধ্যে বিদ্যমান আকাশই লোকাকাশ। মোক্ষের আস্পদই আলোকাকাশ, (এই স্থানে কোনও লোক অবস্থান করে না বলিয়া ইহার নাম আলোকাকাশ)। আস্রব, সম্বর, নির্জ্জর, এই তিন

(*) অস্তীতিকায়স্তে কথ্যন্তে ইত্যস্তিকায়াঃ। অস্তিকায়শব্দঃ পারিভাবিকঃ অনিয়তপদার্থবাচী। (তত্ত্বার্থাধিগম্য সূত্র টীকা)

পূর্য্যন্তে গলন্তি যে তে পুদ্গলাঃ পরমাণবঃ। তৎসমূহঃ পুদ্গলাস্তিকায়ঃ।"

"জীবাজীবৌ তথাপুণ্যং পাপমাস্রবসম্বরৌ।

বন্ধশ্চ নির্জ্জরা মোক্ষৌ নবতত্ত্বানি তন্মতে"। (ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়ঃ)

"ঔপশমিক-ক্ষায়িকৌ ভাবৌ মিশ্রশ্চ জীবস্য সত্বং (জৈনদর্শন সূত্রভাষ্যে) ঔদয়িক পারিণামিকৌ চ।"

"চৈতন্য লক্ষণোজীবো যশ্চৈতদ্বৈপরীত্যবান্।

অজীবঃ স সমাখ্যাতঃ পুণ্যং সৎকর্ম্ম পুদ্গলাঃ"। (ষড়্‌দর্শন সমুচ্চয়)

পদার্থ প্রবৃত্তি লক্ষণ। প্রবৃত্তি দুই প্রকার, সম্যক্ ও মিথ্যা। মিথ্যা প্রবৃত্তিকে আস্রব বলে। পুরুষকে ইন্দ্রিয়গণ বিষয় দেশে প্রেরণ (সম্বন্ধ) করে বলিয়া ইন্দ্রিয় প্রবৃত্তির নাম আস্রব। কেহ কেহ বলেন,—কর্ম্ম কর্ত্তাকে কর্ম্মসমূহ পরিব্যাপিত করিয়া থাকে বলিয়া সেই কর্ম্ম সমূহকে 'আস্রব' বলে। সম্বর ও নির্জ্জর এই পদার্থ সম্যক্ প্রবৃত্তি সংজ্ঞায় কথিত হয়। শম দম প্রভৃতি প্রবৃত্তির নাম সম্বর। ইহারা আস্রবের প্রবাহ দ্বার সম্বরণ (আবরণ) করে বলিয়া ইহাদের নাম সম্বর। সেই সম্বরই নিঃশেষ রূপে পাপ পুণ্য সুখ দুঃখাদিকে জীর্ণ (বিনাশ) করে বলিয়াই, তাহাকে নির্জ্জর সংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। জীবের বন্ধ আট প্রকার তন্মধ্যে চারি প্রকার ঘাতি কর্ম্ম; যথা—জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয়, অন্ত-রায়। (১) জ্ঞান দ্বারাই বস্তু-সিদ্ধি হইয়া থাকে, শক্তি রজতাদি জ্ঞান হইতে যেরূপে সত্য রজতাদির জ্ঞানের প্রশক্তি হয়, এবং আশা মোদকাদি জ্ঞান হইতেও সত্য মোদকাদির জ্ঞান সিদ্ধি হইতে পারে, সেইরূপ বিপর্য্যয়কে 'জ্ঞানাবরণীয়' কর্ম্ম বলে। (২) আর্হত দর্শন ও তৎপ্রতিপাদ্য বিষয়ের অভ্যাস (পুনঃপুনঃ আলোচনা) দ্বারা মুক্তি হয় না, এইরূপ জ্ঞানকে "দর্শনাবরণীয়" কর্ম্ম কহে। (৩) বহু বিপ্রতিষিদ্ধ বিষয়ে তীর্থঙ্করগণের (উপদেষ্টা গুরু) প্রদর্শিত মার্গের বিশেষরূপে অবধারণ না করাকে মোহনীয় কর্ম্ম বলে। (৪) প্রকৃত নির্ব্বাণ-পথগামিগণের তাহার বিঘ্নকর 'অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য হউক'—এইরূপ জ্ঞানকে 'আন্তরীয়ক'' কহে।

অঘাতি কর্ম্মও চারি প্রকার। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার কর্ম্ম মুক্তি পথের নিরোধক বলিয়া সে গুলিকে ঘাতি কর্ম্ম বলা হয়। আয়ুষ্ক, গোত্রিক, নামিক, বেদনীয়। (১) অঘাতি কর্ম্ম সমূহের মধ্যে যাহা উৎপত্তির দ্বারা আয়ুর কথক বা পরিচায়ক হয়, তাহাকে আয়ুষ্ক বলে। (২) তাহা যদি পুনঃ শরীরাকারে পরিণত হয়, সেই পরিণত শক্তিকে গোত্রিক কর্ম্ম বলে। (৩) শুক্র পুদ্গলের আরম্ভক বেদনীয় কর্ম্মের অনুযায়ী যে, তাহাকে 'নামিক' বলে। (৪) ক্রিয়া যুক্ত বীজের তেজ পরিপাকের হেতু ঈষৎ ঘনভাব ও শরীরাকারে পরিণতির কারণকে 'বেদনীয়' বলে। এই চারিটি কর্ম্ম শুক্র পুদ্গলের আশ্রয় হেতু ইহা-দিগকে অঘাতি কর্ম্ম বলা হয়। এই ঘাতি ও অঘাতি কর্ম্ম পুরুষের বন্ধনের হেতু বলিয়া বন্ধ নামে অভিহিত হয়।

অপর জৈন সম্প্রদায় এই আট প্রকার কর্ম্ম বন্ধের অন্যরূপ বর্ণনা

করিয়াছেন; তাহা আমরা প্রবন্ধ বিস্তৃতি ভয়ে উদ্ধৃত করিতে বিরত হইলাম।

বিনষ্ট সকল ক্লেশ 'ও ক্লেশ বাসনা' (সংস্কার) এবং আবরণ জ্ঞানের উচ্ছেদ হইয়া বিশিষ্ট ভাবে যে সুখ প্রবাহ ও জীবের ক্রমে উর্দ্ধে—আলোকাকাশে গতি, তাহার নাম মোক্ষ পদার্থ।*

জীব ও অজীব এই দুই পদার্থ ভোগ্য। আস্রবাদি পঞ্চকের মধ্যে শেষ দুই পদার্থ ফল স্বরূপ। প্রথম তিনটী সাধন। সকল পদার্থই অনেকান্ত অর্থাৎ কোন মতে আছে, কোন মতে নাই; যথা স্যাদস্তি, স্যান্নাস্তি; স্যাদস্তি চ নাস্তিব প্রভৃতি সপ্ত ভঙ্গী ন্যায়। অর্থাৎ যাহাতে সাত প্রকার ভঙ্গী বা বিভাগ ও তাহার মুক্তি আছে, তাহাই সপ্তভঙ্গী ন্যায় নামে প্রসিদ্ধ। (ক্রমশঃ)

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যারত্ন সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

অর্থ]

মৃত্যুপথ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(২)

কারণ শরীর বিচার।

পদার্থ মাত্রই স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ বিশিষ্ট। স্থূলের মূল সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মের যাহা মূল তাহাই কারণ; কারণের মূল নাই, তাহা অনাস্থা দোষ। স্থূল পার্থিব বহুল, সূক্ষ্ম তেজ বহুল; কারণ তেজের স্বচ্ছ প্রকাশাবস্থা বা কর্ম্ম বহুল। স্থূল পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত, সূক্ষ্ম অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত দ্বারা গঠিত কারণ কর্ম্ম দ্বারা। স্থূলে স্থূলের অধিষ্ঠান,—যেমন আমাদের স্থূল দেহে স্থূল ইন্দ্রিয়াদির অধিষ্ঠান। সূক্ষ্মে সূক্ষ্মের অধিষ্ঠান,—যেমন আমাদের সূক্ষ্ম দেহে প্রাণ, মন ও বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান; কারণে কর্ম্ম প্রভাব অধিষ্ঠান। স্থূল, স্থূলকাল অর্থাৎ শতাধিক সহস্রাধিক কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী; সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মকাল অর্থাৎ প্রাকৃতিক প্রলয় পর্য্যন্ত স্থায়ী; কারণ, মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ী। স্থূল থাকিলে সূক্ষ্ম থাকা অনিবার্য্য, সূক্ষ্ম থাকিলে কারণ থাকা স্বতঃসিদ্ধ; যথা স্থূল দুগ্ধ,

(*) "তত্ত্বার্থশ্রদ্ধানং সম্যগ্‌দর্শনং। জৈনদর্শন সূত্রম্।
"তার্হম্মুনি প্রাপ্তির্ম্মুক্তিঃ"। ,,
* "রুচি র্জিনোক্ততত্ত্বেষু সম্যক্ শ্রদ্ধানমুচ্যতে।
জায়তে সন্নিসর্গেন গুরোরধিগমেন চ"। প্রমেয় কমল মার্ত্তণ্ডে।

সূক্ষ্ম ননী, কারণ ঘৃত। কারণ শরীর সূক্ষ্ম দেহের অব্যবহিত কারণ, সূক্ষ্ম শরীর স্থূল দেহের অব্যবহিত কারণ। স্থূল শরীরের অদৃশ্য আধার রূপী সূক্ষ্ম শরীর এবং সেই সূক্ষ্ম শরীরের বীজ বা উপাদান স্বরূপ কারণ শরীর। কারণ শরীরই প্রকৃতি, ইনি সর্ব্বাদিম উপাদান, যথা শ্রুতি—"প্রকৃতেরাদ্যো-পাদান তান্যেষাং কার্য্যত্বং শ্রুতেঃ" ॥ সাংখ্য – ৬অঃ—৩২ ॥

প্রকৃতিই স্থূল, সূক্ষ্ম, ব্যক্ত ও অব্যক্ত জগতের আদি উপাদান। তাহা হইতে মনাদি মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ কারণ স্বরূপিণী প্রকৃতি ঈশ্বরেরই সৃষ্টি শক্তি, অথচ জীবের অনাদি অদৃষ্ট ও কর্ম্মবীজ স্বরূপিণী। শাস্ত্রে তাহার দুই পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে "সদসদাত্মিকা" বিশেষণ দিয়াছেন। তিনি সৃষ্টি-কালে যখন ব্যক্ত হন, তখনই তাঁহার সৎপক্ষের আবির্ভাব হয় এবং প্রলয়কালে যখন পুনঃ অব্যক্তাবস্থা লাভ করেন, তখনই তিনি 'অসৎ' পক্ষ অবলম্বন করেন।

সর্ব্ব প্রকার ভোগই মহামায়া স্বরূপিণী প্রকৃতির পরিণাম। স্বর্গে উনি স্বর্ণ-শৃঙ্খলযুতা, মর্ত্ত্যে রৌপ্য-শৃঙ্খলা এবং নরকে বা পশু পক্ষ্যাদিতে লোহার শৃঙ্খল ; এই মাত্র বিশেষ। প্রকৃতি অনাদি, অনন্ত ও নিত্যা। প্রলয়কালে আকাশাদি সমস্ত পদার্থ, মনাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়, স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত পদার্থ সেই অব্যক্ত কারণে অবস্থিতি করে। সৃষ্টিকালে সেই সমস্তই আবার ব্যক্ত হয়। সুতরাং প্রলয় সময়েও কোন ভূতের বা ইন্দ্রিয়ের দ্রব্যত্ব তিরোহিত হয় না, কেবল অব্যক্ত থাকে এইমাত্র। সেই দ্রব্য ধাতু কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, কেননা প্রলয় প্রলয়ান্তে, তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড পুনঃপুনঃ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

জীবও অনাদি অনন্ত কাল বিদ্যমান। জীবের সন্নিধানে তাহার কর্ম্মজ প্রকৃতি রূপ পরমৈশ্বর্য্য অনাদিকাল হইতে উপস্থিত থাকায়, জীবে তদ্ভোগার্থ বাসনার উদয় হয়। সেই বাসনাও প্রকৃতির সূক্ষ্ম রূপান্তর মাত্র। সেই বাসনাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত প্রকৃতির নিয়ামক পরমেশ্বরের নিয়মে প্রকৃতির গর্ভ হইতে এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য যুক্ত ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হয়। তাহা অদৃষ্টের তারতম্যানুসারে পঞ্চভূত,—অন্ন, জল, বল, বীর্য্য, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতি দ্বারা জীবের সেবা করিয়া থাকে। এবং ঐ কারণস্বরূপা প্রকৃতিই স্থূল সূক্ষ্ম বসনে ভূষিত হইয়া সূর্য্য চন্দ্র খচিত,—তেজ বায়ু বারি মৃত্তিকা বিরচিত ধনধান্যপূর্ণ অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইয়া জীবের হৃদয়াকাশে মানসিক

প্রকৃতিরূপে সূক্ষ্মাকারে অবস্থিতি করিয়া ভোগ জন্মাইতেছে। উক্ত প্রকৃতি স্বরূপিণী রাজলক্ষ্মীকে সম্ভোগ দ্বারা জীবের বাসনা নিবৃত্তি হইলেই প্রকৃতির কর্ম্ম সমাধা হয়। মহামায়া স্বরূপিণী অনাদি অদৃষ্ট ও কর্ম্মবীজময়ী প্রকৃতির ঐ পর্য্যন্তই উদ্দেশ্য। তিনি জীবকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন পূর্ব্বক, স্ত্রীর ন্যায় তোষণ পূর্ব্বক, জলদ বিস্ফারিত সৌদামিনীর ন্যায় অন্তর্ধান করেন। জীব তখন পরমাত্মস্বরূপ স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকেন। তাহারই নাম ব্রহ্মলাভ বা ব্রহ্মজ্ঞান; এইরূপ স্বাধীনতা যে জীবের পক্ষে উপস্থিত হয়, সেই জীবমাত্র মুক্ত হন, প্রকৃতি কেবল তাঁহাকেই ত্যাগ করেন। কিন্তু সে সময়ে অন্যান্য জীবের পক্ষে তাহার প্রভাব সম্পূর্ণ বিদ্যমান থাকে। জীবেতে তাহার কর্ম্মজ অনাদি প্রকৃতি জনিত যে বাসনা থাকে, তাহাও প্রকৃতির রূপ, সেই বাসনা সুসিদ্ধির জন্য জীব কর্ম্ম দ্বারা যে ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ চরিত্র উপার্জ্জন করেন, তাহাও প্রকৃতির রূপান্তর। সেই অনাদি কর্ম্মনিষ্পন্না প্রকৃতি ও তাহার সর্ব্বপ্রকার রূপান্তরই অদৃষ্ট শব্দের বাচ্য। সেই অদৃষ্ট জৈবিক প্রকৃতি নামে এবং স্থূলতর দ্রব্য ধাতু বিশিষ্টা প্রকৃতি বাহ্য প্রকৃতি নামে কথিত হয়। সেই আদ্যাশক্তি মূলা প্রকৃতির স্থূল সূক্ষ্ম মহিমা সর্ব্বশাস্ত্রে একতানে গান করিয়া থাকে। যখন প্রলয় সময়ে ভেদ জাত সকল বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন একমাত্র প্রকৃতি তারই সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ বীজের সহিত অব্যক্ত ভাবে অবস্থিতি করেন। পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে জীব সকল যেমন স্ব স্ব অদৃষ্ট অর্থাৎ জৈবিক প্রকৃতির সহিত প্রকটিত হন, সেইরূপ তাহাদের অদৃষ্ট অনুসারে প্রকৃতি ভোগ্য বস্তুরূপেও পরিণত হয়েন। তাহাতে ইন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন দেহ ও তদ্ভোগ্য অন্নাদি জন্মে। প্রলয় দ্বারা জগৎ সংসার অদৃশ্য হইলে, সেই প্রকৃতিরূপ বীজের ধ্বংস হয় না। সুতরাং প্রকৃতিই সর্ব্বভূতের কারণ শরীর; কেননা সর্ব্বভূতের কারণ তাহাতেই অবস্থিতি করে। যতদিন বাসনামূলক জৈবিক প্রকৃতি থাকিবে, ততদিন প্রকৃতি শরীর ও ভোগ সংঘটন করিবেই করিবে। কোটি কোটি মহাপ্রলয় হইলেও ঐ কারণ শরীর ধ্বংস হইবে না। অতএব একথা বলা যাইতে পারে যে, আমাদের কারণ শরীর আমাদেরই অন্তরে আছে। প্রকৃতি সেইখানে সমস্ত ভাবী দেহের বীজ স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন। যেমন স্বপ্নাবস্থায় স্থূল শরীরের ব্যবহার নিবৃত্তি পায়; কেবল মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সৃষ্টি বিরচিত হয়; এবং যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় সূক্ষ্ম দেহ ও সূক্ষ্ম সৃষ্টির ব্যবহার নিবৃত্ত হয়, কেবল কারণ দেহ মাত্র বীজরূপে অবস্থান

করে, সেইরূপ মৃত্যু দ্বারা জীবের স্থূল দেহ বিনষ্ট হইলেও মনাদি সূক্ষ্ম দেহ জীবিত থাকে এবং প্রলয়ে মনঃ প্রভৃতি সূক্ষ্ম দেহ নিরুদ্ধ বৃত্তি লাভ করিলেও, প্রকৃতি সর্ব্বভূতের কারণ স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন। স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের অব্যক্ত অথচ নিয়ত পূর্ব্ববর্ত্তী অদৃষ্টরূপ নিয়ম স্বরূপিণী প্রকৃতির নাম কারণ শরীর। কারণ শরীরই দেহ ধারণের কারণরূপিণী অনাদি কাম্যকর্ম্ম বীজময়ী অবিদ্যা নামে উক্ত হয়। প্রলয় কালে এই শরীর ভাবী দেহ ব্যাপারের বীজ-রূপ ব্রহ্ম শক্তিতে বিলীন হইয়া থাকে। সর্ব্ব জীবের সমষ্টি কারণ দেহরূপ প্রভৃতির অধিষ্ঠাতৃত্ব উপলক্ষে ব্রহ্মাকে ঈশ্বর বলা যায়।

জীব, জীবদ্দশায় যে সকল কর্ম্মকূট সংগ্রহ করিয়াছে, ভাবী সৃষ্টির জন্য তাহা তাহার আত্মকেন্দ্রে কর্ম্মময়ী কারণ স্বরূপিণী প্রকৃতিরূপে অবস্থিতি করিয়া সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীররূপ জাল বিস্তার করে। যেমন লালা, কীট নিজ লালা দ্বারাই জাল বিস্তার করিয়া নিজে বদ্ধ হয়, তদ্রূপ নিজ কৃত কর্ম্ম দ্বারা কারণ শরীর সৃষ্টি করিয়া জীব নিজেই বদ্ধ হইয়া পড়ে। কালে সেই কারণ শরীর হইতেই তাহার কর্ম্মের উপযুক্ত—ক্রমে সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর নির্ম্মাণ হয়। জীব ভাবাপন্ন চিদাত্মা যেখানেই থাকুন না কেন, তদীয় উদরে দৃশ্য জগতের উদ্ভব হইবেই। শ্রুতি স্মৃতির ইহাই সিদ্ধান্ত। যথা শ্রুতি—

যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ স্বভাবতোদেব একঃ স্বমাবৃণোৎ।
সনো দধাদ্ ব্রহ্মাপ্যয়ম্॥ শ্বেতাশ্বতর॥

যেমন ঊর্ণনাভ, স্বীয় দেহ হইতে সূত্র বাহির করিয়া, তাহা দ্বারা নিজ দেহকে আচ্ছাদন করে, সেইরূপ জীব আত্ম-মধ্যস্থ নিজ কর্ম্ম শক্তি দ্বারা সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ রচনা করিয়া আপনাকে আবৃত করিয়া রহিয়াছে। যথা স্মৃতি,—

হেম মাত্রমুপাদায় রূপং বা হেমকারকঃ।
নিজ লালা সমাযোগাৎ কোষং বা কোষকারকঃ॥ ১৪৭॥
কারণান্যেবমাদায়তা সুতাস্বিহযোনিষু।
সৃজত্যাত্মানমাত্মা চ সম্ভূয় করণানি চ॥ ১৪৮॥ যাজ্ঞবল্ক্য-৩৩॥

স্বর্ণকার যেমন কেবল স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা কনক কুণ্ডলাদি গঠন করে, কিংবা কোষকারী কীট বিশেষ নিজ লালাযোগে আত্মবদ্ধ হেতু কোশ রচনা করে, সেইরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়াদি করণ সঞ্চয় করিয়া, তদ্দ্বারা ইহসংসারে দেব মনুষ্যাদি জাতিতে নিজ কর্ম্মবন্ধ বদ্ধ দেহ সৃজন করেন। ইহার নির্গলিতার্থ এই,—তুমি কর্ম্মদ্বারা ধন রত্ন ভোজ্য সামগ্রী যাহা কিছু উপার্জ্জন

কর, তাহা যেমন সুশৃঙ্খলে রক্ষিত হইবার জন্য মাতা কিম্বা স্ত্রীর নিকট অর্পণ কর; প্রয়োজন সময়ে মাতা তদ্দ্বারাই তোমাকে পোষণ ও স্ত্রী তোষণ করে; তদ্রূপ জীব সোপার্জ্জিত কর্ম্মফল প্রকৃতির হস্তে অর্পণ করে। প্রলয়ে তাহা বিনষ্ট হয় না, কেননা প্রকৃতি তাহা যত্নের সহিত সুশৃঙ্খলে রক্ষা করে। প্রলয় অবসানে—আদি সৃষ্টিকালে প্রকৃতি তোমাকে তাহাই অর্পণ করেন। উহা তোমারই প্রকৃতি এবং তোমারই স্বোপার্জ্জিত কর্ম্মফল অনুযায়ী ভোগ্য দ্রব্য সৃষ্টি করেন এবং তদুপোযোগী সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ রচনা করেন; অর্থাৎ জীব নিজ কর্ম্মরূপী কারণ দ্বারাই সূক্ষ্ম ও স্থূল দেহ রচনা করিয়া আবদ্ধ হইয়া পড়েন। ঐ কর্ম্মফল আত্মার মধ্যেই অবস্থান করে, উহাই কারণ-রূপী প্রকৃতি; উহারই সূক্ষ্ম ও স্থূল বিকাশ এই ব্যক্ত জগৎ। উহা হইতেই সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীরের আবির্ভাব। যার যার কারণ শরীর তার তার আত্মার মধ্যেই অবস্থিতি করে। কালে উহা হইতেই কর্ম্মেচ্ছা প্রবর্দ্ধিত হয়। ইচ্ছাময় সমষ্টি চৈতন্যের ইচ্ছা হইতে ইচ্ছাময়ী সমষ্টি কারণ স্বরূপিণী প্রকৃতি উৎপন্না হয়; আর ব্যষ্টি চৈতন্যের ইচ্ছা দ্বারা ব্যষ্টি কারণ শরীর গঠিত হয়। যার যার কারণ শরীর, তার তার ইচ্ছা দ্বারা পরিপোষিত ও পরিপুষ্ট হয়। ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যথা—

> ইদং দৃশ্যং যদানাসীৎ সদসদাত্মকঞ্চ যৎ।
> তদা ব্রহ্মময়ং তেজো ব্যাপ্তিরূপঞ্চ সন্ততম্॥
> ন স্থূলং ন চ সূক্ষ্মঞ্চ শীতং নোষ্ণন্তু পুত্রক।
> আদ্যন্ত রহিতং দিব্যং সত্যং জ্ঞানমনন্তকম্॥
> যোগিনোঽন্তর দৃষ্টাহি যং ধ্যায়ন্তি নিরন্তরম্।
> তদ্রূপং সকলং হ্যাসীজ্‌জ্ঞানবিজ্ঞানদং মহৎ॥
> কিয়তা চৈব কালেন তস্যেচ্ছা সম পদ্যত।
> প্রকৃতির্নাম সা প্রোক্তা মূল কারণমিত্যত॥ শিব ২ অঃ॥

যে সময়ে সদসদাত্মক এই পরিদৃশ্যমান জগৎ ছিল না, তখন সত্যজ্ঞান অনন্ত সর্ব্বব্যাপক দিব্য ব্রহ্মময় পরম জ্যোতি বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, শীতল নহেন, উষ্ণ নহেন, তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই। যোগীগণ অধ্যাত্ম দৃষ্টি বলে যাঁহাকে ধ্যান করেন, জ্ঞান বিজ্ঞানপ্রদ তদীয় মহৎ স্বরূপই কেবল অবস্থিত ছিলেন। কিছুকাল অতীত হইলে সেই ব্রহ্মের

সনাতনী ইচ্ছা (সিসৃক্ষা) প্রকাশ পাইল, সেই ইচ্ছাই প্রকৃতি ও স্থূল কারণ নামে অভিহিত।

কিরূপে ঐ কারণ শরীর হইতে সূক্ষ্ম শরীরের আবির্ভাব হয়, তাহা পরে বলা যাইতেছে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীজানকীনাথ মুখোপাধ্যায়।

অর্থ]

মহামায়ার খেলা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রীষ্মকালের দ্বিপ্রহর, প্রখর রৌদ্র, আকাশ নির্ম্মল, সূর্য্যদেব অক্লান্তভাবে জগতে রশ্মি বিস্তার করিতেছেন। মাঠ যেন ধূ ধূ করিতেছে, গাছপালা যেন পুড়িয়া যাইতেছে। মধ্যে মধ্যে গরম বাতাস বহিয়া ধূলি উড়াইয়া ঘর্ম্মাক্ত দেহে মিশাইয়া দিতেছে। গৃহস্থেরা সকাল সকাল আহারাদি করিয়া ঠাণ্ডা মাটিতে পড়িয়া আই-ঢাই করিতেছে। পথে ঘাটে প্রায় লোক দেখা যায় না, এমনি গরম যে কৃষকেরাও মাঠে যাওয়া বন্ধ করিয়াছে। আহারে লোকের রুচি নাই, কেবল জল জল রব। এই রৌদ্রে ছিন্নবেশ পরিহিতা—শীর্ণকায়া—মলিন মূর্ত্তি একটি যুবতী কাশীর পথ ধরিয়া চলিয়া যাইতেছে। সঙ্গে একটী কপর্দ্দক বা একখানি বস্ত্র পর্য্যন্তও নাই, শত গ্রন্থিযুক্ত একখানি বস্ত্রই তাহার সম্বল। রৌদ্রের তাপে মুখ রক্তবর্ণ—পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক কঙ্কর ও রৌদ্রের উত্তাপে চরণদ্বয় ক্ষত বিক্ষত। এইরূপ অবস্থায় রাস্তা চলা একরূপ অসম্ভব; কিন্তু প্রাণের তীব্র আবেগ এ সকল যন্ত্রণা ভুলাইয়া দিয়াছে। কেবল অহর্নিশ চিন্তা কত দিনে কাশী পৌঁছাইব। যখন নিতান্ত অস্থির হইয়া পড়িতেছে, তখন বৃক্ষতলে গিয়া উপবেশন করিতেছে। ভদ্র গৃহস্থের কন্যা—সধবা; একাকিনী এরূপভাবে যাইতে দেখিয়া গ্রামস্থ অনেকে অনেক কথা সমালোচনা করিতেছে; কিন্তু তাহার সে সব বিষয়ে ভ্রূক্ষেপ নাই। যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কিছু দেয়, তাহা দ্বারাই তাহার উদর পূরণ হয়। যে গ্রাম পার হইয়া এই রমণী চলিতেছে, সেই গ্রামের অনেকেই তাহাকে তথায় দ্বিপ্রহরে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল; কিন্তু সে কিছুতেই থাকিল না—যতটুকু অগ্রসর হওয়া যায়, ততই

তাহার পক্ষে মঙ্গল। অগত্যা তাহারা কিছু আহার্য্য প্রদান করিল। যেরূপ তাহার শরীরের অবস্থা, তাহাতে আর দুই একদিন এইরূপ ভাবে চলিলেই বোধ হয় প্রাণবায়ুর অবসান হইবে; কিন্তু তাহার সঙ্কল্প অচল—অটল। হৃদয়ের ঐকান্তিকতা তাহাকে তন্ময় করিয়া রাখিয়াছে। ক্রমে রৌদ্রের তাপ কমিয়া আসিল—সূর্য্যদেব অস্তাচল গমনোন্মুখ—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য! আকাশ নির্ম্মল; কিন্তু পশ্চিম কোণে একখানি মেঘের সঞ্চার হইল। ক্রমে মেঘ যেন ভীষণ আকার ধারণ করিল। মন্দ মন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল; ক্রমে তাহার বেগ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অদূরে গ্রাম দেখা যাইতেছে, রমণী দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল; কিন্তু মেঘ ক্রমে বৃষ্টিতে পরিণত হইল। ক্ষণপূর্ব্বে যে প্রকৃতি নীরব নিস্তব্ধ ছিল, মুহূর্ত্তের মধ্যে তাহার কি পরিবর্ত্তন! জল ও ঝড় এরূপভাবে আসিল, যে সে আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না। বৃক্ষের নীচেও দাঁড়াইবার উপায় নাই, কারণ ঝড়ে বৃক্ষ সকল ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল; কাজেই অনাশ্রয়ে সেই মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়াইয়া ভিজিতে লাগিল। সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থামিল, কিন্তু আকাশ ঘন ঘটাচ্ছন্ন এবং বাতাসের বেগ তখনও বেশ আছে। মানুষের যখন বিপদ আসে, তখন এইরূপই হয়। যাহা হউক ভগবানের নাম স্মরণ করিয়া বুক বাঁধিয়া রমণী আর্দ্র বস্ত্রেই গ্রমাভিমুখে চলিতে লাগিল। অন্ধকারে যখন রাস্তা দেখা যায় না, তখন সে দাঁড়ায়; বিদ্যুৎ চমকিয়া উঠিলে আবার চলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এত কষ্টেও তাহার যেন কষ্টের শেষ হয় নাই; একটী প্রস্তরে আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ধরাতলে পতিত হইল। তাহার পায়ের নখ ছিঁড়িয়া দরদর ধারায় শোণিত ক্ষরিত হইতে লাগিল; আর হাঁটিতে পারে না,—অগত্যা সেইখানেই বসিয়া পড়িল।

ভগবানের বিচিত্র নিয়মে সুখ দুঃখ উভয়ের সর্ব্বদাই দ্বন্দ্ব চলিতেছে। বিপদ যদি চিরদিন থাকিত, তাহা হইলে মানুষ কখনও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিত না; অনেকেই আত্মহত্যা করিয়া দুঃখের অবসান করিত।

দুঃখের পর সুখ সুখের পর দুঃখ, ইহাই মানব জীবনে সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে। এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে যদি বিজলি চমকিত না হইত, তবে বোধ হয় স্ত্রীলোকটী আর এক পদও অগ্রসর হইতে পারিত না; কিন্তু অগ্রসর হইয়া যে আরও বিপদ হইল—চলচ্ছক্তি রহিত প্রায়। যুবতী মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিল,—হে ভগবান্, জীবনে ত' কোন পাপই করি নাই; তবে এ

অসহ্য যন্ত্রণা কেন? প্রভু, অনেক সহিয়াছি, আর যে সহ্য করিতে পারি না— মৃত্যু ভিন্ন আমার আর শান্তি নাই। সহসা ঐ অন্ধকারের ভিতর হইতে মনুষ্য কণ্ঠ নিঃসৃত শব্দ –"কে তুমি এই অন্ধকারে বসিয়া"? এই শব্দে প্রথমে স্ত্রীলোকটীর বড় ভয় হইল! বুক দুর্ দুর্ করিয়া উঠিল,—তাহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। সেই কণ্ঠ আবার ধ্বনিত হইল,—"কে তুমি, আমাকে বল—কোন ভয় নাই"। স্ত্রীলোকটী অতি ভীত ভাবে বলিল,—"আমি বিদেশিনী –অভাগিনী; এই গ্রামেই যাইব।'

কথা শুনিয়া এবং বিদ্যুতালোকে উভয়ে উভয়কে দেখিয়া স্ত্রীলোক বলিয়া বুঝিতে পারিল। আগন্তুকটী বৃদ্ধা; পথিককে অল্প বয়স্কা অনুমানে বলিল,-- "মা, তুমি এই গ্রামে কাহার বাড়ী যাইবে?"

স্ত্রীলোক। কাহার বাড়ী যাইব তাহার ঠিক নাই, যে দয়া করিয়া আশ্রয় দিবে তাহার বাড়ীতেই রাত্রি কাটাইব।

বৃদ্ধা। "তুমি কোথায় যাইবে?"

স্ত্রীলোক। "আমি কাশী যাইব; আমার সহায় সম্পদ কিছুই নাই। আজ রাত্রে এই গ্রামে থাকিয়া কাল প্রাতেই আবার চলিয়া যাইব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতা তাহাতে বাদ সাধিল। একখানি প্রস্তরে লাগিয়া পায়ের নখটা উঠিয়া যাইবার মত হইয়াছে, এখনও রক্ত পড়িতেছে; তাই এইখানে বসিয়া পড়িয়াছি।

বৃদ্ধা বড়ই মর্ম্মাহত হইল। বলিল আহা! দেখি মা তোমার পা! এই ঝড়, জল, অন্ধকারে কি রাস্তা চলে —ছেলেমানুষ! বৃদ্ধা বেশ করিয়া দেখিল যে আঘাত গুরুতর নয়। তাহার নিকট নেকড়া ছিল, সেই নেকড়া ছিঁড়িয়া তাহার নখে বাঁধিয়া দিল; তাহাতে সে একটু পায়ে জোর পাইল এবং বলিল, "মা এইবার আমি হাঁটিতে পারিব! এই গ্রামে কি একটু জায়গা পাওয়া যাইবে না?

"গ্রাম যখন, তখন কি যায়গা না পাওয়া যায়। তুমি ইচ্ছা কর ত' এই দীন দরিদ্রার কুটীরেও থাকিতে পার। নইলে এ গ্রামে এক ঘর বড় লোক আছেন, তাঁহারাও লোকজনের বেশ খাতির যত্ন করে থাকেন।"

"আমার বড় লোকে কাজ কি মা! একটা রাত্তির থাকা—আর আমি ত' দীনাতিদীনা; যেখানে সেখানে থাক্‌লেই হ'লো। তুমি যেরূপ দয়ালু, তা'তে তোমার বাড়ী ছেড়ে অন্য যায়গায় যাব না।"

তখন দুই জনে আস্তে আস্তে গ্রাম অভিমুখে চলিতে লাগিল। বৃদ্ধা বলিল দেখ, আর কখন এমন ভাবে রাস্তা চলিওনা। ভগবান তোমার মঙ্গলের জন্যই আমাকে এনেছিলেন, নইলে আজ তুমি কিছুতেই গ্রামে যেতে পার্ত্তেনা। যদি পায়ে আঘাত না লাগ্‌ত, তা'হলে আরও বিপদ হ'তো। এই দেখ গ্রামে ঢুক্‌তেই একটী খাল,— না জানিলে কিছুতেই এই খাল পার হ'তে পার্ত্তেনা। মধ্যে খুব জল; একটী জয়গা আছে, যে দিক দিয়ে পার হওয়া যায়। যাক্ ভগবান তোমার মঙ্গল করুন, কিন্তু বুড়ীর কথাটি মনে রেখো। "অসহায়ের সহায় জগদম্বা" এই বলিয়া স্ত্রীলোকটী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিল। ক্রমে ক্রমে তাহারা বৃদ্ধার বাটীতে উপস্থিত হইল। বৃদ্ধা যেরূপ পর্ণ কুটীরের কথা বলিয়াছিল, এ সেরূপ নহে। বেশ বড় বড় দুই তিন খানি খড়ের ঘর— পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; ঘরে বৃদ্ধার একটী বিধবা কন্যা।

গ্রাম খানি ক্ষুদ্র, প্রায় এক ক্রোশ দূরে একটী হাট বসে; সেই হাট হইতে গ্রামের লোক স্ব স্ব আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া রাখে। অদ্য হাট বার অনেক ব্যক্তি হাটে গিয়াছে বটে, কিন্তু জল ঝড়ে বৃদ্ধা ব্যতীত আর কেহ ফিরে নাই; সেই গ্রামেই অবস্থান করিয়াছে। বৃদ্ধার থাকিবার উপায় নাই, কারণ কন্যাটী কার কাছে থাকিবে; তাই আজ বৃদ্ধার সহিত স্ত্রীলোকটীর দেখা হইল। বৃদ্ধার সাড়া পাইয়া কন্যা তাড়াতাড়ি দ্বার খুলিয়া দিল, দুইজনে প্রবেশ করিলেন। কন্যা বলিল,—"মা ইনি কে?"

বৃদ্ধা বলিল।—'তোমার বোন্; পা ধোবার জল আন।'

উভয়ে হস্ত পদ প্রক্ষালন করিয়া একটু বিশ্রাম করিল। কন্যা উভয়ের জন্য জল খাবার আনিয়া দিল। জল খাইতে খাইতে বৃদ্ধা বলিল,—"মা, কথায় কথায় তোমার নাম জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।"

স্ত্রীলোক। "আমার নাম বিনোদিনী।"

বৃদ্ধা। "মা তোমরা—আপনারা?"

বিনো। "আমরা ব্রাহ্মণ।"

বৃদ্ধা। "তা ত' দেখেই বুঝ্‌তে পাচ্ছি যে ভদ্র ঘরের মেয়ে; কিন্তু এমন ভাবে এ বয়সে একলা ঘরের বাহির হওয়া ভাল হয় নাই। তুমি সধবা মেয়ে, তোমার কি স্বামী ছেড়ে তীর্থে যেতে হয়? তুমি পালিয়ে এস নাই ত'?"

বিনো। তুমি যখন আজ আমায় রক্ষা করেছ, তখন তুমি আমার মা! আমি সত্য সত্যই পালিয়ে এসেছি। আমার কেহই নাই, স্বামী আছেন শুনেছি,